SAMSAPTAK
ISSN : 2454-4884
ESTD.- 2015
PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

SAMSAPTAK 2454-4884

A Bengali Peer-Reviewed & Refereed Journal

সংশপ্তক

নবম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
জুন - ২০২৪

বিশেষ সংখ্যা

পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা উপন্যাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ

পত্রিকা অধিকর্তা
ড. উৎপল মণ্ডল

সম্পাদক
উত্তম দাস

সহ-সম্পাদক
অতীশচন্দ্র ভল্লা

সংশপ্তক

SAMSAPTAK

Peer-Reviewed & Refereed Journal

A bi annual journal based on research social ,literary and cultural discourse

সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক পত্রিকা

২০২৪ ,জুন

2024 ,June

Vol.9, Issue- II

নবম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা

ISSN-2454-4884

Title of the magazine – Samsaptak

পত্রিকার নাম – সংশপ্তক

The language in which Published – Bengali

যে ভাষায় প্রকাশিত – বাংলা

Periodicity of Publication – Six monthly

ব্যবধান – ষাণ্মাসিক

Magazine Director – Dr. Utpal Mandal

পত্রিকা অধিকর্তা

ড. উৎপল মণ্ডল

Name of the editor – Uttam Das

সম্পাদকের নাম - উত্তম দাস

প্রচ্ছদ – উত্তম দাস

অক্ষর বিন্যাস – সুব্রত দত্ত

মুদ্রণ ও প্রকাশকের নাম - বর্ণমিছিল আর্ট প্রেস , সিউড়ী

মূল্য – ৬৮০ /- (ছয় শত আশি টাকা)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় – i

- প্রেমের ব্যর্থতা থেকে পূর্ণতা : অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'রাজনগর' উপন্যাস
  ড. জয়ন্ত মন্ডল# 1
- সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' : মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রাম
  শোভা সাঁতরা #10
- কালবেলা : বিপ্লবে প্রেম ও প্রেমের বিপ্লব
  দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায় # 15
- 'নহন্যতে' উপন্যাস অবলম্বনে মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব
  দেবলীনা বিশ্বাস # 21
- অন্ত:পুরের নিভৃত অন্ধকারের প্রথম স্বাক্ষর : প্রথম প্রতিশ্রুতি
  শিউলী শীট # 31
- শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন : নির্মাণ-বিনির্মাণ
  ড. দীনবন্ধু বিশ্বাস # 36
- সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারঃ প্রসঙ্গ সায়ন্তনী পূততুন্ডের 'চুপি চুপি আসছে' উপন্যাস।
  আবু আসিম # 42
- জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' উপন্যাস: প্রচলিত ইতিহাসের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ
  অরিজিৎ পাল # 49
- 'পথের পাঁচালী' সাহিত্য ও চলচ্চিত্র: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
  ড. মানিক বিশ্বাস# 58
- নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে লোকজীবন
  নন্দিতা সরকার # 64
- আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা
  সহেলী ভট্টাচার্য্য # 69
- জলের উপর পানি : ভাবনার জাগরণে
  প্রভাত দাস , অমৃতা চক্রবর্তী # 72

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD-2015 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

- রূপমঞ্জরী – দেশ-কাল-কল্পনার নিটোল বুননে গড়ে ওঠা এক বিস্মৃত সময়ের কথারূপ
  ডঃ রূপা চট্টোপাধ্যায় # 79
- রাজনৈতিক বিপর্যয়ে কোণঠাসা মাতৃত্ব: ‘জাগরী’র মা ও ‘শহীদের মা’
  তমা দাস # 87
- নিয়মাধীন ভগবানও : সাক্ষ্য ‘শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন’ : কথাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলমে
  ড. অর্ধেন্দু সরকার # 92
- কালকূটের ‘শাম্ব’ : প্রবহমান সংগ্রামের এক নিবিড় আলোচনা
  শতাব্দী ধন # *95*
- বনফুলের ‘হাটে বাজারে’ উপন্যাসে সদাশিব চরিত্রের অন্তর্দর্শন
  রাধা গোবিন্দ নসিপুরী # 101
- উত্তর আধুনিক চেতনার আলোকে বিভূতিভূষণের ‘ইছামতী’
  ড. অচিন্ত্য মাজী # 109
- আরোগ্য নিকেতন : নব চেতনার আলোকে পুরাতন চিকিৎসা বিদ্যার দ্বন্দ্ব
  সুজিত প্রামানিক # 116
- তুঙ্গভদ্রার তীরে উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা ও প্রেমচেতনা
  তনুহাজারী দেবশর্মা # 123
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরোগ্য-নিকেতন’ : রোগ-ব্যাধি-মহামারির বিপন্নতা থেকে স্বস্তির সন্ধান
  প্রভা বিশ্বাস # 132
- ধনপতির সিংহলযাত্রা : বাঙালির অতীত অনুসন্ধান
  অভিজিৎ মান্না # 139
- সমরেশ মজুমদারের কালবেলা উপন্যাসে প্রেম ও বিপ্লবের দ্বৈত রূপ অনিমেষ : একটি আলোচোনা
  ভগীরথ নন্দী # 147
- তারাশঙ্করের ‘আরোগ্য নিকেতন’ : ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এক স্বতন্ত্র জীবন জিজ্ঞাসা
  ড. সারদা বিষ্ণু # 155
- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে বাংলার লোকসংস্কৃতি : প্রসঙ্গ ‘অলীক মানুষ’
  দেবাশিস বিশ্বাস # 160
- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে বিহারের লোকজীবন
  অতীশচন্দ্র ভল্লা # 167

SAMSAPTAK
PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

- কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় এবং পাণ্ডব গোয়েন্দা : একটি আলোচনা
  বিকাশ মান্ডী # 174
- ত্রিপুরার রিয়াং জনজাতির উপাখ্যান : বিমল সিংহের ‘লংতরাই’ উপন্যাস
  ড. মৌসুমী পাল # 181
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’: এক সরল গ্রাম্য প্রেক্ষাপটে জটিল জীবনভাষ্য
  মাধাই পাল # 187
- আত্মকথার স্বরূপ সন্ধান
  অরবিন্দ সরকার # 192
- বর্তমানের দর্পণে প্রতিফলিত অতীতের সুন্দরবনঃ ‘গাঙ বাঘিনি’ উপন্যাসে
  শ্রিয়া দত্ত # 199
- গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী : ফিরে দেখা ও পর্যালোচনা
  প্রসেনজিৎ দাস, উৎপল মণ্ডল # 206
- জয়া মিত্রের নির্বাচিত গল্প : ভাববিশ্বের অন্তর্মুখিতা
  বীথিকা তালুকদার # 215
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বীরঙ্গনা নারী
  হুমায়ুন কবির # 221
- কান্না উপন্যাসের একটি নিবিড় পাঠঃ প্রসঙ্গ প্রান্তিকতা ও প্রতিবন্ধকতা
  ড. সঞ্জীব রজক # 228
- বাবু কালচার থেকে নবচেতনায় উত্তরণ : প্রসঙ্গ উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ
  ইতিষা নন্দী # 232
- শচীন দাশের ‘লাশ ভাইস্যা যায়’: ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে কলকাতা ও নোয়াখালির সমাজচিত্র
  মেহেবুব আলম # 240
- কর্নেল কাহিনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের প্রতিফলন
  সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আতেকা খাতুন # 246
- জগদীশ গুপ্তের ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’: বাংলা উপন্যাসে প্রথম ভিলেন নায়ক
  বাণী রায় # 251
- নজরুল-কাব্যে নারী ও প্রেম : নির্বাচিত কবিতার আলোকে
  মোরশেদুল আলম # 256

SAMSAPTAK
ISSN : 2454-4884
PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

- আসামের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ
  ড. প্রদীপকুমার পাত্র # 267
- সুনীল মাজির কবিতায় অদৃশ্য আলোর ছায়া
  ড. সমীর প্রসাদ # 274
- নবনীতা দেব সেনের ‘সীতা থেকে শুরু’ : নারীজীবনের 'আন্তরকাহিনী' অন্বেষণের পথে
  রিবা দত্ত # 286
- দেবনারায়ণ গুপ্তের শ্যামলী নাটক: প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান
  রিঙ্কু প্রামাণিক # 293
- বিস্মৃতির অন্তরালে বন্দে আলী মিয়া
  রিন্টু বাঙ্গাল # 299
- শৈলেন ঘোষের উপন্যাসে রূপকথা ও মূল্যবোধের প্রসঙ্গ
  রিয়া পাল # 305
- বাংলা নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া
  রোহিত মণ্ডল # 312
- বাংলা ধাঁধায় কীটপতঙ্গ প্রসঙ্গ
  ড. শান্তনু ভট্টাচার্য # 319
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ : গ্রাম ও শহর জীবনের সংঘর্ষ
  ড. দেবযানী ভট্টাচার্য # 325
- সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজভাবনা
  ড. সুজিত কুমার সাহু # 332
- সুখস্মৃতির অনুভবে দেশভাগের গল্প : ‘শিকড়’ ও ‘স্বরাজ—রেলে’
  শ্রীনাথ মাইতি # 338
- অণুগল্পকার অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়:- একটি পর্যালোচনা
  সুমন সরকার # 346
- ফেসবুকের ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য
  তিথি ঘোষ # 351
- ভগীরথ মিশ্রের গল্পে একালের সমাজ চিত্র
  ড. ব্রততী রানী মাইতি সাহু # 356
- আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীদের অবস্থান ও সংগ্রাম
  করম চাঁদ মান্ডি # 363

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

- সামাজিক প্রেক্ষাপটের আদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’
  নিত্যানন্দ দাস # 369
- যন্ত্রণা ও আত্মিক অবক্ষয়ের আলোকচিত্রঃ ‘কেয়াপাতার নৌকো’
  ধ্রুব মুন্সী # 377
- সংস্কৃতির বাহকরূপে আড্ডা
  পায়েল দত্ত # 387
- সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস ' উপন্যাসের আলোকে তৎকালীন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন
  গৌরব সিনহা # 393
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুণ্ডা জনজাতির অবদান এবং তাঁদের সমাজ , ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি অনুসন্ধান
  সুব্রত দাস # 398
- দ্বিশতবর্ষের আলোকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত
  ছন্দা পাল # 404
- ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলন - একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
  প্রদীপ কর্মকার # 411
- সামজিক চুক্তির মতবাদের আলোকে শাস্তিতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা
  মন্দিরা ঘোষ # 419
- সুনীল মাজির কবিতায় নিসর্গ ও প্রকৃতি চেতনার প্রভাব
  গৌতম মন্ডল # 425
- মহাপুরুষদের পদধূলি ধন্য ধর্মীয় পীঠস্থানের ইতিহাসে বারুইপুর
  সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য # 438
- বৃত্তিরূপে লক্ষণা : ন্যায় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সমীক্ষা
  রাধারঞ্জন সাহা # 443
- প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনদর্শন ভাবনা
  উত্তম দাস # 450

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD- 2015 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সম্পাদকীয়---

'সংশপ্তক' পত্রিকার এই সংখ্যায় যারা প্রবন্ধ লিখেছেন, তাদের প্রত্যেককে 'সংশপ্তক' পত্রিকার পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। 'সংশপ্তক' পত্রিকা ২০১৫ সাল থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রথম থেকেই এই পত্রিকা সকলের ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও সহযোগিতা পেয়ে এসেছে , ভবিষ্যতেও পাবে - এই আশা রাখি।

এই বিশেষ সংখ্যায় পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস নিয়ে যে কয়জন অধ্যাপক ও গবেষক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন, তাদের প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে নিজস্বতা।আর উপন্যাসগুলি কেন পুরস্কার পেয়েছে- সেই দিকও কম-বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে । আসলে পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসগুলির পুরস্কার পাওয়ার পশ্চাতে একাধিক কারণ থাকে। তার মধ্যে যেগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হলো-উপন্যাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও প্রচার, সাহিত্যগুণ, ভাষার সৌন্দর্য , বাস্তবতার প্রতিফলন, সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি , সৃজনশীলতা এবং অন্যদিকে চরিত্রের গভীরতা, সামাজিক বার্তা এবং কাহিনীর মৌলিকতা । এছাড়াও পাঠকের মধ্যে সেই উপন্যাস কতটা নতুন চিন্তার জন্ম দিচ্ছে - সেই দিকটিও দেখা হয় । এর বাইরেও অন্যান্য কারণ থাকতে পারে।

যাইহোক ,পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ছাড়াও এই সংখ্যার অন্যান্য বিভাগে সমাজ,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যে সব প্রবন্ধ এসেছে , সেই প্রবন্ধগুলিও মৌলিক ভাবনাজাত এবং গবেষণাধর্মী ।

সম্পাদক

প্রেমের ব্যর্থতা থেকে পূর্ণতা : অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'রাজনগর' উপন্যাস

ড. জয়ন্ত মন্ডল

সারসংক্ষেপ -

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'রাজনগর' উপন্যাসটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার মিশ্রণে রচিত হয়েছে। তবে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো কাল্পনিক। এই উপন্যাসে একসঙ্গে দুটি কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে রয়েছে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়া রাজপরিবার এবং অপরদিকে রয়েছে প্রজাদের রক্ত শোষণকারী নীলাক্ত সমাজ। বাংলাদেশের পাবনা জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে অমিয়ভূষণ মজুমদারের যে পৈতৃক জমিদারবাড়ি ছিল সেই জমিদারবাড়ির প্রভাব রয়েছে এই 'রাজনগর' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, রাজার মৃত্যু হলে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন রানীমা। পুত্র রাজচন্দ্র বয়সে নাবালক হওয়ায় রানীমা অত্যন্ত বুদ্ধির সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতে শুরু করলেন। রানীমা যৌবন বয়স থেকেই গোপনে ভালোবাসলেন তার পিসতুতো দাদা পিয়েত্রোকে। আবার যৌবনের শুরুতেই পুত্র রাজচন্দ্র ভালোবেসেছে নয়নতারা নামে এক কায়েত কন্যাকে। সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে পিয়েত্রো আহত হয়ে ফরাসডাঙায় ফিরে এলেও কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই পিয়েত্রো ছিল রানীমার একমাত্র ভরসা। পিয়েত্রো শুধু রাজচন্দ্রের অভিভাবক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রানীমার প্রেমিক। পিয়েত্রোর মৃত্যুর পরেই তার হাওয়াঘরকে শিবমন্দির রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং পিয়েত্রোকে শিব রূপে কল্পনা করলেন। রাজচন্দ্রের বয়স বৃদ্ধি ঘটলে রানীমা রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করে এক পাহাড়ে মহাপ্রস্থান করলেন যেখান থেকে রানীমা আর কোনোদিন তার রাজ্যে ফিরে আসবেন না। কারণ, মহাপ্রস্থানে যারাই গিয়েছে তারা আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। আবার রাজচন্দ্র ও নয়নতারার বিবাহ কোনো ভাবেই সম্ভব না হওয়ায় রাজচন্দ্র নয়নতারাকে অনুভবের মধ্যে জীবিত রেখেছে। এই উপন্যাসের শেষে প্রচন্ড ঝড় উঠেছে। এই ঝড়ে সবকিছু উল্টো পাল্টা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও রাজচন্দ্র ও নয়নতারা একে অপরের সঙ্গে চিরকালের জন্য মিলিত হতে পারবে না। রানীমা শিবের মধ্যে নিজের প্রেমিককে খুঁজে পেয়েছেন এবং রাজচন্দ্র অনুভবের মধ্যে নয়নতারাকে। এই উপন্যাসের গল্প সমাপ্ত হয়েছে প্রেমের ব্যর্থতা থেকে প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তির মধ্যে।

মুলশব্দ-

উত্তরবঙ্গ , ঐতিহাসিক, অমিয়ভূষণ রাজনগর, প্রেম , ব্যর্থতা

মূলপ্রবন্ধ -

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে যে সকল কথাসাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম কথাশিল্পী ছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ভূমিতে যে সকল কথাসাহিত্যিক নিজেদের সাহিত্য সাধনা দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন সেই তালিকায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অমিয়ভূষণ মজুমদার ছিলেন একমাত্র সাহিত্যসাধক যিনি নিজেকে কখনো প্রচার করতে চাননি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গের একজন প্রচার বিমুখ সাহিত্যসাধক। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন ব্যতিক্রমী ছিলেন, তেমনি ব্যতিক্রমী পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতেও। জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মহৎ সৃষ্টি এবং সৃষ্টির মাধ্যমে সুখকে খুঁজে পেতেই অত্যন্ত গোপনে মহৎ সৃজনের অনুশীলন করেছিলেন বহু বছর ধরে। উত্তরবঙ্গের কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ও দেবেশ রায়ের মত অমিয়ভূষণ মজুমদারও উত্তরবঙ্গের ভৌগলিক পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক,

রাজনৈতিক অবস্থা, লোকসমাজ ও লোকসমাজের বিচিত্র সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস ধারায় যে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গের পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাই এক সময় তাঁর নির্মাণ কাঠামোকে মজবুত করে তুলেছিল। তিনি গোপনে সাহিত্যসাধনা করে এক সময় সিদ্ধিলাভ করলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সিদ্ধিলাভের শিল্পসৃষ্টি পাঠাকের হৃদয়ে পৌঁছতে বহু সময় লেগেছে। পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁকে উত্তরবঙ্গের জনজীবনের সার্থক রূপকার বলতে দ্বিধা করেননি।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশদের কুচক্রে পড়ে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের বাঙালিরাও তাতে জড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে বাঙালিদের মনে স্বায়ত্ব দাবি চলে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শক্তিহীন হয়ে পড়ে বাংলার সাধারণ মানুষ যেমন স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি আবার স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে বঙ্গবাসীর মন আন্দোলিত হতে থাকে। একদিকে বিশ্বব্যাপি রক্তক্ষয়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, অপরদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি। এই অস্থিরময় প্রেক্ষাপটে ১৯১৮ সালের ২২শে মার্চ মহান স্রষ্টা অমিয়ভূষণ মজুমদার পার্থিব জগতে আবির্ভূত হলেন কোচবিহার শহরের মাতুলালয়ে। পিতা অনন্তভূষণ মজুমদার এবং মাতা জ্যোতিরিন্দু দেবী। অমিয়ভূষণ মজুমদারের আদিবাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে। অমিয়ভূষণ মজুমদার পাকুড়িয়ার জমিদার বংশের সন্তান হলেও সামন্ততন্ত্রের ভাঙন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যার কারণেই পিতা অনন্তভুষণ মজুমদার এক রকম সপরিবারে কোচবিহার শহরে এসে অনেকটা উদ্বাস্তু জীবনযাপন শুরু করেন। অল্প বয়সেই অমিয়ভূষণ মজুমদার কোচবিহারের খ্যাতনামা 'ভিক্টোরিয়া' কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক পাস করেই পরিবারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতেই তিনি ১৯৩৪ সালে ডাকবিভাগের চাকরি গ্রহণ করে নতুন করে জীবন শুরু করলেন। পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে তিনি প্রথম ডাক বিভাগে কর্মসূত্রে যোগদান করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কখনও কৃষ্ণনগর, কখনও দার্জিলিং, তুফানগঞ্জ শহর এবং কর্মজীবনের শেষ সময়টুকু কোচবিহার সদরে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজশাহীতে তাঁর প্রথম কর্মজীবন শুরু হলে পরিবার থেকে দূরে থাকায় বহুদিন তিনি একাকীত্বে কাটিয়েছেন। সেই একাকীত্ব থেকে মুক্তি কামনার সাধনা শুরু করলেন এবং বহুকালের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। যদিও তাঁর সৃষ্টিশিল্প তখনও পাঠকের হৃদয়ে ঠিকমত প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি নিজের সৃষ্টির মধ্যেই নিজের পরম আনন্দকে খুঁজে পেলেন। কি উপন্যাস, কি ছোটগল্প, কি প্রবন্ধ, কি নাটক – এই সকল শাখায় তিনি সরল ভাষায় সরল ভাবনায় বাংলার সমাজ জীবনকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৪০ সালে গৌরীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই গৌরীদেবীই ছিলেন তাঁর প্রথম পাঠক ও তাঁর প্রধান প্রেরণাদাত্রী। অমিয়ভূষণ মজুমদার রাতে যা কিছু লেখালেখি করতেন সকালে উনুন ধরাতে গিয়ে সেই সকল লেখাগুলো গৌরীদেবী পাঠ করতেন। স্ত্রীর সেই প্রেরণার কথায় অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছেন -

"একদিন স্ত্রী বললেন টুকিটাকি কি লেখ, উনুন ধরাতে গিয়ে দেখি, একটা গল্প লেখ না। খেলার মতো মন নিয়ে ছুটির দিন পর গল্প লিখলাম। হঠাৎ কি করে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রিকা পূর্বাশার একটি কপি বাড়িতে এসেছিল। গল্পটা শেষ করে পরের দিন সকালে গল্পটা সঞ্জয়বাবুর নামে পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক পনেরোদিন পরে এক কপি পূর্বাশা এল। দেখি, আশ্চর্য আমার সেই গল্প প্রায় দশ পনেরো পৃষ্ঠা জুড়ে। এই শুরু; কিন্তু শুরুটা ভালো হল।"[১]

অমিয়ভূষণ মজুমদার অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করলেও তিনি 'নীল ভুঁইয়া' নামে একটি ট্রিলজি রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ট্রিলজিতে সাধারণ তিনটি খন্ডের কাহিনী থাকে এবং প্রতিটি খন্ডের কাহিনীর মধ্যে থাকে গভীর যোগসূত্র। তিনি প্রথম খন্ডের নামকরণ করেন 'নয়নতারা' দ্বিতীয় খন্ডের নামকরণ করেন 'রাজনগর' এবং তৃতীয় খন্ডের নামকরণ করতে চেয়েছিলেন 'স্যর রাজচন্দ্র'। তিনি কলকাতা মহানগর থেকে অনেক দূরে বসবাস করতেন। ফলে

কলকাতার নামকরা বড় বড় সাহিত্য পত্রিকাগুলোর সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ হয়ে উঠতে পারেনি। তবে কবি ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ অমিয়ভূষণ মজুমদারকে নিয়ে প্রশংসার আলোচনা শুরু করলে ধীরে ধীরে সাহিত্য পত্রিকাগুলোর সঙ্গে তাঁর পরিচিতি বাড়তে থাকে। কবি ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মহাশয় অমিয়ভূষণ মজুমদার সম্পর্কে লিখেছিলেন – "তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ মজুমদারই এখন এমন একজন লেখক যিনি বহুবিধ কোণ থেকে জীবনকে দেখতে পারেন।"[২] তবে বয়স বৃদ্ধি ও সময়ের অভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি ট্রিলজি রূপে 'নীল ভুঁইয়া' সমাপ্ত করতে পারেননি। ফলে তাঁর 'নয়নতারা' এবং 'রাজনগর' উপন্যাস দুটি পৃথক পৃথক আকারেই গ্রন্থাগারে প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৭ সালে 'উত্তরদেশ' নামক একটি সাময়িক পত্রে 'রাজনগর' উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছেন –

"ত্রিশ বৎসর আগে ১৮৫৭ সালের সমাজ নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছিলাম। সে-সমাজ নানাদিক দিয়ে কলকাতা মহানগরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, আবার অন্যান্য বিষয়ে বিশিষ্টও ছিল। তখন অনুভব করেছিলাম এই চিন্তাভাবনা একটি ত্রিস্তর উপন্যাসের রূপ নেবে। ফলে প্রায় ত্রিশ বৎসর হল এই ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'নীল ভুঁইয়া' প্রকাশিত হয়। 'রাজনগর' ট্রিলজির দ্বিতীয় উপন্যাস। তৃতীয় অংশ যার সম্ভাব্য নাম ছিল 'স্যর রাজচন্দ্র'- আমি তা না লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"[৩]

দুঃখের বিষয় হল, সেই সময় কোনো প্রকাশক 'নীল ভুঁইয়া' নামে অমিয়ভূষণ মজুমদারের ত্রয়ী উপন্যাস ছাপতে রাজি হয়নি। একদিকে এই হতাশা এবং অন্যদিকে লেখার প্রতি অনীহা চলে আসায় তাঁর এই ত্রয়ী উপন্যাসের স্বপ্নটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তাছাড়া ইতিহাসের ডিটেল্‌স বড় বেশি এসে যাওয়ায় একশো বছরের ইতিহাসের ধারাকে তিনি সঠিক ভাবে গুছিয়ে নিতে পারেননি। তাই তাঁর পরিকল্পিত ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডটি 'রাজনগর' নামেই স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হল এবং পাঠক মহলে বহু প্রশংসা লাভ করল। এই 'রাজনগর' উপন্যাসটি অমিয়ভূষণ মজুমদারের জীবনে দুটি বড় প্রাপ্তি এনে দিয়েছে। ১৯৮৬ সালে শুধুমাত্র এই উপন্যাসের জন্যই 'বঙ্কিম পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদার ঐতিহাসিক প্রক্ষাপটে নর-নারীর বাহ্যিক প্রেমের ব্যর্থতার ছবিকে হৃদয়ের পূর্ণতায় এঁকেছেন 'রাজনগর' উপন্যাসে। প্রথমে এই কথাটি বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, 'রাজনগর' উপন্যাসটি আসলে অমিয়ভূষণ মজুমদারের ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ড। প্রথম খন্ড 'নয়নতারা'। তাই প্রথম খন্ডকে বাদ শুধু দ্বিতীয় খন্ডের আলোচনা করলে এই আলোচনায় অস্পষ্টটা থেকে যেতে পারে। তাঁর প্রথম খন্ড 'নয়নতারা' উপন্যাসের নায়ক রাজচন্দ্র এবং নায়িকা নয়নতারা। আবার 'রাজনগর' উপন্যাসের নায়ক রাজচন্দ্র এবং নায়িকা নয়নতারা। অমিয়ভুষণ মজুমদার নিজের চোখে দেখেছেন কিভাবে দেখতে দেখতে একটি সামন্ততন্ত্র অবলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর এই দুটো উপন্যাসেই সেই সামন্ততন্ত্রের শেষ সময়কে দেখানো হয়েছে। সেই সময় বাংলার অধিকাংশ জমিদারবাড়ি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়, জমিদার ও তার প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় এই দুটি উপন্যাসে। 'রাজনগর' উপন্যাসের রাজপরিবার অতি সাবধানে এগিয়ে চলতে গিয়ে বার বার পিছিয়ে পড়েছে। রাজনগর ছিল কিন্তু তাকে সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য রাজা ছিল না। অল্প বয়সে পিতৃহারা হওয়ায় রাজচন্দ্র নিজের মায়ের ইচ্ছামত জীবন যাপন করেছে। আবার রাজনগরের রানীমা ও নায়েব হরদয়াল অনেকাংশে ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য হয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীরা ছিল এই রাজপরিবারের একেবারে চোখের বালি। ইচ্ছে না থাকলেও সেই ব্রিটিশদের বাদ দিয়ে কোনো কাজ সহজে করা সম্ভব ছিল না। এমন বাধা বিপত্তির মধ্যদিয়ে চলতে গিয়ে রাজপরিবার নিজেদের সত্তাকে হারাতে শুরু করে। একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকতে থাকে নর-নারীর সুমধুর সম্পর্কগুলো।

'রাজনগর' উপন্যাসের রানীমা ও পিয়েত্রো, রাজচন্দ্র ও নয়নতারা এবং রাজচন্দ্র ও হৈমবতী – এই চরিত্রগুলো অন্তরের টান অনুভব করলেও বাস্তবে তা গভীর প্রেমের রূপ দিতে পারেনি। সকলেই নিজ নিজ স্থানে থেকে ভালোবাসে কিন্তু মিলিত হতে পারেনি। 'রাজনগর' উপন্যাসের শেষ পরিণতি অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে বেদনাহত করে তোলে। অমিয়ভূষণ মজুমদার নিজেও পাবনার সামন্ত পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণেই তিনি এই রাজপরিবারকে হয়ত এত সুন্দর রূপ দিতে পেরেছিলেন।

'রাজনগর' উপন্যাসে একদিকে রয়েছে রাজপরিবারের কাহিনী এবং অপরদিকে রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের নীলাক্ত সমাজের কাহিনী। এই উপন্যাসের সকল চরিত্র কাল্পনিক হলেও ইতিহাসের নীলাক্ত সমাজকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জায়গার নাম মরেলগঞ্জ ও ফরাসডাঙা। এই মরেলগঞ্জের একদিকে রয়েছে রাজবাড়ি এবং অপরদিকে রয়েছে নীলকর ডানকান হোয়াইটের নীলকুঠি। প্রথমখন্ড 'নয়নতারা' যদি পাঠ করা যায় তাহলে 'নয়নতারা' ও 'রাজনগর' উপন্যাসের মধ্যে সম্পর্কটা বোঝা যাবে। 'নয়নতারা' উপন্যাসের কাহিনী শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ সালের সময়ের ইতিহাসকে নিয়ে। আবার 'রাজনগর' উপন্যাসের আলোচনা শুরু হয়েছে ১৮৫৮ সালের ইতিহাসের ঘটনা দিয়ে। প্রথমখন্ড 'নয়নতারা'য় রয়েছে নীলকরদের অমানবিক অত্যাচারের কাহিনী ও একই সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহ। 'রাজনগর' উপন্যাসে নীলকরদের সেই অত্যাচার খুব তীব্র না হলেও নীলকরদের 'দাদন' প্রথা তখনো চলছে। এই সময় রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার ফলে নীলকরদের অত্যাচার বাহ্যিক ভাবে কম মনে হলেও ভিতরে ভিতরে সেই অত্যাচার চরম পর্যায়ে চলতে লাগল। ভারতীয় বাঙালিরা আশা করেছিল ভিক্টোরিয়া শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রচলিত হোক। বাস্তবটা ছিল উল্টো। ভিক্টোরিয়া শাসনের নামেও চলছিল সাধারণ মানুষকে শোষণ করার চক্র।

মরেলগঞ্জের রাজার মৃত্যুর পর স্বয়ং রানীমা পুত্র রাজচন্দ্রকে হবু রাজা করে নিজেই রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। 'নয়নতারা' উপন্যাসে যে সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে সেই বিদ্রোহে ফরাসি ফিরিঙ্গি জাঁ পিয়েত্রো এবং রাজকুমার রাজচন্দ্রও অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজকুমার রাজচন্দ্র প্রাণে বেঁচে ফিরে এলেও পিয়েত্রো ফিরে এলেন একেবারে অসুস্থ অবস্থায়। এই পিয়েত্রো ছিলেন রানীমার পিসতুতো দাদা। অর্থাৎ জাঁ পিয়েত্রোর মা ছিলেন রানীমার পিসি এবং জাঁ পিয়েত্রোর পিতা ছিলেন একজন ফরাসি ব্যবসায়ী। আবার এই পিয়েত্রো ছিলেন রানীমার রাজ্য শাসনের পথ প্রদর্শক। তার থেকেও বড় কথা তিনি ছিলেন রানীমার 'গোপন প্রেমিক'। পিসতুতো এবং মামাতো ভাই-বোনের সম্পর্কের কারণে তাদের প্রেম কোনোদিন পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। অল্প বয়সে রানীমার অন্যত্র বিয়ে হলেও পিয়েত্রো কোনোদিন অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা মুখেও আনলেন না। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'রাজনগর' উপন্যাসে সেই গল্পের পরিচয় পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র 'রাজনগর' উপন্যাসে যে প্রেমের ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে প্রেমের পূর্ণতার ছবি দেখানো হয়েছে সেই ছবিকে একটু পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য এই আলোচনাটুকুর প্রয়োজন ছিল।

'রাজনগর' উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে, রানীমা পিয়েত্রোর হাওয়াঘরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সাতদিন আগে রানীমা উকিলসাহেব ডেকে সেই বিষয়ে কাগজ প্রস্তুত করেছিলেন। পন্ডিতদের বিধান অনুযায়ী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্বেতচন্দন প্রয়োজন। বাস্তবে দেখা গেল রানীমা শ্বেতচন্দনের পরিবর্তে রক্তচন্দন দিয়েছেন। আরও পরে জানা গেল রানীমার বুকের রক্ত দিয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রানীমার দৃষ্টিতে পিয়েত্র ছিলেন তার মনের শিব। সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে পিয়েত্রো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন এবং এক সময় তিনি মারাও যান। পিয়েত্রো চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলে মনের মন্দিরে রানীমা তাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। রানীমা রাজতন্ত্রের ভাঙন দেখেছেন, বালক পুত্র রাজচন্দ্রকে সকল শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু যাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলেছেন তাকে তিনি কোথায় খুজবেন? এক সময় যেকোনো সমস্যায় পিয়েত্রো ছিলেন সমাধানের

সূত্র। তাই রানীমা মনের মন্দিরে পিয়েত্রোকে প্রতিষ্ঠা করে নিলেন। মন্দিরটি শিবমন্দির নামে প্রতিষ্ঠা হলেও বাস্তবে তা ছিল রানীমার হৃদয়মন্দির। যৌবনে তিনি পিয়েত্রোকে কাছে টেনে নিতে পারেননি সমাজ সংস্কারের ভয়ে। পিয়েত্রো মারা গেলে তার হাওয়াঘরকে মন্দির রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন যেখানে সবাই গিয়ে মাথানত করবে। বৈষ্ণব সাহিত্যে নাকি বিরহেই প্রেমের সুখ। হয়ত কথাশিল্পী অমিয়ভূষণ মজুমদারও সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই চিত্রটি এঁকেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করার পর আর কোনোদিন বৃন্দাবনে ফিরে আসেনি। রানীমার ভাবনায় যেন পিয়েত্রোও অন্য কোথাও গমন করেছেন যেখান থেকে আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। শ্রীমতী রাধা যেমন ভাবে বলেছে –'বঁধু, কি আর বলিব আমি, জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি'। রানীমাও যেন সেভাবেই পিসতুতো দাদা জাঁ পিয়েত্রোকে প্রাণনাথ রূপে গ্রহণ করেছেন। রানীমার এই প্রেম ছিল সকলের কাছেই অজানা। এই ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল নিঃস্বার্থ চাওয়া পাওয়া থেকে। রানীমার এই প্রেম যেন আধ্যাত্মিক এক প্রেমের রূপ। হৃদয়ের চাওয়া পাওয়াই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে নায়েব হরদয়াল রানীমা ও পিয়েত্রোর সম্পর্কের কথা ভাবলেন। নায়েব হরদয়াল এই দুজনের সম্পর্ককে অনুভব করেছিলেন। হরদয়ালের মনে হল –

"এটা কিন্তু খুব বিস্ময়ের হবে যদি প্রমাণ হয় যে জাঁ পিয়েত্রো রানীর আপন পিসিমার ছেলে। আর এখন তো তা প্রমাণ হলই।...তাহলে কি রানীর খ্রিস্টান ধর্ম ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক মনোভঙ্গির বিশ্লেষণ হয়? তার মনে পড়ে গেল, রাজকুমার বালকত্ব পার হয়ে কৈশোরের দিকে যেতে তার শিক্ষাদীক্ষার ভারই যেন পিয়েত্রো বুজরুকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অন্তত দিনের অনেক সময়েই ফরাসডাঙায় কাটাত রাজকুমার। একটা পক্ষপাতই ছিল যেন রানীর রাজকুমারের বেড়ে ওঠার ব্যাপারে।...তাতে কিন্তু প্রমাণ হয়, পিয়েত্রো রানীর কত কাছের মানুষ ছিলেন। কিন্তু কোনোদিনই কি কেউ পিয়েত্রোর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে তাঁকে?"[৪]

রানীমার দৃষ্টিতে রাজচন্দ্র এখন অনেক বড় হয়েছে। এখন আর শুধু রাজচন্দ্র নয়, স্যর রাজচন্দ্র নাম ধারণ করেছে। মরেলগঞ্জে নতুন একটি জমিতে পুকুর কাটা নিয়ে এক বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বন্দা নামে একজন সাধারণ প্রজা একশো কোদাল নিয়ে গিয়েছিল। জুড়ান পাইক নামে একজন সড়কি চালালে বন্দা তাকে দুফালা করেছিল। আবার কিবল নামের এক ইংরেজ দূর থেকেই বন্দাকে গুলি করে মেরেছে। বাড়ির চাকর রূপচাঁদের কাছে এই খবর শোনামাত্র স্যর রাজচন্দ্র একাই বেরিয়েছে প্রতিবাদ করতে। রাজচন্দ্রের এই আচরণে রানীমা অত্যন্ত গর্বিত হলেন। অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন-

"...পিয়েত্রোর মৃত্যুর মুহূর্তে দয়াশীল রানী পিয়েত্রোর নিভে-আসা চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন একবার। এই সময়েই হঠাৎ যেন রাজচন্দ্র এতদিনে নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করল।...ওটা তো ভালোবাসার গল্পই। বিচিত্র সুঘ্রাণের ভালোবাসা। রানীমা মনে মনে হাসল, যেন মনে মনেই বলল: তাহলে কিন্তু রানীমা মা থাকে না।...সে অনুভব করল, এতদিন কি সে মায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আর এখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মায়ের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে?"[৫]

এবার রানীমার মহাপ্রস্থানে যেতে বাধা নেই। লিপুধুরাতে একটি বড় পাহাড় রয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই পাহাড়কে একজন পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। রানীমার কাছেও হয়ত সেই পাহাড় ছিল পিয়েত্রোর প্রতিরূপ। দিনের আলোয় প্রচন্ড ঠান্ডায় রানীমা সেই পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছিলেন সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে। রানীমার সেই যে চলে যাওয়া আর কখনও ফিরে আসা হয়নি। রানীমার এই চলে যাওয়া ছিল মহাভারতের মহাপ্রস্থানের মত যেখান থেকে কেউ কোনোদিন ফিরে আসেনি। রানীমার বিশ্বাস ছিল পিয়েত্রো মারা যাওয়ার পর সেই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত রানীমা পাহাড়কেই পিয়েত্রো কল্পনা করে তিনি চিরকালের জন্য মহাপ্রস্থান করলেন।

'নয়নতারা' উপন্যাসে দেখা যায়, রাজচন্দ্র নয়নতারাকে তার প্রেমিকা মনে করে। যে বয়সে রাজচন্দ্র কিশোর অর্থাৎ সতেরো বা আঠারো হবে এবং সেই সময় নয়নতারার বয়স পঁচিশ। রাজচন্দ্র রাগের মাথায় একজন মানুষকে খুন

করে সেই কথা প্রথম নয়নতারার কাছে স্বীকার করেছে। দাদা ও বউদির মৃত্যুর পর থেকে সংসারে নয়নতারা ভীষণ একা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের সূত্রে নয়নতারা বহু পুরুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পেলেও রাজচন্দ্রের মত কাউকে পায়নি। নয়নতারার সঙ্গে রাজচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতে দেখা যায় রাজচন্দ্র নিজের বাড়ির পথ ভুলে গিয়ে নয়নতারার পাড়ার এসে উপস্থিত হয়েছে। রাজচন্দ্রকে দেখামাত্রই নয়নতারার মধ্যে প্রেমের প্রথম পর্যায় পূর্বরাগের জন্ম হয়েছিল। লেখকের কথায়-

"নয়নতারা পথ থেকে দৃষ্টি তুলতে গিয়েই রাজচন্দ্রকে দেখতে পেল। পুতুল হাতে পেলে প্রথম কিছুক্ষণ তার দিকে যে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা স্বাভাবিক তেমনই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রাজচন্দ্র নয়নতারাকে দেখছে। তার দৃষ্টি যেমন নিষ্পাপ তেমনি নির্লজ্জ। নয়নতারা অনুভব করল, তার গ্রীবার কাছে, তার বক্ষের কাছে, তার চিবুকে রাজচন্দ্রর দৃষ্টি স্থির হয়ে পড়েছে-তখুনি সরে যাচ্ছে না, যেন অনুভব করছে।"[৬]

রাজচন্দ্র একজন মানুষকে খুন করার পর থেকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ভয়ে সময় কাটাচ্ছিল। কারণ, তারপর থেকেই ইংরেজ কালেক্টর সেই খুনের খোঁজ-খবর করছে। দ্বিতীয়বার যখন রাজচন্দ্র ও নয়নতারার সাক্ষাৎ হল তখনও তাদের মধ্যে চাওয়া পাওয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

"নয়নতারা, আমার আর ভালো লাগে না চিন্তা করতে। কী করে এটা ভোলা যায় বলতে পারো'? ...

হঠাৎ নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার, চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই'।

'কোথায় যাব'?

'যেখানে কেউ চিনতে পারবে না'।"[৭]

এভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের আলোচনার শেষ হল। নয়নতারা এক সময় সুতোর জন্য দাদন নিয়ে মহাজনের কাজ করেছে। সেই মহাজন এক রাতে দাদনের অজুহাতে নয়নতারার কাছে এসে তাকে ভোগ করার প্রস্তাব দিলে সেদিন থেকে নয়নতারা সুতোর কাজ ছেড়ে দিল। এতবড় পৃথিবীতে যেখানে নয়নতারার নিজের বলতে শুধুমাত্র নয়নতারা, সেখানে একজন রাজকুমারের সঙ্গতি লাভ করা তার কাছে কম সৌভাগ্যের ছিল না। তাই নয়নতারাও ভিতরে ভিতরে অনেক দূর এগিয়ে গেল। রাজচন্দ্রের উপস্থিতি ও রাজচন্দ্রকে অনুভব করার মধ্যে নয়নতারা আনন্দ পেতে লাগল। দুজনের তৃতীয়বারের আলোচনায় রাজচন্দ্রের মনের কথা প্রকাশ পেল যেন।

"নয়নতারা বলল, 'রাজকুমাররাও যদি অপমান থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারেন, প্রজারা কার ভরসায় এই অপমানের দেশে থাকে'।

রাজচন্দ্র নয়নতারাকে দেখতে লাগল; অনুভব করতে লাগল। সে উপস্থিতি যেন উষ্ণ, সুন্দর, যেন তার সৌরভও আছে।

রাজচন্দ্র বলল, 'কী যে করতে ইচ্ছে করছে জানি না। চলো না নয়নতারা, একটু ঘুরে আসি'।

'মেয়েছেলেরা কি পথে বেরতে হয়'?

'পথে কেন, ঘোড়ায়। তুমি যদি বলো এখুনি আর একটা ঘোড়া আনিয়ে নিই কিংবা চতুর্দোলা'।

নয়নতারা হাসল।

রাজচন্দ্র বলল, 'নয়ন, তোমার কাছে আসতে আমার ভারি ভালো লাগে। এখন থেকে আমি রোজ আসব। কখন আসব তা বলতে পারি না। তুমি যেন বাড়ি থেকে কোথাও চলে যেয়ো না'।"[৮]

নয়নতারা সকল কাজ বন্ধ করে কবিরাজের কাজ শিখেছে। দাদা জীবিত থাকতে তার টোলেই কিছুদিন শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিল। নয়নতারাকে রানীমার পছন্দ ছিল কিন্তু তাই বলে বয়সে বড়, কায়েতকন্যা, কবিরাজি যার পেশা তাকে তো আর পুত্রবধূ করা সম্ভব নয়। রাজচন্দ্র ও নয়নতারার সম্পর্ক খুব কাছাকাছি চলে এলেও বিচ্ছেদের মধ্যদিয়েই যেন 'নয়নতারা' উপন্যাসের কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। নয়নতারা কাশী যাত্রা করেছে।

'রাজনগর' উপন্যাসে রাজচন্দ্র প্রাপ্ত বয়স্ক। নিজের ভালো মন্দ বুঝে চলার বয়স তার হয়েছে। কিন্তু তাই বলে নয়নতারা তো কোনোদিন রাজচন্দ্রের জীবন সঙ্গিনী হতে পারে না। রাজচন্দ্র এবং নয়নতারা আর আগের মত যৌবনের টানে মিলিত হতে চায়নি। দুজনেই তাদের প্রেমের সীমানা বুঝতে পেরেছে। এই উপন্যাসে দেখা যায় রাজচন্দ্রের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিবাহের আলোচনা অন্যত্র চলছে। রাজচন্দ্রের বিয়ের সময় বা তার পরে যাতে নয়নতারার কারণে রাজচন্দ্রের সংসার জীবনে কোনো সমস্যা না হয় তাই রানীমা আগে থেকেই রাজচন্দ্রের বিয়ের কথা নয়নতারাকে জানিয়েছেন।

"রানী বললেন, আচ্ছা, নয়নতারা, তুমি কি কখনও কায়েতবাড়ি গ্রামে গিয়েছ? নাম শুনছ নিশ্চয়'?

'হ্যাঁ, সদরে যেতে পড়ে। সেখানে এক জমিদারবাড়ি আছে, যারা নাকি কায়স্থ'।

'সেখানে একজন কুমার আছে যার বয়স রাজুর কাছাকাছি, জানো'?

'শুনিনি তো'।

'সে আমাদের রাজবাড়িতে আসবে লিখেছে'।

'আমাদের রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় বুঝি'?

'না। রাজু কবে কায়েতবাড়ি গেল'? তাছাড়া সেই কায়েত কুমার তো পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকেই বেশিরভাগ কলকাতায়'।

রানী আলাপটাকে অন্যদিকে নিলেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে হৈমীর আলাপ হল, নয়ন? মেয়েটি ভালো নয়! বেশ সুন্দরী, কি বলো'?

নয়নতারা বললে, 'বেশ কম বলা হয়'।

রানী হাসলেন। বললেন, 'ভাগ্যে মেমসাহেব বলোনি। রাজুর একরকম মামাতো বোন।"[৯]

রাজচন্দ্র বিশ্বাস করতে লাগল, সব পুরুষের বিবাহ করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। রাজচন্দ্র হৈমবতীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। হয়ত রাজচন্দ্র নয়নতারাকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল যেমনটা আমরা রানীমার মধ্যে পেয়েছি। পিয়েত্রোর হাওয়াঘরে রানীমা যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন সেই শিবমন্দিরের দেখাশুনার দায়িত্ব দিলেন নয়নতারার উপর। অর্থাৎ একই শিবমন্দিরে যেন পিয়েত্রো ও নয়নতারাকেও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন রানীমা। নয়নতারা এবং রাজচন্দ্রের দেখা করা, আলাপ করা, আগের মতই চলতে লাগল যেন দুজনের মাঝে একটি প্রাচীর রেখে।

রাজচন্দ্র আর নয়নতারা একবার ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পিয়েত্রোর বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রাজচন্দ্র কালবৈশাখীর ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় নদীর ধার বরাবর চলতে থাকে। দেখতে দেখতে রাজচন্দ্র অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলে নিজের জীবন বাজি রেখে রাজচন্দ্রকে উদ্ধার করতে নয়নতারাও অন্ধকার সেই নদীর বুকে নেমে পড়ে। নদীর কিনারায় স্তূপের মত কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে নয়নতারা আর্তনাদ করে ওঠে। নয়নতারা রাজুকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের মধ্যে রাজচন্দ্রের মাথা টেনে নিল। রাজচন্দ্রের কানের উপর নিজের ঠোঁট রাখল। এরপর দুজনেই পিয়েত্রোর বাংলোয় ফিরে এল।

"নয়নতারা চোখ মুদল না, দু হাতের বাঁধন একটু আলগা করে দিল, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেরই ঠোঁট দুটিকে রাজুর কপালে ছোঁয়াল।

রাজচন্দ্র বলল, 'ওমা, এ কী'?

নয়নতারা বলল, 'ওভাবে তাকিয়ো না, দেখো না কোথায় খসে পড়েছে। ঠাট্টা করো না'।

রাজচন্দ্র বলল, 'চাইব কেন? অনুভবে ধরা পড়ে'।"[১০]

নয়নতারা রাজচন্দ্রের জীবনে শুধুমাত্র অনুভবেই রয়ে গেল। নয়নতারাকে কাছে পাওয়ার জন্য অনুভব ছিল রাজচন্দ্রের একমাত্র পথ। নয়নতারার মামার বাড়ি কাশী। ফলে যখনই নয়নতারার মন খারাপ হত তখনই নয়নতারা রাজবাড়ির

আশেপাশে না থেকে সোজা কাশী চলে যেত। আবার রাজচন্দ্রের জীবনে নয়নতারাকে যখন সবথেকে বেশি প্রয়োজন হয়েছে তখন রাজচন্দ্র নয়নতারাকে নিজের কাছে খুঁজে পায়নি। ফলে ধীরে ধীরে রাজচন্দ্রও নয়নতারাকে নিজের অনুভবের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবসম্মিলনে রাধা যেমন কল্পনায় কৃষ্ণের উপস্থিতি দেখে আনন্দ লাভ করত, তেমনি ভাবে রাজচন্দ্রও যেন কল্পনায় নয়নতারাকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। হৈমবতীর সঙ্গে রাজচন্দ্রের যে বিবাহের আলোচনা চলছে তা তো সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। নয়নতারার সঙ্গে রাজচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল জন্ম-জন্মান্তরের। মহৎ প্রেম সব সময় কাছে টানবে এমন নয়, কখনো তো দূরেও ঠেলে দেয়। রাজচন্দ্রের জীবন থেকে নয়নতারাকে এক সময় অনেক দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল।

'নয়নতারা' উপন্যাসে দেখা গেছে নয়নতারা জাতিতে কায়েত হওয়ার কারণে রানীমা নয়নতারাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু 'রাজনগর' উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে দূর সম্পর্কের মামাতো বোন হৈমবতী জাতিতে কায়েত হলেও তার সঙ্গে রাজচন্দ্রের বিবাহের আলাপ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু রাজচন্দ্র হৈমবতীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছে।

"রাণী বললেন, 'তোমার বিবাহের ব্যাপারে ইতিমধ্যে আমি কেলেঙ্কারি করেছি'।

'বিবাহ আমি করছি না'।

'এইসব মানুষেরা অপমানিত হয়ে ফিরে যাবে। সেই নির্দোষ কন্যাটির কথাও ভাবো'।

'আমি নিরুপায়। কিছু টাকা দিয়ে দাও'।

রানী গলাটাকে আরো নামালেন –'শোনো রাজু, তোমাদের সম্পত্তির চার আনা অংশ আমার, তা জানো? আমি আজ সেই চার আনা অংশ আমার ভাবী পুত্রবধূর নামে লিখে দিয়েছি'।...

রাজু বলল – ওটাই তো যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়েছে'।

'এটা হাসির কথা নয়, রাজু। মুকুন্দ এখন সাবালক, তাকেও তার ছ আনা দিয়ে দিতে হবে। তোমার তাহলে কী রইল'?

রাজু বলল – আমাকে কি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে হবে বাকি ছ আনাতেও আমার লোভ নেই'।"[১১]

অমিয়ভূষণ মজুমদারের পূর্ববঙ্গের পৈতৃক জমিদারবাড়ির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে 'রাজনগর' উপন্যাসের রাজবাড়ির কিছু মিল রয়েছে। তবুও এই উপন্যাসের কাহিনীকে মরেলগঞ্জের রাজবাড়ি হিসেবেই বিবেচনা করা স্বাভাবিক। একটি জমিদার পরিবার কিভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে শুরু করে তার পরিচয় যেমন 'রাজনগর' উপন্যাসে পাওয়া যায়, তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের পাবনার পৈতৃক জমিদারবাড়ি সম্পর্কে। জমিদারদের শাসন ক্ষমতা যখন ইংরেজদের হাতের মুঠোয় চলে যায় তখন একটি রাজপরিবার কিভাবে গোপনে বোবাকান্না করে তার পরিচয় রয়েছে এই 'রাজনগর' উপন্যাসে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অমিয়ভূষণ মজুমদারও নিজের চোখে দেখেছেন নিজেদের ক্ষয়ে যাওয়া সামন্ত পরিবারকে। ফলে অমিয়ভূষণের বেশ কয়েকটি উপন্যাসেই যেন ঘুরে ফিরে কখনও পাবনা আবার কখনও উত্তরবঙ্গের বিষয় এসেছে। ইংরেজ শাসনের চক্রান্তে পড়ে যেখানে বড় বড় রাজপরিবার নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি সেখানে মানব মানবীর প্রেম কিভাবে পরিণতি লাভ করতে পারে। ফলে রানীমা হয়ত নিজের হারানো প্রেমকে খুঁজে পেতে পিয়েত্রো রূপী পাহাড়ে মহাপ্রস্থান করেছেন এবং পুত্র রাজচন্দ্রও নয়নতারাকে অনুভবে ধরার চেষ্টা করেছে। রানীমা এবং পুত্র রাজচন্দ্র- দুজনেই বাহ্যিক ভাবে প্রেমকে বাঁচাতে না পেরে দুজনেই প্রেমকে খুঁজে পেলেন হৃদয়ের চেতনায়। এই প্রেমে না আছে বিচ্ছেদের ভয়, না আছে বদনামের ভয়, রয়েছে শুধু প্রেমের গৌরভ। এই প্রেমের পথ ব্যর্থতা দিয়ে শুরু হলেও তা এক সময় পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে 'রাজনগর' উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র :

১. 'আমার সম্বন্ধে', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র-৪, পৃষ্ঠা-১৫।

২. স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৫।

৩. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র-২, পৃষ্ঠা-৫৫০।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪২৪।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪২৫।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৫।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৭।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৯।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা – ২৮৮।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৩৪।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৩৯।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।
২. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।
৩. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।
৪. সেনগুপ্ত, নিতীশ, বঙ্গভূমি ও বাঙ্গালির ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।
৫. নাগ, রমাপদ, স্বতন্ত্র নির্মিতি ও অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২০০২।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুস্তক বিপণি, ১৯৩৮।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, সময়ের উপকরণ মেয়েদের স্মৃতিকথা, বিচিত্রা, ২০০৪।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬১।

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ , আড়ষা কলেজ-পুরুলিয়া

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' : মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রাম

শোভা সাঁতরা

সংক্ষিপ্তসার-

সমরেশ বসু যখন আতপুরে থাকতেন তখন তিনি প্রায়ই যেতেন গঙ্গার ধারে মালোপাড়ায়। সেখানে তাঁর যেসব বন্ধু ছিল তাদের বাড়িতে উনি আড্ডা দিতেন,খাওয়া দাওয়া করতেন। ওরা মূলত চটকলে কাজ করলেও বরষা মরশুমে ওরা মাছ ধরত। এইভাবে ওদের সঙ্গে থাকতে-থাকতেই হালিশহরের কয়েকজন মৎস্যজীবী পরিবারের সঙ্গেসমরেশ বসুর পরিচয় হয়। ওদের সঙ্গে লেখার উপকরণ সংগ্রহের অদম্য তাড়নায় ভেসে পড়তেন। ভরা গঙ্গার বুকে ওদের অবিশ্বাস্য জীবন-সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে থাকতেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। মৎস্যজীবীদের জীবন রচনা করতে গিয়ে সমরেশ বসু শুধু যে গঙ্গার বুকে ভেসেছিলেন তাই নয়, ওদের বিচিত্র জীবনপ্রণালী, সংসার ছেড়ে জলের বুকে চারিদিকে অবিরত মৃত্যুর হাতছানি নিয়ে বেঁচে থাকা এবং লড়াকু জীবনের নিরন্তর হাতছানি দিত। এমনই এক উপন্যাস 'গঙ্গা'। জলের তলায় অদৃশ্য শিকার, আর রোদ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে জলের উপর নৌকায় মাছমারা। অনিশ্চিত, দৃষ্টি-বহির্ভূত, অনুভূতি অগম্য শিকারের সন্ধানে নিষ্ঠায় কঠিন, সংকল্পে দুর্জয়, অভুক্ত অসুস্থ শিকারী জলের বুকেই মৃত্যুবরণ করে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে লেখক যে বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন, তা হলো প্রকৃতই মানুষ জীবনকে সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরেছে জেলেরা।

সূচক শব্দ-

গঙ্গা, ইচ্ছামতী, নিরন্তর, অনিশ্চিত, দুর্জয়, মৃত্যুবরণ, সমুদ্দুর, সংগ্রামমুখিতা, রক্তচক্ষু, প্রতিকূল।

মূল আলোচনা-

'গঙ্গা' উপন্যাসের কাহিনি উপাদান সংগ্রহের জন্য লেখক বহুদিন গঙ্গার বুকে ঘুরেছেন মাছমারাদের সঙ্গে।ভূমিকায় নাম উল্লেখ করে তাদের ঋণ স্বীকার করেছেন। লেখক মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত — মাছমারাদের শ্রেণীর বাইরেকার লোক। তার সত্ত্বেও স্বীকার্য 'গঙ্গা' উপন্যাসে লেখক প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন। তার মূলে আছে কেবল মমত্ববোধ নয়, সামগ্রিক জীবনবোধ। এখানেই 'গঙ্গা' কেবল জেলেদের জীবনচিত্র মাত্রা থাকেনি, হয়ে উঠে যে জীবনবোধসমৃদ্ধ উপন্যাস।

এই উপন্যাস পরিচ্ছেদে বিভাজিত নয়, কেননা মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার একটি বিশেষ মরশুমী যাওয়া-আসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গোটা কাহিনি। আর আতপুর-হালিশহরের জেলেপাড়ায় যেসব মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দিনেও রাতে গঙ্গার বুকে ফিরেছেন, তাঁদের কাছে তাঁর ঋণের শেষ নেই লেখকের।

কেষ্টপুরের খাল-ঘাট থেকে জেলেদের যাত্রা শুরু। এ হল কুতঘাট। এখানে কুত হবে, অর্থাৎ নৌকার মাপ হবে। সেই মাপে যা সরকারের মর্জিতসাব্যস্ত হবে, তত পয়সা দিয়ে কাটতে হবে টিকিট। তবে যাত্রা শুরু পূর থেকে, পূর্ব-দক্ষিণ থেকে আসছে দলে দলে মৎস্যজীবীরা। তাদের তাড়িয়ে আনছে দখনে বাওড়। যাকে বলে, সমুদ্রের ঝড়। তেঁতুলিয়া, সারাপুর, পুঁড়া থেকে ইটিণ্ডে, টাকি, শাঁখচূড়া হয়ে সন্দেশখালি, হাসনাবাদ হয়ে তারা দলে দলে আসে। ইচ্ছামতী, রাইমঙ্গল পেরিয়ে গঙ্গার টানা টানাপোড়েনে। তারপর বাগবাজারে। গঙ্গা দিয়ে সোজা মিঠে জলের এলাকায়। বারাকপুর, বরাহনগর, চন্দননগর — জগদ্দল, হুগলী নৈহাটি, বাঁশবেড়ে ত্রিবেণী পেরিয়ে মিঠে জলে। দিনে-রাতে মাছ

ধরবে, কিন্তু সবটাই জলের মর্জি, মাছের মর্জি। মাছ আরো স্বাধীন। ঠাকুরুণ নদীকে ভালো না লাগলে মাতলায় যাবে। ইচ্ছেমতীকে মনে না ধরলে গঙ্গার মোহনায় যাবে ঝাঁক বেঁধে। তাই মাছ মাছমারাদের জীবনও জীবিকা অনিশ্চিত।

নিবারণ মালো একদিন অকূলে ভাসলো ছোটভাই পাঁচুকে নিয়ে, তারপর একদিন নিবারণ নিরুদ্দেশ হল। আজ প্রবীণ পাঁচু তার ভাইপো, নিবারণের ছেলে বিলাসকে নিয়ে মাছ মারতে যায়। সেই সঙ্গে যায় আরো অনেকে। পাঁচু হুঁকো টানছে আর ভাবছে —“পাঁচুর বাপের হল তিন-কম পাঁচ কুড়ি বছর। দশ বছর গঙ্গা দেখেনি। বলে, ‘আমরা সব সময়ে কলকাতা ঘেঁষে যেতুম না। বড় চোর-বাটপাড়ের ভয় ছেল। ত্যাখন মুক্তাপুরের খালে ছেল জল। এত গেট-ফেট ছিল না। খেল্যের গাং দে’ বেরিয়ে, হাড়োয়া খালের ভেতর দে’ বোদাইয়ের পাশে মালতী বিল। মালতী আর বারুতির বিল। তার সঙ্গে মুক্তাপুরের খাল। সেই খাল দে’ ভাটপাড়ার উতেরে বেলে গে’ একেবারে গঙ্গায় পড়তুম। তা'পর রেললাইন হয়ে খাল-মাল সব বুঁজে যেতে লাগল। রাস্তা ও বদলে গেল।”[১]

প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সাহসিক সংগ্রামের কাহিনি ‘গঙ্গা’। উপন্যাসের পাঁচুর মৃত্যু এই সংগ্রামকে দিয়েছে ট্রাজিক মহিমা। প্রকৃতি আর মহাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাঁচুকে শক্তি যুগিয়েছে বিলাস। তার সাহস, ভয়হীনতা, চলাচলের সবাই মুগ্ধ হয়েছে। গহীন জলে অমাবস্যার কোটালে ‘গড়ান’ (জল নামানো) দেয় খুড়ো ভাইপো। তারপরে বাকি সব জেলে। দূর সমুদ্রের টান, অচেনা জলের টান একদিকে, ঘরের টান, বউয়ের টান অপরদিকে। এই টানাপোড়েনের মাঝে দিন-রাত খোলা আকাশের নিচে মানুষ শিকার খুঁজে বেড়ায় — জেলেরা মাছ মারে — আসলে ব্যক্তিমানুষ সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনকে স্বীকার করে ফেরে।

মানুষগুলির জীবনবোধ প্রথম জগতের কিন্তু তাদের বাস-লড়াই দ্বিতীয় জগতের। দ্বিতীয় জগৎ মাঝেমাধ্যেই নির্মম বাস্তব হিসেবে হানা দেয়, “গত মাঘ মাসে নৌকা বাঁধা পড়েছিল মহাজনের কাছে। মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। আষাঢ়ের আজ অর্ধেক পার হয়ে গেল। এতদিন বাদে দেনার উপরে আবার নতুন মুচলেখা দিয়ে, নৌকা ছড়ানো হল।”[২] যাত্রা শুরুর কাহিনি, এই বাস্তব পরের দুমাস-আড়াই মাস ধরে গঙ্গাপুজো পর্যন্ত অর্থাৎ উপন্যাসের প্রত্যক্ষ সময়কাল জুড়ে বারবার এসেছে নানা রূপে, কখনও ঠাকুর কখনও পালের মহাজনী ফাঁদের মধ্যে। উপন্যাসটি গঙ্গায় ভাসার নানা বর্ণনা আবার পাঁচুরস্মৃতির বিস্তার। শুধু মহাজন নয়, ডাকাতরাও আসে—মহাজনদের মতই। এর সঙ্গেই থাকে স্থিতির জন্য আকাঙ্ক্ষা। জলের সঙ্গে, গহীন স্রোতের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে জেলেদের জীবন — “তবু একফোঁটা জমির মধ্যে কোথায় যেন একটি বাধা সুখের ঠিকানা লেখা রয়েছে। মানুষের মন ওই রকম। বাঁধা সুখের সন্ধান করে সে। আবার মনে হয়, চাষের জীবনে বা বাঁধা সুখ কোথায়। লোকগুলি হাঁপিয়ে মরে জলের জন্যে। কখনো জলকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রাণ দেয়। আর নৌকাও নেই, বাঁধাও থাকে না মহাজনের কাছে। কিন্তু গোটা আবাদী জমিখানি থাকে। সে দাদন নেয় নাকড়ে ব্যাপারীর কাছ থেকে। তবে ঋণ করে শোধ দিয়ে আসে সারা বছরের ফসল জলের পোকার ও মাটির স্বাদ পাওয়ার বড় বাসনা।”[৩]

মহাজন, টোটার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। ঠান্ডারামের বীভৎস মৃত্যুর মূলে এই বাস্তব। সে বলেছিল,“আগে জানলে ক্ষেত-মজুরি করতাম।”[৪] ঋণ জর্জরিত ঠান্ডারামকে মহাজন নৌকা রেখে চলে যেতে বলেছে— ঠান্ডারাম পালাতে চায় । কিন্তু তার বদলে জেটিতে নৌকা আটকে তার মৃত্যু হল। শ্রাবণের টোটা খলখল করে বেড়াচ্ছে গঙ্গায়। অনেক মাছমারা পালিয়েছে। আরো পালাচ্ছে প্রায় রোজই। যাদের উপায় নেই তারা রয়েছে। পালমশাই ধরে রাখতে পারছে না। ... এ তলাটের মৎস্য-জীবীদের পাড়ায়, বাচ্চা বুড়োরা বেরিয়ে পড়েছে শহরের রাস্তায়। ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির ফ্যান চেয়ে বেড়াচ্ছে। ঘটিবাটি গেছে বন্ধক।

এই জগৎ থেকেই একটি জীবনদর্শনও তৈরি হয়। জীবন-মৃত্যুকে দেখার গ্রহণ করার এমন এক নিরাসক্ত দৃষ্টি ভঙ্গি দেখা যায়, যা তথাকথিত আধুনিক বুর্জোয়া ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রে বিরল লভ্য। জোয়ার কখনো দুখের, কখনো সুখের। মাছমারার তার মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে গঙ্গার সুখ-দুঃখ। সুখে নয়, দুঃখে জোয়ার হলে, এমনই হয়, বুকখানি ভরে যায়। প্রাণখানি টইটুম্বুর হয়ে ফুলে ফুলে ওঠে। মুখ থেকে কথা সরেনা। "সংসারের নিয়ম এইটি। কুড়োল দিয়ে কোপাও কাউকে! তোমারো কোপ লাগবে কোথাও। কাউকে প্রাণে মারলে, তোমার প্রাণেও লাগবে। সে কি তুমি সবসময় ঠাহর করতে পারবে? তা পারবে না। তুমি মাছ মারো, তোমাকেও সে মারে পলে পলে। সে কি তুমি বুঝতে পার? কিন্তু মারছে দিবানিশি। কখনো একটু একটু করে, নির্ঘাত কখনো।"[৫]

পাঁচুর এই সিদ্ধান্তে ও কর্মের অভিজ্ঞতায় "মাছমারা মালো, সে জানে মাছের দেবতা খোকাঠাকুর। কেমন তোমার মূর্তি, তা জানিনে। নিজের হাতে মাছ মেরে, সেই মাছের গোল অপলক চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তুমি তাকিয়ে আছআমার দিকে। দেবতা,তুমি আমার শিকার। তোমার আমার জীবনের এই বিধান।"[৬] পাঁচু জানে, মাছ-মারা জানে, বিবাগী হলে চলবে না, চৈত্রমাসে সন্ন্যাসের ভিক্ষায় তো মন সিঁটিয়ে যায়—"সংসারে দুঃখের ভাগ বেশী। সুখ কম। দুঃখ আসবে। তাতে দিশেহারা হলে, দুঃখ তোমার বাড়বে বেশী। চেয়ে দেখ, সেইজন্য সংসারে অনাচার বেশী, বেশী মনের পাগলামি। প্রাণে তোমার লাগবে, কিন্তু এই অসময়টা সাবধানে পার হও। এই এক একটা টোটা তোমার এক একটি সংক্রান্তি।"[৭] পাঁচুর এই ভাবনায় যে নিরাসক্ত জীবনভাবনা দেখা যায়, তার মূল এই বাস্তবে, মহাজন-টোটা-দরিদ্রের লড়াই এর জীবনবোধ।

এই উপন্যাসে আধুনিকতার ভাবনায় বিলাসকে দেখা যায়। "অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে শুধু চোখ। অন্ধকার জলের ঝিকিমিকি স্রোতের কোটালের মতো।"[৮] বিলাস হল নিবারণ মালোর ছেলে। "বিলাস নড়লে চভলে মাংসপেশি সারা অঙ্গে কেউটের মতো ওঠে কিলবিলিয়ে।"[৯] বিলাসের শরীরেই আগুনের শিখার মত সাপ খেলা করে অমর্তর বউয়ের বাঘিনীকে বিলাস যৌনতৃষ্ণামত্ত বাঘের মতোই নীরব করে। তাসত্ত্বেও বিলাসকে মন শান্ত হয় না, মনের মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে। একদিন দামিনী নাতনি হিমিকে দেখে—"শহরের ফড়েনীর চোখমুখের ভাবে ও যেন সাপ খেলানোর মন্ত্রের উত্তেজনা।"[১০]

'গঙ্গা' উপন্যাসের মাছ-মারারা যেতে চায় গঙ্গার সীমা পেরিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার মুক্তি। এই সমুদ্রে গিয়েই সাইদার নিবারণ আর ফেরেনি — সমুদ্রে যাওয়ায় তাই নিষেধ। তারই ছেলে বিলাস— সে এই নিষেধ ভেঙে যেতে চায় সমুদ্রে। এর উত্তরাধিকার বিলাসের ওপরই বর্তেছে। বিলাসের শরীর, তার শক্তি, তার জেদ, বিদ্রোহ আগুনের শিখার মত অস্তিত্বে বিলাসের গড়ন নিবারণ মালোকে ছাড়িয়ে গেছে। "বিলাসকে দেখতে দেখতে পাঁচুর সেই রাম মালোর গল্পের বাদার প্রথম পুরুষের কথা মনে পড়ে।"[১১] বিলাস এক বিচিত্র ভয় ও বিস্ময়। বিলাস বাছাড় অর্থাৎ চার-পাঁচ মন তালগাছের গুঁড়ি একদিক দিয়ে তুলে সব চেয়ে বেশি নিয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় সেই জয়ী। অন্যদিকে বাপ সমুদ্রের গর্ভে মারা গেছে; টাকির ঠাকুরের নির্দেশ আর কাউকে সমুদ্রে না যেতে। অথচ বিলাস সমুদ্রে যাবেই — নিজ গণ্ডীতে, গঙ্গায় সে আবদ্ধ থাকবে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মালো জীবনের অর্থনৈতিক বন্ধন, "মর্মে মর্মে জানে পাঁচু, হাড়ে হাড়ে পাক দিয়েছে মহাজনের ঋণ। তার নিজের ঘরের পাটা জালখানি রয়েছে মহাজনের কাছে। নিবারণ সাইদারের জাল। পাটাজাল সমুদ্রে মাছ ধরার জাল। বাঁধা দিয়ে মনে করেছিল, বিলাসের সমুদ্র যাওয়ার পথ মারা গেল কিছু টাকার দায়ও মিটল। কিন্তু সমুদ্রে যাওয়া আটকানো গেল না।"[১২]

জীবনের এই রূঢ় বাস্তবের সঙ্গেও জড়িত। সমুদ্রে যাওয়া মানে এই বাস্তবের বাইরে যাওয়া, মহাজনের কাছ থেকে পাটাজাল বাঁচানো, নিজের অস্তিত্বকে বাঁচানো। পাণসা জাল বিরাট—" সমুদ্রের গন্ধ আছে ওতে, নিবারণমালোর

গায়ের গন্ধ।”[১৩] সমুদ্রে যাওয়া আর নিবারণ মালোকে ফিরে পাওয়া, একই স্বপ্নের অন্তর্গত আবার এর সঙ্গেই যুক্ত বাস্তব জীবনের টোটাকে ছাপিয়ে ওঠা। গত পাঁচ বছর বিলাসকে নিয়ে গঙ্গায় পাড়ি দিয়েছে, ফিরেছে সংসারের কয়েক মাসের খোরাক নিয়ে মাত্র। কখনো তারা মাছ মারে, কখনো-বা মার খায়। বিশ গণ্ডা নৌকা মাছের চককেধাওয়া করে চলে যায় মোহনায়। “তুমি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই ঝাঁকে, তারই চলাচলের পথে, গহীন আশ্রয়ে ওঁত পেতে থাকে তোমার মরণ। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার, সে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। লীলা শেষ হলেই সে আসবে অন্য মূর্তি ধরে। সে যে শুধু সমুদ্রে, তা নয়। খাল বিলে এমন কি গঙ্গায়ও আসে সে নানান বেশ ধরে।... জলে ডাঙ্গায় সমান নজরে হুঁশিয়ারি থাকতে বলেছে তোমাকে, ভাগ্য নিয়ে খেলা। একটু ভুল করলে আর ফিরতে পারবেনা প্রাণ নিয়ে।”[১৪]

উপন্যাসের শেষভাগে এই তীব্রতা শিথিল হয়েছে, নতুন চরিত্র — রঙ্গিনি হিমির আগমনে। অমর্ত বউয়ের ছলাকলার জবাব দেয় বিলাস গোয়ালের অন্ধকারে খড়ের গাদায় —এই যৌন অভিজ্ঞতা তাকে তাড়িত করে, গ্লানিযুক্ত করে, নিজেকে দোষী মনে হয় তার। কিন্তু শহরের হিমির আকর্ষণ অজানা জগতের। এই হিমির কাছে অমর্ত বউয়ের সেই পাপের কথা বলে সে, এ পাপ স্বীকার না করলে তো সমুদ্রের আকুল পাওয়া যায় না। “আমার ভেতরের শয়তানটাকে সে উসকে দিয়েছেল। বুকে আমার আগুন জ্বালিয়ে ছিল খা খা করে। তোমাকে যেদিন দেখলুম, আমার মন শান্ত হল। তুমি আমার পাপ ধুয়ে দেও।”[১৫] জন্মের ঠিক-ঠিকানা নেই যার, সেই রঙ্গীনী হিমি দুহাত দিয়ে বিলাসের কালো কুচকুচে স্পেশল হাত জড়িয়ে ধরল। “আগনা ছুঁল ডাঙ্গা, ছেউটি গাঙের জল ভাসলে কুল। পাঁচু বলে, বিলাস পাপ করেছে, তার পাপে ডেকে এনেছে এই শাঙনে টোটা। তিরস্কৃত বিলাস জ্বলে ওঠে, বলে —এবার যাব সমুদ্দুরে।”[১৬] পাঁচু দেখে, মরণ ঘুরছে চারদিকে। রক্তচক্ষু মীনকে মরণ কালে দেখে পাঁচু চোখ বোঁজে। আর হিমির বুকে হাত রাখে বিলাস, বিলাসের বুকে হিমি। তবু হিমি বিলাসকে ধরে রাখতে পারে না। “আমি যেতে পারব না তোমার সঙ্গে। সাহস পাইনে ঢপ। আমি এতটুকু পাণী, তোমার অকূলে বেড় পাব না।”[১৭] এই কথা বলে হিমি বিলাসকে ছেড়ে যায়। বিলাস অকূলে ভাসে। আঠারো গন্ডার নৌকা বিলাসকে নেতৃত্বে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে, পালে হাওয়া লাগে, নৌকা চলে অকূলের পানে। হিমির ভালোবাসায়, সন্দেহ নেই, মধ্যবিত্ত রোমান্টিক নায়িকার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত লেখক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠারপ্রয়াস করেছেন, বিলাস আবার সমুদ্রযাত্রায় অকুলে ভেসেছে।

SAMSAPTAK ESTD 2015 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

জীবনের চলিষ্ণুতা, সংগ্রামমুখীতা, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পাঞ্জাকষার এক বলিষ্ঠ ছবি ‘গঙ্গা’ উপন্যাস। উপন্যাসের পটকে লেখক দেখিয়েছেন ঘনিষ্টভাবে, এঁকেছেন ত্রুটিহীন করে। পটলগ্ন ব্যক্তির জীবনের ছন্দকে চলমান স্রোতের ছন্দে পুরোপুরি মেলাতে পারেননি। তবু সমুদ্রে আহ্বান অহরহ মাছমারাদের বুকে বাজে, এই শিল্পসত্যের স্বীকৃতি এখানে পাই। অনির্দেশ্য জীবনকে নদীর চলমানতায় শিকার করে ফেরে মাছমারা আর মাছ হয়ে যায় মৃত্যুর শিকার। তবু এই খরস্রোতার সঙ্গে মৃত্যুচেতনার মিলন, আর মৃত্যুরস্রোতের মানুষের অকূলে ঝাঁপ ‘গঙ্গা’ উপন্যাসকে দিয়েছে এক বিরল সাফল্য।

উল্লেখপঞ্জি:

১.বসু, সমরেশ, (২০১৭), *সমরেশ বসু রচনাবলী, দ্বিতীয়খণ্ড* , গঙ্গা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ.১৯৬

২. তদেব, পৃ. ১৯৯

৩. তদেব, পৃ. ২০৩

৪. তদেব, পৃ.২১২

৫. তদেব, পৃ. ২৪৯

৬. তদেব, পৃ.২৬৬

৭. তদেব, পৃ. ২৩৭

৮. তদেব, পৃ. ২৮০

৯. তদেব, পৃ. ২৩৩

১০. তদেব, পৃ. ২৫২

১১. তদেব, পৃ.২৬৮

১২. তদেব, পৃ. ৩০১

১৩. তদেব, পৃ. ২৮৩

১৪. তদেব, পৃ. ২৫৫

১৫. তদেব, পৃ.৩১৫

১৬. তদেব, পৃ. ৩২২

১৭. তদেব, পৃ. ৩২৪

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চৌধুরী,সত্যজিৎ, সেনগুপ্ত,নিখিলেশ্বর ও সরকার, বিজলি (সম্পাদনা), *সমরেশবসু : স্মরণ- সমীক্ষণ,* চয়নিকা, ৪৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

২.বন্দ্যোপাধ্যায়,পার্থপ্রতিম,*সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৯।

....

গবেষক, বাংলাবিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

কালবেলা : বিপ্লবে প্রেম ও প্রেমের বিপ্লব

দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায়

সারসংক্ষেপ-

‘কালবেলা’ কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের একটি উপন্যাস যা ১৯৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এই উপন্যাস লেখককে এনে দেয় আকাদেমি পুরস্কার লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকেই ‘ কালবেলা’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে । ‘কালবেলা’ উপন্যাসে আছে যুবক অনিমেষের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকাহিনি । এই উপন্যাসটি একটি গল্পত্রয়ীর অংশ; এ ত্রয়ীর অন্য দুটি উপন্যাসের নাম উত্তরাধিকার এবং কালপুরুষ। গল্পত্রয়ীর কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো যুবক অনিমেষ যে কিনা ১৯৭০-এ প্রথম দিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে । এবং নির্যাতিত হয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। অমানুষিক নির্যাতন তাকে শারীরিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। অনিমেষের জীবনের চড়াই-উৎরাই, উত্থান-পতনের কাহিনী শুধু নয় , তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক এবং সামাজিক চিত্রের একটি নিখুঁত চিত্র এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এককথায় ‘কালবেলা’ একটা বিশেষ সময়ের দলিল। উপন্যাসটি ১৯৮৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে । গৌতম ঘোষের পরিচালনায় ‘কালবেলা’ চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়।

মূলশব্দ-

কালবেলা , উপন্যাস , সমরেশ মজুমদার, রাজনীতি , দাঙ্গা , নকশাল আন্দোলন

মূল প্রবন্ধ -

II ১ II

" যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ"

সমরেশ মজুমদারের প্রথম উপন্যাস " দৌড়"। " দৌড়" উপন্যাসের বিষয়বস্তু লেখকের ব্যক্তিগত জীবন থেকে উঠে আসা নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসটি জনপ্রিয় হলেও, কোথাও যেন এক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। আর সেইজন্যই অভিজ্ঞ সম্পাদক " সাগরময় ঘোষ সমরেশকে পরামর্শ দিলেন, নিজের অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধকে অবলম্বন করে উপন্যাস লিখতে।"[১] আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা প্রথমে পেলাম "উত্তরাধিকার " আর তারপরে পেলাম "কালবেলা "। কাহিনির নায়ক অনিমেষের ছোটবেলা, তার স্কুলজীবন, তার বেড়ে ওঠা এসব কাহিনি আছে "উত্তরাধিকার "- এ। আর "কালবেলা"-তে আছে যুবক অনিমেষের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, রাজনৈতিক জীবন আর প্রেম।

সে সময়ের সাড়া জাগানো উপন্যাসটি আজও বহু পাঠকের কাছে তুমুল জনপ্রিয়। তবে সমরেশ মজুমদার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "না, 'কালবেলা' আমার প্রিয় নয় । "[২] এহো বাহ্য, "কালবেলা" কোন ধরণের উপন্যাস, এ- প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। উপন্যাসের ভূমিকাতে লেখক এ- প্রসঙ্গে তাঁর মতটি ব্যক্ত করেছেন। সেখানে তিনি বলছেন, " 'কালবেলা' কি রাজনৈতিক উপন্যাস ? আমি জানি না।... কিন্তু 'কালবেলা' ভালবাসার উপন্যাস। দেশ,

মানুষ এবং নিজেকে।"[৩] আসলে আমাদেরও মনে হয়, দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার ভাবনা ও ব্যক্তি প্রেম কোথাও যেন এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

II ২ II

" বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস"

কলকাতায় পড়তে এসে অনিমেষ বিভিন্ন ধরণের মানুষের সঙ্গ লাভ করে।যা মানুষের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে তাকে। আর সেটা বুঝতে গিয়েই দেখেছে, কোনো মানুষ সম্বন্ধে একরৈখিক ধারণা ঠিক নয়। একটা মানুষের ভেতরেই থাকে আরেক মানুষ। তাইতো যে ত্রিদিবরা তাকে জোর করে মদ খাওয়ায়, অসুস্থ অবস্থায় তারাই আবার সারারাত জেগে থাকে তার মাথার পাশে। যে থম্পোটর বন্ধুর সঙ্গে আগের রাতে তার হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল, সেই- ই আবার পরের দিন অসুস্থ অনিমেষকে নিজের ট্যাক্সিতে তুলে নেয়। শুধু তাইই নয়, কলকাতাতে এসে এসেই আর একটি অনভিপ্রেত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল অনিমেষের জীবন। কলকাতায় সেদিন কার্ফু, ট্রাম জ্বলছে। সেই অবস্থায় পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয় অনিমেষ। এরপর হাসপাতাল, আর পুলিশের নানা জেরার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। কিন্তু তার বাবার বন্ধুর তৎপরতায় সে যাত্রায় রক্ষা পায় অনিমেষ। আর সে সূত্রেই আলাপ হয় নীলার সঙ্গে। যে নীলা উদ্ধত, কিছুটা অহংকারী, প্রগলভ, ডেসপারেট। তাইতো সেই মেয়ে বলতে পারে :---- " আমার নাম শুনলেন তো? ' নীলা'। জানেন তো, ওটা কারো সহ্য হয় না। "সেই মেয়েকেই আবার অনিমেষ দেখে, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে চূড়ান্ত অর্থাভাবের মধ্যে দিন কাটাতে। আবার অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সঙ্গে আলাপ হয় পরমহংসের। যে কীনা চূড়ান্ত রসিক, সদা হাস্যময় এবং পরোপকারী।

এসবের মাঝেই অনিমেষ ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে রাজনীতির সঙ্গে। বাবা মহীতোষ এবং দাদু সরিৎশেখর তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন । বারবার সাবধান করেছিলেন, রাজনীতি সম্বন্ধে। কিন্তু শেষমেশ অনিমেষের জীবন এগোলো সেই রাস্তাতেই। আর অন্তরের আলোকবর্তিকা মাধবীলতার নীরব সমর্থন যেন তাতে গতি প্রদান করল। যে সুবাস দা তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই সুবাসদার প্রতি আস্থা একটু বেশিই ছিল অনিমেষের। তার সূত্রেই সে পরিচিত হয় ছাত্র ফেডারেশনের আরো দুই নেতা বিমান এবং সুদীপের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হয় তারা। বোমাবাজি থেকে স্লোগান কিছুই বাদ যায় না। অনিমেষকে একবার পুলিশ থানাতে ধরে নিয়ে যায় পর্যন্ত। কিন্তু কোথাও যেন এসব করে অনিমেষ শান্তি পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, কোথাও যেন ফাঁকি পড়ে যাচ্ছে। এমনি করে দেশের সাধারণ মানুষের কী পরিবর্তন আসবে! আসলে শুধু সুদীপ বা বিমান নয় , আরো অনেক কমিউনিস্ট নেতার মধ্যেই নিজের আখের গোছানোর ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছিল অনেকে । যে কাকা দীর্ঘদিন বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না, অনিমেষ শুনেছে যে কাকা কমিউনিস্ট ছিল এখন নাকি রাশিয়াতে থাকে; সেই কাকার সঙ্গে তার কথোপকথন ধান্দাবাজ রাজনীতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ:---' রাজনীতিতে সাফল্য পাওয়ার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি হল চোখ খোলা আর মুখ বন্ধ রাখা। এটার সঙ্গে যে মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারে তাকে কেউ ঠকাতে পারে না।' ছোটকাকা হাসলেন।অনিমেষ জিজ্ঞেস খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, ' আর হৃদয়? ' 'ওটার ব্যবহার নির্বোধরাই করে। ইমোশনাল ফুলদের জায়গা রাজনীতিতে নেই।'.... খুব স্বাভাবিকভাবেই অনিমেষের এসব কথা ভালো লাগেনি। আসলে, " ভারতবর্ষের তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অতীতের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে ঔপনিবেশিক সংসদীয় কাঠামোয় নিজেদের মানানসই করে নিয়ে দু-একটি রাজ্য সরকার পরিচালনায় মনোনিবেশ করেছিল। এর প্রতিক্রিয়া - তরুণ কমিউনিস্টদের মধ্যে ভারতবর্ষের সাম্যবাদী আন্দোলনের অতীত বিপ্লবী পর্বের (তেভাগা সংগ্রাম ও তেলেঙ্গানার সশস্ত্র আন্দোলন) উৎস থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন ভাবে বিপ্লব পরিচালনা করার সংকল্প।

" [৪] সেই সংকল্পের শরিক হতে চাইল অনিমেষদের মতো কিছু ইমোশনাল ফুল আর রোমান্টিক তাজা রক্তের তরুণ তুর্কি। অনিমেষদের মতো আরো অনেকের ভাবনা যে ভুল নয়, সে খবর অনিমেষ পেল সুবাসদার কাছে। সুবাসদা বলেছেন:---" হ্যাঁ, আমরা অন্যরকম চিন্তাভাবনা করেছি, কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চীনের পথেই সম্ভব। আমরা সেটা অর্জন করতে চাই। ...আমরা মনে করি বন্দুকের নলই হল মানুষের প্রকৃত শক্তির উৎস। অনিমেষ, আমরা একটা আগুন জ্বালতে চাই। " এরই পাশাপাশি উঠে এল গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার তত্ত্ব। উঠে নানা নতুন নতুন স্লোগান। ' ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় ', ' পার্লামেন্ট একটি শুয়োরের খোঁয়ার ' ইত্যাদি। কমিউনিস্ট পার্টির আবার ভাঙন শুরু হলো। নতুন সংগঠন নতুন ভাবে কাজ শুরু করল। এরই ফলশ্রুতিতে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটল ১৯৬৭ সালের মার্চ - এপ্রিল মাসে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়িতে।আর সেই থেকেই এই আন্দোলনটির নাম হয়ে গেল নকশাল আন্দোলন। অনিমেষ যেহেতু উত্তরবঙ্গের ছেলে, তাই তার দায়িত্ব পড়ল সেই অঞ্চলেই। তার বেড় ওঠা সেই স্বর্গছেঁড়া চা- বাগান। চারিদিকে জঙ্গল, নদী আর কষ্টে থাকা আদিবাসী মানুষজন। খুব দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল। কাছেই তার বাড়ি, সেখানে একটু যাবার ফুরসৎ অব্দি নেই। সেখানে জুলিয়েন, সিরিল এদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক চলতে লাগল। কিন্তু একটা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অর্থ প্রয়োজন, প্রয়োজন অস্ত্রের। আবার সাধারণ গরীব মানুষের আস্থা অর্জন করতে গেলে সুদখোর - মহাজন তাকেও জব্দ করতে হবে। তাই শেষ পর্যন্ত সেই অঞ্চলের নামকরা মহাজন পানিরামকে খুন করে সবকিছু লুঠ করল তারা। কিন্তু আন্দোলনের ঝাঁঝ যত বাড়ছিল, উল্টোদিক থেকে বিপদও তত বাড়ছিল। তাদের - ই দলের সংশোধনবাদীরা, কংগ্রেসিরা যেমন তাদের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তেমনি চুপ করে বসেছিল না পুলিশ ও মিলিটারি। তাই শেষমেষ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর মহাদেববাবুকে নিয়ে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অনিমেষ। সবথেকে অবাক হওয়ার মত ব্যাপার এখানেই, যাদের জন্য তারা এই লড়াই করছিল; সেইসব দেহাতি মানুষরাই পুলিশকে ধরতে সাহায্য করে। দেহাতি লোকগুলো ঢিল ছোঁড়ে, চিৎকার করে বলে, " ভাগতা হ্যায়, ডাকু ভাগতা হ্যায়"। আসলে একদিকে খতমের লাইন আর অন্যদিকে বেনোজলের অবাধ প্রবেশ; কোথাও যেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল নকশাল আন্দোলনকে। পুলিশের নৃশংস অত্যাচারে পঙ্গু অনিমেষ জেলে বসেই খবর পেয়েছে এই আন্দোলন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অনিমেষের তখন মনে হয়েছে:----" বিরাট ভুল হয়ে গেছে। নিজেদের প্রস্তুত না করে, দেশের মানুষকে সঙ্গী না করে শুধুমাত্র বুকভরা উত্তেজনা এবং বিদেশী শ্লোগানকে পাথেয় করে তারা সত্যিই হঠকারিতা করে ফেলেছে। "এ- প্রসঙ্গে বিরূদ্ধবাদীদের মতটাও জেনে নেওয়া দরকার। সেই সময়ের নকশাল আন্দোলনকারীদের চোখে নৃশংস ও কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রুণু গুহ নিয়োগী লিখছেন:--" আমরা দেখেছি, যারা যারা দীর্ঘ আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে হঠাৎ হওয়া নকশালদের তফাৎ ছিল বিরাট। যারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নকশাল হয়েছিল তাদের চরিত্রের মধ্যে একটা আদর্শবোধ, নীতি ছিল কিন্তু হঠাৎ হওয়া নকশালদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। এরা ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খল, চিন্তাশূন্য, একবগ্গা, চারুবাবুর 'খতমের লাইনের ' দাওয়াই খাওয়া অন্ধ সন্ত্রাসবাদী। বহুক্ষেত্রে চরিত্রহীনও। নকশাল আন্দোলন যে অকালে শেষ হয়েছিল, তার প্রধান কারণ কিন্তু এইসব হঠাৎ হওয়া নকশালরা।"[৫] কিন্তু এসব নানা কারণ সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক হয়ে যাবার চেষ্টাটা যে ছিল না তা কিন্তু নয়। চেষ্টাটা হয়তো সার্বিক ছিল না। তাইতো "কালবেলা" উপন্যাসে যে ছবি আমরা পাই না, সেই বিরল ছবিই ফুটে ওঠে বীরভূম-সাওতাল পরগনা পটভূমিতে লেখা "অগ্রবাহিনী" উপন্যাসে। সেখানে কলকাতা থেকে আসা যুবক কিশোর আর বাঘাকে খেতে দিচ্ছে আদিবাসী পাড়া তিলাবুনির বাঘার মা:----" তর সইছিল না বাঘার। উঠোনে পা দিয়ে মাকে বলল, ভাত দে। বাঘার পাশে মাটির উপর বসেছিল কিশোর।তার দিকে তাকিয়ে মা হাসল। গরম ভাতের হাঁড়ি দু'হাতে বেশ জোরে কয়েকবার নেড়ে হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুজনকে ভাত তুলে দিল মা। পাতে তেঁতুলের কাই, নুন। উনুনের আবছা আলোয় কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে কষ্টে ডান হাতের পাতায় ফুঁ দিচ্ছিল মা। প্রথমে কিশোর দেখেনি।

আড়চোখে একপলক নজর করে দেখল গরম ভাতের তাপে মায়ের হাতের তিনটে আঙুলের দগদগে ঘা লাল হয়ে উঠেছে। নিমেষে কিশোর বুঝল, এ কুষ্ঠ। কুষ্ঠরোগে মা ভুগছে। আড়ষ্ট , হিম হয়ে গিয়েছিল কিশোরের শরীর। "[৬] এইসব সাধনা, আত্মত্যাগ, আর সর্বোপরি ভুলগুলো, সব কি বিফলে যাবে? তাইতো উপন্যাসের শেষে এসে অনিমেষের মনে হয়েছে;----" আমাদের আগে কেউ করেনি বলে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পরে যারা এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করবে তারা আমাদের ভুলগুলো থেকে অভিজ্ঞতা পাবে। ফলে তারা সফল হবেই।"

II ৩ II

" বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা"

বাংলা সাহিত্যে যত নারী চরিত্র আছে তার মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল চরিত্রটির নাম মাধবীলতা। তার ভালবাসা অনেকটা যেন " রক্তকরবী"- নাটকের কিশোরের মত। নন্দিনীকে ফুল দিয়েই তার আনন্দ। মাধবীলতারও যেন অনিমেষকে ভালবেসেই আনন্দ। চাওয়া - পাওয়ার কোনো সম্ভাবনার মলিন স্রোতে , ভালবাসার সেই নৌকো ভাসে না। অনিমেষ ও মাধবীলতার প্রথম দিনের কথোপকথনের ইঙ্গিতটুকু অনুধাবন করলেই এর উত্তর আমরা পেয়ে যেতে পারি:---' এতক্ষণ যার সঙ্গে এলেন, কথা বললেন, বাড়ি যেতে চাইলেন, একবারও তার নাম জানতে ইচ্ছে করল না? আমি মেয়ে এটাই কি আপনার কাছে সব?'অনিমেষ সোজা মুখের দিকে তাকাল। ট্রেনটা এবার ছাড়ছিল। মেয়েটি হাসল, ' নিজে কখনো ছোট হই নি, আজ হচ্ছি। আমার নাম মাধবীলতা মুখার্জী।'' মাধবী?'' উঁহু, ফুল নয়, আমি শুধুই লতা, মাধবীলতা।' ঠিকই তো। লতার মতই আজীবন সে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে অনিমেষকে। অনিমেষ রাজনীতির বিরাট ঘূর্ণাবর্তে গা ভাসাচ্ছে জেনেও, সেই অনিশ্চিত আকাশে বৃষ্টিভরা মেঘ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাধবীলতা। অনিমেষ ছায়া চাইলে ছায়া দেয় আর কুঁড়েমি করলে পুড়িয়ে মারে। অনিমেষকে ভালবেসে একা মেয়ে হয়ে বাড়ি ছেড়েছে সে। সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য চাকরি নিতে হয়েছে তাকে। অনিমেষ বারবার সাবধান করেছে তাকে। কেননা অনিমেষ যে পথে চলেছে সেই পথের ভবিষ্যৎ সবার অজানা। কিন্তু মাধবীলতা অবিচল। সে বরং অনিমেষকে অনুরোধ করেছে, যেন তাকে ভয় না পাইয়ে দেয়। আসলে ফিরবার পথও নেই। কেননা মাধবীলতা অন্য গোত্রের মেয়ে, তার ভাবনা:---" যে সব মেয়ে মনে করে মনের কোন সতীত্ব নেই আমি সেই দলের নই। শরীরের চেয়ে মন আমার কাছে কম মূল্যবান নয়।" আর তাইতো মাধবীলতার প্রেম বাউলের একতারা হয়ে বেজে ওঠে রাঙামাটির বোলপুরে। ভুবনডাঙার রাতজাগা তারাদের সাক্ষী রেখে প্রথমবারের মত ঘনিষ্ঠ হয় দুজনে। এরপর মাধবীলতার সঙ্গে অনিমেষের সাক্ষাৎ হয় পুলিশের চক্রব্যূহে। যেখানে অনিমেষের উপর অত্যাচারের পাশাপাশি মাধবীলতাকেও হতে হয় নৃশংস পুলিশি নির্যাতনের শিকার। মাধবীলতাকে চড় মারা, বস্ত্র খুলে নেওয়া, পেটে সিগারেটের ছেঁকা দেওয়া - এসবই অনিমেষকে নিরুপায় হয়ে সহ্য করতে হয়। আর তখনই অনিমেষ জানতে পারে, মাধবীলতা গর্ভবতী। কিন্তু সেই অমানবিক অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়েও মাধবীলতা অনিমেষকে বলেছে, সে যেন না বলে মহাদেববাবু কোথায় লুকিয়ে আছেন। শুধু ভালবাসা নয়, অনিমেষের মত ও পথের প্রতি এই আন্তরিক শ্রদ্ধা মাধবীলতাকে আরো মহান করে তোলে। পুলিশি অত্যাচারে পঙ্গু অনিমেষ, মাধবীলতার কাছে বোঝা হতে চায়নি। কিন্তু মাধবীলতা, অনিমেষকে সমাদরে ঘরে নিয়ে আসে। সেখানে এসে অনিমেষ বুঝতে পারে , কতরকমের সংগ্রাম করতে হয়েছে মাধবীলতাকে। একদিকে সামাজিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও সন্তান আর অন্যদিকে অর্থাভাব। বস্তির কৌতূহলী চোখ আর অসামাজিক নোংরা পরিবেশে কেমন করে তাকে নিজের ছেলেকে নিয়ে সংসার করতে হয়। আসলে রোমান্টিক না হলে তো বিপ্লবী হওয়া যায় না। আর তাইতো বিপ্লবেরও আরেক নাম হয়ে ওঠে মাধবীলতা।

II ৪ II

" চুপ করো , শব্দহীন হও "

প্রকৃতপক্ষে বাইরেটা চুপ হলেই অন্তর কথা বলতে শুরু করে। ভাবনার স্রোত আছড়ে পড়ে জীবন দর্শনের গূঢ় রহস্যের ছায়াঘন রহস্যময়তায়। উপন্যাসের অন্যতম অন্তর প্রবৃত্তিও এটি। ড. দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর "সাহিত্য - প্রবেশিকা" গ্রন্থে লিখছেন , " লেখকের জীবন সমীক্ষা, জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি যখন বাস্তব অথবা বাস্তবানুসারী কাল্পনিক কাহিনী আশ্রয়ে বিবৃতিমূলক গদ্যশিল্পকর্মে রূপায়িত হয় তখনই তাহা উপন্যাসের গৌরব লাভ করে।" [৭] সমরেশ মজুমদারের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য - ই হল ; সাধারণ কথা বলতে বলতে গূঢ় জীবন দর্শনের আলোয় ঢুকে পড়া। অতি তুচ্ছ ভাবনাকেও দর্শনের চুনী-পান্নার আলোয় আলোকিত করে তোলা :---" আমরা কাউকে মনে রেখে দিই চিরকাল, যার হয়তো আমাদের মনে রাখার কোন কথাই নেই।" আমাদের সবসময় চোখে দেখা এক দৃশ্য কেমন করে এক অসাধারণ দার্শনিক উপলব্ধিতে পৌঁছে যায় তার একটি উদাহরণ অনিমেষের এই ভাবনা:---" অন্যমনস্ক হয়ে হাতের আংটিটা ঘোরাচ্ছিল অনিমেষ। ঘোরাতে ঘোরাতে সচেতন হতেই সেটায় নজর গেল। আঙুলের যে অংশটায় ওটা চেপে আছে সেটা সাদা হয়ে গেছে কখন। ঘাসের ওপর কিছু চাপা থাকলে রঙ কিছুদিন পর যেরকম হয়। চট করে দেখলে জায়গাটা নিজের বলে মনে হয় না। দীর্ঘকাল কোন কিছু আবদ্ধ থাকলে এমনি করে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে? হাতের অন্য অংশের চেয়ে এই জায়গাটা বেশ ফরসা ফরসা লাগছে, কিন্তু যে দৃষ্টিকটু তা মানতেই হয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে বোধহয় এইরকম বোধ কাজ করে।যা সহজ তা সব সময়েই শ্রেয়, যা চেপে বসে তার তার ফলশ্রুতি যতই মনোরম হোক তাকে মেনে নেওয়া যায় না।" এই উদ্ধৃতির পর আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। আসলে সহজ-সরল ভাষা আর ছোট ছোট বাক্যের এক মোহময় গদ্য পাঠককে চুম্বকের মত টেনে রাখে অবিরত। তবে এসব সত্ত্বেও "কালবেলা" কিন্তু একটা বিশেষ সময়ের দলিল। উপন্যাসে কল্পনা থাকবেই, থাকাটা স্বাভাবিক। তবুও সত্তরের সেই উত্তাল সময়ের একটা ছবি পাঠকের মনে গাঁথা হয়ে থাকে। একটি সাক্ষাৎকারে সমরেশ মজুমদার বলছেন , " আসলে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের জন্য লিখিনি - যা দেখেছি, যে খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি তার পরিপ্রেক্ষিতেই লিখেছি। আর কোন ভুল তথ্য নিশ্চয়ই দিইনি, দিলে এক লাখ কপি যে বইয়ের বিক্রি হয়েছে - কারও না কারও কাছ থেকে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ আসত।" [৮] বস্তুত সবমিলিয়ে সমরেশ মজুমদারের "কালবেলা" বাংলা সাহিত্যের এক চিরকালীন সম্পদ। মুষ্টিমেয় কয়েকটি নারী চরিত্রের মধ্যে যেমন মাধবীলতা ভাস্বর হয়ে থাকবে; তেমনি সেরা কয়েকটি উপন্যাসের তালিকায় "কালবেলা" র নামটি উজ্জ্বল থাকবে।

তথ্যসূত্র---

১/ জীবনানন্দ গোস্বামী, 'সমরেশ মজুমদার ও বাংলা সাহিত্য' , সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সম্পাদক:-সঞ্জীবকুমার বসু, বৈশাখ - আষাঢ় ও শ্রাবণ -আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যা, ১৪০৫, কলকাতা, পৃ: ২২৫।

২/ সমরেশ মজুমদারের সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাপসকুমার দত্ত, সাপ্তাহিক মৃদুভাষণের নির্বাহী সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকারের মাধ্যমে ২০০৪ সালে নেওয়া, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত ।

৩/ সমরেশ মজুমদার, কালবেলা উপন্যাসের ভূমিকা, পঞ্চদশ মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৪/ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ' নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক ', সত্তর দশক (খণ্ড এক) , সম্পাদনা:- অনিল আচার্য, জুন ২০১৪, অনুষ্টুপ , কলকাতা, পৃ: ৩৪-৩৫ ।

৫/ রুণু গুহ নিয়োগী, সাদা আমি কালো আমি (প্রথম খণ্ড) ১৩৬৬, জিনিয়া পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ: ১১৯।

৬/ শৈবাল মিত্র, অগ্রবাহিনী , মে ১৯৭৫, আদিত্য প্রকাশালয়, কলকাতা, পৃ: ১২১-১২২।

৭/ ড. দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রবেশিকা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, এন. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা, পৃ: ৬ ।

৮/ সমরেশ মজুমদারের সাক্ষাৎকার , সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:-জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, নভেম্বর ২০২৩, বার্ণিক প্রকাশন, বর্ধমান, পৃ: ৬১।

আকর গ্রন্থ :----

* সমরেশ মজুমদার , কালবেলা, পঞ্চদশ মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

....

সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ , রাজনগর মহাবিদ্যালয়

'নহন্যতে' উপন্যাস অবলম্বনে মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

দেবলীনা বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ অনেকটা সূর্যের মতো, সূর্যের আলো যখন যার উপরে পড়েছে সেই আলোকিত হয়ে উঠেছে। এই আলো বাইরে থেকে নয় অন্তরের আত্মাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ এসেছেন, সেই সকল মানুষেরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, সমৃদ্ধ হয়েছেন। এমনই একজন মানুষ হলেন মৈত্রেয়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে অনেকটা ছোট হয়েও ওনার জীবনে রবীন্দ্রনাথের এক অমোঘ প্রভাব লক্ষ করা যায়। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর নিজের জীবন নিয়ে লিখেছিলেন 'নহন্যতে' উপন্যাস। এই কালজয়ী উপন্যাস একদিকে যেমন মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে তাঁর প্রেমিক মির্চা ইউক্লিডের কথা বলে, তেমনি ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭২ এই দীর্ঘ সময়ের কথা বলে। কিন্তু 'নহন্যতে' উপন্যাসে মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এবং মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এক কথায় অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ নিয়তির মতো, নাবিকের মতো ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মৈত্রেয়ী দেবীকে পথ দেখিয়েছেন। 'নহন্যতে' পড়তে গিয়ে বারবার রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আসলে মনে হয়েছে মৈত্রেয়ী দেবী যেন বলতে চেয়েছেন—

"তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা"

'নহন্যতে' উপন্যাসের শুরু ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে। তারপর কখন যেন স্মৃতির উল্টোস্রোতে সাঁতার কেটে আমরা পৌঁছে যাই ১৯৩০ সালে, যে সময় ইংরেজ অধ্যুষিত ভারত, অবিভক্ত ভারত, যখন নেতাজী সুভাষ বোস, পণ্ডিত উদয়শঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বহু প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব সশরীরে বর্তমান। কলকাতার এক অধ্যাপকের কন্যা মৈত্রেয়ী দেবী ছোটবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও এর পেছনে ওনার পিতার সতর্ক শিক্ষাদান সক্রিয় ছিল। খুব কম বয়সেই মৈত্রেয়ী দেবী বিদুষী হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃত শিক্ষা, বেদ, উপনিষদ, গীতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, দার্শনিক তত্ত্ব সবটাই পিতার কাছ থেকে শেখা। কিন্তু নীরস পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেই ষোড়শী মৈত্রেয়ী দেবীর একটি সৃজনশীল নরম মন ছিল। যেই মন দিয়ে সে কাব্য রচনা করত, গান গাইত, আবৃত্তি করত। এই মনের জগতে সে পাখা মেলে উড়ত। মলয় বাতাসে ভর করে পাড়ি দিত অজানা জগতে। খুব কম বয়সেই মহিলা কবি হিসেবে কলকাতার সাহিত্য মহলে মৈত্রেয়ী দেবীর অবাধ যাতায়াত ছিল। মৈত্রেয়ী দেবীর বাহ্যিক পড়াশোনার প্রতি সতর্ক নজর রাখতেন ওনার অধ্যাপক পিতা কিন্তু মনোজগতের ওপর একমাত্র একজনের প্রভাব ছিল, তিনি ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীর "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর প্রেমিক মির্চাকেও বলেছেন "হ্যাঁ তাই, হ্যাঁ তাই, ঐ একজন লোকই আমাদের আকাশ জুড়ে আছে। আমাদের মুখে কথা দিচ্ছেন, আমাদের মনে ভালোবাসা দিচ্ছেন, সে বসে আছে বলে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।"[১] সত্যি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনে যে নীরবে নিঃশব্দে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে তাকে সিঞ্চিত করে রেখেছে।

'নহন্যতে' উপন্যাসটি মূলত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যার মূল সুর হল অবিনশ্বর প্রেম। আবার এই উপন্যাসকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের শ্রেণিতেও রাখা যেতে পারে কারণ নিমেষের মধ্যে লেখিকা অতীত থেকে বর্তমানে পাড়ি দিয়েছেন আবার কখনো বর্তমান থেকে ঘোলাটে ধূসর অতীত হাতড়ে বেড়িয়েছেন, মাঝখানে রয়ে গিয়েছে বিয়াল্লিশ বছর

সময়ের ব্যবধান। কখনো লেখিকা চেতনে আবার কখনো অবচেতনে অনর্গল কথা বলে গিয়েছেন। এই উপন্যাসে বাঙালি বিদুষী কন্যা মৈত্রেয়ীর সাথে ফরাসি মির্চা ইউক্লিডের এক মায়াময় প্রেম কাহিনি আঁকা হয়েছে। কিন্তু আর পাঁচটা সাধারণ প্রেম কাহিনির মতো এই পৃথিবীতে শুধু দুজন নারী-পুরুষের প্রণয়ের আখ্যান নেই বরং এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে একটা দীর্ঘ সময়, সেই সময়ের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক চালচিত্র। আর এই দীর্ঘ সময়ের অনেকটা জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি রক্ত-মাংসের চরিত্র হয়ে আছেন, কবির শেষ জীবনের সুন্দর এক আলেখ্য রচিত হয়েছে কাহিনির পরতে পরতে। এই উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অংশে তাই মৈত্রেয়ী দেবী নিজে লিখেছেন—

> "এ বইতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও এমন অনেকের নাম উল্লেখ করেছি যারা এতদিন জীবিত ছিলেন। এই কাহিনি গড়ে তোলবার জন্য তাদের প্রকৃত নাম উল্লেখের হয়ত তেমন সার্থকতা নেই। শুধু আমি একটি যুগের ছবি আঁকতে চাইছিলাম। যে যুগ এইসব যুগপুরুষ ও অসামান্য নারীদের উপস্থিতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল।"[২]

এই উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় বৃদ্ধা মৈত্রেয়ী দেবীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান। সকলের মাঝে থেকেও আজ সে মন থেকে একলা। মন ছুটে চলে যায় ফেলে আসা অতীতের দরজায় কড়া নাড়তে। ষোল বছরের অনাঘ্রাতা মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনে আসে তাঁর পিতার ছাত্র মির্চা ইউক্লিড। সমস্ত উপন্যাসের প্রতিটা চরিত্রের নাম মৈত্রেয়ী দেবী বাস্তব অনুসারে লিখলেও কেবলমাত্র নিজের নামটি গোপনে রেখেছেন। তাই আমরা যখন গল্পের মধ্যে প্রবেশ করি তখন জানতে পারি 'নহন্যতে' উপন্যাসের নায়িকার নাম অমৃতা। এই অমৃতা জীবনের শেষ অংশে এসে হঠাৎ অতীতের সম্মুখীন হয়েছে। সুদূর ফরাসি দেশ থেকে এদেশে এসেছেন সেরেগেই সেবাস্টিন। সে জানালো যে মির্চা অমৃতাকে নিয়ে বই লিখেছে, সেই বইয়ের মাধ্যমে তাদের দেশের সকলের কাছে অমৃতা এক পরিচিত নারী যেন রূপকথার নায়িকা। এই বইতে মির্চা আর অমৃতার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কথা লেখা রয়েছে যার ফলে সকলেই সে বিষয়ে অবগত। অমৃতা এত বছর পর অতীতকে সামনে আসতে দেখে অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তার সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়। সে মনে মনে বলে ওঠে— "সেরেগেই তুমি আমার জীবনের কি জানো। আমার জীবন নষ্ট করে সাধ্য কার। আমার সমৃদ্ধ জীবন। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে আমার আদর্শ সংসার। কতো মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, সম্মান পেয়েছি। সর্বোপরি আমার গুরু, যার সম্বন্ধে তোমার বন্ধুর অত ঈর্ষা। তাঁর আশ্চর্য স্নেহ অভিষিক্ত আমার মন এমন অতীন্দ্রিয় ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছে যা বাক্য বা মনের অতীত বস্তু।"[৩] এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যখন মৈত্রেয়ী দেবী অর্থাৎ গল্পের আবহে অমৃতা সংকটে পড়তো তখনই একটি নাম, একটি ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দিত। মনকে ভাবিয়ে তুলত পরম প্রশান্তিতে। সেই মানুষটি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিদেশী ছাত্র মির্চার সাথে অমৃতার আবেগপূর্ণ প্রেম। সদ্য-যৌবনে পদার্পণ করে অনভিজ্ঞা অমৃতার সামনে মির্চা উন্মুক্ত করে দেয় এক বেপরোয়া প্রেমের জগত। বইয়ের আদান-প্রদান, লাইব্রেরীতে বই গোছানোর কাজ, সংস্কৃত পড়া, এসব করতে করতে কখন যে অমৃতা মির্চার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায় সে নিজেও বুঝতে পারেনি। সরলা অনভিজ্ঞা অমৃতাকে কোথায় যেন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র নায়িকা শকুন্তলার মতো মনে হয়। প্রেম ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে মির্চা স্বপ্ন দেখে সে অমৃতাকে বিয়ে করবে। কিন্তু অমৃতার মনে ভয় দানা বাধে কারণ সে জানতো তার বাবা কোনোদিন বিয়েতে মত দেবেন না। এভাবেই সংশয়, ভয়ের দোলাচলে থেকেও প্রেম তার নিজস্ব গতিপথে প্রবাহিত হতে থাকে। তবে এই সুরেলা সংগীতেরও তাল কাটে। একদিন অমৃতার বোন সাবি সকলকে তাদের সম্পর্কের কথা বলে দেয়। সবটা জানাজানি হওয়ার পর অমৃতার বাবা মির্চাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং শপথ করতে বলে মির্চা যেন কোনোদিন অমৃতার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা না করে। এই ট্র্যাজিক প্রেম কাহিনির কিন্তু এখানেই সমাপ্তি ঘটতে পারতো

কিন্তু তা ঘটেনি। প্রেমের অবিলম্বে যাত্রা শুরু হয়েছে এই বিচ্ছেদের পর থেকে। বিচ্ছেদ প্রেমকে নতুনতর মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

সমগ্র উপন্যাসটি চারটি পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি পর্বের মূল কাহিনি মির্চা ইউক্লিডকে ঘিরে রচিত হলেও অন্তরের সুরটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ। কমবেশি প্রতিটি পর্বেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব চোখে পড়ে। তার সব থেকে বেশি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ করা যায় দ্বিতীয় পর্বে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সশরীরে উপন্যাসের চরিত্ররূপে ধরা দিয়েছেন। প্রথম পর্বের মির্চার সাথে অমৃতার সম্পর্কের মধ্যেও বারবার অদৃশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথ চলে এসেছেন। মির্চা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত ছিলেন। 'নহন্যতে' প্রথম পর্বের শুরুতে যখন সেরেগেই অমৃতার সাথে সাক্ষাৎ করতে এল তখন অমৃতা মির্চার প্রসঙ্গ ওঠাতে আবারও টালমাটাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে নিজের গুরুকে স্মরণ করেছিল। ভক্ত বিপদে পড়লে যেমন ইষ্টনাম জব করে তেমনি অমৃতা বিপদে পড়লে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন— "আমি সেই ১৯৩০ সালের মতোই আবার আমার গুরুকে ডাকতে লাগলাম— 'প্রভু আমায় পরিত্যাগ করোনা', নাথ হে ফিরে এস— আমার সব সুখ-দুঃখ মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস'— আমি আর কিছু চাইনা। আমার জীবনে আর কিছু নেই, আর কিছু ছিল না। আমার সমস্ত অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়ে তোমার গানে গানে এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব— আমার কোনো অভাব নেই দৈন্য নেই। আজ কি হঠাৎ কোথাকার অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি দুটো কথা বলে সব চুরমার করে দেবে। এতদিন পরে কি ধ্রুবতারার জ্যোতি নিভে যাবে? আমি পথভ্রষ্ট হব?"[৪] অর্থাৎ সেই বিয়াল্লিশ বছর আগেও ষোড়শী কন্যার কাছে ধ্রুবতারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর আজও একজন প্রৌঢ়া রমণীর কাছেও ধ্রুবতারা স্বরূপে সেই রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের সাথে অমৃতা ওরফে মৈত্রেয়ী দেবীর সম্পর্কটা ছিল একটা অদ্ভুত স্নেহের বন্ধনে বাঁধা। মির্চাকে সে জানিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার জীবনে সূর্যস্বরূপ। সে বলেছিল— "আমার সূর্য ভিতরেও আছে বাইরেও আছে। আমি সব সময়ই প্রণত, সকাল বিকাল নেই। ...আমার গুরু। তিনিই আমাকে এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখাচ্ছেন।"[৫]

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

তৎকালীন বাঙালি সমাজ বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের দ্বারা ভরা ছিল, আর এই সময় একটা কথা প্রচলিত ছিল 'ক্রিম অব ক্যালকাটা', এই এলিট শ্রেণি অর্থাৎ সমাজের উচ্চ শ্রেণির মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই রবি ঠাকুরের সাথে অনেক ছোট বয়স থেকেই মৈত্রেয়ী দেবীর একটা সুন্দর সরল সম্পর্ক ছিল। 'নহন্যতে' উপন্যাসে দেখা যায় অমৃতার পিতা তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে যান এবং অমৃতার লেখা কবিতা অমৃতা তাঁকে পড়ে শোনান। অমৃতার বাবা চাইতেন তার মেয়ের লেখা কবিতা রবীন্দ্রনাথ জানুক এবং যা কিছু ভুল ত্রুটি আছে সেগুলো সংশোধন করে দিক। কিন্তু বালিকার মনে ছিল অন্য কিছু। অমৃতা চাইতো কোনোক্রমে নিজের লেখা কবিতা পড়া হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে। খুব ছোট থেকেই অমৃতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসতো। প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন—

"তুমি আমার চেয়েও আমার কবিতা ভালো পড়।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের সাথে কবিতা নিয়ে, কবিতার মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা হতো। যদিও সরলা অমৃতা পিতার শেখানো দার্শনিক তত্ত্ব কবিকে বলতেন তখন কবি স্নেহার্দ হৃদয়ে অমৃতাকে বলেছিলেন— "থাক থাক, তুমি শুধু পড়, যখন সময় হবে, অর্থ আপনি বুঝতে পারবে। পাখি যে গান গায় তারও কোনো অর্থ আছে বিশ্ব ব্যাপারে, সে কিন্তু সেটা জানেনা, তাতে ক্ষতি নেই। তেমনি মনের আনন্দে তুমি পড়। অন্যের ব্যাখ্যা তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"[৭]

অমৃতা ওরফে মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের কবিতার, গানের অর্থ পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছিলেন নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে। মির্চা ইউক্লিডকে ভালোবেসে। মৈত্রেয়ী দেবীর খুব ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথেরও একান্ত ইচ্ছে ছিল মৈত্রেয়ী দেবীকে 'মালিনী' নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করানোর জন্য। এ প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন— "তোমার বাবার কাছ থেকে তোমাকে আমি কয়েক মাসের জন্য ধার নেব। আমি মালিনী নাটকের জন্য কাউকে খুঁজছি। তুমি পারবে। মালিনীর মতো তোমার মনের আকাশ আছে।"[৮]— এই মনের আকাশের সন্ধান কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন জন্যই নিপুণ শিল্পীর মতো মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনকে সঠিক দিশা দেখিয়েছিলেন। 'নহন্যতে' উপন্যাসে দেখা যায় অমৃতার পিতার জন্য অমৃতার 'মালিনী' নাটকে অভিনয় করা হয়ে ওঠে না, এমনকি শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষালাভের স্বপ্নও অধরা থেকে যায়। পিতার মতামত ছিল— "নাটক থিয়েটার করেই জীবনটা কাটাও আর কি। ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তমঃ।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা করবেন তার আগে অমৃতা পিতার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, সেই সময় তাদের সাথে মির্চা ইউক্লিডও শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন কবির সান্নিধ্যে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অমৃতার সাথে মির্চার সম্পর্ক আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। সেই জন্য তিনি অমৃতাকে প্রশ্ন করেন—

"কি গো, সাহেবের সঙ্গে কি গল্প হচ্ছিল? কত কথা বলছিলে? কথার ফুলঝুড়ি, আমি সাহেবকে বলেছি, মেয়েদের কথা খানিকটা বাদ দিয়ে বিশ্বাস করবে। যত পদচারণা তত বাক্যচারণা।"[১০]

আসলে রবীন্দ্রনাথ অমৃতার মনের আকাশের হদিশ পেয়েছিলেন। সেই মনের আকাশে লেখা মির্চার নামও তিনি পড়তে পেরেছিলেন। কিন্তু অমৃতা অপ্রস্তুত হয়ে কেঁদে ফেললে কবি অমৃতাকে অভয় দিয়ে বললেন— "অমৃতা তোমার বয়স অল্প, মনটাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করো না, সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। মনটা কাকচক্ষু সরবরের মতো স্থির রাখ। তার নীচে বহুদূর গভীরতা, কিন্তু এখনই তাকে চঞ্চল করে উত্তাল করার দরকার নেই— শান্ত হয়ে থাক। সে বাইরের নানা ছায়া পড়বে সহজভাবে তা গ্রহণ করো, সেই যে আমি লিখেছি— 'সত্যরে লও সহজে'— তোমার নিজের ভিতরে যে মাধুরীলতা আছে দূরে নেমে যাবে তার মূল, তার ওপরে ফুল ফুটবে। অপেক্ষা কর।"[১১] সার্থক জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, তিনি জানতেন প্রেমের অন্যতম শক্তি হল অপেক্ষা। প্রিয়কে পাওয়ার অপেক্ষা কিন্তু শ্রীরাধিকা করেছিলেন তেমনি কবি অমৃতা ওরফে মৈত্রেয়ী দেবীকে ভালোবাসার ফুল বিকশিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। তবে বিধাতার মনে অন্য কিছু ছিল তাই অমৃতা আর মির্চা পরস্পরের ভালোবাসায় খুব দ্রুত ডুবে যায়।

মির্চা যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সংশয়ে থাকতো তা 'নহন্যতে' উপন্যাসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। একজন বয়স্ক মানুষের সাথে অমৃতার এই অসমবয়সী সম্পর্কের সমীকরণ মির্চার বোধের বাইরে ছিল। এই কারণেই মির্চা অমৃতাকে প্রশ্ন করেছে—

"একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষকে তুমি এইটুকু মেয়ে এত ভালোবাস কি করে?"[১২]

অমৃতার কাছ থেকে আশানুরূপ উত্তর না পেয়ে মির্চা আবারও বলেছে— "দেখো অমৃতা— হয় তুমি নিজেকে চেন না, নয় তুমি নিজেকে ঠকাও, কারণ সত্যকে দেখবার সাহস তোমার নেই। কিংবা জেনেও মিথ্যা কথা বলছ।"[১৩]

আসলে অমৃতা কখনো মিথ্যে কথা বলেনি, তার জীবনে মির্চার প্রতি প্রেম যেমন দিনের আলোর মতো সত্য তেমনই অনেক ছোট বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি টান, ওনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা— এটাও চরম সত্য। মির্চার প্রতি তাঁর

ভালোবাসা যখন বাড়ির কেউ বুঝতে পারেনি তখন অমৃতার বিশ্বাস ছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক অনুভূতির গভীরতা জরিপ করতে পারবেন। এই কারণেই হয়তো সে ভেবেছিল— “আর রবিঠাকুর, তিনি যদি আমার পিতা হতেন, তিনিও কি এরকম করতেন? যিনি লিখেছেন— “দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা হৃদয় আকাশে”— তিনি কি সেই চাঁপার কলি থেঁতলে দিতে পারেন? কখনই না। বলব তাকে! কি হবে বলে, তাঁর তো আমার ওপর কোনো অধিকার নেই। তিনি তো আমার কেউ নয়। কেউই নয়। কি অদ্ভুত কথা।”[১৪] অমৃতা নিজেও জানতেন এই ‘অধিকার নেই’ কথার অন্তরালে কতটা ‘অধিকার আছে’ হয়ে রবিঠাকুর মনের আসন দখল করেছিলেন। এরপর ‘নহন্যতে’ উপন্যাসে দেখা যায় চরম নিয়তির মতো অমৃতা আর মির্চার প্রেমের ওপর অভিশাপ নেমে আসে। অমৃতার অসুস্থ বোন সাবি সকলকে বলে দেয় তাদের সম্পর্কের কথা। এক মুহূর্তের ঝড়ে সবটা তছনছ হয়ে যায়; মির্চাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অমৃতা শোকস্তব্ধ হয়ে চোখের জল ফেলে। জীবনের চরম সংকটে অমৃতার একজনের কথাই বারবার মনে হয় তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহস করে অমৃতা মির্চা চলে যাবার পর নিজের মনের অবস্থার আভাস দিয়ে রবিঠাকুরকে চিঠি লেখেন, সেই চিঠির উত্তরের মধ্যে যে সান্ত্বনা যে স্নেহ ছিল তা হয়তো অমৃতাকে অনেকটা শান্ত করে। জীবনবোধের যে পাঠ তিনি অমৃতাকে দিয়েছিলেন তা কিছুটা তুলে দেওয়া হল— “...কিন্তু জীবনের পরিণতি একান্ত বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে নয়, দিনে দিনে বেদনাকে বোধনার মধ্যে নিয়ে গিয়ে কঠোরকে ললিতে, অম্লতাকে মাধুর্যে পরিপক্ক করে তোলাই হচ্ছে পরিণতি। তোমার যে তা ঘটবে না তা আমি মনে করি নে— কেননা তোমার কল্পনাশক্তি আছে। এই শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। অবস্থার হাতে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি থাকতে পারবে না— নিজেকে পূর্ণতর করে, তুমি সৃষ্টি করতে পারবে।”[১৫] অমৃতার ওপরে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। আর অমৃতাও জানতো তার মনের গহীন জগতের কথা না বললেও বুঝতে পারেন এই মানুষটি। এটা সত্যি অমৃতারূপী মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে আশীর্বাদ, এমন আশীর্বাদ সবার ভাগ্যে জোটে না। এমনকি মির্চার বিরহে বিধ্বস্ত মেয়েকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন একমাত্র রবি ঠাকুর এটা অমৃতার মায়েরও বিশ্বাস ছিল। তাই তিনিও বলেছিলেন—

> “রু তোমার জীবনে আশ্চর্য জিনিস তুমি পেয়েছ। এই সৌভাগ্য ক’জনের হয়? যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা এ সংসারের সম্বন্ধের সঙ্গে জড়িত নয়, স্বার্থশূন্য, জাগতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত, সে ভালোবাসার স্বর্গীয় রূপ ক’জন দেখতে পায়? ক’জনের জীবনে ঘটে? তোমার জ্ঞান হবার আগে থেকেই যেন তুমি প্রস্তুত হয়ে রয়েছ— পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি— তারপর প্রতিদিন তাঁর কবিতায়, গানে, চিন্তায়, মননে তোমার মন ঊর্দ্ধমুখী হয়েছে। এ তো একটা তপস্যার ফল— নিজেকে ভেঙে-চুরে ফেলে এ দুর্লভ সৌভাগ্যকে বিফল করোনা। তুমি তাঁর কাছ যাও, মনে কোনো দ্বিধা সংকোচ না করে তাঁকে সবটা খুলে বল। আমি যা বুঝতে পারছি চিঠিতে তুমি সংকোচ করে লিখেছ। এটা ঠিক নয়। তোমার যখন এমন জায়গা আছে সেখানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে পার, তোমার সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য সমস্ত অকপটে বলে তুমি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাও মা। তিনি তোমাকে পথ দেখাবেন।”[১৬]

অমৃতার মায়ের এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় অমৃতা অর্থাৎ মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের গভীরতা। পরবর্তী সময়ে ঘটনাচক্রে বাবার পছন্দ করা পাত্রের সাথে অমৃতার বিয়ে হয় বিয়ের আগে অমৃতা পাত্রকে দেখতেও চায়না, সম্পূর্ণ অদেখা, অচেনা একজন মানুষকে সে স্বামীরূপে বরণ করে। অনেক অভিমান নিয়ে, অনেক যন্ত্রণা বুকে চেপে অমৃতা বিয়ের পর রবি ঠাকুরের সাথে দেখা করতে আসে। অমৃতার স্বামীকে দেখে এবং অমৃতার নতুন জীবনকে উপলব্ধি করে কবির মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সাক্ষাৎ জীবনশিল্পী, যিনি নিজের জীবনে হাজার ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য করে শিল্পীর আঁকা নিখুঁত ছবির মতো জীবনকে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তিনি

অমৃতা ওরফে মৈত্রেয়ী দেবীকে কোনো উপদেশ দেননি শুধু ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জীবনকে কি করে শান্ত সমাহিত নদীর মতো বয়ে নিয়ে যেতে হয় তার দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> "আমি আশা করছি, তুমি তোমার চারপাশে যারা আছে তাদের সকলকে সুখী করবে। সবচেয়ে বড় কথা নিজে সুখী হবে। যদি তুমি সুখী না হও অমৃতা, যদি তুমি ভেঙে পড়, পরাজিত হও প্রতিকূল অবস্থার হাতে, তাহলে আমি মনে করব সে আমারই পরাজয়। কিন্তু আমি জানি তা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই পারবে। যদি তুমি একখানি নীড় তৈরি করতে পার যেখানে তোমার আনন্দের সংসারে সকলে আনন্দিত তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আমি যাব তোমার সেই ঘরে।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথের এই কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন অমৃতা ওরফে মৈত্রেয়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথের তাঁর প্রতি যে অগাধ বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসকে নিজের গোটা জীবন দিয়ে রক্ষা করেছেন তিনি নির্জন অরণ্যবাসে জীবনের বাইশ বছর অতিবাহিত করেছেন অমৃতা কিন্তু অন্ধকে যেমন আলোর সন্ধান দিলে সে নিজের অজান্তেই আলোর দিকে ধাবিত হয় তেমনই অমৃতাকে আনন্দের সংসারের কথা বলে জীবনে চলার পথকে মসৃণ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মির্চা চলে যাওয়ার পর তার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না ঠিক তখন রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে যে বেঁচে থাকার নতুন উদ্যম খুঁজে পায়। একজন মানুষের জীবনে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন অনুপ্রেরণার, সেই অনুপ্রেরণার উপরে ভর করে গোটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব। অমৃতা রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় নির্জন অরণ্যবাসে, মংপুর দুর্গম জনমানবহীন জীবনেও ভালোবাসার, আনন্দের ফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথ না থাকলে এভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। ক্ষতবিক্ষত মনকে স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে নতুন করে শুরু করতে সাহস দিয়েছিলেন রবিঠাকুর। তাঁর পরশে যেন মৃত অমৃতা সত্যিকারের নবজন্ম লাভ করে। সেই জন্ম তাকে আমাদের মনে অমর করে রাখে। 'নহন্যতে' উপন্যাসে অমৃতার সংলাপে তাই মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন—

> "আমার বাইশ বছর অরণ্যবাসের তিনটি বছর স্মরণীয়— ঐ তিন বছরই আমরা বেঁচে ছিলাম। বাকি দিনগুলি খালি পুনরাবৃত্তি।"[১৮]

অর্থাৎ অমৃতার দীর্ঘ বাইশ বছর অরণ্যে সংসার যাপনের মধ্যে মাত্র তিনটি বছর অর্থবহ এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কতটা প্রভাব মৈত্রেয়ী দেবী অর্থাৎ অমৃতার মধ্যে ছিল। বাইশ বছর কিন্তু কম সময় নয়। প্রায় দুটো যুগ স্বামীর সাথে সংসার করার পর সন্তান প্রতিপালন করার পরও অমৃতার মনে হয়েছে সে শুধুমাত্র এই তিনটা বছর বাঁচার মতো বেঁচে ছিলেন কারণ পরপর এই তিন বছর রবীন্দ্রনাথ তার মংপুর সংসারে পদধূলি দিয়েছিলেন। অমৃতার কথায়—

> "তিন বছরে চারবার এসেছিলেন কবি এই গণ্ডগ্রামে,— পঞ্চমবার এখানে আসার পথে কালিম্পং এ অসুস্থ হওয়ায় আর আসা হল না। এই তিন বছরের পরিপূর্ণ দানে আমার সব ক্ষয়ক্ষতি ধুয়ে মুছে গেল— এই তিন বছরেই আমার সেই সত্তা তৈরি হয়েছে যে নিজেকে সময়সীমা অতিক্রম করে দেখতে শিখেছে।"[১৯]

মির্চার সাথে বিচ্ছেদের পর অমৃতার মনের ওপরে যে অন্ধকারের আস্তরণ পড়েছিল সেই অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথ দেখিয়েছেন পরম গুরু। পরম সখা রবীন্দ্রনাথ। সংসারকে সুন্দর করতে হবে, জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে হবে তবেই তিনি আসবেন এই নির্জন পাহাড়ে, এই অপেক্ষাই অমৃতাকে নতুন জীবন দিয়েছিল। বেঁচে থাকার সমস্ত উদ্যম, শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকখানি জীবন বেঁচে ছিল, সেই জীবনের সন্ধান মেলে কবির সান্নিধ্যে। অমৃতা যখন বুঝতে পারল যে সে প্রস্তুত কবিকে তাঁর সংসারে স্বাগত জানানোর জন্য তখনই সে কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখেন।

কবিও নিজের কথা রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আসার আনন্দে অমৃতা নিজের ঘর-সংসারকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। 'নহন্যতে' উপন্যাসে অমৃতার জবানীতে যেন মৈত্রেয়ী দেবী বলে ওঠে— "সময়ের আপেক্ষিকত্ব আমি নানাভাবে বুঝেছি এই তিন বছরে যখন তিনি আসছেন বা ফিরে গিয়ে আবার আসছেন এই সময়ের মধ্যে কোনো ছেদ নেই— এটা একটা অখণ্ড সময় যা আমার সারাজীবনের চির অতৃপ্তির মাঝখানে অমৃতপাত্র হাতে অচঞ্চল আছে। আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে মহৎ মূল্য দিয়েছে।"[২০]

একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো সময়গুলো কেটে গিয়েছে। ভোরবেলায় উঠে সূর্য নমস্কার থেকে শুরু করে সারাটা দিন কবির সান্নিধ্যে সময়গুলো বয়ে যেত। কবি মৈত্রেয়ী দেবী অর্থাৎ অমৃতাকে শিখিয়েছেন পাহাড়ের মানুষকে আপন করে নিতে। স্থানীয় গোর্খাদের জন্য অমৃতার বাড়ির দরজা খুলে গিয়েছে। যে একাকীত্বে অমৃতা ভুগত কখন যেন সেই একাকীত্বের মেঘ কেটে গিয়ে নির্মল রোদ এসে কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। সারাটা নির্জন পাহাড় যেন এক উৎসবে মেতে উঠেছে। যে লেখালেখির জগত থেকে অমৃতা স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন কবির ইচ্ছায় আমার হাতে কলম উঠেছে। অমৃতের ভাষায়—

> "এ নির্জন অরণ্যে বিশ্বকবির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বও এল। আমি পৃথিবীর মানুষের সঙ্গ পেলাম। দেশ-বিদেশের গল্প শুনতাম। বার্গস, যাঁর দর্শন পড়েছি, যিনি একজন জীবিত মানুষ তা ভাবিনি কখনো— তাঁর কথা শুনলাম। বার্নড শ, রোঁম্যারোল্যাঁ, বাট্রান্ড রাসেল সব বইয়ের মলাটের নামগুলো নানা কথা বলতে লাগল। অজ্ঞাত বিশ্বের দৃশ্য দেখলাম। সবচেয়ে বেশি শুনতাম রাশিয়ার কথা। সেখানে যে নতুন পরীক্ষা চলছে তার প্রতি তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। বৃহদাকার মস্কো নিউজ আমি সেই প্রথম দেখলাম, তিনটে প্রবন্ধ আমাকে দিয়ে অনুবাদ করালেন তিনি, সেগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় গেল। সবদিক থেকে পূর্ণ হয়ে উঠছি আমি— আমাকে মানুষ করলেন তিনি— বললেন, মানুষের ইতিহাসটা পড়ো— ছয় বছর ধরে 'মহাভারত' পড়লাম, দু'বছর 'ঋগ্বেদ' আর পাঁচ বছর হিস্টোরিয়ানস্ হিস্ট্রি অফ দি ওয়ার্ল্ড'— তারই নির্দেশে।"[২১]

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

রবীন্দ্রনাথ অমৃতার সাজানো সংসারে এসে যারপরনাই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। অমৃতার স্বামী, ফুলের মতো সন্তান, সকলকে নিয়ে ছবির মতো একটা গৃহস্থলী যার সর্বময় কর্ত্রী অমৃতা— এসব দেখে কবি অমৃতাকে বলেছিলেন—

> "সুন্দর সংসার সৃষ্টি করা একটা সৃষ্টিকর্ম; এটা একটা কাব্য। এই ফুলের রাজ্যে ফুলের মতো শিশুটিকে নিয়ে তোমরা সুখে আছ— এতে আমি খুব খুশি হয়েছি অমৃতা, তাইতো বারবার আসছি।"[২২]

হয়তো রবীন্দ্রনাথকে সন্তুষ্ট করতে অমৃতা নিজের সমস্ত জীবনীশক্তি ব্যয় করে সংসারকে সাজিয়ে তুলেছিল কিন্তু বুকের ভেতর যে অনর্গল রক্তক্ষরণ চলছে তা আর কখনো প্রশমিত হয়নি। জীবনের এই চরম সত্যিটাকে অমৃতা কবির কাছে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। যিনি গুরু, যিনি পথ নির্দেশক তার কাছে আর কিসের লজ্জা? তাই অমৃতার বয়ানে যেন মৈত্রেয়ী দেবী কবির কাছে আর্তনাদ করে উঠেছেন—

> "আপনি যতটা বলছেন তা ঠিক নয়, আপনাকে ঠকাচ্ছি আমি। ...কিছু করতে পারিনি আমি, সব বাইরেই অর্ধেক ভুয়া— আমার একলা রাতের কোনো সঙ্গী নেই।"[২৩]

মির্চার সাথে বিচ্ছেদের পর মৈত্রেয়ী দেবীর মনের যাবতীয় যন্ত্রণা তিনি 'নহন্যতে' উপন্যাসের নায়িকা অমৃতার মধ্যে এঁকেছেন। অমৃতার জীবনে সবই পরিপূর্ণ ছিল, স্বামী, সন্তান, সংসার কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন দিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতা

তাকে গ্রাস করতো। একলা রাতগুলো ভয়াবহ নির্জনতায় কেঁদে উঠত। নিজের মনের এই গতিপ্রকৃতি মনের দেবতা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে না জানালে যে অন্যায় হবে। তাই সে অকপটে স্বীকার করেছে নিজের অক্ষমতার কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার মনকে শুশ্রূষা করেছেন। কবি বলেছেন জীবনে সবটা পাওয়া যায় না। আর যা পাওয়া যায় না সেটা নিয়ে হাহুতাশ করে কোনো লাভ নেই বরং যা হয়েছে তাতেই সুখী থাকতে হয়। সমগ্র মানব জন্ম আসলে একটা মায়া, আমরা জন্মের পর থেকে এই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হই কিন্তু মৃত্যু সম্মুখে আসলে একদিন সব মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবী ওরফে অমৃতাকে জীবনপথে চলার জন্য সঠিক দীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে ভালোবেসে আঘাত পাওয়ার পর ভেঙে পড়া অমৃতাকে যেন এক অদৃশ্য জাদুবলে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই অমৃতা উচ্চারণ করে আত্মার অমোঘ উপস্থিতির কথা—

'অজো নিত্যং শাশ্বতোহয়ং পুরাণে

ন হন্যতে হন্য মানে শরীরে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 'নহন্যতে' উপন্যাসের নায়িকা অমৃতার জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে অর্থাৎ বোঝা যায় যে মৈত্রেয়ী দেবী এই উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক, তাঁর নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও মৈত্রেয়ী দেবীর গভীর প্রভাব ছিল। এ প্রসঙ্গে 'দশ নারীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক বইয়ে লেখক পৃথ্বীরাজ সেন বলেছেন—

"বয়সের বিস্তর ব্যবধানে দূরে সরিয়ে দিয়ে যিনি অনায়াসে অকপট স্বীকারোক্তিতে জীবনের অনেক না বলা ঘটনা মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে উন্মোচিত করেছেন, তখন তাঁর মুখ থেকে খসে পড়েছিল সংকোচের মুখোশ। তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে আত্মার আত্মীয়া করেছিলেন। এই দুই অসমবয়সী নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এমন এক সম্পর্ক যাকে আমরা সহজে বিশেষায়িত করতে পারি না।"[২৪] সত্যি এই অসম বয়সের সম্পর্ককে আমরা কোনোরকম বিশেষণের আজ্ঞায় আনতে পারিনা। মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনে সূর্যের মতো সবসময় আলো দিয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিদিনের প্রয়োজনের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে এই সম্পর্ক মৈত্রেয়ী দেবীকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। নিজেকে নিজের অনুভূতিকে চিনতে শিখিয়েছেন। 'নহন্যতে' উপন্যাসে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এক সন্ধ্যায় অমৃতাকে তার জীবনের সেরা স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "আমি তোমায় একটা কথা বলছি অমৃতা, এতে যদি তোমার কোনো সান্ত্বনা হয়— জীবনে আমি অনেক পেয়েছি, তবুও শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসার মিলিত যে অর্ঘ্য তুমি আমাকে দিয়েছ, এরকম জিনিস আমিও বেশি পাইনি। বিদায়ের আগে এ আমারও দরকার ছিল। নইলে বারবার আসতুম না।"[২৫]

মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের এর থেকে বড় স্বীকৃতি আর কি হতে পারে। 'নহন্যতে' উপন্যাসের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে মৈত্রেয়ী দেবীর জীবনে রবীন্দ্রপ্রভাবের অনুষঙ্গ। অমৃতা নামের আড়ালে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন কালজয়ী উপন্যাস যার গভীরে ফল্গুধারার মতো বইছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব।

তথ্যসূত্র :

১. মৈত্রেয়ী দেবী, 'নহন্যতে', প্রাইমা পাবলিকেশন, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৭, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৮

২. তদেব, পৃ. ভূমিকাংশ

৩. তদেব, পৃ. ৫

৪. তদেব, পৃ. ৮

৫. তদেব, পৃ. ১০

৬. তদেব, পৃ. ১৩

৭. তদেব, পৃ. ১৩

৮. তদেব, পৃ. ৫১

৯. তদেব, পৃ. ৫১

১০. তদেব, পৃ. ২৬

১১. তদেব, পৃ. ২৭

১২. তদেব, পৃ. ৩১

১৩. তদেব, পৃ. ৩১

১৪. তদেব, পৃ. ৬৯

১৫. তদেব, পৃ. ১০৬

১৬. তদেব, পৃ. ১০৭

১৭. তদেব, পৃ. ১২০

১৮. তদেব, পৃ. ১২৭

১৯. তদেব, পৃ. ১৩৯

২০. তদেব, পৃ. ১৩৮

২১. তদেব, পৃ. ১৩৯

২২. তদেব, পৃ. ১৪০

২৩. তদেব, পৃ. ১৪০

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

২৪. সেন, পৃথ্বীরাজ, দশনারীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রিয়া বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী ২৫শে বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ২৪৭

২৫. মৈত্রেয়ী দেবী, 'নহন্যতে', প্রাইমা পাবলিকেশন, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৭, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৪১

……………………………

গবেষক , বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

অন্ত:পুরের নিভৃত অন্ধকারের প্রথম স্বাক্ষর : প্রথম প্রতিশ্রুতি

শিউলী শীট

সারসংক্ষেপ -

যে কোনো সাহিত্যিকের তার সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে দেশ কাল সমাজ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকে। সাহিত্যে ঘটে থাকে সমাজ জীবনেরই প্রতিফলন। স্রষ্টার মগ্ন চৈতন্য যুগ ও জীবন যে প্রভাব ফেলে তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য স্রষ্টার জীবনের মৌল ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। আশাপূর্ণা দেবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তর সময়ের লেখিকা হিসেবে পরিচিত। সুতরাং সেই সময়ের পরিবর্তনশীল মানব সমাজ ও মানব জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে সংসারে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ থেকেও বাইরে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেও দুই শতাধিক গল্প উপন্যাস লিখে পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছেন তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্যা স্বয়ংসিদ্ধা এবং বিস্ময়কর লেখিকা। নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা ধর শক্তির পথিকৃৎ ছিলেন আশাপূর্ণা দেবী।

আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের সেরা সম্পদ তার ট্রিলজি উপন্যাস প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, ও বকুল কথা। তিন যুগের, তিন কন্যার, তিন নারীর জীবনের কাহিনী ও বিচিত্র চরিত্রের বিবর্তনের প্রতিরূপ। এক নারী লেখিকার কলমে আর এক নারীর জীবন ইতিহাস হলো প্রথম প্রতিশ্রুতি। অন্তঃপুরে নিভৃত অন্ধকারে যারা বয়ে এনেছিল প্রথম প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, যাদের কাটিয়ে আসা পথের উপর বর্তমান নারীরা ছুটিয়ে চলেছে তাদের বিজয় রথ সেই সমস্ত নারীদের একজনের কাহিনীই হলো প্রথম প্রতিশ্রুতি। শুধুমাত্র একজন নারীর কথাই শুধুমাত্র নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমাজের চোখে নারীরা ছিল যে এক চরম অবহেলার বস্তু তার প্রতিছবিও পরবর্তী প্রজন্মের অনেক সাহিত্যিকের কলমে ফুটে উঠেছে। এই অন্তঃপুরের অন্ধকারে পড়ে থাকা অর্ধেক আকাশ নারীদের জন্য চিরকালই ছিল ঘনো মেঘের আস্তরণ স্বরূপ। নারীদের চাওয়া পাওয়া আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সমাজ কোনো কালেই ভাবতে বসেনি। তবুও নারী স্বাধীনতা এসেছে আর এই স্বাধীনতার পথ ছিল কণ্ঠকাবৃত। এই কণ্ঠকাবৃত পথ কিভাবে অতিক্রম করে নিজেদের স্বাধীন করতে হয় তারই পূর্ণ প্রতিফলন করতে দেখা যায় প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে 'সত্যবতী' চরিত্রের মাধ্যমে তাই বলা যেতে পারে আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি উপন্যাসের প্রথম সোপান হল প্রথম প্রতিশ্রুতি।

মূল শব্দ -

নারী, বিজয় রথ, স্বাধীনতা, অন্তঃপুর, পরিবর্তনশীল, সমাজ।

মূল প্রবন্ধ -

বাংলা কথা সাহিত্যের শক্তিশালী সৃজনী ব্যক্তিত্বের সম সাময়িক দেশ কাল পরিবেশের একটি রেখাচিত্রের পূর্ণ প্রতিফলন ধরা পড়ে আশাপূর্ণা দেবীর মধ্য দিয়ে। আশাপূর্ণা দেবীরা ছিলেন আট ভাইবোন এর মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। আশাপূর্ণা দেবীর নিজেই তিন বোনকে (রত্নমালা, আশাপূর্ণা, সম্পুর্না) " ট্রিলজির অখণ্ড সংস্করণ বলে মনে করতেন এক মলাটে তিনখানি গ্রন্থ।"–[১]

সমাজ সভ্যতার উচ্চ শ্রেণীর, নিম্নশ্রেণী ও ধনী গরিবের পার্থক্য করা হয় ঠিক তেমনি আরেকটি শ্রেণী বিভাগ ও পরিলক্ষিত করা যায় তা হলো নারী এবং পুরুষের। সংস্কার বশে মিশে যাওয়া বহু কালের অভ্যাসে নারী নিজেকে পুরুষের কাছে সুরক্ষিতভাবে। আর পুরুষ নারীকে এই সুরক্ষা দেওয়ার নাম করে তা চারপাশে এক অদৃশ্য বেড়ার সৃষ্টি করে। বাঙ্গালীদের প্রাত্যহিক গৃহ জীবন তথা ভারতীয়দের গৃহজীবনও এখনো একটা নির্দিষ্ট ছক আছে। সেই

ছকে বিভিন্ন অবস্থানে থাকা মানুষগুলি সম্পর্কে চেহারা কেমন হবে তার ঠিক করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ নারীর যে স্থান ছিল ২০ শতকেও তার যে সুবিশাল পরিবর্তন ঘটেছে তার কোন বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না-"এই মধ্যযুগে বাঙালি সমাজের শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক ছিল নারীর প্রতিষ্ঠাহীন লাঞ্ছনার ইতিহাস। মুঘল যুগে বাংলার পুরুষদের যেমন চরম নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল অন্যদিকে তেমনি কুলাঙ্গাদের নৈতিক বিশুদ্ধ রক্ষার অসুস্থ উদ্যানের তারা প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।.......... সেকালে নারীর কোন পৃথক অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকৃত হতো না।-সেই ছিল একান্ত রূপে সমাজের তথা পুরুষের সম্পত্তির একটা অংশ মাত্র।–[২]

মাতৃত্বের কি পিতামহিত্বের যে আদর্শ মহিমান্বিত চেহারা আমাদের বর্তমান সমাজ ও সাহিত্যে স্বীকৃত সেই সমাজ স্বীকৃত নির্মম সাহিত্য সৃষ্টিকেই যেন এ ফোড় ও ফোড় করে সৃষ্টি করে তুলেছেন প্রথম প্রতিশ্রুতিকে। চেনা জানা জগতের বাইরে কখনো পা বাড়ায়নি সত্যবতী, এমনটা তিনি নিজেই বলেছেন কিন্তু চেনা মানুষগুলোর মধ্যে যে এত অচেনা অভিব্যক্তি যে আত্মগোপন করে আছে তা যেন সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করেছেন ।এই সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন- "যাদের চিনি জানি বলে মনে করা যায়, তারা কি সত্যিই চেনা?

বিচিত্র চরিত্র এই মানুষ জাতটাকে কে কবে চিনেছে? এ কত উল্টোপাল্টা উপাদান দিয়েই তৈরি। এর মধ্যে কত রং লীলা, কত বিষয় সে নিজেই জানে না, কি জন্য কি করে বসে জানে না তার চেতনে অবচেতনে কোথায় কি আছে তার মন নামক বস্তু টা কি জটিলতার জালে আবদ্ধ! দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন কোথায় এক একটা জানালা খুলে যায় অনুভবে আসে-মানুষের যতটুকু দেখি সেতুটুকুই তার সব নয় যেটা দেখি না সেটাও অনেকখানি হয়তো-সেটাই অনেক খানি। মানুষ নিজেও জানে না সে অনেকখানি টাই তার জীবন আর জীবন জিজ্ঞাসার নিরন্তন দ্বন্দ্ব [৩]

প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে সত্যবতী চরিত্র যেমন পুরুষতন্ত্রের দ্বারা বা পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি স্থানীয় নারীদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন তেমনি তার প্রতিচ্ছবি তার অন্য দুই বিখ্যাত ছোটগল্প ইস্পাতের পাত গল্পের 'সুখী' এবং তাসের ঘর গল্পের 'মমতা' চরিত্রের মধ্যেও আমরা পেয়ে থাকি। নারীকে পুরুষ চিরকালই নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে এসেছে বলেই তার উপর পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখতে চাই। এবং এর মাধ্যমে পুরুষেরা এক অনির্বচনীয় আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে। ভু প্রাচীন কাল থেকে পুরুষের সমস্ত লাঞ্ছনা কে নিজের ভাগ্য বলেই মেনে এসেছে নারীরা। ইস্পাতের পাত গল্পে পিতৃতন্ত্রের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে সুখী। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই সুখী লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হতে একসময় সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে শিখে গেছে তাই সুখী ভয় না পেয়ে বলে ওঠে- "ভুলবো কেন? ও জিনিস কি ভোলা যায়, স্মরণে আছে। গরম পাঁচে ভুলে যায় তাই ওর একটা যমজ ভাইকে গড়িয়ে রেখেছি যে"-[৪] সুখী আক্ষরিক অর্থে ঘর বা বর না ছাড়লেও স্বামীর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধচারণ করে প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী পত্রিকা 'কথাসাহিত্য' এর পক্ষ থেকে আশাপূর্ণা দেবীর নিকট অনুরোধ আসে ধারাবাহিক উপন্যাস রচনার জন্য। এরপরই 'মিত্র ও ঘোষ' পাবলিশার্স থেকে শ্রীযুক্ত ভানু রায় মহাশয়ের অনুরোধে আছে একখানি বড় উপন্যাস রচনার জন্য। বাইরের জগতের এই ধরনের তাগাদা গুলোই তার অন্তরের ইচ্ছাটিকে প্রকট করে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ছিল। ছোটবেলা থেকেই এবারও অনুরোধের ফলস্বরূপ সৃষ্টি করলেন যুগান্তরকারী রচনা ট্রিলজির প্রথম খন্ড প্রথম প্রতিশ্রুতি। উপন্যাসের সময়সীমা ১৯ শতকের মধ্যভাগ। সেই সময় মেয়েদের থেকে ছেলেদের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল অথচ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সাহস ছিল না নারীদের নারীরা কেবলমাত্র নারী দের প্রধান কাজ ছিল নারী ধর্ম পালন করা। তাই তিনি প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখাতে চান যে নারীদের নব অর্জিত আত্ম সচেতনতা এবং মর্যাদা বোধকে বড় করে দেখিয়েছেন। যুদ্ধ,দেশ বিভাগ এবং তীব্র অভাবের ফলে এক প্রজন্মে

ভারতবাসীর দ্রুত মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। সমাজ মানুষের এই পরিবর্তনের কথা নিয়েই তিনি জানিয়েছেন-"বাল্য থেকে বার্ধককে দীর্ঘকাল ধরে চলেছে এই দীর্ঘকাল যেমন ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে তেমনি সমাজ জীবনেরও উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা রদ বদলের ইতিহাস ও রচিত হয়ে চলেছে। লেখা কোনদিনই থামাইনি সমাজের বদল ঘটেছে বদল ঘটেছে সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিকতার লেখার মধ্যে সেই বদলের চাপ এসেছে অনিবার্যভাবেই।-[৫]

বৈচিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের রচনার রীতি অবলম্বন করেছেন লেখিকা উপন্যাসে। সূচনা ও সমাপ্তির ভারসাম্য মধ্যভাগে থাকে। উপন্যাসের মধ্যভাগের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই মধ্যভাগে কাহিনী বর্ণিত হয় সংঘটিত হয় কাহিনীর মূলদ্বন্দ্ব এরপর সংকটের নানামোর পেরিয়ে উপন্যাসের কাহিনী শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। কাহিনী গ্রন্থনেও উপন্যাসের নিজস্ব রীতি থাকে। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্লটকে নানাভাবে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেন যাতে উপন্যাসের নির্মাণ শৈলীর আলোচনায় বিশেষ অভিনিবেশের দাবি করে। ঘটনা সংস্থান বা প্লট নির্মাণ কৌশল আশাপূর্ণা দেবীর সংকেত গর্ভ বা প্রতিমা নির্মাণ প্রায়শই পরিহার করে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠ বক্তব্যে তৃপ্তি পান। নাটকীয়তা আশাপূর্ণা দেবীর প্লট নির্মিতির গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যদিও তা স্থানে স্থানে অতি নাটকীয়। তার উপন্যাসে সর্বত্রই প্রায় ন্যারেটর হচ্ছেন লেখিকা নিজে। তিনি যেন আমাদের ঘরের কথাই বলছেন গল্পচ্ছলে। উপন্যাসের বন্ধনে প্লটের ঘনবদ্ধতা থাকে তার পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে ঘিরে মূল ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার ক্ষেত্রে কখনো কখনো ঘটনার বর্ণনায় শিথিল ভাব ও লক্ষ্য করা যায়। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের গ্রন্থন সর্বত্রই নিপুনতা অর্জন করেছে তা নয় কখনো তাতে দেখা যায় শিথিলতাও।– "আশাপূর্ণার গল্পের প্লট গঠন যে সর্বত্র নিখুঁত তা বলা যাবে না, কারণ তিনি গল্প লেখেন বা গল্প বলেন। তার রচনার মধ্যে কোন কথক ঠাকুর লুকিয়ে আছেন অথবা ঠান দিদি"-[৬]

তিনি মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনকে উপস্থাপিত করতে ব্যবহার করেছেন সহজ সরল প্লট। তিনি কি লিখেছেন সেটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, কিভাবে লিখেছেন তা নয়। উপন্যাস আরম্ভ হবার পর সরলরেখায় তা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী রচিত প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাস এই সরল পথের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। নির্মিতিতে ঈষৎ বক্রতা এসেছে সত্যবতীর সূক্ষ্ম ও তৃপ্তিবোধে।-"শিল্পী মাত্রই নিজস্ব মানভঙ্গির অনুকূলে তার শিল্পের উপকরণ বেছে নেয়। আমার বেছে নেওয়া উপকরণ হচ্ছে-সাধারণ সমাজবদ্ধ ঘরোয়া মানুষ। নিত্যান্তই সাধারণ, যে সাধারণেরা শুধু প্রাণপাত করে দিনের ঋণ শোধ করে চলে"[৭] অন্যত্র আরো বলেছেন-"এদের জীবনের রোগ শোক দারিদ্র্য আর আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কোন নাটকীয় ঘটনা বড় একটা ঘটে না, তাই তাদের আত্মার ক্রন্দন ধ্বনি কখনোই উত্তাল হয়ে বাজে না। শুধু কান পাতলে শোনা যায়। সেই অদ্ভুত ধ্বনি টুকু পৌঁছে দেওয়া আমার সাহিত্যকর্ম। সেই পৌঁছে দেওয়ার কাজের জন্য চাই সততা আর ভালোবাসা। আমার সাহিত্য জীবনে চিরদিন এই নীতি অনুসরণ করে চলেছি। আমি যা অনুভবে পাই শুধু সেটুকুই বলি হঠাৎ চমকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে কিছু বলতে চাই না আমি কখনো আমার জানা জগতের বাইরে পা বাড়াই না।"[৮]

চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও চোখ মন আর কান দুটি খোলা রেখেই তিনি অফুরন্ত চলমান জীবনের ধ্বনি শুনতে পেতেন। মানুষ নামক জীব দিয়ে এমনই অফুরন্ত বৈচিত্রের ও অশেষ অভিনবত্বের উৎস যে তার উপন্যাসের জন্য কখনো প্লটের অভাব হয়নি। তার উপন্যাসে কখনো কীর্তিময়তা নেই ।কোন গুরু গম্ভীর তত্ত্ব কথাও নেই, আছে হার্দিক অনুভবে সহজ ও সরল ভাবে সচ্ছন্দ জীবনের বহিঃপ্রকাশ। ২০ শতকে জীবন শিল্পী লেখিকারা যেভাবে রূঢ় ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় জীবন যাচাই করেছেন সেখানে তিনি সমাজে যা ঘটেছে তাই দেখিয়েছেন ফলে তিনি অতি পরিচিত বিষয়বস্তুকে গল্প বলার ভঙ্গিমায় পাঠকের দরবারে উপস্থিত ও করেছেন এই সহজ সরল প্রচেষ্টার আঙ্গিক তার অনেক

সার্থক উপন্যাসের মূলে অবস্থান করছে। আশাপূর্ণা দেবীর বিষয়বস্তু অভিনব নয়। এখানেই তার শিল্প সামর্থের বাহাদুরি অজানা চমকপ্রদ। উত্তেজক বিষয় ও পরিবেশ নিয়ে উপন্যাস লিখে জয় করার চেয়ে চেনা সংসারে চেনা মানুষের আপাত চমক ও উত্তেজনা বর্জিত জীবন নিয়ে লেখায় অনেক বেশি শিল্প নৈপুর্যের প্রয়োজন হয়। আটপৌরে জীবনের পরিচিত দৃশ্যকে সহজ সরল ভঙ্গিমায় উপস্থিত করেছেন আশাপূর্ণা দেবী আঙ্গিকে জটিল নিরীক্ষায় তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে স্বচ্ছ ধারণায় চরিত্র ও প্রকাশের জন্য প্রাণবন্ত গতিশীল জীবন উপযুক্তভাবেই ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেছেন। শব্দ অর্থ ও ভাব এই তিনের সমন্বয়ে ভাষা ভঙ্গিমা হাস্য ও ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে তার স্বাদ বজায় রেখেছেন। তিনি কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাষার যে কুশলতা দেখিয়েছেন তাতে আশ্চর্য হতে হয় ।অহেতুক অপ্রয়োজনীয় অলংকার ব্যবহারের পরিবর্তে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাক্য গঠনের আশ্চর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।ওনার প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানব মনের বিচিত্র ভাব কে সরল ভাষার আশ্রয় প্রকাশ করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী রচনায় নারী চরিত্রই প্রাধান্য বেশি পায়। -“আমি রাজনীতি নিয়ে লিখিনি, সমাজ সেবিকাদের নিয়েও না, লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে।“-(৯) ঘরোয়া মেয়েদের সাধারণ জীবনধারা ব্যবহৃত ভাষা আচার ব্যবহার সমস্ত কিছুকে নিজের ভাষার মধ্যে তুলে ধরেছেন তার ব্যবহৃত ভাষার জাদুমন্ত্রে অন্তঃপুরীকাদের জীবনচিত্র সজীব হয়ে উঠেছে। লেখিকার সৃজিত নারী চরিত্রের মধ্যে আমরা প্রায় অন্দরমহলের নারীর ভাষা ভঙ্গি আয়ত্ত করার প্রমাণ। আশাপূর্ণা দেবী যেভাবে সাধারণ জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি সাধারণ মানুষদের কথাই তার রচনাতে তুলে ধরেছেন। তার সমসাময়িক নারীরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য হতেন। সেই সময়কে নারীরা যখন কথাবার্তা বলতেন তাদের মুখে একেবারে নিপাট আটপৌরে মেকি ভাষায় উঠে আসতো। এই আটপৌরে ভাষার মেজাজ কে লেখিকা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উপলব্ধি ও প্রয়োগ করতে পারতেন বলেই চরিত্রগুলি সজীব হয়ে উঠতো। অতি সহজ সদা ব্যবহৃত বিরচিত ঘরোয়া শব্দচয়নের ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবীর জুড়ি পাওয়া ভার। লৌকিক ভাষা প্রয়োগেও তিনি যে জীবন ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেখিয়েছেন তার উদাহরণ যতটা সম্ভব উপন্যাসে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী নারী পুরুষের ঝগড়ার ভাষাকে পর্যন্ত উপন্যাসে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। ঝগড়ার সময়ে নারী ও পুরুষের মুখে যে ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে তাকে আশাপূর্ণা দেবী সুন্দরভাবে উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশ কাল সম্পর্কে যে তিনি সচেতন ছিলেন তাও ওনার ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রায় ৫০ বছর ধরে গল্প উপন্যাস লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী। তার লেখক জীবনের দীর্ঘ সময়ে বাঙালির গল্প ভাবনা রীতিমত বৈপ্লবিক ঢেউ আছড়ে পড়েছে একের পর এক। কাহিনী মুখ্যতাকে পরিহার করে, নিটোল গল্প বলার ভঙ্গিটিকে অবান্তর ঘোষণা করে কেউ কেউ বা কোন গোষ্ঠীর ফতোয়াও জারি করেছেন। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী এইসব তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থেকে নিজের মতো করে লিখে গেছেন। আপাতত মনে হতে পারে যে নির্মাণের বা শৈলীর দিকে তিনি অপেক্ষায় করে গেছেন কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে মধ্যবিত্ত জীবনের আলো আঁধারে পরিবেশ কে সময়ের চিহ্ন খচিত করে তুলতে গিয়ে তিনি কিছু নির্দিষ্ট ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। সচেতন ভাবে, কিভাবে বলবোর চাইতে কি বলবো সেটা ঠিক করে নিয়েছেন লেখিকা প্রথমে। তিনি মনে করতেন জীবনে যা ঘটে তা সবই সাহিত্যে আসতে পারে আর এ বোধের প্রভাব আমরা তার উপন্যাসের প্লটের মধ্যেও অনুভব করে থাকি। সহজ সুরে সহজ কথাটি বলতে গিয়ে তিনি প্রতীক সংকেতকে সেভাবে আশ্রয় করেননি বরং উপন্যাস বলার আটপৌরে পরম্পরা কে তিনি অবলম্বন করেছেন বেশি। উপন্যাস বলতে গিয়ে তিনি ন্যারেটর বয়ানের পাশাপাশি সরাসরি উঠিয়ে এনেছেন চরিত্রের সংলাপ সংলাপ ধর্ম ও নাটকীয়তা ও চরিত্র কে প্রাণ ময় করে তুলেছে। প্রবাদ প্রবচন নারীর নিজস্ব ভাষায় সমৃদ্ধ আশাপূর্ণা। সহজিয়া তিনি,

সংযত বাক শিল্পী তিনি। তবুও তার উপন্যাসকে টানটান না বলে খানিকটা শিথিল বলতে হয়। আটপৌরে জীবনের সংযম আর শৈথিল্যের রূপটাই তার উপন্যাসের নির্মাণ শৈলীকে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করে রেখেছে।

তথ্যসূত্র :

(১) নবনীতা দেবসেন: আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্প সংকলন, ভূমিকা পৃ:XVIII

(২) ভট্টাচার্য তাপাধীর: প্রতিচ্ছের সাহিত্য তত্ত্ব, অমৃত লোক, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ:১৩৬

(৩) আশাপূর্ণা দেবী: আর এক আশাপূর্ণা; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, মাঘ ১৪০১, পৃ:৯

(৪) অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়: কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোট গল্পের একশ বছর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ:৩২৫।

(৫) আশাপূর্ণা দেবী :'আর এক আশাপূর্ণা'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ১৪০১, পৃ:১৪।

(৬) আশাপূর্ণা দেবী: আশাপূর্ণা রচনাবলী (১ম খন্ড) ভূমিকা-অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ:XVII

(৭) আশাপূর্ণা দেবী :'আর এক আশাপূর্ণা, 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ১৪০১, পৃ:২১।

(৮) তদেব পৃ:২৪।

(৯) তদেবো পৃ:১৮।

....

কলেজ শিক্ষিকা (স্যাক্ট -২)বাংলা বিভাগ, ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়

শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন : নির্মাণ-বিনির্মাণ

ড. দীনবন্ধু বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ -

'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' গ্রন্থটি লেখকের গভীর চিন্তা চেতনার ফসল। এ আখ্যান মহাভারতের নব-নির্মাণ। যুদ্ধের বিভৎসতা ও তা থেকে সরে আসার জন্যই মূলত এই গ্রন্থের অবতারণা। আজ আন্তর্জাতিক আকাশে যুদ্ধের ছায়া, বারুদের গন্ধ। এ সময়ে এই ধরণের উপন্যাস পর্যালোচনা অত্যন্ত সময় উপযোগী। যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা স্মরণ উপন্যাসটি শুরু - 'কুরুক্ষেত্রের বীভৎস ছবি। যুদ্ধ শেষ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজা মহারাজা নিহত'।[১] এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো অস্থি, কেশ, চর্বি। রক্তের প্রবাহে আপ্লুত হাজার হাজার মৃতদেহ। এ উপন্যাসের কথক চোখের সামনে সব দেখছেন। যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথপোকথনে লিপ্ত হয়েছেন। পুরো মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের কী ভূমিকা, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সাহসী বিশ্লেষণ আছে এখানে। শ্রীকৃষ্ণ যেসব ইতি ও নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে দিয়েছেন, তারও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কখনো কথক শ্রীকৃষ্ণকে নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন, কখনো তাঁকে অভিযুক্তও করেছেন। আবার কোনো কোনো কাজে কৃষ্ণের যে অদূরদর্শীতা তা বলতেও দ্বিধা করেননি। উপন্যাসের কথক এখানে সার্থক সমালোচকের ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জেনেও তাঁর কৃতকর্মের সীমাবদ্ধতার দিকে আঙুল তুলতে ভোলেননি। অসাধারণ লেখনশৈলীতে সচালাক, কূট দক্ষতায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের উদারতা ও সীমাবদ্ধতা দুইই প্রকাশ করেছেন ।

কৃষ্ণ এখানে যুদ্ধবাজি শক্তিমদগর্বী দেশনায়কের প্রতীক চরিত্র। যারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধের আবহ জিইয়ে রাখে। বিশ্বের শক্তিশালী দেশ আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মান। এসব দেশের দেশনায়করাও জানেন যুদ্ধ কখনও প্রশান্তি আনতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণও যেমন জানতেন, পৃথিবীর প্রায় সব বুদ্ধিজীবীরাও এ সত্য জানেন। কী কারণে যুদ্ধ বাধে? এবং কীভাবে চললে যুদ্ধের এই ভয়ংকর ধ্বংস থেকে দূরে থাকা যাবে, তারপরেও যুদ্ধ সংঘঠিত হতে প্রেরণা দেন এঁরা। অস্ত্রধারণ না করেও বুদ্ধিজীবী সাজি, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মাতি (শ্রীকৃষ্ণের মতো)। এরপর শাসকের কু মতলব জেনেও নীরব থাকা। ক্ষুদ্রতর স্বার্থে শাসকের সঠিক স্বরূপ জেনেও নীরব থাকা, এ সবই ক্রমে একটি সমাজ ও দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' গ্রন্থকে সামনে রেখে রূপকের আড়ালে এইসব সত্যের উদঘাটন করা হবে এই প্রবন্ধে।

মূলশব্দ –

নির্মাণ, আখ্যান, উপন্যাস, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধ, সমাজ, শাসক।

মূলপ্রবন্ধ-

(১) নির্মাণের গভীরে :

'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' একটি উপন্যাস। লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তিনি পাণ্ডিত্যের শীর্ষে বিচরণকারী। গুণী। শিক্ষক। কয়েক দশকের সাংবাদিক। পৌরাণিক থেকে বর্তমান সবধরনের গ্রন্থ করায়ত্ত। এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ত্রিকালদর্শী যুগ-স্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের চোখে চোখ রেখে কথা বলা। এই গ্রন্থে তিনি তাই করলেন। অনেক মিথ, সত্য-মিথ্যা, তর্ক-বিতর্কের মূলে দাঁড়িয়ে থাকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রক্তমাংসের জীবন্ত অবয়বে দাঁড় করালেন।

অজস্র প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করলেন। মহাভারতের যুগকেই আশ্চর্য দক্ষতায় একালের আবহে রূপকাশ্রিতভাবে বিনির্মাণ করলেন। এই বিনির্মিত গ্রন্থটি ২০১৬ সালে প্রকাশ করল আনন্দ পাবলিসার্স। দুবছরের ব্যবধানে ২০১৮ সালে ছিনিয়ে নিল 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার।

তার্কিক মিখায়েল বাকতিনের তত্ত্ব, মিচেল ফুকো, জাক দেরিদা, রোলাবার্ত, রবীন্দ্র দর্শন, বিবেকানন্দ, ভারত আত্মার বিবর্তন, দেশ ভাগ, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, কূটনীতি এসব নিরপেক্ষভাবে না জানলে এ ধরনের উপন্যাস নির্মাণ ভাবনারও অতীত। সাহিত্য তো লেখা যায় না, তা সময়ের দান(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে)। 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' রচনার প্রেক্ষাপট বহুধা বিস্তৃত। তিনি জানেন পৃথিবীতে পরপর ঘটে গেছে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা, রুশ বিপ্লব, ক্রীতদাস প্রথা, কালো মানুষের উপর সাদা চামড়ার আক্রমণ, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শাসকের বর্বরচিতরূপ। ইংরেজ অত্যাচার কূট কৌশল, দেশভাগ, দ্বিজাতি তত্ত্ব, ভায়ে ভায়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, জাতি দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, খাদ্যাভাব, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, শাসকের দমন, পীড়ন, নিপীড়ন, মার্কসবাদের প্রতি আস্থা হারানো, রাশিয়ার ষোলো ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া। তিনি দেখেছেন আমেরিকার মতো কূট কৌশলী, খবরদারি, শক্তিশালী, দেশে প্রথম কালো মানুষের নেতা বারাক ওবামার প্রেসিডেন্টের আসনে বসা। কার্গিল যুদ্ধ, দেশ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জঙ্গী বিস্ফোরণ, মানব বোমা, বেহেস্ত বা জান্নাতের লোভ দেখিয়ে মর্ত্যের মানুষ নিধন। এর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার নির্যাস লেখকের অন্তরে নতুন প্লট নির্মাণের অবস্থা তৈরি করে। বাহ্য ঘাত প্রতিঘাত স্রষ্টার অন্তরের তারে নতুন সুরে অনুরণিত হতে থাকে। সৃষ্টি হয় নবভাষ্য, নব ভাবনা, সাহিত্যে যা দেহ পায়। প্রকাশকের হাত ধরে তা জনসমক্ষে আসে। তাই বিদগ্ধ স্রষ্টার যেকোনো লেখা আভিধানিক অর্থ ছাপিয়ে দেশ কালের ব্যপ্তিময়তার রূপক কাহিনি হয়ে ওঠে। 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' উপন্যাসটিও তাই। সর্বশক্তিমান হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম দশা কী হয়েছিল, তা প্রকাশের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে শাসকের প্রতি এক রূপক বার্তা। তা হল এই- 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায় /আজ যে রাজা উজির, কাল সে ভিক্ষা চায়। / চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।'[২]

এই উপন্যাসের লেখকই কথক। উপন্যাস-প্লটের আবরণ উন্মোচনে লেখক ব'কলমে নিজেই আখ্যানে প্রবেশ করেছেন, এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। যেমন 'সত্যচরণ' নামে বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক' উপন্যাসে পদার্পণ করেছেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্ত তো শরৎচন্দ্র নিজেই। কিন্তু উপন্যাস-লেখক সরাসরি আখ্যানের মূল চরিত্রের সাথে নিজেও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে, এ ঘটনা বিরল। যদিও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে এমনটি ঘটতে পারে। কিন্তু এই উপন্যাসটি তো আর সেই শ্রেণিভুক্ত নয়। এখানে উপন্যাসের প্রচলিত নির্মাণ ঘরানা থেকে সরে এসে এক নতুন আঙ্গিকের বয়ন কৌশল নির্মাণ করেছেন লেখক। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের মতো শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটিকে মহাভারতের উত্তরপর্ব বলা যেতে পারে। রামায়ণের সাতকাণ্ডের (আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা এবং উত্তর) শেষকাণ্ড পূর্বের ছটা কাণ্ডের সারসংক্ষেপ। অর্থাৎ রামের জন্ম থেকে সীতার বনবাস, সীতাহরণ থেকে রাবণবধ সবই উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। লঙ্কা জয় করে রামচন্দ্র স্ত্রী ও ভাইকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছে। তাঁদের স্মৃতিচারণে ধরা পড়েছে পূর্বের ঘটে যাওয়া প্রায় সকল ঘটনা। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড পাঠ করলেই রামায়ণের সম্পূর্ণটাই জানা হয়ে যায়। তদ্রুপ মহাভারতের সম্পূর্ণ কাহিনির সংক্ষিপ্তসার সুকৌশলে দুই মলাটের মাঝে অতি সুনিপুণভাবে কৃষ্ণের সাথে কথপোকথনের মাধ্যমে ভরে দিয়েছেন লেখক । পুরো উপন্যাসে কোনো অধ্যায় বিভাজন নেই। গদ্য আকারে লিখে যাওয়া এ এক নব-মহাভারত।

কথক নিজে এখানে মহাভারতের সময়কার একজন। জাতিস্মরের জন্মান্তরের পেছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় পৌঁছে গেছেন। সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথপোকথনে লিপ্ত হয়েছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যেমন সামনাসামনি বসে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানের আদানপ্রদানে লিপ্ত হয়, 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' উপন্যাসও ঠিক তেমনি। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কী ভূমিকা নিয়েছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সাহসী কথপোকথন, টান টান উত্তেজনায় এগিয়েছে কাহিনি। তৎসহ শ্রীকৃষ্ণ যেসব ইতি ও নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে দিয়েছেন, তারও

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কখনো শ্রীকৃষ্ণকে নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন, কখনো তাঁকে অভিযুক্তও করেছেন। আবার কোনো কোনো কাজে কৃষ্ণের যে অদূরদর্শীতা , তা বলতেও দ্বিধা করেননি। উপন্যাসের কথক এখানে সার্থক সমালোচকের ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জেনেও তাঁর কৃতকর্মের সীমাবদ্ধতার দিকে আঙুল তুলতে ভোলেননি। অসাধারণ লেখনশৈলীর সচালাক, কূট দক্ষতায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের উদারতা ও সীমাবদ্ধতা দুইই প্রকাশ করেছেন। আসলে কৃষ্ণের আড়ালে বর্তমান যুদ্ধবাজি শক্তিমদগর্বী দেশনায়কের সত্য স্বরূপের দিকে অঙ্গুলি হেলন করেছেন লেখক। আজ বিশ্বের শক্তিশালী দেশ আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মান। এ দেশের দেশনায়করাও জানেন যুদ্ধ কখনো প্রশান্তি আনতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণও যেমন জানতেন। এসব কথা পৃথিবীর প্রায় সব বুদ্ধিজীবিরাই জানেন। তাঁরা এও বোঝেন কী কারণে যুদ্ধ বাধে এবং কীভাবে চললে যুদ্ধের এই ভয়ংকর ধ্বংস থেকে দূরে থাকা যাবে। তারপরেও যুদ্ধ সংঘঠিত হতে প্রেরণা দেয়। অস্ত্রধারণ না করে বুদ্ধিজীবি সাজি (শ্রীকৃষ্ণের মতো)। এরপর শাসকের কু মতলব জেনেও নীরব থাকা। ক্ষুদ্রতর স্বার্থে শাসকের সঠিক স্বরূপ বলি না। এ সবই একটি সমাজ ও দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যানুভব রূপক সাংকেতিক আবহে বিধৃত এই উপন্যাসের প্রতি ছত্রে ছত্রে।

(২) জানার মাঝে অজানা :

উপন্যাসের নামকরণ নিয়েও কিছু বলার আছে। জানার মাঝেও কিছু অজানা তথ্য দেওয়ার আছে। শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন নয়, আসলে পুরো মহাভারতই এখানে বর্ণিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সামনে রেখে লেখক ব্যাসদেবের মূল মহাভারতের সার অংশ পুনর্নির্মাণ করেছেন। মহাভারতের যুদ্ধ, রক্তপাত, হস্তিনাপুরের অস্তিত্বের বিলোপ, শিশুপালের প্রশ্নবাণ, পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের অধ্যায় - কী নেই এই গ্রন্থে? অর্জুনের জন্ম ইতিহাস, দ্রোণের জন্ম ছবির মতো অঙ্কিত। দ্রোণের জন্ম প্রসঙ্গে এসেছে মহাতপস্বী ভরদ্বাজ মুনির কথা। তিনি 'আকুমার ব্রহ্মচারী, একদিন গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। সেখানে আগে থেকে অপ্সরা ঘৃতাচী স্নান করছিলেন। তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় তীব্র বাতাসে তাঁর বস্ত্র উড়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আকুমার ব্রহ্মচারী ভরদ্বাজ সেই অপূর্ব নারীশরীর দর্শনে এতটাই উত্তেজিত হলেন, রেতঃপাত হয়ে গেল। সেই বীর্য তিনি একটি কলসে ধারণ করলেন। যজ্ঞ কলসে বীর্য। যজ্ঞের কলসকে বলা হয় দ্রোণ। ধীমান ঋষি ভরদ্বাজের সে অমোঘ বীর্য থেকে দ্রোণের জন্ম হল।'[৩] এইভাবেই দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের কাহিনি, কৃষ্ণের জন্মকথা, পঞ্চপাণ্ডবের পূর্ব ইতিহাস, দ্বারকা নগরীর পত্তন। শ্রীকৃষ্ণের সাংসার জীবন, ষোলো হাজারেরও বেশি স্ত্রী, লক্ষাধিক সন্তান-সন্ততি, যদুবংশ ধ্বংসের প্রেক্ষাপট- এমন বহুধা বিস্তৃত পৌরাণিক লিপিমালা গ্রন্থিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এ আখ্যানের কথক বিশ্বাস করেন আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা-আগমনের উৎসমুখের পথ বেয়ে কথক দাঁড়িয়েছেন লক্ষ কোটি জন্মের আগে প্রভাসের পুণ্যতীর্থ সুরধনী-সরস্বতীর তীরে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ত্রিকাল ব্যাপ্ত এ আখ্যানের পরিসর। এ প্রেক্ষিতেই 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' এই নামে গ্রন্থের নামকরণ সংকীর্ণ অর্থে হয়ে গেল না কি? 'কটা দিন' শব্দগুচ্ছ ব্যাকরণের ভাষায় 'অনির্দেশক অব্যয়' হলেও এ শব্দযুগলে খুব অল্প সংখ্যক বিষয় ও পরিসরকেই বোঝায়। এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনির ব্যাপ্তিময়তার সাথে উক্ত অনির্দেশক (কটা দিন) অব্যয় খাপ খায় না। বরং মনে হয়, উপন্যাসের নামকরণ হতে পারতো, 'হে শ্রীকৃষ্ণ আপনিই বুঝুন' অথবা এমনই অন্য কোনো নাম। কারণ, গান্ধারী এবং উপন্যাসকথক শ্লেষাত্মক অজস্র প্রশ্নবাণে শ্রীকৃষ্ণকে বারবার বিদ্ধ করেছেন। কৃষ্ণকে আত্মসমালোচনার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁকে প্রভু জ্ঞানে বারবার সম্বোধন করেও তাঁর কৃতকর্মের সমালোচনার অদ্ভুত কৌশল রয়েছে এই গ্রন্থে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরিণামে কী লাভ হল হস্তিনাপুরের এবং যদুবংশের? সর্বজ্ঞানী কৃষ্ণের প্রতিই এ প্রশ্নের সমাধানের ভার দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থের নামকরণ আরেকটু অন্যরকমভাবে ভাবলে ভালো হোতো।

এবার উপন্যাসের গভীরে আরেকটু অজানার দিকে ঢোকা যাক। স্মৃতিচারণে মহাভারতের মাঝে কথকের চরিত্ররূপে আগমন। শ্রীকৃষ্ণকে সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে চোখে চোখ রেখে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে অভিনব কৌশলে বেদব্যাসের

মহাভারতের নবনির্মাণ। এ নির্মাণ একবিংশের প্রেক্ষিতে সংকেতময়ও বটে। দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি মজুত করেছে পারমাণবিক বোমাসহ অজস্র অস্ত্রশস্ত্র। এর কিছু অংশের ব্যবহার হলে এক মুহূর্তে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এসব জেনেও মৃত্যু মজুত করছে। চোখে দেখা চরিত্রের সাথে কৃষ্ণ চরিত্রের সংকেতময়তা খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণও জানতেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতির কথা। তাও তো তিনি যুদ্ধ বাঁধিয়েছেন। উপন্যাসের লেখক বারবার সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু। কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে 'স্বজনহারা পুররমণীদের হাহাকার, বিলাপ। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও পতিদের দেহ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। পালে পালে এসে গেছে মাংসভক্ষণকারী পশুর দল। শৃগাল, দ্রোণকাক, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস। দেহ খণ্ড খণ্ড করে মহা উল্লাসে ভক্ষণ করছে।'[৪] এর মধ্যে গান্ধারী খুঁজে চলেছে তাঁর প্রিয় পুত্রদের। না, কেউ নেই। সব রাগ, অভিমান, অপমান, ক্ষোভ গিয়ে আঁচড়ে পড়েছে কৃষ্ণের উপরে। কারণ, এই যুদ্ধের মূল কাণ্ডারী তো সেঁই। সেঁ তো ইচ্ছে করলে এই যুদ্ধ থামাতে পারতো। তাই সন্তানহারা জননী কৃষ্ণকে স্পষ্টভাবেই বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন - 'উভয়পক্ষকে শান্ত করার ক্ষমতা তোমার ছিল। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মহাত্মাদের বাণী তুমি শুনেছ, তুমি জানো। তবু তুমি স্বেচ্ছায় কুরুকুলের এই বিনাশে উদাসীন রইলে, অর্থাৎ তুমি জেনেশুনে এই বংশকে বিনষ্ট হতে দিলে। এ তোমার মহাপরাধ, এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। চক্র ও গদাধারী কেশব! আমি পতির সেবাতে যা কিছু তপস্যা অর্জন করেছি, সেই দুর্লভ তপোবলে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করব।'[৫]

যাঁরা যুদ্ধ থামাতে পারে, যে সকল শিক্ষিত দূরদর্শী বুদ্ধিজীবীদের অঙ্গুলি হেলনে শাসক নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে পিছুপা হন, সে সকল চরিত্রের প্রতীকরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি এখানে ভগবান নন, তাঁকে অবতার জেনে ভালোমন্দ বিচার দূরে সরিয়ে ফুল তুলসী দিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নত হওয়ার ভক্তিমূলক পৌরাণিক কাহিনি এ উপন্যাস নয়। এ গ্রন্থের লেখকও গান্ধারীর মতোই কৃষ্ণকে একইভাবে বারবার অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। স্বজন ও প্রজাদের হত্যা করে কী লাভ হল শ্রীকৃষ্ণের? তিল তিল করে অনেক ঘাম রক্তের বিনিময়ে তৈরি দ্বারকা স্বর্গনগরী, আপন যদুবংশ, সেও তো ধ্বংস হল। কৃষ্ণেরই বা কী লাভ হল? শুধু নৈতিক যুক্তি তর্কে নয়, ধর্মের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা তুলেও কৃষ্ণকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে পিছপা হননি লেখক। অর্জুন কৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়েছেন 'ধর্মশাস্ত্রের প্রথম কথা- 'অহিংসা।- পরমোধর্মঃ, গুরুজনরা অবধ্য। সামনে বিপক্ষে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজন। এঁদের হত্যা করলে ধর্মশাস্ত্রের বিধানে আমাদের পাপ হবে।'[৬] অর্জুনের এ প্রশ্ন আসলে এ গ্রন্থ লেখকেরই। কৃষ্ণই মহাভারতের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় 'চমৎকার ঘুঁটি' সাজিয়েছেন। একই অস্ত্রগুরুর কাছে অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে দুই (কৌরব আর পাণ্ডব) রাজবংশের কুমাররা। তারই চরম পরীক্ষা হল কুরুক্ষেত্রে। এর ফলাফল তো কৃষ্ণ আগেই জানতেন। তবুও এত রক্তক্ষয় কেন? এই প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। শ্রীকৃষ্ণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সোজাসুজি বলেছেন (বিনয়ের সাথে)- 'প্রভু! এ আপনার কী খেলা! গড়া জিনিস ভাঙা! মহাকালে বসে কালকে চিবোচ্ছেন। ছিবড়ে ফেলে দিচ্ছেন এদিকে ওদিকে। প্রেমিক নিষ্ঠুর! গোপীরা দেখল এক, ঋষিরা দেখলেন আর এক, দেবতারা ভীত।'[৭] এখানে 'প্রভু' শব্দ খানিকটা ব্যঙ্গবিদ্রুপের ঢঙে উচ্চারিত। শুধু কৃষ্ণ নন, অর্জুনকেও প্রশ্ন করতে কুণ্ঠা হননি এ গ্রন্থের লেখক। অর্জুনও সব জানতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সখা। যুদ্ধ শেষে পক্ষে-বিপক্ষের কেউ যে জীবিত থাকবে না, সে কথা অর্জুনের থেকে আর বেশি কে জানতো? নিষ্ঠুর নির্দয় কণ্ঠে অর্জুনের আত্মযন্ত্রণার স্ফুরণ ঘটেছে এইভাবে -

'কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঅপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।

ধ্বনি-প্রতিধ্বনি- আমি কাল, অতিভীষণ লোকক্ষয়কারী কাল। আমি সংহারকারী। তুমি যুদ্ধ করো আর নাই করো বিপক্ষদলের যোদ্ধাদের কেউই জীবিত থাকবে না। আমি মহাকাল।'[৭] এ কথা বলে অর্জুন নিজেকে প্রলয়ংকরী যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নিতে চায়লো। কিন্তু কৃষ্ণ তাতে রাজি হলেন না। তিনি বারবার অর্জুনকে প্ররোচিত করেছেন যুদ্ধ করতে। অবশেষে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। ভীত অর্জুন বাধ্য হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

সচেতন শিল্পীর সাহিত্যে সময়ের দাগ থাকবেই। সমাজ-রাজনীতি সচেতন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে পৌরাণিক আখ্যানের নবনির্মান ঘটেছে। কৃষ্ণ এ উপন্যাসে ভগবান নয়, অহংকারী, ধূর্ত, কপোট, অদূরদর্শী এক ব্যক্তি। বাঁকা পথে জয়ী হতে আধুনিক যুগের সুপারিকিলারের যে কনসেপ্ট, তাও লেখক খুঁজে পেয়েছেন মহাভারতের নামি দামী ঋষি মহাঋষি রাজ-রাজাদের মধ্যে। রাজার বন্ধু দ্রোণকে নিজ হাতে হত্যা করা সম্ভব নয় জেনে ঋষি উপযাচককে আমন্ত্রণ করে বন্ধু দ্রোণের মৃত্যুর পথ উদ্ঘাটন করেছেন দ্রুপদ। বিনিময়ে ঘুষ দিতে চেয়েছেন। বলেছেন- 'আপনি যদি আমাকে এমন একটি পুত্র দান করতে পারেন যে দ্রোণকে বধ করতে পারবে, তা হলে আমি আপনাকে দশ কোটি গাভী প্রদান করব। তা ছাড়া আপনার যদি আরও কামনা থাকে তাও পূরণ করব।'[৯] অর্থাৎ ধনভাণ্ডারের লোভ দেখিয়েও নিঃসংশয় হতে পারেনি, তাই কামিনী কাঞ্চনের ইশারা। এ নব-মহাভারত ছাড়া কী?

এভাবেই যুদ্ধবাজি মানসিকতা শিক্ষা-অশিক্ষা, রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান, তাদের চালচলন, পৌরাণিক আখ্যানের আড়ালে নবনতুনভাবে বিনির্মিত হয়েছে। শুধু যুদ্ধর আবহই নয়, পুরাণের অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে। সে তথ্য অবিকৃত রেখেও একবিংশের মোড়কে মুড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন, লক্ষাধিক সন্তান-সন্ততি, পাঞ্চালির পঞ্চস্বামী হওয়ার পূর্বকাহিনি, দ্রৌপদীর পূর্বজীবন, দ্বারকা নগর পত্তন, দ্রোণাচার্য, ধ্রুপদের জন্মরহস্য এমন নানা তথ্যবহুল ঘটনা পাঠককুলকে ঋদ্ধ করেছে। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে তুলতে গেছেন লেখক। যিনি জগৎ স্রষ্টা, তিনিই নিজহাতে জগৎ ধ্বংস করেছেন এবং অতিনিম্নবংশজাত ব্যাধের বাণে মৃত্যুবরণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অন্তিম দৃশ্যে রূপক-সংকেত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তা হল এই- পৃথিবীর যতবড়ই শক্তিশালী নেতা বা রাজা হন না কেন, কৌমুদী গদা ও সুদর্শন চক্রের মতো শক্তিশালী পরমাণুবোমাধারী দেশ হোক না কেন, নিচু সম্প্রদায়ের আমজনতার হাতেই সে দেশের পতন ঘটবে। এবং সেই নিচু সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা নেতার (জরা ব্যাধের মতো) হাতেই সেই অহংকারী শক্তিশালী নেতার পতন অনিবার্য। একারণেই কালের পথে একবিংশের দ্বিতীয় দশকে 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' উপন্যাসটি মহাভারতের নব-নির্মাণ।

তথ্যসূত্র :-

১. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-১১

২. নজরুল গীতি

৩. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৯-৩০

৪. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-১২

৫. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৪

৬. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৮
৭. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩৪
৮. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩৪
৯. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন, আনন্দ পাবলিশিং, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :-

■ ভট্টাচার্য, তপোধীর, বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , কলকাতা– ৭০০০০৯ , প্রথম প্রকাশ -কলকাতা বইমেলা -২০১০

■ ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , কলকাতা– ৭০০০০৯ , প্রথম প্রকাশ- দীপাবলি ২০১০

■ ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতিত্যের সাহিত্য তত্ত্ব, দেজ পাবলিশিং,১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০৭৪, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি,২০১১

■ ভট্টাচার্য, তপোধীর, কবিতার রূপান্তরিত, সাহিত্যলোক ৫৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতার ৬, প্রথম প্রকাশ - ১৮ সেপ্টেম্বর,২০০৩

■ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি, ১৯৯৬

■ দাস কাশীরাম, 'কাশীদাসী মহাভারত', অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ - ফাল্গুন ১৪২৫

■ শীল বেণীমাধব (সম্পাদিত), বৃহৎশ্রীমদ্ভাগবত,অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা ৭০০০০৯, পুনঃ মুদ্রিত- জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

■ মজুমদার, সুবোধচন্দ্র , কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন,৭০০০০৯, পুনঃ মুদ্রন - ১৯৯৭

■ স্বামী প্রভুপাদ, অভয়াচরণাবিন্দ, ভক্তিবেদান্ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রী মায়াপুর, ৭৪১৩১৩, নদিয়া। প্রথম প্রকাশ- ২০০৪

■ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন, দেজ পাবলিশিং,১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০৭৪, প্রথম প্রকাশ - জুলাই,১৯৯৪

■ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং,১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০৭৪, প্রথম প্রকাশ – ১৯৬১

....

কালনা কলেজ, কালনা , পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারঃ প্রসঙ্গ সায়ন্তনী পূততুন্ডের 'চুপি চুপি আসছে' উপন্যাস

আবু আসিম

সারসংক্ষেপ-

সাইকোপ্যাথ (Psychopath) হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের জনপ্রিয় একটা মানসিক রোগ, যা মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার নামক অন্তর্ভুক্ত একটি ডিজিজ হিসাবে চিহ্নিত। French psychiatrist "Philippe Pinel" এই রোগটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দিয়েছেন। সাইকোপ্যাথরা তাদের জীবনের কোনো একসময় মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার বা কোনো অসহনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে থাকে, যা তাদের মস্তিষ্কে বার বার আঘাত করে এবং তাদেরকে 'অপরাধ মনস্তত্ত্বের' দিকে ধাবিত করে। এরকমই একটি চরিত্র হল গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পূততুন্ডের "চুপি চুপি আসছে" নামক উপন্যাসের সি.আই.ডি অফিসার রথীন দাশগুপ্ত। আর এই চরিত্র-কেন্দ্রিক সাইকো-এন্যালাইসিসই আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়। রথীন দাশগুপ্ত শৈশব থেকেই একজন ছেলে হওয়ার সত্ত্বেও তার চালচলন, আদব কায়দা, চলাফেরা, সবকিছুই একটি মেয়ের মতো ছিলো এবং তার কিছু সমকামি আচরণ বা হাবভাবের মাত্রা ছিলো অন্যরকম। তার সঙ্গে ছেলেবেলায় ঘটে যাওয়া জঘন্য অত্যাচার ও অবহেলা, নিজের বাবার নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ, সমাজে প্রাধান্য না দেওয়ার ক্ষোভ তাকে ধীরে ধীরে এক নৃশংস-নির্দয় হত্যাকারী বা একজন সিরিয়াল কিলারে পরিণত করেছে। সে একজন সি.আই.ডি অফিসার হলেও তার অন্তঃমনে পুষে রাখা ক্ষোভ ও রাগ তাকে ধীরে ধীরে মানসিক অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং তার মাথায় কাজ করেছে এক জঘন্য কুৎসিত পরিকল্পনার ছকচিত্র। সুতরাং, আমার লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে আসে যে, সে কেন এই খুনগুলো করলো ? তার হত্যার পিছনে তথাকথিত কোনো সাধারণ কারণ না-কি কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের অসৎ অভিরুচি ? না কি নতুন কোন সাইকো-ডিজিজের মনস্তাত্ত্বিক কারুকার্য ? এসব প্রশ্নের উত্তর ও সামগ্রিক আলোচনাই আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, সে একজন মানসিক অস্থিরতায় ভুক্তভুগী ব্যাধিগ্রস্ত-ব্যক্তি বা Psychopath যে মানসিক দিক থেকে প্রবল ভাবে বিপন্ন ও উন্মাদ, যে ভুলে গিয়েছে তার নিজের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ও সুস্থ মেজাজকে। ফলত তাকে, সমাজের মানুষ ও শক্তিশালী প্রশাসনকে খুন ও হত্যার কঠিন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভীষণ ক্রোধের স্বরে বলতেও শোনা গিয়েছে "সমস্ত অপমানের বদলা নেব। গোটা ডিপার্টমেন্ট গোটা সমাজ আমায় অপমান করেছে! আর ভালোবাসবো না ! এবার ভয় দেখাবো! এমন ভয় দেখাবো যে পরের জন্মেও মনে রাখবে।"

মূল শব্দ -

সাইকোপ্যাথলজিক্যাল ডিজিজ; নৃশংস হত্যা; সি আই ডি রথীন দাশগুপ্ত; সমকামিতা; সিরিয়াল কিলিং; মলেস্ট; বিকৃত মনস্তত্ত্ব ।

মূল প্রবন্ধ

জীবনের প্রতক্ষ্য বা অতিপরিচিত সমস্যাগুলিকে দেখতেই আমরা চিরাচরিতভাবে অভ্যস্ত কিন্তু আজকের এই অস্বস্তিকর সমাজের অন্দরমহলের কিছু মানুষের মনের অদৃষ্ট অন্তঃসমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে আমরা নারাজ। কিন্তু সেই অন্তঃসমস্যাই আজকের দিনের সবথেকে বেশি সংকীর্ণ, কুৎসিত ও ভয়ংকর রূপধারণকারী ডিজিজে পরিণত। ঠিক এরকমই কিছু মানসিক রোগ বা সমস্যাগুলি পরবর্তীতে মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার নামক অন্তর্ভুক্ত একটি ডিজিজ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। যাকে আমরা সাইকোপ্যাথ হিসাবেও শনাক্ত করি এবং যা Abnormal psycholgy এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সাইকোপ্যাথ (Psychopath) হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের জনপ্রিয় একটা মানসিক রোগের নাম। French psychiatrist "Philippe Pinel" এই রোগটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দিয়েছেন। এই মনোরোগটির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা জানলেও এই 'Psychopath' নামটি প্রথম American Psychiatrist "Hervey Milton cleckley" German Psychiatrist "Julius Ludwig August Koch" (JLA KOCH) এঁর ১৮৯১ সালে প্রকাশিত die psychopathischen minderwertigkeiten নামক বইটি থেকে প্রথম উদ্ধার করে ১৯৪১ সালে তাঁর লেখা "The Mask of Sanity" নামক বইটিতে প্রথম ব্যবহার করেন এবং এই সাইকোপ্যাথ নামক মনরোগ বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এই সাইকোপ্যাথ নারী-পুরুষ উভয়ই হতে পারে, এরা বিশেষত মনস্তাত্বিক মনঃসমীক্ষন কে কাজে লাপিয়ে লোকসম্মুখে ফুটে ওঠা নৈতিকতা বা ন্যায়পরায়ণতার আড়ালে নিজেদের কদর্য, কুৎসিত ও বিকৃতকারী ব্যক্তিত্বরূপকে পরিস্ফুটিত করে, যা সহজবোধ্য জটিলতাহীন মানসিক বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অমীমাংসিত। এই ব্যক্তি চরিত্রগুলি সদালাপী ব্যক্তি যাদের কাছে থাকে অসম্ভাব্য বুদ্ধিমত্তা ও বিশেষ কিছু বিশ্বাসী গল্প যা অন্যসকলকে খুব সহজেই বিশেষ আকর্ষণীয় ও মুগ্ধ করে তোলে এবং অন্যের অনুভূতিকে তারা এত সহজেই অনুকরণ করতে পারে যে, তাদেরকে সহজে ধরা যায় না। তারা দেখায় যে তারা অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু আদতে তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনে অন্যদের ব্যবহার করে। তারা খুব হিসেবি হয় এবং ঠান্ডা মাথায় কাজ করে। তারা তাদের যেকোনো ভুল বা খারাপ কাজের জন্য কোনা ধরনের অনুতাপ অনুভব করেনা। আর সাইকোপ্যাথরা জেনে-বুঝেই এসব অপকর্ম করে থাকে। এছাড়া এদের থাকে মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, যে কোনো তর্কবিতর্কে অবিশ্বাস্যভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে জেতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেইসঙ্গে এরা ভীষণ নির্মম হৃদয়ের অধিকারী, আত্মকেন্দ্রিক, প্রখর সুকৌশলী ও ছলনাকারী। কোনো পরিস্থিতিকে নিজেরদিকে করতে চাইলে যে কোনো রকম ভয়ানক আচরন দিয়ে সেই পরিস্থিতিকে নিজের দিকে করে নিতে সচেষ্ট। এরা সর্বদা সকলের উচ্চে স্থান অধিকার করতে চাই। অর্থাৎ, এই Psychopath বা মানসিক ভুক্তভুগী ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বর্তমান Ratio বা অনুপাত যদি দেখা যায় তাহলে সেখানে দেখতে পাবো-- তাইওয়ান ৬১ শতাংশ, আফ্রিকা বা আমেরিকা- ৫৮ শতাংশ, চিন-- ৫৬ শতাংশ ও ইউরোপ--৩৪ শতাংশ, কিন্তু ভারতবর্ষে এবিষয়ে তেমন কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই, যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এর গবেষণা চলছে।

যদিও সাইকোপ্যাথদের বিভিন্ন রূপচিত্র ও বৈচিত্র্যময়তার মধ্যেও কিছু সংখ্যক সাইকোপ্যাথ আছে যারা বাকি সাইকোপ্যাথ দের থেকে অনেকটাই আলাদা। যাদেরকে "Psychopath serial killer" হিসাবে চিহ্নিত করি। এরা অল্প কিছুর মধ্যে নিজেদের মানসিক শান্তিকে পরিতৃপ্ত করে না, এদের মানসিক সুখ, শান্তি, আত্মতৃপ্তি ও জোর করে সবকিছু জেতার মানসিকতা নির্ভর করে শুধুমাত্র বিকৃত ও ভয়ঙ্করভাবে নিজেদের হাতে অসংখ্য মানুষের খুন ও হত্যার মধ্যে

দিয়ে। আর এই খুন বা হত্যা গুলিকে সিরিয়াল কিলিং হিসেবেই নির্ণীত করা হয়। কিন্তু, পূর্বে চম্বলগড়ের ডাকাত বা বিভিন্ন জঙ্গলের ডাকাতেরা ও শহরের তাবড়তোড় মাফিয়ারা একই পদ্ধতি বা একই প্যার্টানে একের পর এক একদম পরপর প্যার্টান আনুযায়ী খুন করে গেছে টাকা পয়সা বা ধনসম্পত্তির লোভে, তাহলে কি তাদেরকে সিরিয়াল কিলার বলবো ?------ না, একদমই না ! তাদেররকে সিরিয়াল কিলার বলা যাবে না। কারণ তাদের প্রকৃত একটি উদ্দেশ্য বা একটি Motive ছিলো, সেটা কী ? যে না, আমাদের ওই খুন গুলি করলে টাকা বা কোনো ধনসম্পত্তি বা অন্য কোন কিছুকে অধিকার করা যেতে পারে । অর্থাৎ, এই Motive গুলি একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের কাছেও যথার্থ মোটিভ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারদের মোটিভের প্রধান লক্ষণ হিসাবে যদি দেখা যায়, তাহলে তাদেরকে বাইরে থেকে ঠান্ডা মেজাজের মনে হলেও তারা ভেতরথেকে একটি বিকৃত, উন্মাদ ও খ্যাপাটে মস্তিষ্কের অধিকারী । যাদের মধ্যে তথাকথিত একটি 'প্রকৃত মোটিভের' অভাব থাকে। যে মোটিভ বা উদ্দেশ্যটি তাদের কাছে একদম ঠিক কিন্তু বাকি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের কাছে সে মোটিভটি যথার্থ, ঠিক বা প্রকৃত মোটিভ হিসাবে কখনই বিবেচিত হবে না। আবার, কখনো কখনো সেই মোটিভটি কোনো রাগ বা ভীষণ ক্ষোভের কারনেও হয়ে থাকে কিন্তু সে রাগ বা ক্ষোভ কোনো একজনের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা বশত হয় না, হয় পুরো সমাজ বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এছাড়া তারা বিভিন্ন অপরাধ করলেও তাদের মধ্যে কোনোরকম কোনো অপরাধবোধ থাকে না। শুধুমাত্র সমাজের মানুষ ও শক্তিশালী প্রশাসনকে খুন বা হত্যার কঠিন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজের মনের অতৃপ্তবাসনা, ক্ষোভ, আত্মসুখ ও আবেগকে চরিতার্থ করা । ঠিক এরকমই একজন সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারের যদি কথা বলি তাহলে সায়ন্তনী পুততুন্ডের "চুপি চুপি আসছে" নামক গোয়েন্দা উপন্যাসের CID অফিসার রথীন দাশগুপ্তে'র কথা আলোচনা করতেই হয়। যার হত্যা-পদ্ধতির বীভৎসতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে "পাঁচটি লাশই বীভৎসভাবে ছিন্নভিন্ন যেন কোনো হিংস্র বন্য জন্তুর তীক্ষ্ণ নোখ তাদের ছিড়েখুঁড়ে ফালাফালা করেছে! উপরন্ত প্রত্যকটি লাশই মুন্ডুহীন। খুনী অত্যন্ত নিপুণ হাতে কেটে নিয়েছে তাদের মাথা! তার বদলে বসিয়ে দিয়েছে একটু মাটির হাঁড়ি। তার ওপরে রক্ত দিয়েই লেখা, 'গেস হু ?'"[পৃঃ২৯(চুপি চুপি আসছে)] এই রথীন দাশগুপ্ত একজন বিখ্যাত সি.আই.ডি অফিসার হলেও তার অন্তঃমনে পুষে রাখা ক্ষোভ ও রাগ তাকে ধীরে ধীরে মানসিক অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং তার মাথায় কাজ করেছে এক জঘন্য কুৎসিত পরিকল্পনার ছকচিত্র। সে পাঁচজন সাধারণ মানুষ ও চারজন নিজের দলের সি.বি.আই অফিসার মোট নয়জন কে একের পর এক নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে খুন করে গেছে। আর তার সেই বিকৃত, অসুস্থ, অস্বাভাবিক ঠান্ডা মাথার মনস্তাত্বিক কারুকার্যের ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপ ও তার সিরিয়াল কিলিং প্যার্টান বা পদ্ধতিগুলিকে পূর্ণরূপে দৃশ্যায়িত করতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য গুরত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন "কি ভয়ঙ্কর নৃশংস খুনী: খুনী ভিকটিমদের মাথা কেটে আদৌ খুন করেনি। বরং প্রথমে এক এক করে সুনিপুণ হাতে শরীরের অভ্যান্ত গুরত্বপূর্ণ আর্টারিগুলোকে কেটেছে। রক্ষিয়াল, ইসোফেগাল পেরিকার্ডিয়াল, ইন্টারকোস্টাল থেকে শুরু করে অ্যাবডোমেন আর্টারিজ, অক্সিয়াল, ব্রাকিয়াল, রেডিয়াল এমনকী লেগ আর্টারিগুলোও কাটা! এখানেই শেষ নয়! যখন ভিকটিমরা রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুমুখী সেই অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে পেরিমর্টেম আনন্যাচারাল সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়েছে। মানে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলোকে একরকম রেপই করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ একদম অ্যাবনর্মাল। এবং মৃত্যুর পরই অত্যন্ত ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে পরিস্কারভাবে মাথা কেটে নেওয়া হয়েছে।"[পৃঃ৩০] স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে কেন সে খুন গুলো করলো ? তার হত্যার পিছনে প্রকৃত কারন কী ?---------- যদি এই

প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে উত্তর হিসাবে শুধুমাত্র এটাই পাবো যে, সে একজন মানসিক অস্থিরতায় ভুক্তভুগী ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বা Psychopath যে মানসিক দিক থেকে প্রবল ভাবে বিপন্ন ও উন্মাদ। যার এসব খুন করার পিছনে প্রকৃতভাবে তেমন কোনো মোটিভ নেই। আছে শুধু নিজের ক্ষোভ ও রাগ গুলিকে অন্য ভাবে উগরে দেওয়ার তুচ্ছ ও ভন্ড আবেগ। আর ঠিক এরকমই সাইকো কিলারদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে ইতালিয়ান অপরাধবিদ সিজার ল্যাম্ব্রোসো (cesare lombrosa) এঁর ধারণা যে সাইকোপ্যাথরা তাদের জীবনের কোনো একসময় মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার বা কোনো অসহনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে থাকে, যা তাদের মস্তিষ্কে বার বার আঘাত করে। আবার দুর্ঘটনা ছাড়াও ছোটবেলার কোনো বাজে স্মৃতিও তাদের মস্তিষ্কের গঠনই বদলে দিতে পারে, যার ফলে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক আবেগ অনুভব করার অংশটিও নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ অপরাধ মনস্ততত্ত্ববিদ সিজার ল্যাম্ব্রোসো সাইকোপ্যাথদের এই যে অতীত জীবন বা অল্প বয়সের অস্তিত্বহীন আতঙ্ক ও ত্রাসপূর্ণ অধ্যায় প্রসঙ্গকে বিশেষভাবে গুরত্ব দেওয়ার কথা যেমন বলেছেন ঠিক তেমন ভাবেই ব্রিটিশ লেখক “Jon Ranson” তাঁর The Psychopath Test: A Journey Through the Madness Industry (2011) এবং বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ “Sigmund Freud” তাঁর Psychopathology of Everyday Life (1901) গ্রন্থেও এ বিষয়ে ঠিক একইরকম ধারনাই পোষণ করেছেঁন।

সাইকো কিলার অফিসার রথীন দাশগুপ্তের অতীত জীবনকাহিনী মধ্যেও দেখা গিয়েছে শৈশব, কৈশোর ও বয়সন্ধিতে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অপমান, অসহায়তা ও একাকীত্বের দৃশ্যকথা। অর্থাৎ, যে অপমান, অত্যাচার তাকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর সহ্য করতে হয়েছিল যা তাকে পরবর্তীতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ও মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য করেছে। রথীন দাশগুপ্ত শৈশব থেকেই একজন ছেলে হওয়ার সত্ত্বেও তার চালচলন, আদব কায়দা, চলাফেরা, সবকিছুই একটি মেয়ের মতো ছিলো এবং তার কিছু সমকামি আচরণ বা হাবভাবের মাত্রা ছিলো অন্যরকম। তার সেরকমি কিছু ছেলেবেলার আচরনের দৃশ্য উল্লেখিত “আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো বাচ্চটা ! পরনে একটা লাল রঙের ঘাগরা-চোলি। লাল রঙটা তার বড়ো পাচ্ছন্দের। দুনিয়ার যত লাল সব তাকে আকর্ষন করে। দিদির লাল রঙের চুলের ফিতে, মায়ের লাল সিঁদুর, লাল রঙের জামা, লাল ফুল, লাল লিপিস্টিক....... সব ভালো লাগে! সব।”[পৃঃ৭৬] আবার তার দিদির মাথার লম্বা লম্বা চুল দেখে তার নিজের মনে হত কেউ কি দেখে না যে দিদির চুলের থেকে তার চুল অনেকবেশি সুন্দর, অনেক বেশি ঘন। বড় চুল রাখলে দিদির থেকে বেশি সুন্দর লাগবে তাকে। নরম চেহারায় আরোও বেশি পুতুল পুতুল লাগবে। মা বাবার কাছে এ নিয়ে অনেক দরবার করেছে কিন্তু বাবাকে বললে পেল্লায় ভ্রূকুটি কে তাকান, যেন ও সাজ্ঘাতিক কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। আর মা কে বললেই তিনি হেসে বলেন, ‘রাজকন্যে সেজে কাজ নেই বাবা! বরং তুমি ঘোড়াই চড়ে রাজকুমার সেজো’। এসব আচরনের জন্য তাকে বাড়ির সকলের কাছে স্বাভাবিকভাবে অপমানিত হতে হত। কিন্তু সেই ছোট্ট বয়েসে সে কি জানতো যে, সে একটি ছেলে হয়ে তার এরকম মেয়ে সুলভ আচরন এ সমাজ ও সমাজের মানুষ কখনই মেনে নেবে না বরং তা একদিন নিজের জীবনের সব থেকে বড়ো অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। সেই অভিশাপের কথা তখনও খুব ভালো ভাবে টের না পেলেও তার শারীরিক গঠন একজন মেয়ের মত নরম, সুডৌল ও চাকচিক্যপূর্ণ হওয়ার কারনে পুরুষের সেই শরীরভক্ষনকারী কামার্ত জঘন্য দৃষ্টি তার উপর নিক্ষেপিত হয়েছিল সেই শৈশব অবস্থা থেকেই। এমনকি তার নিজের জ্যাঠামশায়ের হাতেই তাকে শারীরিক সেক্সচুয়াল মলেস্টের মত জঘন্য ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে ওই

ছোট্ট বয়সে তার জ্যেঠু তাকে দিনের পর দিন প্রকৃতভাবে 'রেপ' করেছিল । কিন্তু এসব কথা নিজের বাবা কে বলতে গেলে উলটে তাকেই প্রচন্ড বোকতো ও মারধর করতো, কেউ বিশ্বাস করতো না তার ওপর এ অত্যাচারের কথা। সে নিজেও জানতো না তার দোষটা আসলে কী! তার জ্যাঠামশাই তার নরম শরীর, গাল ও ঠোঁটে স্পর্শ করে তাকে বলতো----মেয়েদের মত সাজলে তোকে তো গরম মাল লাগে রে। সে তখনও বুঝে উঠতে পারেনি 'গরম মাল' কি জিনিস। তার গলায়, ঘাড়ে তারপর জামার মধ্যে সরীসৃপের মত কিলবিলিয়ে উঠতো আঙুলগুলো। তারপর তার সেই অসহ্য দাড়ির ঘষায় তার অভিষ্ট লাগতো। কোনওমতে সে বলতো জেঠুমনি! কী করছ! জেঠু বলত 'আদর করছি'। তাকে গাঢ় স্বরে বলতে শোনা যেত 'তোকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, তাই আদর করছি' ওই ছোট্ট বাচ্চাটি জানত আদর বলতে ও যা বোঝে এ আদর সে আদর নয়। তাই যখন আসল আদর শুরু হল তখন চিৎকার করে উঠেছিল 'জেঠুমনি ব্যাথা লাগছে........ চুপ ! একদম চুপ ! টু শব্দ করবি তো কেটে ফেলবো' বাচ্চাটার আর্ত চিৎকার, করুণ কান্না কিংবা যন্ত্রনাকাতর গোঙানি সেদিন কেউ শোনেনি।

এছাড়া ওই ছোট্ট বাচ্চাটিকে স্কুল থেকে শুরু করে সকল বন্ধু দের কাছে, স্কুলের স্যারদের কাছে ও তার চারিপাসের সকল আপনজন দের কাছ থেকেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছে। এভাবেই এসব অত্যাচার ও যন্ত্রনা সহ্য করতে করতেই সে বড়ো হয়েছে ও ধীরে ধীরে সে নিজেই বুঝতে পেরেছে যে, সে সমকামি-লিঙ্গে আকৃষ্ট এবং নিজের আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, চাওয়া পাওয়া, ভালোবাসা সবকিছুই তার পুরুষদের প্রতি। পুরুষদেরকে যখন সে নিজের ভালোবাসার কথা জানাত তখন সেইসব পুরুষদের কাছে থেকে তাকে ঘৃনভাবে অপমানিত হতে হত, আবার কখন কখন মারও খেতে হত, কেউ কেউ আবার তাকে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দিত আর এভাবেই সে বছরের পর বছর অবহেলিত হয়েছিল এবং তাকে বলতে শোনা গিয়েছিলো "ঈশ্বর আমায় যে অভিশাপ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তার কী করবো ? আমিও ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। কৈশোরে, বয়সন্ধির সময়ে প্রত্যেকবার ভালোবাসতে গিয়ে অপমানিত, রক্তাত্ব, লাঞ্ছিত হয়েছিলাম। কারণ আমি নারীকে নয় পুরুষকে ভালোবাসতাম।"[পৃঃ২৮৭] এছাড়াও তার কণ্ঠে বার বার গভীর আক্ষেপবাণী ধ্বনিত হয়েছে এবং সে এও বলেছে পুরুষকে ভালোবাসতে নেই। তাকে ভালোবাসার আরেক নাম যন্ত্রনা। কিন্তু বারবার প্রচন্ড আকর্ষণে আমায় পাগল করে তুলেছে পুরুষেরা। তাতেই বা আমার দোষ কী ? আমি তো এই কামনা নিয়ে নিজে জন্মাইনি । আমাকে যে সৃষ্টি করেছিঁলেন তিনিই জন্মলগ্নে এই অভিশাপ লিখেছিলেন অদৃষ্টে। অথবা জিনগত ভাবেই আমার এই অদ্ভুত বাসনা। কিন্তু কে বুঝবে ? কেউ বোঝেনি। এছাড়া এসমাজ যখন তাকে মেনে নিলো না এবং এ পুরুষেরাও যখন প্রশ্রয় দিল না তাকে, তখন ভিতর থেকে তাকে আরো ভয়ঙ্কর বিদ্ধস্ত, বিকৃত, মেজাজ গ্রাস করেছিল। আর সবথেকে বড়োকথা তার বাবা তাকে তার শৈশব অবস্থাতেই বাড়ি থেকে ছুঁড়ে আসামের এক জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছিল এবং তার বাবার এ জঘন্য আচরণ তাকে প্রচন্ড ব্যথিত ও ক্ষুণ্ণ করে তুলেছিল। তখন এক এক্স আর্মিম্যান তাকে সে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে তার দেখাশোনার ভার নিয়ে তাকে বড়ো করে তুলেছিল। এবং পরবর্তীতে তারই সান্নিধ্যে ও চেষ্টায় বড়ো হয়ে যখন থেকে সে পুলিস অফিসার হিসাবে যোগদান করে তখন থেকেই তার মাথায় মারত্মকভাবে সেই রিভেঞ্জের নেশা আরো প্রগাঢ় ভাবে চড়ে বসলো এবং সে ভুলে গিয়েছিল তার নিজের স্বাভাবিক অস্তিত্ব ও সুস্থ মেজাজকে । এবং তাকে ভীষণ ক্রোধে ও উঁচু স্বরে বলতে শোনাগিয়েছিল "সমস্ত অপমানের বদলা নেব। গোটা ডিপার্টমেন্ট পোটা সমাজ আমায় অপমান করেছে! ওদের কিসের গর্ব ! সমস্ত গর্ব, ঔদ্ধত্য মাটিতে না মিশিয়েছি

তবে আমার নাম রথীন দাশগুপ্ত নয়! আর ভালোবাসবো না ! এবার ভয় দেখাবো! এমন ভয় দেখাবো যে পরের জন্মেও মনে রাখবে। স্বাভাবিকতার এত দেমাক ! কে ঠিক করে দেয় যে কে স্বাভাবিক, আর কে অস্বাভাবিক ? যে ঠিক করে তাকেও কাঁপিয়ে ছাড়বো ! দেবতা হয়ে সেটা করা যায় না ! দেবতার চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করার লোকে সাহস পায়। কিন্তু রাক্ষস ? দানব ? কার সাধ্য আছে তাদের দিকে আঙুল তোলার ?”[পৃঃ২৮৫]

অর্থাৎ অফিসার রথীন দাশগুপ্তের সঙ্গে ছেলেবেলায় ঘটে যাওয়া এই জঘন্য অত্যাচার ও অবহেলা, নিজের বাবার নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ, তাকে সমাজে প্রাধান্য না দেওয়ার ক্ষোভ তাকে ধীরে ধীরে এক নৃশংস নির্দয় হত্যাকারী বা একজন সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারে পরিণত করেছে । আর এই সাইকো কিলার রথীন দাশগুপ্ত ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৭ সালের এই একবছরের মধ্যে একদমই নিরপরাধ নির্দোষ পাঁচজন সাধারন মানুষ ও চারজন সি.বি.আই অফিসারকে একই প্যার্টানে ভয়ঙ্কর ও নিকৃষ্টভাবে মুন্ডুচ্ছেদ করে খুন করেছিল । তাই তৎকালীন সি.আই.ডির শ্রেষ্ঠ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এই সাইকো কিলার রথীন দাশগুপ্ত সম্পর্কে বলেছিলেন স্যার এ সাধারণ খুনী নয়! এ জলজ্যান্ত ও বিকৃত মস্তিস্ক রাক্ষস! বকরাক্ষস বলাই ভালো। সুতরাং পরিস্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে এখানেও তার খুন করার পিছনে একটি প্রকৃত মোটিভের অভাব। হ্যাঁ, যদিও তার সঙ্গে পূর্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অত্যাচার, অবেহেলা ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ স্বরূপ খুনী এ খুনগুলো করে তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে, সে ঠিক কথা ! কিন্তু সেখানেও একটি প্রশ্ন উঠে বারবার আসছে যে, তাহলে ওই পাঁচজন নির্দোষ, নিরপরাধ মানুষ গুলিকে সে কেন মারছে ? তা আবার এত নিকৃষ্টভাবে ! আর এদেরকে খুন করেও সে কী Achieve করতে চাইছে ?- শুধুই কি, নিজের মনের আত্মতৃপ্তির খোঁজ ? না কি সম্পূর্ণ একটি আত্ম-উন্মাদ, অসুস্থ ও অস্বাভাবিক মানুষের বিকৃত মাথার কারুকার্য ?--------- এই সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলাররা প্রধানত দুই রকমের হয় Organized ও Disorganized তবে সি.আই.ডি অফিসার রথীন দাশগুপ্ত Organized সিরিয়াল কিলার হিসাবে বিবেচিত, কারণ তার খুন করার পদ্ধতি ভীষনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ। সে প্রথমে বেছে বেছে সুন্দর, যৌবনাপ্রাপ্ত পৌরুষালী ছেলেদেরকে ভিকটিম হিসাবে নির্বাচন করে তারপর প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম (Pancuronium) নামক এক মাসল রিল্যাক্সিং ড্রাগ তাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নড়াচড়া করার ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে অর্ধচেতন অবস্থায় তাদেরকে রেপ করে। এই প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম নামক ড্রাগটির ব্যবহার করেছিল বিখ্যাত আমেরিকান সিরিয়াল কিলার “রিচার্ড এঞ্জেলো” ১৯৮৭ সালে। এরপর তাদেরকে সার্জিক্যাল-স্ দিয়ে নির্মম ও নির্দয়ভাবে খুন করে তাদের দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করে দিয়ে মাথায় একটি মাটির হাড়ি লাগিয়ে মৃত দেহগুলিকে ডাম্প করেছে শহরের পুলিশ স্টেশন গুলিতে । আর এ ভাবেই মূলত উদ্দেশ্যহীনভাবে বিকৃত মেজাজে চলতে থাকে একের পর এক ভয়ঙ্কর খুনের লীলা খেলা।

কিন্তু শেষমেষ ৩২ বছর আগের এই কেসের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত দক্ষ সি.বি.আই অফিসার "অধিরাজ ব্যানার্জী' সাইকো কিলার রথীন দাশগুপ্তকে যখন খুঁজে বের করেছিলেন তখনই সে দেখে বুঝেছিলেন যে এ মানুষটি বড়ো উন্মাদ। আর এ উন্মাদ বিকৃত মস্তিষ্কের পিছনে লুকিয়ে আছে একটি মর্মান্তিক অবদমিত যন্ত্রনা, যা সমস্ত নীরবতাকে ভেঙে দিয়ে বাইরে আসতে চায়। তখন তাকে বড়ো ক্রোধের সুরে বলতে শোনা যায় “কীসের অভাব ছিল আমার ? আমি সুদর্শন, আমার মতো ভালো ফটোগ্রাফার খুব কমই আছে, ভালো ছবি আঁকতে পারি, রীতিমতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শক্তিমান ----

শৌর্যে বীর্যে কিসে কম। কিন্তু না আমি কোনোও দিন প্রেম পাবো না ! কেন ? কেন চিরদিন আমার কামনা বাসনাকে অবদমিত করে চলতে হবে ? অদ্ভুত ক্ষোভে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে মানুষটা। কেন ? কেন আমার জীবনে কেউ থাকবে না। কেন রাতের পর রাত আমায় অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে হবে।....... সমাজ একজন নিষ্ঠুর এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টকে ম্যানলি তকমা দেয়। কিন্তু সেই প্রেমিকের কী হবে যে পুরুষ হয়ে পুরুষকেই কামনা করে ? যত গুনই থাক ওই একটা পরিচয়ের কাছে সর্বনসম্পন্ন মানুষটা হেরে যায়। কেন ? কেন ? সবকিছুকে ছাপিয়ে আমার একটাই পরিচয় কেন হবে যে আমি 'গে'। কেন আমায় বারবার লজ্জিত হতে হবে লজ্জিত হতে হবে ? লজ্জা তো তোমাদের সমাজের হওয়া উচিত, যে একটা মানুষকে একটু একটু করে জঘন্য খুনী হওয়ার পথে ঠেলে দেয়। এভিল ইজ নট বর্ন, ইউস মেড়।”[পৃঃ২৮৪]

অর্থাৎ, একজন সাইকোপ্যাথ (Psychopath) বা মানসিক অস্থিরতাই ভুক্তভুগী ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তি যে নিজের উন্মাদ বীভৎসকারী চিন্তাবেগকেই সবসময় ঠিক মনে করে, নিজের অপরাধকার্যের কোনোরকম অনুতাপ থাকে না বরং সেই অপরাধকার্যের কৃতিত্বস্বরূপ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও গর্বিত মনে করে । তাই একজন "সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারে"র মনস্তত্বিক চিন্তাভাবনা ও তার বিকৃতিসাধনের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ সি.বি.আই অফিসার রথীন দাশগুপ্তের মতো একজন সাইকো কিলারের নিজস্ব উক্তিই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য যা সমাজ ও সমাজের মানুষকে দারুণভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে–“আমি নিজের কৃতিত্বে গর্বিত। আমি লিজেন্ড। একজন সৎ পুলিশ অফিসার হিসাবে, একজন দেবতা হিসাবে রথীন দাশগুপ্তই শ্রেষ্ঠ । অন্যদিকে সার্জিক্যাল-স কিলারের চেয়ে বড় রাক্ষস আর নেই। লোক হয় ভগবান হিসাবে শ্রেষ্ঠ হয়, নয় শয়তান হিসাবে। আমি দুটোতেই সেরা। চূড়ান্ত অভয় দিয়েছি, চরম ভয়ও দেখিয়েছি! আই অ্যাম লিজেন্ড ! আই অ্যাম দ্য বেস্ট!”[পৃঃ২৮৯]

আকর গ্রন্থঃ

১) পূততুণ্ড, সায়ন্তনী / চুপি চুপি আসছে / বিভা পাবলিকেশান / প্রথম প্রকাশ- ১ জানুয়ারী ২০২৩

সহায়ক গ্রন্থঃ

২) Ronson, Jon / The Psychopath Test: A Journey Thought the Madness Industry / Riverhead Publication (UK) / 12 May 2011

৩) Freud, singmund / Psychopathology of Everyday Life / Translation by Anthea Bell / penguin classics Publication / 2003

৪) .Benning, T / Neuroimaging Psychopath: Lessons from Lombross / British Journal of Psychiatry / 183(6) / doi:10.1192 / bjp.183.6.563 / December 2023

....

পিএইচডি গবেষক , বিষয় বাংলা বিভাগ- আধুনিক ভারতীয় ভাষা , বাংলা বিভাগ ,আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় , আলিগড়, উত্তর প্রদেশ ।

জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' উপন্যাস: প্রচলিত ইতিহাসের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

অরিজিৎ পাল

সারসংক্ষেপ-

বঙ্গদেশে পালযুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কৈবর্ত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল উচ্চবর্গের রাজশক্তির শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের কৈবর্তদের বিদ্রোহ। বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কৈবর্ত বিদ্রোহের শ্রেণিচেতনার দিকটি উপেক্ষিত ছিল। সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে উত্তর আধুনিকতাবাদী ভাবধারা ও নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা শুরু হওয়ায় প্রচলিত ঐতিহাসিক ভাবধারার পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে এই সময় থেকে কৈবর্ত বিদ্রোহকে একাদশ শতকের নিম্নবর্গের মানুষদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের বিদ্রোহ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' উপন্যাসেও (২০১১) কৈবর্ত বিদ্রোহের শ্রেণিগত চেতনার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রমাণ করেছেন কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল 'বহিরাগত' পাল নৃপতিদের বিরুদ্ধে 'বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্র' কৈবর্তদের লড়াই। একাদশ শতকে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 'রামচরিত' কাব্যে রাজপক্ষপাতদুষ্ট কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্ত বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিব্যোক সম্পর্কে যে বিকৃত ইতিহাস প্রচার করেছিলেন তার বিপরীতে প্রকৃত ইতিহাস উত্থাপনের প্রয়াসও এই উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রচলিত ভাবধারার বিপরীতে ইতিহাসের এক বিকল্প ভাষ্য রূপে জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ-

জাকির তালুকদার, পিতৃগণ, ইতিহাস, পালযুগ, বরেন্দ্রী, কৈবর্ত, নিম্নবর্গ, পপীপ।

মূল প্রবন্ধ-

বিংশ শতকের শেষ দশক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত লেখক-ঔপন্যাসিকরা প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের বঙ্গদেশের ইতিহাস নিয়ে অনবরত চর্চা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব জাকির তালুকদার (১৯৬৫-)। বাংলাদেশের জনপ্রিয় এই কথাসাহিত্যিক পেশাগতভাবে একজন চিকিৎসক। কর্মজগতের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা তাঁর অন্যতম পছন্দের বিষয়। তাঁর লেখার মধ্যে একদিকে যেমন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক বাস্তবতার মেলবন্ধন দেখা যায়, অন্যদিকে নিজ জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। 'কবি ও কামিনী', 'কুরসীনামা', 'মুসলমানমঙ্গল','প্রতিপাঠ', 'পিতৃগণ' বিবিধ উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব দর্শন ও ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'পিতৃগণ' উপন্যাসটি একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। ২০১১ সালে রোদেলা প্রকাশনী থেকে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে এটি জেমকন সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে। একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে দিব্যোক ও ভীমের নেতৃত্বে সংঘটিত কৈবর্ত বিদ্রোহ এই উপন্যাসের মূল পটভূমি।

প্রাগাধুনিক যুগের বঙ্গদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, বঙ্গদেশে পালযুগ চলাকালীন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে একাদশ শতকে কৈবর্ত নেতা দিব্যোকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে পাল নৃপতিদের দ্বারা শোষিত-নিপীড়িত বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তসমাজ পাল শাসনের অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। ইতিহাস অনুসারে, পাল সম্রাট দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্ত বিদ্রোহকে দমন করতে

চাইলেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং কৈবর্তরা বরেন্দ্রভূমির অধিকার অর্জন করে। কৈবর্ত নেতা দিব্যোক বরেন্দ্রীর নৃপতি হিসাবে অভিষিক্ত হন। দিব্যোকের পরবর্তীকালে যথাক্রমে তাঁর ভ্রাতা রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর সিংহাসনে বসেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল তাঁর মাতুল মথনদেবের সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সামন্তপ্রভুদের একত্রিত করেন ও কৈবর্ত রাজ্য আক্রমণ করেন। এই লড়াইয়ে ভীমের পরাজয় ঘটে এবং প্রায় সাঁইত্রিশ বছরের কৈবর্ত শাসনের পর বরেন্দ্রভূমি পুনরায় পালেদের হস্তগত হয়।

'কৈবর্ত' বলতে সাধারণত কাদের বোঝানো হয়ে থাকে? বিভিন্ন অভিধানে 'কৈবর্ত' শব্দের যে অর্থগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি হল-

ক) রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অনুসারে 'কৈবর্ত' বলতে বোঝানো হয়-'হিন্দুজাতি বিশেষ, জেলে'।[১]

খ) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড) অনুসারে 'কৈবর্ত' শব্দের অর্থ 'দাশ, ধীবর, কেওট, জেলে।'[২]

গ) কাজী আবদুল ওদুদের 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' অনুসারে 'কৈবর্ত' বলতে বোঝানো হয়- 'যে জলে বাস করে, জলের সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত, হিন্দু জাতিবিশেষ'।[৩]

উপরিউক্ত অর্থগুলি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, কৈবর্তরা পেশাগতভাবে ধীবর সম্প্রদায়ের, যাঁরা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ধারার ইতিহাসবিদরা কৈবর্ত বিদ্রোহকে কেবলমাত্র দ্বিতীয় মহীপালের অদূরদর্শিতা ও শাসনক্ষমতার দুর্বলতার ফলে সংঘটিত পাল সাম্রাজ্যের একটি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, এর শ্রেণিগত চেতনার দিকটি তারা কার্যত উপেক্ষা করেছিলেন। ইতিহাস অবলোকনের প্রচলিত এই ধারার বিপরীতে বিশ শতকের সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে একদিকে বামপন্থী ভাবধারার চর্চার বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে উত্তর আধুনিক ভাবধারার প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রচারিত ইতিহাসচর্চার ধারার বাঁকবদল ঘটে। এই সময় থেকেই সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এর প্রভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়। ফলে পালযুগের কৈবর্ত বিদ্রোহকে প্রচলিত ঐতিহাসিক ভাবধারার বিপরীতে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয়। নবতর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কৈবর্ত বিদ্রোহকে বাংলার ইতিহাসে প্রথম উচ্চবর্গের রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের বিদ্রোহ হিসাবে অভিহিত করা হয়।সত্তর দশক পরবর্তী ইতিহাসাশ্রিত বাংলা সাহিত্যেও নতুন এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। এই সময় থেকেই কৈবর্ত বিদ্রোহ বাংলা উপন্যাসেরও বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৭০), মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্তখণ্ড' (১৯৯৪) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' উপন্যাসটি এই ধারারই উত্তরসূরী।

'পিতৃগণ' উপন্যাসটি ২০১১ সালে প্রকাশিত হলেও ২০০৩ সাল থেকেই ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার 'পিতৃগণ' উপন্যাস রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ ছ' বছর ধরে তাঁর নিরন্তর গবেষণা ও অধ্যবসায়ের ফসল এই মহাকাব্যিক উপন্যাসটি। উপন্যাসের সূচনাতেই জাকির তালুকদার দাবি করেছেন বঙ্গদেশের প্রকৃত ভূমিপুত্র কৈবর্তরাই, বরং পালরাই 'বহিরাগত'। উপন্যাসের শুরুর পূর্বে 'পিতৃগণ' উপন্যাসের সন্ধানে' অংশে তিনি পাঁচবিবির বাসিন্দা স্কুলশিক্ষক বিনয় সরকারের মতামত উল্লেখ করেছেন, যেখানে বিনয় সরাসরিই বলেছেন কৈবর্তদের 'ভিন্ন' প্রমাণ করতে তাদের 'আদিবাসী' কিম্বা 'উপজাতি' হিসাবে দাগিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু বল্লাল সেনের বর্ণবিন্যাস অনুসারে তারা 'মাহিষ্য কৈবর্ত', অর্থাৎ 'জলচল শূদ্র' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, এককথায় নিম্নবর্গের 'হিন্দু' ও 'বাঙালি'। বিনয় সরকারের এই মতামত ঔপন্যাসিক

জাকির তালুকদারকে নীহাররঞ্জন রায় রচিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থটিও দেখতে বাধ্য করে এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে --

> 'বাংলার আদি বাসিন্দা, যাদের এককথায় নিষাদজাতি বলা হয়, সেই কোল, ভিল, শবর, পুলিন্দা, কোচ, পোদদের পাশাপাশি কৈবর্তরাও একটি কৌম, যারা নিজেরা ছিলেন এদেশের ভূমিপুত্র, এবং তারাই পৃথিবীর ইতিহাসে একটিমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন, যে রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব ছিল কৃষকের হাতে, শ্রমজীবীদের হাতে।'[৪]

উপরিউক্ত মতানুসারে বলা যেতে পারে, কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে উৎপন্ন হওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল, যার মূল কাণ্ডারি ছিল নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষ। মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে এই রাষ্ট্রশক্তি ছিল 'প্রলেতারিয়েত' চালিত। বঙ্গদেশের বুকে ঘটে যাওয়া এ হেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে উচ্চবর্গের ইতিহাস চর্চাকারীরা দীর্ঘদিন ব্রাত্য করে রেখেছিলেন। কিন্তু সাবঅল্টার্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসকে বিচার করা ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার একাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত প্রথম মেহনতি মানুষদের বিদ্রোহকে নিজের উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু করে তুললেন।

পাল সম্রাট রামপালের সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী (১০৮৪-১১৫৫)। তিনি রচনা করেছিলেন 'রামচরিতম' কাব্য। এই কাব্যে ২১৫টি শ্লোক (বৌদ্ধ লিপিকার শীলচন্দ্রের মতে ২২০টি শ্লোক) রয়েছে। এই কাব্যে দ্ব্যর্থবোধক 'শ্লেষ' শব্দালংকারের মাধ্যমে একদিকে রামায়ণের কাহিনি ও অন্যদিকে রামপালের প্রশস্তি উভয়ই একইসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটিতে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে 'কলিকালের বাল্মীকি' বলে অভিহিত করেছেন এবং দিব্যোকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ ও বরেন্দ্রভূমি জয়কে রাবণের সীতাহরণের সঙ্গে, কৈবর্ত সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে রামপাল ও অন্যান্য সামন্তরাজাদের জোটবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে সীতা উদ্ধারের অভিপ্রায়ে সুগ্রীবসহ বানরদল ও রামের মিত্রতা স্থাপনের সঙ্গে এবং রামপালের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের ঘটনাকে রামের সীতা উদ্ধারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বাভাবিক নিয়মেই কৈবর্ত নেতা দিব্যোক প্রবলভাবে নিন্দিত হয়েছেন এই কাব্যে।দিব্যোককে তিনি 'উপধিব্রতিনা' বলে চিহ্নিত করেছেন, যার অর্থ 'খল' বা 'ছলনাময়'। রাজ পক্ষপাতদুষ্ট কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর পক্ষপাতিত্বমূলক অবস্থান এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিপীড়িত, শোষিত মানুষদের নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে উচ্চবর্গ এভাবেই বারবার 'দস্যুবৃত্তি' বলে দাগিয়ে দেয়।

ইতিহাসচর্চা তথা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে অবলোকন করার দৃষ্টিকোণ কখনও নিরপেক্ষ হতে পারে না, বাস্তবে তা হওয়া সম্ভবও নয়। ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদারও এখানে রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রতিস্পর্ধীমূলক অবস্থানে দাঁড়িয়ে সরাসরি নিম্নবর্গের পক্ষ নিতে কোনও রাখঢাক করেননি। তিনি প্রয়াস করেছেন বিকল্প ইতিহাসচর্চার, যা উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনার এক গুরুত্বপূর্ণ ফসল। যে কোনও রাজশক্তির কাছেই প্রজাবিদ্রোহ রাষ্ট্রদ্রোহের সমতুল্য এবং এ ঘটনা প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সত্য। রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর কাছে সে কারণেই কৈবর্ত নেতা দিব্যোক 'উপধিব্রতিনা', কৈবর্ত বিদ্রোহ 'অলীক ধর্ম-বিপ্লব', 'ভবস্য আপদম'। ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন সন্ধ্যাকরের এই চাটুকারি দৃষ্টিভঙ্গিকে --

> 'কৈবর্তদের সবই যদি এত খারাপ, তবে পালসহ চতুঃসীমায় সকল নৃপতি ও সামন্তদের অবিরল আক্রমণ প্রতিহত করে পর পর তিনজন নেতার নেতৃত্বে কৈবর্ত-কৃষক-জেলে-ভূমিপুত্ররা ৩৭ বছর ধরে নিজেদের বরেন্দ্রভূমির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখলেন কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর ভদ্রজনের লেখা ইতিহাসগ্রন্থে থাকার কথা নয়। নেই-ও। থাকলে থাকতে পারে লোকশ্রুতিতে, কিংবদন্তিতে, আঞ্চলিক কথা-কাহিনীতে।'[৫]

বঙ্গের ভূমিপুত্রদের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করাই ছিল ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য। তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি তাঁর উপন্যাসের মূল উপাদান সংগ্রহ করেছেন বরেন্দ্রভূমির বিভিন্ন মানুষদের সঙ্গে কথা বলে। তথ্যের জন্য নির্ভর করেছেন লোকশ্রুতি, কিংবদন্তি ও আঞ্চলিক কথা-কাহিনির ওপর। ছুটে গিয়েছেন বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার অন্তর্গত দিবর দিঘীর মধ্যস্থলে অবস্থিত দিব্যোক জয়স্তম্ভ (যা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করার পর দিব্যোক নির্মাণ করেছিলেন) ও নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলায় অবস্থিত রামপাল নির্মিত জগদ্দল বিহার দেখতে। সব মিলিয়ে, দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় ও নিরন্তর ইতিহাসচর্চার ফলে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার 'পিতৃগণ'-এর মত মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'পিতৃগণ' উপন্যাসটির দুটি পর্ব রয়েছে। প্রথম পর্বে রয়েছে পাল রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভূমিপুত্র কৈবর্তদের বিদ্রোহ ও গৌড়ের ক্ষমতা দখলের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় পর্বে বর্ণিত হয়েছে কৈবর্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসের ইতিবৃত্ত। প্রথম পর্বে রয়েছে তেইশটি উপপর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ছাব্বিশটি উপপর্ব। প্রত্যেকটি উপপর্বের পৃথক পৃথক নামকরণ রয়েছে।ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার এই উপন্যাসে রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বিপরীত অবস্থানে কৈবর্ত কবি পপীপকে উপস্থাপিত করেন, যেসমাজে প্রচারিত বিকৃত ইতিহাসের বিরুদ্ধে রচনা করবে ইতিহাসের বিকল্প ভাষ্য ।উপন্যাসের সূচনাতেই ঔপন্যাসিক কৈবর্তদের বিদ্রোহের পশ্চাতে দীর্ঘদিনের নিপীড়ন ও শোষণের ইতিহাসের কয়েকটি কাহিনি উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রথমেই বলা যায়, ক্রীতদাস ব্যবস্থার কথা। পপীপের পিতা বট্যপ পপীপের জন্মের প্রাকমুহূর্তে গর্ভবতী স্ত্রী বিবানির প্রসবযন্ত্রণা উপশমের জন্য দেবগ্রামের উচ্চবর্গের প্রসবকারিণী ধাত্রী বিল্ববালাকে ডেকে নিয়ে আসে। স্ত্রীকে বাঁচানোর তাগিদে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বট্যপ বিল্ববালাকে দশ দ্রম্ম পারিশ্রমিক দিতে রাজি হয়ে যায়, যদিও এ অর্থ দিতে সে ছিল অসমর্থ। সে যাত্রায় বিবানি বাঁচলেও এবং তাদের সন্তান পপীপ সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করলেও বিল্ববালার প্রাপ্য অর্থ না মেটাতে পেরে সমস্যায় পড়ে বট্যপ। শেষাবধি কামরূপের ভূমিপতি রামশর্মার কাছ থেকে দশ দ্রম্ম উনিশ কার্যাপণ নিয়ে বিল্ববালাকে দেয় বট্যপ ও এই আর্থিক ঋণ মেটানোর জন্য সে আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হয় কামরূপে রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতে। সাত বছরেও তার ঋণশোধ না হওয়ায় পুত্র পপীপকেও কামরূপে যেতে হয় রামশর্মার ইক্ষুক্ষেতে শ্রমদানের জন্য। চড়া সুদ মেটানোর জন্য সারাজীবন ধরে ইক্ষুক্ষেতে শ্রমদান করাই ছিল একমাত্র পন্থা। এভাবেই উচ্চবর্গের শাসকশ্রেণির দ্বারা নিম্নবর্গের কৈবর্তরা শোষিত ও নিপীড়িত হত।

আর্যদের ভারতবর্ষে আসার পরবর্তী সময় থেকে বৈদিক ভাবধারা ও রীতিনীতির প্রভাবে ভারতের আদি জনগোষ্ঠীগুলির বৈচিত্র্যময় লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে ধ্বংস করার ইতিহাসও এই উপন্যাসে উঠে এসেছে।সেই সময় কখনও বাহুবলে, কখনও লোভ দেখিয়ে অনার্য জাতিসমূহের লৌকিক ভাবধারা ও রীতিনীতিগুলিকে গ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হয় আর্যদের তরফ থেকে। প্রখ্যাত দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির ভাষায় বলা যেতে পারে সাবঅল্টার্নদের ওপর বুর্জোয়া উচ্চবর্গের সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেজিমনি', যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রীয় শক্তি অধিকারের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতেরও পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়।[৬]'পিতৃগণ' উপন্যাসটির সূচনাতেও পরিলক্ষিত হয় কৈবর্তদের নিজস্ব লোকসাংস্কৃতিক পূজাপার্বণের ওপর ব্রাহ্মণ্যশক্তির আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস। পাল নৃপতিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের অমাত্যরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, ফলে সেই সময় থেকেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যশক্তির রমরমা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৈবর্তরা তাদের নিজস্ব লোকবিশ্বাস অনুসারে পূজা করত 'গাঁওদেব-গাঁওদেবী' নামক চ্যাপ্টা একটি পাথরের। 'গাঁওদেব' তথা 'গ্রামদেবতা' ছিলেন আর্যপূর্ব যুগের আদি জাতিগোষ্ঠীর দেবতা এবং সেই কারণেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুসারে গ্রামদেবতার পূজারীরা মনুর বিধানে পতিত হিসাবে গণ্য হত।[৭]'পিতৃগণ' উপন্যাসে দেখা যায়, পাল সম্রাটের প্রতিনিধি রাজপুরুষ ঘোষণা করে, দেদ্দাপুরে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হবে, অতএব কৈবর্তদের গ্রাম এখন 'দেবোত্তর সম্পত্তি'। সে এও বলে, বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য গাঁওদেব-গাঁওদেবী বলে পরিচিত পাথর দুটিকে

নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। এ বিষয়টিকে স্পষ্টতই জনজাতির লোকসাংস্কৃতিক বিশ্বাসের ওপর ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসন হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, পাল যুগে পাল রাজা ও মন্ত্রী-অমাত্যরা নিম্নবর্গের প্রজাদের দমন করে রাখতেন নানাবিধ উপায়ে, যাতে তারা কোনওভাবেই মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে রাজ অনুগত না হওয়ায় সমস্তরকম শাসনতান্ত্রিক সুযোগসুবিধা থেকেও তারা ছিল বঞ্চিত। একইসঙ্গে, যাতে তারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে, সেইজন্য কৈবর্তদের মধ্যে থেকেই পদলোভী কয়েকজনকে বরেন্দ্রীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করা হত এবং তাদের এমনভাবে বিলাসব্যসনে ভুলিয়ে দেওয়া হত, তারা জাতির উন্নয়ন অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভকেই বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখতেন। ফলে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনাও অনেকটা কমে যেত। এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন দ্বিতীয় মহীপালের মহা অমাত্য, ধূর্ত ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ভট্টবামন। তবে দিব্যোক বরেন্দ্রীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা হওয়ার পর ভট্টবামন তাকে কোনওভাবেই নিজের বশে আনতে পারেননি। দিব্যোকের মানসিকতা অন্য সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার থেকে পৃথক ছিল। প্রাচীন কট্টলির স্বপ্নে বিভোর দিব্যোক নিজের জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতিসচেতন ছিলেন । তাই পাল সাম্রাজ্যের অধীন শাসনকর্তা হয়েও নিজের শিকড় কখনও ভোলেননি তিনি। তাই তিনি ক্ষেত্রপূজার দিন কৈবর্তদের ওপর আক্রমণ চালানোর মূল মস্তিষ্ক শ্রীবৎসপালস্বামীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ্মনাভর সহায়তায় প্রকৃত নেতার মত দিব্যোক কৈবর্ত সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ দখল করে, মৃত্যু হয় দ্বিতীয় মহীপালের এবং বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নিম্নবর্গ তথা শ্রমজীবীদের অধিকার। জাকির তালুকদারের কলমে মূর্ত হয়ে উঠেছে কৈবর্ত বিদ্রোহের সেই চিত্র-

> '....শত শত বৎসরের নিপীড়ন-লাঞ্ছনা-শোষণ-অমানবিক আচরণের শিকার হওয়া, এবং সর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণা-অপমান ঘৃণা হয়ে জমে আছে কৈবর্তদের বুকে। আজ সেই ঘৃণা নিজেকে উন্মুক্ত করার পথ পেয়েছে। তাকে আজ রুখবে কে! .....বিধ্বস্ত নগরজুড়ে কৈবর্তরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর জয়ধ্বনি উঠছে দিব্যোকের নামে। তারা ফিরে পেয়েছে তাদের বরেন্দিকে। সাথে পুণ্ড্রও। ওলান ঠাকুর দিব্যোকের বেশে জন্ম নিয়ে এই মাটির সন্তানদের মুক্ত করেছে শত শত বৎসরের দাসত্ব থেকে।'[৮]

দিব্যোকের নেতৃত্বে কৈবর্তদের বরেন্দ্রভূমি অধিকারের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার এখানে প্রচলিত ইতিহাস দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের এক বিকল্প ভাষ্য নির্মাণ করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার সহ বহু ইতিহাসবিদের মতে, কৈবর্ত নৃপতিকে ভীমকে পরাজিত করে রামপাল পালেদের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ভীমের মৃত্যুর পর রামপালের পালরাজ্য পুনরুদ্ধার সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেম-'বহুদিন পরে রামপাল আবার পিতৃভূমি বরেন্দ্রী ফিরিয়া পাইলেন।'[৯] এখানে 'পিতৃভূমি' শব্দটি উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র ও অন্যান্য প্রচলিত ধারার ইতিহাসবিদদের মতে, তৎকালীন সময়ে বরেন্দ্রভূমি ছিল পালেদেরই সাম্রাজ্য, সেখানে কৈবর্তদের সাঁইত্রিশ বছরের শাসনকে বহিঃশক্তির শাসন হিসাবেই তাঁরা অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবধারায় প্রভাবিত ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদার মনে করেন, কৈবর্তদের বরেন্দ্রী অধিকার করা প্রকৃত অর্থে তাদের নিজেদের ভূমি অধিকার করা, কারণ বরেন্দ্রীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তারাই-

> 'বরেন্দির ভূমিপুত্ররা বুকের রক্ত ঢেলে শত শত বৎসরের সংগ্রামের পরে নিজেদের মাটিকে মুক্ত করেছে দিব্যোকের নেতৃত্বে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই একবারই কোনো ভূখণ্ডের কৃষক-ভূমিপুত্ররা অর্জন করেছিল নিজেরাই নিজেদের জীবন নিজেদের মতো পরিচালনা করার অধিকার।'[১০]

উপন্যাসের প্রথম পর্বে মল্লর উদ্যোগে কামরূপে দেবদাসী ঊর্ণাবতীর কাছে শুরু হয়েছিল পপীপের বিদ্যাচর্চা। পপীপই হয়ে ওঠে নিরক্ষর কৈবর্ত সমাজের শিক্ষিত প্রতিনিধি। অন্ধ সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে কৈবর্ত সমাজে সে নিয়ে আসে শিক্ষার আলোকবর্তিকা। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে, তিন বছর ঊর্ণাবতীর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের পর পপীপকে রামশর্মা ফের ইক্ষুক্ষেতে শ্রমদান করতে নিয়ে যায়। এরপর পপীপ শিক্ষাগ্রহণ করে বাসুখুড়োর কাছে। বাসুখুড়োর কাছ থেকেই সে শোনে প্রাচীন কট্টলির ঐতিহ্যের কথা। মৃত্যুশয্যায় বাসুখুড়ো পপীপকে জানিয়ে যায়, পপীপের শিক্ষা ও জ্ঞান পপীপের অন্যতম অস্ত্র ও অবলম্বন --

> 'তার বুক আর মাথায় কাঁপা কাঁপা আঙুল ছুঁইয়ে বাসুখুড়ো বলেছিল-তোকে যে বিদ্যা দিয়েছে মল্ল, যে সাক্ষরতা দিয়েছে, বর্ণমালা পাঠের সক্ষমতা দিয়েছে, ঊর্ণাবতী তোকে যে শাস্ত্রপাঠ শিখিয়েছে, আর আমি দিয়েছি জীবনের যে পাঠ-সেগুলোই তোর পাথেয়। প্রতিকূল পৃথিবীতে সেগুলোই তোর প্রতিরোধের আয়ুধ। আর নিজের মানুষদের জন্য সেগুলোই তোর সবচেয়ে বড় উপহার-প্রতিদান।'[১১]

বাসুখুড়োর আশীর্বাদকে পাথেয় করে নিজের শিকড়ের টানে, নিজের দেশের মাটির আকর্ষণে কামরূপ ত্যাগ করে বরেন্দ্রীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে নিরক্ষর কৈবর্ত সমাজের প্রথম শিক্ষিত প্রতিনিধি পপীপ। বরেন্দ্রীতে পৌঁছে পপীপ প্রাণভরে অনুভব করতে থাকে নিজের জন্মভূমির ঘ্রাণ, বরেন্দ্রীর মানুষদের লৌকিক ভাষা। ঔপন্যাসিক নিপুণভাবে কৈবর্ত জাতির উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে মাথায় রেখে তাদের লৌকিক ভাষাকে দিয়েছেন ভিন্নতর রূপ, যেমন-'তুই কে রে বাপ?', 'কুথা থেকে আসছিস বটি?' ইত্যাদি৷ ছেলেবেলাতেই পপীপকে বরেন্দ্রী ত্যাগ করতে হয়েছিল বলে এবং ঊর্ণাবতীর কাছে শিক্ষাগ্রহণের ফলে কৈবর্ত পপীপের মুখের ভাষা হয়ে পড়েছিল বৈদিক ও সংস্কৃত ঘেঁষা, যা কৈবর্তদের লৌকিক ভাষা থেকে পৃথক। ফলে সে প্রতিমুহূর্তে প্রয়াস করে বরেন্দ্রীর উপভাষা, যা তার 'নিজের ভাষা', তা শিখে নেওয়ার এবং আপন জনজাতির অংশ হয়ে ওঠার --

> 'তুই তো কৈবর্ত জাতির মানুষ। কিন্তু কথা বলিস বেদী (বেদ পাঠকারী হিন্দু) আর নিগগন্থদের (বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিত) মতোন। কোথায় শিখলি বটি এমন ভাষা? মল্লকাকা, ঊর্ণাবতী, বাসুখুড়োর মুখ ভেসে ওঠে তখন পপীপের মনে। কিন্তু সে কোনো উত্তর দেবার আগেই আবার প্রশ্ন আসে-তুই কি কৈবর্তদের ভাষা বলতে পারিস না? কে বলেছে পারি না! এই যে বলছি বটি!'[১২]

পপীপ ধীরে ধীরে ঊর্ণাবতী ও বাসুখুড়োর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কৈবর্তদের মধ্যে প্রসারিত করতে শুরু করে। তাঁর এখন অন্যতম লক্ষ্য, কৈবর্ত সাম্রাজ্যকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত করা এবং সেইজন্যই কৈবর্ত নৃপতি ভীমের বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন পপীপের বর্ণমালার জ্ঞান। বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্ররা একদিন নিজেদের লৌকিক ভাষায় এবং সর্বোপরি নিজেদের বর্ণমালায় শ্লোক রচনা করবে, এ প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে পপীপ। এভাবেই একটি নিম্নবর্গ জনগোষ্ঠী উচ্চবর্গের প্রতিস্পর্ধীভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়ে ওঠে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে কৈবর্তদের এই উত্থানের প্রচেষ্টাকে ভারতবর্ষে সাবঅল্টার্নদের সর্বপ্রথম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নির্মাণের উদ্যোগ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। মল্ল পপীপকে উদ্বুদ্ধ করে রাজপক্ষপাতদুষ্ট কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বিপরীতে কৈবর্তদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য রচনা করতে। উচ্চবর্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের নিজস্ব লোকসাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ-রীতিনীতি টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে একদিকে যেমন লড়াই ভীম ও রামপালের, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক পরিসরে সংগ্রাম সন্ধ্যাকর নন্দী ও পপীপের। যে এই লড়াই জিতবে, তার কাব্য হবে কালোত্তীর্ণ, সুতরাং ভীমের রামপালকে পরাজিত করার থেকে অনেক গুরুদায়িত্ব এখন পপীপের, কারণ এ সংগ্রাম উত্তরপ্রজন্মের কাছে 'বিকৃত ইতিহাস'-এর পরিবর্তে বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্রদের 'প্রকৃত ইতিহাস' লিখে যাবার সংগ্রাম --

> 'মল্ল বলে-কৈবর্ত জাতি এই প্রথম একজন কবিকে পেয়েছে পপীপ। সে তুই। সন্ধ্যাকর নন্দী কাব্যরচনা করে কৈবর্তজাতির মুক্তিদাতা দিব্যোকের নামের সাথে যেসব কুৎসিত বিশেষণ যোগ করে দিচ্ছে, তার প্রতিবিধান করার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। পুরো কৈবর্তজাতি তাই নিজেদের একজন কবির আগমনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তুই সেই কবি পপীপ। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যে দিব্যোক আর কৈবর্তজাতি সম্বন্ধে যেসব কুৎসিত কথা আছে, সেগুলোর যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে কাব্য রচনা করতে হবে তোকে। তোকেই করতে হবে পপীপ।কারণ আমাদের আর কেউ নেই। পপীপ ঘাবড়ে যায়-এত বড় দায়িত্ব! আমি কি পারব মল্লকাকা? তোকে পারতেই হবে পপীপ। ভীম যদি হেরে যায় রামপালের কাছে, তাতে যতটা ক্ষতি হবে এই মাটির সন্তানদের, তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে যদি তুই সন্ধ্যাকর নন্দীর কাছে হেরে যাস। কারণ, সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য হাজার বছর পরেও এদেশের ভূমিপুত্রদের ছোট করে রাখবে মানুষের কাছে।'[১৩]

পপীপ মল্লর সঙ্গে ভীমের কাছে পৌঁছোয়, ভীম তাকে কাব্যরচনার জন্য গোলযোগবিহীন একটি নির্জন স্থানে তার বাসস্থানের আয়োজন করতে চাইলে পপীপ স্পষ্টতই জানায়, সে রূঢ় বাস্তবের কবি, নির্জনে থেকে কাব্যসাধনা করলে সে সত্য থেকে বিচ্যুত হবে। পপীপ কৈবর্ত জাতির অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামেও অবতীর্ণ হতে চায়। ভীম তাতে রাজিও হন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রামপাল ও মথনদেবের সঙ্গে ভীমের চুক্তি হয় উভয়পক্ষই প্রকৃত নিয়ম মেনে যুদ্ধ করবে, কোনওরকম হীন কাজ বা অসততার আশ্রয় কোনও পক্ষই নেবে না। কিন্তু প্রাথমিকভাবে কৈবর্তদের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হলে রামপাল দুরভিসন্ধি ও ছলের আশ্রয় নেন, ন্যায়যুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করে গভীর রাতে কৈবর্তদের তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ করে পাল সৈন্যরা। রামপালের এই হীন আচরণে পপীপ আর স্থির থাকতে পারে না, কলম ফেলে তরবারি হাতে তুলে নেয় সে, 'কবি পপীপ' হয়ে 'যোদ্ধা পপীপ'। যদিও বেশিক্ষণ অসম লড়াইয়ে সে টিকতে পারে না, দ্রুত পরাজিত হয়। নিজেদের জন্মভূমির ওপর ভূমিপুত্রদের অধিকার খর্ব হয়, বরেন্দ্রী পুনরায় অকধিকৃত হয় 'বহিরাগত' পাল নৃপতিদের। অসদুপায়ে হীন পন্থা অবলম্বন করে যুদ্ধ জয় করা প্রতারক রামপালকে মৃত্যুমুখী ভীম জানিয়ে দেয়, আর্য জাতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে জারজ সন্তানদের ইতিহাস, যে ঘৃণ্য জাতির যোগ্য উত্তরসূরী রামপাল --

> '.....ভীম সেই রকম কষ্ট করেই বলতে থাকে-জারজ অর্জুনের বংশধর তুই। তোদের জন্মের ঠিক নেই। তাই তোদের মুখের কথারও কোনো ঠিক নেই। তুই আসলেই অর্জুনের বংশধর। এই কথাটা জানানোর জন্যই এখনো বেঁচে রয়েছি আমি।'[১৪]

উপন্যাসের সমাপ্তিতে জাকির তালুকদার এক অভিনব চিত্রকল্প রচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বরেন্দ্রীর প্রকৃত ভূমিপুত্রদের মৃত্যুর পর আকাশে-বাতাসে হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে এ মাটির অন্যান্য আদি অধিবাসীদের। কৈবর্ত-ভিল-শবর-রাজবংশীদের সেই ভিন্ন ভাষার আর্তনাদগুলি ক্রমে সম্মিলিত হয়ে রূপ নেয় বাংলা ভাষার এবং পরবর্তীকালে এই ভূমিপুত্ররাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, যার ইঙ্গিত রয়েছে বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদের ৪৯ নং পদে, যে পদে ভুসুকুপাদ নিজেকে অভিহিত করেছেন 'বাঙ্গালী' হিসাবে-'আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলি'। এভাবে বরেন্দ্রভূমির পুত্র কৈবর্তদের ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্ম নেয় নতুন দিনের আশার আলো, ভূমিপুত্রদের সম্মিলিতভাবে ভাষার ভিত্তিতে একটি 'জাতি' হয়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়।

'পিতৃগণ' উপন্যাসটি জাকির তালুকদার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উপন্যাস। একাদশ শতাব্দীর কৈবর্ত বিদ্রোহকে তিনি ভিন্নধারার দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন। জাকির তালুকদার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্রদের উত্তর প্রজন্ম হিসাবে মনে করেছেন। এই উপন্যাসটি যেন প্রত্যেক বাঙালির পূর্বসূরী বরেন্দ্রভূমির নিজস্ব সন্তান দিব্যোক, রুদোক ও ভীমের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধাঞ্জলি। জাকির তালুকদার কোথাও একথা বলতে

কার্পণ্যবোধ করেননি যে, দিব্যোক ও ভীমসহ কৈবর্তরা তাঁর 'পিতৃগণ', এই মাটি প্রকৃতপক্ষে কৈবর্তদেরই জন্মভূমি, পালরাজারা সেখানে বহিরাগত আর্যদের বংশধর, যে আর্য জাতি উরাল পর্বত পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং ধীরে ধীরে তাদের বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা ভারতের বিভিন্ন জনজাতির বৈচিত্র্যময় লোকসাংস্কৃতিক আঙ্গিকগুলিকে গ্রাস করেছে। পরবর্তী সময়ে নিজের দেশের ওপর নিজেদেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভূমিপুত্ররা আর্যদের লিখিত সাহিত্যে চিহ্নিত হয়েছেন দস্যু হিসাবে এবং বিদ্রোহী হিসাবে। এ প্রসঙ্গে এহসান মাহমুদকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জাকির তালুকদার জানিয়েছেন, অনেকের মতে মুক্তির জন্য তথা স্বাধীনতার জন্য বাঙালির সংগ্রামের সূচনা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে, যেদিন শেখ মুজিবর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, প্রকৃত অর্থে মুক্তির দাবিতে বাঙালির লড়াই বহু প্রাচীন, ১৯৭১ এর প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকেই। সেই সময়ে 'বহিরাগত' পাল নৃপতিদের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্র কৈবর্তদের সংগ্রামকে জাকির তালুকদার বাঙালির প্রথম মুক্তি আন্দোলনের স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৫] সুতরাং বলা যায়, মূলধারার ইতিহাসের বিপরীতে ঔপন্যাসিক জাকির তালুকদারের নির্মিত ভিন্ন এই দৃষ্টিকোণ প্রাগাধুনিক বঙ্গদেশের ইতিহাসচর্চার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, রাজশেখর (সংকলিত), 'চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান , এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা-১২, সপ্তম সংস্করণ-১৯৩৭, পৃ. ১২২।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রথম খণ্ড॥অ-ন', সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী-১, প্রথম প্রকাশ-১৩৪০-১৩৫৩, পৃ. ৬৮০।

৩. ওদুদ, কাজী আবদুল (সংকলিত), 'ব্যবহারিক শব্দকোষ বাংলা ভাষার অভিনব অভিধান', প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৭৩, ১৩৫৬, পৃ. ২০৯।

৪. তালুকদার, জাকির, 'পিতৃগণ', রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ-একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ৯।

৫. ওই, পৃ. ১৩।

৬. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯, সপ্তম মুদ্রণ-নভেম্বর ২০১২, পৃ.৩।

৭. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'বাঙালীর ইতিহাস', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১, জুন ১৯৬০, পৃ. ১২৩।

৮. তালুকদার, জাকির, 'পিতৃগণ', রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ-একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ১৭৭।

৯. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, 'বাংলা দেশের ইতিহাস: প্রাচীন পর্ব', জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ-ফাল্গুন ১৩৫২, পৃ. ৬৫।

১০. তালুকদার, জাকির, 'পিতৃগণ', রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ-একুশে বইমেলা ২০১১, পৃ. ১৭৯।

১১. ওই, পৃ. ১৮৩।

১২. ওই, পৃ. ১৯১।

১৩. ওই, পৃ. ২৩৫।

১৪. ওই, পৃ. ২৯৮।

১৫. 'আমি লেখার বিষয় সংকটে ভুগিনি : জাকির তালুকদার', এনডিটিভি অনলাইন, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ১২:২১।

আকর গ্রন্থ-

১. তালুকদার, জাকির, 'পিতৃগণ', রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ-একুশে বইমেলা ২০১১।

সহায়ক গ্রন্থ

১. ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার, 'গৌড় কাহিনী', ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬, ১৩৫৭।

২. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত, 'গৌড়ের ইতিহাস (দুই খণ্ড একত্রে)', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ-কলকাতা পুস্তকমেলা-জানুয়ারি ১৯৯৯।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত: প্রথম খণ্ড', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ-১৯৫৯।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, 'বাঙ্গালার ইতিহাস: প্রথম খণ্ড', মনোমোহন প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, ১৯৬০।

৫. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯, সপ্তম মুদ্রণ-নভেম্বর ২০১২।

৬.মজুমদার, রমেশচন্দ্র, 'বাংলা দেশের ইতিহাস: প্রাচীন পর্ব', জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ-ফাল্গুন ১৩৫২ ।

৭. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'বাঙালীর ইতিহাস', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১, জুন ১৯৬০।

৮.রায়, নীহাররঞ্জন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৩৫৬।

....

গবেষক , বাংলা বিভাগ , ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

‘পথের পাঁচালী’ সাহিত্য ও চলচ্চিত্র: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ড. মানিক বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ-

বিভূতিভূষণ–সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’ দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে এক হাভাতে বাঙালীর আত্মকথনের গল্প। মা-মেয়ে,ঘরের হাঁড়ি–কুড়ি,নারকোল-মালা, হাসিখুশি, জীবন যন্ত্রণা থেকে ঘাস জল মাঠ বন পরিব্যাপ্ত এক সংসার।‘পথের পাঁচালী’-র হরিহর, অপু-দুর্গা, কিম্বা ইন্দিরা ঠাকরুনকে সত্যজিৎ সেইভাবে তুলে আনলেন তাঁর শিল্প কর্মে যা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আড়ালে ছিল। এ যেন আমাদের জীবনেরই গল্প সাহিত্যে বুনেছেন বিভূতি আর তাকে আমাদের সামনে ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ। সত্যজিৎ রায় এমনই একটি নাম যিনি বাংলা সাহিত্যের কিছু সৃষ্টিকে অমর করে দিয়েছেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ সেরকম এক সাহিত্য। ‘পথের পাঁচালী’ এমনই এক সাহিত্য যাকে পাঠক যখন পড়ে তখন এর স্বাদ এক আবার চলচ্চিত্রে যখন এটিকে দেখে তখন তার স্বাদ আলাদা। সত্যজিৎ লিখছেন, এমন কোনো ঘটনা বা বস্তুর ছবিতে স্থান নেই,যা কাহিনিতে আছে কিন্তু ছবিতে তা আবশ্যিক নয়। খুব সুন্দর কোনো দৃশ্য হাতে আছে,তাই তাকে ছবিতে রাখতে হবে, এমন বিশ্বাসে তিনি ছবি করেন না। যুক্তিবাদী ছবির এটাই প্রধান যুক্তি; আখ্যানের ব্যাকরণে কোনও বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। তাই বিভূতির ‘পথের পাঁচালী’-তে শুধু কি এই আঁটোসাঁটো কাহিনিকে পাই? নাকি সত্যজিতের চলচিত্রে সেই আখ্যানের সংহতির মধ্যে ঢুকে পড়ছে এক ধরনের পুনরাবিষ্কার। সত্যজিৎ সরাসরি বিভূতিভূষণের উপন্যাস থেকে তুলে এনেছেন তাঁর এই অভিনব কৌশল। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে চরিত্র কেন্দ্রিক গল্প বলা, ব্যক্তি চৈতন্যের বিবর্তনের কাহিনিকে অতিক্রম করে পরিবেশকে স্পর্শ করা যায়। সেই পরিবেশ নতুন স্পর্শ পেয়ে শুধু পটভূমি হয়ে থাকে না। হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়ময় ও জীবন্ত । ‘পথের পাঁচালী’ এমন একটি কাহিনি যা একই সময়ে বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে পরিপূর্ণতা এবং সত্যজিতের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নতুন উত্তরাধিকার পায়। এটি একটি পুনরাবৃত্তির গল্প, যেখানে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শব্দগুলির জীবন্ত আদান-প্রদান হয়, যা বিভূতিভূষণের কাহিনিকে ফুটিয়ে তোলে। সাহিত্যের পাঠক এবং চলচ্চিত্রের দর্শক, যখন দু'টি মাধ্যমে এই কাহিনি অনুভব করে, তখন তারা একই ঘটনার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সংস্করণের মুখোমুখি হয়। এটি সত্যজিতের অতীত থেকে নতুন জ্ঞানের মাধ্যমে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি। যার ফলে ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস হয়ে ওঠে মানুষের সংসার এবং মানবতার পুনরাবৃত্তির গল্প।

মূলশব্দ-

বাংলা সাহিত্য, চলচ্চিত্র, বিবর্তন, আত্মকথন, আঁটোসাঁটো কাহিনি, সংসার, মানুষের জীবন, মানবতা, স্বাদ, পুনরাবৃত্তি।

মূলপ্রবন্ধ -

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র শিল্প সৃষ্টির দু’টি মাধ্যম। সাহিত্যে একটি চরিত্র পাঠকের কাছে বিচার্য হয় অনেকখানি লেখকের সাপেক্ষতায়। আবার চলচ্চিত্রে সেই চরিত্র জনপ্রিয়তা পেয়েছে ভালো পরিচালকের স্বকীয় ভাবনায়। মাধ্যম দু’টি, দেখার দৃষ্টিভঙ্গীও দু’রকম। চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যাম যা সমাজের কথা বলে। আসলে কোনও চলচ্চিত্রই সমাজ ও সময়ের বাস্তবতাকে সচেতন বা অবচেতনভাবে উপেক্ষা করতে পারে না। চলচ্চিত্র একটি শিল্প মাধ্যম যার সৃজনশীলতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সময়ের ভাবনা, সংকট, দর্শন, ধর্ম, সীমাবদ্ধতা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

অন্তর্নিহিত থাকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপধ্যায়-এর কালজয়ী উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’-এর সার্থক চলচ্চিত্রায়ন করেন সত্যজিৎ রায় ১৯৫৫ সালে। উপন্যাসের সময়কাল ১৯২৯। বিভূতি বাবু সেই সময়ের বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের জীবন-সংগ্রামের এক অনন্য ছবি তুলে ধরেন তাঁর উপন্যাসে। আর সেই ভাবনাকে অনুধাবন করে সত্যজিৎ রায় সেই মানুষদের বিশ্ব দর্শকের কাছে নিয়ে এলেন।

সাহিত্যে যে বিষয় আমাদের সামনে জ্বলজ্বল করে চলচ্চিত্রে তা নাও হতে পারে। সেখানে এমন কিছু মুখ্য হয়ে ওঠে যা চিত্র পরিচালককের নিজস্ব ভাবনা । তেমনি ঘটেছে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সাহিত্যের বিচার ও চলচ্চিত্রের বিচার একই মানদণ্ডে হয় না। তাই উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে তেমন আছে অনেক বৈসাদৃশ্য। দু’টি মাধ্যমের ক্ষেত্রে গল্পের ভূমিকা রয়েছে অপরিসীম। আর এই গল্প গড়ে ওঠে অবশ্যই বিচিত্র ধর্মী চরিত্র ও ঘটনাকে আশ্রয় করে। এই ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে দিয়েই লেখক কিংবা পরিচালক তাদের নিয়ম ভেঙে সামনে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। যার ফলে সমাজ সংসারে তাদের দাবি ভিন্ন হয়ে ওঠে। পাঠক বা দর্শকের সংযোগ মাধ্যম হিসেবে দু’টি মাধ্যমেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। তবে একথা দর্শকমাত্রই স্বীকার করেন যে উপন্যাসের থেকে চলচ্চিত্রের আবেদন অনেক বেশি। এর কারণ অবশ্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। চলচ্চিত্র একটি মিশ্র বা ‘Composite art’; তাকে তুলে ধরতে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন কলাকৌশলের। একথা অনস্বীকার্য যে কিছু সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন কোনও ভালো উপন্যাস বা গল্পের প্রয়োজন হয় তেমনি সেই উপন্যাসের কাহিনিকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দিতে পারেন একজন দক্ষ পরিচালক। বিভুতির ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটিই সত্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের যে দিকগুলি সেভাবে ফুটে ওঠেনি, সেগুলিকে সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কাহিনিকে নিজের রঙে রাঙিয়ে নিয়েছেন। অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস সম্পর্কে একটি লেখায় বলেছিলেন--

> “পথের পাঁচালী অপুর জীবনের দলিল’ : Document of Life; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে বাধা কী যে, আমাদের অনেকেরই গতজীবনের দলিল গাঁথা হয়ে গেছে তার মধ্যে ? গতজীবনের, কেননা, এই উপন্যাস এক বালকের অভিজ্ঞতা, গতজীবনের কেননা আমাদের দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া এক গ্রামের ছবি এর চিত্রপট; গতজীবনের কেননা, থেকে থেকে কোন আদি প্রকৃতির দিকে এ আমাদের টান দেয়।” [১]

এ যেন আমাদের জীবনেরই গল্প সাহিত্যে বুনেছেন বিভূতি আর তাকে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ। সত্যজিৎ রায় এমনই একটি নাম যিনি বাংলা সাহিত্যের কিছু সৃষ্টিকে অমর করে দিয়েছেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ সেরকম এক সাহিত্য। ‘পথের পাঁচালী’ এমনই এক সাহিত্য যাকে পাঠক যখন পড়ে তখন এর স্বাদ এক আবার চলচ্চিত্রে যখন এটিকে দেখে তখন তার স্বাদ আলাদা। কারণ উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের একটি প্রকরণগত পার্থক্য থাকে। আর এই কারণে উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান করতে গেলে প্রয়োজন হয় চিত্রনাট্যের। এই চিত্রনাট্যই হচ্ছে চলচিত্রের প্রাণ। একে রূপদান করার সময় পরিচালক কাহিনির নাট্যধর্মের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। উপন্যাসে যেখানে লেখকের বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ থাকে সেখানে চলচিত্রে তা থাকে না। কারণ দর্শক ধরে রাখার বিষয়টি চলচ্চিত্রে বা নাটকে কাজ করে। তাই পরিচালক সেই বিষয়কে মাথায় রেখেই চিত্রনাট্য তৈরি করে থাকেন। বিভূতিভূষণের এইপথের পাঁচালী উপন্যাসের চিত্রনাট্য সত্যজিৎ নিজেই তৈরি করেছিলেন। সত্যজিৎ যেহেতু একজন সাহিত্যিক তাই সাহিত্যের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখেই ‘পথের পাঁচালী’র ঘটনা ধারাকে কিছুটা সংযোজন ও পরিমার্জন করে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে, আর সত্যজিৎ তাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন ১৯৫৫ সালে। একটি স্বাধীনতার আগে আরেকটি স্বাধীনতা পরে। মুক্তির আনন্দ বোধ হয় অনেক বেশি ধরা পড়েছিল সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'-তে । সত্যজিৎ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রগুলির পরিচয়কে অক্ষত রেখে এবং চলচ্চিত্রের শিল্পকে মাথায় রেখে চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন। উপন্যাসে দেখি কাহিনির তিনটি পর্ব। এর মধ্যে চলচ্চিত্রকার দু'টি পর্ব অর্থাৎ 'বল্লালী বালাই' ও 'আম আঁঠির ভেঁপুর' কাহিনিকে নিয়েছেন। পরের পর্ব অর্থাৎ তৃতীয় পর্বে 'অক্রুর সংবাদ'-কে তিনি বাদ দিয়েছিলেন। সত্যজিতের এই চিত্রনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অপু ও দুর্গার জীবনকে পর্দায় ফোকাস করা আর তিনি সেটাই করেছেন। শুধু এখানেই নয়, তিনি অনেক ক্ষেত্রে মূল উপন্যাসের কাহিনিকে কাঁটা ছেঁড়া করেছেন। বিভূতির 'পথের পাঁচালী'-র কাহিনি ধীরস্থির ভাবে বিন্যস্ত। সেখানে ছোট ছোট কাহিনিও এক অন্য মাত্রা দান করেছে। কিন্তু চলচ্চিত্রে সবকিছুকে ধরা সম্ভব নয় কারণ সেখানে সময় সীমিত। এই কারণেই পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে চরিত্রকে যেমন নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন তেমনি কাহিনির বিস্তারকেও কমিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসে কাহিনির বিস্তার মাঝেমাঝে নিশ্চিন্দিপুরের বাইরে এসেছে । কিন্তু সত্যজিৎ কাহিনিকে শুধু নিশ্চিন্দিপুরের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। তিনি 'পথের পাঁচালী'র শেষ কাহিনিকে তাঁর চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে যোগ করেননি। এই কারনে উপন্যাসের বেশিরভাগ বর্ণনাকে কমিয়ে তিনি হরিহর ও তার পরিবারের অন্যদের নিয়ে একটি সংহত কাহিনির চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন সেই কারণে সত্যজিতের কাহিনিতে নিশ্চিন্দিপুরের গোকুলের বউ, নীরেন, অমলা, গুলকী, ইন্দিরা ঠাকরুণের জামাতা চন্দ্র মজুমদারকে দেখতে পাই না। তেমনি অপুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পটু এবং তার সঙ্গে জড়িত ঘটনা সমূহ যেমন নৌকা বিহারের কাহিনিগুলি সত্যজিতের চলচ্চিত্রে স্থান পায়নি। সাহিত্যে যে পরিসর থাকে চলচ্চিত্রে তা থাকেনা বলেই সত্যজিৎ এ অংশগুলিকে বাদ দিয়েছেন।

উপন্যাসের ঘটনায় পাঠককে সবথেকে বেশি যে কাহিনি আনন্দ দান করে, তা ইন্দিরা ঠাকরুণের ইতিহাস বর্ণনা। এই বর্ণনায় পাঠক জানতে পারে হরিহরের পূর্বপুরুষের কাহিনি ও নিশ্চিন্দিপুরের ইতিহাস। চলচ্চিত্রে এধরণের ইতিহাস বর্ণনায় কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে সত্যজিৎ মনে করেননি। কারণ তিনি সমকালীন সময়ের অর্থনীতি ও হরিহরের পেশার মধ্যে দিয়েই সে সময়কে ধরতে চেয়েছেন বলেই মনে হয়। যে জিনিস দর্শক অনুভব করতে পেরেছে তাকে পুনরায় বলার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তিনি শুধু একটি কাজ চলচ্চিত্র করেছেন তা হল ইন্দিরা ঠাকরুণের ভূমিকাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। কারণ উপন্যাসে দেখি অপুর জন্মের কিছু পরেই ইন্দিরা ঠাকরুণের মারা যান। আর চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অপুর ছ'বছর বয়স পর্যন্ত। এইরূপ বহু পার্থক্য মূল উপন্যাস থেকে সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন পরিচালক সত্যজিৎ। গল্পের এই বাঁক প্রসঙ্গে তাঁকে অনেক সময় বিভিন্ন প্রশ্নের এবং সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। একবার একটি আলোচনায় সত্যজিৎ লিখেছেন-

> "পথের পাঁচালী' চিত্রনাট্যের কোনও কোনও দৃশ্যে উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে পার্থক্য আছে। চুনিবালার কোনটিতেই আপত্তি ছিল না- কেবলমাত্র ইন্দিরার মৃত্যু দৃশ্যটি ছাড়া। তিনি বল্লেন 'বই' এ আছে বুড়ি চণ্ডীমণ্ডপে মরেছে। আপনি দেখাচ্ছেন বাঁশবনে। ধার্মিক বুড়ি- তার কি বাঁশবনে মরাটা ভালো দেখায়? তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, বাঁশবনে আচমকা মৃতদেহের আবিষ্কার অপু-দুর্গার শিশুমনে যে ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, ছবি ও নাটকের দিক দিয়ে তার মূল্য অনেক। চুনিবালা আর কিছু বললেন না। দৃশ্যটিতে আছে, দুর্গা বুড়িকে হাটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকতে দেখে তাকে ঘুমন্ত মনে করে, তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়; কিছুক্ষণ বসা অবস্থায় থেকে হঠাৎ টাল হারিয়ে বুড়ির মৃতদেহ ধপ করে মাটিতে পড়ে।" [২]

উল্লেখ্য সত্যজিতের চুনিবালা মুলত তাঁরই চলচ্চিত্রে ইন্দিরা ঠাকরুণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এ শিল্প ভাবগম্ভীরতা, ভাষায় নতুন কিছু শেখায়। আর সত্যজিৎ ও সেই ধারারই পরিচালক। ছোট্ট অপু ও দুর্গার যে মানসিক পরিস্থিতি ইন্দিরা ঠাকরুণের মৃত্যুতে তা খুব সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত করেছেন। শুধু সেখানেই শেষ নয়, কাহিনির প্রয়োজনে তিনি ইন্দিরা ঠাকরুণের অনেক বেশি আধুনিকীকরণ করে তুলেছেন। তার চরিত্রের বিবর্তন ঘটিয়ে তার কণ্ঠে গান দিয়েছিলেন। যেটা বিভূতিভূষণের মূল উপন্যাসে নেই। এর পাশাপাশি ইন্দিরা ঠাকরুণের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি শবযাত্রার একটি দৃশ্যও চিত্রায়ন করেছিলেন। যেটা বিভূতিভূষণ দেখাননি। একটি যুগের পতনের যে শব্দ তিনি ইন্দিরা ঠাকরুণের মৃত্যু দৃশ্যে দর্শকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে পাঠক হিসাবে আমরা একথা বুঝতেই পারি যে উপন্যাসের বিস্তৃত বর্ণনা যেটা পারে না সেটা অবশ্যই চলচ্চিত্রের নিরব মুহূর্ত করে দেখায়। সত্যজিৎ এই ভাবেই তাঁর 'পথের পাঁচালী'-কে নিজের কাহিনিতে রূপান্তরিত করেছেন।

শুধু ইন্দিরা ঠাকরুণের ক্ষেত্রে নয়, সত্যজিতের চলচ্চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দুর্গা। যে দুর্গাকে বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে প্রথমে স্থানই দেননি। সেই দুর্গাকে নিয়ে সত্যজিৎ অন্যভাবনার খেলা খেললেন। মূলগ্রন্থের কাহিনির সঙ্গে দুর্গা চরিত্রের আমূল পার্থক্য রয়েছে চলচ্চিত্রে। উপন্যাসের দুর্গা কোনদিন রেলগাড়ি দেখেনি। তার পরিচয় পাই অপুর স্মৃতিচারণায়- 'অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরোনো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা- অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?' উপন্যাসে দুর্গার এই অপূর্ণ ইচ্ছা বিভূতিভূষণ পূরণ করতে না পারলেও তার দুর্গাকে অপুর হাত ধরে গরু খুজতে গিয়ে রেলগাড়ি দেখাতে পেড়েছিল। উপন্যাসে দেখি দুর্গা পুঁথির মালা চুরি করে ধরা পড়েছিল। এ কারণে সেজো ঠাকরুণের কাছে তাকে খুব হেনস্তা হতে হয়েছিল কিন্তু সত্যজিৎ সুকৌশলে চলচ্চিত্রে বিষয়টিকে রেখেছেন কিন্তু পুঁথির মালা দুর্গার কাছে পাওয়া যায়নি। তবুও সর্বজয়া তাকে ফল চুরি করার অপরাধে খুব মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। পরে অবশ্য সে আরেকবার চুরি করেছিল সেটি রানুদের বাড়িতে। যেটি ছিল সোনার সিঁদুর কৌটো, এটি অবশ্য চলচ্চিত্রে নেই। তবে এই ঘটনা দু'টিকে একত্রিত করে সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে দেখালেন; অপু ঝোলানো একটি মাটির পাত্র থেকে টুনুর পুঁথির মালাটি খুঁজে পেয়েছিল এবং তা ছুড়ে ফেলেছিল একটা পানা পুকুরে। আসলে এটি উপন্যাসে ছিল সিঁদুরের কৌটো, যেটা অপু নিশ্চিন্দিপুর থেকে চলে যাওয়ার আগে খুঁজে পেয়েছিল এবং সেটি বাঁশবাগানে ছুড়ে ফেলেছিল। সত্যজিৎ শিল্পী তাই এই অপকর্মটি খুব সুন্দরভাবে পানাপুকুরের সবুজ আস্তরণে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যজিৎ কোনোভাবে চাননি দুর্গার যে চিত্র দর্শকের সামনে রয়েছে তাকে ম্লান করতে। এই কারণেই তিনি এই চুরির বিষয়টি খুব নাটকীয়ভাবে তার চিত্রনাট্যে উপস্থাপন করেছেন। সত্যজিৎ 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনকে যেমন নারীর সবগুন দিয়ে মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী বানিয়ে তুলতে পেরেছেন, এখানে ঠিক অন্যভাবে দুর্গাকে অপুর সমস্ত কাজের সঙ্গী ও অকৃত্রিম স্নেহের উপকরণ করে তুলেছেন। এই দুর্গা বয়সে বড় হলেও সত্যজিৎ তার মধ্যে শিশু মনস্তত্ত্বের গুণাবলী বেশি আরোপ করেছিল। সেই কারণেই উপন্যাসে দুর্গার কাহিনিকে অনেকটাই পরিবর্তন করে চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। এটি ছিল তার সতর্ক ও সচেতন একটি প্রয়াস।

দুর্গা চরিত্র প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় সত্যজিৎ আড়ালে রেখেছেন, তা হল উপন্যাসে দুর্গা- নীরেনের একটি সম্পর্কের কথা বিভূতি বলেছেন, যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন দুর্গা নীরেনকে পছন্দ করছে। তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। অন্যদিকে গোকুলের বৌ নীরেনের কাছে বিবাহের প্রস্তাবও রেখেছিল। তারপরে দুর্গার সঙ্গে নীরেনের পথে দেখা হয় দুর্গা তাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, এমনই রোমান্টিক একটি দৃশ্য বিভূতি তুলে ধরেছিল উপন্যাসে। দুর্গা সম্পর্কে অনেক কথায় নীরেনের কণ্ঠে শোনা যায়। এমনকি অপুর মুখেও নীরেনের সঙ্গে তার দিদির বিয়ের কথা শোনা যায়। অপু বলে "একটা কথা বলব দিদি? তোর সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের বিয়ে হবে" অবশ্য একথা শুনে দুর্গা লজ্জা বোধ করেছিল। এই প্রণয়ের কাহিনি সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রের তুলে ধরেননি। তার কারণ অবশ্য ভিন্ন। 'পথের পাঁচালী' তে

দেখাতে চেয়েছেন অপু-দুর্গার শিশু সুলভ মনস্তত্ব। সেখানে এই প্রনয়ের কাহিনি সত্যিই অবাঞ্ছিত। যা তার মূল কাহিনির রেশটাকে নষ্ট করে দিত বলে মনে হয়। তাই তিনি সচেতনভাবে এই অংশটি তাঁর 'পথের পাঁচালী' থেকে বাদ দিয়েছিলেন। তবে তিনি যে বিষয়টিকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা দুর্গার মৃত্যু। হরিহর বাড়ি ফেরার পত্র দেয় স্ত্রীকে। খুব শীঘ্রই সে বাড়ি ফিরছে এবং ভালো খবর নিয়ে। হরিহর রানাঘাটের বাজার থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য জামাকাপড় কিনেছিলেন। সামনে দুর্গাপুজো, দুর্গা লাল পাড়ের কাপড় পড়তে ভালোবাসে। সেই কারণে হরিহর দুর্গার জন্য লাল পাড়ের কাপড় আর কিছু গৃহস্থলীর টুকিটাকি জিনিস নিয়ে বাড়ি এসে ডাকলেন- 'ও মা দুগগা- ও অপু' অন্যদিন তাঁর গলা শুনে ছেলে মেয়েরা ছুটে আসত। আজ সর্বজয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিভূতি তার উপন্যাসে দেখাচ্ছেন সর্বজয়া বাড়ির কুশলের কোনও সংবাদ না দিয়েই স্বামীকে ঘরে এসে বসতে বললেন। স্ত্রীর এই রূপ শান্তস্বভাব দেখেও হরিহরের মনে খটকা লাগেনি আর তা লাগার কথাও নয়। সে জানত এখনই তার ছেলেমেয়েরা ছুটে আসবে। তারপর ধীরে ধীরে কেনা জিনিসগুলি যখন পুটলি থেকে বের করতে লাগলেন তখন সর্বজয়া আর কোন মতেই কান্না চাপতে পারলেন না। উচ্ছ্বাসিত গলায় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল 'ওগো দুগগা কি আর আছে গো- মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে গো- এতদিন কোথায় ছিলে'।

এই দৃশ্যটিকে সত্যজিৎ পুনর্নির্মাণ করলেন চলচ্চিত্রের ঢঙে সেখানে হরিহর অপু ও দুর্গাকে ডাকতে ডাকতে রাস্তা দিয়ে আসেন। 'অপু......দুগগা' এরপর বাড়িতে ঢুকে ডাকলেন – 'খোকা- দুগগা' এই আওয়াজ শুনে স্ত্রী সর্বজয়া বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে ঘরে আসতে বলেন। সর্বজয়াকে জিজ্ঞাসা করেন – 'কেমন আছো।' রানাঘাটের চরকের মেলা থেকে যে জিনিস নিয়ে এসেছে তা দেখতে বলেন। এইসময় হরিহর দুর্গার জন্য আনা লালপাড় দেওয়া শাড়ি সর্বজয়াকে দেখতে বলেন। তার পরের চিত্রটি শুধুই কথাহিন ছবি। সেখানে সত্যজিৎ মিউজিক এর মাধ্যমে বাকি সংলাপ শুনিয়ে দিয়েছেন। হরিহর বুঝতে পারলেন দুর্গা আর নেই, দুজনেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন শুধু হরিহরের মুখে দুর্গা দুর্গা শব্দ। এরূপ সিনেমাগ্রাফি বোধ হয় সত্যজিৎ এর দ্বারাই সম্ভব। তিনি দর্শকের মেজাজ বোঝেন। কোথায় থামতে হবে তিনি জানেন। বিভূতি রচনা করেছেন সাহিত্য আর সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করলেন চলচ্চিত্র। একজনের অন্যতম হাতিয়ার ভাষা আর অন্যজন নিলেন দৃশ্য সংলাপ এবং নাট্যক্রিয়া। প্রিয়জনের বিয়োগের ঘটনার বর্ণনা দুজনের দুরকম। এখানেই দুই শিল্পের ভিন্নতা।

শুধু চরিত্র, ঘটনা বা কাহিনিকেই তিনি নতুনত্ব দেখিয়েছেন তা নয়, তাঁর 'পথের পাঁচালী'-তে সত্যজিৎ বহু নতুন কিছুকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। হরিহরের পত্র পেয়ে সর্বজয়ার মুখে যে হাসি তাঁর যে আনন্দ শুধু সেইটুকু বোঝানোর জন্য তিনি প্রায় দুই মিনিট ধরে সঙ্গীতের সাহায্যে জলের মধ্যে জলপোকাদের যে খেলা দেখালেন তা সত্যিই অনবদ্য। এদৃশ্য বোধহয় পাঠক হিসাবে সাহিত্যে পাওয়া খুব কঠিন। এটি পড়ার আনন্দ নেই, দেখাতেই আনন্দ। প্রকৃতি যে এতো সুন্দর হতে পারে, তা সাহিত্য পাঠে যতটা অনুভূতি আসে তার থেকে বেশি এসেছে এই চলচ্চিত্রে। পরিচালক সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণের অমরসৃষ্টিকে আরো বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন আমাদের সামনে। আমরা খুব সহজেই পৌঁছে যায় অপু দুর্গার ছোট্ট বেলায়। সবথেকে বেশি যে দৃশ্যটি দর্শককে আকৃষ্ট করে তা হল অপু-দুর্গার ট্রেন দেখার চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। আর একটি কথা না বললেই নয় তা এর সংগীত ভাবনা। অসাধারণ ভঙ্গিতে সত্যজিৎ এ ছবির সঙ্গীতকে প্রাণ দান করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। যা আমাদের কাছে এক নতুন পাওয়া বলে মনে হয়। বিভূতির উপন্যাস আর সত্যজিতের চলচ্চিত্র দু'টির কাহিনি এক থাকলেও স্রষ্টার সৃষ্টিতে শিল্পে ভিন্ন হয়ে উঠল।

তথ্যসূত্র-

১। গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ (সম্পাদিত)। “বিভূতিভূষণ: বিচার ও বিশ্লেষণ” (সম্পাদিত)। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-৩।

২। গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ (সম্পাদিত)। “বিভূতিভূষণ: বিচার ও বিশ্লেষণ” (ওরফে ইন্দিরা ঠাকরুণ)। (সম্পাদিত)।সাহিত্য সংসদ।কলকাতা। ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-২২৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ (সম্পাদিত)। “বিভূতিভূষণ: বিচার ও বিশ্লেষণ” (সম্পাদিত)। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ১৯৯৭।

২। বসু ,রবি। ‘সত্যজিতের প্রথম ছবি এবং একজন সাংবাদিক’।‘দেশ’(সম্পাদিত)। কলকাতা। ২৮ মার্চ ১৯৯২।

৩। চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস। ‘পথের পাঁচালী’-র নেপথ্য কাহিনি। ‘শারদীয় দেশ’। কলকাতা। ১৯৮২।

৪। দাশ, নলিনী। ‘সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা’। ‘নবকল্লোল’। সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা। কলকাতা। ১৯৯১।

৫। চক্রবর্তী, পুণ্যলতা। “ছেলেবেলার দিনগুলি”। । আনন্দ। কলকাতা। ১৯৯৭।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। ‘পথের পাঁচালী’। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স । উনত্রিংশ মুদ্রণ। ১৪২১।

৭। ভট্টাচার্য, তপোধীর। ‘মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব’। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম সংস্করণ। ২০১৩।

৮। ভট্টাচার্য, সুতপা। ‘কথা সাহিত্যের একলা পথিক বিভূতিভূষণ’। পুস্তক বিপণ। কলকাতা। ২০১৪।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নগর কলেজ,মুর্শিদাবাদ

নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে লোকজীবন

নন্দিতা সরকার

সারসংক্ষেপ-

চার এর দশকে সাহিত্যের দোরগোড়ায় পা রাখেন একালের কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা। সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশের সূচনালগ্নে তিনি জয়মালা অর্জন করতে না পারলেও তার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটি তার শিরে স্বর্ণ মুকুট পরিয়ে দিল। উপন্যাসটি ১৪২৫ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয় এবং ১৪২৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ বইটি আনন্দ পুরস্কার লাভ করে। সুবর্ণরেখা ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রবেশ করেছে এবং গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানা অঞ্চল হয়ে চলে গিয়েছে দাঁতন, তারপর ওড়িশার বালেশ্বর হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এমনি কতই না শত শত পরিবার, জনজীবন গড়ে উঠেছে সুবর্ণরেখার তীরে। এইসব টুকরো টুকরো জনজীবনের কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক নলিনী বেরা তার উপন্যাসে। এই জনজীবনের বর্ণনা এতটাই প্রাসঙ্গিক যে উপন্যাসটি পড়তে পড়তে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী মানুষ ও পাঠক মিলেমিশে এক হয়ে যায়। লেখক সেই নদী তীরবর্তী গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের লোকজীবনের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠকের কাছে সুবর্ণরেখা নদীর জলের মত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট।

মূলশব্দ-

'সুবর্ণরেণু ,সুবর্ণরেখা , উপন্যাস , ইতিহাস , নদী , জনজীবন , লোকজীবন

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD - 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

মূলপ্রবন্ধ -

'কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,
এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবাসে।'

নাগরিক সভ্যতায় মত্ত হয়ে মানুষ আজ ভুলতে বসেছে তার শিকড়ের টান কে। কিন্তু এই টানকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বারবার ফিরে এসেছে মানুষ গ্রামের মাটির সেই সোঁদাগন্ধের ভালোবাসায়। 'লোকজীবন' আমাদের ঐতিহ্য, কিন্তু আজ তার আলো কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। কোন জনগোষ্ঠীর লোকজীবন আমাদের কাছে তখনই ধরা দেবে যখন আলোক ঝলমল বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে আমরা পৌঁছে যাব মাটির কাছাকাছি। বৈদ্যুতিক আলোর বদলে হয়ত প্রদীপের ম্লান শিখায় তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। 'লোক' বলতে কোন একজন মানুষকে বোঝায় না, বোঝায় একদল মানুষকে যারা সমাজের বাসিন্দা হয়েও স্থান পায় সমাজের থেকে অনেক দূরে। যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার, পূজাপার্বণ, লোকবিশ্বাস প্রভৃতি লোকজীবন হয়ে ধরা দেয়। লোকজীবন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষিকেন্দ্রিক অথবা নদীকেন্দ্রিক। অনেক সাহিত্যিকদের উপন্যাসে নদীকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর লোকজীবন ফুটে উঠেছে যেমন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি। এমনই এক স্বনামধন্য লেখক নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটি সুবর্ণরেখার তীরবর্তী গ্রামের সাঁওতাল, হাড়ি, ডোম, কামার, কুমোর, লোধা,

কৈবর্ত, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকজীবনের আঁকর হয়ে উঠেছে। লেখক নিজেও মেদিনীপুরের অখ্যাত গ্রাম বাছুরখোঁয়াড়ে অঞ্চলের বাসিন্দা, সেকারনেই সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী লোকজীবন কীভাবে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার পাঁকে মিশ্রিত হয়ে উপন্যাসে ধরা দিয়েছে সেইদিকে আলকপাত করার চেষ্টা করছি।

উপন্যাসে লেখক নিজেই কথক। শুরুতেই আমরা দেখি অনেকেই চান কিশোর কথক কোবরেজ বা নাটুয়া দলের নাচুয়া হোক। কিন্তু কোনটিই তাঁর হয়ে ওঠা হয় না। পরবর্তী পর্যায়ে বাজিকরদের প্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের সূচনালগ্নে এই ঘটনা গুলো যদি পর্যায়ক্রমে দেখা যায় তবে বোঝা যাবে কথক প্রথমেই গ্রাম ও সে যে নিজেও সেই গ্রামের একজন সদস্য তা সম্বন্ধে পাঠক কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে। নদী যেখানে মানুষের একমাত্র অবলম্বন সেই নদীতে কেউ নৌকা পারাপার করে, কেউ মাছ ধরে জীবনযাপন করে। নৌকা পারাপার করতে করতে কথকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে হংসী নাউড়ীয়ার। কথক তার সাথেই নৌকাবিলাস করে সুবর্ণরেখার বক্ষে ও নদী তীরবর্তী জনজীবন, প্রকৃতি, নদীর গতিপথ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে। হংসী নাউড়ীয়া একজন ব্যতিক্রম চরিত্র কারণ সে নাউড়ীয়া হলেও তার মন নাবালক ও ভবঘুরে। এই ভবঘুরে প্রবৃত্তি নিয়ে কথকের সাথে সেও বারবার ছুটে যেতে চায় নৌকাবিলাসে। কথক ও হংসী নাউড়ীয়ার এই নৌকাবিলাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের নৌকাযাত্রার কথা। সকল নাউড়ীয়ারা যে শুধু নৌকা পারাপার করে জীবনযাপন করে তা নয়, তাদের মধ্যে কারও কারও চাষের জমি, খেরি-তরমুজের ক্ষেত, আখবন, গোরুমোষ, হাঁস মুরগী প্রভৃতি তাদের দিনযাপনের সঙ্গী। দেখা যায় খাণ্ডারপাড়ার জেলে ঝারেশ্বর পানীকে। যে কিনা সারাদিন মাছ ধরতেই ব্যস্ত থাকে, কেন নদীর নাম সুবর্ণরেখা তা নিয়ে ভাববার সময় নেই তার। তাই তিনি কথককে বলেন-

"তুই নদীর নাম নি পড়ি থা ললিন, গবেষণা কর, মোর কাম অছিরে, পানিতে জাল ফেলা আছেনি!"[1]

এমনই সব নাউড়ীয়া, কৈবর্ত, বৈরাগী, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত সাধারণ জীবন চিত্র ফুঁটে উঠেছে উপন্যাসে।

সুবর্ণরেখার তীরবর্তী মানুষ সকলে নিরক্ষর নয়। এমনকি বুধক ঘরের মেয়েরাও গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ে। কথকের ন'কাকীকেও গড়গড় করে রামায়ণ, সুবৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র পড়তে শোনা যায়। আবার মাথায় ঘোমটা থাকলেও শ্বশুর, ভাসুরের সাথে স্বাচ্ছন্দে বাক্যালাপ চলে। কিন্তু নাউড়ীয়া ঘরের মেয়েদের বহিরাগতদের সামনে কথা বলার প্রচলন নেই, কথা বলে বাড়ির পুরুষেরা। সমাজে শিক্ষার আলো প্রবেশ করলেও গ্রামের মানুষদের কন্যার বিবাহে পণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। নয়নতারার বিবাহে পণ দেওয়ার প্রসঙ্গে কথকের মেজকাকা বলেন -

"আগে ভূমিদান তারপরে কন্যাদান"[2]

কথকদের গ্রামের মানুষদের একটি স্বভাব হল, কোন বিষয়ে তর্ক বাধলে তারা গীতা সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারতে প্রমান খুঁজতে বসে। রামায়ণ, মহাভারত যেন তাদের জীবনে চলার পথের পাথেয়। সমগ্র উপন্যাসে তাই বারবার আসে রামায়ণ, মহাভারতের প্রসঙ্গ। কথক শুধু তার নিজের গ্রামের লোকজীবন ফুটিয়ে তোলেননি, তিনি যেখানেই পা রেখেছেন সেইজায়গা থেকেই সংগ্রহ করেছেন লোকজীবনের রসদ। ডুলুং নদীর তীরে রোহিণী চৌধুরানী রুক্মিণী দেবী হাইস্কুলের ছাত্রাবাসে দিনযাপন করার সময় সেখানকার জনজীবনের সাথে পাঠককে পরিচয় করায়। সেখানে বরোজিয়াদের কথায় তাদের বহু যুগের অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়-

"রোদে বাড়ে ধান, ছায়ায় বাড়ে পান"[3]

ডোমপাড়ায় যার বাড়ি হোস্টেলের সেই রাখাল মুখী যাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। আর বিভিন্ন উৎসবেই প্রধান উপকরণ হিসাবে থাকে পচাই, শুয়োরের মাংস আর ঢোল, বাদ্য। কথকের ছাত্রাবাসে কথকের সঙ্গে পাঠক না প্রবেশ করলে হয়ত জানতেই পারত না যে লাউয়ের খোসার তরকারিকে 'চুপি' বলে। আর এই 'চুপি' রান্না হলে একমুঠো ভাত বেশিই খাওয়া হত হোস্টেলের ছাত্রদের। এখানে আরও কিছু জনজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন- সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, দু চার ঘর ব্রাহ্মন, গোড়িয়া কুমোর প্রভৃতি। সুবর্ণরেখা ও ডুলুং দুই নদীরই পরিচয় পাই আমরা উপন্যাসে। কিন্তু দুই নদীর স্রোত ভিন্ন। এক স্রোতের রং গেরুয়া, আরেক স্রোতের রং স্বচ্ছ নীল, এক যেন সন্ন্যাসী ভৈরব, আরেক যেন গৃহবাসিনী উমা। এই দুই নদীর স্রোতের যেমন পার্থক্য বর্তমান তেমনি সেখানকার লোকজীবনেরও বৈচিত্র্যও উপন্যাসে স্পষ্ট লক্ষণীয়। এখানেই শেষ নয়, এরপর কথকের সাথে আমরা যাই লবকিশোরপুরে 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান' শুনতে। যখন খরগপুর রেলস্টেশনে কথক ছোটপিসিকে খুঁজতে যায় তখন তার গ্রাম থেকে সেই খরগপুর ষ্টেশন পর্যন্ত বহু জায়গার কিছুনা কিছু লোকায়ত উপাদানের সাক্ষাৎ দিতে দিতে খরগপুরে পৌঁচ্ছায় কথক। সালুয়া পেরিয়ে গোপালিতে গিয়ে কথক দেখে সেখানকার মেয়েরা বেঁটো খাটো আর বউরা বেশীরভাগ লাল কিংবা হলুদ রং এর শাড়ি ও সালোয়ার কামিজও পরে। বেশীরভাগ মেয়েরা নেপালি, গারো-গোর্খা মেয়ে যাদের কথকের মেজদি, সুবোধদিরা 'বাজারিয়া বউ' বলে। খরগপুর আসা মাত্রই কথকের মনে পরে 'রাবণ পোড়ার মাঠ'। বিজয় দশমীর দিন যে দশেরা উৎসবের জন্য কথকের মন পরে থাকতো। কাকার সাথে খরগপুর ষ্টেশনে এসে তার প্রথম ট্রেন দেখা আমাদের নিয়ে যায় সেই ছোট্ট অপু আর দুর্গার কাছে। এই ভাবেই কথকের চোখ দিয়ে বিভিন্ন গ্রাম কে আমরা নতুন করে দেখি।

লোকায়ত জনজীবন যখন কোন উপন্যাসে ধরা দেয় তখন সেখানে লোকায়ত গান, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, আচার অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ, প্রভৃতি ছাড়া সেই জনজীবন কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কথক সেই স্বাদ গ্রহন থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেননি। কথকদের বাড়িতে কাঁলপেঁচার উপস্থিতিতে সেই গ্রামের লোকবিশ্বাসের সাথে আমাদের পরিচয় হয়।কথকের মেজকাকা বাড়ির গাছে কাঁলপেঁচার দর্শন পাওয়া মাত্রই বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে সংসারে। ভাস অর্থাৎ গণৎকারের কাছ থেকে ছোট কাকা জেনে বলেন-

"মেজদা, আমাদের নাকি পুষ্করা দোষ ঘটেছে! পুষ্করা হলে গৃহ স্বামীর সমূহ বিপদ, দক্ষিণ দাড়িয়ার ভাস খড়ি দেখে তাই তো—।"[৪]

এই দোষ কাটানোর জন্য ভাস নির্দেশ দিয়েছিল-

"স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, যাগযজ্ঞ, একশো আটটা পদ্ম আর সাড়ে ন সের ঘৃতাহুতি।"[৫]

শত দারিদ্রতা সত্ত্বেও দোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাড়ির প্রত্যেক সদস্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় উদ্যত হয়। লোকবিশ্বাস যে শুধু অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে তা নয়, তা যে শিক্ষিত মানুষের উপরেও বিস্তার লাভ করে তারই প্রমান পাওয়া যায়। কারণ আগেই জেনেছি যে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী গ্রামের বেশীরভাগ মানুষই সাক্ষর। এছাড়া ডুলুং তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'পাহাড় পূজা' উৎসবের কথা জানা যায়। এই পূজা আষাঢ় মাসের কোন এক শনিবারে পালন করা হয় এবং সেই পূজায় হাজার হাজার পাঁঠা ও মোরগ বলি দেয় গ্রামের মানুষ। এছাড়া সাঁওতালদের 'দিশম্ সেঁদ্রা' বা শিকার উৎসব, কাদো-ঘাটি উৎসব ইত্যাদি উৎসবের উল্লেখ পাই।

উপন্যাসে প্রচুর লোকগানের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন লেখক। শিমুলতলায় যখন কারিগররা নৌকা মেরামতি করত তখন বৈরাগীর কণ্ঠে শোনা যায়-

"শিমুল খুঁটার নৌকা তোমার হে, ও নৌকা তলায় জলের ভারে,
শিমুল খুঁটার নৌকা তোমার হে............." [৬]

সুবর্ণরেখার তীরবর্তী গ্রামের মানুষ নদীর চর কে 'পাল' বলে। বৈশাখ মাসের বৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার বুক চিরে জন্ম নেয় এমনই এক পালের। এই পালের প্রভাবে তাদের মধ্যে বিবাদ, প্রতারণা, অত্যাচার শুরু হয় আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় হাটুয়া গান-

"বিধি যাহা লেখি আছে কপালে। বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে।" [৭]

ডুলুং এর তীরে ছাত্রাবাসে থাকাকালীন পুনিয়া অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের মুখে শোনা যায় ঝুমুর গান-

"শালগাছে শাল পঙড়া খেজুর গাছে ঝুড়ি হে,
বধার গায়ে লাল গামছা চটক দেখে মরি হে।" [৮]

আবার কথকের দাদার বিবাহে মেয়েদের মুখে শোনা যায় বেহা গীত-

"বেহা বেহা করি আমাদের কবে হবে বেহা গো।
কইন্যার মামা ঘরে না পাইল গুয়া পান গো।" [৯]

গানের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রবাদ, টিপ্পনী উল্লেখ পাই যা নদী তীরবর্তী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ। হোস্টেলের বামুন ঠাকুর যেমন টিপ্পনী কেটে বলে-

"আজ নগদ কাল ধার, ধারের পায়ে নমস্কার।" [১০]

অথবা তাদের আঞ্চলিক প্রবাদ-

"ঘৈতা আর পৈতা কখন হাতছাড়া করতে নেই, সবসময় কাছে কাছে রাখতে হয়।" [১১]

এই অঞ্চলের মানুষেরা যে স্বামী কে ঘৈতা বলে তা হয়ত বহু পাঠকেরই অজানা থাকবে। 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটিকে ঠিক উপন্যাস বলা যায় কিনা সেই বিষয়ে সংশয় আছে, কারণ কোন ধারাবাহিক কাহিনী এই উপন্যাসটিতে নেই। কিছু খণ্ড খণ্ড কাহিনী কে একত্রিত করে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামের লোকায়ত জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়েছেন। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যেও প্রবেশ করিয়েছেন প্রচুর লোককাহিনী। যে কাহিনী গুলো হয়ে উঠেছে নদীতীরবর্তী জনগোষ্ঠীর সম্পদ। যেমন- ভ্রমরগরের কাহিনী, কোলাসুন্দরীর কাহিনী, হিড়িম্বেশ্বরী কালি মন্দিরের কাহিনী, কুসমি খালের রাউতমণির কাহিনী, প্রভৃতি। উপন্যাসটির একটি প্রধান দিক হল লেখক এখানকার আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রামের মানুষের মুখ দিয়েই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। সদ্‌গোপ, খণ্ডায়েৎ প্রভৃতি মানুষদের মুখে যে ভাষা শোনা যায় তা হল হাটুয়া ভাষা। হাটুয়া ভাষা বাংলা নয়, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষা মিশ্রিত একটি ভাষা-

আইলা বাভন মাইলা তালি।
নিই পলাইলা চাউল থালি।" [১২]

তাছাড়া এই গ্রামের মানুষের মুখ থেকে পাঠক বহু অজানা শব্দ জানতে পারে, যেমন- বাগাডুলু (উড়াকল ফড়িং), ভাবুর (বাবলা গাছ), ট্যাঁসা (নীলকণ্ঠ পাখি), ঢ্যাপচু (ফিঙে পাখি), ন্যাঙটা ভুটুঙ (উলঙ্গ বাচ্ছা) ইত্যাদি। এমন ভাবেই প্রচুর লোকায়ত বীজ বপন করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

সুবর্ণরেখা আজও বয়ে চলেছে তার বিরামহীন ছন্দে। আর এই নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারাও চলছে একই সঙ্গে। এমনই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বর্ণ রেণু সংগৃহীত হয়ে স্বর্ণ অলঙ্কার গড়ে উঠেছে একালের লেখকের কলমে।

তথ্যসূত্র

১. বেরা, নলিনী; সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩। পৃষ্ঠা- ২৯।
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৮।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৮।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৩।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৩।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬৩।

আকর গ্রন্থ

১. বেরা, নলিনী; সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আহমদ, ওয়াকিল; " বাংলার লোক-সংস্কৃতি", বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২।

২. চট্টোপাধ্যায় হীরেন, "সাহিত্য প্রকরণ", বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯।

৩. মিত্র, অমর; " নদীর প্রতিবেশী যে নাব্য জীবন, তা এখানে সোনার জলে আঁকা", সম্পাদকীয় কলম সংবাদ প্রতিদিন।

৪. হাটি চূড়ামণি (সম্পা:), 'লোকসংস্কৃতির দিকদিগন্ত', গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা

সহেলী ভট্টাচার্য্য

সারসংক্ষেপ:-

কৈশোর কাল প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। কৈশোরকাল ভয়হীন , দুর্দমনীয়। কৈশোর মানেই রহস্য রোমাঞ্চ । আর এই কিশোর কিশোরীদের নিয়েই যে কালজয়ী গোয়েন্দা উপন্যাসগুলি আমাদের মন জয় করে নেয় পান্ডব গোয়েন্দা তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা উপন্যাস। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' একটি কাল্পনিক গোয়েন্দা উপন্যাস ।এর কাহিনী পাঁচজন কিশোর-কিশোরীর দুঃসাহসিক কিছু অভিযানের বর্ণনা। কিন্তু কিশোর উপন্যাস হলেও 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' উপন্যাসের কাহিনী সকল স্তরের মানুষকেই তার কৈশোরের পৌঁছে দেয়;করে তোলে নস্টালজিক। পাণ্ডব গোয়েন্দার প্রথম প্রকাশ হয় মাসিক শুকতারা পত্রিকায় ১৯৭০ সালের শেষের দিকে। এরপর আনন্দমেলার পুজো সংখ্যাতেও পাণ্ডব গোয়েন্দা উপন্যাস প্রকাশিত হয় । ১৯৮১ সালে নিউ বেঙ্গল প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় পাণ্ডব গোয়েন্দা উপন্যাস.পাণ্ডব গোয়েন্দা উপন্যাস সর্বস্তরের মানুষের কাছেই জনপ্রিয়তা লাভ করে ,বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' উপন্যাস শুধুমাত্র মাসিক পত্রিকা কিম্বা পূজোবার্ষিকী বা গ্রন্থাকারেই প্রকাশিত হয়নি , এই উপন্যাস বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে টেলিভিশনেও জায়গা করে নিয়েছে এবং দর্শকের মন জয় করেছে। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' ছাড়াও আরো অনেকগুলি শিশু সাহিত্যে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের অবদান বিশেষ অনস্বীকার্য । তবুও এ কথা বলতেই হয় হয়তো পাণ্ডব গোয়েন্দার মধ্য দিয়েই শিশু-কিশোর তথা আমাদের সকল পাঠক মনে লেখক আজীবন অমর হয়ে থাকবেন। ২০১৭ সালে শিশু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ষষ্টিপদ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

মূলশব্দ:-

কিশোর - কিশোরী, গোয়েন্দা , অভিযান, রহস্য রোমাঞ্চ, ভয়হীন, দুর্দমনীয়, বুদ্ধিমান সার্বজনীন, শ্রেষ্ঠকীর্তি।

মূল প্রবন্ধ:-

কৈশোর মানেই দুঃসাহসিক ,দুর্দান্ত এক সময় । কৈশোর মানেই ভয়হীন, দ্বিধাহীন ভাবে এগিয়ে চলা। কৈশোর কোন বাধা মানেনা। অজানাকে জানা , অচেনাকে চিনে নেওয়ার নেশা কৈশোরকালকে ঘিরে থাকে। কৈশোর মানেই রহস্য রোমাঞ্চ। কৈশোর কাল প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। নানা গল্প ,উপন্যাস ,ছোটগল্প ,সিনেমা , কার্টুন বা মেগা সিরিয়ালে আমরা অনেক সময়ই শিশু বা কিশোরদের নিয়ে নানা কাহিনী আমরা পড়েছি বা দেখেছি। যে সমস্ত শিশু সাহিত্য বা কিশোর উপন্যাসগুলি আমরা পড়ি পান্ডব গোয়েন্দা তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই উপন্যাসে পাঁচ জন দুঃসাহসিক কিশোরের রহস্য অভিযানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যারা তাদের চেনা গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে রহস্য সমাধানের জন্য । যেকোনো রহস্য অভিযানে এই পাঁচ কিশোর ভয় দ্বিধাহীন ভাবে এগিয়ে গেছে।পান্ডব গোয়েন্দা ;আমরা যারা কৈশোর ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছি , সেই আমাদের নস্টালজিক করে তোলে। আর এখনো যারা নেহাতি শিশু তারাও এই কাহিনী পড়ে স্বপ্ন দেখে পান্ডব গোয়েন্দার মতো দুর্দমনীয় সাহসী হয়ে ওঠার। পান্ডব গোয়েন্দা উপন্যাস কিশোর সাহিত্য হলেও এই সাহিত্য তার নিজস্ব শিল্পগুনে ও সাহিত্যগুণে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন ও অনন্য। পাণ্ডব গোয়েন্দা আমাদের সকলের।পান্ডব গোয়েন্দা উপন্যাসের কাহিনী অন্যান্য গোয়েন্দা উপন্যাসের থেকে অনেকটাই

আলাদা এবং এর চরিত্রায়ণ ও চিরাচরিত গোয়েন্দা উপন্যাসের কাহিনী থেকে বেশ ভিন্ন ধরনের। পাণ্ডব গোয়েন্দা নিঃসন্দেহে ষষ্টিপদ চট্টোপাধ্যায়ের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের হাওড়া জেলার খুরুট ষষ্টিতলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। ছেলেবেলা থেকেই লেখক ছিলেন ভীষণভাবে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। সেই সঙ্গে সাধু সন্ন্যাসীর প্রতিও ছিল তার এক অমোঘ টান । বিভিন্ন সময় তিনি সাধু সঙ্গ করেছেন সেই প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তার বেশ কিছু লেখায় ।এছাড়া তিনি ছিলেন ভ্রমণ প্রিয়; সেই প্রসঙ্গ ও আসে তার রচনাগুলির মধ্যে। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর লেখালিখির সূচনা। সতেরো বছর বয়েসে দৈনিক 'বসুমতী 'পত্রিকায় ডাকঘর নামক বাচ্চাদের জন্য নির্দিষ্ট পাতায় কালের 'কামাক্ষা' নামক একটি ভ্রমণমূলক প্রবন্ধ ছিলো তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। তাঁর যৌবনকালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সঙ্গে যুক্ত হন। লেখকের ৮১ বছরের জীবনকালে তিনি বহু রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী ,ভৌতিক গল্প কাহিনী ,ভ্রমণ কাহিনী, লিখেছেন । পান্ডব গোয়েন্দা ছাড়াও আরো বেশ কিছু গোয়েন্দা কাহিনী যেমন প্রাইভেট ডিটেকটিভ অম্বর চ্যাটার্জি কিশোর গোয়েন্দা তাতারের অভিযান ইত্যাদি সিরিজ গোয়েন্দা কাহিনীও তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু ১৯৮১ সালে তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক গোয়েন্দা উপন্যাস পাণ্ডব গোয়েন্দা কাহিনী তাকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা এনে দেয়। যদিও ১৯৭০ সালে মাসিক শুকতারা পত্রিকাতেই এই পাণ্ডব গোয়েন্দার প্রথম প্রকাশ। ২০১৭ সালের ষষ্টিপদ চট্টোপাধ্যায় শিশু সাহিত্যে তার অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দা উপন্যাস হলো ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি কাল্পনিক গোয়েন্দা উপন্যাস ।এর চরিত্রগুলিও স্বভাবতই কাল্পনিক ।পাঁচজন দুঃসাহসী কিশোর-কিশোরীকে নিয়েই গঠিত এই পঞ্চপান্ডব গোয়েন্দাবাহিনী । তাদের নিবাস হাওড়ায়।বাবলু বিলু ভোম্বল এই তিন কিশোর ও বাচ্চু বিচ্ছু এই দুই কিশোরীই হল পঞ্চপান্ডব।এই দলে আছে একটি কুকুরও। তার নাম পঞ্চু। বাবলু পঞ্চপান্ডব দলের সবচেয়ে বড় সদস্য এবং দলের নেতা । বাবলু খুবই দুঃসাহসী বুদ্ধিমান ও সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী তার একটি লাইসেন্স প্রাপ্ত পিস্তলও রয়েছে এবং সে এটি চালাতেও ওস্তাদ। পঞ্চপান্ডব দলের দ্বিতীয় পাণ্ডব বিলু। বাবলুর অবর্তমানে বিলুই পঞ্চপান্ডব দলের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে সেও ভীষণ সাহসী ও বিচক্ষণ। পঞ্চপান্ডব দলের সবচেয়ে মজার চরিত্র ভোম্বল সে কিছুটা ভীতু হলেও খুব ভালো সাঁতারু এবং খাদ্য রসিক। বাচ্চু পঞ্চপান্ডব দলের প্রধান নারী চরিত্র। তারই বোন বিচ্ছু সে পঞ্চপান্ডব দলের সব থেকে বয়সে ছোট হলেও প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য বিচ্ছুর রাত্রি কালীন অভিযানই পান্ডব গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম গল্প। সঙ্গী কুকুর পঞ্চ কিছু মাত্র কম নয়। সে দেশি কুকুর এবং তার একটি চোখ কানা হলেও প্রয়োজনে সে বুদ্ধিমত্তাতা ও হিংস্রতার পরিচয় দেয়। তুখর বুদ্ধিদীপ্ততা ,সাহসী অথচ সারল্যে ভরা এই পাঁচ দস্যি কিশোর কিশোরী ও সঙ্গী সারমেয় পঞ্চুর গোয়েন্দা অভিযানের কাহিনী পাণ্ডব গোয়েন্দা উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা গল্পগুলিতে বেশিরভাগেরই নায়ক বা নায়িকা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্ত কোন মানুষ এবং তার একজন সহযোগী আছে এমনটাই আমরা দেখে আসছি। এবং এই সমস্ত উপন্যাসের কাহিনী গুলো কেউ দেখি বেশ জটিল কোন ঘটনাবলি সমৃদ্ধ । কিন্তু পান্ডব গোয়েন্দা উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্রগুলি এই চিরাচরিত গোয়েন্দা গল্প উপন্যাসের থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। এখানে উপন্যাসের কোন আলাদা নায়ক নেই। পঞ্চপান্ডবের পাঁচজনই এই গল্পের নায়ক নায়িকা। শুধু মানুষ চরিত্রগুলিই নয় ,পাণ্ডব গোয়েন্দাই হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস যেখানে কোন পশু রহস্য উদঘাটনের সাহায্য করেছে। তিরিশটিরও বেশি অভিযানের কাহিনী পাণ্ডব গোয়েন্দায় স্থান পেয়েছে।একটির পর একটি নিত্যনতুন পটভূমি আমাদের চমকিত করে। এই উপন্যাসের কাহিনীগুলি তার দুঃসাহসী অভিযান ও ঘটনার জটিলতায় কখোনোই সারল্য হারিয়ে ফেলে না । তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চপান্ডবের চিন্তা

ভাবনায়ও পরিপূর্ণতা এসেছে। পঞ্চপান্ডব কিশোর বলে তাদের গোয়েন্দাগিরি , বুদ্ধির প্রখরতা কিছু মাত্র কম নয়। কিংবা তাদের শত্রুর ওজন ও কিন্তু একটু ও কম নয় ।তারা একের পর এক দুর্ধর্ষ শত্রুর পাল্লায় পরে এবং তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। তাদের অভিযান প্রথম প্রথম শুধুমাত্র নিজেদের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে তাদের অভিযান নিজেদের গণ্ডি পেরিয়ে অনেক দূর এলাকাতেও রহস্য সমাধান করতে পৌঁছে যায় । যেমন একটি গল্পে আমরা দেখেছি যে তারা মধ্যপ্রদেশ অব্দি ছুটে গেছে রহস্য সমাধানের জন্য। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করলে বলাই যায় যে পান্ডব গোয়েন্দা অন্যান্য গোয়েন্দা উপন্যাসের থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন এবং অনন্যতার দাবি রাখে।

পান্ডব গোয়েন্দার কোন গল্প এখনো সিনেমার পর্দায় আমরা না দেখলেও এই পঞ্চপান্ডব টেলিভিশন জগতে পা দিয়েছে বহু আগেই। পান্ডব গোয়েন্দা গল্পগুলি নিয়ে একটি বাংলা অ্যানিমেশন টেলিভিশন সিরিজ তৈরি হয়েছিল বহু আগেই। এটি আকাশ বাংলা পরে প্রকাশ করে। এরপরে পাণ্ডব গোয়েন্দা নামক একটি মেগা সিরিয়াল আসে রাহুল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যদিও এই মেগা সিরিয়ালটি নিয়ে অনেক সমালোচনা তৈরি হয়। কারণ এর সব কাহিনী ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পাণ্ডব গোয়েন্দা কাহিনী অনুসরণে দেখানো হয়নি।

হাওড়া নিবাসী এই পঞ্চপাণ্ডবের তারুণ্যে ভরা ও সারল্যে ভরা অ্যাডভেঞ্চারাস বিভিন্ন কাহিনীগুলি খুব সহজ ভাবেই শিশু কিশোর মনে জায়গা করে নেয়। কিন্তু পঞ্চপান্ডবের কাহিনী শুধু শিশু-কিশোরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এই কাহিনীর জটিলতা বিহীন রহস্য রোমাঞ্চ শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা সকল স্তরের পাঠকের মধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে চিরতরে। সকল বয়সের গণ্ডি পেরিয়ে পঞ্চপান্ডব হয়ে উঠেছে সকলের মধ্যে জনপ্রিয় এবং আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ে।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

তথ্য ঋণ- ১) চট্টোপাধ্যায়,ষষ্ঠীপদ, পান্ডব গোয়েন্দা সমগ্র ১(২০০৫), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

২) উইকিপিডিয়া (পান্ডব গোয়েন্দা)

৩) উইকিপিডিয়া (ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়)

৪) চ্যাটার্জী পায়েল , পাঁচ দস্যির কাহিনী ডিসেম্বর ১২ ,২০২০, Jiyo Bangla

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - আমার এই প্রবন্ধের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগীয় প্রধানা মাননীয়া সংহিতা সান্যাল মহাশয়ার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

....

গবেষক , বাংলা বিভাগ , অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি ।

জলের উপর পানি : ভাবনার জাগরণে

প্রভাত দাস , অমৃতা চক্রবর্তী

সারসংক্ষেপ-

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী চতুষ্পাঠীতে যে কাহিনী বুনেছিলেন জলের উপর পানিতে তারই শেষাংশ। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরী দেশভাগ বাস্তবে কি দেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্নপূরণ করেছিল ? নাকি দেশভাগের যন্ত্রনা আর 'রিফিউজি' নামের 'মহিমা' বারবার তাদের অস্তিত্বকে প্রশ্নচিহ্নের মাঝে দাঁড় করালো ? সংবেদনশীল নিরাভরণ ভাষায় স্বপময় সেইসব উত্তাল দিনগুলোকে গেঁথেছেন জলের উপর পানিতে। 'জলের উপর পানি' শুধু উপন্যাস নয়; একটি সময়ের দলিল যেখানে মিশে আছে ধর্ম, ইতিহাস, প্রেম,স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। উপন্যাসে একটি বিস্তৃত সময়কে তুলে ধরেছেন যার ব্যাপ্তি ১৯৪৭-৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৯২ পর্যন্ত। দেশভাগ হল আবার সেইসঙ্গে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। পাকিস্তানের বশ্যতা থেকে বেড়িয়ে এসে এপার বাংলার কলোনীগুলিতে। ইতিহাসে তাদের কিছু পরিসংখ্যান পাওয়া যায় কিন্তু এদের সামাজিক রাজনৈতিক এবং মানসিক অবস্থার বর্ণনা ইতিহাস দিতে পারেনি। কিছু উপন্যাসে সে সময়ের ছাপ পাওয়া যায়। যেমন-প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' ; 'শতধারা বয়ে যায়'; 'নোনাজল মিঠে মাটি'; অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ; 'মানুষের ঘরবাড়ি'; জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি'; সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'; 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'; আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'; 'খোয়াবনামা'; নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা'; 'বল্মীক'; 'অরন্যদন্ডক'; শক্তিপদ রাজগুরুর 'দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'; শচীন দাশের 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ'; প্রভৃতি উপন্যাসের কথা। তেমনি দেশভাগের যন্ত্রণায় দগ্ধ উদ্বাস্তুদের জীবনচিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তীর, 'জলের উপর পানি'। একসময় রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের হটকারিতায় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশভাগ করেন আর সেই দেশভাগের যন্ত্রণা, অপমান, উত্তরাধিকার সূত্রে আবহমান কালধরে বয়ে চলে দেশের সাধারন মানুষ । জীবনের নগ্নবাস্তব যেমন স্বপ্নময়ের কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে তেমনি স্বপ্নালু ভাষায় তিনি হৃদয় নিঙড়ানো অভিজ্ঞতায় তুলে ধরেছেন জীবনের ধূসর বিষাদকে আবার সেই ধূসর বিষাদের মধ্যে থেকেই সবুজাভ দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। দেশভাগ অন্তহীন লাঞ্ছনার ক্ষত দেশভাগের এক জীবন্ত নক্সা ছিন্নমূল ও সর্বহারা উদ্বাস্তু মানুষদের মর্মবিদারী কান্নার করুণ সংহিতা ।

মূল শব্দ-

ধর্মীয় রাজনীতি, দেশভাগ, রিফিউজি, জাতিবিদ্বেষ, উদ্বাস্তুসমস্যা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, জীবনবোধের সংকট

মূল প্রবন্ধ-

সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বিচিত্রি জীবনকে দেখেছেন কখনো দেশলাইকাঠির সেলস্‌ম্যান, কখনো সাংবাদিকতা ও কখনোবা বেতারের কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা তার ছোটোগল্প ও উপন্যাসে বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্যতা এনেছে। জীবনের নগ্নবাস্তব যেমন স্বপ্নময়ের কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে তেমনি স্বপ্নালু ভাষায় তিনি হৃদয় নিঙড়ানো অভিজ্ঞতায় তুলে ধরেছেন জীবনের ধূসর বিষাদকে আবার সেই ধূসর বিষাদের মধ্যে থেকেই সবুজাভ দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। দেশভাগ অন্তহীন লাঞ্ছনার ক্ষত দেশভাগের এক জীবন্ত নক্সা ছিন্নমূল ও সর্বহারা উদ্বাস্তু মানুষদের মর্মবিদারী কান্নার করুণ সংহিতা । দেশভাগ জীবনের স্বাভাবিকতাকে কীভাবে কালবৈশাখী

ঝড়ের মতো নিমেষে এলোমেলো করে দিয়ে যায়। দেশ বলতে কী বোঝায় একখন্ড যায়গা জমি, ভৌগোলিক অঞ্চল, নাকি দেশ বেঁচে থাকে মানুষের অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে। আকাশ বাতাস সোনালি রোদ, শিশির ভেজা ঘাস মায়ের মুখের ভাষা এদের কোনো ভাগ হয় না। "দেশ কথাটা মোহ নারে, দেশ মাইন্‌সের মনে। জমির উপুর দেওয়াল তুলেছে- মনে য্যান তুলতে না পারে।" [১] কিন্তু আমরা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি, তাই একদা দেশভাগের ক্ষত আজও উত্তরসূরীরা বহন করে চলেছেন। কিছু পরিসংখ্যান শুধু সংখ্যা জানান দিচ্ছে, কিন্তু এদের সামাজিক রাজনৈতিক এবং মানসিক অবস্থার বর্ণনা ইতিহাস দিতে পারেনি। একসময় রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের হটকারিতায় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে দেশভাগ করেন আর সেই দেশভাগের যন্ত্রণা, অপমান, উত্তরাধিকার সূত্রে আবহমান কালধরে বয়ে চলে দেশের সাধারন মানুষ । দুশো বছরের ইংরাজ শাসনের নাগপাশ কাটিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। কিন্তু সেই স্বাধীন ভারতের মাঝখানে চিরকালীন দাগ থেকে যায় দেশভাগের। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরী দেশভাগ বাস্তবে কি দেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্নপূরণ করেছিল ? নাকি দেশভাগের যন্ত্রনা আর 'রিফিউজি' নামের 'মহিমা' বারবার তাদের অস্তিত্বকে প্রশ্নচিহ্নের মাঝে দাঁড় করালো ? আধুনিকতার পোশাক পরে বিপ্লবী মন্ত্র আওর্যাতে আওর্যাতে আমরা কী পারলাম 'Conservative' মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে আসতে ? এরকম হাজারো প্রশ্ন নিয়ে এবং নতুন প্রজন্মের ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে শুধু প্রেম দিয়ে নতুন ভুবনের স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস 'জলের উপর পানি'।

ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বেতিয়া, চরবেতিয়া, দন্ডকারণ্য, আন্দামান এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের বিস্তীর্ন অঞ্চল; এমনকি বিহার উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলজুড়ে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেসব পুনর্বাসন কেন্দ্রে নগ্নতা,ক্ষুধা, ও মৃত্যু একটি বিষাদের আচ্ছাদন বিছিয়ে দিল। চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শত শত মানুষ মারা যেত; পচা আটার শুকনো ডোল খেয়ে দূষিত জলপান করে। এইসকল ছিন্নমূল মানুষগুলি একসময় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন উদ্বাস্তুদের এ ইতিহাস ছড়িয়ে আছে বেশকিছু উপন্যাসে। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' ; 'শতধারা বয়ে যায়'; 'নোনাজল মিঠে মাটি'; অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ; 'মানুষের ঘরবাড়ি'; জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি'; সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'; 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'; আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'; 'খোয়াবনামা'; নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা'; 'বল্মীক'; 'অরন্যদন্ডক'; শক্তিপদ রাজগুরুর 'দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'; শচীন দাশের 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ'; প্রভৃতি উপন্যাসের কথা। তেমনি দেশভাগের যন্ত্রণায় দগ্ধ উদ্বাস্তুদের জীবনচিত্র স্বপ্নময় চক্রবর্তীর, 'জলের উপর পানি'।

জলকে পানি বলি বা অন্যনামে ডাকি তাতে জলের মহিমা কি ম্লান হয় ? জল তো বহন করে চলে বহমান জীবনের জলছবি। জল ও পানির মতো একসূত্রে বাঁধা আলি ও কালি। জল যেমন কীটদুষ্ট হয় তেমনি ধর্মও হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার অথচ সব ধর্মই বলে চলে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির কথা, ভালোবাসার কথা। উপন্যাসের প্রারম্ভেই গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'মনের মানুষ' চলচ্চিত্রে শাহজাদ ফিরদাউস রচিত একটি গানের প্রথম চরণের প্রথম অংশ তুলে ধরা হয়েছে –

"জলের উপর পানি না পানির উপর জল
বল খোদা, বল খোদা, বল
আলীর উপর কালী না কালীর উপর আলী
বল খোদা, বল খোদা, বল
জামিন তলায় আসমান উপর
নাকি আসমান জমিন সব বরাবর
বল খোদা, বল খোদা, বল
হিঁদু-পোড়া শ্মশান আর মিয়ার গোরস্থান

কাহার থিকে কে ছোট কও কার কি অবস্থান

বল খোদা, বল খোদা, বল”

এই গানটি প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন – ‘এই গানটির নির্বাসেই ভিজে আছে উপন্যাসটি।’

স্বপ্নময় চক্রবর্তী ‘জলের উপর পানি’ উপন্যাসে একটি বিস্তৃত সময়কে তুলে ধরেছেন যার ব্যাপ্তি ১৯৪৭-৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৯২ পর্যন্ত । এই বিস্তৃত সময়ের রূপরেখা আঁকতে গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিকে প্রসঙ্গ এনেছেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশভাগ ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের জন্ম। কৃষক প্রজা পার্টি (১৯৩৬)র প্রতিষ্ঠাতা ফজলুল হক ছিলেন যার সদস্য। যার বিখ্যাত শ্লোগান ‘লাঙল যার জমি তার’। বাংলার অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলিম এবং জমিদাররা হিন্দু । ফজলুল হকের মতো নেতারা এইসব মুসলমান কৃষকদের ‘চাষীস্থান’ পাকিস্তানের স্বপ্নদেখায় ফলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববাংলার মুসলমানরাও পাকিস্তানের দাবীতে নাচল, দেশভাগ হল আবার সেইসঙ্গে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। পাকিস্তানের বশ্যতা থেকে বেড়িয়ে এসে এপার বাংলার কলোনীগুলিতে । রাস্তায় মাইকে তখন বলছে ‘ একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের ধ্বনি’। এপার বাংলায় তখন চলছে নকশাল আন্দোলনের আগুন। কাশীপুর হত্যাকান্ডের বদলা শিবপুরে । চারধারে শুধু রক্ত রক্ত রক্ত, ইনফর্মারদের মুন্ডুকাটা চলছে অন্যদিকে রনু গুহ নিয়োগী বলছে ছ-মাসের মধ্যে ‘নকশাল ফকশাল’ সব শেষ করে দেবে। সন্তান হারানোর শোকে নকশালের মা বলছে ‘ও মাও সে তুং গো তুমি কি সর্বনাশ করলে আমার।’ সত্তরের এই উত্তাল দিনগুলির প্রতিচ্ছবি খুব স্পষ্ট উপন্যাসে। ১৯৭১ সালে অজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে জন্ম হল পশ্চিমবঙ্গে জোড়াতালি দেওয়া সরকারের আয়ু আড়াই মাসের ও কম। ১৯৭২ সালে ২০ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী হলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার নিয়ে শাসনযন্ত্র আর শোষনযন্ত্রের মধ্যে ফারাক হল শূন্য। নকশাল রনুকে বাঁচাতে গিয়ে শাসকের লাঠির আঘাতে মৃত্যু হয় অনঙ্গমোহনের। দেশ স্বাধীন হল দেশ ভাগ হল কিন্তু বদলালো না শাসকের রূপ রাজনীতিই হল তাহলে জীবনের পরিণতি ? অনঙ্গমোহনের মৃত্যুতে একটি পর্বের অবসান।

অবশেষে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো জ্যোতিবসু হলেন মুখ্যমন্ত্রী, নকশালরা মুক্তি পেল, ভূমিসংস্কার করা হল ফলে ভূমিহীনরা ভূমি পেল। কিন্তু ‘যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ’ ঘটে মরিচ ঝাঁপির মত ঘটনা । উদ্বাস্তুরা বারংবার শিকার হয় ঘৃণ্য রাজনীতির। ১৯৭৮ সালে রিফিউজিদের দন্ডকারণ্য ছেড়ে আসতে হয় মরিচঝাঁপিতে। ৭৯ সালের জানুয়ারী থেকে মরিচঝাঁপিতে অবরুদ্ধ করা হয় ১৪৪ ধারা জারি হয়। নদীবাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া হয়, জলদূষণ করা হয়, মরিচঝাঁপির মানুষের লড়াই জারি থাকে ৩১শে জানুয়ারী মরিচঝাঁপি আর কুমীরমারিতে পুলিশ ৩২রাউন্ড গুলি চালায়। দেশভাগ দন্ডকারণ্য মরিচঝাঁপি সব যেন একসূত্রে বাঁধা। “ সবই যেন মরিচের ঝালের মতন তরকারী রঙ্গায়ে লাগা”[২] উদ্বাস্তুদের চিরকাল তুরুপের তাসের মত ব্যবহার করেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা যা তখনও ছিল এখনও আছে ইতিহাস সেকথাই বলে। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধংস আবার ধর্ম আবার দাঙ্গা সময় বদলায়, বদলায় না ধর্মীয় উন্মাদনার আগুন ঝরে মানুষ মরে। উজামার গর্ভস্থ সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার আগেই বিদায় নেয় এই অন্ধকার পৃথিবী থেকে। সে সন্তান ছিল তাদের কাছে ‘স্বপ্নমাখা আগামীদিন’ রক্তমাখা গারবেজ নয়। এমন অসংখ্য টুকরো টুকরো প্রসঙ্গ অনুভূতিকে একসূত্রে গেঁথেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবন্ত দলিল কৈলাস দেবনাথ। কংগ্রেস থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টি সব রাজনৈতিক দলকেই খুব কাছে থেকে দেখেছেন। কিন্তু কে ঠিক আর কে ভুল জীবনের সায়াহ্ন বেলাতে এসেও বুঝে উঠতে পারলেন না । তাঁর নিজের ভাষায় – “ চোদ্দো বছর বয়সে নলিনীবাবুর আহ্বানে স্বদেশী করলাম, ব্রিটিশের গোলামি করুম না বইল্যা কলেজ টলেজ বিশেষ গেলাম না, ঠিক করলাম ? গান্ধীজী তখন ও আসেন নাই। তারপর আমি গান্ধীজীর চেলা। সুভাষ বোসের সঙ্গে যখন গান্ধীর গণ্ডগোল ,আমি ভাবলাম কী করি ? গান্ধী গ্রুপের উপর হইতে শ্রদ্ধা গেল গিয়া।”[৩]

পরবর্তীতে কমিউনিস্টদের বেশকিছু বিষয় তাঁর ভালো লেগেছে। তবে একটা বিষয়ে তিনি দৃঢ় যে সুভাষ বোস 'দ্যাশের' ক্ষতি করতে পারেন না। জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কবিতার খাতায় যেখানে দেশভাগ রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ কী নেই। বামপন্থীদের মতো বলেন ' এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের সংস্থা করেন আবার মহাকাব্যও লেখেন। বাড়ির লোকের কাছে আপদ, আশেপাশের মানুষের কাছে 'পাগলা দাদু' তাঁর লেখা পদ্য ভাইপো বোয়ের কাছে আবর্জনা। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন নিতে তাঁর আত্মসম্মানে লাগে, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষাও খুঁজে পাননা তিনি। বাক্‌হারা কৈলাস দেবনাথ উপলব্ধি করেছিলেন দেশপ্রেমের সঙ্গে ধর্ম মেশানো ঠিক হয়নি। তাঁর ভাষায় – " গীতা হাতে শপথ নিতাম, কালীর পা ছুঁইয়া অনুশীলনীর পোলাপাইনগুলি শপথ নিত মোসলমানরা ইয়ার মধ্যে যাইব ক্যান ? এসবের রিয়াকশনেই তো মুসলিম লিগের জন্ম ।"[৪] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত– "নবজাগরণের লাড্ডু খাইছে কলকাতা । গ্রামে তার কী এফেক্ট? মোসলমানেরা এই নবজাগরণের হল ঘরের ভিতরে ঢোকা দূরে থাক, হলঘরের বাইরের মাঠেও ছিল না, শূদ্ররাও নয়।" এটা তো সত্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উন্নয়নের ঢেউ সমাজের সর্বস্তরে সমান ভাবে পৌঁছায়নি । উন্নয়ন হয়েছে দেশের কিছু অংশে এবং সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে । এখনো আমাদের দেশের ও রাজ্যের অনেক প্রান্তেই উন্নয়নের আলো এসে পৌঁছায়নি । এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষনশক্তি যে কোনো বিষয়কে খুব গভীরভাবে দেখার প্রচেষ্টা ঔপন্যাসিকের শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। এই উপন্যাসে সেই শক্তিশালী অস্ত্রের নিপুণ প্রয়োগে চরিত্রগুলির চিত্রায়নে, বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণে, একেকটি অধ্যায়ের পৃথক নামকরণে ।

দুই স্মৃতিবেদী অনঙ্গমোহন আর কৈলাস দেবনাথ যেন দুই বিবেক। কৈলাস দেবনাথ ফেলে আসা দিনগুলোর নিপুণ বিশ্লেষণ করেন। আর অনঙ্গমোহন আস্থা রাখেন জীবনে আর ভবিষ্যতে । তারা দুই মলিন স্মৃতিবেদী প্রতিনিয়ত দেখে চলেন চলমান জীবনের ছবি। দেখেন পিতৃপুরুষের ভিটার আঁটি থেকে জন্মনেওয়া আমগাছে মঞ্জুরী এসেছে। দেখেন উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে শাবল গাঁইতি নিয়ে প্রমোটাররা উন্নয়নের কান্ডারী, জীবন অভিজ্ঞতায় বারবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কৈলাস দেবনাথের কাছে আশা যেন কুহকিনী, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ,গান্ধীজী সাম্যবাদ সবাই যেন পরাজিত ধর্ম নামক অস্ত্রের কাছে। তবুও অনঙ্গমোহন ভরসা রাখেন ভবিষ্যতে আলোর পথে – " সূর্যস্য পশ্য শ্রেমনাং যেনে তন্দ্রয়তে চরণ চরৈবেতি চরৈবেতি '[৫] দেখ সূর্যের আলোক গরিমা সে কখনো পথচলা থামায় না। এতএব চলো চলতেই থাকো লেনিন বলেছিলেন ' টু স্টেপ ফরোয়ার্ড ওয়ান স্টেপ ব্যাক। ..." আসলে জীবন ও নদীর মতো এগিয়ে চলে সামনের দিকে। নদীর জল যেমন যাত্রাপথে কীটদুষ্ট হয় জীবনের গতি ও বাঁধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু জলধারাকে যেমন রোধকরা যায় না জীবনের গতিকে ও তেমনি থামানো যায় না সুতরাং চলতেই থাকো।

ধর্মকে সামনে রেখেই দেশভাগ হল, আর তাতে আখেরে লাভ হল বা স্বপ্নপূরণ হল রাজনৈতিক নেতাদের আর সাধারণ মানুষ ধর্মের পর্দায় চোখ বেঁধে বাঁদর নাচ নাচছে । উপন্যাসে ঘরছাড়া দেশছাড়া উজামা বলেছে – " ওরা ভারত দুনিয়ার সব মুসলমান ভাই।তাই যখন বিপন্নবোধ করেছে পাকিস্থান চেয়েছে। কিন্তু জিন্নাহ পাকিস্থান চেয়েছিলেন মুসলমানদের জন্য নয় ফর হিস ওন ইন্টারেস্ট। নেহেরু পলেটিক্যাল মার্কেটে আছেন তাই ওর ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান মানুষ হওয়ার সম্ভবনা নেই। তার দরকার ছিল আরেকটা দেশ,সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খায়েশ।"৬ এই কথাগুলি বলেছেন ধর্মসূত্রে একজন মুসলিম কন্যা কিন্তু সেও দেশভাগের শিকার। 'বিলু, উজমা ধর্মের সংকীর্ণতা ও বিষাক্ততাকে ঝেড়ে ফেলে মানবধর্মের কথা বলে আর মানবধর্মের কথা তো সব ধর্মের মূলকথা। কিন্তু বাস্তবে শব্দ আর সত্য একসূত্রে মেলে না, তাই সেখানে 'ফিলোসফি' নয় বড় হয়ে ওঠে 'রিচুয়াল'। এরকম নির্মম বাস্তব সত্যগুলোই এই উপন্যাসের সম্পদ ।

দেশভাগের ফলে অগণিত মানুষ পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে, তাদের নতুন পরিচয় 'রিফুউজি'। সংস্কৃত পন্ডিত অনঙ্গমোহনের পরিবার; কিংবা কৈলাশ দেবনাথের মতো আরও অজস্র পরিবার। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে

অনঙ্গমোহন টোল ছেড়ে, 'স্বপ্নের স্মৃতিকণা' ছেড়ে এপার বাংলায় পরিণত হয় 'চা বিক্রেতায়' একসময় যিনি ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শেখাতেন তাঁকে এখন জনগনেশের জন্য চা তৈরী করতে হয়। বিধবা পুত্রবধূ অফিসে যায়, এ যেন জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই। গল্পের নায়ক বিলু অনঙ্গমোহনের পৌত্র, সে দেশভাগ দেখেনি কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণা, বাবাকে হারানোর বেদনা, মায়ের লাঞ্ছনা, দিদির বৈধব্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে; দেখেছে ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল দিনগুলি । রাজনৈতিক আবর্তে না জড়িয়ে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আসলে রাজনীতির আগুন সে দেখেছে, যে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই না হয়ে সে চেয়েছে রাজনীতির কীটদুষ্ট জলে ভেসে আসা পরিবারটিকে দাঁড় করাতে; অপমান লাঞ্ছনার যোগ্য জবাব দিতে । হকার কমিটির সদস্য একবার চা বিক্রেতা অনঙ্গমোহনকে বলেছিল – " কি বলছেন বাঙাল দাদু ? বিজনেস করতে পারবেন ? সব চৌপাট হয়ে যাবে। মাত্র পাঁচ টাকা মাসে বাগবাজার স্ট্রিটের একশো চল্লিশটা হকার দিচ্ছে যারা সকালে শাকসব্জি নিয়ে বসে ওরাও দিচ্ছে আর আপনি কে হরিদাসের বাচ্চা যে দেবেন না ?" [৭] দুই বাংলার ভাষাগত একটা দূরত্ব ছিল কারন ওপার বাংলার মানুষের বাঙাল ভাষা এপার বাংলার কাছে চিরকালই হাসির খোরাক। এবার বুঝি গুরুজনকে সম্মানের চিত্রটাও বদলে গেল। তারপর অতিরিক্ত হিসাবে পাঁচটাকা কাটমানি। এভাবেই অনঙ্গমোহনদের বারংবার এপার বাংলার মানুষের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। কিশোর বিলু তার সাক্ষী,তাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে চেয়েছে যাবতীয় অপমানের যোগ্য জবাব দিতে আবহাওয়া বিজ্ঞানী হয়ে বিলু দেখেছে দেশ ভাগ হয় কিন্তু আবহাওয়া...? ; "সারা দুনিয়া জুড়ে এক নিয়ম মেয়েদের পাসপোর্ট নেই ভিসা দরকার নেই । জেরুজালেমের মেঘ প্যালেস্টাইনে উড়ে গিয়ে বৃষ্টি ঝড়ায়। সিন্ধুপ্রদেশে জন্মানো মেঘ জলন্ধরে বৃষ্টি দেয় ।"[৮]

বিলু ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও সে কিন্তু ধর্মকারার প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে । ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করে ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছে শুধুমাত্র গলায় পৈতে ঝুলিয়ে নয়। পাকিস্তানী উজমাকে জীবনসঙ্গিনী করেছে কিন্তু মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট কোথায় যেন বিলুর অন্তরের গোপন কোঠরে বাসা বেঁধেছিল। উজমাকে দেহে মনে গ্রহণ করলেও সেই সেন্টিমেন্টের প্রাচীর কিন্তু এত সহজে অতিক্রম করতে পারেনি। মুসলিমদের জন্যই তাদের দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল। বিলু চরিত্রের মনোগহনে এই দ্বন্দ্বই আজন্ম কুরে কুরে হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিত ধ্বংস হলে হিন্দু হিসাবে সে লজ্জিত হয়। দাঙ্গার আগুনে তার সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার আগেই উজামার গর্ভে অন্ধকার দেশে তলিয়ে যায়। দেশ, রাজনীতি, ধর্মের মোহ ক্ষমতার বিস্তার প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মৃত্যু উপত্যকায় নিয়ে আসে, এ থেকে মুক্তি নেই। স্বপ্নময় চক্রবর্তী এই সত্যকেই যেন উপন্যাসের এক একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে বলতে চেয়েছেন। অনঙ্গমোহন, বিলু, উজামা, কৈলাশ দেবনাথ, মাধুরী, বিলুর অনাগত সন্তান প্রত্যেকের জীবনে নিয়ামক হয়ে ওঠে রাজনীতি ও ধর্ম এবং ক্ষমতার আস্ফালন। শুধু বিলু নয়, বিলুর মা অঞ্জলিরও প্রাথমিক পর্বে উজামাকে গ্রহণ করতে বেঁধেছিল। কিন্তু একসময় অঞ্জলিও 'পাথরের' নারায়ন শিলাকে ফেলে রক্তমাংসের 'নারায়ন' এর জন্য দিল্লিতে পুত্র বিলুর কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ এই অঞ্জলিই যখন বিলুর কাছে প্রথম উজামার খবর শোনে তখন আঁতকে উঠে বলেছিল – " বললেই হল মোসলমান না,ওর বাপ মোসলমান, মা মোসলমান, মোসলমান ঘরে জন্ম, আমার ঘরে নারায়ণ আছে।"[৯] শুধু তাই নয়, অঞ্জলি পুত্রকে আরও বলে -" তুই যদি খ্রীষ্টান ও আনতি, অরাজি হতাম না। যে মোসলমানদের জন্য দেশ ছাড়তে হল, তাদের ঘরের মেয়ে আমার ঘরে ঢুকামু ? তার উপর আবার বিহারী ...তোর বাবা থাকলেও রাজী হইত না, তোর দাদুও না..." [১০] মুসলিমদের প্রতি এই ক্ষোভ বিদ্বেষ শুধুমাত্র অঞ্জলির নয়; এপার বাংলার একটা বৃহৎ অংশের । রাজনৈতিক নেতারা ধর্মের নামে মানুষে মানুষে ভেদ তৈরী করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিল। আর ধর্মের উস্কানির সেই ধারা এখনো কিন্তু রাজনীতির তুরুপের তাস। একসময় অঞ্জলিও মুসলিম উজামার মধ্যে খুঁজে পান স্নেহের 'উজুমাকে'। ধর্মীয় সংকীর্ণতা হার মানে স্নেহের কাছে। অঞ্জলির উপলব্ধিতে অনন্যসাধারণ মানবতার জাগরণ – "হে নারায়ণ হে রূপনারায়ণ, জলে স্থলে পাহাড়ে পর্বতে তুমি আছো শিলারূপে।এতদিন আমার সংসারে ছিলে এই আকাশ তোমার এই জল ও তোমার। তুমি তোমার কাছেই থাকো। ফুল চন্দনের সেবা তোমার লাগে না, এইসব

আমাদের সান্ত্বনা, হে ঈশ্বর, মন্দির ভাঙ্গে ধার্মিকেরাই, মসজিত যারা ভাঙে, তারাও নিজেদের ধার্মিক ভাবে। আমি কিন্তু আমার ধর্ম রাখার জন্যই তোমাকে এই গঙ্গাজলে রাখলাম, লক্ষ লক্ষ বছরের নদীজলে তোমার নিত্যপূজা হোক। তুমি যদি অন্তর্যামী হও, তবে তো জানোই আমার অন্তরের কথা। আমার দুর্বলতা ও আমার সংস্কারের বেড়া পার হতে পারিনি কিছুতেই। কত সমস্যা তোমায় নিয়ে। সমস্যা তোমার নয় হে নারায়ণ, আমার তার ওপর আমার সংসারে আসছে আরেক নারায়ণ, শিশু নারায়ণ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী করতে চাইনা তারে, তোমার সঙ্গে মিলাইতে চাই তুমিই সে। আমি বিলুর কাছে যাব। আমি যেন নতুন মানব শিশুটির মধ্যে তোমারে পাই।”[১১]

'মোজাহির' আর 'রিফিউজি' এরা দেশভাগের চিহ্ন বহণ করে সব দেশে সব কালে। ইসলাম ধর্মে নবির মক্কা যাওয়াকে বলা হয় হিজরত। যেদিন গেলেন সেদিন থেকেই হিজরি সন গণনা শুরু। নবির সঙ্গে যারা মক্কা গিয়েছিলেন তাদের বলা হয় 'মোজাহির' বা 'মুজাহির'। ধর্মের কারণে দেশভাগ করাকে বলে মোজাহির, তাই যারা দেশভাগের সময় ভারত থেকে পাকিস্তান বা 'সো কল্ড পাক মিঙ্গ হোলি ল্যান্ড' এ গিয়েছিলেন ধর্মীয় কারণে তারা মোজাহির। কিন্তু ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আগত হিন্দুরা মুজাহির নয়, তারা রিফিউজি। ঘরছাড়া অধুনা পাকিস্থানী বিহারী মুসলিম উজামা তাই বুঝতে পারে রিফিউজি বিলুর যন্ত্রনা। ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসে তাদের ক্যাম্প জুটেছিল, কলোনিও জুটছিল, চাকরী পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল। কিন্তু রিফুউজি তকমা তাদের আজও ছাড়েনি। শুনতে হয়েছে 'বাঙাল মনুষ্য নয় উড়ে একজন' এর মতো শ্লেষ কিংবা 'ভাটিয়া' র মতো সম্বোধন। সেই ধারা কিন্তু আজও চলছে, একদা বাংলাদেশী অধুনা ভারতবাসীকে এইসব বিশেষন শুনতে হয়। ভাষাগত ব্যবধান বা বঙ্গালী উপভাষায় কথা বলার জন্য উপহাসের শিকার হতে হয়। কলকাতার বালিগঞ্জে থাকা অনঙ্গমোহন প্রফুল্লনগর কলোনীতে গিয়ে তাই মুক্তমনে কথা বলতে পারেন। কারণ সেখানে যারা আছেন তারা তাঁর ভাষাতেই কথা বলেন। কতদিন পর সেখানে গিয়ে শুনলেন তাঁর দেশের ভাষা একেবারে গ্রাম্য নোয়াখালি – “ এরিও...হুইনছেননি ? আমনে বোলে ইয়াঁনে বাত খাইতেন নঁ ? ক্যা? দুপুরে আইয়া চিঁড়া খাইবেন? আঁইয়ারা কম বামননি ? আম্মেরা উচা বামন নি ? হিয়াল্লাই নি ? মনে রাইখ্যেন, ইয়াঁনে আঙ্গোর আকই জাত।” [১২] সত্যি এখন উঁচু ব্রাহ্মণ নিচু ব্রাহ্মণ নয় এখন একটাই পরিচয় 'রিফিউজি' । ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বহু পরিশ্রমে, তত্ত্ব ও তথ্যে সহানুভূতিশীল হৃদয়ের মেলবন্ধনে তাঁর এই উপন্যাস রচনা করেন। ফলে 'রিফিউজি' জীবনের যন্ত্রনা তাঁর লেখনীতে এত সাবলীল ও প্রাণময় হয়ে উঠেছে। লেখক বইপত্র ছাড়াও উদ্বাস্তু জীবনের এই তথ্যসংগ্রহ করেছেন বয়স্ক মানুষের মৌখিক স্মৃতিকথা,ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং উদ্বাস্তু পরিবারের যত্নে রাখা ডায়েরি থেকে। অনঙ্গমোহন প্রফুল্লনগর কলোনীতে যখন নিজের ভাষা শুনতে পান যেমন- “ এড্ডু ইচামাছ আছিল,আইল্লা দি করুম,না লতিদি করুম ঠিক কইত্তাম পারিনা।”[১৩] নিজের ভাষা শোনার মধ্যে এত শান্তি এত পরিতৃপ্তি। 'রিফিউজিদের এদেশের মানুষ স্থান দিয়েছে কিন্তু গ্রহণ করতে পেরেছে কি? এই প্রশ্নের মুখে ঔপন্যাসিক আমাদের দাঁড় করিয়েছেন। 'রিফিউজিদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা তারা সব পারে। এমনকি রিফিউজি মেয়েদের সাথে সিফিলিস রোগাক্রান্ত পুরুষের বিবাহ দেওয়া যায়, জোর করে 'কুলগুরুর' সন্তান বংশ রক্ষার জন্য তাদের ধারণ করতে হয় এবং বংশের উত্তরাধিকারী প্রাপ্তির পর সেই রিফিউজি বধূকে ঘর থেকে তাড়ানোও যায়। উপন্যাসের মাধুরী তেমনই চরিত্র। সব পারে বলেই বোধহয় রিফিউজি মাধুরী গলায় দড়ি দিয়ে জীবননাট্যের ইতি টানে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার পরিচয় রিফিউজি যারা খেতে পেলে শুতে চায়। যারা এক নম্বরের নেমকহারাম।

উজামাও বিলুর মতোই দেশভাগের শিকার। দেশভাগ তারা দেখেনি কিন্তু তার ফলশ্রুতি উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করেছে। দুই নারী-পুরুষ পূর্বজদের স্মৃতিচারণার ঝুড়ি উপুর করে দেয়। উজামা বলে – “ আমি আপনার মতোই স্বাধীনতার পর জন্মানো। বাপ পিতামহের মুখে দেশের বাড়ির কথা শুনেছি। দেশের কথা বলার সময় কী উচ্ছ্বাস,কখনও কান্না জানেন...আমার আব্বু-আম্মাও তাই করত। আমাদের গ্রামের নাম ছিল দরিয়াপুর বলত দরিয়াপুরকা পানি দুধ বরাবর।”[১৪] উজামার আব্বু-আম্মার অনুভূতি আর বিলুর ঠাকুর্দা সংস্কৃত পন্ডিত 'অনঙ্গমোহনের' অনুভূতি কী আলাদা

?এদের প্রত্যেকেই চোখভরা স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। উজামার পরিবার বিহার থেকে পাকিস্তানে আর অনঙ্গমোহনরা পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে। এদের স্বপ্নপূরণ কী হয়েছিল ? যে স্বপ্ন তাদের দেখানো হয়েছিল। আজও তো সিরিয়া লেবাননে প্যালেস্টাইনে কত মানুষ উদ্বাস্তু হয়; কত নারী ধর্ষিত হয়, কত শিশু মৃত্যুর মিছিল, আসলে ঘর হারাদের যন্ত্রণা ঘড় ছাড়ারাই বোঝে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী বুঝি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন চরিত্র নির্মানে, কাহিনী বয়নে 'জলের উপর পানি সত্যিই অনবদ্য । আর কালজয়ী সাহিত্য কেবলমাত্র বিশেষ দেশকালে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বকালীন সর্বজনীন হয়ে ওঠে । এর আবেদন হয় শাশ্বত 'জলের উপর পানি' উপন্যাসের কাহিনী দেশ-কালের গন্ডী অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন। অনঙ্গমোহন, কৈলাশ দেবনাথ, মাধুরী, বিলু, উজামা, সিরিয়া, লেবানন, পূর্বপাকিস্তান, বিহার সব কোথায় যেন একসূত্রে মিশে যায়।

চতুষ্পাঠীতে ঔপন্যাসিক যে কাহিনী বুনেছিলেন জলের উপর পানি তারই শেষাংশ। একদিকে প্রবল সঙ্কটে দেশভাগ পরবর্তী বাংলা যেখানে গুড়িয়ে যাচ্ছে বাঙ্গালী ও তার অবশিষ্ট মূল্যবোধ। অন্যদিকে অচল পয়সার মতো ইংরাজী না জানা আচার্যদেব অনঙ্গমোহন গুটিকয়েক ছাত্রছাত্রী নিয়ে তাঁর চতুষ্পাঠীকে টিকিয়ে রাখার মহাকাব্যিক লড়াই লড়ে যাচ্ছেন 'জলের উপর পানি'তে নায়ক অনঙ্গমোহনের পিতৃহীন পুত্র বিলু। অনঙ্গমোহন তাঁর দার্শনিক মন নিয়ে খুঁজে চলেছে আত্মার স্বরূপ। বিলু দেশভাগের ফল উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করেছে, দেখেছে ষাটের দশক ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলি ভয়ঙ্কর এক সময়কে। সংবেদনশীল নিরাভরণ ভাষায় স্বপময় সেইসব উত্তাল দিনগুলোকে গেঁথেছেন চতুষ্পাঠী ও জলের উপর পানিতে, দুয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ঔপন্যাসিকের ভাবনা ও জীবন দর্শন। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'জলের উপর পানি' শুধু উপন্যাস নয়; একটি সময়ের দলিল যেখানে মিশে আছে ধর্ম, ইতিহাস, প্রেম, স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা।

তথ্যসূত্র-

১। সেন সলিল, নতুন ইহুদী' সম্পাদনা, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২য় সংস্করণ এপ্রিল ২০১১, প্রথম দৃশ্য ,পৃ-৩১

২। তথ্যসূত্র, সম্পাদক সুব্রত রায়চৌধুরী, 'দেশভাগ স্মৃতি ও সত্তার বিষাদ' ২৫ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২০, ISSN- 2278-5922, পৃষ্ঠা- ৬৫

৩। চক্রবর্তী স্বপ্নময়, জলের উপর পানি, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২১,পৃষ্ঠা-১০৩

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৩

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩০ , ৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭ , ৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩০ , ৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯৪

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯১

১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩১

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯

১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮

....

প্রভাত দাস , সহকারী অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ , নুর মোহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

অমৃতা চক্রবর্তী , সহকারী অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ , নুর মোহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

রূপমঞ্জরী – দেশ-কাল-কল্পনার নিটোল বুননে গড়ে ওঠা এক বিস্মৃত সময়ের কথারূপ

ডঃ রূপা চট্টোপাধ্যায়

সারসংক্ষেপ –

২০০০ সালে বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস রূপমঞ্জরী। কথাকার – নারায়ণ সান্যাল। ইতিহাসের ধারায় 'রূপমঞ্জরী'র আখ্যান ভাগ বাংলাদেশের অষ্টাদশ শতক। উপন্যাসের নায়িকা 'রূপমঞ্জরী'র চরিত্র নির্মাণে কথাকার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র উননব্বইতম পুস্তিকা – 'চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী মহিলা' তে উল্লেখিত অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই স্বয়ংপ্রভ নারী হটী বিদ্যালঙ্কার (১৭৪৩? – ১৮১০) ও হটু বিদ্যালঙ্কার (১৭৭৫? – ১৮৭৫?) এর সংক্ষিপ্ত জীবনীর সূত্র ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়িকা রূপে রূপমঞ্জরীকে কেন লেখক গ্রহণ করেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে 'রূপমঞ্জরী' এক 'মিসিং লিঙ্ক' যে কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে আপন শক্তিতে বহন করেছে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বের 'পূর্বাধিকারী'র কথা না জানলে অষ্টাদশ শতকের অমানিশার অন্তে উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয়কে বড়ো আকস্মিক মনে হয়। ইতিহাস পরম্পরার সূত্রে বা কার্যকারণের সূত্রে বাঁধা। তাতে আকস্মিকতার কোনো স্থান নেই। ইতিহাসের এই 'ক্রমানুগত্যে'র তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতেই রূপমঞ্জরী এবং তাঁর বাবা রূপেন্দ্রনাথের অসাধারণ জীবনের আলেখ্য রচনা করেছেন উপন্যাসিক। যে আখ্যানে উঠে এসেছেন একাধিক ঐতিহাসিক চরিত্র। ইতিহাসের সত্য ও গল্পের সত্যের মিশেলে গড়ে উঠেছে আখ্যান ভাগ। সময়ের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশাচার-লোকাচার-কিংবদন্তীর নিটোল বুননে; যোগ্য সঙ্গত করেছে কাল্পনিক চরিত্রগুলি – যারা শুধু আখ্যানভাগ গড়ে তুলেছে তাই নয়, দেশ-কালের চালচিত্রকে পুনর্নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু 'এহো বাহ্য' । 'রূপমঞ্জরী' পাঠের অভিজ্ঞতা অনাস্বাদিত পূর্ব। কারণ এই উপন্যাস শুধু কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটা বিশেষ সময়কে নিপুণভাবে তুলে ধরার কাহিনি মাত্র নয়। কিংবা নারীজাগরণের প্রজন্ম বাহিত সত্যের কাল্পনিক বয়ান মাত্র নয়; এর মধ্যে আছে অসংখ্য উপকাহিনির সংযোজন, আছে ধর্ম-শাস্ত্রের বিশ্লেষণ , আছে স্থান মাহাত্ম্যের পরিচয়। এতে উপন্যাসের আখ্যান কখনো কখনো যে শিথিল তনু হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এটুকু ত্রুটিকে মেনে নিলে এই উপন্যাস পাঠকের কাছে পরম উপভোগ্য এবং অবশ্যপাঠ্য-সন্দেহ নেই।

মূল শব্দ –

ঐতিহাসিক উপন্যাস, অষ্টাদশ শতক, বঙ্গসমাজ, নারীশিক্ষা, হটুবিদ্যালঙ্কার, হটীবিদ্যালঙ্কার, মিসিং লিঙ্ক, বঙ্কিম পুরস্কার।

মূল প্রবন্ধ -

কালের উজানে পাড়ি জমিয়ে যে কথাকোবিদ ইতিহাসের ঘাটে তাঁর আখ্যানের নোঙর ফেলেন, তাঁর হাতে আসে ঐতিহাসিক তথ্যের কিছু শুকনো মাটির দলা। কল্পনার রস সিঞ্চনে তাতেই তৈরি হয় লেখকের অভীষ্ট কথা-মূর্তি আর সেই মূর্তিতে প্রাণ দান করে পাঠকের পরম আস্বাদ্য 'ঐতিহাসিক রস'।[১] ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাহিত্য সংরূপ

নির্মিত হয় এই প্রকরণে। অষ্টাদশ শতকের বঙ্গদেশের কূলে তাঁর আখ্যানের তরী ভিড়িয়ে 'রূপমঞ্জরী'র সন্ধান করেছেন স্বাধীনতাপরবর্তী কালপর্বের লেখক নারায়ণ সান্যাল। এই 'রূপমঞ্জরী' উপন্যাসের জন্যই ২০০০ সালে তিনি 'বঙ্কিম পুরস্কারে' ভূষিত হন।

উপন্যাসটি প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করার আগে এই উপন্যাস এবং তাঁর রচয়িতা প্রসঙ্গে দু-একটি আবশ্যিক তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনটি খন্ডে সমাপ্ত 'রূপমঞ্জরী'র প্রথম খন্ডের প্রকাশ কাল ১৯৯০। দ্বিতীয় খন্ডের গ্রন্থাকারে প্রকাশ কাল ১৯৯৮। তৃতীয় খন্ডটির শেষ পর্ব 'নবকল্লোল' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পূর্বেই ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ এ প্রয়াত হন শ্রীযুক্ত সান্যাল। তাঁর কন্যা অনিন্দিতা বসু পিতার মুখে শোনা কাহিনি অবলম্বনে উপন্যাসটির শেষাংশ রচনা করেন। তৃতীয় খন্ডটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৫ এর ডিসেম্বর মাসে।

১৯৬৯ সালে 'অজন্তা অপরূপা' গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন নারায়ণ স্যানাল। সেটি অবশ্য উপন্যাস নয়। নারায়ণ সান্যালের গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রই জানেন যে, তাঁর যে কোনো রচনার বুনিয়াদ নিবিড় অধ্যয়ন। তাই উপন্যাস হোক্ বা অন্য জাতীয় রচনা, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য তথ্য ব্যাপকতা। তথ্য সর্বস্বতা নয় - কারণ তথ্য তাঁর জাদুকলমে হয়ে ওঠে স্বাদু-রমণীয়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় ব্যক্তি নারায়ণ সান্যালের একটি প্রাপ্তির কথা – যা তিনি গ্রহণে অসম্মত হয়েছিলেন। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার 'আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইন্সটিট্যুট' এর 'বোর্ড অব ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ' তাঁকে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার-১৯৯৮' এর নমিনেশনের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু অজানা কারণে তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হননি।

'রূপমঞ্জরী' উপন্যাসটি পড়বার আবশ্যিক শর্ত লেখকের 'কৈফিয়ৎ' অংশটির সতর্ক পাঠ। কারণ, সেখানেই বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে ঔপন্যাসিকের বিষয় নির্বাচনের কারণ, তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির কথা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসের 'লেখকের কথা' অংশকে স্মরণে রেখেই সম্ভবত নারায়ণ সান্যাল তাঁর 'কৈফিয়ৎ' এ জানিয়েছেন যে, 'রূপমঞ্জরী' উপন্যাসের নায়ক 'সময়' নয়' কারণ তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বলে বিবেচিত কালপর্ব প্রায় পুরো একটা শতাব্দী। শুধু তাই নয় তা পরিবর্তনশীল এবং কালাঙ্কের বিচারে তা ক্রমানুসারী নয়। কাহিনির স্থান ও স্থির নয় – পরিবর্তিত হয়েছে 'তদানীন্তন বৃহত্তর বঙ্গের-অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। কখনো বা বঙ্গ সংস্কৃতির উপনিবেশ কাশীধাম'!'[২] এ।

পরিবর্তনশীল দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর এই উপন্যাসের নায়িকা 'রূপমঞ্জরী'র পরিচয় কৌতূহল জাগায়। প্রশ্ন জাগে উপন্যাসের নায়কই বা কে? এই প্রশ্নগুলির সবিস্তার উত্তর দিয়ে গেছেন স্বয়ং কথাকার। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র ঊননব্বইতম পুস্তিকা 'চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী মহিলা' তে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই স্বয়ংপ্রভ নারী 'হটী বিদ্যালঙ্কার' (১৭৪৩? – ১৮১০), হটু বিদ্যালঙ্কার (১৭৭৫? – ১৮৭৫?) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখিত আছে। এঁদের যুগ্মছায়ায় নির্মিত নারায়ণ সান্যালের মানস কন্যা 'রূপমঞ্জরী'। কিন্তু 'রূপমঞ্জরী' কে নায়িকা রূপে কেন তিনি নির্বাচন করেছেন তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক স্বয়ং। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী রূপমঞ্জরী সেই 'মিসিং লিঙ্ক' যে কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে আপন শক্তিতে বহন করেছে

এক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। যে উত্তরাধিকারীর কিংবা বলা যেতে পারে পূর্বাধিকারীর সংবাদ না জানলে অষ্টাদশ শতকের অমানিশার অন্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয়কে বড়ো আকস্মিক বলে মনে হয়। অথচ ইতিহাসের গতিপথে আকস্মিকতার তো কোনো স্থান নেই। কার্য-কারণের নিবিড় সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা থাকে কালের অপ্রতিরোধ্য বহমানতা। 'রূপমঞ্জরী' যেন রিলে রেসের মশাল বাহক, যিনি ষোড়শ শতকের জাগরণের আলোটুকু নীরবে, নিভৃতে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, বহন করেছিলেন কাল-প্রদত্ত মহান দায়িত্ব – বাহকের। আর তাই তো সেই আলোটুকুই আবার প্রগাঢ় দীপ্তিতে জ্যোতিষ্মান হতে পেরেছে উনিশ শতকের বাংলায়। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ সান্যালের 'কৈফিয়ৎ' অংশ থেকে উদ্ধৃতি অনুধাবন যোগ্য –

"... ঊনবিংশ শতাব্দী সাদায়-কালোয় মেশানো। সে যেন শরৎকালের আকাশ। মেঘরৌদ্রের লুকোচুরি। এদিকে বাইজী-বেড়ালের বিয়ে-বুলবুল-বাবুকালচার, ওদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অতন্দ্র সাধনার আশীর্বাদ। তুলনায় বক্ষ্যমাণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'সেই-তর সময়' নীরন্ধ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্রাবণের অমারাত্রি। শুধুমাত্র তথ্যের অপ্রতুলতা নয়, যেটুকু দৃষ্টিগোচর তাও পঙ্কিল, ক্লেদাক্ত, আদ্যন্ত পূতিগন্ধময় পুরীষ! ... সতীদাহ প্রথাটাকে তখনো কারও আপত্তিকর বলে মনে হয়নি, বিধবাবিবাহ একটা অলীক দিবাস্বপ্ন, কুলীনপাত্রের ধর্মপত্নীর সংখ্যা গুন্‌তি করা হত 'কুড়ি'র এককে। স্ত্রী শিক্ষা এবং বৈধব্যযোগ বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত!

... তাহলে? এমনটাতো হবার কথা নয়? বিবর্তনের একটি ফল্গুধারা তো থাকতেই হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে-পাগল বিদ্রোহী পন্ডিতের পর্ণকুটীর থেকে হোমাগ্নি শিখাটি নিশ্চয় পৌঁছে দিয়েছিলেন রাধানগরের রাজপ্রাসাদে জ্ঞান গরিমার দার্ঢ্যে সমুন্নতশির নবীন ঋত্বিকের হাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয় গোপনে করে গেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অমানিশায় অতন্দ্র 'রাত্রির তপস্যা'। বুড়ো ইতিহাস কথাটা বেমালুম ভুলে বসে আছে!"[৩]

বিবর্তনের ফল্গুধারায় প্রায় অনুচ্চারিত মিসিং লিঙ্কে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ রূপমঞ্জরী চরিত্র যে তাঁর আখ্যানের নায়িকা হবে সেটাই স্বাভাবিক I রূপমঞ্জরী চরিত্রের খুব সামান্য হলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক রূপেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে তথা 'একবগ্গা ঠাকুর' নারায়ণ সান্যালের স্বকপোলকল্পিত। সম্পর্কে তিনি নায়িকা রূপমঞ্জরীর পিতা। উপন্যাসের প্রচলিত ছক ভেঙে তিনি নায়ক হলেন কোন্ সূত্রে? – এর ব্যাখ্যায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন,

"রাজা রামমোহন রায় যদি স্বয়ম্ভু লিঙ্গের মতো অলৌকিক ক্ষমতায় গজিয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে হটী বা হটু বিদ্যালঙ্কারও তা পারেন না। পারে না আমার মানস কন্যাও তাঁদেরও প্রয়োজন এক-একজন পূর্বসূরী। শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিটি রক্তকণিকার প্রতিটি 'জীন'-এ চাই সেই পূর্বসূরীর আশীর্বাদ। বাস্তব রূপমঞ্জরীর পিতৃদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর নারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিন্তু সেই তৃণাদপি সুনীচেনকে দেখা গেল কূপমন্ডূক সমাজের বিরুদ্ধে বজ্রাদপি কঠোর হতে। হটীর পিতৃদেবের নামটা মনে রাখতে পারে নি বুড়ো ইতিহাস। তবে এটুকু তার স্মরণে আছে – সমাজপতিদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তিনি আত্মজার অক্ষর-পরিচয় করিয়েছিলেন, সহমরণের চিতা থেকে নাবালিকাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন।

সেই অজ্ঞাতনামা বজ্রাদপি কঠোর টুলো পন্ডিতই আমার উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র।”[৪]

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে উপন্যাসে ‘বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই’ করে আত্মনীতি নিষ্ঠ ভাবে জীবনের পথ চলেছেন যে মানুষটি অর্থাৎ রূপেন্দ্রনাথ তিনি কোনোদিনই ছিলেন না টুলো পন্ডিত। তিনি ছিলেন ভেষগাচার্য বা ধন্বন্তরি। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে একটি মহিলা বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর স্বপ্ন। সমকালীন বঙ্গ সমাজের ধর্মাচার-লোকচার, সমাজনীতির যিনি প্রতি পদে বিরুদ্ধতা করেছেন, অস্বীকার করেছেন, সেই রূপেন্দ্রনাথকে তো হতেই হতো ‘একবগ্গা’ ‘বজ্রাদপি কঠোর’। কিন্তু তিনিই আবার অভাগা আতুর জল-অচল মানুষগুলির ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছেন ‘কুসুম কোমল’। শুধু সমাজে নয় পরিবারেও যে স্ত্রী-পুরুষের অবস্থান পরিপূরকের এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন রূপেন্দ্রনাথ। তাই দেখা যায় নিরামিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্থ কুসমঞ্জরীকে বিবাহ করার আগে নিজে নিরামিশাষী হয়েছিলেন স্বেচ্ছায় । গর্ভবতী কুসুমমঞ্জরীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে স্ত্রীকে তিনি সাক্ষর করে তুলবেন যাতে তাঁদের অনাগত সন্তানের অক্ষর জ্ঞানদানে সক্ষম হন তাঁর স্ত্রী। হয়ে ওঠেন আর এক ‘মদালসা’ – কাশীরাজ মহিষী।

‘রূপমঞ্জরী’ উপন্যাসের কাহিনির রূপরেখা অনুসরণ করলে দেখা যাবে সোঁঞাই গ্রামে রূপেন্দ্রনাথ তদানীন্তন সমাজপতিদের লোকাচারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নিয়ে চলেন একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সহযোগী ছিলেন কেবল উদারমনা জমিদার ভাদুড়ীমশায় আর গ্রামের অসংখ্য জল অচল মানুষ। কুসুমমঞ্জরীকে ‘রাইরাণি’ হবার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা – তাঁকে বিবাহ করা – সেদিনের পক্ষে অসম্ভব এক সিদ্ধান্ত মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া – কুসুমমঞ্জরীর সন্তান প্রসবকালীন জটিলতা - অথচ সেদিনের ‘ধন্বন্তরি’ রূপেন্দ্রনাথকে প্রসবকালে আঁতুর ঘরে ঢুকতে না দেওয়া ফলশ্রুতি কুসুমমঞ্জরীর মৃত্যু এবং সেই আক্ষেপ-হতাশায় দেশত্যাগ - নীলাচল থেকে কাশী সমকালীন বিদ্বান ও ধর্মীয় নেতাদের কাছে মহিলা বিদ্যানিকেতন স্থাপনে সম্মতি আদায়ে ব্যর্থতা – ফেলে আসা সন্তানের কাছে ফিরে যাওয়া – তাঁকে নিয়ে সোঁঞাই গ্রামে প্রত্যাবর্তন – সমাজের কঠোর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও নিজচেষ্টায় একটি ছোট্ট মহিলা বিদ্যা নিকেতনের প্রতিষ্ঠা – সেখানেই ‘রূপমঞ্জরী’ কে শিক্ষিত করে তোলা – রূপমঞ্জরীর বিবাহ-বৈধব্য-সহমরণে না যাওয়া কন্যাসহ একঘরে হওয়া এবং সর্পদ্রষ্ট আর্তকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণদান। রূপেন্দ্রনাথের চমকপ্রদ জীবনের কাহিনি এই সূত্র ধরেই নির্মিত। কাহিনির পরবর্তী অংশের অগ্রগতির লাগাম তাঁর সুযোগ্যকন্যা রূপমঞ্জরীর হাতে। জন্মেই মাতৃহারা রূপমঞ্জরী মাতৃসমা নারীদের আদরের কোল থেকে ঠাঁই নাড়া হয়েছে একাধিকবার; হারিয়েছে বাল্যবন্ধু সখা শুভাপ্রসন্নের সাহচর্য। একবছরের বিবাহিত জীবনের ইতি ঘটেছে স্বামীর অকাল আকস্মিক প্রয়াণে, সমাজপতিদের সহমরণের বিধান কে অগ্রাহ্য করেছে, অচিরেই হারিয়েছে তার গুরু-শিক্ষক-আদর্শ বাবাকে – তবু মাথা নত করে নি একবারের জন্যও। একমুঠি বাবার স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় বাবার আদর্শ ধরে রাখার চেষ্টা করেছে প্রাণপন কিন্তু মন্বন্তরের ঘূর্ণাবর্তে নিজের গ্রামচ্যুত হয়ে যে বহির্বিশ্বে পা রেখেছে সে, সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল ভীষণতর চ্যালেঞ্জ। নিজ বুদ্ধিবলে – সাহসের জোরে তার মোকাবিলা করে এসে পড়েছে কাশীতে বিদ্যার্ণবের আশ্রয়ে। রূপেন্দ্রনাথের পর যিনি একমাত্র তার আশ্রয়দাতা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু শাস্ত্র পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে কাশীর বৃহত্তর বিদ্বৎ সমাজের রক্ষণশীলতা তাকে পুনর্বার বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে আর কীভাবেই বা রূপমঞ্জরী সেই বিপদমুক্ত হয়েছে সেটাই বর্ণিত হয়েছে তৃতীয় খন্ড জুড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লেদাক্ত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পিতা-পুত্রীর এ সংগ্রাম কুর্নিশযোগ্য।

"ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণত প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি সময় প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য কিছু কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করা হয়। সেই চরিত্রগুলি ইতিহাসের তাৎপর্য পরিস্ফুটনে যথেষ্ট সাহায্যও করে। এই উপন্যাসে তেমন চরিত্র আছে একাধিক। এই চরিত্রগুলির সাহায্যে লেখক একটি বিশেষ সময়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে তুলে ধরেন এবং চরিত্রগুলির আচরণ, ভাবনা-চিন্তার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের অন্তঃস্পন্দনটি ফুটিয়ে তোলেন।"[৫]

'সেই সময়' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয়া সুমিতা চক্রবর্তীর এই মতামত 'রূপ মঞ্জরী' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রণিধান যোগ্য।

উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র সম্পর্কে তথ্যের অভাব হয়ত আছে কিন্তু তার প্রেক্ষাপটের চালচিত্র নির্মাণে উপাদানের অভাব ছিল না। লেখক তার কথা-তুলির জাদুতে পাঠককে নিয়ে অনায়াসে পাড়ি জমাতে পেরেছেন সময়ের উজান ঠেলে অষ্টাদশ শতকে। সেখানে একদিকে আছে কল্পিত চরিত্রের ভিড়, যারা প্রকৃতপক্ষে সমসময়ের সমাজ রসে জারিত হয়ে এক বৃহত্তর সমাজের চালচিত্র নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক নির্মাণের অংশ হয়েও তারা ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জল। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ, ব্রজসুন্দরী, গিরিবালা যদি উচ্চবর্ণের মানুষ হয়েও সমাজ স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানোর স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হতে পারেন; তাহলে ভীমা বাগ্‌দি, ঈশান, বেষ্টাবায়েন প্রমুখ জল-অচল শ্রেণির সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও সেই গৌরবের সমান অধিকারী, হয়ত বা কিঞ্চিত বেশি। জামাতা সৌম্যসুন্দরের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে যখন রূপেন্দ্রনাথ শোকস্তব্ধ, এবং সুযোগ বুঝে 'রূপমঞ্জরী' কে সহমরণে পাঠাতে উদ্যত সমাজপতির দল; তখন রূপমঞ্জরী কে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছে ভীমা বাগ্‌দি সদলবলে। এই ঘটনা হয়ত সেই সাধারণ সত্যেরই পুনঃ প্রতিষ্ঠা যে , যুগ স্রোতে গা ভাসানো মানুষেরা নয়, বরং যুগ পরিবেশের বলদর্পী অন্যায়ের আপন সামর্থ্যে বিরুদ্ধাচরণ করে যারা, তারাই আসলে যুগ পরিবর্তনের সত্যিকারের কুশীলব। এদের নেতৃত্ব দেন যিনি , তিনি হয়ত হয়ে ওঠেন যুগ পরিবর্তনের নায়ক। কিন্তু কোনো একক প্রচেষ্টায় নয়, এই পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে ইতিহাসে অনুচ্চারিত থেকে যাওয়া অসংখ্য মানুষ -- লিঙ্গ-জাতপাত-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানুষ।

দ্বিতীয় খন্ডের 'পরিশিষ্ট' অংশে ঔপন্যাসিক যুক্ত করেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়িকা (তাঁর ভাষায় আত্মজা তথা জননী) 'রূপমঞ্জরী' চরিত্রের মৌল উপাদান হটু বিদ্যালঙ্কার ও হটী বিদ্যালঙ্কারের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনি। সে কাহিনি শুধুমাত্র 'সাহিত্য-চরিতমালা' থেকে উদ্ধৃত এমনটা নয়, সেখানে হটি বিদ্যালঙ্কার ও সমকালীন পন্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের ঐতিহাসিক অবস্থান প্রমাণে শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ওয়ার্ড রচিত "Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos Vol.I, Jan.1811, pp.195-96" উদ্ধৃতি রয়েছে, রয়েছে উদ্ধৃতি হটু বিদ্যালঙ্কার প্রসঙ্গে গগন চন্দ্র হোমঃ "হটু বিদ্যালঙ্কার" – 'সখা' আগস্ট ১৮৯০ থেকেও। প্রামাণ্য ইতিহাসের সামান্যতম সূত্র ধরে যে 'রূপমঞ্জরী' কে লেখক সৃষ্টি করলেন তিনি এককথায় অনন্য। রূপের থেকেও ('রূপমঞ্জরী' নামকরণের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় লেখকের অসাধারণ কল্পনা শক্তির পরিচয়) গুণের আধার এই কন্যে। মেধাবী তো নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাবার মতোই চারিত্রিক দৃঢ়তা, বুদ্ধি বিবেচনাবোধের উপাদানে গড়া এই চরিত্রকে কিন্তু অসাধারণ কুশলতায় রক্তমাংসের মানবী রূপে গড়ে তুলেছেন লেখক। বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক কৌতুহলবশত রূপেন্দ্রনাথের নিষেধসত্ত্বেও লুকিয়ে 'কুমারসম্ভবের' অষ্টমসর্গ পাঠ কিংবা যে স্বামীর সঙ্গে 'ঘরবসত' টুকু হয়নি, হঠাৎ তার থেকে 'বাদলদিনের প্রথম

কদমফুল’ পাবার রোমাঞ্চ কিংবা যে তারাপ্রসন্ন ‘বারিন্দির’ আর ‘রাঢ়ী’র ব্রাহ্মণত্বে তফাত করে রূপমঞ্জরী আর তাঁর আবাল্যের সখা শুভাপ্রসন্নের চার হাত এক করার অনুমতি দেননি , সেই তারাপ্রসন্ন যখন পিতৃহীন রূপমঞ্জরীকে তার ভদ্রাসনে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করেন তখন রূপমঞ্জরীর অভিমানাহত প্রত্যাখ্যান ‘একথাটা সেদিন কেন বলেননি জেঠু’ – এই উক্তির মধ্যে ফুটে ওঠে। আর তখনই ইতিহাসের খড়-মাটির প্রতিমাতে শুনতে পাওয়া যায় প্রাণের স্পন্দন।

উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতা শুধু চরিত্র সৃজনে নয়। এমনকি প্রবহমানতার সূত্র প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়। অসংখ্য সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা, কিংবদন্তী, স্থানমাহাত্ম্যের সংযোজনেও। সেজন্য কথাকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন নানা ইতিহাসবিদের রচনা থেকে। পাদটীকায় তথ্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন যথাবিহিত। এ কাহিনী ইতিহাসের রথে চেপে দ্রুত পথ পরিক্রমণের নয় বরং যেন গজেন্দ্র গমনে সেই দেশ-কাল-পরিবেশের আস্বাদ গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে যাওয়া। শাস্ত্র-দর্শন-ধর্মতত্ত্ব সবই এই উপন্যাসে যথাযোগ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট। হতে পারে তথ্যবহুলতার কারণে গল্পের খেই হারিয়েছে কোথাও কোথাও। কিন্তু ‘সেই-তর সময়কে’ সর্বাঙ্গীণ ভাবে চিনতে, জানতে, অনুভব করতে এ উপন্যাসের জুড়ি মেলা ভার। ঔপন্যাসিক স্বয়ং তার উপন্যাসের গঠন শিথিলতা বা কালক্রম জনিত ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর তাই তাঁর উপন্যাসে দ্রুত কখনো বা আকস্মিক পরিবর্তিত দেশ কাল প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘পাঠক-পাঠিকা যাতে লেখকের মতো দিশেহারা না হয়ে পড়েন তাই মার্জিনে স্থান-কালের ইঙ্গিত রাখা গেছে।’[৬] একথাও কৈফিয়ৎ অংশে লিখেছেন যে, “কোন ধারাবাহিক সাহিত্য-সাপ্তাহিকে অথবা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়তে যদি এ রচনা প্রকাশ করা সম্ভবপর হত তাহলে যে-সব তথ্যগত বিচ্যুতি বা ‘কালানৌচিত্য দোষ’ আমার অজ্ঞতাবশত রয়ে গেল তার অনেকটাই সংশোধন করা যেত। এ-জাতীয় বৃহৎ কাজে সেটা বাঞ্ছনীয়। তাহলে ধারাবাহিক প্রকাশ কালে সতর্ক ও গবেষকমনা পাঠকের হুঁসিয়ারিতে লেখক মার্জনার সুযোগ পায়। উভয় অর্থেই ‘মার্জনা’। সম্পাদকের কাছে লেখা সতর্ক পাঠকের চিঠির কল্যাণে গ্রন্থাকারে প্রকাশ কালে সংশোধনগুলি করা চলে।”[৭]

কিন্তু লেখকেরও দুর্ভাগ্য, পাঠকেরও যে , কোন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে (ব্যতিক্রম তৃতীয় খন্ড – সম্ভবত বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্তির ফলশ্রুতি) এটি প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু কথাসাহিত্যের অনুরোধে তিনি যে সজ্ঞানে কিছু কিছু কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়েছেন তাও স্বীকার করেছেন এবং একাধিক উদাহরণে ঐতিহাসিক সত্যটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যেমন –

“গবেষকদের মতে নদীয়া কৃষ্ণনগরে ‘বারোদোল’ এর মেলার সূচনা পলাশী যুদ্ধের পরবর্তীকালে। শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তার বর্ণনা অ্যানাক্রনিজম”[৮] ইত্যাদি।

আবার, গ্রন্থমধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তারও উল্লেখ করেছেন স্পষ্টাক্ষরে। - “ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাধার প্রথম সাক্ষাৎ, রামপ্রসাদের বাগানের বেড়াবাঁধা, জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের পরিবারে সতীদাহ ইত্যাদি।”[১১]

‘রূপমঞ্জরী’ প্রথম খন্ডটি লেখক উৎসর্গ করেছে ‘বুনো রামনাথ’কে। রামনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক চরিত্র এবং লেখকের প্রাথমিক অভিপ্রায় ছিল এঁকেই তাঁর উপন্যাসের নায়করূপে গ্রহণ করার। কালের হিসেবে মধ্যযুগেও

দাঁড়িয়ে যিনি প্রগাঢ় পান্ডিত্য নিয়ে রাজানুগ্রহকে তুচ্ছ করে অরণ্যের একান্তে তাঁর শিক্ষায়তনকে গড়ে তুলেছিলেন – সেই মানুষটির দার্ঢ্য ঔপন্যাসিককে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হতে গেলে যেটুকু উপাদান বা তথ্য প্রয়োজন হয় তা খুঁজে পাননি ঔপন্যাসিক। কিন্তু তা বলে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ দিতে বাধা নেই। নিজ আদর্শে স্থিতধী মানুষটি রূপেন্দ্রনাথের যথার্থ পূর্বসূরী আর তাই বোধহয় গ্রন্থের সূচনাভাগেই করেছেন তাঁর স্মৃতি তর্পণ।

দ্বিতীয় খন্ডটি নিবেদিত হয়েছে বিদ্যাসাগরী চটির পদ প্রান্তে। বিদ্যাসাগর ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী রূপেন্দ্রনাথের উত্তরসূরী। কিন্তু যে 'ব্রজসুন্দরী বিদ্যানিকেতন' প্রতিষ্ঠায় রূপেন্দ্রনাথ ছিলেন 'একবগ্গা', সেই রূপেন্দ্রনাথের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে অসময়োপযোগী কর্মকান্ডের আখ্যানভাগ বিদ্যাসাগরের মতো যোগ্য উত্তরসূরীর হাতে তুলে দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

ঔপন্যাসিকের স্বীকৃতি মতে রূপমঞ্জরী হচ্ছেন উত্তর শ্রীচৈতন্য ও প্রাক্ শ্রীরামমোহন যুগের বিদ্রোহিনী নারী। তাই তৃতীয় খন্ডটি সমর্পিত হয়েছে ভারতপথিক মহাত্মা রাজা রামমোহনের 'চরণারবিন্দে'। এমনকি আখ্যানটির সমাপ্তিতে নায়িকা রূপমঞ্জরী মৃত্যুর পূর্বে জেনে যাচ্ছেন যে সতীদাহ আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে। যে সহমরণে না যাবার জন্য রূপমঞ্জরী ও তার পিতা একঘরে হয়েছিলেন – সেই সহমরণ থেকে বাঁচতে/বাঁচাতে এসে গেছে আইনি অধিকার। এই অর্থে রামমোহন ও পিতা-পুত্রীর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

এভাবেই কাল বয়ে যায়। সামাজিক কাঠামোয় নারী শিক্ষা-নারী স্বাধীনতার ক্রমবিকাশ ফুটে ওঠে 'প্রথমপ্রতি শ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুল কথার' আখ্যান আধারে। 'রূপমঞ্জরী'র আখ্যানভাগে যে স্ত্রী শিক্ষা-স্বাধীনতার কাহিনি নির্মিত তা উপরোক্ত উপন্যাস ত্রয়ীর কালপর্বের চেয়েও বেশ কিছুটা অতীত। এবং শুধু কল্পকাহিনি নয় বরং তা ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক। 'রূপমঞ্জরী'র কাল-পর্ব 'সেই সময়' উপন্যাসের কালপর্বের থেকেও প্রাচীনতর – ঐতিহাসিক তথ্যও অপ্রতুল। তবু তা 'সেই সময়' উপন্যাসটি থেকে ভিন্নতর এই অর্থে যে 'সেইসময়' উপন্যাসটি একটি বিশেষ দেশ কালের দর্পণ। অন্যদিকে, রূপমঞ্জরী সমকালীন ইতিহাসের সাধারণ তথ্য সত্যকে শুধু তুলে ধরে নি; তা বিশ্বস্তভাবে ইতিহাসের 'ক্রমানুগত্য' তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধ শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন--

"... ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান্ হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যান্ হো পড়ো।"[১০]

উপসংহারে এসে তাই একথা বলা যায়ই যে, ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্বের মোড়কে রূপমঞ্জরীর যে কাহিনি পরিবেশন করেছেন নারায়ণ সান্যাল তা এককথায় অনাস্বাদিত-পূর্ব।

তথ্যসূত্র-

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, ফাল্গুন ১৪০১, পৃঃ ৪৪৮

২. সান্যাল, নারায়ণ, রূপমঞ্জরী, ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুর্নমুদ্রণ বৈশাখ ১৪৩০, কৈফিয়ৎ

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ – অগাস্ট ১৯৯৮, পৃঃ ১৪০

৬.সান্যাল, নারায়ণ, রূপমঞ্জরী ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ-বৈশাখ ১৪৩০, কৈফিয়ৎ

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. ঐ

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ৮ম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, ফাল্গুন, ১৪০১, পৃঃ ৪৫১

....

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ ,সুশীল কর কলেজ

রাজনৈতিক বিপর্যয়ে কোণঠাসা মাতৃত্ব: 'জাগরী'র মা ও 'শহীদের মা'

তমা দাস

সারসংক্ষেপ-

বাংলার মাতৃচরিত্র চিরন্তন। সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক মাতৃহৃদয়ের স্নেহ- ভালবাসার কোনো পরিবর্তন নেই। পূর্বে বাংলাদেশ মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা ছিল। কালক্রমে তা হয়ে যায় পিতৃতান্ত্রিক। পরিচালক পুরুষরাও হয়ে উঠলেও সংসারের অভ্যন্তরের পরিচালক সেই সংসারের মা। কিন্তু এক্ষেত্রেও নিয়ামক পুরুষ। মা যতই লালন-পালন করে মাতৃ আঁচলের নির্মলতা দিয়ে সন্তানদের আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন, সন্তানরা বাইরের দলাদলি থেকে নিজেদের ফাঁকি দিতে পারে নি। রাজনীতির করাল গ্রাসে নষ্ট হয়েছে মায়ের সংসার। বিনষ্ট হয়েছে তার স্বামী-সন্তানদের বন্ধন। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে মা চেষ্টা করেছেন তাঁর মাতৃত্বের প্রলেপ দিয়ে তার স্বামী সন্তানদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন রক্ষা করার।

চুম্বক শব্দ-

রাজনৈতিক , ক্যানভাস, গার্হস্থ্য জীবন, বিলাসিতা, অধিকার, স্বীকৃতি, দলাদলি, অধিকার, সক্রিয়তা।

মূল প্রবন্ধ-

স্বাধীনতার প্রাক্‌পর্ব থেকে বর্তমান রাজনৈতিক উত্থান- পতনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' থেকে 'ঘরে বাইরে', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' থেকে 'দেবী চৌধুরাণী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' সর্বত্রই প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক ক্যানভাসে অঙ্কিত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসটিও এক রাজনৈতিক বাতাবরণে রচিত। যেখানে রাজনীতির চিত্র ভয়াবহ। রাজনীতি কীভাবে একটি পারিবারিক চিত্রকে ঝড়ের মতো ছিন্ন- বিছিন্ন করে দেয় তা 'জাগরী' উপন্যাসে দেখা যায়। আত্মকথনরীতিতে লেখা চারটি পরিচ্ছেদে লেখা আলোচ্য উপন্যাসটির তৃতীয় ভাগটির নাম 'আওরত কিতা-মা'। যেখানে মায়ের আত্মজবানীতে লেখক দেখিয়েছেন রাজনীতির করাল স্রোত কীভাবে এক নারীর গার্হস্থ্য জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। তার সংসার ভেঙ্গে ছারখার করে দিয়েছে।

'জাগরী উপন্যাসের মা চান তার পারিবারে শান্তির ভারসাম্য বজায় থাকুক। ছোটছেলে নীলু স্পষ্ট বক্তা। নীলু বাবাকে তির্যক ব্যঙ্গ করে না কিছু বলে দেয় এই ভয় তাঁর মনে সবসময়। আবার নীলু যদি কিছু বলেও সেটা যাতে বাবার কানে না ওঠে সে চেষ্টাও মা করতেন। মা-দের সাংসারিক ভালোমন্দ, খুঁটিনাটি সব দিকটা খেয়াল রাখতে হয়। নিজেকে পরিপাটি করে রাখার সময় তার কোথায়? বাক্যে কিছু ভুল শব্দ তার ভুলই থেকে যায়, তা শুধরে দিলেও শোধরানোর সময় তার নেই। বিলু-নীলুর মা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানোর সময় ভুল শ্লোকটাই আওড়ান। বিলু-নীলু মায়ের শ্লোকের ভুল উচ্চারণ শুনে হেসে উঠলে মায়ের সম্বিত হয় যে তিনি ভুল উচ্চারণ করেছেন। তাঁর কথার ভুলগুলো ছেলেদের মুখস্থ। তিনি তাঁর ভুল বলা শব্দগুলো ভুলই উচ্চারণ করে যান। সংসারের কাঁধ বাবাদের বলা হলেও মা-ও কিছু কম যান না। সংসারের দায়ভার নিজ কাঁধে নিতে মা-কে তাঁর বিলাসিতা বলিদান দিতে হয়। বিলু-নীলুর মায়েরও তেমন কোনো শখ নেই। বিশেষ কোনো খাদ্যদ্রব্যের প্রতি বাসনা বা পছন্দের তালিকাও নেই। "একটু দুধ না হলে মা'র খাওয়া হয় না। এটিই বোধহয় মা'র একমাত্র বিলাসিতা।"[১] কিন্তু এটুকু বাসনাও যে সবসময় পূরণ করতেই হবে তা নয়,

আশ্রমে অনেক লোকজন আসার কারণে প্রায়ই দুধ থাকত না, তখন অল্প দুধ থাকলে সে দুধটুকু নিজে না খেয়ে ছেলে বিলু-নীলুকে দিতেন।

যিনি সবাইকে স্নেহ দিয়ে আদর দিয়ে লালন করেন তার স্নেহ পাওয়ার অধিকার কেন থাকবে না। কিন্তু বিলু-নীলুর মা-ও তাই মাঝে মাঝে একটু স্নেহ কামনা করেন। তার অসুখ হলে ছেলেদের মুখে অসুখ একটু বেশি হয়েছে মায়ের এমনটাই শুনতে চান। ছেলের- বিলুর হাতের উষ্ণতাতে কপাল ছুঁয়ে দিলেই খুশি হতেন।

একজন মায়ের কাছে তার সন্তানের কাছে প্রাপ্য মাতৃত্ব তিনি অন্য কোনো নারীর সাথে ভাগ করে নিতে চান না। তার মাতৃত্বের দাবি স্বীকৃতি 'মা' ডাক তো একদমই না। বিলুর তার জ্যাঠাইমাকে মা ডাক বিলুর মা পছন্দ করেননি। তাই বিলু যখন মায়ের সামনে জ্যাঠাইমার তিলবাটা দিয়ে ঝিঙ্গের ঝোল রান্নার প্রশংসা করলেন তখন বিলুর মা তাকে বাড়িতে খেতে বলেন। বিলুর মিষ্টভাষিনী মায়ের মুখে এইরকম তির্যক উক্তি শুনে বিলু অবাকই হন। নীলু কারণটা জানিয়ে দেয় জ্যাঠাইমাকে বিলুর মা ডাক। আর সেজন্যই মা বিলুকে তুমি বলে সম্বোধন করেন। সন্তানের প্রতি অভিমানে নিজের অধিকারের দূরত্ব তৈরী হয়ে যায়। তুই থেকে তুমি বলেন ছেলেকে।

বিলু ফাঁসি সেলে, তার ফাঁসির আদেশের শেষ দিনটি যখন উপস্থিত বিলুর মা সারারাত ঘুমোতে পারবেন না। মা-এর মন ভালো নেই, সন্তানের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। মা তাই জপ করবেন। নীলুর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের সময়ও মা সারারাত পূজার ঘরে থাকলেন সেসময় মা বিলুর সাথেও কথা বলার সাহস পান না পাছে বিলুর কাছে কোনো গুরুতর খবর পেয়ে যান মায়ের ডানপাশের কোলের দাবি নিয়ে নীলু-বিলুর মধ্যে ঝগড়া হলে মা বিলুকে মারেন ঝগড়া করার জন্য। পরে বিলুকে গিয়ে বোঝান বাঁ পাশের কোলটাই তো ভালো , কারণ সে দিকের কোলেই মাথা দিয়ে মা শিশুকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ান; তাই বিলুর জন্যে বাঁ পাশের কোলটা। বিলুর বাবা কোনোদিন ছেলেদের সাথে সহজভাবে মেশেননি। তাদের সাথে শিশুসুলভ ব্যবহার বা আদর কিছুই করেননি। তাঁর ধারণা ছিল ছেলেরা আসকারা পেয়ে বিগড়ে যেতে পারে। তাই বিলুর বাবার থেকে বিলু-নীলুর দূরত্ব মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছে। "নীলু বিলুর আদর আবদার যা কিছু সব মায়ের সঙ্গে। একসঙ্গে খাওয়া বসা, মনের কথাটি বলা, ছোটবেলার মতো এখনও সব সেই রকমের বজায় আছে।"[২]

একজন মা চান তার ছেলেরাই পৃথিবীতে সবটা ভালোবাসা পাক। ছেলেদের বাবারাও সবথেকে তার ছেলেদেরই ভালোবাসুক। বিলু-নীলুর বাবার নিজের ছেলেদের ফাঁকি দিয়ে অন্যের ছেলেকে আদর করা, অন্যের ছেলের জন্য পকেটে লজেন্স রাখা এতে সংসারে নিশ্চুপ থাকা বিলু-নীলুর মা-ও মুখ খোলেন, একজন বাবার কাছে নিজের ছেলেদের ভালবাসা প্রাপ্তির অধিকার দাবি করেন।

ছেলেরা দুষ্টুমি করলে মা তাদের বাবার কাছে নালিশ করেনি। ছেলেদের দোষ ত্রুটি বাবার থেকে আড়াল করেছে। বিলুর হাত থেকে দোয়াতের কালি পড়ে নীলুর 'ক্ষীরের পুতুল' বইটি নষ্ট হয়ে গেলে নীলু রাগ করে বিলুর মার্সডেনের ইতিহাস বইটি বটি দিয়ে কেটে ফেলে। তাদের বাবা চলে এলে, তাদের মা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে টুকরো করা বইটি ঢেকে রাখে যাতে বাবা না দেখতে পান।

বিলু রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে। বিলুর ফাঁসির আদেশ এসেছে। সংসারে ঢুকিয়ে দিলে হয়তো এমনটা হতো না, বিলুর মা আক্ষেপ করেছে, বিলুর সাথে বিয়ের কথা সরস্বতীর বাড়ি থেকে বলেছিল। সরস্বতীরা অবাঙালি, বাঙালি সংস্কৃতি তাদের তেমন জানা নেই, তার সাথে বিলু কীভাবে মানিয়ে চলবে, তাই তাদের মা তাদের না করে দেয়।

বিলু-নীলুর মা-ও জেলবন্দী। জেলের সবাই তাকে মা বলে ডাকে, এই মা ডাকে তাঁর মন নরম হয়ে যায়। কাউকে কিছু বলতে পারে না, কড়া কথা শোনানো দূরে থাক, তিনি সবার মা হতে চান না। তিনি শুধু বিলু-নীলুরই মা হতে চান। আবার এও চান বিলু নীলু যেন তাকে ছাড়া পৃথিবীকে আর কাউকে মা না বলে, কিন্তু বিলু-নীলুর জন্ম তো দেশে জন্য, দেশের মানুষ তাদের চায়- "আমি চাই বিলু নীলুকে একেবারে আমার নিজের করে রাখতে, যাতে ওদের উপর আর কারও দাবি-দাওয়া না থাকে। কিন্তু আমি ওদের আঁকড়ে ধরে থাকলে কী হবে, রাজ্যের লোক যে ওদের চায়। সকলেরই টান যে ওদের উপর। আমি কি ওদের ধরে রাখতে পারি?"[৩]

বিলুর বাবা রাজনৈতিক কর্মী। সংসারে সুখের কিছু নেই। অর্থ- সম্পত্তি স্থায়ী ঠিকানা কিছুই নেই। বিলু-নীলুর স্নেহই তাঁর একমাত্র সম্বল, সেটি তিনি হারাতে চান না।

বিলুর বাবা চেয়েছিলেন বিলুর মা-ও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে আসুক, বক্তৃতা দিক তা বিলুর মায়ে হয়ে ওঠে নি। তবে স্বামীর আদর্শের জন্যই তার জেলে আসা। স্বামীর আশ্রমের সংসার চালিয়েছেন।

সন্তান যত বড়ই হোক না কেন মায়ের কাছে ছোট থেকে যায়, "বিলু নীলুর কেবল ছোটবেলার কথাই মনে পড়ে কেন? বোধহয় ওরা আমার কাছে সেই ছোট্টটি থেকে গিয়েছে।"[৪]

গান্ধীজিকে তথা রাজনীতিকে দোষারোপ করেছেন নিজের সংসার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার জন্য "তুমি আমাদের একেবারে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছো; সত্যিকারের ভিখিরি।তুমি মাসের শেষে হাতে তুলে কিছু দেবে, তবে আমরা চারটি খেতে পাবো। নিজের ঠাকুর দেবতা ছেড়ে তোমার পুজো করেছি; তোমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়েছি; হাসতে ভুলেছি। তার প্রতিদান তুমি খুব দিলে। তোমার দেখানো রাস্তায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না বাপ ছেলেতে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না, ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, গৃহবিচ্ছেদে সংসার ছারখার হয়ে যায়।"[৫]

সংসারের পুরুষদের কাছে রাজনীতি আবেগ। রাজনীতি পুরুষের যৌবনের ভালোবাসা কিন্তু তার বলিদান হয় নারীর স্বপ্নে গড়া সংসার। রাজনৈতিক বাতাবরণে নারীর মাতৃত্বের সংকটের একই ছবি আমারা দেখি সমরেশ বসুর 'শহীদের মা' গল্পেও।

এক পরিবারের তিন ছেলে আর তাদের পিতা সবাই আলাদা আলাদা পার্টির লোক। সবাই রাজনীতির সক্রিয় কর্মী। সেই পরিবারের ছোটছেলে বাদল মারা গেলে বাদলের দলের ছেলেরা বাদলের স্মৃতিতে একটি সমাধি করে। সেই সমাধি বেদী তৈরী হলে তারা বাদলের বাবা হরপ্রসাদবাবু, বাদলের দুই দাদা কৃপাল, দয়াল কাউকে ডাকেনি, ডেকেছে শুধু বাদলের মা-কে। বাদল মারা যাওয়ার পর তার দাদারা বাদলকে নিয়ে কোনো কথাই বলে না। এমনকি তারা নিজেদের মধ্যেও কম কথা বলে। নিত্য প্রয়োজনীয় কথা টুকটাক বললেও বাদলের কথা একদমই বলে না। বাদল যেন দূর পরিচিত কেউ। "বাদলের বিষয়ে কোনো কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরে নি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে।"[৬]বাদলের মৃতদেহ তার দলের লোকেরাই কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যায়। দাদারা, বাবারা কেউ যান না। দাদারা সেই সময় কেউ বাড়িতেই ছিল না, বাবা হরপ্রসাদ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাদলের মৃত্যুর পর ১৯শে শ্রাবণ বাদলের জন্মদিনের দিন বাদলের মা বিমলার ভীষণ করে মনে পড়ে বাদলের জন্ম মুহূর্তের কথা। 'জাগরী' উপন্যাসেও দেখেছি মা-দের কাছে তার সন্তানের ছেলেবেলাই বেশি স্মরণীয়। কারণ এইসময়

সন্তানরা তখনও মায়ের আঁচলের নিরাপত্তাতেই থাকে, রাজনৈতিক চিন্তন তাদের তখনও গ্রাস করেনি। বিমলার সংসারে হরপ্রসাদের সাথে ছেলেদের নিত্য অশান্তি চলতো। এক সাধারণ রমণী তার সুষ্ঠু সংসারের পরিবর্তে পেয়েছিলেন রাজনৈতিক দলাদলি। 'জাগরী'র মা-ও স্বামী-সন্তানদের ব্রতে পা দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করে কারাজীবন বরণ করেছিলেন। বিমলা তা করেননি। বিমলার কাছে সবকিছু অসহ্য হয়ে উঠেছিল- "একটা সংসারের মধ্যে, তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া- বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ্য করতে পারছি না।"[৭] বাইরের অশান্তি বাইরের গোলমাল সব বিমলার সংসারে প্রবেশ করেছে বিমলার ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়েছে, কখনও ছেলেরা পার্টির কাজে রাতের পর রাত বাড়ির বাইরে যা বিমলাকে তার নিজের কাছে এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি করে দিয়েছে- সে কোথায় আছে! তার কী কোনো সংসার আছে! তার বাড়ি যেন কতগুলো পার্টির কার্যালয়। সে যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়ে রয়েছে, কোনোদিকে তার শান্তি নেই, স্বামী পুত্রকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে সে অক্ষম। তার সংসার যেন চারটে পার্টির দলাদলির ময়দান।

যতই রাজনীতির স্রোত বয়ে চলুক একটি সংসারের কেন্দ্রবিন্দু সেই সংসারের নারী, সেই সংসারের মা। তিনি তাঁর সংসারকে রাজনীতির পঙ্কিলতার মধ্যেও রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। 'জাগরী'র মা কিংবা বিমলা-ও যতটুকু পেরেছেন নিজের সংসার, স্বামী-সন্তানদের আগলে রাখার চেষ্টা করেছেন। শেষপর্যন্ত তাদের মাতৃত্ব কোণঠাসা হলেওরাজনৈতিক অভ্যন্তরে থেকেও মাতৃস্নেহের বিশিষ্টতারক্ষা পেয়েছে। কারাবন্দী থেকে 'জাগরী'র মা-এর অন্ধ মাতৃস্নেহ, স্বার্থপরতা ম্লান হয়নি। একই চিত্র বিমলার মাতৃত্বেও।

তথ্যসূত্র:

১। ভাদুড়ী, সতীনাথ; 'জাগরী', প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ- বৈশাখ, ১৩৮৮; পৃ- ৮।

২। তদেব, পৃ- ৬২।

৩। তদেব, পৃ- ১২২।

৪।তদেব, পৃ- ১৪২।

৫। তদেব, পৃ- ১৪৪।

৬। বসু, সমরেশ; 'শহীদের মা', সমরেশ বসুর বাছাই গল্প, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৯, অক্টোবর ১৯৫৮, পৃ- ১৫৩।

৭।তদেব, পৃ- ১৬০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, 'বাংলা সাহিত্যে মা', দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯, নভেম্বর ১৯৬০।

২। বসু, সমরেশ; 'শহীদের মা', সমরেশ বসুর বাছাই গল্প, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৯, অক্টোবর ১৯৫৮।

৩। ভাদুড়ী, সতীনাথ; 'জাগরী', প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ- বৈশাখ, ১৩৮৮।

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়মাধীন ভগবানও : সাক্ষ্য 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' : কথাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কলমে

ড. অর্ধেন্দু সরকার

সারসংক্ষেপ-

'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' উপন্যাসে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কোথায় যেন মিলিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানের নশ্বরতাকে আর অবিনশ্বর ভগবানেরও নিয়মাধীন হওয়ার সত্যটিকে। তাই এর ভাষায় আবেগ যতখানি আছে তার চাইতে অনেক বেশি আছে যুক্তির শব্দ সম্ভার। কথাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মনে মনে স্থিরই করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের কথা কথাই উপন্যাসে বলবেন। তাই বৃন্দাবন পর্ব বাদ যায় উপন্যাসে ; মথুরা পর্বও তাঁর কাহিনির পরিসরে এলো না। উপন্যাসটি শুরু হল কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। তবে এ দাঁড়ানোর ঘটনাও যুদ্ধের আগে নয়; যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের।

মূলশব্দ-

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় , উপন্যাস , কুরুক্ষেত্র , শ্রীকৃষ্ণ , ভগবান , কংস

মূলপ্রবন্ধ-

শ্রীকৃষ্ণ ; ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। অবতারের যে নানা প্রকারভেদ আছে সেই ভাগে তিনি পূর্ণ অবতারের গোত্রভুক্ত। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্যই তাঁর জন্ম। এবার তিনি জন্ম নিলেন কংসের কারাগারে। দৈববাণী সত্য হল। ঝড়-জলের রাতে সবাই যখন ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন তখন আপনি কংসের চোখে ধুলো দিয়ে বাবার মাথায় ডালায় শুয়ে ভরা যমুনা পার হলেন। বাসুকীর ফণা ছাতা হয়ে এলো আপনার মাথায়। যমুনা পা ধুইয়ে দিল। আর আপনি হাসতে-খেলতে লুকিয়ে পড়লেন নন্দর ঘরে।

জানতেই পারল না দুরাচারী কংস। তারপর সন্দেহবাতিক কংস কত ষড়যন্ত্রই না করেছেন আপনাকে মেরে ফেলবার জন্য। কিন্তু যুগধর্মের প্রয়োজনে যাঁর জন্ম তাঁকে মারবে কে! কথায় আছে রাখে হরি তো মারে কে? আর এক্ষেত্রে তো হরি নিজেই শরীর ধারণ করেছেন পৃথিবীকে কলুষ মুক্ত করবার জন্য। ফলে দানবের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

তবে এসবের মাঝে বন্ধুত্ব , প্রেম কোনো কিছুই কিন্তু বাদ যায়নি। অলৌকিক সব কর্মকাণ্ডের মাঝে তিনি নিজেকে যথাসম্ভব লৌকিক রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রেমের বৃন্দাবন রচনা করেছেন। রাধা সহ ষোড়শ গোপিনী নিয়ে রাসলীলা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে যাকে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ , প্রেমবৈচিত্র্য বলে তার কোনো কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু মাথুর পর্যায়ে এসেও তাঁর অবিচল ভাব দেখে বোঝা যায় তিনি সাধারণ মানুষ নন।

বৃন্দাবন থেকে মথুরায় তাঁর এই যাত্রা যে পূর্ব নির্দিষ্ট তা তিনি জানেন। তাই প্রেম থেকে কর্তব্যের পথে পাড়ি দিয়েছেন। নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছেন যেন নিজেরই তৈরি কুঞ্জবন। গোপীরা যখন রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন তখনও তিনি পিছু ফিরলেন না।

কথাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণের পূর্বাশ্রমের এসব কথা তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেননি। তিনি যেন মনে মনে স্থিরই করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের কথা বলবেন। তাই বৃন্দাবন পর্ব বাদ গেল; মথুরা পর্বও তাঁর কাহিনির পরিসরে এলো না। উপন্যাসটি শুরু হল কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। তবে এ দাঁড়ানোর ঘটনাও যুদ্ধের আগে নয়; যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের।

সূচনা লগ্নের এই বর্ণনায় কথোপকথন অংশে আছেন দুই বিশেষ চরিত্র যাঁদের একজন গান্ধারী অপরজন শ্রীকৃষ্ণ। শতপুত্রহারা মা গান্ধারী এবার হাহাকারের স্বরে আর্তনাদ করতে করতে খুঁজছেন শ্রীকৃষ্ণকে। স্মৃতিচারণ করছেন পুত্র দুর্যোধনের নানা ভ্রান্তির। আক্ষেপ করেছেন তাঁর সাবধান বাণী না শোনার জন্য। আর নিজেই উপনীত হচ্ছেন সিদ্ধান্তে - এ সব কিছুর মূলে দৈব। ঔপন্যাসিক তাঁর মুখে যে বাক্যবন্ধগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি হল-

‘দৈবের পক্ষে কোনও কাজই কঠিন নয়। দৈবই ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা এইসব ক্ষত্রিয়দের সংহার করিয়েছ।’[১]

চলচ্চিত্রে যাকে ফ্ল্যাশব্যাক বলে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঠিক তেমন করেই মহাভারতের ঘটনার পিছন পানে ফিরেছেন। উপন্যাসটির যতই পাতা ওল্টানো হয় ততই চোখে পড়ে ঘটে

যাওয়া সেই সব ঘটনার ঝলক। ঔপন্যাসিক যেন সময় ধরে ধরে গান্ধারীকে দিয়ে বলিয়েছেন যুদ্ধ কেন হল? যুদ্ধের আগের ঘটনাক্রমগুলিকে। বিশেষত দুর্যোধনের মূঢ়তা ও অবিমৃষ্যকারিতাই যে এর জন্য দায়ী গান্ধারী তা স্বীকার করে নিচ্ছেন।

কিন্তু এরপরেও তাঁর মন মানছে না। কারণ তিনি মহামানব কৃষ্ণকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চাইলে এসব কিছু রোধ করতে পারতেন। আর তাই ক্ষোভে, দুঃখে সর্বস্বান্ত গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন। তাঁর ভাষায়- ‘গোবিন্দ! যেহেতু পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত জ্ঞাতি গৌরব ও পাণ্ডবগণকে তুমি উপেক্ষা করেছ, সেই কারণে তুমিও নিজের জ্ঞাতি বান্ধবদের বিনাশ করবে।’

‘মধুসূদন! আজ থেকে ঠিক ছত্রিশ বছর পরে তোমার জ্ঞাতি, মন্ত্রী ও পুত্রগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি সকলের অপরিচিত ও অদৃষ্ট হয়ে অনাথের মতো বনে বিচরণ করবে। তারপর কোনও এক নিন্দিত উপায়ে নিধনপ্রাপ্ত হবে।’[২]

মহাভারতে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে কথাকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনার খুব একটা হেরফের হয়নি। কিন্তু এরপর শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন তাই আসলে এই উপন্যাসে জোরের জায়গা ‘কোনও সন্দেহ নেই, বৃষ্ণি বংশের যাদবরা দৈব কারণেই বিনষ্ট হবে। এইটাই তাদের দৈব নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ।’[৩] শ্রীকৃষ্ণের জীবন ভিত্তিক উপন্যাস আগেও লেখা হয়েছে। বাণী বসু লিখেছিলেন ‘কৃষ্ণ’ এবং ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাস। কিন্তু দুটি উপন্যাসেরই ধরণ আলাদা। দুটি উপন্যাসেই কোথাও শ্রীকৃষ্ণের পরিণতি বিষয়ে কাটাছেঁড়া নেই। অপরপক্ষে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম পরিণতি নিয়েই উপন্যাসটি লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসেও শ্রীকৃষ্ণের কার্যধারায় বিবরণী আছে ; কিন্তু সেগুলি মুখ্য নয়। বরং তাঁর মতো মহামানবের পরিণতি কেন সামান্য জনোচিত হল সেটাই তিনি পাঠককে যুক্তি পারম্পর্যে বলতে চেয়েছেন।

তাঁর কথাতেও পুরাণ এসেছে, এসেছে ঐতিহাসিক ও প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক পটভূমি। তিনিও কৃষ্ণ হয়ে ওঠার নানান ঘটনা প্রাসঙ্গিকক্রমেই বলেছেন। এমনকি বলতে ভোলেননি পাণ্ডব ও কৌরবদের জন্মের কারণ। ঔপন্যাসিক যেন বারে বারেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন সবই প্রারব্ধ। অর্থাৎ আগে যাকে দৈব বলেছিলেন প্রারব্ধ যেন সেই দৈবরই অনুগামী।

মহাভারতে যা গান্ধারির অভিশাপ হিসাবে খ্যাত হয়ে আছে তার পূর্ব লগ্নটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্য মাত্রায় নিয়ে এসেছেন তাঁর 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায়। সেখানে তিনি দুর্যোধনকে নানা ভাবে ধর্ম পথে আনার চেষ্টা করেছেন। এ যেন পুত্রকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা। তাঁকে ত্যাগ করে বুঝিয়ে দেওয়া; তুমি যা করছ তা ঠিক নয়। কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তা পারলেন না। দুর্যোধনের মৃত্যুর পথই প্রশস্ত হল।

'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা ভবে' মাইকেল মধুসূদনের এই অমোঘ উচ্চারণকেই আপনি বহু পূর্বে নিজের জীবনে সত্য করে তুলেছিলেন। তাই দুর্যোধনের মৃত্যু, তাঁর পরাজয় এবং অধর্মের শেষের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম প্রতিস্থাপক আপনি যেন সমাপ্তির দৃশ্য রচনা করতে লাগলেন। আপনার মায়াময় সৌন্দর্য নগরী দ্বারকাকে সমুদ্র গ্রাস করল। এমনকি নিজেই নিজের বংশকে নির্বংশ করতে চাইলেন।

না অহংকার আপনার সহ্য হয় না। তা সে নিজের হোক বা অন্যের। তাই সজ্ঞানে সব শেষ হয়ে যেতে দিলেন। তাই সার্থক আপনার দুই নাম দর্পহারী ও দত্তা প্রহারি। আপনার নিয়মের রাজত্বে আপনারও রেয়াৎ নেই। তাই মেনে নিলেন জরার মৃত্যুবাণকে। প্রমাণ করলেন নিয়মাধীন ভগবানও!

ঘটনায় খুব বেশি হেরফের নেই। মোটামুটি মহাভারতেরই অনুসারী। কিন্তু বর্ণনাশৈলীটি উপপাদ্যের মতো। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যেন গোটা বিষয়টিকে ধাপে ধাপে যুক্তি সাপেক্ষে পাঠকের দরবারে উপস্থিত করেছেন। প্রয়োজনে টেনেছেন পুরাণের রেখা; ইতিহাসের বাহু দিয়ে তাকে খণ্ডিত করেছেন । অবশ্যই ভূগোলের গণ্ডিতে রেখেই।

মাত্র ১০৪ পাতার একটি ছোট উপন্যাস। বিষয়ও খুব বড় নয়, অজানাও নয়। কিন্তু বিষয়ের ভিতর যে বিষয় আছে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাকেই এখানে তুলে ধরেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' বলতে গিয়ে তিনি যেন একই সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানের নশ্বরতাকে আর অবিনশ্বর ভগবানেরও নিয়মাধীন হওয়ার সত্যটিকে। তাই এর ভাষায় আবেগ যতখানি আছে তার চাইতে অনেক বেশি আছে যুক্তির শব্দ সম্ভার।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে এটি যে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছিল তার পিছনে বোধহয় অনেকগুলি কারণের মধ্যে লেখকের এই যুক্তি ভাবনা সম্মানিত হয়েছে। আমরা যাঁরা একালের ছেলেমেয়ে তাদের কাছে এই গ্রন্থটি তাই এত আদরনীয়। ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় অনাগত কালের কাছেও এটি পাঠের আবেদন রাখবে।

তথ্যসূত্র-

১। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন', আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩

২। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৫

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্যামসুন্দর কলেজ , পূর্ববর্ধমান ।

কালকূটের 'শাম্ব' : প্রবহমান সংগ্রামের এক নিবিড় আলোচনা

শতাব্দী ধন

সারসংক্ষেপ –

বাংলা সাহিত্যের জগতে সমরেশ বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বলা ভালো তাঁর হাত ধরে বাংলা কথাসাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নেয়। তিনি কালকূট ছদ্মনামে, আবার অনেক সময় ভ্রমর ছদ্মনামেও তিনি লেখালেখি করেছেন। সমরেশ বসু উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণমূলক সাহিত্য, কিশোর সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা একশোরও বেশি। তাঁর কালকূট ছদ্মনামে লেখা উপন্যাসগুলি হল—'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'শাম্ব', 'কোথায় পাব তারে', 'মুক্তবেণীর উজানে', 'চলো মন রূপনগরে', 'পূণ্যভূমে পূণ্যস্নান' প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শাম্ব' উপন্যাসটি ১৩৮৪ সাল নাগাদ শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তারপর আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সমরেশ বসু এই উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান।

সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির ছাপ প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখনীতে উঠে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমরেশ বসু নিজের জীবনের নিখুঁত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর লেখনীর মধ্যে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শৈশব থেকে তিনি নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হতে ক্রমশ জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, জীবনকে দেখতে শিখেছিলেন সম্পূর্ণ এক নতুন, গভীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তাই হয়তো তাঁর সমকালীন সময়পর্বের ছাপ ও সময়ের সাথে সাথে তার পরিবর্তনের সূক্ষ্ম চেহারাটা তাঁর সৃষ্ট লেখনীতে উপলব্ধি করা যায়। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য জীবনের কাছে ঋণী। জীবনসত্যের অনুসন্ধান থেকেই শিল্পসত্তার বিকাশ ঘটে। সমরেশ বসু তাঁর জীবনে এবং সাহিত্যে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে জয় করতে চেয়েছিলেন। এই সুদৃঢ় মনোভঙ্গি তাঁর 'শাম্ব' উপন্যাসটিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

পৌরাণিক কাহিনির অবলম্বনে মহাভারতের মৌষল পর্ব থেকে ঔপন্যাসিক কালকূট তাঁর উপন্যাসের নায়ক হিসেবে শাম্ব চরিত্রটিকে নির্বাচন করেছেন। মহাভারতে এই চরিত্রটিকে একটি পার্শ্বচরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে দেখানো এই শাম্ব চরিত্রটিকে কালকূট নিজের সৃষ্টির ছাঁচে ফেলে এক অনন্য রূপদান করেছেন। কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়া এবং এই রোগের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিজীবনে যে কঠোর আঘাতগুলি পেয়েছেন তা থেকে উত্তরণের একটা সর্বতো প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অনেক তপস্যা, যন্ত্রণা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিষ্ঠুর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ পূর্ণতার সন্ধান পায়। সেই পূর্ণতার পথে সন্ধানই কালকূট তাঁর 'শাম্ব' উপন্যাসে করেছেন।

সূচক শব্দ –

পৌরাণিক কাহিনি, অভিশাপ, কুষ্ঠ, কৃচ্ছসাধন, সমাজ, সংগ্রাম, উত্তরণ, মুক্তি

মূল আলোচনা –

সমরেশ বসুর ‘শাম্ব’ উপন্যাসটি ১৯৭৮-এ কালকূট ছদ্মনামে লেখা। এই উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮০ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ঔপন্যাসিক পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে ‘শাম্ব’ উপন্যাসটিকে এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়ন করেছেন। পুরাণ আশ্রিত একটি বিষয়কে কালকূট এক সংগ্রামী মানুষের মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে কালকূটের অভিমত—“শাম্ব আমার কাছে এক ‘সংগ্রামী’ ব্যক্তি’। ‘বিশ্বাস’ এখানে আমার বক্তব্য বিষয় এবং এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে চেয়েছি, কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।”[১] কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ্রস্ত হওয়া এবং এই রোগের জন্য ব্যক্তিজীবনে পাওয়া কঠিন আঘাতগুলি থেকে নিরন্তর উত্তরণের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী মানুষের স্বরূপ অন্বেষণই ‘শাম্ব’ উপন্যাসের মূল উপজীব্য।

‘শাম্ব’ উপন্যাসের পূর্বে ১৯৭৭ সালে সমরেশ বসু লেখেন ‘মহাকালের ঘোড়া’। এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র রুহিতন কারাবাসের সময় শেষ করে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পরে তার সাথে রাজনৈতিক দলের মতের অনৈক্য তৈরি হয়। এই নায়ক রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তার কুষ্ঠ হয়—যা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে এক সামাজিক প্রতীকী চিত্র হিসেবে এই ব্যাধিকে ঔপন্যাসিক উপস্থাপিত করেছেন। সে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধের সন্ধানে এককভাবে সংগ্রামকে চালিয়ে যান। ‘শাম্ব’ উপন্যাসের শাম্বও একক সংগ্রামী চরিত্র। এজন্য ; ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ উপন্যাসের উত্তরসূরী বলা হয় ‘শাম্ব’ উপন্যাসটিকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, এই দুই উপন্যাসে সমরেশ বসু ও কালকূট যেন হাত ধরাধরি করে কাহিনি দুটোকে একই কলমের দুটি ধারায় প্রবাহিত ও বাংলা সাহিত্যকে গৌরাবান্বিত করেছেন।

‘শাম্ব’ উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন। এই ভূমিকাতেই বলা হয় সমগ্র উপন্যাসটির মূলসূত্র ধরা আছে। এই ভূমিকার কিছুটা অংশ—“শাম্ব কাহিনী, বিশেষত তাঁর পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া, শাপমোচন ও মুক্তি, বহুবিধ ঘটনা তত্ত্ব তথ্যের জালে আবৃত। আমি তার অনেক বিষয়ই বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছি। কেবল তাঁর প্রতি পিতার অভিশাপের কারণ এবং শাপমোচন বিষয়কেই আমি যথাসম্ভব সহজভাবে বলতে চেয়েছি। কৃষ্ণ যেমন আমার কাছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহামানব, তেমনি শাম্বকে আমি প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রভাবশালী, ত্যাগী, বিশ্বাসী উজ্জ্বলতম ব্যক্তিরূপে দেখেছি। ... যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন। শাম্ব আমার কাছে এক সংগ্রামী ব্যক্তি, বিশ্বাস এখানে আমার বক্তব্য, বিষয় এবং এই বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছি কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।”[২]

ঔপন্যাসিক কৃষ্ণ, শাম্ব এই পৌরাণিক প্রতীকী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বাস্তবের চরিত্রকে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। দুঃখ ও সুখ—এই দুই নিয়েই জীবনযাত্রা। দুঃখ আছে বলেই মানুষ সুখের সন্ধানী। এই দুঃখের মধ্য দিয়ে মানুষ কীভাবে সুখ রূপ অমৃতের সন্ধান করে চলে তার একটা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া কালকূটের লেখনীতে ধরা যায়। আবার, ‘অমৃতকুম্ভের সন্ধানে’ উপন্যাসের সঙ্গেই ‘শাম্ব’ উপন্যাসের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। জীবনের দুঃখযাপনকে স্বীকার করে কালকূট কখনো বাস্তব জগতের বিচিত্র মানুষের জীবনের অমৃতের সন্ধানের প্রতি সক্রিয় থেকেছেন আবার কখনো বা পৌরাণিক জগতের বিস্তৃত অতীত ক্ষেত্র থেকে অমৃত সন্ধানী পরাক্রমশালী ব্যক্তিদের সংগ্রামময় জীবনকে উপস্থাপন করেছেন বলা যায়। ঔপন্যাসিক স্থানিক ভ্রমণের পরিবর্তে এখানে মানস ভ্রমণ করেছেন। অবশ্য এ জন্য লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষেভাবে প্রভাব ফেলেছে। ‘শাম্ব’ রচনার মূলগত তথ্যের বিষয়ে ঔপন্যাসিকের ছোট ছেলে উদিত বসু বলেন—“শাম্ব-র ক্ষেত্রে তাঁর মূল সহায়ক ছিলেন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় অশোকরঞ্জন সেনগুপ্তও তাঁকে এই কাজে সহায়তা করেন। ...”[৩] এই উপন্যাসে তিনি আপাত পুরাণাশ্রিত কাহিনির আবরণে কীভাবে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার ধারা প্রচ্ছন্নভাবে বহমান তা দেখাতে চেয়েছেন। পুরাণের পাতায় তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ঐতিহ্যকে নিরন্তর অন্বেষণ করে গেছেন। তিনি চরিত্রগুলোর মধ্যে তাদের আত্মোপলব্ধি তথা নিজেকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে দেখাতে

চেয়েছেন। অনেক তপস্যা, যন্ত্রণা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিষ্ঠুর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ পূর্ণতার সন্ধান পায়। সেই পূর্ণতার পথের সন্ধানই কালকূট 'শাম্ব' উপন্যাসে করেছেন। তাই শম্ভুনাথ চক্রবর্তী বলেছেন—"শাম্বের বসতভূমির অনুসন্ধানে কালকূট জাতীয় ইতিবৃত্তের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করেছেন, তা সত্যই গতানুগতিক পুরাণ চিন্তার উর্ধ্বে এক অভিনব সমীক্ষা। পুরাণের অতিপ্রাকৃতবাদকে সযত্নে পরিহার করে, মনুষ্যত্বের সংজ্ঞায় সমুজ্জ্বল একটি চরিত্রকে স্থাপনা করার প্রয়াসের মধ্যে কালকূটের কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুবাদী নিরিখের অন্তর্বর্তী এক বিরল প্রতিভার প্রতিভাস বলা যেতে পারে।"[৪]

মূল পৌরাণিক কাহিনিটিকে একটু দেখে নেওয়া যাক— দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণের পুত্র হলেন শাম্ব। মহাভারতে এই শাম্ব চরিত্রটিকে এক পার্শ্বচরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই চরিত্রটিকেই কালকূট তাঁর উপন্যাসের নায়ক চরিত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন। পুরাণের আসর থেকে তুলে এনে তাকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে এক নবরূপ দান করেছেন। মহাভারতের মৌষল পর্বে শাম্ব চরিত্রটিকে দেখা যায়। যেখানে তিনি যদুবংশের একদল দুর্বিনীত যুবকের সঙ্গে গর্ভবতী নারীর ছদ্মবেশে দ্বারকায় আসা কশ্যপ, দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র, কন্ব, নারদ মুনিদের সঙ্গে রসিকতা করেন। মুষল (লোহার কড়াই) বেঁধে গর্ভবতী সাজানোর ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে মুনিরা অভিশাপ দেন। তিনি যেন মুষলই প্রসব করেন। এই মুষলকে কেন্দ্র করে যদুবংশ ধ্বংস হয় ও স্বয়ং কৃষ্ণেরও মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কালকূট এই পরিচিত মূল পৌরাণিক কাহিনিকে হুবহু নিচ্ছেন না। যেখানে কয়েকজন বিমাতার সঙ্গে অনুচিত কার্যে লিপ্ত হচ্ছেন সেখানে বিমাতার পরিবর্তে কৃষ্ণের বৃন্দাবন সহচরী গোপিনীদের সঙ্গে শাম্বের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন।

উপন্যাসে কাহিনির সূচনা ঘটে মহর্ষি নারদের দ্বারকাপুরীতে আগমনকে কেন্দ্র করে। মহর্ষি কৃষ্ণের প্রাসাদে প্রবেশমাত্র কৃষ্ণ ও বৃষ্ণিগণ তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করেন। বলা বাহুল্য মহর্ষি নারদ তাঁদের সাদর আন্তরিক আপ্যায়নে খুশি হন। কিন্তু তিনি ভাবেন কৃষ্ণের অপূর্ব রূপবান পুত্র শাম্ব তাঁর সহচরীদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে আসেনি। শাম্বের এই আচরণ মহর্ষিকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। শাম্বের আচরণ অন্যান্যদের কাছে প্রীতিসুলভ হলেও বিচক্ষণ, কুটিল নারদ শাম্বকে উচিত শিক্ষা দেবেন বলে মনস্থির করেন। তিনি ভেবে দেখলেন, একমাত্র কৃষ্ণকে শাম্বের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই শাম্বের প্রতি তার ক্রোধকে চরিতার্থ করতে পারবেন। শাম্বের নিজের রূপের প্রতি অহংকারকে পিতা-পুত্রের মাঝে বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমকে নারদ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেন। তাই বিচক্ষণ, কুটিল নারদও এ সুযোগের উপযুক্ত করে ফেললেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন ষোলো হাজার রমণীর সঙ্গে শাম্ব পাপ সম্পর্কে জড়িত। সেই রমণীরাও রূপবান শাম্বের জন্য ব্যাকুল। শাম্ব এবং ষোলো হাজার রমণীর সম্পর্কে প্রসঙ্গ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণ এই অভিযোগ মানতে চাননি। নারদ এই ঘটনার প্রমাণ দিতে চাইলেন। দ্বারকার রৈবতক পর্বতের প্রমোদ কাননে যখন কৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোলো সহস্র রমণীদের সঙ্গে জলকেলিতে মগ্ন তখন নারদ কৃষ্ণ ছাড়া সকলের অগম্য স্থানে শাম্বকে উপস্থিত করেন। অসময়ে প্রমোদ কাননে শাম্বকে দেখে কৃষ্ণ যথারীতি অবাক হন। কৃষ্ণের ষোলো সহস্র রমণীরা শাম্বের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। নারদও সেইখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ ক্রোধে ও গ্লানিতে রমণীদের ধিক্কার ও অভিশাপ দেন। একবার তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দেন— এই রমণীমোহন রূপ যেন তার না থাকে, তার যেন কুষ্ঠরোগ হয়।

শাম্বের পিতা কৃষ্ণের কাছ থেকে এই অভিশাপ প্রাপ্তিকে কালকূট ভবিতব্য বলে চিহ্নিত করেছেন, যা শাম্বের জন্মলগ্নেই ভাগ্যে লিখিত ছিল। সুতরাং, এই অভিশাপকে মেনে নিয়ে শাম্ব আরোগ্যের পথে অগ্রসর হন। কৃষ্ণের উপদেশ অনুযায়ী শাম্ব প্রথমে মহর্ষি নারদের দ্বারস্থ হন। তিনি এই অমোঘ ও অনিবার্য অদৃষ্ট থেকে মুক্তি পেতে উত্তরণের পথে যেতে, প্রয়োজন হলে সসাগরা পৃথিবী, দেবলোক বা অন্তরীক্ষে সর্বত্র চেতে প্রস্তুত। বাহ্যিক জগতের প্রমোদে তাঁর মন

নেই। শাম্ব মনে মনে বলেন—"জীবনপ্রবাহ কী আশ্চর্য স্বপ্নবৎ! যে-আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, সেই আত্মানুসন্ধানেই জীবনকে আহরণ করতে হয়। আমার সমগ্র ধারণা এই ধারণার বশবর্তী।"[৫] মহর্ষি নারদ আরোগ্য উপায় হিসেবে সূর্যালোকের সন্ধান দেন। সেই সূর্যক্ষেত্র মহানদী চন্দ্রভাগার তীরে মিত্রবনে বর্তমান। শাম্ব প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে, রোগাক্রান্ত বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে মিত্রবনে পৌঁছান। শাম্ব এই অতি দুঃখের সময় পর্বে মনে মনে শুধু উচ্চারণ করেছেন—"তুমি অভিশপ্ত। শাপমোচনেই তোমার জীবনের মোক্ষলাভ। ভাগ্য অমোঘ। তাকে মেনে নিয়েই, দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের সন্ধান করতে হয়। ... বলবীর্যের দ্বারা শত্রুনিধন, মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপন যেমন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তেমনি ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য তাকে একাকী সংগ্রাম করতে হয়।"[৬]

শাম্বের এই মিত্রবনে গমনের পথে বিভিন্ন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যেমন—পূজারিণীকূল, ঋষিতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে, ধীরবগোষ্ঠী মাঝিদের সঙ্গে। এই পর্যায়টি কালকূটের নিজস্ব সৃষ্টি। তিনি শাম্বের সাধনার পথকে জটিল করে দেখানোর জন্যই চরিত্রটিকে এভাবে চিত্রিত করেছেন। মিত্রবনে তিনি প্রথমে কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে উপনিবেশ তৈরি করেন। শাম্বকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করেন দেবলোকের ব্রাহ্মণ বংশজ এক ঋষি, যিনি সৌর চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি কোনো প্রকার ঘৃণা ছাড়াই শাম্বকে উত্তরণের পথ বলে দেন। সেই দুরূহ পথে দ্বাদশ নামে অভিহিত গ্রহরাজ দ্বাদশরূপে দ্বাদশ মাসে তীর্থ ও নদনদীতে কীভাবে ক্রিয়াশীল, কীভাবে ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ সম্ভব তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পথনির্দেশ করেন। এই নির্দিষ্ট পথ তাঁকে ছয় ঋতু ধরে অতিক্রম করতে হবে। শাম্ব এখানে শুধু যে নিজের রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন তা নয় তার পাশাপাশি যারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাদের যাতে আর নিজেদের হতভাগ্য মনে না হয় তাদের সকলনে নিয়ে শাম্ব পাপমুক্তির পথে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন।

সমাজ-সংসার থেকে বিতাড়িত মিত্রবনে বসবাসকারী কুষ্ঠরোগীদের দল, যাদের জীবনে আর কিছুই নেই তাদের মুক্তির উপায় কী? শাম্বর মনে হয় এই ব্যাধি থেকে আরোগ্যই সবাইকে মুক্তির দিশা দেখাবে এবং এই মুক্তিই মৃত্যুভয়কে দূর করে এক নতুন আলোর সন্ধান দেবে। এই বিশ্বাসকে মনের জোর করে শাম্ব সূর্যালোকের দ্বাদশ স্থানে সকলকে সঙ্গী করে পরিভ্রমণ করতে চান। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত, হতাশায় পরিপূর্ণ মানুষের দল শাম্বের কথা মিথ্যা, বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাতেও শাম্ব হাল ছেড়ে দেয় না, সে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তার প্রতি বিশ্বাসটা রাখতে। কিন্তু অন্যান্যরা তার কথাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বুঝিয়ে দেন শাম্বের কোনো কথাকে তারা বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। শাম্ব বিশ্বাস করে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়, ঠিক এই জায়গায় অন্যান্যদের সঙ্গে শাম্বের মতবিরোধ।

শাম্বের বিশ্বাসে প্রথম উদ্বুদ্ধ হয় নীলাক্ষী। তার সহযোগিতায় সবাই শাম্বের সঙ্গে দ্বাদশ স্থানে যাওয়ায় জন্য রাজি হয়। শাম্ব তাঁর দৃঢ়তায় এই আশাতীত প্রতিক্রিয়া দেখে। তেজ ও যুক্তি দিয়ে সে সকলকে শাম্বের কথা শুনতে বলে। নীলাক্ষীর সহযোগিতায় সত্তরজন নর-নারীকে নিয়ে শাম্ব আরোগ্য কামনায় যায়। দ্বাদশ স্থানে ও নদনদীতে স্নান করে, দ্বাদশ মাস পরে যখন তিনি আবার চন্দ্রভাগার কূলে অস্তাচলমান স্থানে ফিরে এলেন তখন তাঁকে বাদ দিয়ে মাত্র চোদ্দজন জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই লক্ষ্যে পৌঁছেছে মাত্র কয়েকজন। মেয়েদের মধ্যে নীলাক্ষীই হয়ে উঠেছে নেত্রীস্থানীয়। এই নীলাক্ষী যে প্রথমের দিকে উৎশৃঙ্খল জীবনযাপন করত সে এখন রূপ ও লাবণ্যের অধিকারী। অন্যদিকে গ্রহরাজের প্রতি ভক্তিতেও এক ধ্যানমগ্না পূজারী। তার মধ্যে সঙ্গীদের হারানোর শোকও যেমন রয়েছে তেমনি তার মধ্যে রয়েছে নবজীবন লাভের উদ্দীপনাও। এই নবজীবনে তাঁর কোনো উৎশৃঙ্খল উচ্ছ্বাস নেই, আছে এক স্নিগ্ধরূপ। প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য লক্ষ করা যায়। শাম্বও এই নতুন পথচলাতে এক গভীর আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করেছে। এই নবজন্ম নবসূচনা ঘটিয়েছে। সে মনে করে জীবনের কোনো কিছুই অনর্থক নয়, সব প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ নির্দেশ থাকে। শাম্ব অনুভব করে—

"ক্ষাত্রবীর্যের স্পর্ধা, প্রণয়শীলা রমণীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সুখী ও বিলাসের জীবন এখন আমার কাছে অতীত স্মৃতিমাত্র। তা আমাকে আকর্ষণ করে না, বিচলিত করে না, যে কল্পারম্ভের দ্বারা আমি কর্ম ও মোক্ষলাভের পথে চলেছি, আমার গৌরব তা ছাড়া আর কিছু নেই।"[৭]

গ্রহরাজ মূর্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শিল্পীদের ভরণপোষণের জন্য টাকার প্রয়োজন। তাই শাম্ব দ্বারকায় একবার যায়। কৃষ্ণ ও জাম্ববতীর কষ্ট হলেও শাম্বর সংকল্পের কথা শুনে তাঁকে আর বাধা দেননি। বরং তাকে সম্মান ও সমর্থন করেছেন। শাম্ব আর তার অতীতের বিলাসবহুল জীবনে কখনো ফিরবে না জেনে স্ত্রী লক্ষণা কাতর হয়ে পড়লে শাম্ব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—"তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে কোনো সময়ে পঞ্চনদীর দেশ চন্দ্রভাগার মিত্রবনে এসো। ... এখন তুমি একমাত্র আমার অমোঘ নিয়তির সঙ্গেই মিলিত হতে পারো।"[৮]

এরপর মিত্রবনে ফিরে আসার পরে পায়ে হেঁটে তিনি শাক্যবনে যান। হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করে অন্তরীক্ষের পথে অতি দুর্গম গিরিশিখর ও বনভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রাপথে শাম্ব তাঁর জীবনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সেখানে মগ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আঠারোজন ব্রাহ্মণকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে মিত্রবনে স্থাপন করেন। পরে মিত্রবনের ঋষিদের সঙ্গে আলোচনা করে ছটি মগ পরিবারকে মিত্রবনে, বারোটির মধ্যে ছটি মথুরার কাছে যমুনার দক্ষিণ তীরে, আর বাকি ছটি পরিবারকে উদয়াচলের ওড্রদেশে প্রাচী নদীর শাখা চন্দ্রভাগার তীরে স্থাপন করেন। এই তিন স্থানে তিনটি মন্দির স্থাপন করেন। একবছর পরে যখন শাম্ব মিত্রবনে ফিরে এলেন তখন দেখলেন, প্রায় একটি ছোট নগরে পরিণত হয়েছে, যার নাম দিয়েছে শাম্বপুর। শাম্ব দেখেন মগ ব্রাহ্মণদের চিকিৎসায় সকলেই সুস্থ হয়েছে। মিত্রবনের ঋষির নির্দেশে শাম্ব প্রতি চার মাসে তিন স্থানে বৎসরান্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন, সঙ্গে পূর্বের চোদ্দজন পথসঙ্গী হলেন। তিনটি স্থান হল—মূলস্থান মিত্রবন, কালপ্রিয় কালনাথক্ষেত্র, উদয়াচলের সমুদ্রতীরে কোণবল্লবক্ষেত্র। বারো বছরের মধ্যে এই তিনটি জায়গায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নীলাক্ষী উদয়াচলের মন্দিরে আজীবন বসবাসের প্রার্থনা জানায়। নীলাক্ষীর ইচ্ছাতে কোনাদিক্ষেত্রের নাম হয় মৈত্রেয়বন।

মহর্ষি নারদের চিহ্নিত পথে শাম্ব ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণদের মিত্রবনে আনয়ন করেছেন এবং তিনস্থানে তিনকালের আলোকে স্নানের ব্যবস্থা করেছেন। মহর্ষি নারদ শাম্বকে দ্বারকায় ফেরার কথা জানতে চাইলে শাম্ব বলেন তিনি মিত্রবনে, কালপ্রিয়ক্ষেত্রে ও মৈত্রেয়বনে আনন্দের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করছেন। পূর্বের ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকায় রাজকীয় সুখ-ভোগের কোনো বাসনাই তাঁর নেই। তিনি জেনেছেন অভিশাপ কী, ব্যাধি কী। সুতরাং বর্তমানের সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত আনন্দকে কখনোই ত্যাগ করতে চান না। শাম্বের এই অবস্মরণীয় পরিবর্তন দেখে নারদ মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। তাই মহর্ষি নারদ গ্রহরাজ মূর্তির পূজা শেষ করে তিনি শাম্বকে আশীর্বাদ করে বলেন—"হে সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন।"[৯] মহর্ষি নারদ শাম্বকে স্পর্শ করে বলেন আজ থেকে এই মূর্তির আরেক নাম শাম্বাদিত্য। গ্রহরাজ এখানে এই নামেই পূজিত হবেন। যে শাম্ব তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া অভিশাপের দিনেও চোখের জল ফেলেননি সে এই মুহূর্তের নারদের কথায় চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। শাম্বও দেখলেন নারদের চোখও অশ্রুপূর্ণ এবং মুখে এক অনির্বচনীয় হাসি। এইভাবেই সুদীর্ঘ এই কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শাম্ব ব্যাধিমুক্ত হয়ে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এখানেও কালকূট পৌরাণিক কাহিনির শেষাংশকে অনুসরণ না করে এক নতুন পথের সন্ধান দেন।

ঔপন্যাসিক মহাভারতের একটি স্বল্প পরিচিত কাহিনিকে বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করে তার অভ্যন্তরে তৎকালীন সমাজের নীতিভ্রষ্ট, কুষ্ঠগ্রস্ত, অভিশপ্ত, পচনশীল রূপটিকে উদ্ভাসিত করেছেন। শুধুমাত্র যে তিনি উদ্ভাসিতই করেছেন তা নয়, তিনি এই শ্বাসরোধকারী সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর জীবন

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই কালকূটের ‘শাম্ব’ কোনো একটি পৌরাণিক কাহিনির পরিসরে আবদ্ধ না থেকে সর্বকালের পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১.বসু ডঃ নিতাই (সম্পাদিত), ‘কালকূট রচনা সমগ্র’, ৩য় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৬৮৩

২.বসু ডঃ নিতাই (সম্পাদিত), গ্রন্থ পরিচয়, ‘শাম্ব’, ভূমিকাংশ (কালকূট, ১ বৈশাখ ১৩৮৫), কালকূট রচনা সমগ্র, ৮ম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৬৮

৩.বসু উদিত, ‘কালকূট : কোথায় পাবো তারে’, ‘শব্দ’ সাহিত্য পত্রিকা, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৯০

৪.চক্রবর্তী শম্ভুনাথ, ‘কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে’, ‘সাহিত্যায়ন’, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৯৩

৫.বসু ডঃ নিতাই (সম্পাদিত), ‘কালকূট রচনা সমগ্র’, ‘শাম্ব’, ৪র্থ খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৯৬০

৬.তদেব, পৃ. ১৯৬৮

৭. তদেব, পৃ. ১৯৯৩

৮. তদেব, পৃ. ১৯৯৪-১৯৯৫

৯. তদেব, পৃ. ১৯৯৮

SAMSAPTAK
ISSN : 2454-4884
ESTD.- 2015
PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সহায়ক গ্রন্থ :

১.বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২

২.মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, ‘বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪০১

৩.চক্রবর্তী সুমিতা, ‘ছোটগল্পের বিষয়-আশয়’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০২২

....

স্বাধীন গবেষক , বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

বনফুলের 'হাটে বাজারে' উপন্যাসে সদাশিব চরিত্রের অন্তর্দর্শন

রাধা গোবিন্দ নসিপুরী

সারসংক্ষেপ -

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অন্যতম শক্তিমান লেখক হলেন বনফুল। বনফুলের রচিত একটি অন্যতম উপন্যাস হল 'হাটে বাজারে'(১৯৬১)। এই উপন্যাসের জন্য ১৯৬২ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান। বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ডাক্তার। তাঁর ডাক্তারি জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা উপন্যাসে পাওয়া যায়—'হাটে বাজারে' উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র সদাশিব ভট্টাচার্য একজন পাস করা ডাক্তার। এই সদাশিব চরিত্রের 'অন্তর্দর্শন' আলোচনা করাই আমার গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সদাশিব ডাক্তারি চাকরি থেকে রিটায়ার অর্থাৎ অবসর নিয়েছেন, কিন্তু নিজের কর্তব্যের জগৎ থেকে রিটায়ার করেননি—গ্রামের, হাটে বাজারের মানুষদের চিকিৎসা করা, অভাবে, বিপদে পাশে থাকা তাঁর কর্তব্য। তিনি নিজেকে হাটে বাজারের 'ছোটলোকদের ডাক্তার', 'ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার' হিসেবে পরিচয় দিতেই ভালোবাসেন। সদাশিবের জীবনে দুটি পর্বে তাঁর চরিত্রের অন্তর্দর্শনের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। একটি 'অতীত জীবন'-এর ছবি অপরটি 'বর্তমান জীবন'-এর চিত্র। তাঁর জীবনে অন্তর্দর্শনের ভিতটি গড়ে উঠেছে এই প্রথম পর্বে। জীবনে তিনি বিস্তর টাকা রোজগার করেছেন, শুয়ে বসেই বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এই জীবনেই তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছে "এত টাকা কীসের জন্য?" তাই হৃদয়-দর্পণে অন্তর্দর্শনের দৃষ্টিতে দেখেছেন সবকিছুকে—রোগী, রোগিনী, অনাহারী মানুষেরা সামনে এসেছে । তখন তাঁর চরিত্রে এই উৎকর্ষ দিকটির উদয় হয়েছে—হাটে বাজারের ডাক্তার হবেন, বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। অন্তর্দর্শনের এই ভিতটি আরও পরিপূর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব বর্তমান জীবনের পটচিত্রে। এখন তিনি নিজেকে উজার করে দিয়েছেন হাটে বাজারের ময়দানে, আনন্দ-স্রোতে তাঁর হৃদয় সর্বদা মগ্ন। এই গ্রামের, এই হাটে বাজারের কুলি, মুটে,মজুর, মেছুনি ছিপলী; কেবলী, ফালতু, ভগলু, জগদীশ, রহমানদের সাথে এক আসনে আসীন করে নিয়েছেন নিজেকে। মৃত্যুও এসেছে তাদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে। অন্তর্দর্শনের পরিচয় পেতে তাঁর লেখা ডায়েরির পাতাতেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় । সদাশিব চরিত্রের এই অন্তর্দর্শনের রূপটি গবেষণা প্রবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ –

বনফুল, হাটে বাজারে, রবীন্দ্র পুরস্কার, সদাশিব, ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার, ডায়েরি, অন্তর্দর্শন

মূল প্রবন্ধ –

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অতি পরিচিত নাম বনফুল — যাঁর আসল নাম বলাইচাঁদ- মুখোপাধ্যায় । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে সার্থক উপন্যাস (দুর্গেশনন্দিনী) সৃষ্টি হওয়ার পর বাংলার সাহিত্য আকাশে অনেক তারকার উদয় হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , শরৎচন্দ্র প্রমুখ । এঁদের পাশাপাশি কল্লোল যুগের তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, যুবনাশ্ব, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ দিকপালদের আবির্ভাব কথাসাহিত্যে যুগান্তের সূচনা করেছে । শরৎচন্দ্রের রচনায় অভিনব মাতৃপ্রেম, সামাজিক আগ্রাসন; তারাশঙ্করের রচনায় রাঢ় বাংলার পটভূমিতে মানব-মনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি; বিভূতিভূষণের রচনায় গ্রাম-বাংলার শান্ত প্রকৃতির রূপ ফুটে উঠল । শৈলজানন্দ 'কয়লাকুঠী'র দেশে অন্ত্যজ মানুষের কাহিনি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও

জৈব প্রবৃত্তি আর অচিন্ত্যকুমার 'বেদে' জাতীয় রচনায় বোহেমিয়ান জীবনের এল । এমন উত্তাল পর্বে কথাসাহিত্যিক রূপে বনফুলের আবির্ভাব 'কল্লোল'(১৯২৩)-এর এক বছর আগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'চোখ গেল' (১৯২২) গল্পের মধ্য দিয়ে । কল্লোল যুগে বনফুলের আবির্ভাব হলেও, কল্লোলীয় যুগের সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি সাহিত্য রচনার প্রকৃত পথ বলে মনে করেননি । তিনি মনে করতেন সাহিত্যিকদের নীলকণ্ঠ হয়ে, গরল পান করে অমৃতকে পরিবেশন করতে হয় । বাংলা সাহিত্য সেই অমৃত পেয়েছে, যা আস্বাদনে, বৈচিত্র্যে, শিল্পরূপে নূতনত্ব ও অভিনবত্ব লাভ করেছে । এখানেই বনফুল স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে ।

সুকুমার সেনের মতে বাংলা উপন্যাস রচনায় আড়াইজন শক্তিশালী ডাক্তার সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায় । একজন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অপরজন অর্ধ-ডাক্তার সাহিত্যিক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অন্যজন অবশ্যই বনফুল । বনফুল একজন বড় মাপের সাহিত্যিক হলেও পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার । পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে এসে তিনি ভাগলপুরে ডাক্তারি শুরু করেন । এই ডাক্তারি অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর ডাক্তার চরিত্র প্রধান উপন্যাসগুলিতে, যেমন — 'তৃণখণ্ড', 'বৈতরণী তীরে', 'কিছুক্ষণ', 'নির্মোক', 'অগ্নীশ্বর', 'হাটে বাজারে', 'তীর্থের কাক', 'উদয় অস্ত' প্রভৃতি । বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসে ডাক্তার অগ্নীশ্বর চরিত্র, 'উদয় অস্ত'-এ সূর্যসুন্দর, 'নির্মোক'-এ বিমল ডাক্তার, 'ত্রিবর্ণে'- সুঠাম ডাক্তার এবং 'হাটে বাজারে' উপন্যাসে নায়ক চরিত্র সদাশিব ডাক্তারের জীবন্ত রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'হাটে বাজারে' উপন্যাসে তাঁর জীবনের ছায়া পড়েছে । আমার প্রবন্ধের সম্পাত বিন্দু "বনফুলের হাটে বাজারে উপন্যাসে সদাশিব চরিত্রের অন্তর্দর্শন"।

'হাটে বাজারে' উপন্যাসটির রচনা ও প্রকাশকাল হল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ । উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে । এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র সদাশিব ভট্টাচার্য একজন ডাক্তার । তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে চাকরি পেয়েছিলেন । এখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন । কিন্তু দায়িত্ব থেকে এখনও অব্যাহতি পাননি । তিনি হাটে বাজারে ঘুরে ঘুরে দুস্থ, অসহায় সাধারণ মানুষদের চিকিৎসা করেন । নিজেকে তিনি বলেছেন 'ছোট লোকদের ডাক্তার' । অনেকবার ঠকেও সদাশিব কিন্তু ভয় পাননি, কারণ তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করে আনন্দ পান । তিনি বাজার করতে ভালোবাসেন । বাজারের সেরা জিনিসটি গাড়িতে তুলে নেন —উপযুক্ত মূল্য দিয়েই । নিজের জন্য নয় শুধু, প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে দুবেলা অভাবী, অর্ধাহারী মানুষের পাত পড়ে যে । গাছতলায় বসে বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন, নিজেকে তিনি হাটে বাজারের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ পথিক ডাক্তার হিসেবেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

উপন্যাসের নামটি লক্ষ্যণীয় — 'হাটে বাজারে', 'হাসপাতালে চেম্বারে' নয় কিন্তু । এই হাটে বাজারেই আমরা সদাশিবকে খুঁজে পাব । উপন্যাসে সদাশিবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ——আবদুল, ড্রাইভার আলী, ভগলু, ছিপলী, কেবলী, ফালতু, রহমান প্রভৃতি জীবন্ত চরিত্র । তিনি এদের নাড়ির খবর যেমন নেন, তেমনি নেন হাঁড়ির খবরও । সংসার পরিবারের আপনজন হারিয়ে, দীর্ঘ চাকুরী জীবনের অবসর সময়টুকু ডাক্তার সদাশিব এভাবেই গোটা সংসারকেই আপন সংসার করে নিয়েছেন । সামাজিক মানুষের প্রতি আন্তরিকতায় সদাশিবের অন্তরে অন্তর্দর্শন হয়েছে । তাই এখন তাঁকে পুকুরের ধারে গাছের ছায়ায় খাবার রান্না করে আর পাঁচ জনের সাথে খেতে দেখা যায় । তিনি ডায়েরি লিখতে ভালোবাসেন, এতে সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, ইতিহাস, মধ্যবিত্তের সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, অযোগ্যদের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি নানা বিষয় তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, দেখিয়েছেন — যা তাঁর অন্তর্দর্শনের পরিচায়ক । আসলে এখানে সদাশিবের অন্তরে বনফুলেরই অন্তর্দর্শনের পরিচয় পাই । অন্যায় অবিচারকে বনফুল

সহ্য করতে পারতেন না, সদাশিবও শেষপর্যন্ত ন্যায়ের পথে থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণ বলিদান দেন— কাহিনির সমাপ্তি এখানেই । আমরা এখানে সদাশিব চরিত্রের 'অন্তর্দর্শন'-এর দিকটি আলোচনা করব ।

বনফুল 'পশ্চাৎপট'-এর এক জায়গায় বলেছেন : "ভাগলপুরের ফটোগ্রাফার হরি কুণ্ডু এবং আনন্দ প্রেসের মালিক রাম আওতার আজও আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আরও আছে অনেক কুলি, মুটে, মজুর, রিকসাওলা, মেছো, মেছুনি, দোকানদাররা। ইহারা আমার সাহিত্যের আস্বাদ পায় নাই, তবু কেন যে ভালোবাসিত আমাকে, তাহা জানি না। ইহাদের অনেকের কথা পরে আমি আমার 'হাটে বাজারে' গ্রন্থে লিখিয়াছি।"[১]

সদাশিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া যাক । খনিতে হীরা থাকে ঠিকই, কিন্তু প্রচণ্ড চাপেই কয়লা হীরায় পরিণত হয়। ঝিনুকের ভেতর বালুকণা প্রবেশ করেই মুক্তার সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড চাপ এবং বালুকণার প্রদাহ না থাকলে যেমন হীরামুক্তার জন্ম হত না, "সদাশিবের জীবনেও চাপ এবং প্রদাহ এসেছিল, কিন্তু সে তো অনেকের জীবনেই আসে, সবাই কি সদাশিব হয়?সদাশিবের সদাশিবত্বের সম্ভাবনা নিগূঢ়ভাবে সুপ্ত ছিল তাঁর চরিত্রে, পরিবেশের প্রভাবে তা পরিস্ফুট হবার সুযোগ পেয়েছিল।"[২]

ডাক্তার সদাশিবের জীবন পরিক্রমায় দুটি পর্ব পাওয়া যায়, যথা

ক) অতীত জীবনের কাহিনি

খ) বর্তমান জীবনের কাহিনি

অতীত জীবনে আছে — তাঁর প্রাথমিক জীবন, ডাক্তারি পাস, চাকরি, বিবাহ ইত্যাদি নানা ঘটনা । বর্তমান জীবনের চালচিত্রে আছে— তাঁর হাটে বাজারের ডাক্তার হয়ে ওঠা, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠা, আত্মার অন্তর্দর্শনের প্রকাশ প্রভৃতি নানা দিক ।

সদাশিব ডাক্তারের অতীত জীবনের কাহিনি

সদাশিবের প্রপিতামহ ছিলেন একজন সন্ন্যাসী । পিতামহ ছিলেন মার্চেন্ট অফিসের কেরানি । সদাশিবের জন্ম হয়েছিল কলকাতায় । এখান থেকে ডাক্তারি পাস করেন । বাইশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল মনোমোহিনীর সঙ্গে । পাস করার পরই তিনি হাসপাতালে চাকরি পেয়েছিলেন । এরপর তিনি রিটায়ার করে বিহারের একটি শহরে বাস করছিলেন । এক মাত্র সন্তান সোহাগিনীর বিয়ে হয়ে গেছে, স্ত্রীও মারা গেছে অনেক আগেই । সমান দক্ষতায় মানুষের চিকিৎসা করতেন, আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো টাকার তাগিদে নয়; অন্তরের তাগিদে । প্রাথমিক জীবনে সদাশিব প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন । কিন্তু জীবনের শেষে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে : "এসব কিসের জন্যে করছি? কার জন্যে ?"[৩]

তিনি বারবার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন — বিধুবাবুর ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসা, পিসেমশাইয়ের হঠাৎ উদয় এবং ঋণশোধ করা ইত্যাদি ঘটনায় । এ পর্বেও সদাশিবের জীবনে দার্শনিকত্ব,মমত্ববোধ ও অন্তর্দর্শনের আত্মিক পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ডায়েরির পাতা পড়লে— "যে শিক্ষার প্রধান লক্ষণ বিনয়, সেই শিক্ষা লোপ পেয়ে গেছে আমাদের ভিতর থেকে। ছি, ছি।"[৪] সদাশিব আত্মীয়দের সম্পর্কে মনে পাপের প্রসঙ্গ আনলেও পরমুহূর্তেই অনুভব করলেন "....এদের দূর করতে চাইছি কেন! এরাই তো আমার আত্মীয়!"[৫]

সদাশিব সমাজের বাস্তবতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন । অতীতের গর্ব আঁকড়ে ধরে অনেকে ভবিষ্যতের আশায় বেঁচে থাকতে চান । এর প্রতিবাদে তিনি বলেন যে, বাঙালি বাঙালির ইতিহাসের খবর রাখে না, নিজের বংশের

খবর রাখে না— সে বাঙালি "আস্ফালন করবার বেলায় কেবল বলে, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের অরবিন্দ। কিন্তু একটু চেপে ধরুন, দেখবেন রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানে না সে। নামগুলো জানে শুধু।"[৬]

স্ত্রী মনুর অসুখে সবাই খবর নিতে এসেছে, এসেছে রোগীর আত্মীয়েরাও, এদের সম্পর্কে সদাশিব হৃদয়ে অনুভব করলেন — "এরা গরীব, এরা অনাত্মীয়, কিন্তু এদের উৎকণ্ঠা দেখে মনে হয় এদের চেয়ে বড় আত্মীয় আমার কেউ নেই।"[৭] তাঁর রিটায়ার করতে আর দুইমাস বাকি আছে। তাঁর সমসাময়িক অনেকেই রিটায়ার করে প্র্যাকটিস করছেন, আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ তারা। কিন্তু সদাশিব জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভণ্ডামির মুখোশ পরতে পারবেন না । "অনেকের বুড়ো বয়সে ধর্মে মতি হয়। আমার কিন্তু সে মতি এখনও হয়নি । জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি। ডাক্তারি ছাড়া আর কিছুতে প্রবৃত্তি নেই। আর কিছু জানিও না।"[৮]

সদাশিব বনের পাখি, খাঁচার পাখি নন । তাই তিনি কলকাতার খাঁচায় বন্দী হতে চাননি, বনের পাখির মতোই বিহারের মুক্ত পরিবেশে তিনি বিহার করেছেন । তিনি এবার প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছেন। একটা বড়ো স্টেশন ওয়াগন গাড়ি কিনলেন । তাঁর কথায় — "প্রচুর জায়গা আছে গাড়িটাতে। ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার হব ঠিক করেছি। গ্রামে গ্রামে হাটে বাজারে ঘুরব। চিকিৎসা করব সাধারণ লোকদের। চিকিৎসা করব পয়সা রোজগার করবার জন্য নয়, নিজের তাগিদে।"[৯] বনফুল 'পশ্চাৎপট'-এ বলেছেন : "আমি ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করিতাম বটে কিন্তু অনেক গরীব রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসাও করিতাম।"[১০] এইভাবে সদাশিব আর বনফুল যেন মিলে যাচ্ছেন। এই পর্বটি সদাশিবের অন্তর্দর্শনের প্রস্তুতি পর্ব । তাঁর অন্তর্দর্শনের সম্যক পরিণতি ঘটেছে দ্বিতীয় পর্বে।

সদাশিব ডাক্তারের বর্তমান জীবনের কাহিনি

রিটায়ার করার পর তাঁর বর্তমান জীবনের শুরু। অতীত জীবনের যে পরিচয় পেলাম তাতে সদাশিবের অর্ধেক পরিচয় পাওয়া গেল, বাকি অর্ধেক পরিচয় পেতে তাঁর বর্তমান জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

"দিবসেতে সেথা কত কোলাহল

চেনা-অচেনার ভিড়ে;

কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন

ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।"[১১]

সদাশিব এভাবেই হাটে বাজারে চেনা-অচেনার ভিড়ে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক হয়ে মিশতে চেয়েছেন— মিশে গেছেনও । হাজিপুরের প্রকাণ্ড হাট, সেখানে গাছের ছায়ায় টেবিল পেতে তিনি রোগী দেখছেন। তাদের কাছে সদাশিব কোন ফি ধার্য করেন না; একটি তালাবন্ধ বাক্স আছে— রোগীরা ইচ্ছে মতো ওষুধের দাম দিতে পারেন । এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি চিকিৎসার জন্য চার দেওয়ালের মধ্যে চেম্বার খুলে বসেননি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষই তাঁর রোগী আর হাটের মুক্তাঙ্গনই তাঁর চিকিৎসালয় । সদাশিবের বাজার করার বাতিক আছে। সকাল হলেই তিনি ড্রাইভার আলীকে নিয়ে বাজারে যান । সংসারে খাবার লোক নেই, মালতীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি বলেন — "খাবার লোকের কি অভাব আছে।দাই,চাকর, তাদের ছেলেমেয়েরা, ভিকিরি— সবাইকে খাওয়াও না"[১২]

তৃতীয় পুরুষে লেখা এই উপন্যাসে সদাশিব ডাক্তারের ডায়েরির পাতা লক্ষ্য করলে আমরা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্দর্শনের পরিচয় পাব । দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সকরুণ দিকটি তাঁর ডায়েরির পাতায় উঠে এসেছে এইভাবে—

> "আমাদের স্বাধীন ভারতে আর একটা ব্যাপারও হচ্ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লোপ করে দেবার চেষ্টা করছেন কর্তৃপক্ষরা। তারা শিক্ষা পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না।...কর্তৃপক্ষ ভুলে গেছেন যে স্বাধীনতা-সুখ আজ তাঁরা রাজার মতন ভোগ করছেন সে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই ছেলেরা। তাদের ত্যাগ, তাদের আত্মবলিদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষেরা সে ঋণ সম্বন্ধে উদাসীন।"[১৩]

সদাশিব গীতার সেই নির্দেশ "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ" মেনে চলেছেন।তাই তিনি প্রচলিত অর্থে ধার্মিক নন, রাজনীতি বা সমাজনীতির আলোচনার ছুতোয় পরনিন্দা করেন না। "লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট কুড়িয়ে 'নেতা' হইনি, আমি যা ছিলাম তাই আছি, যে পথে এতদিন চলে এসেছি সেই পথই ধরে আছি.... এক হিসাবে গীতার নির্দেশই পালন করেছি, 'স্বধর্ম'কেই আঁকড়ে আছি।"[১৪] সদাশিব মনে করেন রোগীদের চিকিৎসা করেন বলেই ওরা তাঁকে ভালোবাসে না, ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন বলেই এই ভালোবাসা।

আবার আমরা সদাশিবের ডায়েরির পাতায় প্রবেশ করব । একমাত্র মেয়ে সোহাগ বিলেতে চলে গেছে। মেয়ে বিলেতে চলে আসার কথা লিখলেও তিনি যেতে চাননি—সেখানে সবরকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও । মেয়ে-জামাই বিদেশে থাকলেও "আমি যাব না। এই দেশে জন্মেছি, এই দেশেই মরব।"[১৫] এমন উক্তি দেশপ্রেমের পরিচায়ক। জগদীশ নবীগঞ্জের হাটে তরকারি বেচে। তার 'স্ট্র্যাংগুলেটেড' হার্নিয়া' হয়েছিল । সদাশিব খবর পেতেই উলফৎ কম্পাউন্ডার এবং আলীর সাহায্যে দুঃসাধ্য অপারেশন করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। সদাশিবের কাছে তারা যেমন ছুটে আসেন, তিনিও তাদের কাছে ছুটে যান—কেবল কর্তব্যবোধে নয়, আন্তরিক ভালোবাসায় । তিরমোহানীর হাটে গিয়ে সদাশিব যখন শুনেছেন, শিবুর ছেলেকে দৎ সাহেব চিকিৎসা করেছে—ছেলেটি মারাও গেছে—তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে । বাড়ি ফিরে দেখলেন দ্বিজেনবাবু বসে আছেন চোখ দেখাবেন বলে। দ্বিজেনবাবু বললেন— "নতুন বিলেতফেরত ডাক্তারটার কাছে গিয়েছিলাম, এক কাঁড়ি টাকা খরচা হল খালি, চোখের তো কোনও উপকার দেখছি না"[১৬] বোঝাই যাচ্ছে সমকালীন ডাক্তারদের থেকে সদাশিবের মৌলিকত্ব, অসাধারণত্ব কতখানি । চিকিৎসা করার পর দ্বিজেনবাবু ওষুধের দাম দিতে চাইলে তিনি বলেন — "না, ওসব দিতে হবে না। এখন আমি কেবল ডাক্তারি করি, ডাক্তারি ব্যবসা অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি।"[১৭]

সদাশিবের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা যায় । স্ত্রী তো আগেই মারা গেছে, মেয়ে সোহাগ, ভাইপো চিরঞ্জীব ও তার স্ত্রী মালতী বিদেশে, আজ আজবলাল বাড়ি ফিরে গেল । এরপর সদাশিব আর বাড়িতে খেতে যেতেন না । ভ্রাম্যমাণ জীবনের মহা পথের পথিক হাটে বাজারেই রান্না করে খান, এতে দুস্থ অসহায়রাও খেতে পায় । এভাবে নতুন এক ধরনের যাযাবর জীবন যাপন করছেন তিনি।

যত সময় গেছে সদাশিবের হৃদয়-মন্দিরে অন্তর্দর্শনের আবহ তৈরি হয়েছে তত বেশি । যে মাচাকে আশ্রয় করে ঝুমকোলতা বড়ো হয়ে ওঠে, একদিন সে মাচা ভেঙে গেলেও পাশের ঝোপকে আশ্রয় করেই ঝুমকোলতা ঠিক বেঁচে থাকে, ফুল ফোটায়। মাচার আশ্রয় হারিয়েও ঝুমকোলতা মরে যায়নি, নতুন আশ্রয় খুঁজে নিজেকে সার্থক করেছে। তেমনি অন্তরে ডুব দিয়ে সদাশিব উপলব্ধি করেছেন :

"আমার জীবনের মাচাও বার বার বদলেছে । বার বার বদলির চাকরি করেছি, আজ এখানে-কাল-ওখানে করেই কেটেছে জীবনের বেশীর ভাগ। পুরাতনকে ছেড়ে নূতনের কাছে বার বার গেছি,....সেই নূতনও পুরাতনে বিলীন হয়েছে

আবার, তাকে আঁকড়ে বেশী দিন থাকতে পারিনি। এর নামই জীবন। আমার জীবনের মঞ্চে যাদের স্থায়ী সম্পদ বলে মনে হয়েছিল আজ দেখছি তারাও একে একে সরে গেছে।"[১৮] কিন্তু সদাশিব আত্মীয়-মাচার আশ্রয় না পেয়েও হাট-বাজারের সর্বস্তরের মানুষের আশ্রয়ে ঝুমকোলতার মতোই জীবনের ফুল ফুটিয়েছেন। হাটে বাজারের সেই কেব্‌লী,ছিপ্‌লী, গীতা, জগদীশ, রহমান, ভগলু— এদের জীবনের সুখ-দুঃখের তরঙ্গেই তিনি বেশি আন্দোলিত । ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার সদাশিব চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন :

> "অগ্নীশ্বর উপন্যাসে ডাক্তার অগ্নীশ্বর এবং 'হাটে বাজারে' উপন্যাসে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য আদর্শবান এবং সক্রিয় চরিত্র রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন । এখানে ডাক্তার-চরিত্র 'তৃণখণ্ড' অথবা'বৈতরণী তীরে'-র মতো নিরপেক্ষ দর্শক বা শ্রোতামাত্র নয়— এখানে তারা সাধারণ মানব-জীবনের কোলাহলমুখর রাজপথের পথিক । ডাক্তারের চরিত্র এখানে উজ্জ্বলতর ও সুন্দরতর রূপে ফুটে উঠেছে।"[১৯]

জীবন চিরদিনের জন্য নয়— তাতে আসে জড়া, অবশেষে আসে শমনের নোটিশ। সদাশিবের ইউরিনে অ্যালবুমেন দেখা দিয়েছে, ব্লাড প্রেসার বেড়েছে । কিন্তু সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে জীবন্মৃতের মতো পড়ে থাকতে তিনি অপারগ । নবীপুর হাটে সদাশিব একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলেন। মঙ্গলদাস বাবাজির পেটে জল জমেছে, তিনি মুহূর্তের মধ্যে একটা ট্রোকার দিয়ে ফুটো করে জল বের করে দিলেন ।

মহামানবের জীবন-পথে কেবল অমৃতই আসে না, মাঝে মাঝে গরলের ঢেউও এসে পড়ে। তাঁরা গরলের স্রোত পান করবার জন্য মহাবিশ্বের ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হন। সদাশিব চরিত্রে এ দিকটা চোখে পড়ে, যখন তিনি প্রতিবাদী সত্তার দ্বারা সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করেন। তিনজন ছোকরা— স্থানীয় ডাক্তারের ছেলে, ছবিলাল মোড়লের ছেলে আর একজন অপরিচিত ছেলে মেছুনি ছিপ্‌লীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে এগিয়ে আসে। তিনি তাদের বাজার থেকে তাড়িয়ে দিলেন। থানায় চললেন ডায়রি করতে। অন্তর-দর্পণে অন্তর্দর্শন হল : "অন্যায় অসভ্য অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। ডাক্তার হয়েছেন বলেই তিনি এ কর্তব্যের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।"[২০] বনফুল জীবনে ছিলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধক এবং মেকির ঘোর বিরোধী। তাঁর সৃষ্ট সদাশিব চরিত্রে সে পরিচয় পেলাম।

প্রতিদিনের মতো আজকেও মোটর চালিয়ে বাজারে চললেন— বাজার করার জন্য শুধু নয়, হাটে বাজারের মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নেবার জন্যও। সেখানে প্রত্যেকের সুস্থতার সংবাদ নিয়েছেন। ডাক্তারি বিদ্যা ছাড়াও সমকালীন ভারতবর্ষের নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির ভাগ্যাকাশে যে বিপন্নতার করাল ছায়া তা তিনি অন্তরে অনুধাবন করেছেন : "এরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ? কে বাঁচাবে এদের ? ভারত স্বাধীন হয়ে এরাই তো সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়েছে।.....শিয়ালদহ স্টেশনে তাদের যে চেহারা একবার দেখেছেন তা মর্মন্তুদ । মানুষ নয়, যেন পশুর দল। তিন-চারজন নেতা মিলে দেশটাকে ভাগ করে দিলে ক্ষমতার লোভে।"[২১]

শিক্ষার মূল্য বোঝেন বলেই গীতিয়াকে তাঁর বাড়ির আউট হাউসে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল করার কথা বলেন। নবীপুরের হাটে তাঁর জন্য অনেক রোগী অপেক্ষা করছিল; এমন সময় ফরসা জামাকাপড় পড়া কয়েকজন ছেলে এল, এদের পরিচ্ছন্নতার দিকটি সদাশিব নিজের হাতে গড়ে তোলেন। "হঠাৎ একটা নির্মল আনন্দে তাঁর সমস্ত মন ভরে গেল যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি এদের যথার্থ আত্মীয় হতে পেরেছেন।"[২২] কিন্তু একদিন সব শেষ হয়ে গেল । গভীর রাতে ছিপ্‌লীদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে । গিয়ে দেখেন ছিপ্‌লী মেঝেতে পড়ে রয়েছে । এমন সময় কার লাঠির আঘাতে সদাশিব অচৈতন্য হয়ে গেলেন । হেমারেজের কারণে তিনি অন্ধ হয়ে যান । "ক্রমশ প্রলাপও বন্ধ হয়ে

গেল।....দিন দুই পরে তাঁর মৃত্যু হল।”[২৩] এই মহৎ প্রাণের মহাপ্রয়াণে হাটে বাজারের সবাই ভেঙে পড়ে, তাদের দুঃখে আমাদেরও হৃদয়াশ্রু বিগলিত হয় ।

বনফুল একজন সমাজসচেতন শিল্পী । ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তারি করতে করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিলেন । ফলে ‘হাটে বাজারে’ উপন্যাসে সদাশিব চরিত্রকে আপন সুনিপুণ শিল্পীর তুলিকায় জীবন্ত করলেন তিনি । সদাশিব ডাক্তারি চাকরি থেকে রিটায়ার করলেও সামাজিক দায়িত্ব থেকে রিটায়ার করেননি। ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার হয়ে হাটে বাজারের পথে ঘোরা, মানুষের চিকিৎসা করা, দেশের ও দশের বিপদে বন্ধুর মতোই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া—অন্তর্দর্শনেরই পরিচয়। তৃতীয় পুরুষে লেখা এ উপন্যাস এবং সদাশিবের ডায়েরি আমাদের তাঁর অন্তর্দর্শনের অন্তঃপুরে নিয়ে যায়। সদাশিব তেজে-সহমর্মিতায়, ত্যাগে-সেবায়, অনুরাগে-প্রতিবাদে একজন বিরলতম চরিত্র হিসেবে পাঠক-হৃদয় স্থান করে নিয়েছে । এইভাবে ডাক্তার সদাশিব চরিত্র আজকের দিনে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ।

গ্রন্থপঞ্জি

১) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুল উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), নিউ বেঙ্গল প্রেস(প্রা) লিমিটেড৬৮,কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০২ ।

২) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুল রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩, সম্পাদনা ড. সরোজমোহন মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ: ১৩৬২ ।

৩)মুখোপাধ্যায়, নিশীথ, বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, বর্ণালী, ৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯শে জুলাই, ১৯৯৮ ।

৪) মিত্র, সরোজমোহন,বনফুলের সাহিত্য ও জীবন, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১২ ।

৫) সেন, সুকুমার, বনফুলের ফুলবন, সাহিত্যলোক, ৩২/৭, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৫ ।

৬)চৌধুরী, সুবল কান্তি, বনফুলের ছোটগল্প, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ২০১১ ।

তথ্যসূত্র-

১) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, পশ্চাৎপট, বনফুল রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা- ৭০০০৭৩, সম্পা. ড. সরোজমোহন মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ: ১৩৬২, পৃষ্ঠা ২১৭

২) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, হাটে বাজারে, বনফুল উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), নিউ বেঙ্গল প্রেস(প্রা)লি., ৬৮,কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৭০৭

৩) তদেব, পৃ. ৭১০

৪) তদেব, পৃ. ৭১৩

৫) তদেব, পৃ. ৭১৫

৬) তদেব, পৃ. ৭২৭

৭) তদেব, পৃ. ৭৩০

৮) তদেব, পৃ. ৭৩৮

৯) তদেব, পৃ. ৭৩৯

১০) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, পশ্চাৎপট, বনফুল রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা- ৭০০০৭৩, সম্পা. ড. সরোজমোহন মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নিরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২, পৃ. ১৮৮

১১) সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, হাট, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, সম্পা. সুশান্ত বসু, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ৩৬

১২) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, হাটে বাজারে, বনফুল উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), নিউ বেঙ্গল প্রেস(প্রা)লি., ৬৮,কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ.৭৪১

১৩) তদেব, পৃ. ৭৪৪

১৪) তদেব, পৃ. ৭৫৩

১৫) তদেব, পৃ. ৭৬৪

১৬) তদেব, পৃ.৭৭১

১৭) তদেব, পৃ.৭৭২

১৮) তদেব, পৃ. ৭৭৬-৭৭৭

১৯) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ, বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, বর্ণালী, ৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯শে জুলাই, ১৯৯৮, পৃ. ৪৪-৪৫

২০) মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, হাটে বাজারে, বনফুল উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), নিউ বেঙ্গল প্রেস(প্রা)লি., ৬৮,কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ.৭৮৫

২১) তদেব, পৃ. ৭৯১

২২) তদেব, পৃ. ৭৯৮

২৩) তদেব, পৃ. ৮০০

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

....

রাধা গোবিন্দ নসিপুরী বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর আধুনিক চেতনার আলোকে বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'

ড. অচিন্ত্য মাজী

সারসংক্ষেপ-

উত্তর আধুনিক চেতনা সমকালের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মতাদর্শ। সত্তর দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি অমিতাভ গুপ্ত 'জনপদ' এবং 'আলোচনাচক্র' পত্রিকায় এই চেতনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। উত্তর আধুনিক চেতনার মধ্যে প্রছন্ন রয়েছে জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং লোকায়ত চেতনার সমন্বয়, নিজের নাড়ির স্পন্দনকে যথার্থভাবে চিনে নেওয়া আর মানবিকতার চিরন্তন মূল্যবোধগুলিকে লালন করার অভিলাষ। বিপন্ন সময়ের সরণিতে দাঁড়িয়ে অস্তিত্বের ধ্বংস ও মানবতার কৌমার্য রক্ষা করতে চায় উত্তর আধুনিক আদর্শ। 'ইছামতী' উপন্যাসে মানুষের বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিকে, আবহমানের স্তরীভূত স্রোতে মানুষের যাপনের ঐক্যকে বিভতিভূষণ যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে উত্তর আধুনিক চেতনারই যেন প্রতিধ্বনি শুনি। চরিত্রের বিবর্তনে, সমষ্টির অভিব্যক্তিতে, লোকায়ত ও প্রাকৃত অভিমুখগুলির স্ফুটনে, বিশ্বাস ও শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতিস্থাপনে 'ইছামতী' উপন্যাস হয়ে উঠেছে উত্তর আধুনিক চেতনায় ঋদ্ধ। উপন্যাসের সামগ্রিক আয়তনে বাঁধা পড়েছে এই চেতনার সাড়া ও সঞ্চার।

মূলশব্দ-

উত্তর আধুনিক চেতনা , ইছামতী , উপন্যাস , জীবনদর্শন

মূল প্রবন্ধ-

'উত্তর আধুনিক চেতনা' সমকালের এমন এক আদর্শ যা চিরায়ত জীবনের অখণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়। আধুনিক জীবনের বিপন্নতার বিপ্রতীপে এ এক এমন আন্দোলন যা সুস্থ মনোবৃত্তির বিন্যাসগুলোকে আত্মবোধির আলো দিয়ে পুর্ণ করে দিতে চায়। সারা বিশ্ব আজ প্রাচীনের লেখমালা, ইতিহাসের প্রাচীরকে ধ্বসিয়ে ফেলার জন্য উন্মুখ। বিচ্ছিন্নতা আর বিযুক্তির বীজমন্ত্র দিয়ে সাজানো হচ্ছে মানবিকতার আয়তন, ভেঙে ফেলা হচ্ছে হৃদয়ের সৌকুমার্য। মানুষ আজ পরস্পরকে বিশ্বাস করতে ভুলে গেছে, হাতের ওপর হাত রাখাটা এখন আর সহজ নয়। এককেন্দ্রিকতার কাছে ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে সমষ্টির সুষম সমন্বয়। নগ্নতা, চিৎকার, বিকৃতি ও নেতির প্রণোদনায় সাহিত্য থেকে উঠে যাচ্ছে প্রেম ও বিশ্বাসের অন্তর্বয়ন। 'উত্তর আধুনিকতা' আজকের জীবনের সর্বগ্রাসী উন্নাসিকতা থেকে মানুষের সুস্থ চেতনাকে রক্ষা করতে চায়। তাবৎ মানববিশ্বকে খণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামই উত্তর আধুনিকতা। এজাজ ইউসুফির মতে " 'উত্তর আধুনিকতা' বলতে সাধারণত সমসাময়িক এমন এক অভিজ্ঞানকে বোঝায় যা শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে কেবল নয়, তা আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত এক সমৃদ্ধ অতীতকেও চিহ্নিত করে"।[১] ১৯৭৩ সালে 'তরুণ কবির সংকট' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন কবি অমিতাভ গুপ্ত। ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে অরুণ ভট্টাচার্য 'উত্তরসুরী' পত্রিকার ১০৫ সংখ্যায় লেখেন – "বন্ধুগণ এবার আপনারা র‍্যাবোঁ, বোদলেয়র অথবা এলুয়ার মায়াকভস্কি থেকে ফিরে আসুন মহাজন পদাবলী আর রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীধর কথক আর নিধুবাবুর গানে। দেশের মাটির গন্ধ বুক ভরে নিন"।[২] এ আসলে পুরনো যুগে প্রত্যাবর্তন নয় এ হল নিজের নাড়ির স্পন্দনকে নতুন করে চিনে নেওয়া। ১৯৮৫ সালে অমিতাভ গুপ্ত 'জনপদ' পত্রিকায় প্রথম 'উত্তর আধুনিক' শব্দবন্ধটির উল্লেখ করেন। এরপর

'আলোচনাচক্র' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (১৯৮৭-১৯৮৮ তে 'সরমা' ও 'পরমা' নামে প্রকাশিত) তিনি এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। 'উত্তর আধুনিকতা' সম্পর্কে কলম ধরেন অঞ্জন সেন, উদয়নারায়ণ সিংহ, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, তপোধীর ভট্টাচার্য, বীতশোক ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শূর, এজাজ ইউসুফী, জিললুর রহমান প্রমুখেরা।

উত্তর আধুনিক চেতনার সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য যা এদেশীয়, ভারতীয়, বাঙালির তাকে উপেক্ষা না করে আমাদের জীবনে এর প্রকৃত গুরুত্ব নির্ণয় করে সাহিত্য শিল্পে প্রতিফলন ঘটানো। ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শ আমাদের মনে জন্ম দিয়েছে বিদেশের প্রতি যুক্তিহীন অনুকার বৃত্তির। আত্মসুখই যে চূড়ান্ত এই বোধ কখনোই ভারতীয় সভ্যতার নয়। 'আমি'কে চূড়ান্ত বলে মেনে নিলে অপরকে দেখা, বোঝা এবং অনুভব করার প্রয়োজন ফুরায়। যে ত্যাগ, করুণা, পবিত্রতা ভারতবর্ষকে হাজার হাজার বছর ধরে শক্তি, ঐক্য, প্রেরণা জুগিয়েছে তাকেই প্রতিস্থাপন করতে চায় এ আদর্শ। উত্তর আধুনিকতা চায় মাটি ও মানুষের মিলন, চায় সুকুমার বৃত্তির বিকাশ এবং ঐতিহ্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণ। অঞ্জন সেন এই সংশ্লেষণ বোঝাতে 'সাংস্কৃতিক আন্তর্বয়ন' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে "সাংস্কৃতিক আন্তর্বয়ন শুধু বাক্যাংশ নয়, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা বাক্‌প্রতিমা, শব্দের, চিত্রকল্পেরও বয়ন। উত্তর আধুনিক চেতনার বৈশিষ্ট্য লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক"।[৩] তপোধীর ভট্টাচার্য উত্তর আধুনিক আদর্শের মধ্যে দেখতে পান বুর্জোয়া মানসিকতা আর বিকৃতিকে প্রতিরোধ করার অন্তর্গত তুফান "সবই যখন পণ্য, কেনা বেচা আর উৎপাদন-যোগান ছাড়া বাকি সব কিছু অবান্তর হয়ে পড়ে। নতুন চেতনা এই যুক্তি শৃঙ্খলাকে ভেঙে দিতে চাইছে, কোনো ধরনের বিচ্ছিন্নতা বা অধিকারবাদ গ্রাহ্য নয় তার কাছে। নতুন চেতনা বিদ্বৎবর্গ ও সাধারণ পাঠকের আপাত দুরতিক্রম্য ব্যবধান অস্বীকার করে বলেই তো লোকায়ত জীবনবৃত্তে শেকড় ছড়াতে চাইছে, ডাক দিয়েছে প্রাকৃতায়নের"।[৪] আসলে ঔপনিবেশজাত মনন হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছে ফলে খর্ব হয়েছে তারুণ্যের শক্তি, মাটির প্রতি দরদ। লেখক ঝুঁকেছে ভঙ্গিসর্বস্বতার দিকে, সহজ হয়েওঠা আর যেন কাম্য নয়। মানুষের তুচ্ছতা আর ক্ষমাহীনতা যে বিশেষ সৌন্দর্যে গরীয়ান হয়ে উঠতে পারে তাকেই দেখায় উত্তর আধুনিকতা। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "উত্তর আধুনিকের প্রতিবাদ সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, অবক্ষয়ী আধুনিকতার বিরুদ্ধে। ইউরোপের বিশেষপটে যে যন্ত্রণা দীর্ণতা স্বাভাবিক তাকে আরোপ করে, ফ্যাশনে দাঁড় করায় যে আধুনিকতা তার বিরুদ্ধেই উত্তর আধুনিকরা দাঁড়াতে চান"।[৫]

উত্তর আধুনিক চেতনা মাটির গন্ধ মেখে, জলের গন্ধ নিয়ে প্রাকৃত মানুষের অঙ্গীকারে ঋদ্ধ হয়ে উঠতে চায়। এদেশের আবহাওয়া, আলো, বাতাস মেখে, সবুজের শ্বাস নিয়ে চৈতন্যের দলমণ্ডলে গেঁথে দিতে চায় প্রেমের পতাকা। নগরকেন্দ্রিক, আমি পরায়ণ, বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির উল্টোপীঠে আবহমান ভারতবর্ষের নাড়িতে বাঁধা যে প্রাকৃত প্রকাশ সেই কৃষি সভ্যতার সবুজাভ দ্যুতি দিয়ে বিনির্মাণ করতে চায় বর্তমানের চৈতন্যকে। উত্তর আধুনিকতা তাই সংকীর্ণতা আর সংকটের থেকে উত্তরণের গান। গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক মানুষের যাপন প্রণালী আর মনস্তত্ত্বের স্বরূপ অন্বেষণ করে সমগ্রতার পরিচয়কে তুলে ধরার নিরন্তর প্রচেষ্টায় রত উত্তর আধুনিকতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে বিশাল মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট জীবনপ্রবাহকে আলিঙ্গনের মধ্যে। বিভূতিভূষণের সাহিত্য চেতনার ফোকাল থিমটিতেই আছে কালচেতনার এই অঙ্গীকার। বিস্তৃত মহাকালের স্রোতে সংলগ্ন আর দীপ্ত এই জীবন উজ্জ্বল হয়ে গড়ে তুলেছে সভ্যতা, চৈতন্য, অস্তিত্বকে। রাজা রাজড়ার ব্যক্তিত্ব দিয়ে নয় জাতি গঠিত হয় এই সহস্র ধারায় সংলীন হয়ে –

> এইসব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেইসব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এইসব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের

> আকাশ শিশির বর্ষণ করে, জ্যোৎস্না পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে। সেইসব বাণী, সেইসব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জণগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।[৬]

এ ভাবনাবীজকে গ্রহণ করেই উপন্যাস একটু একটু করে এগিয়েছে। বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই বিশেষ কোনো সুসংবদ্ধ প্লট এখানে দেখতে পাওয়া যাবে না বরং আমরা দেখতে পাব গ্রাম সমাজের পরিমণ্ডলে বিচিত্র চরিত্রের প্রকাশকে। পরম্পরা আর ঐতিহ্যকে সুনিবিড় সাঙ্গীকরণের ভেতর দিয়ে উপন্যাসটির অভিযাত্রা ত্বরান্বিত হয়েছে। কথক একটু একটু করে উন্মোচিত করেছেন স্তরান্বিত ও বহুবিভক্ত সমাজের চলাচলকে, তার অদৃশ্য ঘাত প্রতিঘাত ও ওঠানামাকে। উত্তর আধুনিক চেতনা যে সমগ্রতার কথা বলে, সার্বভৌম অন্বয়ের ইঙ্গিত দেয় সেই সামগ্রিকতার লাবণ্য ও রূপরেখা এভাবেই সময়ের সরণি বেয়ে সবুজাভ হয়ে উঠতে চায়। লেখকের লক্ষ্য জায়মান কালের ঘূর্ণন কীভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন চেতনায় আশ্লীষ্ট হয়ে রূপান্তরিত সত্তার বহুবিভাজিত বিন্যাসকে সৃষ্টিশীল করে তুলেছে সেই আভ্যন্তরীণ স্বাদকে ফোটানো। এজন্য ইতিহাস এবং ঐতিহ্য 'ইছামতী' উপন্যাসের প্রধান মর্মবিন্দু। পরম্পরা সংস্কৃতির সচল সংবেদকে আত্মস্থ করে এই সঞ্চার ঘটে থাকে। সমষ্টির এই হয়ে ওঠার অভিব্যক্তিই বিভূতিভূষণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং এই দেখার ভেতরে আশ্চর্য কারুণ্য ও সহানুভূতি জীবনের খুব গভীর অংশকে ছুঁয়ে যেতে পারে। লেখক একটি ঘটনাকে হৃদয়ের গভীর অবতল থেকে উপলব্ধ করে তাকে ছড়িয়ে দেন মহাজীবনের পাদপীঠে, ফলত সেই মহাযাত্রার রেশ হিসেবে ঘনীভূত হয়ে ওঠে নিরাসক্ত উচ্চারণ। এখানেই বিভূতিভূষণ একক ও অনন্য। জীবনের তীব্র ভয়াল রূপের কথা বলতে গিয়ে এই ভয়ালতার পাশাপাশি তিনি দেখান প্রাখর্যের আড়ালে কোনো ভিন্ন সুষমার বিস্তার। জীবনের ঘনঘোর আয়োজন আর আঘাতই তো মানুষকে চেনাবে তার স্পর্ধা আর শক্তিকে। আসলে কোনো কিছুই চূড়ান্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত নয় বরং দৃশ্যমান এই প্রবাহের অন্তরালে যে ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য অন্তর্লীন প্রাচুর্যবোধে টলমল করে ওঠে লেখক সেই সম্পূর্ণতাকেই অনেক ভাঙাগড়া, উত্থানপতন এবং বিবর্তনের চালচিত্রে আনীত করেন। এর ফলে প্রায়শই আত্মচৈতন্য বৈশ্বিক চেতনার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়, প্রচণ্ড ব্যক্তিবোধের উগ্রতা নয় বরং একক সত্তার বিচ্ছুরিত বর্ণালি সামূহিকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। 'ইছামতী' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র তাই নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়েও সমষ্টির বোধে উত্তীর্ণ। উত্তর আধুনিক চেতনা বহুকে নিয়ে, বহুর উচ্চারণে স্পন্দিত হয়ে এক অখণ্ড জনপদের বিকাশকে মেলে ধরতে চায় অসীমের নিখিল স্পর্শে নিষিক্ত হয়ে। মাটির প্রতি তীব্র টান আর প্রাকৃত লগ্নতার গূঢ় অঙ্গীকারে এই বিকাশ আরও নিবিড় ও সুন্দর হয়। তাই দেখি দারিদ্র, অভাব, লাঞ্ছনা প্রাকৃত মানুষের সরলতার সুষমাকে ধ্বস্ত করতে পারে না, অত্যন্ত অনাচারী ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত চৈতন্যের দংশনে কাতর হয় এবং আত্মবোধে উত্তীর্ণ হতে পারে। 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন-

> আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি – এইরকম ধূ-ধূ বালিয়াড়ি, পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দুপাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট আকন্দফুল। গত পাঁচশত বছর ধরে কত ফুল ঝরে পড়ছে – কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধপাটী শ্যাওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসি কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল – কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশান শয্যা হল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ তরুণী সময়ের পাষাণ-বর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ...এদের গল্প লিখব নাম হবে ইছামতী।[৭]

বিভূতিভূষণের লক্ষ্য ঐ আবহমান জীবন, কাল স্রোতের স্তবকে স্তবকে ফুটে ওঠা অমোঘ জীবন মরণের লীলা। এ নিয়েই কথক সাজিয়েছেন তাঁর কথামালা। তাঁর অন্তশ্চক্ষু ভ্রমণ করছে ইছামতীর ধারের জনপদে, বিস্তৃত মাঠ, শস্য, বনজঙ্গলের কোণে আর আবিষ্কার করেছেন পরম দার্শনিক সত্য। অসুন্দরকে কেন্দ্র করে ছাপিয়ে ওঠা সমস্ত প্রশ্নের তীক্ষ্ণ তিরগুলিকে বরং একপাশে সরিয়ে রেখে লেখকের গান পরম মানবের নির্ভরতাকে প্রশয় করে অমোঘ ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। উত্তর আধুনিক আদর্শের এটাই বৃহত্তর সম্পদ ও সঞ্চয়। নিবিষ্ট ও স্থিতিশীল এক সমন্বয়ের কাছে লেখকের সংবেদন চেনা অচেনা মানুষগুলিকে নিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। গল্প নির্মাণের প্রচলিত সূত্রগুলির শিরাছিঁড়ে ইতিহাসের মজ্জা নিংড়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির আলোক রেখাটিকে ধরে আখ্যানের ধ্রুপদী শিল্পরূপ নির্মাণ করেন তিনি।

উপন্যাসটির যত গভীরে যাই চিত্রবিচিত্র চরিত্রের আলপনাগুলো ব্যাপক অভিজ্ঞতার তৌলে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। দেওয়ান রাজা রায়, শিপটন সাহেব, ভবানী বাঁড়ুজ্যে, তিলু ,বিল, নীলু , গয়ামেম , প্রসন্ন চক্রবর্তী, নালুপাল, নিস্তারিণী, হলাপেকে প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে আশ্চর্য জীবনসত্য। খণ্ড সময়ের দ্যুতি চরিত্রগুলিকে তৈরি করেছে, অন্তর্নিহিত সুষমা অথবা নৈরাজ্যকে নির্মাণ করেছে, নির্ণিত করেছে সত্তার ভাঙচুরের বিবিধ চালচিত্র। যেমন রাজারামকে পাচ্ছি একজন প্রতাপশালী, দুর্ধর্ষ, প্রজানিপীড়ক, দাঙ্গাবাজ নীলকুঠির দেওয়ান হিসেবে। সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারক এই মহাজনের রক্তে বর্ণবাদের তীব্র ঔদ্ধত্য, অহংকৃত সত্তার ভেতরে আত্মগৌরবের জটিল ধূপছায়া জ্বাজল্যমান। অন্যদিকে বড় সাহেব শিপটন সাহেবকে সে বাঘের মতো ভয় করে। রাহাতুনপুরের প্রজারা নীল চাষে বিদ্রোহী হলে রাজারাম আর তার লাঠিয়াল পুরোগ্রাম জ্বলিয়ে দেয়। রাজারামের এই ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা উপন্যাসের ক্রমিক অগ্রসরে আরও বেশি পরিস্ফুট হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের গরিমা কদর্যরূপে প্রকাশ পায় যখন তিনকড়ি নিজের ঘরে তৈরি করা তেলের ভাঁড় উপহার দিতে চায় অথচ রাজারাম তা প্রত্যাখান করে কেননা কাওরার দেওয়া জিনিস তার ঘরে ঢুকবে না। রাজারাম যে সবসময় খুব মাথা খাটিয়ে কাজ করে তা নয় বরং তার প্রতিটি কাজে জড়িয়ে থাকে জোরপূর্বক কাজ হাসিল করার প্রচেষ্টা। যেমন চরপাড়ার প্রজারা দাগ উপড়ে ফেললেরাজারাম রায় বড়সাহেবকে কথাটা না জানিয়ে করিম লেঠেলকে সঙ্গে নিয়ে এর বিহিত করতে চেয়েছিল। রামু সর্দার বাগদিপাড়ার মোড়ল। করিম এর সঙ্গে তার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে করিম ও রামু দুজনেই নিহত হল। রামাকানাই কবিরাজকে রাজারাম মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করে। কিন্তু সৎ ও নির্লোভ রামাকানাই এই কাজ করতে অপারগ হলে তাকে বিনা দোষে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হল। অথচ এই রামকানাই কবিরাজ তাকে পরে সতর্ক করেছিল আগত মৃত্যুর ইশারা সম্পর্কে। লর্ড মেয়ো খুন হওয়ার পর রাজারাম ঘোড়ায় করে নীলকুঠির দিকে যাচ্ছিলেন। রামাকানাই তাকে সতর্ক করে কানসোনার বাগদিদের প্রতিশোধ নেওয়া বিষয়ে। কিন্তু রামকানাইয়ের কথায় কর্ণপাত করল না রাজারাম। ষষ্ঠীতলার মাঠ পেরোলেই রামু বাগদির বড় ছেলে হারু ও তার শালা নারাণ এর একটা দল তাকে ঘিরে ফেলল। এদেরই আক্রমণে রাজারামের মৃত্যু হল। মৃত্যুর মুহুর্তে "তিলুর সুন্দর খোকাটা দূর মাঠের ওপ্রান্তে বসে যেন আনমনে হাসছে"।[৮] বিভূতিভূষণ এখানেই জীবন সম্পর্কে গভীর সত্যকে প্রকাশ করলেন। উন্মত্ততা যে মানুষটির রক্তস্রোতে ঢেউ তোলে, উগ্রতা যার সত্তায় উতরোল সেই মানুষটিও মৃত্যুকালে নিজের বোনের ছেলের হাসিমুখ দেখতে পায়। তীব্র যন্ত্রণার ভেতরেও তখন জীবনের আরেক আনন্দ জেগে ওঠে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে শেষবারের মতো পরখ করে। বিভূতিভূষণের এই জীবনবোধে উত্তর আধুনিক চেতনা কথা বলে ওঠে। স্থবিরতার শত সহস্র আলেয়ান ভেদ করে জোনাকির শান্তির প্রভা নিয়ে মৃত্যুহীন অঙ্গীকারে জাগতে চায় তার শেষ স্পন্দন। শিপটনের মধ্যেও আমরা এই উত্তরণ দেখতে পাই, দুর্ধর্ষ প্রতাপ সময়ের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে এসেছে। শিপটন ভিন্ন জলবায়ু ভিন্ন আবহাওয়ার মানুষ হয়েও এদেশের মাটিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। তার গাম্ভীর্যময় ব্যক্তিত্বের আড়ালে ফুটে উঠেছে এদেশের মানুষের প্রতি দরদ। সেই সাড়া ও সঞ্চার অবশ্য শেষদিকেই পাওয়া যায়। প্রভূত খুনোখুনি, জখম, দাঙ্গা থেকে সরে আসতে চাইছিল তার মন। এদেশের মাটি ছেড়ে অন্য

কোথাও যাবার কথা ভাবেনি কোনোদিন। লেখক চরিত্রটির রূঢ়তা মুছে, কদর্যতার তমসা নিকিয়ে বাংলার জল হাওয়া আর শ্যামলিমার মাঝে একাত্ম করে নিতে চেয়েছেন ফলে দুর্ধর্ষ প্রতাপ কোনো ভিন্ন বেদনায় দগ্ধ হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আমরা স্মরণ করি শিপটনের মৃত্যুকালীন মুহুর্তটি – "কিন্তু শিপটন সাহবের কষ্ট হয় নি। ...সবসময়ই ওর কানে ভেসে আসছিল তাদের গ্রামের ছোট্ট গির্জাটার ঘন্টাধ্বনি, বহুদূর থেকে তুষার শীতল হাওয়ায় পাতা ঝরা বীচ্‌গাছের আন্দোলিত শাখা প্রশাখার মধ্যে দিয়ে দিয়ে..."। [৯] কথক বাতাবরণকে ভিন্ন ভাবনায় বদলে দিলেন, মৃত্যুর দীনতার বদলে ফুটে উঠল বেদনার স্নিগ্ধ সুষমা। ঔপনিবেশিক ভাববৃত্তের বাইরে জীবনকে অনুভব করার সৌম্য মন্ত্রে মৃত্যুই হয়ে উঠল প্রেমের স্পর্শে দীপ্যমান আর তাই মোল্লাহাটির নীলকুঠির গীর্জাধ্বনির সঙ্গে একাকার হয় ওয়েস্টমোরল্যান্ডের অ্যাল্ডসি গ্রামের ছোট্ট গীর্জার ঘন্টাধ্বনি। আসলে কথক মহাকালের ওপার হতে ভেসে আসা মানবতার মন্ত্রটিকেই গাঁথলেন জীবন মৃত্যুর বেড়াজাল পার হয়ে অস্তিত্বের উত্তরণে। নিরাকার কাল অবয়বে দেখা যায় তার অমোঘ দ্যুতি, প্রাণ এবং প্রাণের ভেতরকার প্রতিশ্রুতি এই দ্যুতি নিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে, পূর্ণ হয় ছাপোষা মধ্যবিত্তের আঙিনায় লুকিয়ে থাকা অসীমের মাধুরি।

উত্তর আধুনিক কালচেতনার কথা বলতে গিয়ে অমিতাভ গুপ্ত বলেছেন –

> একটি অবসানকে, একটি ক্ষয়কে, শেষ অভিবাদন জানিয়ে দেওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন এই মহাভূলোকের মত দ্যুলোকের বিশাল বিস্তীর্ণ রূপকথার কোনো ক্ষুদ্রাংশে একটি সামান্য মাটির আলপনা আঁকা আনন্দ বেদনার অভিজ্ঞানেই চিনে নিতে পারি তার সব স্পর্শ, সমস্ত স্পন্দন। [১০]

বিভূতিভূষণের কথামালা এই চিরায়ত প্রদীপের আলো দিয়ে গড়া, মাটির কোরকে পাখা মেলে মেলে ওঠা সবুজ বীজের অভিজ্ঞান। তাঁর উপন্যাস চেতনা তুচ্ছের অন্তর্নিহিত সুষমায় নতুন রূপে নতুন বোধে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নালুপাল, হলা পেকে, রামকানাই কবিরাজ, প্রসন্ন চক্রবর্তী, গয়া মেম, নিস্তারিণী মাটির ঘ্রাণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সরল অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার এই ব্যক্তিগুলির কোনো বিরাট চাওয়া পাওয়া নেই বরং খুব অল্পে বাঁচতে ভালোবাসে এজন্যই জীবনের খুব গভীরকে এরা স্পর্শ করতে পারে। হলা পেকের বর্বরতার পরিচয় কথক মাঝে মধ্যেই উদ্‌ঘাটিত করেন, নিপুণ সড়কি চালনার প্রয়োগ দেখে পাঠক শিউরে ওঠে। তবে এ সমস্তকে ছাপিয়ে দস্যু হলা পেকের দাস্য পরায়ণ রূপটিই পাঠকের মনে দোলা দেয় বেশি। রাতচর এই ডাকাত কাউকে পরোয়া না করলেও তিলুর মাতৃমূর্তির কাছে নত হয়ে ওঠে, মায়ের স্নেহের কাছে পরাজিত হয় বর্বরতার আখরগুলি। ভবানীর ছেলের অন্নপ্রাশনে হলা উপহার নিতে না চাইলে হলা পেকের অনুনয় – " এ লুঠের মাল নয়। আমার ঘরের মানুষের গলার হার ছেল, তিনি স্বগগে গিয়েছে আজ বাইশ তেইশ বছর। আমার ভিটেতে ভাঁড়ের মধ্যে পোঁতা ছেল। কাল এরে তেঁতুল দিয়ে মেজেছি। অনেক পাপ করেছি জীবনে। ব্রাহ্মণকে আমি মানিনে বাবাঠাকুর। সব দুষ্টু। খোকা ঠাকুর নিষ্পাপ নারায়ণ। ওর গলার হার পরিয়ে আমার পরকালের কাজ হল"।[১১] রণ পা, লাঠি আর সড়কি যার জীবনের প্রধান সম্বল সেই মানুষটির মধ্যেই শোনা গেল অনাচারের কুহক ভেঙে নিষ্পাপ শিশুর সরলতায় নিজেকে অন্তত একবার সত্যের রঙে বোনার অভিলাষ। ব্রাহ্মণের প্রতাপের কাছে নয় , হলা পেকে নিজেকে উন্মোচন করে শিশুটির সারল্যের কাছে। লেখক দেখিয়ে দেন রুক্ষতা, কাঠিন্যই শেষ কথা নয়, হৃদয়ের নিবিড় প্রদেশে স্নেহজ্যোতি জোনাকির মত জ্বলছে।

প্রসন্ন চক্রবর্তী আর গয়া মেম নীলকুঠির কর্মচারী। প্রসন্ন আমীন নীলকুঠির হয়ে প্রজাদের জমি দাগ দেয়। ফন্দিফিকির করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়াই তার অভিসন্ধি। মতলববাজ চাটুকার এই চরিত্রটি নীলকুঠির বিভিন্ন কুকর্মেরও হোতা। তবে এসকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া যাবে না, এই ব্যক্তিত্বের আসল উদ্ভাস ঘটেছে গয়ার প্রতি তার প্রেমের প্রস্তাবে। অবশ্য গয়াকে সে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলতে পারে না, আচরণ আর ভঙ্গির অজস্র বিন্যাসে

বুঝিয়ে দিতে চায় গয়ার প্রতি তার অনুরাগের গভীরতা। গয়াও এই মুহূর্তগুলিকে লালন করে, প্রশয়ের সূক্ষ্ম উদ্রেকে প্রসন্নের মোহকে আরও উসকে দেয়। তারপর জীবন রহস্যের অচেনা পথ বেয়ে দুইজন দুইপ্রান্তে মিলিয়ে যায়। নীলকুঠি উঠে গেলে তাদেরও ভবিতব্য হয় অজানার বাঁকে। বিশাল জীবনপ্রবাহের মধ্যে দুটি প্রাণ কোথায় মিলিয়ে যায়, শুধু মাটির পাত্রের আলপনার মতোই আঁকা থাকল ঐ আকুলতাখানি, যাপনের লাঞ্ছনা আর ভাঙচুরকে ছাপিয়ে সেই না পাওয়া সৌন্দর্যের বিন্দুটি জ্বলজ্বল করতে লাগল মহাজীবনের প্রান্তে। এই দিব্যবেদনাকে বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছিল পাঁচপোতা গ্রামের আরেকটি মেয়ে নিস্তারিণী। তার বিয়ে হলেও শ্বশুরবাড়িতে সে সুখী ছিল না সে ভালোবেসেছিল পরপুরুষকে। তবে সমাজ এই সম্পর্ককে স্বীকৃতিদেবে না সে ভালো করেই জানত। কথকও কোনো কিছুকে পরিণতি দিয়ে বাঁধেননি, সম্পূর্ণতা দিয়ে ইতি টানেননি বরং অপূর্ণতার সেই স্পন্দনকে মেলে দিয়েছেন অসীমদেশকালের প্রেক্ষাপটে। উত্তর আধুনিক চেতনা এই উদ্ভাসের কথা বলে। নালু পাল এ উপন্যাসে আরেক চরিত্র। নালু পাল অত্যন্ত দরিদ্র, তার স্বপ্ন বলতে দুবেলা দুমুঠো ভাত কিন্তু তার জেদ , বড় হবার ইচ্ছা , নিজের কর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা তাকে অনেক উঁচুতে পৌঁছে দিয়েছে। ধীরে ধীরে তার সমৃদ্ধি হয়েছে, সমাজে প্রতিপত্তি ও প্রসার বেড়েছে। অথচ তার উত্তরণের পথে অহমিকা কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তার জীবনযাত্রাও আভিজাত্যে ধূসর হয়ে ওঠে নি বরং ঐশ্বর্যের চরম শিখরে পৌঁছেও সামান্য ভাত ডাল মেখে খাবার সময় তার চোখে মুখে তৃপ্তি ফুটে ওঠে –

> সতর্ক পাঠকের মনে না হয়ে পারে না যে বিভূতিভূষণের চোখের আলোয় ধরা পড়েছে এই তৃপ্তির বোধ যা একজন ব্যক্তির নয় শুধু, লেখকের মনোদর্পণে প্রতিফলিত গ্রামীণ সমাজেরও। তাই লেখকের উচ্চারণকে প্রায়ই আড়াল করে জেগে ওঠে ঐ সমাজেরই অংশীদার কথকের কণ্ঠস্বর। [১২]

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

গ্রামীণ সমাজে নালু পালের মতো ব্যক্তিরা পুঁজিবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত করলেও চিরাগত অভ্যাসের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায় না। গ্রামীণ সামন্ততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পুরুষ্ট প্রলেপকেই বরং সে আরও বেশি করে মসৃণ করতে চায়। নালু পাল থেকে সে পরিণত হয় লালমোহন পালে। এই ক্রমিক উত্তরণের পথে তার বিনয়, সরলতা, বিশ্বাসই তাকে জীবনকে পালটে নেওয়ার স্পর্ধা জুগিয়েছে।

ভবানী বাঁড়ুয্যে প্রথমজীবনের সন্ন্যাস শেষে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করে। তবে সংসারে থাকলেও সে আসক্তিহীন, বৈরাগ্যের জ্যোতি অন্তরে ধারণ করে জীবনকে শান্ত শিখার মতো গড়ে নিতে চেয়েছে। রাজারাম রায়ের তিন বোনকেই সে বিয়ে করে। ভারতীয় জীবনধারার বিশেষত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন –

> হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে নিরক্ষর ভারতীয় যে কোনো গ্রাম্য চাষীর সঙ্গে কথা বলে দেখুন... কথাবার্তা যখন এগিয়ে চলে জীবনের গভীরতায় যখন স্পর্শ করে জীবন ও মৃত্যুকে চরম দুঃখ ও নৈরাশ্যকে, পরম সুখ ও আনন্দকে দেবতা ও ঈশ্বরকে তখন কীভাবে যে অতি সহজ সরল নীরবতায় গড়িয়ে চলে যায় বিভাজ্য পরিমেয় কাল অবিভাজ্য অপরিমেয় কালে, কাল থেকে মহাকালে, বর্তমান ক্ষণ থেকে শাশ্বত অশেষে। [১৩]

উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিজেদের জীবনের কথা বলতে বলতে , সাংসারিক প্রয়োজন দুঃখ বা আনন্দের কথা বলতে গিয়ে সমকালকে অতিক্রম করে চিরকালের অমোঘ বিন্দুটিকে স্পর্শ করে। ‘ইছামতী’ উপন্যাসে রাজনীতিও মহাকালের একটি অংশ হয়েই এসেছে। নীলবিদ্রোহের তীব্রতাও যেন সময়ের অনুচক্রিকায় পাক খেতে খেতে আপনা আপনি ফিকে হয়ে আসে। নীলবিদ্রোহের শুরুও এ উপন্যাসে দেখানো হয় নি আবার পরিকল্পিতভাবে এর উপসংহারও টানা হয় নি, জীবনের চলমানতার একটি অংশ হয়ে আপনিই এসেছে আর আপনিই গিয়েছে। মহাকাল কোনো কিছুই মনে রাখে না। এরকম কত যাওয়া আসা চলতে থাকে কেউই অমর নয়, শুধু হৃদয়ের আর্তি ও আরতিটুকু ফুরোয় না কখনো। এ প্রসঙ্গে এসে

পড়ে দেশকালের আধারে লালিত সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রকাশের পথরেখা। এ উপন্যাসে পাই সমষ্টির যাপনপ্রণালীতে স্থিত হয়ে থাকা লোকায়ত চেতনার বিচিত্র অভিমুখ। পূজা, পার্বন, ব্রতকথা, পরব, পালাগান, মহোৎসব, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি এই উপন্যাসে আলাদা মাত্রা ও মানদণ্ড নিয়ে আসে। 'ইছামতী' উপন্যাসে এই আর্তি ও আরতি মানুষের মিলনের অঙ্গীকারে নতুন ভাষা পায়। জীবনের অপূর্ব রহস্যভরা অবগুণ্ঠন প্রবহমান ঐতিহ্যের স্নিগ্ধ ধারায় অভিযোজিত হয়ে একটু একটু করে খুলতে থাকে তার নিভৃত সুষমা, তেলাকুচা ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সুর কানে আসে। উত্তর আধুনিক চেতনাও অনন্তের এই আলিঙ্গনে নিজের অবগুণ্ঠন খুলতে চায়, সমষ্টির কণ্ঠস্বরে গেঁথে দিতে চায় আবহমানের সুর। দেশ কাল ইতিহাসের স্পন্দনকে নিংড়ে নিয়ে , মানবতার অঙ্গীকারে ঋদ্ধ হয়ে 'ইছামতী' হয়ে ওঠে উত্তর আধুনিক চেতনায় দীপ্ত।

তথ্যসূত্র-

১) ইউসুফী এজাজ, 'প্রাককথন', "উত্তর আধুনিকতা ১৯৯৩-২০২৩"(সম্পাদনা-এজাজ ইউসুফী), পুণ্ড্র প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৪, পৃ-১১

২) ভট্টাচার্য অরুণ, 'স্বকাল পত্রিকা', অরুণ ভট্টাচার্য সংখ্যা(সম্পা- প্রকাশ দাস), বর্ধমান, ২০০৬, পৃ-৭২

৩) সেন অঞ্জন, 'কেন উত্তর আধুনিক সাহিত্য চিন্তা', "উত্তর আধুনিকতা ১৯৯৩-২০২৩", তদেব, পৃ- ৩০-৩১

৪) ভট্টাচার্য তপোধীর, 'নতুন চেতনা নতুন বয়ন', "আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর", পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-২৭৩

৫) বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম, 'পোস্টমর্ডান –উত্তর আধুনিক', "পোস্টমর্ডান ভাবনা ও অন্যান্য", র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা ২০০৭, পৃ -৩৫

৬) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'ইছামতী', "বিভূতি রচনাবলী", নবম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৪০৪, পৃ- ৩

৭) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'স্মৃতির রেখা', বিভূতি রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৪০৪, পৃ-২৫১

৮)বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'ইছামতী' তদেব পৃ-১১৬

৯) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, তদেব পৃ-১৬৪

১০) গুপ্ত অমিতাভ, 'উত্তর আধুনিক চেতনা', "উত্তর আধুনিকতা ১৯৯৩-২০২৩"(সম্প- এজাজ ইউসুফী), পুণ্ড্র প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৪, পৃ- ৬০

১১) বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'ইছামতী' তদেব পৃ-৪৩

১২) ভট্টাচার্য তপোধীর, 'ইছামতী – রূপান্তরে ব্যক্তিস্বরূপ', "উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ", বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২, পৃ- ৭৩

১৩) রায় নীহাররঞ্জন, "ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা", দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ২৯

....

সহকারী অধ্যাপক, চিত্ত মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ, জার্গো, পুরুলিয়া

আরোগ্য নিকেতন : নব চেতনার আলোকে পুরাতন চিকিৎসা বিদ্যার দ্বন্দ্ব

সুজিত প্রামানিক

সারসংক্ষেপ -

বিচিত্র অভিজ্ঞতা পুষ্ট আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) শরৎপরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ত্রিশের দশকে তিনি পূর্ণশক্তিধর কথা সাহিত্যিক। তারাশঙ্করের উপন্যাসে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি যেমন আছে তেমনি জীবন জিজ্ঞাসার গভীরতা আছে। বিংশ শতকের শিল্পী হয়েও তারাশঙ্কর ঐতিহ্য অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হননি। তাঁর আধুনিক হবার বাসনা বা সাধনা ছিল না, রুগ্ন মানসিকতা, সৌখিন জমিদারি কিংবা কারুসর্বস্বতা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই বর্তমান যুগের তরঙ্গ সংকুলতা তিনি উপলব্ধি না করে পারেননি। তাঁর শিল্পজগৎ গড়ে তুলতে তারাশঙ্কর বীরভূম এবং বর্ধমান, বাঁকুড়ার যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে নির্বাচন করেছেন সেটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বক্ষেত্র। একদিকে বর্ধমানের শস্যপূর্ণ প্রান্তর অন্যদিকে বীরভূম, বাঁকুড়ার তরঙ্গময় কাঁকুড়ের রুক্ষতা জীবনের দ্বৈত রূপকে এখানে যুগপথ ধরে রেখেছেন। তারাশঙ্করের সাহিত্যচর্চার সুদীর্ঘ সময়কালে যুগসন্ধির অস্থিরতা যেমন আছে তেমনি ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলন, সূচনাকাল, বয়কট, বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড, কমিউনিস্ট ভাবধারা, আইন অমান্য, আগস্ট আন্দোলন, স্বাধীনতা ও দেশভাগ, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তান বিভাগ ও বাংলাদেশের উদ্ভব, ভারতবর্ষের আদিবাসী জঙ্গলের পূর্ণবাসনের দাবি, অবিশ্বাস ও আত্মঘাতী আচরণ ইত্যাদি ঘটনা সম্ভারের প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের এই আলোচনার ভরকেন্দ্র আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসে নব চেতনার আলোকে পুরাতন চিকিৎসা বিদ্যার দ্বন্দ্ব বিষয়ে সন্নিবেশিত থাকবে।

শব্দসূচক -

তারাশঙ্কর, চরিত্র, চিকিৎসা, দেবীপুর, হাসপাতাল, ভদ্রলোক, অসুখ, আধুনিক, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি।

প্রতিপাদ্য বিষয় -

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম উপন্যাস হলো 'আরোগ্য নিকেতন'। তারাশঙ্করের এই উপন্যাসে আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসে দুটি চিকিৎসা ব্যবস্থার সংকট, দ্বন্দ্ব, প্রসার দেখানো হয়েছে এবং পাশাপাশি জীবনমশায়ের মৃত্যু চেতনা ও মৃত্যু রহস্যের সন্ধান রয়েছে। উপন্যাসটি সমাজ ও দুটি কালের নিরন্তর দ্বন্দ্ব প্রকাশের বয়ান। তারাশঙ্কর কালবদলের কথাশিল্পী, কালান্তরের কথাকার। তিনি যুগসন্ধিক্ষণের লেখক –

> "অতীত আর বর্তমান- ক্রমাবক্ষয়ী পুরাতন আর অপ্রতিরোধ্য
> নবীন - এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের শিল্পী সত্তারও দ্বন্দ্ব।"[১]

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব জিজ্ঞাসা রূপকের মধ্যে দিয়ে কাহিনীরূপ পেয়েছে। পাশাপাশি লেখক এই উপন্যাসে কালান্তরে দ্বন্দ্ব - বেদনাকে গভীর ও ব্যাপকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেবল জীবন মৃত্যুই নয় কালান্তরের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের বাস্তবসম্মত ভাবে চিত্রিত হয়েছে। আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের সূচনাতেই আছে কালান্তরের পরিচয়। জগদ্বন্ধু কবিরাজের 'মহাশয়ের হোথা' কিংবা 'মশায়ের কোবরেজখানা'র আরোগ্য নিকেতন' নামকরণ হয়েছিল জগৎবন্ধু মশায়ের ছেলে জীবনমশায়ের আমলে। একটি নতুন কালের কালান্তরের মহিমাকে লেখক বাস্তবসম্মতভাবে

চিত্রিত করেছেন। সমাজের বহিরঙ্গিক পরিবর্তনগুলিকে উপস্থাপিত করে তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার কালের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন-

"লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম, আমার জন্মস্থান- আমার মাতৃভূমি-
আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি ব'লে অতিরঞ্জন করছি না। সত্য
কথা বলছি, কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত
সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না।"[২]

ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মকে পুরানো জীর্ণতা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার নিয়তির অমোঘ বিধানকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাই তিনি বলেছেন-

"আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।"[৩]

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে জমিদার ও ব্যবসায়ী, সমাজতন্ত্র এবং বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ নেই বটে, কিন্তু দুই কালের চিত্র- কবিরাজী ও এলোপ্যাথির দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে এসেছে। যেহেতু তারাশঙ্কর ঐ কালেরই পক্ষপাতি ফলে তাঁর উপন্যাসের নায়ক পুরনো কালের কবিরাজ মশাই। উপন্যাসের শুরুতেই তিনি সেই জীর্ণতার বর্ণনা এবং নবাগত কালের জীবন্ত পদধ্বনিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন-

"আজও দেখতে পাবেন। নড়বড়ে টেবিল, হাতল ভাঙা চেয়ার
এখানও আছে।... এখানে দেখবেন বিচিত্র দৃশ্য। নতুন বাড়িঘর,
একেবারে নতুন কালের ফ্যাশন, নতুন কালের ইঞ্জিনিয়ারিং এর
নিদর্শন।"[৪]

জীবনমশায় এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে লেখক উপস্থাপিত করেছেন প্রাচীনের বুক চিরে আধুনিক পথ করে নেয়। বিগত এর সঙ্গে আধুনিকের সম্পর্ক সংযোগ প্রাচীনতার মধ্যে দিয়েই আধুনিকতার যাত্রা। আমরা উপন্যাসের শেষে দেখতে পাবো প্রাচীন উদ্দেশ্য ধ্যান-ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে আধুনিকতার সঙ্গে এগিয়ে গেছে। লেখক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে কিছু মূল্যবোধকে দেখিয়েছেন, উপন্যাসের মূল কথা বা মূলসুরই হল-

"মরণরে তুঁহু মম শ্যামসমান।"[৫]

উপন্যাসে দুটি চিকিৎসা ব্যবস্থা অর্থাৎ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন লেখক। এখানে কবিরাজী চিকিৎসা করেন জীবনমশায় নাড়ির মধ্যে কালের পদধ্বনি অনুভব করতে পারেন। এটি তাঁর পিতৃ পিতামহের বংশগত সম্পদ। তিনি প্রথমে কবিরাজি চিকিৎসা না শিখে ডাক্তারি শিখতে চেয়েছিলেন এবং ভর্তি হয়েছিলেন এরপর বর্ধমান মেডিকেল কলেজে কিন্তু প্রেম জনিত কারণে সেটা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। বাধ্য হয়ে পিতার কাছে কবিরাজি শিক্ষা নেন। কবিরাজি চিকিৎসা এবং মুষ্টিযোগে তাঁর অন্যতম খ্যাতি ছিল-

"জীবনমশায় নাড়ির মধ্যে, কালের পদধ্বনি অনুভব করতে
পারেন। এটি তাঁর পিতৃ পিতামহের বংশগত সম্পদ। তাঁরা
ছিলেন কবিরাজ। তিনি প্রথম ডাক্তার হয়েছেন কবিরাজি
অবশ্যই জানেন।প্রয়োজনে দুই মতেই চিকিৎসা করে থাকেন।
তবে নাড়ি দেখাই তাঁর বিশেষত্ব। নাড়ির স্পন্দনের মধ্যেই

রোগাক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে রোগীর রোগের স্বরূপ
এবং কালের দ্বারা আক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে কাল
কতদূর তাও তিনি বুঝতে পারেন। নিদান হাঁকায় জীবনমশায়ের
নাম ছিল- আজও আছে।”[৬]

জীবনমশায়ের এত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও একসময় লেখক দেখিয়েছেন কবিরাজি চিকিৎসার পাশাপাশি নতুন আলোপ্যাথি চিকিৎসা শুরু হলো। আর এখান থেকে শুরু হয়েছে দুটি চিকিৎসার দ্বন্দ্ব। দেবীপুর গ্রামে অনেক আধুনিক চিকিৎসক এসেছেন যেমন রঙ্গলাল ডাক্তার, হরেন বাবু, চারু বাবু এবং শহর থেকে এসেছেন প্রদ্যোত ডাক্তারই জীবনমশায়ের কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবস্থার বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি করেছেন। এমনকি আমরা দেখবো সূচনা অংশে লেখক দুজনের দৈহিক বর্ণনাতেও একটা বিপরীত ভাব দেখিয়েছেন। জীবনমশায়ের বর্ননায় বলেছেন-

“প্রায় সত্তর বছর বয়স, স্থবির, ধূলিধূসর; দিক হস্তীর মতো
প্রাচীন। এককালের বিশাল দেহের কাঠামো কুঞ্চিত দেহ চর্মে
ঢাকা; বক্ষপাঞ্জর প্রকট হয়েপড়েছে, মোটা মোটা হাত- তেমনি
দুখানি পা সামনে দেখবেন প্রকাণ্ড আকারের অতিজীর্ণ এক
জোড়া জুতো, পরনে ময়লা ধান ধুতি- তাও সেলাই করা;
শোভা শুধু গজদন্তের মতো পাকা দাড়ি গোঁপ, মাথার চুলও
সাদা কিন্তু খাটো করে ছাঁটা।”[৭]

প্রদ্যোত ডাক্তারের বর্ণনায়-

“হাসপাতালের ডাক্তার নামলেন বাইসিক্ল থেকে, তরুণ বয়স,
পরনের প্যান্ট, বুশশার্টের উপরে ওয়াটার প্রুফ, মাথায়
ওয়েলিস্কিনের ঢাকনি শোলার হ্যাট। চোখে শেলের চশমা,
কলকাতার আধিবাসী- নাম প্রদ্যোত বোস।”[৮]

জীবনমশায়ের বর্ণনাতে একটা স্থূলকায় প্রাচীনতার ছাপ রয়েছে আর প্রদ্যোতের মধ্যে আধুনিক একটা সূক্ষ্মতা রয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই দুজনের দ্বন্দ্ব শুরুহয় মতির মাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাস শুরুতে উপন্যাসের শুরুতে দ্বন্দ্ব বেধেছে মতির পুকুর ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুর ব্যথা হয় মতির মায়ের। জীবন ডাক্তার মতির মাকে দেখে বলেছেন কালীমায়ের স্থানের মৃত্তিকা লাগিয়ে দে অর্থাৎ তার নিদান হেঁকেছেন। এই জীবন ডাক্তারের নিদান হাঁকা শুনে প্রদ্যোত ডাক্তার খুব বিরক্ত হয়ে জীবনমশায়কে বলেছেন-

“হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া এককালে যখন চিকিৎসা ছিল না –
তখন যা করেছেন – করেছেন। কিন্তু একালে বৈজ্ঞানিক
ব্যবস্থা যখন হয়েছে, লোক পাচ্ছে- তখন ওই হাতুড়ে
চিকিৎসা ফলানো মারাত্মক অপরাধ। অন্য দেশ হলে
শাস্তি হতো আপনার।”[৯]

শুধু মতির মা নয়, দেবীপুর গ্রামে অনেকেরই নিদান হেঁকেছেন জীবনমশায়। এবং তা আশ্চর্য রকম ভাবে ফলেছে। এমনকি নিজের ছেলে বনবিহারীর মৃত্যু হবে তিনি নাড়িজ্ঞান এ বুঝতে পেরেছিলেন তিন মাস আগে এবং নিদান হেঁকেছিলেন। এই কথা স্ত্রী আতর বউকে তিন দিন আগে বলেছিলেন। প্রদ্যোত ডাক্তার তাই বলেছেন এভাবে

নিদান হাঁকলে রোগীর মনোবল ভেঙ্গে যায়, রোগের সঙ্গে রুগীর মানসিক যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছেন নিজের ছেলের নিদান হাঁকা এবং অন্য সকলকে বলা এ নিষ্ঠুর কাজ। বিপিনের অসুখের সময় যখন জীবনমশায়ের কাছে হিক্কার জন্য আনা হয়েছিল তখনও প্রদ্যোত মনে মনে সকলের ওপরে রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকলের সামনে বলতে পারেননি। জীবনমশায়ের ঔষধে বিপিনের হিক্কা কমে গিয়েছিল। আবার দেখবো গণেশ ভট্টাচার্যের প্রথম সন্তান সম্ভবা কন্যাকে দেখতে জীবনমশায় ডাক পড়লে জীবনমশায় প্রদ্যতের কাছে নিয়ে আসেন এবং তার পুত্র সন্তান হয়। জীবনমশায় যখন মতির মা, দাতু ঘোষাল, বিপিনের নিদান হেঁকেছেন তখন প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছেন লোকটাকে যেন বাতিকে পেয়েছে। আশ্চর্য লোক জীবনমশায় তাঁকে জয় করাবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই, আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হচ্ছে, আজও তাকে রোধ করা যায়নি। জীবনমশায় যেন ঠিক পশুকে বলি দেয়ার মতো পূজা অর্চনার পরস্পরে আধ্যাত্মিকতা ধূপ জলে আচ্ছন্ন এক কল্পলোক সৃষ্টি করে মৃত্যুকে মুক্তি বলে ঘোষণা করেছেন। গণেশের মেয়েকে যখন প্রদ্যুৎ ডাক্তার বাঁচালেন তখন জীবনমশায় বলেছেন-

> "ছোকরার সাহস আছে, ধৈর্য আছে, জেদ আছে। বড় হবার
> অনেক লক্ষণ আছে। শুধু একটা জিনিস নাই। শুধু একটা
> জিনিস নাই। অন্যমতকে মানতে পারেনা।"[১০]

আধুনিক চিকিৎসার উন্নতির জন্য প্রদ্যোত ডাক্তার ক্লিনিক এর কথা বলেছে। তাহলে কত লোক বেঁচে যেত, এরই ফলস্বরূপ সকলে মিলে কো-অপারেটিভ মেডিকেল স্টোর্স খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। হাসপাতাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকলে মতির মা এবং গণেশের মেয়েকে বাঁচানো যেত না। নবগ্রামের এক তরুণ উকিলের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছে-

> "আমাদের এখানে ডাক্তার এসেছে, হাসপাতাল হয়েছে- নতুন
> কালের ঔষধপত্রও এসেছে তবুও হাতুড়ের যুগের অন্ধকার
> সম্পূর্ণরূপে আমাদের যায়নি।"[১১]

আয়ুর্বেদ বা কবিরাজি চিকিৎসাতে একটা আত্মিকতা লক্ষ্য করা যায়। ডাক্তার রুগীর কথা, পরিবেশ, স্থান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাতে কতকগুলি পরীক্ষা- নিরীক্ষণের ওপর নির্ভর করে সেখানে আত্মিকতা নেই। প্রদ্যোত, হরেন সকলে যখন অভয়ার রুগীটাকে যক্ষা বললেন তখন জীবনমশায় নাড়ি দেখে বললেন যক্ষা নয় এবং তাকে এক দেড় মাসে ভালো করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি জীবন ডাক্তারের নাড়ি জ্ঞান খুবই চমৎকার সেটা শেষ পর্যন্ত প্রদ্যোত ডাক্তারও মেনে নিয়েছেন ও প্রদ্যোত বাড়িতে আহ্বান জানিয়েছে তাঁকে।প্রদ্যোত ডাক্তার ক্ষমা চেয়ে বলেছেন-

> "আপনার কাছে হয়তো আমার ত্রুটি হয়ে থাকবে। কিন্তু বিশ্বাস
> করুন, সে আমি ইচ্ছা করে করিনি। আপনার চিকিৎসা পদ্ধতি
> আর আমার পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ। আমার মত ছেড়ে
> আপনার মতে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।... তবে হ্যাঁ-
> মতির মায়ের নিদান হাঁকার কথা শুনে আর সেই কান্না দেখে
> আমার রাগ হয়েছিল। আজ অবশ্য দেখলাম- মতির মা
> মরলেই ওর পক্ষে ভালো হত।"[১২]

জীবনমশায় বলেছেন যখন বাঁচার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তখন তাকে যেতে হয়। আর আশ্রয় নির্ভর যদি হন অনেকের তাঁকে বাঁচতে তাঁরাও লড়াই করেন। অহী সরকারের নাতির অসুখে জীবনকে নারী দেখতে দিতে ভয় করতো প্রদ্যোত ডাক্তারের এ কথা স্বীকার করেছেন প্রদ্যোত। আর জীবনমশায় প্রদ্যোত কে বলেছেন-

"ও আপনি অদ্ভুত বাঁচিয়েছেন। অদ্ভুত চিকিৎসা করেছেন।
আমি প্রথম নাড়িতে মৃত্যুর যেন পায়ের সাড়া পেয়েছিলাম।
আমি বরাবর হাত দেখেছিলাম কেন জানেন? মৃত্যুকে পিছনে
হঠে চলে যেতে দেখলাম।"[১৩]

এই স্বীকৃতি রাণার ব্যাপারে মশায় পরাজয় স্বীকার করে ভেবেছেন তাঁকে বাঁচাতে পারত প্রদ্যোতদের চিকিৎসা- যা তাঁর নেই।

এই ভাবে প্রাচীন নবীনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন তারাশঙ্কর। গড়ে তুলেছেন মিলন সেতু। যা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে প্রদ্যতের স্ত্রীর রোগে। নির্দিষ্ট সময় না হলে টাইফয়েড পরীক্ষাতেও ধরা পড়েনা। অ্যালোপ্যাথির এই শুন্যতায় সীমাবদ্ধতায় কবিরাজের নাড়ীজ্ঞান কাজে লেগেছে। প্রদ্যোত ও চারুবাবু দুজনেই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। উভয় পদ্ধতির চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসিক উপন্যাসে যেমন দুটি চিকিৎসা দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন তেমনি দুটি চিকিৎসা ব্যবস্থার সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে দেখব প্রদ্যুৎ ডাক্তারের স্ত্রীর জ্বর হলে জীবনমশায় কেই ডেকেছেন। আসলে উপন্যাসিক দুটি চিকিৎসাকে বড় করে তুলতে চেয়েছেন। কখনো আধুনিক চিকিৎসাকে যেমন সময়োপযোগী হয়েউঠেছে, তেমনই কবিরাজি চিকিৎসাও। জীবনমশায় যখন প্রদ্যোতের স্ত্রীর রোগ নাড়ীজ্ঞানে বলেন তখন প্রদ্যোত বলেছেন-

"আপনার নাড়ীজ্ঞানের সাহায্য না পেলে এতটা সাহস পেতাম
না মশায়। আচ্ছা আমি যাই। মনের খুশিতে ছুটে এসেছি।"[১৪]

জীবনমশায়ের ডায়াগনোসিস অদ্ভুত সেকথা প্রদ্যোত ডাক্তার স্বীকার করেছেন। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে জীবনমশায় যখন মৃত্যুশয্যায় তখন প্রদ্যোত ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করেছেন এবং তাঁর স্ত্রী মঞ্জুকে প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছেন-

"শেষটায় ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেলাম! তোমার
অসুখের সময় সাহায্য সব ডাক্তারই করেছিলেন, কিন্তু মশায়ের
সাহায্যের চেয়ে ভালোবাসা বড়ো।"[১৫]

উপন্যাসের পরিণতি লেখকের জীবন দর্শনেরই প্রতিফলন। বস্তুত তারাশঙ্কর শুধু নন। যেকোনো বিচক্ষণ জ্ঞাণী জগৎ ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন। অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তির বিজ্ঞান জ্ঞান একেও অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনই যথার্থ শিক্ষা। মানব মুক্তির যথার্থ পথ।

আধুনিকতা যেটিকেই বলা হোক না কেন প্রাচীনের তুলনায় সে নবীন। তাকে অতীতের কাছে মাথা নত করে শিখতে হয়, জানতে হয় অনেক কিছু বিনম্র শ্রদ্ধায়। ঐতিহ্যকে, প্রাচীনকে অস্বীকার করা মূর্খতা, আবার তাতেই মুখ গুঁজে থেকে এর সবটুকু গ্রহণ করা, বর্তমান কে অস্বীকার করা, বর্তমানের সবকে নবীন বা উগ্রতা বলে বর্জন করাও অজ্ঞতা। দ্বন্দ্ব যেমন সত্য দ্বন্দ্বের অবসান এবং দুইয়ের মিলনও তেমন সত্য। কবিরাজি প্রথায় চিকিৎসা ভারতবর্ষের বহুকালের ঐতিহ্য। তবে রঙলাল ডাক্তারের মতো আমরা বলতে পারি- সে শাস্ত্রকে তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা ক্রমাগ্রসরমান সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হয়েছে।

উপন্যাসের পরিণতিতে তাই তারাশঙ্কর প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে তারাশঙ্কর প্রাচীনে, নবীনের কল্যাণে বিজ্ঞানে সন্ধি চেয়েছেন। প্রাচীনপন্থী অপবাদ নিয়েও তিনি তাঁর নায়কের আধুনিকতার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাকে বারবার উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন। তিনি জীবনমশায় ও প্রদ্যোতের মিলনে উপন্যাসের পরিণতি ঘটিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও তিন পুরুষের চিকিৎসা শাস্ত্র জীবনমশায়ের মৃত্যুতে যেন শেষ হলো। অন্যদিকে সুস্থ রইল মঞ্জু, রইলেন প্রদ্যোত- ভবিষ্যৎ এদেরই। এই সমন্বয়ই লেখকের এর মূল কথা-

> "কঠিন হিমশীতল দেহ, অর্ধ নিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ,
> নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন। ধ্যানস্ত হয়ে গেছেন যেন অনন্তের
> ধ্যানে। এই আমার সেকালের ছবি। তাই সে কালকে আমি
> শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি। তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক।"[১৬]

প্রাচীন নন, নবীন নন, দ্বন্দ্ববাদী নন- চির সমন্বয়ে কালের প্রবাহমানতার অগ্রগতির শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বাংলা গল্প বিচিত্রা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা- ১২, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৩৬৪, পৃ. ১২৮

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, বেঙ্গল পাবলিশার্স , বঙ্কিমচাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ. ৫

৩. ঐ, পৃ. ২১৭

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আরোগ্য নিকেতন, প্রকাশভবন, কলিকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৫৯, পৃ. ৬-৭

৫. ঐ, পৃ. ১৩২

৬. ঐ, পৃ. ১১

৭. ঐ, পৃ. ৯

৮. ঐ, পৃ. ২৪

৯. ঐ, পৃ. ২৫

১০. ঐ, পৃ. ১৭৪

১১. ঐ, পৃ. ২৭৬

১২. ঐ, পৃ. ২৯২

১৩. ঐ, পৃ. ২৯৩

১৪. ঐ, পৃ. ৩০৫

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

১৫. ঐ, পৃ. ৩১৪

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, বেঙ্গল পাবলিশার্স , বঙ্কিমচাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ. ২১৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. রায়, অলোক, কালান্তরের কথাকার তারাশঙ্কর, কলিকাতা, অক্ষর ২০০৯

২. গুপ্ত, ক্ষেত্র, তারাশঙ্কর অনুসন্ধান, কলিকাতা, পুস্তক বিপিণি ১৯৯৮

৩. রায়, গৌরমোহন, তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী ১৯৯৪

৪. বসু, নিতাই, তারাশঙ্করের শিল্পি মানুষ, কলকাতা, দে'জ ১৯৯৮

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি ২০০৯

৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কথা শিল্পী, কলকাতা, ভারবি ২০০৭

৭. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন (সম্পা:), তারাশঙ্কর: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি ২০১০

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

....

প্রাবন্ধিক

তুঙ্গভদ্রার তীরে উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা ও প্রেমচেতনা

তনুহাজারী দেবশর্মা

সারসংক্ষেপ-

‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখক ঐতিহাসিক সময়ের সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনা এক বিমিশ্রণ কাহিনী এই উপন্যাসে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন। উপন্যাসটির কাহিনী মূলত দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় দেবরায় এর রাজত্বকালের। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর যে কোন সভ্যতার প্রথম উত্থান হয় নদী কেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে । এই বিজয়নগর রাজ্যটিও গড়ে উঠেছিল ‘তুঙ্গভদ্রা’ নামক নদীর তীরবর্তী স্থানে। লেখক ‘ভূমিকা’ অংশে উল্লেখ করেছেন কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও কাহিনী মৌলিক। ঘটনাকাল ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে। যে সময়কার কাহিনী বিজয়নগর রাজ্যের অবসানের তখনো শতবর্ষ বাকি ছিল। লেখক উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিকতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরলেও যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা রাজতন্ত্রের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই রাজতন্ত্রের মধ্যে রাজার বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা, রাজা-প্রজার সম্পর্ক, রাজার রাজত্বের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের রাজত্বগুলির সঙ্গে সম্পর্ক, রাজতন্ত্রের গৃহ শত্রুতা, রাজতন্ত্রের পরিবারের সদস্যদের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এবং জীবনের পরিণতি, রাজা এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়ন, সামাজিক মানুষের আবেগ-যন্ত্রণা-নিরাশা সবই উপন্যাসটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র বিজয়নগরের রাজা দেবরায় হলেও কলিঙ্গ রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার আবেগ, প্রেম-চেতনা এবং সাধারণ একজন সৈনিক অর্জুনবর্মার দেশপ্রেম, রাজভক্তি ও নারীর প্রেম সুলভ যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় তা কাহিনীর উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে । যা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সময়কে ছাপিয়ে সর্বকাল মানুষের জীবন যৌবনের চিত্র হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসে অতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নদী পথের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল তার বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতবর্ষের এই নদী পথগুলিতে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন নগর গড়ে উঠেছিল। এই নগরকেন্দ্রিক মানুষের নিজস্ব মাতৃভূমির প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছোট ছোট রাজত্বের পরিণত হয়ে নিজস্ব সভ্যতার মানদণ্ডকে নিয়ে এগিয়ে চলছিল। উপন্যাসের কাহিনীতে গুহাবাসী মানুষের জীবনচার্যার তথা বনকেন্দ্রিক জীবন যাপনের কথাও উঠে এসেছে। গুহাবাসী মানুষের দৈনন্দিন জীবন একপ্রকার বহির্বিশ্বের সম্পর্ক থেকে অনেকটা বিচ্যুতিতে রয়ে যায়। বাইরের জগত সম্পর্কে তাদের তেমন ধ্যান ধারণা কথা নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সামাজিক সংস্কার, সংস্কৃতি, জীবনচর্যা এবং তাদের নৃত্য-গীত-কলা-কৌশলীর ও রাগ-রাগিনীর বিশেষ সমাদরের কথা জানা যায়। ঐতিহাসিক উপাদান দিয়ে সাহিত্যিক উপন্যাস লেখা হলেও মানুষের জীবনচার্যার কথাই উপন্যাসটির মুখ্য বিষয়। প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়া গুলির সঙ্গে ভালোবাসা ও প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক জীবনের যে বিচার বিশ্লেষণ এবং তার সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে মানুষকে পরিচালিত করে তা এই উপন্যাসে রয়েছে। উপন্যাসে রাজা দেবরায় নারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক কথাই তুলে ধরেছেন। বিচিত্র নারী মনের যে প্রেম চেতনা তা উপন্যাসটিকে প্রেম তন্ময়তার এক নিষ্ঠ পরাকাষ্ঠা স্বরূপতা দান করেছে। কলিঙ্গ রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার মনের যে প্রেমচেতনা তা পুরাণের রাম-সীতার একনিষ্ঠ প্রেমে পবিত্রতা ছাপ রেখেছেন। এছাড়াও ভাগ্যান্বেষী দুই যুবক অর্জুনবর্মা এবং বলরামের যে জীবন কাহিনী তা মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়নে জীবন চলার পথে সত্যতার পথ অবলম্বন করেছে। একজন প্রজাকল্যাণকারী রাজা তাঁর নিজস্ব রাজত্ব

রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক চিন্তা চেতনায় এবং নিজস্ব স্বয়ং আত্মকেন্দ্রিক বিশ্লেষণের দ্বারা কীভাবে নারীর মনকেও বুঝতে পারার যে এক শক্তি তা রাজা দেবরায়ের চিন্তাচেতনায় পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তুঙ্গভদ্রার এই উর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু, সকল ইতিহাসের পিছনে লুকিয়ে থাকে মানব সভ্যতার স্মৃতিকথা। যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে কোন ইতিহাস হয় না। আর এই তুঙ্গভদ্রার স্মৃতির ইতিহাসেই এই কাহিনী সাহিত্যে রূপ দেওয়া হয়েছে।

সূচক শব্দ-

বিজয়নগর, রাজা, দেবরায়, দাক্ষিণাত্য, রাজকন্যা, বিদ্যুন্মালা, আর্জুনবর্মা, বলরাম, কলিঙ্গ ।

মূল প্রবন্ধ-

বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ভিন্ন মাপের লেখক। তাঁর লেখায় সাহিত্যের যে বিভিন্ন আঙ্গিক ধরা পড়েছে তার ফলে বাংলা সাহিত্য বরাবরই সমৃদ্ধ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর (১৮৯৯ সালের ৩০ শে মার্চ) গোড়াতেই জন্মগ্রহণ করে প্রায় বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হল ব্যোমকেশ। বাংলা সাহিত্যে ব্যোমকেশ জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি করে গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভধর্মী রচনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই যথা- উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা নানান বিষয়ে তাঁর বিচরণ রয়েছে। তাঁর অনেক রচনা সিনেমা জগতে পরিচিতি লাভ পেয়েছে। তবে ডিটেকটিভধর্মী রচনা, সাসপেন্স, ঐতিহাসিক বা ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস বা গল্প রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসগুলি হল - কালের মন্দিরা (শ্রাবণ, ১৩৫৮), গৌড়মল্লার, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, কুমারসম্ভাবের কবি, তুঙ্গভদ্রার তীরে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের এক ও অনন্য স্বাদের দাবিদার রাখে। ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসটি রচনার সময়কাল লেখকের ডায়ারি অনুসারে আরম্ভ ২১ শেষ জুলাই ১৯৬৩ থেকে ১৭ এপ্রিল ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেছেন বাংলা সাহিত্যের বিক্রমশীল ধর্মপাল শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সহৃদয়েষুকে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি ১৩৭২ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির জন্য ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ লাভ করেন।

‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির সাহিত্যিক দিক থেকে ঐতিহাসিক বিষয় আলোচনায় ইতিহাসের কাহিনীর আশ্রয়ে চরিত্র গুলির যে কাল্পনিকতা ও অতীতচারিতার চিত্র তা উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। লেখকের মতে, এই উপন্যাসের কাহিনী Fictionised history নয়, Historical fiction। তবে যুগের ধারাবাহিক উত্থান ও পতনের ঘটনাকে আমরা ইতিহাস বলে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে ইতিহাসের ঘটনাকে লেখক তাঁর লেখনীর কল্পনার দ্বারা রচনা করে এক নতুন কাহিনীর সৃষ্টি করেন। যার ফলে সাহিত্য ইতিহাসের চেয়েও সত্যনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাই ইতিহাসের তথ্যকে লেখক নিজস্ব সৃজনশীলতায় জারিত করে সামাজিক, রাজনৈতিক, দ্বন্দ্ব- সংঘাত, আবেগ, আলোড়ন, প্রেম চেতনা, দুঃখ-কষ্ট, পাত্র-পাত্রীদের সম্পর্কগুলি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে গড়ে তুলেন। লেখকের রচনায় অতীত ইতিহাসের যে সময় পর্বের প্রকাশ পায় তা লেখক ও পাঠকের কাছে বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও প্রেমমুগ্ধতা হয়ে ওঠে।

‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির মূল পটভূমি দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্য। এই বিজয়নগর রাজ্যটি তুঙ্গ ও ভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত । উপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির ‘ভূমিকা’ অংশে লিখেছেন – “এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পান্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

Sewell-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell- এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনা কাল খৃ ১৪৩০-এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল"।[১] ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুই নদীর তীরে গড়ে ওঠা বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাসকে সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে এসে তার ইতিহাসকে স্মৃতিচারণ করতে চেয়েছেন। প্রচলিত প্রবাদ- 'গঙ্গার জলে স্নান, তুঙ্গার জল পান' দুটোই পুণ্যের কর্ম। উপন্যাসে উল্লেখিত যে তুঙ্গভদ্রা অনাদ্রিত নদী। তুঙ্গ ও ভদ্র দুই নদীর মিলিত পথ এর সঙ্গে কৃষ্ণা নদী ও মিলিত হয়েছে। শুধু সঙ্গিনী নয় ভগিনীও বটে। দুই বোন একই সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল পথে দেখা এবং দুই বোন গলা জড়াজড়ি করে একসঙ্গে চলতে থাকে। তুঙ্গভদ্রার এই সৌভাগ্যের সময় বিজয়নগর রাজ্য গড়ে ওঠে। এই বিজয়নগর একসময় সমস্ত দাক্ষিণাত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্তমানে বিজয়নগর এর বহু বিস্তৃত ভগ্নস্তূপ এর ঐতিহ্য থাকলেও তুঙ্গভদ্রা সেই ইতিহাস ভুলে নি। আর এই স্মৃতির ইতিহাস কত কোটি রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম বিদ্বেষ, কৌতুক কুতূহল, জন্ম মৃত্যুর বৃত্তান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক ১৩৫২ শকাব্দের বৈশাখ মাসের অপরাহ্ন সময়ের কথা উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের বিজয় নগরের জলপথে কলিঙ্গদেশের প্রধান বন্দর কলিঙ্গপত্তন থেকে তিন মাস পূর্বে তিনটি বড় নৌকার যাত্রা শুরু হয় বিজয় নগরের উদ্দেশ্যে। তিনটি নৌকার মধ্যে বড় নৌকার প্রধান যাত্রী কলিঙ্গদেশের রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা ও বৈমাত্রী ভগিনী মণিকঙ্গনা। বাকি দুটি নৌকায় তিন মাসের ভোজন সামগ্রী এবং সৈন্যবাহিনী ছিল। কলিঙ্গ রাজকন্যা যাত্রা আসলে বিজয় নগরের তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের সঙ্গে বিবাহের জন্য। কারণ বিজয়নগরের সঙ্গে কলিঙ্গরাজের পরাজয় স্বরূপ এই বিবাহ সন্ধি ও আত্মীয়তা। রাজতন্ত্রের সময়কালে পরাজিত রাজারা নিজস্ব রাজত্ব বাঁচাতে নিজ রাজকন্যাকে জয়ী রাজাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে নিজস্ব রাজত্ব রক্ষা করত। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক সময়ে ভারতের প্রাচ্য উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য নৌবিদ্যার প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে ছিল। উত্তরে নৌ- সাধনোদ্যত বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিনে তৈলঙ্গ, তামিল দেশ পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে ঘাঁটি স্থাপন হতে থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য মূলত ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ তথা সাগরিকার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজয়নগর রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই হরিহর ও বুক্ক। বিজয় নগরের আদি নাম ছিল 'বিদ্যানগর'। তবে তা মুখে মুখে বিজয়নগর নামে পরিণত হয়। দিল্লির সুলতান মুহম্মদ তুঘলক এর বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে হরিহর ও বুক্ক দুই ভাই শৃঙ্গেরি শংকর মঠের সন্ন্যাসী বিদ্যারন্যের শরণাপন্ন হয়ে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিজয়নগর রাজত্ব শাসন করেন। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। আবার কৃষ্ণার উত্তরে বহমনী নামে মুসলিম রাজত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিজয়নগর রাজত্বে প্রায় শতবর্ষ পরে বিজয়নগরের রাজা হন দেবরায়। যিনি অসাধারণ রাজ্য শাসক ও রণ পণ্ডিত ছিলেন। রাজা প্রথম দেবরায় তুরস্ক থেকে ধানুকী সৈন্য ও যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরের বেশি শাসনকালে সমস্ত দাক্ষিণাত্য বিজয় নগরের রাজত্বের ছত্রছায়ায় এনেছিলেন। দেবরায়ের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও বিজয় রায় কর্মশক্তিহীন অপদার্থ হওয়ায় বিজয় রায়ের পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় পিতামহের মতো রণদক্ষ ও ধীমান ছিলেন। দ্বিতীয় দেবরায়ের বয়স ৩৫ বছর। দ্বিতীয় দেবরায়ের শৌর্য ও বীরত্বে প্রায় সমস্ত কাছাকাছি রাজ্যগুলি বিজয়নগর রাজত্বের পদানত হন। অন্ধ্র দেশ বিজয় নগরের মিত্র দেশ ছিল। কিন্তু কলিঙ্গের রাজা গজপতি চতুর্থ ভানু দেব অন্ধ্র দেশ আক্রমণ করলে পরিনাম স্বরূপ বিজয় নগরের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে কলিঙ্গের পরাজয় ঘটে।

এই বিবাহ যাত্রা শুভ ও আনন্দের বার্তা বহন করলেও কলিঙ্গ কুমারী বিদ্যুন্মালার মনে কোন আনন্দ নেই। রাজকুমারীর মনে হয়েছে এ এক রাজনৈতিক দাবা খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজকুমারী বোন মনিকঙ্কনাকে জানায় – "যাচ্ছি।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নিরপরাধ মানুষ যেমন বদ্ধভূমিতে যায়, আমিও তেমনি যাচ্ছি। যে স্বামীর তিনটি বউ আছে তাকে কোনদিন ভালোবাসতে পারবো না"।[২] রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার প্রেম বা বিবাহ সম্পর্কিত মতামত হল রামচন্দ্র সীতার মত পতিব্রতা প্রেম। তবে রাজকুমারীর বোন মনিকঙ্কনার কাছে এই যাত্রা অনেকটা আনন্দের। বোন মণিকঙ্কনা রাজার সঙ্গে বিয়ের কথা প্রসঙ্গে বলে –"তাঁকে অন্য বৌরা যতখানি ভালবাসে আমি তার চেয়ে এর বেশি ভালবাসব। আমার বুকে ভালবাসা ভরা আছে। যিনিই আমার স্বামী হবেন তাঁকেই আমি প্রাণভরে ভালবাসব"।[৩] এই যাত্রায় নৌকায় তাদের সঙ্গে ছিল মন্দোদরী, মাতুল চিপিটক ও রাজবৈদ্য রসরাজ। এরাই ছিল রাজকুমারীদের যাত্রার অভিভাবক। এই যাত্রা পথেই মণিকঙ্কনা মাঝ সমুদ্রের জলে দূরে ভাসমান অবস্থায় কিছু দেখতে পায়। এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় সংকেত দেওয়ায় অন্য জাহাজে থাকা বঙ্গদেশের বলরাম কর্মকার নামক সাঁতারু দুই বংশ দণ্ডের সঙ্গে লোকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। জাহাজের বৈদ্য রসরাজের ঔষধে লোকটি সুস্থ হলে জাহাজের দায়িত্বে থাকা চিপিটপ মূর্তি প্রথমত গুপ্তচর সন্দেহ করে। কিন্তু আহত ব্যক্তিটি সত্যতার সঙ্গে তার পরিচয় দিলে সেই আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। আহত ব্যক্তিটি পরিচয়ে নাম বলেন অর্জুন বর্মা। দক্ষিনে যবনদের রাজধানী গুলবর্গা থেকে পলায়ন করে ভীমা নদীতে সাঁতার কেটে অসহায় অবস্থায় এই পর্যন্ত এসে পৌঁছান। অর্জুনবর্মাও হিন্দু রাজ্য বিজয় নগরের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছেন। এই যাত্রায় জাহাজের কর্মকার বলরাম ও আহত যুবক অর্জুন বর্মার মধ্যে মিত্রতা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মিত্রতার সম্পর্কে জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ভাগাভাগি করে নেয় দুজনে যাত্রাপথে। বলরাম জীবনে অনেক দুঃখ পেয়ে তার মন একপ্রকার স্থির হয়ে ভাবতে থাকে – 'দুঃখ তো আছেই, দুঃখ তো জীবনের সঙ্গী; তাহার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুখ আহরন করা যায় ততটুকুই লাভ'। তাছাড়া বলরাম ছিল সংগীতের রসানুভূতির মানুষ। বলরাম মৃদঙ্গের তালে জয়দেব গোস্বামীর পদাবলীর মধুর গীত পরিবেশন করতে পারে। এদিকে সুদর্শন পুরুষ অর্জুনকে দেখে রাজকন্যা মোহিত হয়ে স্বয়ংবর সভার স্বপ্ন পরিকল্পিত করতে থাকে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথা ভেবে রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার মনে হয় তার জীবন এত জটিল কেন।

বিজয় নগরের পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকে হেমকূট নামে পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। আর এই চূড়ায় প্রতিদিন ধুনী জ্বালানো হয় যাতে সারা রাত্রি জ্বলতে থাকে। এই জ্বলন্ত হেমকূট দেখে সারা দেশের লোক জানতে পারে দক্ষিণাত্যের একটি হিন্দু রাজা ললাটে আগুন জ্বালিয়ে জেগে আছে। বিজয়নগরগামী তিনটি নৌকা বিজয়নগরের সীমায় প্রবেশ করে সৈন্যদের অনেগুন্দি দুর্গ পেরিয়ে, কিল্লাঘাটে আসলে বিজয় নগরের রাজার ভাই কুমার কম্পনদেব রাজকুমারীদের স্বাগত জানাতে আসেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের শৈল বন্ধুর মালভূমিতে অতর্কিত ঝড় আসে। যা অনেকটা ধুম্র বর্ণ রাক্ষসের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর ঘাট ও নৌকো গুলিকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে যায়। এমতবস্থায় রাজকুমারী বিদ্যুন্মালাসহ আরো অনেকে নদীর জলে পড়ে যায়। রাজকুমারী জলে ডুবন্ত অবস্থায় একটি হাত তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অপরিচিত যুবক অর্জুনবর্মা ও রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা নদীর কাছাকাছি একটি দ্বীপে ভেসে উঠে তারা রাত্রি যাপন করে। যুবক অর্জুনবর্মা রাজকন্যাকে অভয় দিয়ে বলেন তিনি এখন সুস্থ আছেন এবং শরীর ক্লান্তির জন্য বিশ্রাম করতে বলেন। অর্জুনবর্মা রাজকন্যাকে তার পরিচয় জানান পিতার নাম রামবর্মা, তারা যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয়। পূর্বপুরুষেরা যোদ্ধা ছিল,পরে অস্ত্র ছেড়ে শাস্ত্র চর্চায় নিযুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের যবনেরা দিল্লির শাসন ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বহমনী রাজ্য নাম দিয়ে তার রাজধানী করেন গুলবর্গায়। মুসলিমদের অত্যাচারের জন্য পিতা অর্জুনকে বিজয়নগরে যেতে বলেন। বিজয় নগরে আসার পথে অর্জুনের পিতৃবাক্য – " কেঁদো না। আমরা যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁকেও একদিন জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে যেতে হয়েছিল। তুমি বিজয়নগরে যাও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করবেন"।[৪] অর্জুন বর্মা নিষ্পাপ কথাবার্তা, আচরণ ও প্রাণ রক্ষার্থে হেতু রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার মনে এক প্রকার অনুরাগের দুর্বল মনোভাব উদয় শুরু হয়ে যায়।

ঝড়ের ঘটনার এক রাত কাটার পর দিন সকালে চামড়ার আবরণের তৈরি বেতের চেঙ্গারির মত ডিঙ্গায় নদীর কাছাকাছি তট গুলিতে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। এই জলযান গুলি প্রাচীনকাল থেকে আরব দেশে প্রচলিত ছিল। মোপলাদের আরব দেশ থেকে দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা সচল থাকত। বিজয়নগরের কুমার কম্পনদেব দুই রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজার কাছে নিয়ে আসে। কলিঙ্গ রাজকন্যাদের সৌন্দর্য দেখে কুমার কম্পানদেবের মনে একপ্রকার লালসা ও ঈর্ষান্বিত মনোভাবের জন্ম হয়। রাজার মন্ত্রী লক্ষণ মল্লপ ও কুমার কম্পনদেবকে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং কম্পন দেবের কাছে মন্ত্রীও পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন না। রাজাকে কুমার কম্পনদেব, রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা ও অর্জুন বর্মার উদ্ধারের কথা এবং দ্বীপে দুজনে রাত্রে যাপনের কথা এক প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজা দেবরায় অর্জুনবর্মাকে ডেকে তার কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনলে রাজা ও মন্ত্রীর মনে হয় কম্পন দেব তিলকে তালের মত করেছে। রাজা অর্জুনবর্মাকে তার সাহসিকতার জন্য স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন এবং সেনাবাহিনীতে কাজ দেওয়ার জন্য আশ্বাস প্রদান করেন। রাজমহলে রাজকন্যাদের দেখাশোনার ও মনোভাব বোঝার জন্য রাজা দেবরায় সাতশত প্রতিহারিনীর প্রধানা নায়িকা পিঙ্গলকে দায়িত্ব দেন। তবে রাজার ভাবি স্ত্রীকে অন্য পুরুষের স্পর্শ করার জন্য বিধি হিসেবে রাজা ও মন্ত্রী যুক্তি পরামর্শের জন্য রাজগুরুর উপদেশ নেন। রাজগুরুর উপদেশ হিসেবে বিবাহ তিন মাস ঋতুকাল বন্ধ থাকার নির্দেশ দেন এবং রাজকন্যাকে তিন মাস পম্পাপতির মন্দিরে সহস্তে পূজা দেওয়ার বিধি প্রদান করেন। রাজগুরু শ্রাবণ মাসে বিবাহের তিথি দেখে রাখার কথা জানান।

নদীর ঘাটের ঝড়-ঝাপটার পর কর্মকার বলরাম নৌকাগুলি ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে বন্ধু অর্জুনবর্মা বিজয় নগরের অতিথি আভূষণে বিজয়নগর ভ্রমণ করে বিজয় নগরের লোকেদের সঙ্গে আলাপচারিতা করতে শুরু করেন। অর্জুনের মনে হয় মাতৃভূমি বলে কোন বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে মাতৃভূমি সেইখানে। অর্জুন এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে বন্ধু বলরামকে খুঁজতে নদীর ঘাটে জাহাজগুলির স্থানে চলে যায়। বন্ধুকে নিয়ে রাজভবনে ফিরে এসে বিজয়নগর দর্শন করতে বেরিয়ে পড়ে। বিজয়নগরের অনেক লোকালয়, দোকানপাট, মঠ-মন্দির ঘুরে মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত্য-গীত দেখে বিজয়নগর সম্পর্কে তাদের মনে একপ্রকার ভালোবাসা জন্ম নিতে থাকে। পাশাপাশি দুই বন্ধুর পেছনে যে গুপ্তচর ঘুরছে তার আন্দাজ করতে পারে। তবে নিজেদের সততা ও সৎ বুদ্ধির কারণে এই যাত্রায় তারা উত্তীর্ণ হয়। প্রাচীনকাল থেকেই দাক্ষিণাত্য দেশ নৃত্য গীতাদি কলায় পারদর্শী। সেকালে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিনী সঙ্গে কর্ণাট রাগ, দেশ রাগ, গুর্জর রাগ এবং জয় মঙ্গল গানের বেশ সমাদরের কথা জানা যায়।

রাজভবনে আসা পর্যন্ত বিজয় নগরের সুদর্শন রাজা দেবরায়কে দেখার ফলেও কলিঙ্গ রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার মনে সুখ নাই। কিন্তু মণিকঙ্কণার মনে বসন্তের বাতাস দেখা দিয়েছে। রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা জানায় মামা চিপিটক ও মন্দোদরীর জন্য মন খারাপ হচ্ছে কারণ ঝড়ের সময় থেকে তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে ঔপন্যাসিক চিপিটক ও মন্দোদরীর হাস্যকৌতুক মূলক দুটি চরিত্রকে বিজয়নগর থেকে অনেক দূরে গুহাবাসী গ্রাম জীবনের নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছেন। যেখানে এই দুজনের গার্হস্থ্য জীবন গড়ে ওঠে। এদিকে রাজগুরুর আদেশ মত রাজকুমারীরা পম্পা পতির মন্দিরে প্রতিদিন সকালে দাসী সমেত পদব্রজে পূজা দিতে থাকে। মন্দিরের উত্তরে তুঙ্গভদ্রা, দক্ষিনে বামে পম্পা সরোবর ও হেমকূট পর্বতে আচ্ছন্ন। প্রচলিত রয়েছে ত্রেতা যুগে পম্পা সরোবরে সীতা দেবী স্নান করেছিলেন, রাম ও লক্ষণ এই তীরে পরম ধার্মিক বকপক্ষী দেখে হাস্য পরিহাস করেছিল। বিবাহের জন্য তিন মাস সময় পেলেও রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার মনে শান্তি নাই। রামচন্দ্রের মত আদর্শ স্বামী তার কাম্য। তবে নদী গর্ভ থেকে প্রাণ রক্ষা করা, অজ্ঞাত অখ্যাতনামা অর্জুনের মত যুবকের প্রতি তার যে আকর্ষণ - রাজার মেয়ে হয়ে এক সামান্য যুবকের প্রতি আসক্ত জন্য রাজকন্যার মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। তবে মণিকঙ্কনা রাজার অন্যান্য রানী গুলির সঙ্গে পরিচয় করতে যায় পিঙ্গলার সাথে।

বড় রানীর যুবরাজ মল্লিকার্জুনকে গর্ভে ধারণ করেছিল বলে, তার নামের সঙ্গে 'অম্বিকা' শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। রানীদের ব্যবহার ও পরিচর্যা দেখে মাণিকঙ্কনার মনে রাজার প্রতি সুপ্ত প্রেম ভাব জন্ম নিতে থাকে।

বিজয় নগরের মহারাজা দেবরায়ের হৃদয়ে প্রচুর স্নেহরস রয়েছে। তার সর্বপ্রধান প্রেমাস্পন্দন হল বিজয়নগর রাজ্য। প্রজাদের প্রতি প্রাণাধিক ভালবাসা। যার ফলে একজন আদর্শ রাজা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। রাজার মধ্যম ভ্রাতা বিজয়রায় ছিল অবিমিশ্রি যোদ্ধা। মহারাজের ভ্রাতা বিজয়রায় দক্ষিণ প্রান্তে বিদ্রোহী হিন্দু সামন্ত দমন করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ছোট ভাই কম্পন দেবের স্বভাব ছিল লোভী, কুটিল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী; মনে মনে সিংহাসনের প্রতি লোভ জন্মেছিল। রাজা দেবরায়ের পিতা ও মন্ত্রী ছোট ভাই কম্পন দেবের মতলব সম্পর্কে সচেতন থাকতে বললেও রাজা ছোট ভাই কম্পনদেবকে যথেষ্ট স্নেহ ও ভালোবাসতেন। রাজা দেবরায়কে এই অভ্যন্তরে সাংসারিক রাজতন্ত্র সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে বিজয় নগরের স্বর্ণ সময়ের বহিঃ আক্রমণের জন্য যুদ্ধকালীন বিষয়ের দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হত। গুপ্তচরদের খবর অনুযায়ী বহমানী রাজ্যের আহমদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করছে তা রাজা জানতে পারেন। আর এই সময়ের ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। রাজা দেবরায়ের কথায় – "ওরা ধূর্ত এবং শঠ; কপটতাই ওদের প্রধান অস্ত্র। ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের কপট এবং শঠ হতে হবে; ধর্মযুদ্ধ চলবে না। যুদ্ধে আবার ধর্ম কী ? যুদ্ধ কর্মটাই তো অধর্ম। ধর্ম যুদ্ধ করতে গিয়ে ভারত বর্ষ উৎসন্ন গেল"।[৫] মন্ত্রী লক্ষণ মল্লপও জানায়, ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধ করে বলেই মুসলিমরা হিন্দুদের বারবার যুদ্ধে পরাজিত করেছে। আসলে সেই সময় গোটা ভারতবর্ষের এই অবস্থার কথা জানা যায়।

রাজা দেবরায়ের সান্নিধ্যের ফলে বলরাম কর্মকার ও অর্জুনবর্মা দুইজনে রাজার গুপ্তচর সৈন্যদলে কাজ জোগাড় করে নেয়। দুই বন্ধু মিলে অজানা দেশে আবার বামন দৈবজ্ঞের কাছে রাম স্বামীর মন্দিরে নিজেদের ভাগ্যের কথা জানতে যায়। রাজা দেবরায়, অর্জুনবর্মা ও বিজয়নগরের প্রধান রাজদূত অনিরুদ্ধের সঙ্গে খবর আনতে মধ্যম ভ্রাতা বিজয় রায়ের কাছে পাঠালে অর্জুন বর্মা নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেন। অন্যদিকে বলরাম কর্মকার তার গুপ্ত বিদ্যার দ্বারা ছোট কামান তৈরি করে রাজার মন জয় করে নেন। রাজা তাদের দুই বন্ধুকে থাকার জন্য সংকেত গুহায় ব্যবস্থার কথা বলে দেন। এই গুহা রাজভবনের কাছাকাছি থাকায় রাজভবনের দাস-দাসীরা এই গুহার মধ্যে লুকিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করত এবং তাই এই গুহার নাম সংকেত গুহা বলে পরিচিত। গুহায় দুই বন্ধুর জন্য রাজভবন থেকে খাবার দিতে আসা দাসী মঞ্জুরীর সঙ্গে বলরামের পরিচয়ের দরুন প্রেমের অনুরাগ, মান অভিমানের পালা চলতে থাকে। মঞ্জুরী বাঁশি বাজায় আর বলরাম খোলের তালে গীতগোবিন্দের মধুর কোমল পদাবলী গান গায়। গুহার বাইরে পাহারা দেওয়ার জন্য চতুর্ভুজ নামক সৈনিক রাত্রে হুক্ক-বুক্কুর প্রেতাত্মা কে দেখে ভয় পেয়ে বলরাম ও অর্জুনের কাছে আসলে এই ঘটনার সাক্ষী দুই বন্ধুতে হয়ে যায়। হুক্ক-বুক্কুর আবির্ভাবের কথা রাজা ও মন্ত্রী জানতে পারলে বুঝতে পারে যে বিজয় নগরের কোন সংকট মুহূর্ত আসতে চলেছে। এই সময় রাজা সীমান্তবর্তী সৈন্যদের মনোবল বাড়ানোর জন্য সীমান্ত ভ্রমণে যান। সংকেত গুহায় দুই বন্ধুর জীবন যাপন বেশ কয়েকদিন ভালোভাবে কাটলেও অর্জুন পিতৃশোকে মুহ্যমান হয়ে থাকত। হঠাৎ একদিন এই গুহার দিকে অর্জুনবর্মা রাজকুমারী বিদ্যুন্মালাকে দেখতে পায়। রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা প্রায়ই অর্জুন বর্মার সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকলে একদিন রাজকুমারী অর্জুনবর্মাকে গলায় মালা পরিয়ে প্রেম নিবেদন করে জড়িয়ে ধরে। এই ঘটনায় অর্জুন বর্মা এক প্রকার আতঙ্কিত হয়ে যায়। কারণ রাজকুমারীকে মনে মনে অর্জুন বর্মা ভালবাসলেও তার নিজস্ব পরিচয় ও চাওয়া পাওয়ার সম্পর্কে সংযম রেখেছিল। রাজকন্যা বিদ্যুন্মালাকে অর্জুন বোঝাতে চায়, তুমি রাজকন্যা আমি সামান্য মানুষ। অর্জুনের মনে যৌবন ও বিবেক বুদ্ধির দড়ি টানাটানি চলতে থাকে। এদিকে রাজকন্যা অর্জুনের সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করতে থাকায় পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু অর্জুন বর্মা রাজকুমারীর এই কথাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। অর্জুনবর্মার মনে হয়, রাজকুমারীকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালোবেসেছে কিন্তু সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করে ভালবেসেছে মনের

মধ্যে নিবিড় প্রেম অনুভূতি পূর্বে তা অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রেম যত গভীরই হোক তার দ্বারা অপরাধবোধ তো দূর হয় না। তার মনে হয়েছে রাজা আমার অন্নদাতা যিনি আমার প্রভু তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। কেন আমি রাজকুমারীর প্রেম প্রথমে প্রত্যাখ্যান করি নাই বারবার সাক্ষাৎ করেছি এই জন্য গ্লানিতে ভুগতে থাকে।

রাজা দেবরায় রাজ্যের সীমান্ত ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে কুমার কম্পন দেবের নতুন গৃহপ্রবেশে নিমন্ত্রিত হন। এই সংবাদ মন্ত্রীর কাছে সন্দেহজনক মনে হয়, মন্ত্রী রাজাকে অনেকটা সচেতন করে দেন। কম্পন দেবের নতুন গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রিত দ্বাদশ জনকে কুমার কম্পনদেব ঠান্ডা পানির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলেন। কিন্তু রাজার অপেক্ষায় থাকায় রাজা না আসলে রাগে গজ গজ হয়ে প্রথমে পিতাকে হত্যা করে রাজা দেবরায়কে হত্যা করতে যান। রাজা দেবরায় রাজভবনে তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বিশ্রাম করায় অস্ত্রহীন ছিলেন। এই সময় পাশাপাশি অর্জুন বর্মা থাকায় তিনি ভল্লা দিয়ে কম্পনদেরকে হত্যা করে রাজা দেবরায়ের প্রাণ রক্ষা করেন। রাজা দেবরায় অর্জুন বর্মাকে নিজস্ব দেহরক্ষী জন্য রাখেন। রাজভবনে দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত থাকা অর্জুন বর্মার সঙ্গে রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার অনায়াসে দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকে। কিন্তু পিঙ্গলা রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার এই গোপন সম্পর্ক কথা রাজাকে জানিয়ে দেয়। রাজার সম্মুখে একদিন ধরা পড়ে যাওয়ায় রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা কান্নায় ব্যাকুল হয়ে বলে- "রাজাধিরাজ, অর্জুন বর্মাকে ক্ষমা করুন। ওঁর কোন দোষ নেই, আমি অপরাধিনী। হত্যা করতে হয় আমাকে করুন। ....আমি অর্জুন বর্মাকে প্রলুব্ধ করেছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সম্মত হননি। ওঁর অপরাধ নেই, আমি অপরাধিনী, আমাকে দণ্ড দিন"।[৬] পিঙ্গলা রাজকন্যাকে রাজ ভবনে নিয়ে যায়। অর্জুনবর্মা নতমস্তকে রাজার কাছে স্বীকার করে বলে, আমিও সমান অপরাধী মহারাজ। এই ঘটনায় রাজা দেবরায় অর্জুনবর্মাকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে নির্বাসন দেয়। কারণ অর্জুনবর্মা রাজার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। অর্জুন বর্মার নির্বাসনের কথা শুনে বলরামও তার সঙ্গে এই উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। সহায়হীন যাত্রা পথে বন্ধুই তার একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে। এই ঘটনায় রাজা দেবরায় বড় চিন্তিত হয়ে ভাবেন স্ত্রী জাতির মন স্বভাবতই চঞ্চল। রাজকুমারী বিদ্যুৎন্মালাকে দেখে তা মনে হয় না। নদী থেকে প্রাণ বাঁচানোর সময় অঙ্গ স্পর্শের দরুন অর্জুনের প্রতি রাজকুমারীর প্রেম আকর্ষণ হতে পারে। আসলে নারীর মন একবার যার প্রতি ধাবিত হয়, সহজে নিবৃত্ত হয় না। তাছাড়া অর্জুন বর্মার চরিত্রে তেমন কোন অসৎ বার্তা রাজা খুঁজে পাননি। হয়তো রাজকুমারীর কথাই সত্য, অর্জুন রাজকন্যার দ্বারাই প্রলুব্ধ হয়েছে। রমণীর কুহকে আবদ্ধ হয়ে কত সৎ চরিত্র যুবক ওই না সর্বনাশ হয়েছে। রাজা দেবরায় এই ঘটনায় অনেক ধর্ম সংকটে পড়ে যান।

ভাগ্যান্বেষী হতভাগ্যবান দুই বন্ধুর বলরাম ও অর্জুন বিজয়নগর থেকে অনেক দূরে নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। গুহার মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে লেখা –'দেবদাসী তনুশ্রী গৌড় নিবাসী শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল'। বলরাম ও অর্জুন দুজনে এই লেখা দেখলেও অর্জুন ভাবতে থাকে অন্য একটি মুখ - সামান্য দেবদাসী তনুশ্রী কে কেউ মনে রাখে নাই কিন্তু ব্যর্থ কামনা পাষাণ ফলকে কালজয়ী হয়ে আছে। আর এই সকল ব্যর্থ কামনাই কি অন্তিম নিয়তি - এই প্রশ্নই অর্জুনের মনে উঠতে থাকে। গুহায় বিশ্রাম কালে দুই বন্ধু যুদ্ধকালের নাগরার আওয়াজ শুনতে পাই। গুহার শেষ প্রান্তের দেখতে পায় বহমনী রাজ্যের সৈন্য বিজয় নগর আক্রমণ করার জন্য এই পথে প্রস্তুতি শুরু করেছে। অর্জুনবর্মা অবিলম্বে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় রাজাকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য। অর্জুনবর্মা বন্ধু বলরামকে বলে – "বিজয়নগর কে বেশি ভালবাসি, কি রাজাকে বেশি ভালবাসি, কি বিদ্যুন্মালাকে বেশি ভালবাসি, তা জানিনা। কিন্তু আমি যাব"।[৭] এই বলে অর্জুন কাদা-জল-মাটি-প্রান্তর পার করে যাত্রা করে। এদিকে বলরাম তার ছোট্ট কামান প্রস্তুত করে দুই তিন জন বহমনী সৈন্যকে কামানের গুলিতে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে রাজভবনে অর্জুন মরণাপন্ন অবস্থায় রাজাকে খবর দেওয়ার জন্য পৌঁছলে রাজা দেবরায় কে শত্রু আক্রমণের কথা জানায়। রাজা মন্ত্রী ও সেনাপতিকে ডেকে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। এই যুদ্ধযাত্রায় অর্জুনবর্মা রাজার সঙ্গে যেতে চায় কারণ

সংবাদ মিথ্যা হলে রাজা যেন তাকে সেখানে হত্যা করে। এইদিকে বিজয়নগরের রাজধানীতে যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতির কথা শুনে সবার মধ্যে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হতে থাকে। বিজয় নগরের সৈন্য দেখে বহমনীর সুলতান আহমদ শাঁর সৈন্য পিছু হাঁটতে থাকে। রাজা এই প্রান্তে দুই হাজার সৈন্য রেখে রাজধানীতে ফিরে যায়। অর্জুনের নির্বাসন দণ্ড মাপ করে তাকে রাজ সেনাপতি পদ দেন এবং বলরামকে রাজ কর্মশালার প্রধান করে দেন। রাজভবনের কলিঙ্গ রাজকন্যা বিদ্যুন্মালাকে ডেকে বিবাহের জন্য শেষ মতামত চাইলে রাজকন্যা অর্জুন বর্মাকে বিয়ে করতে চান। রাজাও অর্জুনের সঙ্গে তার বিবাহ করার ব্যবস্থা করেন। রাজা দেবরায় মনিকঙ্কনাকে নাম পাল্টে তাকে বিবাহ করেন। এদিকে বলরাম ও রাজার কাছে মঞ্জুরীকে বিবাহ করার জন্য আবেদন জানালে শ্রাবণের ত্রয়োদশীতে তিনটি বিবাহ একসঙ্গে সম্পন্ন হয় । বিবাহ সম্পন্নের পরে কলিঙ্গদেশের তিনটি জাহাজ বিজয়নগর থেকে আবার কলিঙ্গদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে । ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির ইতিহাস চেতনায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন – “তোমার লেখার একটা জাদু আছে, তুমি অনায়াসে এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি কর যে পলকে মনকে সুদূর অতীতে টানিয়া লও । তুঙ্গভদ্রার তীরে তোমার সে সুনাম রক্ষা করিয়াছে । ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি – দুইই তোমার তুল্যমূল্য ।.....”[৮]

ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসে ইতিহাস চেতনার সঙ্গে যে প্রেম চেতনা এক বাস্তব রূপ অঙ্কিত করেছেন তা এক সাহিত্য ইতিহাসের চেয়ে বেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে। বিজয়নগর রাজ্যের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ইতিহাস, এক রাজকন্যার প্রেম, দুই ভাগ্যান্বেষী যুবকের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়ন, নদীমাতৃক বাণিজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস চেতনা, রাজতন্ত্রের মধ্যেই সিংহাসন নিয়ে ভাই ভাইয়ের মধ্যে চক্রান্ত, রাজার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক যে বিভেদ তা উপন্যাসটিতে সাহিত্যের নিরিখে ইতিহাস যেন বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সেই সময়কে উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরে নিজস্ব ও পাঠকের কাছে এক আকর্ষণীয় ঘটনা ও সময়কে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন – “..... আপনি বিজয় নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন - এজন্য আমরা হঠাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ - কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না - কিন্তু আপনার বই পড়বে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়ে Three Musketeers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুই খানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেব রায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে”।[৯]

আকড় গ্রন্থঃ

বন্দ্যোপাধ্যায়,শরদিন্দু, ‘শরদিন্দু অমনিবাস’, (তৃতীয় খন্ড) ঐতিহাসিক উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নবম মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯।

তথ্য সূত্রঃ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়,শরদিন্দু, ‘শরদিন্দু অমনিবাস’, (তৃতীয় খন্ড) ঐতিহাসিক উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নবম মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৮৩ (ভূমিকা অংশ) ।

২.তদেব, পৃ.৪৯১

৩. তদেব, পৃ.৪৯১

৪. তদেব, পৃ.৫১৫

৫. তদেব, পৃ.৫৪৮

৬. তদেব, পৃ.৫৮৯

৭. তদেব, পৃ. ৫৯৮

৮. তদেব, পৃ. ৬১৭(চিঠি, ৪ আষাঢ় ১৩৭৩)

৯. তদেব, পৃ. ৬১৭(চিঠি, ২৬ নভেম্বর ১৯৬৫)

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীশ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ০৭৩, পুনমুদ্রণ, ২০১৬-২০১৭.

২. মিশ্র, ড. আশোক কুমার, 'সাহিত্যের রূপরীতি কোষ', সাহিত্য সঙ্গী, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ০৯. ষষ্ঠ সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩.

৩. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, 'সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', রত্নাবলী, কেশবচন্দ্র সেন স্টড়িট, কলকাতা ০৯,পঞ্চম পরিমার্জিত সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১২

৪. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রজ্ঞাবিকাশ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, ০৯. পুনমুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৬.

৫. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'উপন্যাসের বর্নমালা', পুস্তক বিপনি, বেণিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, আগস্ট ২০১৬.

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য-নিকেতন' : রোগ-ব্যাধি-মহামারির বিপন্নতা থেকে স্বস্তির সন্ধান

প্রভা বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ -

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আরোগ্য-নিকেতন'। এই উপন্যাসের ভরকেন্দ্রে আছে জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েন। জীবনের হাসি-গান কলরব যেমন আছে, তেমনই আছে আগ্রাসী বিশ হাত বাড়িয়ে জীবনকে মৃত্যু জঠরস্থ করার চেষ্টা। একই সঙ্গে অলৌকিকতা ও দৈবেবিশ্বাসী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আধুনিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আরোগ্য নিকেতন ঘিরে শুধু আয়ুর্বিদ্যা বনাম অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার হার-জিতের লড়াই পুনরাবৃত্তি করেননি, জীবনমশায় ও প্রদ্যোত ডাক্তারের লড়াইয়ের মাধ্যমে জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ সন্ধান করতে চেয়েছেন। সেই সূত্রে একাধিক রোগ-ব্যাধি, মহামারির কথা উঠে এসেছে উপন্যাসে। রোগ-ব্যাধি ও মহামারিজনিত বিপন্নতাকে কেন্দ্র করে সমাজ-মানুষের যে বহুকৌণিক চিত্র; কোথাও যা ব্যক্তি, সমাজ কিংবা পরিবারের মানবিক মুখকে প্রোজ্জ্বল করেছে, কোথাও বা অমানবিক ভূমিকায় দেখা দিয়েছে। কাল থেকে কালান্তরে ঐ রাষ্ট্র-সংকটের সময়ে সার্বিক জনজীবনে বিপর্যয়, স্বাস্থ্য-পরিষেবার হাল-হকিকত, পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্য-কর্মী ও চিকিৎসকদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম আখ্যানে জায়গা করে নিয়েছে। মানুষ বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে, চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর ভর করে রোগ-ব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ থেকে নিজেদের অকাল মৃত্যু রোধ করার জন্য পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করেছে। আগামী দিনেও ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হবে মানুষ এই প্রত্যয় সন্নিবেশিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ –

ব্যাধি, মহামারি, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রতিষেধক, কলেরা, ম্যালেরিয়া, মৃত্যু, বিপন্নতা।

মূল প্রবন্ধ-

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, রাঢ়ের চারণকবি, নিম্নবর্গের মানুষের কথাকার এমনতর বহুমাত্রিক অভিধায় সম্মানিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই কথাশিল্পী আমাদের মনে সদা জাগ্রত আছেন তাঁর মৌলিক সৃষ্টিরসের মাধ্যমে। তিনি চার দশকের বেশি সময়কাল ধরে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। ১৯২৯-৩০ থেকে মৃত্যুকাল অবধি তিনি একটি কাব্যগ্রন্থ, পঁয়ষট্টিটি উপন্যাস, আড়াইশো-র অধিক ছোটগল্প, বারটি নাটক, অসংখ্য প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী রচনা করেছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি হল— 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪৩), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'কবি' (১৯৪৪), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'আরোগ্য-নিকেতন' (১৯৫৩) ইত্যাদি। তিনি সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের জন্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন— রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৫), সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৬), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৬৭) এবং পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। আমার প্রবন্ধের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসটি বেছে নিয়েছি। আলোচ্য প্রবন্ধের শিরোনাম— "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য-নিকেতন' : রোগ-ব্যাধি-মহামারির বিপন্নতা থেকে স্বস্তির সন্ধান"।

'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাসে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'সঞ্জীবন ফার্মেসি' নামে। পরবর্তী দ্বিতীয় সংস্করণে (মার্চ, ১৯৫৩) পরিবর্তন পরিমার্জন করে নাম দেন 'আরোগ্য-নিকেতন'। এই রচনার জন্য ঔপন্যাসিক ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। পরের বছর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক 'আরোগ্য-নিকেতন' মালায়ালম, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি, তামিল এবং হিন্দিসহ একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়।

এই উপন্যাসটি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাব, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক চিকিৎসকের গল্প লিখতে বসেছেন; মানুষের রোগ-আরোগ্যে মৃত্যুর কাহিনি লিখেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ লেখকের উদ্দেশ্য জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব উদ্ঘাটন অথবা অ্যালোপ্যাথি বনাম আয়ুর্বেদের লড়াই বর্ণনা। কিন্তু "উপন্যাস তো শুধু গল্প বা কাহিনি রচনা নয়, গল্প বা কাহিনির স্থিতিধর্মিতা ছাড়িয়ে ঔপন্যাসিক জীবনসামগ্রের গতিধর্মিতাকে তুলে ধরেন।"[১] নিজের চোখে দেখা পল্লি অঞ্চল, সেখানকার আপামর জনসাধারণ, তাদের স্বাস্থ্যবিধি এবং চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চিকিৎসা ও চিকিৎসাবৃত্তির প্রসঙ্গে উঠে এসেছে অজস্র রোগ-ব্যাধি যেমন—টাইফয়েড, একজ্বরি, উদরাময়, রেটিমেন্ট, যক্ষ্মা এছাড়াও আরও কত ব্যাধি; এসেছে কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের মতো অতিমারির কথাও। এই সবের হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য অসহায় মানুষের আপ্রাণ প্রয়াস, টীকা আবিষ্কার, চিকিৎসাবিদ্যার ক্রমোন্নতি, এক চিকিৎসকের জীবনকর্মে প্রকাশিত হয়েছে। এই রোগ-ব্যাধি-মহামারিতে বিপন্ন মানবজীবন এবং তা নিরাময়ের নানান উপায় বা দিশা যেভাবে আখ্যানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটে উঠেছে তার উপর আলোকপাত করার-ই চেষ্টা করব এই প্রবন্ধে।

'আরোগ্য-নিকেতনে'র পূর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক রচনায় উপজীব্য ছিল চিকিৎসক অথবা চিকিৎসাবৃত্তি। তাঁর চিকিৎসাতত্ত্ব সম্পর্কে নানা আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে— 'শ্রীনাথ ডাক্তার', 'বোবাকান্না', 'দেবতার ব্যাধি' প্রভৃতি রচনায়। 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তারাশঙ্করের যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর প্রথম জীবনে লোকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগের কথা অল্প বিস্তর সকলেই জানেন। কলেরা রোগীর সেবা অথবা সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসায় তাঁর দক্ষতা ছিল। 'ধাত্রীদেবতা'-র ফ্যালা ডোমের স্ত্রী বা 'কবি' উপন্যাসের স্বৈরিণী, ঝুমুর দলের নর্তকী বসনের চিকিৎসা করেছিলেন তিনি নিজে। আসলে,

"চিকিৎসাবিদ্যায় তারাশঙ্করের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি না থাকলেও, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি তিনি জেনে-বুঝে নিয়েছিলেন। ... নানা ব্যাধিতে জর্জর তারাশঙ্কর নিজেও মৃত্যু আতঙ্কে কাতর জীবনকে নানাভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।"[২]
উপন্যাসটির সূচনা প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—
"জীবনের শেষ প্রহরে দেবীপুর-গ্রামের প্রবীণতম মানুষ জীবনবন্ধু দত্ত ওরফে জীবনমশায় তাঁর আরোগ্য-নিকেতনের বারান্দায় বসে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন। এখানেই উপন্যাসের সূচনা। ... "[৩]

এই উপন্যাসের নায়ক জীবনমশায়। তিনি কবিরাজ। তাঁর পিতা জগদ্বন্ধুমশায় তাকে আয়ুর্বেদবিদ্যায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। আর ঘরে বসে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি শিখেছিলেন রঙ্গলাল ডাক্তারের কাছে। জীবনমশায় নাড়ী ধরে বহুজনের মৃত্যুর নিদান দিলেও তিনি অনেক বাস্তববাদী, যুগের সঙ্গে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি, নতুন ওষুধের গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন। যে সব ক্ষেত্রে কবিরাজির তুলনায় অ্যালোপ্যাথি সহজে কার্যকর হবে তখন তা প্রয়োগ করেছেন। রোগ ও মৃত্যু সম্পর্কে জীবনমশায়ের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে—

> "মৃত্যুর বহু পথ, সে অনিবার্য। কেউ রোগে মরে, কেউ আঘাতে মরে, কেউ ইচ্ছে করে মরে,—আত্মহত্যা করে। তবে রোগই হল মৃত্যুর সিংহদ্বারের পাকা সড়ক। রোগ মাত্রই মৃত্যুর স্পর্শ বহন করে; সব রোগে মানুষ মরে না কিন্তু খানিকটা এগিয়ে দেয়; জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ঠেলে দেয় খানিকটা। চিকিৎসক চিকিৎসা করে, তার জ্ঞান মতো যে বাঁচবে বলে মনে হয় তাঁকে সে মরবে বলে না। যে মরবে বলে মনে হয় তার ক্ষেত্রে কেউ আকারে ইঙ্গিতে জানায়, বলে বড় ডাক্তার আনুন, কেউ নিজের মত স্পষ্ট করে বলে দেয়।"[৪]

জীবনমশায়ের বিশ্বাস মৃত্যু তখনই অনিবার্য যখন সে কালব্যাধি। যা মানুষ রোধ করতে পারে না। যেমন পারেননি নিজের পুত্র বনবিহারীকে বাঁচাতে। বনবিহারী আক্রান্ত হয়েছিল 'প্রমেহ' রোগে। এছাড়াও লিভার, প্লীহা, রক্তহীনতা সব মিলিয়ে জটিল ব্যাধি বানিয়ে নিজেকে জীর্ণ করেছিল সে। জীবনমশায় বুঝে নিয়েছিলেন এই রোগ দুঃসাধ্য। ব্যাধির হাত ধরে মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে। বনবিহারীর রোগ নির্ণয় প্রসঙ্গে এক মহামারি কালাজ্বরের যে তথ্যভিত্তিক পরিচয় মিলেছে তাতে জানা যাচ্ছে—

> "আসামের কালব্যাধি কালাজ্বর এককালে মৃত্যু—আশ্রিত ম্যালেরিয়াই বলত লোকে। তারপর কালাজ্বরের স্বতন্ত্র স্বরূপ ধরা পড়েছে। জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙালী ডাক্তার ইউ.এন. ব্রহ্মচারী তার ওষুধ আবিষ্কার করেছেন।
>
> তাঁর বাবা বলতেন—আসামে এক ধরণের বিষজ্বর আছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু; মহামারীর মতো গতিপ্রকৃতি। সেই রোগে ধরল বনবিহারীকে?"[৫]

যদিও জীবনমশায়ের অনুমান সত্য হয়েছে। রক্তপরীক্ষায় কালাজ্বরের বীজাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। তিনি আগেই নাড়ি দেখে বুঝে নিয়েছিলেন এ দীর্ঘদিনের ম্যালেরিয়া, যা ক্ষয় করেছে শরীর। বনবিহারী নিজে ডাক্তার হয়ে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে কুইনিনের বদলে খেত ব্র্যাণ্ডি। অর্থাৎ অনিয়মের প্রশয়ে নিজেকে ক্ষয় করে জীবনের শেষ সীমান্তে উপনীত হয়েছে সে। যেখান থেকে রোগ মৃত্যুরোগে পরিণত হয়েছে।

আমরা জানি, রাঢ় বাংলার একটি সাধারণ ব্যাধি হিসাবে পরিচিত ছিল ম্যালেরিয়া। এই ম্যালেরিয়া দু-চার জনের হলে তখন নিরাময়ের উপায় ছিল শিউলি পাতার রস আর বাড়ির পাঁচন। উপন্যাসের বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি জীবনমশায় নিজেও খেতেন শিউলিপাতার রস, মধ্যে মধ্যে খেতেন কুইনিন। কিন্তু এই ম্যালেরিয়া ১৯৩১ সালে নিয়ে এসেছিল শিশুমড়ক। সংক্রামক ব্যাধির মতো মাহামারির আকার ধারণ করেছিল। জীবনমশায়ের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে সেই ভাষ্য— "উঃ, কত যে শিশুরমৃত্যু হয়েছিল সেবার, তার সংখ্যা নাই। শিশু মড়ক বলা চলে। মায়ের কান্নায় আকাশ ভরে উঠেছিল।"[৬] এই মড়ক-মহামারির মধ্যে নরপতি রায় চৌধুরী, পাগলা সীতারাম খুলে বসে ওষুধের দোকান; রোগের মরশুমে যারা ডাক্তার নয়, তারাও ডাক্তার হয়ে বসে উপার্জনের জন্য। মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে যেখানে টানাপোড়েন সেখানে অবহেলা, অজ্ঞতা, এবং কুটিল ব্যবসায়—বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারে মানুষের জীবন হয়েছে বিপন্ন। যদিও এক্ষেত্রে সেকাল ও একালের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও তা থেকে পরিত্রাণের একটি সহজ দিশা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন আধুনিক চিকিৎসক প্রদ্যোত-এর সতর্কত্যার মধ্য দিয়ে—

> "মশা এখানে খুব বেশি ছিল। ... আজকাল মশা কমেছে। ডি.ডি.টি. ক্যাম্পেন শুরু হয়েছে গত বছর থেকে। তবুও প্রদ্যোত বিনা মশারিতে শোয় না। একটি মশাও কামড়াতে পারে এবং সেইটিই অ্যানাফিলিস হতে পারে এবং তার বাহিত বিষটুকুতে ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার বীজাণু থাকতে পারে।"[৭]

বনবিহারীর মতো ব্রজলালবাবুর দৌহিত্রের নাড়ি দেখেও জীবনমশায় মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেছিলেন। বজ্রলালবাবুর নাতি কলকাতা থেকে তাঁর বাড়িতে এসে জ্বরে পড়েছে। ছেলেটির সান্নিপাতিক জ্বর অর্থাৎ টাইফয়েড হয়েছে। এবং তা বেশ শক্ত ধরণের। কলকাতা থেকে ডাক্তার সেনগুপ্ত এসে মশায়ের অনুমানকে সঠিক বলেছেন। রোগ নির্ণয় করে

টাইফয়েডের ওষুধ হিসাবে তখন ফাজের ব্যবহার করেছেন। যদিও জীবনমশায়ের অনুমান অনুযায়ী আঠারো দিনের দিন ছেলেটি মারা গিয়েছে। এই অঞ্চলে এই প্রথম এই রোগের চিকিৎসায় 'ফাজে'র ব্যবহার দেখেছিলেন জীবনমশায়।

উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে কালব্যাধি যক্ষ্মার প্রসঙ্গ। মরি বোষ্টমের ছেলে, মেয়ে ও স্বামী তিনজনেরই যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুর কথা আছে। সে আরোগ্য-নিকেতনে ওষুধ নিতে আসত। সে এবার এসেছে শশাঙ্কের স্ত্রী অভয়ার জন্য। জীবনমশায় তাঁর কী হয়েছে জানতে চাইলে মরি বোষ্টম অভয়ার রোগের বর্ণনা দিয়েছে এইভাবে—"রোগ নানান খানা। ভুগছে আজ ছ মাস। গুসগুসে জ্বর, খুসখুসে কাশি; সবই সেই কালরোগের মতো।"[৮] হাসপাতালের প্রদ্যোত ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে, পেনিসিলিন দিয়েছেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। জীবনমশায় গেছেন তাকে দেখতে। দেখে বলেছেন যক্ষ্মা তার হয়নি, আসল রোগ যকৃতের দোষ। তার ব্যাধি নিরাময়যোগ্য। অভয়া মশায়ের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। এছাড়াও হাটকুড়ো কাহারের ছেলে পরাণ, যাকে নবগ্রামের ডাক্তারেরা তার রোগের উপসর্গ দেখে রাজব্যাধি যক্ষ্মা হয়েছে বলে জবাব দিয়েছিল। কিন্তু পরাণের যক্ষ্মা বা টি.বি. কিছুই হয়নি। তার শরীরে আসলে ম্যালেরিয়া এবং রক্তপিত্ত জড়িয়ে জট পাকিয়েছিল। মশায় তার চিকিৎসার ভার নিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছেন। কিন্তু বাঁচাতে পারেননি রানা পাঠককে, নিশি ঠাকুরুণের মামাতো ভাই-এর মেয়েকে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নতুন জনস্বাস্থ্যের ধারণাও একেবারে বদলে ফেলতে পারেনি বাঙালি জনমানসে দৈবনির্ভরতার বোধকে। রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ অনেক অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে জীবন কাটায়— কবচ, মাদুলি, জরিভুটি, চরণামৃতের উপর তাদের একান্ত নির্ভরতা। তার প্রমাণ মিলেছে জীবনমশায়ের দৃষ্টিতে নিশি ঠাকুরণের মামাতো ভাই-এর মেয়ের বর্ণনায়— "গলায় একবোঝা মাদুলি। হাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা জড়িপুষ্প।"[৯] এরমধ্যে নির্বুদ্ধিতা থাকতে পারে, কুসংস্কার থাকতে পারে কিন্তু অর্থনৈতিক দুরাবস্থাও অনেক সময় আত্মপ্রতারণার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। রাণা পাঠক কেন হাসপাতালে যায় না? তার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে আখ্যানে—

> "ওরা গেলেই বলবে যক্ষ্মা হয়েছে। বুঝলেন না—ওদের এইটে বাতিক। তার পর ফর্দ দেবে ইয়া লম্বা। বুকের ফটো তোলাও, গয়ের থুথু পরীক্ষা করাও—এই করো—তা করো। চিকিৎসা তারপর।... টাকাতে কুলানো চাই তো! হাসলো রানা।–আপনার কাছে আসা—সেজন্যেও বটে যে! কম টাকায় চিকিৎসা –এ আর কোথায় হবে?"[১০]

এই আখ্যানে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির পাশাপাশি কলেরা মহামারির ব্যপ্তি তেমন প্রবল না হলেও গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কম নয়। উনিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শুরুতে মহাপীঠে অসুস্থ মোহান্তর ডাকে তাঁকে দেখতে গিয়ে স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়েছেন জীবনমশায়। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করতেই কলেরা মহামারির করাল ছায়া আখ্যানে ঘনিয়ে এসেছে—

> "দেশের তখন একটি ভয়াবহ অবস্থা। মড়ক চলছে, মহামারী কলেরা লেগেছে দেশে। একগ্রাম থেকে আর-এক গ্রাম—সেখান থেকে আর-এক গ্রাম; বৈশাখের দুপুরে খড়ের চালের আগুনের মতো লেলিহান গ্রাস বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ল। সেকালে তখন কলেরার কোনো ওষুধ ছিলি না। ক্লোরোডাইন সম্বল। কবিরাজিতে ওলাওঠার ওষুধ তেমন কার্যকরী নয়। ক্লোরোডাইন দেবারও কোনো চিকিৎসক নাই। যারা আছে তারা নিজেরাই ভয়ে ত্রস্ত।"[১১]

কলেরা মহামারি বিভীষিকা হয়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল মানবজীবনকে। আতঙ্ক এতটাই ছড়িয়ে গিয়েছিল যার ফলে মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল গুজব—

"কলেরা নাকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে তাকে দেখা যায়। শীর্ণ কঙ্কালসার শরীর চোখে আগুনের মতো দৃষ্টি, পিঙ্গল রুক্ষ চুল, দস্তুর একটি মেয়ে; পরনে তার একখানা ক্লেদাক্ত জীর্ণ কাপড়, বগলে একটি মরা বওয়া তালপাতার চাটাই নিয়ে সেই পথ ধরে গ্রামে ঢোকে—যে পথ ধরে গ্রামের শব নিয়ে শ্মশানে যায়।"[১২]

জীবনমাশায় বেশ মনে করতে পারেন, এরপরে গ্রাম ছেড়ে লোক পালাতে লাগল ভয়ে। সবার আগে শহরে পাড়ি দিল অবস্থাপন্নেরা; নবগ্রামের বাবুরা তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তারপর সাধারণ মানুষ। থেকে গিয়েছিল শুধুমাত্র গরীব কিছু মানুষ, যারা নিরুপায় আর রইল কিছু অসমসাহসী মানুষ তাদের মধ্যে মাতাল-গেঁজেলদের সংখ্যায় বেশি। জীবন ডাক্তার শেষে ছুটে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ রঙ্গলাল ডাক্তারের কাছে। কলেরার ওষুধ জানতে। ডাক্তারে লিখে দিয়েছিলেন ওয়ান সিকস্থ গ্রেন ক্যালোমেল আর সোডা বাই কার্বনেট যার প্রয়োগে অনেক প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন সেবার।

উপন্যাসে উনত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে মশায়ের স্মৃতিতে ভেসে উঠে ১৯০৫ সালে কলেরা মহামারির বিভীষিকাময় ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার চিত্র। সেইসময় কলকাতা থেকে মেডিকেল ভলেণ্টিয়ার্স আসেন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আসেন যারা পুকুরে পুকুরে ব্লিচিং পাউডার গুলে জলকে জীবাণু মুক্ত করে দেয়। আর আসে 'কোদালি ব্রিগেড', যারা শুকনো পুকুরের তলায় কুয়ো কেটে সমস্ত জল বের করে দেয়। অ্যান্টিকলেরা ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। যার ফলে মহামারি নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি সেই কলেরার সময় ইন্ট্রাভেনাস সেলাইন ইঞ্জেকশনের প্রয়োগ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। যা প্রয়োগ করা হয়েছিল অবিনাশ বাউরির বউয়ের উপর। জীবনমশায় জানতেন এ রোগী বাঁচবে না। কিন্তু বাধা না দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তরুণ দুটি ডাক্তারের অসম্ভব প্রত্যাশা আর প্রচেষ্টাকে। সেদিন পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিকে এবং মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের সাধনাকে জানিয়েছিলেন প্রণাম। ।

SAMSAPTAK PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

গোটা উপন্যাস জুড়ে বিচিত্র সব রোগ-ব্যাধি মহামারির হাত ধরে এসেছে বিচিত্র মৃত্যুর কথা। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয়—

"এই সমস্ত রোগজর্জর সত্তার মধ্যে মানবাত্মার নানারূপ তির্যক প্রকাশ। রাণা পাঠক, মহা পীঠের মোহান্ত সন্ন্যাসী, ভুবন রায়, গণেশ বায়েন—ইহারা মৃত্যুর সম্মুখীন ধীর-স্থির, অচঞ্চল। কেহ-বা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছে, কেহ-বা প্রতিযোগী মল্লযোদ্ধার ন্যায় মৃত্যুর সহিত শক্তিপরীক্ষায় উৎসুক, কেহ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া জীবন-মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া জীবনকে শেষ বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে উল্লসিত, কেউ-বা জীবনের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া দায়মুক্তভাবে মহা অভিযানে বাহির হইতে প্রস্তুত।"[১৩]

তাহলে কি মৃত্যু ভাবনাতেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসটি শেষ করলেন? আসলে উপন্যাসে মৃত্যু প্রাসঙ্গিক নয়, আধিকারিক। জীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুতে পৌছানো নয়, মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরে আসার গল্প। এই গল্প জীবনের গল্প। মানুষের সঙ্গে মৃত্যুর যে লড়াই, সে লড়াই মানুষ আজীবন লড়ে আসছে। অতীত বিশ্বে বারবার এই ব্যাধি-মারি এসে জানান দিয়ে গেছে তার অস্তিত্ব। তছনছ করে দিয়েছে মানুষের সাজানো জীবন ব্যবস্থাকে। কিন্তু জীবন তাতে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। সাময়িক থমকে গেলেও জীবন সংগ্রাম প্রায় অব্যাহত থেকেছে। সমস্ত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে, নতুন দিনের সূর্য দেখতে চেয়েছে। তাই রোগ-ব্যাধি-মহামারি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে মানুষ আবিষ্কার করে চলেছে প্রতিষেধক ওষুধ মানুষকে বাঁচার পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। মশা

ম্যালেরিয়ার বীজ বহনকরে তা আজ প্রমাণিত। কলেরার জীবাণু যে জলের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, যা মাছিতে বহন করে রোগ ছড়ায় তা সকলে জানে। কলেরার টীকাও আবিষ্কৃত হয়েছে। যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে মানুষের পূর্বের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছ। যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি যে খাদ্যাভাব থেকে তা মানুষ আজ জানতে পেরেছে। ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা, এক্স-রে, মল-মূত্র, থুতু, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। টিবি রোগের ক্ষেত্রে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, পি-এ-এস মতো শক্তিশালী ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। জীবনমশায়ের অনুভবে ধরা পড়েছে সেই সত্য—

> " এ চিকিৎসাশাস্ত্র বিপুল গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র খুলে দিয়েছে দিব্যদৃষ্টি। বীজাণুর পর বীজাণু আবিষ্কৃত হচ্ছে। রোগোৎপত্তির ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আজ সবই প্রায় আগন্তুক ব্যাধির পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল।"[১৪]

এই পাঠ পরিসরে একটি কথা জানান দেয়, মৃত্যুকে জয় করা যায় না ঠিকই, কিন্তু অকাল মৃত্যুকে তো রোধ করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা। আখ্যানে আমরা দেখেছি আধুনিক চিকিৎসা ও হাসপাতালের উপরে ধীরে ধীরে মানুষের অনিবার্য নির্ভরশীলতা জন্ম নিয়েছে। কবিরাজি চিকিৎসার পরিবর্তে মতির মা, দাতু ঘোষাল, বিপিন প্রভৃতি চরিত্রেরা প্রদ্যোত ডাক্তারের উপর ভরসা করেছে। লক্ষ করার বিষয় হল, স্বাধীনতা-উত্তর রাঢ় বাংলার যে চিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসে এঁকেছেন সেইসূত্রে নানান রোগ-ব্যাধি-মহামারির হাত থেকে পরিত্রাণের নানা দিশাও আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন— যা আজকের দিনে আমাদের প্রধান প্রাপ্তি।

তথ্যসূত্র:

১. কার্তিক লাহিড়ী, বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, সারস্বত লাইব্রেরী, পৃ: ৪৯
২. উদয়চাঁদ দাশ, মাহামারি ও বাংলা আখ্যান, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, পৃ: ২৮৯
৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী (দশম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ভূমিকা অংশ
৪. তদেব, পৃ: ২৩৫
৫. তদেব, পৃ: ১৭৪
৬. তদেব, পৃ: ১৩৮
৭. তদেব, পৃ: ১০৪
৮. তদেব, পৃ: ২৩৩
৯. তদেব, পৃ: ৫৮
১০. তদেব, পৃ: ১৩০-১৩১
১১. তদেব, পৃ: ১১৯
১২. তদেব, পৃ :১১৯
১৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৩৩১
১৪. তারাশঙ্কর বধ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী (দশম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ প্রা: লি:, পৃ: ২৪৬

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, নভেম্বর ২০১৯

২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮

৩. রায়চৌধুরী, সুব্রত, কথাসাহিত্য: মন্বন্তরের দিনগুলিতে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর ২০০৭

৪. লাহিড়ী, কার্তিক, বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৬৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৪

....

পি-এইচ. ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

ধনপতির সিংহলযাত্রা : বাঙালির অতীত অনুসন্ধান

অভিজিৎ মান্না

সারসংক্ষেপ -

মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য অবলম্বনে নবআখ্যান রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ধনপতির সিংহাসযাত্রা’ উপন্যাস। উপন্যাসটিতে লেখক উপনিবেশপূর্ব অবিভক্ত বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস তথা সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন- তাই সেই দিক থেকে উপন্যাসটি উপনিবেশপূর্ব বাংলা তথা ভারতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন। বহু ভাষাবিদ রামকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসটি ভাদ্র ১৪১১ থেকে মাঘ ১৪১৬ বঙ্গাব্দে রচিত, ১৪১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসটি ১৪২০ বঙ্গাব্দে আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হয়। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে ‘কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী’ বিষয়ে সুকুমার সেনের সঙ্গে যৌথ গবেষণা, ১৪০৪-১৪০৫ বঙ্গাব্দে লিখিত ‘লহনা-খুল্লনা’ উপন্যাস ও ১৪০৯ বঙ্গাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কালিদহ’ গল্পে যে বীজ রোপিত হয়েছিল সেই আখ্যান মহীরুহে পরিণত হলো ‘ধনপতি সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসে। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের বণিকখণ্ডের কেবল ধনপতির আখ্যানকে অবলম্বন করে রচিত উপন্যাসটি। উজানিরাজ বিক্রমকেশরীর রাজবণিক ধনপতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিংহল পাটনে বাণিজ্যযাত্রা করতে বাধ্য হয়েছে। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রাপথে একাধিক জনপদ পার হয়ে সপ্তডিঙা নদী-খাল-সমুদ্রপথে সিংহলে উপনীত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের রীতি অনুসরণ করে রামকুমার মুখোপাধ্যায় যে সকল জনপদ, নদী-খাল-সমুদ্রপথের বর্ণনা দিয়েছেন তা অবিভক্ত বাংলার অতীত ইতিহাসের পুনর্পাঠ। বাণিজ্য প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে একাধিক বাণিজ্যপণ্যের উল্লেখ বাঙালি জাতির খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান তথা সংস্কৃতির বিবিধ দিকের উল্লেখ উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

তবে মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য অনুসরণ করলেও রামকুমার মুখোপাধ্যায় সিংহলে ধনপতির কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনার মধ্যদিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি রচনা করেছেন। সিংহলরাজ শালবাহনকে কমলে কামিনী দেখাতে না পারার জন্য ধনপতির কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনায় আখ্যানের সমাপ্তি সচেতনভাবেই ঔপন্যাসিকের নির্মাণ। আসলে ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা ও পিতাকে কারামুক্ত করার কাহিনিকে বর্জন করে রামকুমার মুখোপাধ্যায় ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনামূলক রীতি থেকে বেরিয়ে এসে একবিংশ শতাব্দীর এক হার না মানা ট্রাজিক নায়কের আখ্যান রচনা করেছেন যা শুধু মঙ্গলকাব্যে আগ্রহী পাঠক নয় সকল পাঠককে আকৃষ্ট করেছে। রামকুমার মুখোপাধ্যায় তার ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাসের অনুসন্ধান যেমন করেছেন তেমনি ভাগ্যবিড়ম্বিত ধনপতির মধ্যদিয়ে প্রাচীন গ্রিক ট্রাজেডি নাটকের দৈবনিপীড়িত নায়কের ট্রাজেডিকেও তুলে ধরেছেন।

সূচক শব্দ –

ধনপতির সিংহলযাত্রা, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দ চক্রবর্তী, বাঙালির নৌবাণিজ্য, অতীত অনুসন্ধান, মধ্যযুগের কাহিনিকাব্য, উজানিরাজ বিক্রমকেশরী, রাজবণিক

মূল আলোচনা -

মধ্যযুগের কাহিনিকাব্য ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের বণিক খণ্ডের কাহিনি অবলম্বনে ধনপতি সওদাগরের সিংহলে বাণিজ্যযাত্রার নব আখ্যান রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’। উপনিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির মনে বাংলার বিস্মৃত প্রাচীন-মধ্যযুগের নব উদ্ধার উপন্যাসটি, তাই ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ ঔপনিবেশিকপূর্ব বাংলা তথা ভারতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ৫ আশ্বিন (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ) কলকাতায়।[১] পিতা রামাঙ্গমোহন মুখোপাধ্যায় ও মাতা কনকলতা মুখোপাধ্যায়ের সন্তান রামকুমার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির থেকে স্নাতক পাশ করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি পূর্ব ভারতের সাহিত্য আকাদেমির আঞ্চলিক সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় ভাষা পরিষদের সভাপতি হিসাবেও তিনি দায়িত্বভার সামলেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে কাজ করেছেন তিনি। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাদলে নতুন বোল' প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'চারণে প্রান্তরে' ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও লিখেছেন 'ভাঙা নীড়ের ডানা', 'মিছিলের পরে', 'দুখে ক্যাওড়া', 'ভবদীয় নঙ্গরচন্দ্র', 'কথার কথা', 'পরিক্রমা', 'শঙ্খ', 'যাত্রা', 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রমুখ উপন্যাস ও ছোটগল্পগ্রন্থ। একাধিক ভাষায় পারদর্শী এই কথাকার অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, মালয়ালম, রাজস্থানী ভাষায় সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন সোমেনচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার(২০০০), বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার(২০০৬), শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার(২০০৭), শিস পুরস্কার(২০০৭), গজেন্দ্রকুমার মিত্র জন্মশতবার্ষিকী পুরস্কার(২০০৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পুরস্কার(২০১৪), কুসুমাঞ্জলি পুরস্কার ২০১৪), কৃতিত্ব সমগ্র পুরস্কার, কর্মযোগী ননীগোপাল চক্রবর্তী স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার(২০২৩) ইত্যাদি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের গদ্য নির্মাণ, সর্বোপরি বাঙালির অতীত অনুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু ঔপন্যাসিকের সফল প্রয়াস 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসের জন্য রামকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪২০ বঙ্গাব্দে(২০১৩ খ্রিস্টাব্দ) আনন্দ পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।

ঔপন্যাসিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের গবেষণায় দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্পর্কে সুকুমার সেনের (১৯০০-১৯৯২) সাথে যৌথ অনুসন্ধানে লেখকের সার্বিক পরিচয় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সঙ্গে। ১৪০৪-১৪০৫ বঙ্গাব্দে লিখিত 'লহনা-খুল্লনা' উপন্যাস, ১৪০৯ বঙ্গাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালিদহ' গল্পে নিহিত আখ্যানটি ভাদ্র ১৪১১ থেকে মাঘ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ সময়কালে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব পেল- 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে। রামানন্দ বন্দোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ সম্বলিত উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দে (২০১০ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতার মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। বাংলার একাধিক অধুনা লুপ্ত নদীপথ ও সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে বাংলার বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার অতীত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে।

উপন্যাসের কাহিনি অংশে আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যের অন্তমধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় উল্লেখযোগ্য কাহিনিকাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের চারটি অধ্যায়ের (বন্দনা, দেবখণ্ড, আক্ষটি খণ্ড, বণিকখণ্ড) মধ্য থেকে বণিক খণ্ডের ধনপতির সিংহলযাত্রার কাহিনি অংশকে গ্রহণ করে রচনা করেছেন 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বণিক খণ্ডের শ্রীমন্ত অধ্যায়কে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র জয়পতি পুত্র ধনপতির সিংহলে বাণিজ্যযাত্রার অংশ গৃহীত হয়েছে উপন্যাসে। রাজার নির্দেশে ও ব্যবসার প্রয়োজনে নিমরাজি ধনপতি সিংহলযাত্রা করতে বাধ্য হয়। সমগ্র আখ্যান জুড়ে প্রাচীন বাংলা তার সময়-সমাজ-সমকাল নিয়ে উঠে এসেছে। উপন্যাসে লেখক এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি বর্তমানে অপ্রচলিত। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের অধনালুপ্ত একাধিক তৎসম, দেশি শব্দের ব্যবহার উপন্যাসের বাক্যবিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে শব্দ তথা বাক্য ব্যবহারের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন- "ভাষা নিয়ে চমৎকার পরীক্ষা। বাংলায় বাক্য গঠনের রীতিতে অনেক হারিয়ে যাওয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন রামকুমার। যেমন, পলাকড়ি। মানে পটল। কিন্তু শব্দটি আজ আর আমরা ব্যবহার করি না।"[২] এমনকি ঔপন্যাসিক এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের জন্য উপন্যাসের শেষে দীর্ঘ শব্দার্থ অংশ সংযুক্ত করেছেন যা বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে অধুনালুপ্ত বা অব্যবহৃত শব্দ ভাণ্ডারের খোঁজ দেবে। প্রাচীন বাঙালির পুরাণ, লোককথা, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, নদীমাতৃক জনপদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোতে থাকেন ঔপন্যাসিক। সপ্তডিঙা নিয়ে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রাকালে মগরায় চণ্ডীর

রোষে ছয় ডিঙা ডুবি, কেবলমাত্র দুর্গাবর ডিঙা নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা এবং সিংহলরাজ শালবানকে কমলে কামিনী না দেখাতে পারায় ধনপতির কারাবরণ পর্যন্ত কাহিনি অবলম্বনে উপন্যাসটি রচনা করেছেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়। লোক-উপাদানের সংমিশ্রণে বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধান 'ধনপতির সিংহলযাত্রা'- "ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি একদিন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে বিস্মৃত হল তাকেও; বঙ্গ-হৃদ-হ্রদের কমলে কামিনীও অদৃশ্য হল। ধনপতির সিংহলযাত্রা উপনিবেশ-পূর্ব বাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে নতুন সেতুবন্ধন"।[৩]

'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে বাঙালির অতীত নৌবাণিজ্য ইতিহাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে বাঙালির অধুনালুপ্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পুনরুদ্ধার এই আলোচনার বিষয়বস্তু। বিষয়ভিত্তিক নামকরণের মাধ্যমে উনপঞ্চাশটি অধ্যায়ে রচিত উপন্যাসটির সূচনা ,মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের 'কমলে কামিনী' কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে-

"কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রী কবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশ যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
বেশ কে না পূজে তোমার, মজি তব গানে?-
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।।"[৪]

উপন্যাসের আখ্যান ভাগের শুরুতেই দেখি উজানি নগরস্থিত[৫] দুই পুরুষের প্রসিদ্ধ বেনে, জয়পতি পুত্র ধনপতি রাজ আদেশে সিংহলযাত্রায় বাধ্য হয়েছে। উজানিরাজ বিক্রমকেশরীর[৬] রাজভাণ্ডারে চন্দন, চমরি, লবঙ্গ, গুয়া, সৌন্ধব লবণ, রাজরানিদের ব্যবহার্য পান্না, নীলা, মানিক, প্রবাল, মোতি, পলা, নারীদের প্রয়োজনীয় শঙ্খালঙ্কার, কুম্কুম, কস্তুরি, গন্ধচুয়া, বয়স্কদের ভোটকম্বল প্রমুখ দ্রব্যের অভাব দেখা দিয়েছে। তাই রাজা বণিক ধনপতিকে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন। ধনপতি উজানি রাজ্যের রাজবণিক, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বাণিজ্যে যেতে হয়েছে। রাজভাণ্ডারীর কথায়- "যত ঋণী সদাগর ছিল তারা সব এখন ধনী। গেহ থেকে এক পা ফেলার মতি নেই কারো। শেষ দক্ষিণ পাটনে গিয়েছিল জয়পতি দত্ত, ধনপতির বাবা। ডিঙার পর ডিঙা ভরে এনেছিল নানা সামগ্রী। তারপর আর কোনো সাধু ওমুখো হয়নি; কোনো সদাগর আসেনি ওদেশ হতে।"[৭] বাংলার বাণিজ্য ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখব মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলায় যে সকল আঞ্চলিক শাসনকর্তারা ছিলেন তাদের বেশিরভাগই বাংলা এবং বহির্বাংলার বাণিজ্যে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তারা রাজবণিকদের অর্থের যোগান দিতেন এবং বণিকরা সেই অর্থ বাণিজ্যে ব্যবহার করতেন। বাণিজ্য মূলধন সরবরাহের বিনিময়ে বণিকরা রাজা বা আঞ্চলিক শাসনকর্তাকে বাণিজ্যের লভ্যাংশ দিতেন। উপন্যাসে উজানিরাজের রাজবণিক হলেন ধনপতি। বণিক ধনপতির পরিবার দুই পুরুষ ধরে উজানিরাজের অধীনে রাজবণিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। উপন্যাসের কাহিনি অংশে আমরা দেখি রাজার নির্দেশে ধনপতি গৌড়-পাটন যাত্রা করেছিল সুবর্ণ পিঞ্জর নির্মাণের জন্য। ঠিক তার এক বছর পর ধনপতিকে পুনরায় সিংহল পাটনে বাণিজ্যযাত্রা করতে হয়েছে। ধনপতি যে উজানিরাজের অধীনস্থ বণিক তা উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত 'ঋণী' শব্দটির ব্যবহারে স্পষ্ট, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধনপতিকে রাজ আদেশ পালন করতে হয়েছে।

উজানি নগরের সমৃদ্ধ বণিক ধনপতি। পূর্বপুরুষানুক্রমে বাণিজ্যযাত্রা করে তার পরিবার অর্জন করেছে প্রচুর সম্পদ। তাই ধনপতি নিজের সঞ্চিত চন্দনকাঠ, চমরি, পান্না, নীলা, মানিক, প্রবাল, মোতি, পলা, লবঙ্গ, সৌন্ধব লবণ, শঙ্খালঙ্কার, কুম্কুম, কস্তুরি, গন্ধচূয়া, ভোটকম্বল, ধনরত্ন দ্রব্য রাজাকে দান করতে চেয়েছেন, যাতে তাকে বাণিজ্যযাত্রায় যেতে না হয়। কিন্তু রাজার সভাসদরা ধনপতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- "বসে খেলে কুবেরের ধনও শেষ, নদীর বালুও ফাঁকা। চাঁদ সদাগরের বাহির মহলে যে সাত মরাই মুদ্রা তা ওই নিত্য পাটনের কারণে।"[৮] তাই শেষ পর্যন্ত

ধনপতি রীতি মেনে উজানিরাজের কাছ থেকে বাণিজ্যযাত্রার পাথেয় শালবস্ত্র, লক্ষ মুদ্রা, তুরঙ্গ, বর্ম, দু-ফলা কাটারি, তাম্বুল গ্রহণ করেন। অতীত বাংলার নৌবাণিজ্যযাত্রার এক চিরাচরিত রীতিকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে- এ যেন বাংলার নৌবাণিজ্যের খণ্ড চিত্র।

সওদাগরের ধর্ম হল বাণিজ্য। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে শত শত বণিকের বসবাস। রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বঙ্গের বিখ্যাত বণিকদের উল্লেখ করেছেন উপন্যাসে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের নায়ক চাঁদ সওদাগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করে বলেছেন বাণিজ্য করে চাঁদ সওদাগর সাত মরাই ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছেন। চম্পাই নগরের চাঁদ সওদাগর ছাড়াও কর্জনার নিলাম্বর বান্যা, সাঁকোর শঙ্খদত্ত, বর্ধমানের ধুসদত্ত, গণেশপুরের সনাতন দত্ত, সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা, কাইতির যাদবেন্দ্র দাস, জাড়গ্রামের রঘু দত্ত, তেঘরার গোপাল দত্ত, দশঘড়ার বাসু লা, ত্রিবেণীর রাম রায়, লাউগাঁ নিবাসী রাম দত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ, গেতনের মধু দত্ত, খণ্ডঘোষের বাসু দত্ত প্রমুখ বাংলার বিখ্যাত বণিকদের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বর্ণনাতেও আমরা উক্ত জনপদ বণিকদের উল্লেখ পাই। বর্ধমান ও সংলগ্ন জনপদের বিখ্যাত বণিকদের উল্লেখ ঔপন্যাসিক মঙ্গলকাব্য থেকেই গ্রহণ করেছেন। বাংলার বিখ্যাত গন্ধবণিক পরিবারের চার-আশ্রমের[৯] (দেবদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ত, বিঙ্কটগুপ্ত) উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। শুধুমাত্র দেশীয় বণিকরাই নন তার পাশাপাশি সপ্তগ্রাম বাণিজ্য বন্দরকে কেন্দ্র করে ভিনদেশীয় বণিকেরও উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক।

ধনপতি তার সপ্তডিঙা নিয়ে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রায় বের হয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রচলিত রীতিমাফিক মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটমুঠি, গুয়ারেখি, নাটশালা এই সপ্তডিঙা নির্মাণ করেছে বিশ্বকর্মার পাঁচপুত্র- কাষ্ঠকার, শিলাকার, লৌহকার, তাম্রকার ও সুবর্ণকার। মধুকর নৌকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দিগন্তবিস্তারী। সম্মুখ অংশ সূচালো এবং পিছনের দিক গোলাকার। সমগ্র নৌকাটি কারুকার্যে অলংকৃত।[১০] ধনপতি সওদাগরের দুর্গাবর নৌকা গাম্ভীর ও ডহুদারু নির্মিত এবং গজদন্তের অলংকরণ বিশিষ্ট। নৌকায় রয়েছে একাধিক প্রকোষ্ঠ বা জলদেওয়াল। নৌকার বাইরে দুর্গতিনাশিনীর মুখ, দশহাতে অস্ত্র, দুপাশে দারু প্রদীপ। দুর্গাবরের বিশাল পালে মহাদেবের ত্রিশূল ও বিষম ঢাকের চিত্র অঙ্কিত। কাঁঠাল, পিয়াল গাছের পাতায় তৈরি ধনপতির তৃতীয় নৌকা শঙ্খচূড়। গঙ্গার দুকূলে আশি গজ জল ভেঙে এগিয়ে যায় শঙ্খচিত্র অঙ্কিত শঙ্খচূড় জলযান। চতুর্থ নৌকা চন্দ্রপাল মালবাহী জলযান। দৈবসার ও তাল গাছের পাটায় নির্মিত। নৌকার বাদামে চন্দ্রের ছবি আঁকা ও কলাপীর রঙিন গ্রীবা ও মুখের ছবি আঁকা চন্দ্রপাল নৌকায়- "কলাপীর মাথা ওপরে সারি সারি নাইয়ার পিঁড়া। তারা দিনভর কেরয়াল টানবে, গলায় ভাজবে সুর। চন্দ্রপালে যখন ভরা তুলবে তখন কোল গর্ভিণী বধূর মতো নাওয়ের রূপ পড়বে ফেটে। নদীর দুকূলের মানুষজন তাকিয়ে দেখবে। বলবে সদাগর শুধু ভরা বেচে না, নাওটিকেও আদরে রাখে। তা নইলে এমন বিদ্যাধরী রূপ?"[১১] তারপরে এগিয়ে চলেছে শাল, পিয়াল, ডহু কাঠের পাটিতে তৈরি বজরা ছোটমুঠি। নৌকার গায়ে সমৃদ্ধির প্রতীক ধানের শিষ। মা লক্ষ্মী তার সম্পদে ভরিয়ে তুলেছেন ছোটমুঠি নৌকাটিকে। পরের নৌকা গুয়ারেখি যা দক্ষিণ পাটনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে গুয়া। শেষ নৌকা নাটশালায় গাবরদের বাস। রামকুমার মুখোপাধ্যায় এই বর্ণনা গ্রহণ করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে। ধনপতির বিশালাকৃতির সপ্তডিঙা প্রাচীন বাংলার নৌবাণিজ্যের বিপুলতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বাংলার নিজস্ব রীতিতে নির্মিত একাধিক নৌকার উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে- ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা, মন্থরা। ঔপন্যাসিক বাংলার নদীপথে বহমান এই বিভিন্ন নৌকার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন সংস্কৃত কাব্য ভোজরাজ রচিত 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থ থেকে।[১২]

ধনপতির সপ্তডিঙা উজানি নগর থেকে যাত্রা শুরু করে পথ মধ্যে একাধিক জনপদ অতিক্রম করেছে- চাঁপাতলা, কোঙরবন্দ, দুবরাজপুর, নবখণ্ড, বাঁকাদামোদর, জুজুটি, গোবিন্দপুর, বর্ধমান, গঙ্গাপুর, দেউল্যা, আমাদিপুর, গোদাঘাট, কুক্কুরঘাট, জগতিঘাটা, শিয়াল্যা, ওসমানপুর, বোদল্যা, হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, ইছানী, কমলাপুর, চক্রঘাটা,

ব্রহ্মপুর, প্রয়াগ, ত্রিপিনি প্রমুখ জনপদ। বাণিজ্যপথে ধনপতির নৌকা ললিতপুর, ইন্দ্রাণী, পারঘাটা, নবদ্বীপ, পাড়পুর, শান্তিপুর, আম্বুয়ামুলুক, গুপ্তিপাড়া, হালিশহর পার হয়ে গঙ্গা, যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ‘মুক্তবেণী’ ত্রিবেণীতে এসে পৌঁচেছে। সেখান থেকে সপ্তগ্রাম হয়ে নিমাইতিথঘাট, খড়দহ, কোণ্ডরনগর হয়ে মগরায় পৌঁচেছে সপ্তডিঙা। চণ্ডীর রোষে ছয়ডিঙা ডুবির পর কেবল দুর্গাবর নৌকা নিয়ে ধনপতি বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে ওড়িশা সেখান থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল ছুঁয়ে শঙ্খদ্বীপ, সর্পদহ, রামের জাঙ্গাল, কালিয়াদহ, হাথুয়াদহ পার হয়ে সিংহলে পৌঁচেছে। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা পথে[১৩] যেসকল জনপদের উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক তা থেকে বাংলার অতীত নৌবাণিজ্যপথের সন্ধান পাওয়া যায়। অজয়, আমোদর, দামোদর, তারাজুলি খাল, দারুকেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, শিলাবতী, কোপাই, ক্ষীরাই, সরস্বতী, কুন্তী, ভাগীরথী নদীপথের মাধ্যমে সংযুক্ত বাংলার সমৃদ্ধ জনপদের ভৌগোলিক মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসে।

বাংলার সমৃদ্ধ বন্দর জনপদ সপ্তগ্রামের উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। সপ্তগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে সেখানে পণ্য আমদানি-রপ্তানির বর্ণনা- “ওই জাগে সপ্তগ্রাম যেখানে বাণিজ্যে আসে দূর দূরান্তের সদাগর। তাদের বাস কলিঙ্গ, তেলঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, কর্ণাট, মহেন্দ্র, মগধ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত। সপ্তগ্রামের সদাগর নগরে বসে সুখ-মোক্ষ-ধন লাভ করে। তরী নিয়ে আসে বারেন্দ্র, বিন্ধ, পিঙ্গল, উৎপল, দ্রাবিড়, রাড়া, বিজয়ানগর, মথুরা, দ্বারিকা, কালী, কাঞ্চীপুর, জয়া, প্রয়াগ, কৌরবক্ষেত্র, গোদাবরী, গয়ার বণিক।”[১৪] শুধু বাংলা বা বহির্বাংলা নয় বহির্ভারতের বণিকরাও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করতে আসতো- লঙ্কা, মালয়দেশ, বটেশ্বর, জাভা, বর্ণীয়ো প্রমুখ অঞ্চলের বণিকরা।[১৫] সপ্তগ্রামের নদীপথে যে সব বিচিত্র আকারের নৌকা দেখা যেত উপন্যাসিক তারও বর্ণনা দিয়েছেন- “ষোল হস্ত মুদ্রা, চব্বিশ হস্ত মধ্যমা, চল্লিশ হস্ত ভীমা, আটচল্লিশ হস্ত চপলা, চৌষট্টি হস্ত পটলা, বাহাত্তর হস্ত অভয়া, অষ্টআশি হস্ত দীর্ঘা, ছিয়ানব্বই হস্ত পটপুটা, একশো বারো হস্ত গর্ভরা, একশো বিশ হস্ত মন্থরা।”[১৬] আবার কখনো ডিঙি, খিলে, পাউখা চড়ে জেলেদের মাছ ধরা, মধ্যমা নৌকায় শর্করা, নারিকেল, ঘৃত পণ্য পরিবহণ উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসে। উক্ত বর্ণনা থেকে একদিকে যেমন বাংলার সমৃদ্ধ নৌবন্দর সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির উল্লেখ পাই তেমনি আমাদের একথা স্বীকার করতেই হয় মঙ্গলকাব্যের সময়কাল থেকে ঔপনিবেশিক বাংলা পর্যন্ত বাংলার সমৃদ্ধ বন্দরগুলির মধ্যে সপ্তগ্রামের অবস্থান ছিল প্রথমসারিতে।

বাণিজ্য বিবরণের পাশাপাশি বাণিজ্যপণ্যের উল্লেখও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ধনপতি উজানি রাজ্য থেকে সপ্তডিঙায় পণ্য সংগ্রহ করেছে সিংহলে বদল-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। তাই রাজ্যে প্রচার করা হয়েছে, নগরবাসি যেন তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ধনপতিকে বিক্রি করে- “চোংদার ঘোষণা দেয়- কে ভরবে গো মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপালের খোল? কে পুরবে ছোটমুঠি, গুয়ারেখি, নাটশালার কোল? কণা দিলে দানা মিলবে, তিল দিলে তাল।”[১৭] ধনপতি মৃগ, কুরঙ্গ, পারাবত, শুকপাখি, নারিকল, বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠ, আমলকি-হরিতকী-বহেড়া, সিন্দূর, কুমকুম, হরিদ্রা, গুঞ্জা, কনক, পাট ও শোণবস্ত্র, কাঁচ, কাঁচদ্রব্য, গুড়, লক্তক, পাটের পাছড়া, গিলাপ, দোলাই, বালাপোশ, আকন্দ, হরিতাল, মাষকলাই, মুশরি, তন্ডুল, বালাম, বিউলির ডাল ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাণিজ্যযাত্রায় বের হয়েছে। ঔপন্যাসিকের এই বর্ণনা বাংলার রপ্তানি দ্রব্যের বিস্তৃত পরিচয়কে প্রকাশ করেছে। রামকুমার মুখোপাধ্যায় ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের রীতি মেনে উপন্যাসে ধনপতি ও সিংহলরাজ শালবানের সঙ্গে বদল-বাণিজ্য করে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করেছে। বদল-বাণিজ্যে ধনপতি তুরঙ্গ, শঙ্খ, লবঙ্গ, টঙ্ক, মাকন্দ, গুয়া, জায়ফল, হিঙ্গুল, পলা, ধবল চামর, নীলা, সৌন্ধব লবণ, জিরা, কুরঙ্গ, হিরা, চঞ্চু, পাগ, শুক্তা, ভেড়া ইত্যাদি দ্রব্য সংগ্রহ করেছে। ধনপতির এই বদল বাণিজ্যে বাংলার আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের উল্লেখ বাংলার নৌবাণিজ্যের এক অপরিহার্য অধ্যায়।

প্রাচীনকাল থেকে নদীমাতৃক বাংলার সবথেকে জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম জলপথ। বাংলার নদী-খালপথে ব্যবহার্য নৌকার চাহিদা মেটাতে বাংলার একাধিক জায়গায় নৌকা নির্মাণ শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। উপন্যাসে বাংলার গুপ্তিপাড়া অঞ্চলের নৌনির্মাণ শিল্পের উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক- “ডানদিকে পুরী গুপ্তিপাড়া নৌতল নির্মাণে এমন

কারিগর নেই ভাগীরথী কূলে। সার সার গুপ্তি তৈরি হয় তীরে আর ভেসে যায় দূর দূর পুরীতে।"[১৮] বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে বাংলার একাধিক প্রসিদ্ধ নৌনির্মাণ কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ, শ্রীপুর বলাগড়, হাওড়া জেলার নৌকা নির্মাণের প্রসিদ্ধি ছিল সমগ্র বাংলা জুড়ে। রামকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলার নিজস্ব রীতিতে নৌকা নির্মাণ কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন উপন্যাসে। উক্ত বিষয়ে গুপ্তিপাড়ার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বিস্মৃত প্রায় শিল্পকর্মের পুনরুদ্ধার প্রয়াস। উক্ত বর্ণনা ছাড়াও ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে বঙ্গোপসাগর তটে জেলেদের নিজস্ব প্রয়োজনে তৈরি করা ছোট নৌকার উল্লেখ করেছেন- "সাগরতটে ঝাবুবন-ঘেরা নিদ্রিত একটি জালিক গ্রাম। বালিয়াড়িতে বেশ কটি ডিঙা। কোনোটি আট দাঁড়ি, কোনোটি ষোলো, কোনোটি আবার চব্বিশ। নির্মীয়মান ডিঙাও আছে বেশ কটি। খোলগুলি নানা ভঙ্গিমায় স্থিত। কোনোটির কচ্ছ আকাশে, কারো গুপ্তি অধোমুখ, কারো গলুই তীর্যক। অজাগর সর্পের মতো দীঘল কাছি ঝোলে নাদন বৃক্ষে। ঘনবুনট কাল জাল দোলে বংশ খণ্ডে।"[১৯] সমগ্র বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নৌনির্মাণ কেন্দ্রগুলি থেকে নির্মিত নৌকা একদিকে যেমন বাংলার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েছে, অন্যদিকে নৌনির্মাণ শিল্পের বিকাশ বাংলার জলপথনির্ভর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিরও ইঙ্গিতবাহী।

ধনপতি একটিমাত্র নৌকা নিয়ে সিংহলে পৌঁছালে নগর কোটাল কালু দত্তকে পঞ্চাশ কাহণ কর দিয়ে সিংহলরাজের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে। ধনপতি কদলি, গুয়া, তাম্বুল, মাকন্দ, নারিকল, তন্ডুল, মধু, দধি, শর্করা, ফেনি, কপোত, কেশরী, ব্যাঘ্র, মৃগ, ছাগ, মেষ উপঢৌকন দিয়ে সিংহলরাজ শালবাহনের কাছ থেকে বাণিজ্যের অধিকার আদায় করেছে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় ধনপতি, সিংহলরাজকে 'কমলে কামিনী' দেখাতে না পারায় ধনপতি বারো বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন। উক্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়েই ঔপন্যাসিক উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দেবীমাহাত্ম্য অংশ, শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা ও পিতাকে কারামুক্ত করার কাহিনি লেখক সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন। আসলে রামকুমার মুখোপাধ্যায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনামূলক রীতি থেকে বেরিয়ে এসে একবিংশ শতাব্দীর এক হার না মানা ট্রাজিক নায়কের আখ্যান রচনা করতে চেয়েছেন যা কেবলমাত্র মধ্যযুগের কাব্যপাঠে আগ্রহী পাঠক নয়, সকল পাঠককেই আকৃষ্ট করবে। রামকুমার মুখোপাধ্যায় 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাসের অনুসন্ধানে যেমন ব্যাপৃত থেকেছেন তেমনি ভাগ্যবিড়ম্বিত ধনপতির মধ্যদিয়ে প্রাচীন গ্রিক ট্রাজেডি নাটকের দৈবনিপীড়িত নায়কের ট্রাজেডিকেও তুলে ধরেছেন।

উনপঞ্চাশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং প্রতিটি অধ্যায়ের কাহিনি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ পাঠককে অধ্যায় পাঠের পূর্বে কাহিনির পূর্বাভাস দেবে। তবে কয়েকটি অধ্যায়ে কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 'নদীবন্ধে ধনপতি' ও 'নৌকারোহণ' পর্ব দুটি একসাথে বর্ণিত হতে পারতো, 'ডিঙা দর্শনে প্রতীক্ষা' অংশটি অতিদীর্ঘ এবং তার সঙ্গে 'কাণ্ডারীর আতঙ্ক' অংশটি সংযুক্ত হলে উপন্যাসের কাহিনি আরো দ্রুত হতো। এমনকি উপন্যাসে দশাবতার বর্ণনা অংশে কূর্মাবতার বর্ণনা এবং বিবিধ নৌকার আকার বর্ণনায় পুনরুক্তি ঘটেছে যা উপন্যাসের গতিকে কিছুটা শ্লথ করেছে।

উপন্যাসের পর্যালোচনায় সময় ও স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে স্থানের বর্ণনা যথাযথ হলেও সময়কালের তেমন স্পষ্ট উল্লেখ লেখক করেননি। তবে পরোক্ষ একাধিক তথ্য, যেমন সিংহলরাজ শালবাহনের সময়কাল এবং বাংলার নদী-জলপথের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তা থেকে মোটামুটি বলা যায় উপন্যাসের সময়কাল দশম-একাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস-আদিপর্ব গ্রন্থে বলেছেন- অষ্টম শতক থেকেই বাংলা এবং উত্তর ভারতের বৃহত্তর নৌবাণিজ্য স্রোতে ভাটা পড়তে থাকে এবং বাঙালির জীবন একান্তভাবেই কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে।[২০] অন্যদিকে ধনপতি উজানি নগর হয়ে সরস্বতী নদী ধরে যে পথে বাণিজ্যযাত্রা করেছে এবং তার সপ্তডিঙার সুবৃহৎ আকার সচেতন ইতিহাস পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগায়। অষ্টম শতকের পূর্ব থেকেই সরস্বতী নদী তার নব্যতা হারিয়ে বৃহৎ নৌচলাচলের অনুপোযোগী হয়ে ওঠে। ফলত উপন্যাসের সময়কাল নির্ধারণে

বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আসলে বাংলার প্রাচীন বাণিজ্য গৌরবের ইতিহাস লেখকের স্মৃতির পটে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয়ে গেছে, লেখক সেখানে অতীত গৌরবজনক ইতিহাসকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সময়কাল পরম্পরার বিচ্যুতি সত্ত্বেও।

'ধনপতি সিংহলযাত্রা' উপন্যাসকে মোটের ওপর ঐতিহাসিক স্থান-কাল অবলম্বনে রচিত উপন্যাস বলা যায়। কারণ একটি ঐতিহাসিক কালপর্বকে লেখক পুনরুজ্জীবিত করেছেন তার রচনায়। ইতিহাসের নথিভুক্ত তথ্যকে পরিবর্তিত না করে ইতিহাস যেখানে নীরব, লেখক তার কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাই উপন্যাসের স্থান-কাল সবই ঐতিহাসিক বা ইতিহাস সম্ভাবিত। আলোচনার শেষে একটি কথা উল্লেখ করতেই হয় বাঙালির অতীত নৌবাণিজ্য ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' মাইলফলক উপন্যাস।

তথ্যসূত্র :

১। https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC. Accessed on 23rd April, 2024.

২। https://www.amarboi.com/2013/07/dhanapatir-sinhaljatra-ramkumar-mukhopadhyay.html?m=1 Accessed on 23rd April, 2024.

৩। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, নবম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২০, পৃ. গ্রন্থের কোলোফোন অংশ

৪। পাত্র, প্রফুল্লকুমার(সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ১৭১

৫। ঠাকুর, স্বপনকুমার, উজানি মঙ্গলকোটের ইতিবৃত্ত, নান্দনিক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২২, পৃ. ৯-১৫

৬। তদেব, পৃ. ১৭-২০

৭। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৮। তদেব, পৃ. ১৪

৯। তদেব, পৃ. ৩০

১০। Mookherji, Radha Kumud, Indian Shipping, Kitab Mahal Pvt. Ltd., Allahabad, Second Edition, 1957, P. 13-17

১১। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১২। Mookherji, Radha Kumud, Indian Shipping, p.14-15,
দাস, গোকুলচন্দ্র, বাংলার নৌকা প্রাক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগ, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৫৮

১৩। ভট্টাচার্য, তন্ময়, বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগণা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ(১৯৪৫-১৮৭৩), মাস্তুল, হুগলি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২৪, পৃ. ৬৮-৭৩

১৪। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

১৫। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৪, পৃ. ৯৮

১৬। মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
১৭। তদেব, পৃ. ২৩
১৮। তদেব, পৃ. ১০৬
১৯। তদেব, পৃ. ১৬৩
২০। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

গ্রন্থসূত্র :

আকর গ্রন্থ :

মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, ধনপতির সিংহলযাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, নবম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২০

সহায়ক গ্রন্থ :

১। সেন, সুকুমার(সম্পা.), চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দ চক্রবর্তী, সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লি, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩
২। ঠাকুর, স্বপনকুমার, উজানি মঙ্গলকোটের ইতিবৃত্ত, নান্দনিক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২২
৩। Mookherji, Radha Kumud, Indian Shipping, Kitab Mahal Pvt. Ltd., Allahabad, Second Edition, 1957
৪। ভট্টাচার্য, তন্ময়, বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগণা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ(১৯৪৫-১৮৭৩), মাস্তুল, হুগলি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২৪
৫। দাস, গোকুলচন্দ্র, বাংলার নৌকা: প্রাক উপনিবেশিক ও উপনিবেশিক যুগ, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১
৬। ওঝা, সুনীলকুমার(সম্পা.), চণ্ডীমঙ্গল, মানিক দত্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭
৭। পাত্র, প্রফুল্লকুমার(সম্পা.), মধুসূদন রচনাবলী, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০১
৮। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৪

অন্তর্জাল সূত্র :

১। https://bn.m.wikipedia.org
২। https://www.amarboi.com
৩। https://pabitra-online.in/category/lekha-pottor/book-review/ Accessed on 23rd April, 2024.
৪। https://www.dainikstatesmannews.com/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF/interview-ramkumar-mukherjee/73722 Accessed on 23rd April, 2024.

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডা. গৌরমোহন রায় কলেজ, পূর্ব বর্ধমান ।

সমরেশ মজুমদারের কালবেলা উপন্যাসে প্রেম ও বিপ্লবের দ্বৈত রূপ অনিমেষ : একটি আলোচনা

ভগীরথ নন্দী

সারসংক্ষেপ-

সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত ‘কালবেলা’ উপন্যাসের অনিমেষ চরিত্রের দ্বৈত রূপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের শুধুমাত্র একটি উপন্যাসের কাহিনী নিলে হবে না। তাই অনিমেষ সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবে জানতে হলে লেখকের পূর্ববর্তি উপন্যাস ‘উত্তরাধিকার’ থেকে কাহিনীর সূত্র ধরে কালবেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনাকে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। প্রেম ও বিপ্লবের সমন্বয় অনিমেষের মধ্যে যে সময়ে ঘটেছে তার পূর্বের তথা তার পরিবারের মানুষজন বিশেষত তার দাদু, বাবা, মা, পিসি, কাকা, বন্ধু-বান্ধব এবং তার জন্মভূমির কথা আলোচনা করতেই হয়। সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত উপন্যাসটি ১৯৮১-৮২ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৯৮৪ সালে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র যুবক অনিমেষ ১৯৭০ সালের নকশাল আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তার পর থেকেই নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার ছাপ ও সামাজিক চিত্র নিখুঁত বর্ণনার সাথে লেখক তুলে ধরেন। ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় পা দেওয়া দাঙ্গার মধ্যে নিজের অজান্তে পড়ে যাওয়া। পুলিশের গুলি লাগা। কাকা প্রিয়োতোষের রাজনৈতিক মতাদর্শ, শিক্ষক মহাশয়ের কংগ্রেসি চিন্তাভাবনা, মা মাধুরীর মৃত্যু, পিসির ভালোবাসা ইত্যাদি মনের মধ্যে নিয়েও বাংলা বিষয়ে এম.এ ক্লাশে স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তে আসা। রাজনীতির দোলাচলতা, এস. এফ. আই দলের ছাত্র নেতাদের একপ্রকার জারিজুরির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। মাঝে মতাদর্শগত টানাপোড়েনের মধ্যে থেকেও সহপাঠী মাধবীলতা মুখার্জীর সঙ্গে পরিচয় আলাপ ও ঘনিষ্টতা, সবকিছু অনিমেষের মধ্যে লেখক সংগঠিত করেছেন সুন্দরভাবে। উক্ত প্রবন্ধে অনিমেষ চরিত্রের মূলত প্রেম ও বিপ্লবের যে দ্বৈত রূপ সদ্য প্রয়াত উপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার তাঁর পুরষ্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ‘কালবেলা’-তে তুলে ধরেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ-

কালবেলা, সমরেশ মজুমদার, অনিমেষ, মাধবীলতা, বিপ্লব, প্রেম।

মূল প্রবন্ধ -

সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত ‘কালবেলা’ উপন্যাসে অনিমেষ চরিত্রটির আলোচনার প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজনলেখক এই চরিত্রটির অবসান ঘটিয়েছেন যেন এক অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারকে রেখে গেলেন।সমরেশ মজুমদারের মানসপুত্র ও আমরা তাকে বলতে পারি। এমনকি তাঁর একেবারে নিজস্ব চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চরিত্রটির মধ্যে বলা যায়। উত্তরাধিকার উপন্যাসের সূচনায় শিশু অনিমেষকে আমরা পাই। এই চরিত্রটি সম্পর্কে লেখকের উক্তি সর্বাগ্রে বলতে হয় –

> “১৯৪৭ সালের পনেরই আগষ্ট আমাদের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কারার সময় অনিমেষ নামে একটি কিশোর প্রথম শুনেছেল ‘বন্দেমাতরম’ শব্দটি। শব্দটির অর্থ পুরোপুরি

উপলব্ধি না করতে পারলেও তার ধ্বনি – ব্যঞ্জনা তার মনকে নাড়া দিল। এই শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আর তার মূল্য বুঝতে না বুঝতে সে কিশোর হয়ে উঠলো সদ্য তরুণ। তারপর সেই তরুণ উচ্চশিক্ষার জন্য এল কলকাতায়। সেদিন সারা শহরে আগুন জ্বলছে – এক আন্দোলনের ভয়ের পরিবেশ। নিজের সম্পর্কে, দেশের সম্পর্কে পুরনো বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ভালোবাসার সঙ্গে নতুন করে তার মুখোমুখি পরিচয় শুরু হয়। এই কাহিনী সেদিনকার সেই কিশোর তরুন অনিমেষের আত্ম- অনুসন্ধানের কাহিনী।”[১]

এর থেকেই আমরা অনিমেষ সম্পর্কে লেখকের স্বল্প পরিচয় দিতে পারি। কিন্তু এই চরিত্রটির বিস্তৃতি রয়েছে উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ এই তিনটি উপন্যাস জুড়ে। সেখানে লেখক কিভাবে চরিত্রটিকে খাড়া করেছেন তাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশেষত কালবেলা উপন্যাসের মধ্যে অনিমেষ চরিত্রটির প্রেম ও বিপ্লবের দ্বৈত রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।সমরেশ মজুমদারের জীবনের শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে তাই উপন্যাসের নায়ককেও আমরা দেখি মনমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে। পুরো হাত ওয়ালা হলুদ পুলওভার পরে অনি দেখছে দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাদের বাড়ির চারপাশে শুধু গাছ। সেইসব পেরিয়ে সে এসে হাজির হয়েছে আঙরাভাসা নদীর ধারে। সেই নদী বন্ধ হবার খবর শোনে তা দেখতেও যায়। সরিৎশেখরই ছিলেন অনিমেষের বন্ধু। দাদু নাতিতে খুব ভাব। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে অনি যেভাবে উৎসাহিত তাতে তার সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা যাতেই পারে। সে দেশের জন্য দশের জন্য কতটা তৈরী। ভবানি মাষ্টার, নতুন দিদিমণি, এবং নতুন দিদিমণির শেখানো ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি তাকে এক অন্য জগতের পথ দেখায়। স্থানীয় জননেতা হরবিলাসবাবু তাদের স্কুলে উপস্থিত হয়ে যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা উল্লেখ করা যেতেই পারে –

> “স্থানীয় জননেতা বৃদ্ধ হরবিলাসবাবু পতাকা তোলার আহ্বান করলেন অনিমেষকে। অনি কম্পিত হাতে রশি ধরে টানল। এপাশ থেকে একটা রঙিন পুঁটুলি উঠে গেল, ওদিকের দড়ি নেমে আসছে। দরি ধরে অনি ঝাঁকুনি দিতেই স্বাধীন ভারতের পতাকা দুলতে লাগল আর ঝর ঝর করে পড়ল একরাশ ফুলের কুঁড়ি। হরবিলাসবাবু বললেন আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ পতাকা তুলেছে।”[২]

এখানেই দেশ সেবার শুভ সূচনা। তার কদিন পরই সে স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে বাপী, বিশু প্রভৃতি বন্ধুদের ছেড়ে দাদুর সাথে জলপাইগুড়ি রওনা দেয়। যাবার সময় অনিমেষ রুমালে করে মাটি নিয়ে যাচ্ছে এ থেকে লেখক বোঝাতে চাইছেন অনি তার জন্মভূমিকে কতটা ভালোবাসে। নির্মিয়মান বাড়ির মজুরদের চিত্র সেখানকার মানুষজনের আচার ব্যবহার অনিকে অনেক ধরনের শিক্ষা দিয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতো অনিমেষ চটপটে না হলেও ঐ বয়সের ছেলের চেয়ে বুদ্ধিটা অনেক বেশি। কথা যখন বলে তখন এর বয়সের ছেলের মতো বলে না। সে তার মা কে ভীষণ ভালোবাসে তাই জলপাইগুড়িতে এসে তার মায়ের জন্য খারাপ করেছে। এখানে তার নিজের কোনো বন্ধু নেই শুধু দাদু আর পিসিমা। এখানে আসার পর তার চোখের সামনে একদিন মজুর আর কামিনটার যে আচরণ দেখেছে তাতে সে বিস্মিত। একসময় কামিনটাকে মজুরটার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা কথা সে মাথায় ভাবলেও শেষ পর্যন্ত নির্বিকার বালির গর্তে লুকিয়ে থেকে তাদের পৈশাচিক ভালোবাসার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে । অবশ্য সে তা জানেনা এই ঘটনা পাপ না পুণ্য। মায়ের কাছে সুযোগ বুঝে ঠিক কথাটা বলায় তার মনের দ্বিধা কেটেছে। মা তাকে বলেছে চিরকাল সব কথা খুলে বলার জন্য তাতে

আর কোনো পাপ থাকে না। গৃহ প্রবেশের সময় অনির মা মাধুরী বাবা মহীতোষ সবাই উপস্থিত থেকেছেন সেখানে সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিক শনিবাবা অনিমেষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন –

> "সরিৎশেখর তোমার এই নাতি বংশছাড়া, যৌবন এলে একে আর তোমাদের মধ্যে পাবে না। এঁর জন্যে মায়া আর বাড়িও না। এই ছেলে যতটা নরম হৃদয়ের ততটাই নির্দয়। তবে হ্যাঁ, এ যদি তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন হয় তবে তোমার আর অঙ্গহানির সম্ভাবনা নেই। জন্ম থেকে এ প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে এসেছে। .... তবে মনে হয় ও বিদ্বান হবে কিন্তু আঠারো বছর বয়সে রাজনৈতিক কারণে ওকে জেলে যেতে হতে পারে। যদি তাই যায় তাহলে আমি আর কিছু বলতে পারব না। কিন্তু একটা জিনিস বলছি, এর জীবনে বহু নারী আসবে, নারীদের কাছে ও চরম দুঃখ পাবে, নারীদের জন্য কর্মভ্রষ্ট হবে, আবার কোনো কোনো নারীর জন্য ও মাথা তুলে দাড়াতে পারবে। সরিৎ শেখ একে তুমি কোনো কাজে বাধা দিওনা কক্ষনো।"[৩]

আধুনিক উপন্যাসে তান্ত্রিকের এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা প্রত্যেক পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন। তিন পর্বের ট্রিলজি উপন্যাস পড়লে এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অনেকটাই সফল হয়েছে তা বোঝা যায়। মাধুরীর শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হওয়ায় অনি হতভম্ব। সে তার মায়ের শরীর থেকে রক্তস্রোত দেখে ভীত হয়েছে। মাধুরী তাকে কাছে ঘোরের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন –

> "আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক শুনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।"[৪]

এই কথাটা অনিমেষ অনেকদিন মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছিল, কালের নিয়মে যন্ত্রণার দায়ে তাকেও ভুলতে বাধ্য হতে হয়েছে। সে তার নিজের হাতে মায়ের মুখাগ্নি করেছে কাকা প্রিয়তোষের কাছে মায়ের ভূমিকা ও স্থান সম্পর্কে অনিমেষ নতুন সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে। ক্লাসের শিক্ষক মহাশয় তাকে সান্ত্বনা দিলেন আমার দুটো মা, একজন চলেগেলেন ঈশ্বরের কাছে অন্যজন মা তো আছেন, তিনি দেশ মাতা। তাঁর কাছে থেকেই সুভাষ চন্দ্র বসের কথা শোনে কিন্তু তার মনে সেই কংগ্রেসী ধারনা বেশিদিন থাকেনি। কাকা প্রিয়তোষ বাড়িতে ফিরলে একটি পত্রিকা দেখে যার নাম মার্ক্সবাদী। সে রাতেই সে শুনল, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। কংগ্রেসীরা বদমায়েশ। তারা ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষা নিয়েছে। আমরা এ স্বাধীনতা চাই না। কমিউনিস্ট শব্দটা সে তার কাকুর কাছ থেকে প্রথম শোনে। তবে তার মনে এক দ্বিধার জন্ম হয়। সেই রাতেই তাদের বাড়িতে পুলিশ আসে এবং কাকার খোঁজ করে। এতে তার মনের পরিবর্তন দেখা যায়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

> "পর পর এই সব ঘটনা অনিমেষকে বদলে দিচ্ছিল। সারা 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসটাই অনিমেষের আস্তে আস্তে বড়ো হওয়া আর বদলে যাবার কাহিনী। তার বাবার দ্বিতীয় বিবাহ, জলপাইগুড়ির স্কুলের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার পর সারা দেশে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' ধ্বনি, কংগ্রেস আর বিরোধী দল গুলির মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান ও সংঘর্ষ মাঝে মাঝে অনিকে বিভ্রান্ত করে দেয়।"[৫]

সমরেশ মজুমদার অনিমেষেকে বার বার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করিয়েছেন। জলপাইগুড়ির স্কুলে পড়ার সুবাদে সেখানেও তার পরিবেশ ও মানুষজন আস্তে আস্তে পরিচিত হয়। তিস্তা নদীর প্রচণ্ডতা, বন্ধুদের কথোপকথন অবগত হয়। নতুন মার সাথেও তার আলাপ ঘটে। পিসিমার হাতের রান্না করা পায়েস যে অনি ভালোবাসে সে কথা নতুন মা জানেন এবং অনিকে বাটি ভরে নিজের হাতে রান্না করা পায়েস খেতে দেন। মন্টু – তপনের মতো সে অবশ্য তিস্তার চরে উদম মেয়েদের দেখে আনন্দিত না হয়ে লজ্জিত হয়। জলপাইগুড়িতে পড়াশোনা শেষ করে অনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার জন্য রওনা হয় 'উত্তরাধিকার উপন্যাসের শেষে। এঁর পরই শুরু হয় তার জীবনের পরবর্তী পর্ব। অনিমেষ চরিত্রের পুর্ণতার জন্য আমাদের তার বিপ্লব ও প্রেমের জগতে পদার্পণের যে দীর্ঘ পথ সে অতিক্রম করেছে তার মানসিকতা কেন এভাবে গড়ে উঠেছে তা আলোচনা করতেই হয়েছে।

'কালবেলা' উপন্যাসে অনিমেষের জীবনের চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্খা চড়াই উতরাই এর মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছে। লেখকের কথায় আমরা জানতে পারি –

> "অনিমেষ যখন প্রথম কোলকাতায় পা রেখেছিল তখন রাস্তায় ট্রাম জ্বলছে, গুলি চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা এই তরুণটি সেদিন দুর্ঘটনার স্বীকার হয়েছিল। তারপর আর পাঁচটা মানুষের মত গা ভাসিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার জীবনের মোড় পালটালো। ছাত্র – রাজনীতি তাকে নিয়ে গেল জটিল আবর্তে। এই দেশে আর দেশের মানুষের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মনুষ্যত্ব আর মানবিক মূল্যবোধ তাকে সরিয়ে নিয়ে এল উগ্র রাজনীতিতে। সত্তরের সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে দগ্ধ করে সে দেখল, দাহ্য বস্তুর কোনো সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নেই। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সে যখন বিকলাঙ্গ তখন বিপ্লবের শরিকরা হয় নিঃশেষ না হয় গুছিয়ে নিয়েছে আখের। অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল মাধবীলতাকে। ..... দেশ গড়ার জন্যে বিপ্লবের নিষ্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করেছিল বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা।"[৬]

সমরেশ মজুমদার আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে অনিমেষের এক চিত্র আমাদের কাছে খাড়া করেছেন। অনিমেষ কলেজে পড়াশোনা করতে এসে দাদূর পরিচিত দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা করার আগেই পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হয় এবং অপরিচিত সুবাসদার আনুকূল্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়। দেবব্রতবাবুর বাড়ি ছেড়ে কলেজে ভর্তি হওয়া ও হস্টেলে থাকার পর হটাৎ রটেগেল, অনিমেষ খুব অ্যাক্টিভ কমিউনিস্ট – খাদ্য আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। অনিমেষের আপত্তি সত্বেও বাম – রাজনীতি করা ছাত্ররা তাকে 'হিরো' বানিয়ে দিল। হস্টেলে আফ্রিকান ছেলেকে অনিমেষ মারতে গিয়েছিল একথাও রটে যায়। তার আন্তরিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক আছে কি না তা না জেনে কলেজের ছেলেরা তাকে এস.এফ.আই এর সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার জন্য আহ্বান জানায়। জলপাইগুড়িতে যে সব চিন্তা ভাবনা ওর মাথায় ছটফট করত সেগুলো এই কলেজে পড়তে পড়তে অন্য চেহারা নিয়েছে। পুলিসের গুলি তার পুষ্ট ঊরুতে বিদ্ধ হওয়ায় যেন তার কাজ কর্মে কিছুটা লাগাম পড়েছে। না হয় সে রাজনীতির আঙিনায় হয় তো আলাদা ভূমিকা পালন করত। অনিমেষ চরিত্রের এই ধরনের চিন্তা ভাবনার পেছনে লেখকের প্রত্যক্ষ অবদান ও অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। সে প্রসঙ্গে উল্লেখ্য –

"এই উপন্যাসের লেখক জলপাইগুড়ি থেকে এসে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পড়েছিলেন।তাঁর আত্মজীবনের প্রক্ষেপ পড়েছে প্রথম দুটি পর্বে ('উত্তরাধিকার', 'কালবেলা')।"[৭]

অনিমেষ ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এফ.আই এঁর নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে কমরেড সুবাসদার নেতৃত্বে।ক্রমে সে বুঝতে পারে এখানকার ছাত্রদের রাজনীতি জলপাইগুড়ির ছাত্র আন্দোলনের থেকে সম্পুর্ন আলাদা। আমাদের ছাত্র ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্গান লাভ করে সুবাসদার সঙ্গে।দাদু শরিৎশেখর মনের মতো করে তৈরী করেছিলেন তবুও আক্ষেপ শোনা যায় কালবেলার এই অংশে তিনি অনিমেষকে বলেছিলেন-

"কীজন্যে তুমি রাজনীতি করবে? কেন করবে? আমি ঠিক বুঝিনা তোমাদের। কিন্তু মনে হয় তোমরা নানান জিনিস দিয়ে প্রতিমা বানাও শুধু প্রতিমার জন্যে, ভক্তিটুকুই তোমাদের নেই।"[৮]

১৯৬৪ সাল তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উপলক্ষ চিন–ভারতের সম্পর্ক। সি.পি.আই আর সি.পি.আই.(এম) দুটি আলাদা পার্টি যাদের মধ্যে সম্পর্ক মধুর নয়। সেই সময় থেকে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও অনিমেষ আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন, বিক্ষোভ, পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া। লাঠি দিয়ে মারা এইসবকিছুর মধ্য দিয়ে চলে ঘটনা প্রবাহ আর ছাত্র আন্দোলনে তাল রেখে বামপন্থী রাজনৈতিক সগঠনের হাত ধরে এগিয়ে চলে। এর মধ্যেই অনিমেষের জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

অনিমেষ অনুভব করেছে বাড়ির সঙ্গে তার একটা দূরত্ব বেড়েছে তার মনে মাধবীলতার আগমন ঘটেছে সে নিজেকে মাধবীলতার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে তাই যে তার মানসিক টানাপড়েনের সবকথা মাধবীলতাকে জানায়। এখন সে নিজেই বুঝতে পারছে না তার জীবনের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে এগোচ্ছে। সেই দোলাচল বৃত্তিটা লেখক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন –

"এখন প্রতিটি দিন শুরু হয় বুকজোড়া এক ধরনের চাপ নিয়ে। সে চাপ বুক থেকে সরে না যতক্ষণ মাধবীলতাকে সে না দেখছে। একটু একটু করে মাধবীলতা তার জীবনে মিশে যাচ্ছে।"[৯]

কফি হাউসের দোতলায় মাধবীলতার সঙ্গে অনিমেষ অনেকক্ষণ কথা বলে। পরস্পর নিঃশেষে জানা, চেনা ও গ্রহণ করার পালা সাঙ্গ করে। অনিমেষের জীবনের সমস্ত ঘটনা জানে মাধবীলতা। মাধবীলতাও তাকে সম্পুর্নরূপে ভালোবাসে। তাকে দেখার পর অনিমেষের জীবনের গড়ে ওঠা একাকিত্বের দুর্গ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রাজনীতির নানা কাজে ডুবে থাকতে থাকতে মাধবীলতার সাহচর্যে যেমন সহানুভূতি পেয়েছে তেমনি আস্তে আস্তে অনির মনে হতে লাগল এদেশের রাজনীতির ফাঁকিবাজি। দেশের মঙ্গলের কথা কেউ ভাবে না। কংগ্রেস ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার জায়গা কমিউনিস্টরা নিতে চাইলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। নিজের খরচ চালানর জন্য সে টিউশান করতে চেয়েছে। এ বিষয়ে বন্ধু পরমহংসের সাহায্য যদিও সে পেয়েছে তবু কোনমতে সে টিকতে পারেনি। মাধবীলতাকে অনিমেষের জন্যই বাড়িছাড়া হতে হয়। দেশ গড়ার জন্য বিপ্লবের নিস্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করে – বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা। সে অনিমেষকে ছায়া দেয়, ভরসা দেয়, প্রেরণা দেয়। বহুদিন পর মস্কো

থেকে ফরে আসা কাকা প্রিয়তোষের সঙ্গে দেখা হওয়ায় অবাক চোখে দেখেছে এবং তার কথা শুনে অবগত হয়েছে। রাজনীতি যারা করেছে তারা শুধুই নিজের স্বার্থ সিদ্ধির কথা ভেবেছে। তপু পিসির দেওয়া নীল কাগজের লেখা চিঠিটার কথা মনে পড়ে যায় তার বহুদিন তাদের যোগাযোগ নেই অথচ তাদের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক ছিল। আজ তার ছিঁটে ফোঁটা নিদর্শন যেন নেই। যত দিন গেছে অনিমেষ এঁর মধ্যে দ্বিধা বেড়েছে সে একদিন সুবাসদাকে বলেছে-

> “আমার আর ভালো লাগছে না। আসলে আমি পার্টির কাজকর্ম আর মানতে পারছি না। এত স্বার্থন্বেষী মানুষ পার্টির ওপর তলায় ছেয়ে গেছে যে এই দলের কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করা যাবে না।প্রতিমুহূর্তে বিবেকের সঙ্গে লরাই করার চাইতে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অনেক ভালো।”[১০]

অনিমেষ সত্যিকারের সৈনিক হতে চেয়েছে কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা কিছু কিছু মানুষের জন্য তার স্বপ্ন সফল হতে পারছে না। হস্টেলের এক বিছানায় শুয়ে সে সুবাসদার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছে সুবাস কিন্তু যে পথে অনিকে পরিচালিত করেছিল আজ নিজেও সেই পথের পথিক নেই তার অবস্থাও অনিমেষের মতো। সবকিছু ভুলে গিয়ে অনিমেষ পড়াশোনার চেনা জগতে ফিরে যেতে চায় এখন। পারেনি সুবাসদা তাকে আবার নতুন করে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে হাতে তুলে দিয়েছে একটি লিফলেট। তাতে লেখা প্রত্যেকটি শব্দ বার বার মনদিয়ে পড়ে অনিমেষ। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অতীত প্রশ্রুতিগুলো বিস্মৃত হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি বৃদ্ধি করে সরকার গঠন করতে চাইছে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের মধ্যে সবচেয়ে শোষিত ও পীড়িত কৃষক কুলকে বাঁচাতে হবে। ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রামের কথা, দেশের ধনী সম্প্রদায়ের থেকে ভূমিহীন কৃষকদের পাশে দাঁড়াবার আহ্বান জানানো হয়েছে। আসলে চিনের আন্দোলন ভারতবর্ষের মাটিতে ছাপ ফেলেছে। যার ফলস্বরূপ দেখাযায় সুবাসদা, মহাদেবদার সঙ্গে অনিমেষ গোপন মিটিং করেছে শহরের গোপন স্থানে। পুলিশের ভয় ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকেও তাদের দূরে থাকতে হয়। তার জীবনে মাধবীলতা ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে জোরকদমে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন লেখক অনিমেষের জীবনে। এই সুত্রে সে পরিচিত হয়েছে কিছু নতুন ব্যক্তির সাথে যাদের মধ্যে অন্যতম বারীন সরকার, পার্টির কাজে তাকে আসতে হয়েছে শিলিগুড়ি সেখানে পৌঁছে বারীন সরকারের সাথে সে কয়েকটা মিটিং শেষ করে নকশালবাড়ির কথা শোনে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমান নির্বাচনে বেশ গরম। কংগ্রেসের অধীনে পঞ্চায়েত রয়েছে তার থেকে মানুষকে বুঝিয়ে দলে টানার রাস্তা কৃষক আন্দোলন হঠাৎ মিলিটারি আক্রমণ হলে একমাত্র গেরিলা যুদ্ধই তাদের সম্বল। এবার সোজাসুজি শ্রেনিশত্রু খতম করার মুহুর্ত এসেছে। মাওবাদ এর কথা প্রচার করে সি.পি.এম.এল. শুরু হয়ে গেল নকশালবাড়ি আন্দোলন। জোতদার খতম করো, শ্রেনিশত্রু খতম করো বলে।

এসবের মাঝেও লেখক অনিমেষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তুলেছেন। মাধবীলতাকে সে চিঠি লিখেছে। তাতে অনিমেষের জীবনে এক নতুন ঘটনার পরিচয় দিয়েছেন লেখক তা নিম্নরূপ-

> “মনে হচ্ছে আমি খুব নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। কোনও কিছুই আমাকে তেমন স্পর্শ করে না। যেমন ধরো, এই স্বর্গছেঁড়া, এককালে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড় বলে

ভাবালুতায় ভুগতাম তা আর নেই। .... আত্মীয় স্বজন চেনা জায়গা কিংবা তার মতো অন্তরঙ্গ ছবি সম্পর্কে অদ্ভুত উদাসীনতা আজকাল আমাকে নির্লিপ্ত করছে।"[১১]

বিভিন্ন কথার মধ্য দিয়ে অনিমেষ শেষবেলা চিঠিতে উল্লেখ করে বর্ধমানে পৌষমেলার দিন সে মাধবীলতার সাথে দেখা করবে। এরপর সে তার পার্টি কাজে যথাসময়ে বোলপুরে এসেপৌঁছয়। বোলপুরে শ্রীনিকেতনে একটি খালি বাড়িতে মাধবীলতা আর অনিমেষ এক রাত থাকে। সেখানে অনিমেষের জীবনে বিপ্লবের পাশাপাশি প্রেম-ভালোবাসাকে তুলে ধরেছেন।

"অনিমেষের দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরতেই মাধবীলতা মুখ উঁচু করে তাকে চুম্বন করল। মুহুর্তেই সব বাঁধ ভেঙেগেল অনিমেষের। এই মেয়ে যার মুখ হাজার পদ্মের চেয়ে সুন্দর, যার শরীর স্বপ্নের আলোয় উজ্জ্বল তাকে এমন করে কাছে পেয়ে তার সমস্ত বিবেকের দরজা হাট খুলে গেল।"[১২]

এটাইতো স্বাভাবিক যে মানুষটাকে এতটাকাল ভালোবেসে এসেছে এবং বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হবার স্বপ্ন দেখেছে তাকে এরকম আবেগঘন চাপের ভয়ার্ত মুহুর্তে কাছে পেয়ে অনিমেষ বেঁচে থাকার সাধ খুঁজে পেতে চাইবেই। খুব কামনা বাসনার আবেগ ও ভালোবাসার সঙ্গে দুজনে যৌন মিলনে পরস্পরকে গ্রহণ করেছে। উন্মাদনায় অনিমেষ তার নিজস্ব স্বভাবের যে দিকটা কোনোদিন টের পায়নি তা আস্তে আস্তে টের পেয়েছে। মাধবীলতার শরীরের গন্ধ, স্পর্শ এবং পাশাপাশি থাকার আবেশে সে আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও তার বার বার মনে হয়েছে আজ তার জীবনের অন্যতম পাওয়ার দিনটাকে সে ব্যবহার করতে পারল না। এখন তাড়াহুড়ো করে কোনও রকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া যৌবনের ব্যবহার সে কখনও চায়নি।

নকশালবাড়ির রক্তাক্ত আন্দোলনে অনিমেষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সে তার পুরনো বন্ধু জুলিয়েনকে ফিরে পেয়েছে। সিরিল, সোমরা তাদের দলে যোগ দিয়েছে। অনিমেষের নেতৃত্বে পানিরামের হত্যা হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় বেশ উদ্বিগ্ন। নকশালবাড়ির এই আন্দোলন ক্রমশ বীরভূম, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, খোদ কলকাতায় অ ছড়িয়ে গেছে। পুলিশের সাথে আজকাল তাদের প্রায় সংঘাত হয়। তার কিছুদিনের মধ্যে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। দীর্ঘ বিচারহীন বন্দিজীবন কাটাতে লাগল অনিমেষ। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সম্পুর্নরূপে পঙ্গু। তাকে দেখলে আর মনেই হবে নাগের কর্মকাণ্ড আজ সে যেন অবোধ শিশু। এঁর মাঝে সে হারিয়েছে তার দাদুকে। মাধবীলতা সন্তান সম্ভবা তাকে পুলিস কটূক্তি করলে অনিমেষ প্রতিবাদ করে উঠেছে। বহুদিন জেলে থাকার পর যখন পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট এল অনিমেষ মুক্তি পেল ১৯৬৭ সালে। পুলিশের অত্যাচারে প্রায় খোঁড়া অনিমেষ ক্রাচে ভোর দিয়ে হাঁটে। জেলে থাকা বন্ধুর বাড়ি থেকে মাধবীলতার সঙ্গে বেলগাছিয়ার তিন নম্বর বস্তিতে এসে পৌঁছয়। সেখানে পৌঁছোবার আগে সে তার পুত্র সন্তানের কথা শুনেছিল। অবশেষে তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছে। নিমেষের মধ্যেই ভুলেগেছে সব যন্ত্রণা এবং মাধবীলতাকেও দুবাহুর বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে সে। এইখানে 'কালবেলা' উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটালেও অনিমেষ চরিত্রটি শেষ তথা তৃতীয় পর্ব 'কালপুরুষ' পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত যে কয়টি উপন্যাস রয়েছে তাদের মধ্যে বহুজন প্রশংসিত উপন্যাস এই কালবেলা যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অবস্থান করেছে

অনিমেষ। তার মধ্যে উপন্যাসিক যে প্রেম ও বিপ্লবের দ্বৈত রূপ দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপিত করেছেন তা স্বীকার করতেই হয়।

তথ্যসূত্র--

১. মজুমদার সমরেশ, 'উত্তরাধিকার', চুয়ান্ন মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, প্রচ্ছদ

২.মুখোপাধ্যায় অরুণ, 'বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি', প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭,দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃঃ ১৮২

৩.মজুমদার সমরেশ, 'কালবেলা', অষ্টবিংশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ৫৯

৪. মজুমদার সমরেশ, 'উত্তরাধিকার', চুয়ান্ন মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯, পৃঃ ৬২

৫.মুখোপাধ্যায়অরুণ, 'বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি', প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭,দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃঃ ১৮৫

৬.মজুমদার সমরেশ, 'কালবেলা', অষ্টবিংশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৌষ ১৪১৮, প্রচ্ছদ

৭.মুখোপাধ্যায় অরুণ, 'বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি', প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃঃ ১৮৯

৮.মজুমদার সমরেশ, 'কালবেলা', অষ্টবিংশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, পৌষ ১৪১৮, পৃঃ ১৫৭

৯.তদেব, পৃঃ ১৭৪

১০.তদেব,পৃঃ ২৩৭

১১., তদেব,পৃঃ ৩১০

১২.তদেব,পৃঃ ৩৩১

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

....

গবেষক , রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি

তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' : ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এক স্বতন্ত্র জীবন জিজ্ঞাসা

ড. সারদা বিষ্ণু

সারসংক্ষেপ –

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের উপন্যাস ধারায় 'আরোগ্য নিকেতন'(১৯৫৩) একটি বিশিষ্টতম ও বিরলতম সংযোজন। উপন্যাসটির উপজীব্য বিষয় কেবলমাত্র জীবন নাট্যমঞ্চে অভিনীত নর-নারীর চরিত্রায়ণই নয়;জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামী ছন্দে রূপায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এক জীবন দর্শন। উপন্যাসটিতে মরণের ছায়াতলে জীবননাট্যের নানা অভিনয় অভিনীত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মরণের মহাসঙ্গমে এসে তা বিলীন হয়ে গেছে। উপন্যাসটির নায়ক ভারতীয় আয়ুর্বেদ ও কবিরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী জীবনমশায়। যিনি তার বংশের ধারা অনুযায়ী 'আরোগ্য নিকেতন'নাম দিয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। চিকিৎসকের নাড়ী জ্ঞান এবং মৃত্যুর নিদান দেওয়া আমাদেরও স্তম্ভিত করে দেয়। এরই সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্য-আগত আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্রে পারদর্শী হাসপাতালের প্রদ্যোত ডাক্তারের সঙ্গে। উপন্যাসটির বয়ন কর্মে এগিয়ে গেছে এই দুই ধরনের চিকিৎসা প্রণালীর ঘাত-প্রতিঘাতের ঝংকার তরঙ্গে। জীবন-মৃত্যুর দোলায় দোলায়িত আলোচ্য উপন্যাসে এসে গেছে নানা চরিত্রের মিছিল। কবিরাজী চিকিৎসা এবং নতুন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে রচিত 'আরোগ্য নিকেতন'উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কথাশিল্পী তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভার একটি বিশেষ দিকের পরিচয়ে সমৃদ্ধ আরোগ্য নিকেতন।

মূল শব্দ –

তারাশঙ্কর, আরোগ্য নিকেতন, উপন্যাস, চিকিৎসা, নিদান, নাড়ীজ্ঞান, দ্বন্দ্ব, মৃত্যু

মূল আলোচনা –

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি লিখেছেন; তাদের মধ্যে 'আরোগ্য নিকেতন'(১৯৫৩)এক ব্যতিক্রমী উপন্যাসের নিদর্শন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সার্থক উত্তরসুরী তারাশঙ্কর এই উপন্যাসটিতে এক বিচিত্র জীবন জিজ্ঞাসা ও বিচিত্র দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন চিকিৎসা জগৎ-কে কেন্দ্র করে। বহু শতাব্দী বাহিত ভারতীয় আয়ুর্বেদিক ও কবিরাজী চিকিৎসা এবং পাশ্চাত্য দেশ আগত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার মেলবন্ধনে উপন্যাসটির বয়নকর্ম এগিয়ে গেছে পরম পরিণতির দিকে। একদিকে কবিরাজী চিকিৎসার প্রাণপুরুষ জীবনমশায় এবং অপরদিকে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বিশ্বাসী হাসপাতালের প্রদ্যোত ডাক্তার। প্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যায় আস্থাশীল জীবনমশায় এবং অন্যদিকে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী প্রদ্যোত ডাক্তার। জীবনমশায়-এর নিদান হাঁকা, নাড়ীজ্ঞান এসবে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত প্রদ্যোত ডাক্তারের কোনো বিশ্বাস নেই। ফলে সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে নতুন এবং পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বন্দ্ব সংঘাত ও লড়াই এগিয়ে গেছে;যার মধ্য দিয়ে আমরা কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের চিকিৎসাশাস্ত্রেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধাবনত হই।

চিকিৎসালয়টির নামই হলো আরোগ্যনিকেতন। দেবীপুর গ্রামের জীবনমশায় এখানেই প্রাচীন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন। জীবনমশায়ের নাড়ীজ্ঞান কিংবদন্তীর বিষয় হয়ে উঠেছে। নাড়ী দেখেই তিনি নিদান দিয়ে থাকেন। জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দোলায়িত আমাদের জীবন ছান্দসিক গতিতে চলতে চলতে কখন যে ছন্দ পতন হবে তার নিদান দিতেন জীবনমশায়। উপন্যাসটির সূচনা অংশেই এপ্রসঙ্গের বর্ণনা রয়েছে। আরোগ্য নিকেতন "হাসপাতাল নয়, দাতব্য

চিকিৎসালয়ও নয় – দেবীপুর গ্রামের তিনপুরুষ চিকিৎসা ব্যবসায়ী মশায়দের চিকিৎসালয়। স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর পূর্বে।”[১]

'আরোগ্য নিকেতন'নামকরণ করেন জগদ্বন্ধু মশায়ের পুত্র জীবনমশায়। দেবীপুর অঞ্চলের লোক এই চিকিৎসালয়টিকে বলত, 'মশায়ের হোথা'।আবার অনেকে বলত –'মশায়ের কোবরেজখানা'।জীবনমশায় 'আরোগ্য নিকেতন' নাম দিয়ে নতুনভাবে চিকিৎসা শুরু করলেন। কেননা, তখন কালান্তর ঘটেছে। একটি নতুন কাল শুরু হয়েছে। জীবনমশায় একটা কাঠের ফলকের উপর 'আরোগ্য নিকেতন' নাম লিখে বারান্দার সামনে টাঙিয়ে দেন। জীবনমশায় ভাবতে পারেননি তার চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে নতুনকালে চিকিৎসা পদ্ধতির লড়াই ও সংঘাত শুরু হয়ে যাবে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন আশ্চর্য ভুয়োদর্শী একজন যুবক কোবরেজ ডাক্তার। সত্যকে আশ্রয় করে গম্ভীর কণ্ঠে সত্যকে জানিয়ে দিতে তাঁর কণ্ঠস্বর কোনোদিন কম্পিত হয়নি। সেকালে অর্থাৎ যখন আরোগ্য নিকেতন জীবনমশায়ের হাত ধরে কলরব মুখরিত ছিল; তখন জীবনমশায়ের কোবরেজখানা অর্থাৎ আরোগ্য নিকেতন রোগীদের ভিড়ে লোকারণ্য থাকত। কিন্তু এখন মহাকালের পথ দিয়ে বয়ে গেছে অনেক স্রোত। এখন বৃদ্ধ জীবনমশায় একা বসে থাকেন। সঙ্গীহীন সারাদিন কেটে যায় স্মৃতিচারণে। —

> “অপরাহ্নের দিকে গেলে দেখতে পাবেন জীবনবন্ধু মশায় একা বসে আছেন। ..... ওই গাছ দুটির দিকে চেয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ 'মশায়'। প্রায় সত্তর বছর বয়স;–স্থবির, ধুলিধূসর;–দিক-হস্তীর মতো প্রাচীন।”[২]

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ডাক্তার কোবরেজ জীবনমশায়। অলৌকিক তার নাড়ী জ্ঞান। নাড়ীর ছন্দ ও তার গতি তাঁকে জানিয়ে দেয় মৃত্যুর পদধ্বনি। রোগাক্রান্ত মানুষের নাড়ী ধরেই তিনি বুঝতে পারেন রোগের গতি প্রকৃতি এবং জীবন-মৃত্যুর আগমনী ছন্দ। তিনি যেন নাড়ীর মধ্যে কালের পদধ্বনি শুনতে পান। নাড়ী দেখেই জীবনমশায় নির্লিপ্ত কণ্ঠে নিদান হাঁকেন। —

“নাড়ী দেখে বহুজনের মৃত্যু তিনি পূর্বাহ্ণেই ঘোষণা করেছেন তাঁর চিকিৎসক জীবনে। একের পর এক রোগীর কথা পলকে পলকে মনে উঠে মিলিয়ে যায়। এই মনে পড়াটার গতি অতি অস্বাভাবিক রকমেই দ্রুত। থেমে গেল এক জায়গায় সুরেন মিশ্রের ছোটো ছেলে শশাঙ্কের মৃত্যুঘোষণার কথায়। ...... কত মৃত্যু, কত কান্না, কত নীরব মর্মান্তিক শোক তিনি দেখেছেন।”[৩]

নতুন কালের অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার রাজকীয় সমারোহ দেখে বৃদ্ধ কোবরেজ জীবনমশায়ও স্তম্ভিত হয়ে যান।

'আরোগ্য নিকেতন'উপন্যাসটির কাহিনীধারা ১৯০৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃদ্ধ জীবনমশায় বর্তমানকালে বসে বহুবার অতীতকালের স্মৃতিচারণা করেছেন। এই অতীত স্মৃতিচারণার সূত্রেই নানা ঘটনা, নানা চরিত্র জীবন-মৃত্যুর ছন্দময় খেলার মধ্য দিয়ে পরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় উপন্যাসটি সমাপ্তি অংশে এসে গেছে। জীবনমশায়ের চিকিৎসা পদ্ধতির নেপথ্যে রয়েছে ভারতীয় জীবন দর্শন, ঐতিহ্যবাহী অধ্যাত্মচেতনা। আর প্রদ্যোত ডাক্তারের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্য আগত চিকিৎসা পদ্ধতি। এইভাবেই নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে পরম মূল্য দিয়ে লেখক তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'উপন্যাসটিকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন।

“মৃত্যুর নিকষকৃষ্ণ যবনিকার উপর ব্যাধির দমকা হাওয়ায় সঞ্চালিত জীবন-দীপশিখার এই বিচিত্র ভঙ্গিমার, নানা ছন্দের ও বিবিধ অন্তরভাবদ্যোতনার ছায়ানৃত্য লেখক এই উপন্যাসে অপরূপ রেখাবর্ণ-সমাবেশে ও তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও ভাবব্যঞ্জনার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।”[৪]

উল্লেখ করা যেতে পারে, আলোচ্য উপন্যাসটি শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয় ভারতীয় সাহিত্যেও এক বিশিষ্ট রচনা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার সার্থক শিল্পরূপায়ণ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।'আরোগ্য নিকেতন'নামাঙ্কিত হবার পূর্বে উপন্যাসটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয় 'সঞ্জীবন ফার্মাসী' নামে। উপন্যাসটি ১৯৫৫-তে রবীন্দ্রপুরস্কার এবং ১৯৫৬-তে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। তারাশঙ্কর নিজেও 'আরোগ্য নিকেতন'উপন্যাসটিকে তাঁর বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠতম রচনা বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। তারাশঙ্কর নিজেই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। প্রাচীন ও নতুন চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এরকম একটি উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যেও বিরলতম নিদর্শন বলা যায়।

মরণের ছায়াতলে জীবননাট্যের মায়াবী জালের অভিনয় একসময় শেষ হয়ে গেলেও উপন্যাসটির মধ্যে জীবনলীলা উপজীব্য বিষয় নয়। উপজীব্য বিষয় হল জীবন-মৃত্যুর চলমান ছন্দে আকস্মিক ছন্দপতন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর মৃত্যুর রহস্যময় ঘোমটার উন্মোচনে যেন এক সত্য সন্ধানী দার্শনিক সাহিত্যিক। উপন্যাসটিতে মৃত্যুর স্বরূপ ও আকস্মিক পদসঞ্চারে হতচকিত জীবন নাট্যমঞ্চে উপস্থিত নর-নারীর মৃত্যু ছায়াচ্ছন্ন শোক বিমূঢ় জীবনের খণ্ডাংশগুলির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, নায়ক-কোবরেজ জীবনমশায়ের স্মৃতিচারণার সূত্র ধরে। ফলে একের পর এক নানা চরিত্রের মিছিল আমরা লক্ষ্য করি। উপন্যাসটিতে রয়েছে প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা।

জীবনমশায়েরচিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দুটি ঘটনা তার ভাবনা-চিন্তাকে আলোড়িত করে দিয়ে গেছে। জীবনমশায়ের ডাক্তার পুত্র বনবিহারীর আসন্ন মৃত্যুর নিদান দেওয়া যা আতর বৌ-এর শ্লেষাত্মক অনুযোগ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সত্য সন্ধানী চিকিৎসককে বিদ্ধ করেছে। আর একটি হল, শশাঙ্কের আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনির কথা অনুভব করে তার তরুণী স্ত্রীকে সাধ মিটিয়ে খাওয়ানোর আমন্ত্রণ জানানো এবং সেই আমন্ত্রণ রূঢ়ভাবে প্রত্যাখানের ঘটনাটির মধ্য দিয়ে। শশাঙ্কের স্ত্রীর এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে জীবনমশায়ের সমস্ত অন্তঃকরণটিও যেন মৃত্যুবিষজারিত হয়ে নীল হয়ে গেছিল। জীবনমশায়ের স্ত্রী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে যেন মৃত্যুরূপিনী শক্তিরূপে এই চিকিৎসকের জীবনকে বিষজর্জর ও বেদনা নীল করে দিয়েছে। ঔপন্যাসিকের জীবন সাধনা ও ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী মৃত্যুচেতনা যা আমরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গভীরেও ছায়াবিস্তার করতে দেখি, তারই বহিঃপ্রকাশ যেন শিল্পী তারাশঙ্করের শিল্প সৃষ্টির আত্যন্তিক গভীরে নিহিত হয়ে আছে। তারশঙ্করের জীবনজিজ্ঞাসার গভীরে রয়েছে এই মৃত্যুভাবনা। 'আমার কালের কথা' (১৯৫১) গ্রন্থে তারাশঙ্কর মৃত্যু প্রসঙ্গে তাঁর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন এবং নানা গল্প-উপন্যাসে তারাশঙ্কর তারই শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে,ভারতীয় দর্শনে মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জীবন-মৃত্যুকে একটি অখণ্ড প্রবহমান প্রবাহ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন'উপন্যাসে মৃত্যুর প্রশান্ত রূপই চিত্রিত করার প্রয়াসী হয়েছেন। উপন্যাসের অন্তিমে এসে দেখতে পাই তারই বর্ণনা রয়েছে।

"উনিশশো একান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাস। আশ্বিন সন্ধ্যা। প্রদ্যোত ডাক্তার বাইরের বারান্দায় কলব্যাগ, ব্লাডপ্রেসার পরিমাপের যন্ত্র নিয়ে কলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। ...... মশায়ের অসুখ।"[৫]

'আরোগ্য নিকেতন'উপন্যাসটির নায়ক ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী সনাতনী আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্বাসী জীবনমশায় এবং নায়িকা অবশ্যই পিঙ্গলকেশিনী মৃত্যুদেবী। সারা উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর মরণের নির্যাসটুকু ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমনভাবে দিয়েছেন;তাতে কোনো না কোনো সূত্র ধরে মৃত্যুচেতনা বারবার ফিরে এসেছে। মৃত্যু কখনো অকাল মৃত্যুরূপে চঞ্চল প্রাণের উপর আকস্মিক ছেদ টেনে দিয়েছে, কখনো চিকিৎসা-প্রয়োগবিধির প্রাচুর্যের কাছে মৃত্যু পরাজিত হয়ে পিছু হটেছে। তারাশঙ্কর লিখেছেন, –

“জন্মমাত্রেই মৃত্যু সঙ্গ নেয়;দিনে দিনে সে বাড়ে, সে বৃদ্ধির মধ্যেই সে তার ক্ষয়ের ক্রিয়া করে যায়, ঠেলে নিয়ে যায় তার পথে, জীবন-যুদ্ধ করে মানুষ যেদিন ক্লান্ত হয় – সেদিন আসে জরা তারপর আসে শেষ।”[৬]

‘আরোগ্য নিকেতন’উপন্যাসটি তাই এক মৃত্যুময় উপন্যাস। উপন্যাসটিতে মৃত্যুর কথা বলা হলেও ঔপন্যাসিক মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনার কথাই বলতে চেয়েছেন। আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্র এই মৃত্যুকে জয় করার জন্যই অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভারতীয় সনাতন সাধনাকে মূল্য দিয়ে তারাশঙ্কর উপন্যাসে জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করেছেন। ব্যাধি, অকাল মৃত্যু, পরিণত বয়সে মৃত্যু, মৃত্যু ভয়ে কাতর মানুষ, বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছা – এসব ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে লেখক যেন মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের মৃত্যুকে জয় করার প্রাণপণ চেষ্টার কথাই বলতে চেয়েছেন। পরিণত বয়সে জীবন ডাক্তার মৃত্যুর পদধ্বনি তার নিজের নাড়ীর ছন্দে অনুভব করেছিলেন –

“নিজের নাড়ী ধরে বলেছিলেন – সে আসছে। মনে হচ্ছে গ্রামের বাইরে তার পায়ের শব্দ উঠছে। গ্রামে ঢুকবার মুখে ধর্মরাজ স্থানের বকুলতলায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। হেসেছিলেন একটু।”[৭]

ক্রমশ সংক্রমণ জীবন ডাক্তারের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এতোদিন বহুলোকের বহুজনের নাড়ী দেখে তাদের মৃত্যুর দিনক্ষণ সঠিক বলে দিয়েছেন। আজ মৃত্যুর পদধ্বনি তার হৃদপিণ্ডকে যেন অচল করে দিয়ে মস্তিষ্ককে চৈতন্যহীন করে দিচ্ছে। জীবনমশায় যেন অনুভব করতে পারছেন মৃত্যুরূপী মহাকাল ক্রমশ সংকুচিত হয়েতার বৃত্তকে অক্টোপাশের মতো শূন্য পরিণামের দিকে নিয়ে চলেছে। বহুদূরের অস্পষ্ট ছায়াছবির মতো অতীত, বর্তমান, স্মৃতি, আত্মপরিচয়, স্থান-কাল সমস্ত কিছু বিলুপ্তির পথে। আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ও তাঁর মস্তিষ্কের পরতে-পরতে যেন এই মৃত্যুরূপা পিঙ্গলকেশিনী-র ছায়া অনুভব করে লিখেছেন;–

“মনে হল আশা নাই,
মনে হল ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হল
সংকুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হল রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এত কাল ধ’রে
কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে;
এইবার ফুরায়েছে পালা,”[৮]

প্রদ্যোত ডাক্তার লক্ষ্য করলেন প্রগাঢ় একটি শান্তির ছায়া জীবনমশায়ের শীর্ণ মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে ! শান্ত আত্ম-সমর্পণের মতো আতর বৌ জীবনমশায়ের নিষ্প্রাণ, নিথর দেহটার উপর লুটিয়ে পড়লেন।

এই হলো ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে রচিত ‘আরোগ্য নিকেতন’ উপন্যাস।একদিকে বিচিত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্য এবং মানবতাবোধ অপরদিকে তেমনি আবার মৃত্যুদেবতার জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। বিশ শতকের মধ্যভাগের বাঙালি জীবনের এরকম আলেখ্য নির্মাণ এবং অন্তর্জীবন ও আত্মার নিগূঢ় স্বরূপ অনুভব করতে হলে তারাশঙ্কের ‘আরোগ্য নিকেতন’উপন্যাসটির সাহায্য নিতে হবে। অন্য কোনো উপন্যাসে সাধারণ জনজীবনের ও সাধারণ মানুষের এরকম শিল্পরূপ নির্মাণ পাওয়া যায় না। চরিত্র চিত্রণে এমন নতুন মূল্যবোধ ও জনমানসের অন্তর্জগতের গভীরে প্রবেশ করে তার চরিত্রায়ণ এবং সমাজচেতনার প্রতিষ্ঠা তারাশঙ্করের উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে, তারাশঙ্করের জীবনভাষ্য প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসটির ঘটনা নির্বাচনে, পরিণামী সংবেদনায় এবং চলমান ঘটনাধারা বর্ণনার

ফাঁকে ফাঁকে উচ্চারিত নানা মন্তব্যে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে জীবনযাপনের প্রকৃতিও বদলায় এরই বাস্তবতাগুণে ‘আরোগ্য নিকেতন’উপন্যাস বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

তথ্যসূত্র –

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ‘আরোগ্য নিকেতন’, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম করুণা প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০২২, সূচনা।

২। তদেব, পৃষ্ঠা-৯।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১১।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা-৫৬৩।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ‘আরোগ্য নিকেতন’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৫।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৩।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৮।

৮। দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, ‘সমাপ্তি’,‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ’, ভারবি, ২৬ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-১২, প্রথম ভারবি সংস্করণ অক্টোবর ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-১১৯।

....

স্টেট এডেড কলেজ টিচার (ক্যাটাগরি-১), বাংলা বিভাগ, পূর্ণিদেবী চৌধুরী গার্লস্ কলেজ, বোলপুর

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে বাংলার লোকসংস্কৃতি : প্রসঙ্গ 'অলীক মানুষ'

দেবাশিস বিশ্বাস

সারাংশ-

মানুষ সাধারণত তার প্রাচীন সংস্কার, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে ধরে রাখতে চায়। এই সংরক্ষণের প্রচেষ্টা কেবল ব্যবহারিক জীবনেই নয়, সাহিত্যেও তা ভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, বাংলা সাহিত্যে সেই আদিকাল থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ বারে বারে উঠে এসেছে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাসেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান যথাযথ ও প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে শুধু সাহিত্যের গুণগত মানই সমৃদ্ধ করেনি, সমসাময়িক বাস্তবতার পটভূমিতে লৌকিক সমাজের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও তুলে ধরেছে। তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং) ছাড়াও আরও অনেক উপন্যাস - যেখানে সিরাজের মন ও মননে লোকসংস্কৃতির গভীর প্রভাব আমরা লক্ষ করে থাকি। 'অলীক মানুষ' নামকরণটির মধ্যে দিয়েই লেখকের মননে লোকসংস্কৃতির অন্তঃসলিলা ধারা লক্ষ করা যায়। অবশ্য শুধু নামকরণেই নয়, অধ্যায়ের শিরোনাম, কাহিনি বর্ণনের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব লক্ষনীয়। স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস্ (Stream of Consciousness) বা চেতনা-প্রবাহ রীতিতে আভাসিত এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা দুটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষ করতে পারি। এক, লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং দুই, 'ম্যাজিক রিয়ালিজ্ম' (Magic Realism) বা জাদু বাস্তবতার প্রভাব। উনিশ-বিশ শতক তথা দীর্ঘ প্রায় একশো বছরের পটভূমিতে দেশ-কালের সীমাবদ্ধতার গন্ডি ছাড়িয়ে এক মুসলমান পীরপরিবারের পারিবারিক জীবনে কীভাবে ব্যক্তি-মানুষ সামাজিক জীবনে 'অলীক' মানুষে পরিণত হয় এবং সেই মানুষ ক্রমশ মিথ (Myth) বা কিংবদন্তিতে পর্যবসিত হয় – তার কাহিনিই এ উপন্যাসে কোলাজ (Collage) রীতিতে পরিবেশিত হয়েছে। শুধু যে কেবল বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তি, তাই নয়; জনপ্রিয়তার কারণেই এটি ইংরেজিতে ছাড়াও প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। 'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসে বাংলার লোকসংস্কৃতি : প্রসঙ্গ 'অলীক মানুষ' শীর্ষক এই প্রবন্ধে আলোচ্য উপন্যাসে প্রযুক্ত লোকসংস্কৃতির উপাদানের সঙ্গে লেখকের মন ও মননের সম্পৃক্ততার দিকটি জনমানসে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ-

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কথাসাহিত্য, উপন্যাস, 'অলীক মানুষ', লোকসংস্কৃতি, বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি, মিথ (Myth) বা কিংবদন্তি, ম্যাজিক রিয়ালিজ্ম (Magic Realism) বা জাদু বাস্তবতা।

মূল প্রবন্ধ-

মানুষ যখন কথার মাধ্যমে ভাববিনিময় করতে শিখল, সেই তখন থেকেই তার গল্প বলার আকাঙ্ক্ষা শুরু হয়েছে। শুরুটা হয়েছিল মৌখিক বা শ্রুতি হিসাবে, এরপর শুরু হল লিখে রাখার প্রচেষ্টা। অবশ্য মৌখিক সাহিত্যের ধারাটিও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হলো না, সেটিও সংহত জনগোষ্ঠীর মধ্যে টিকে রইল লোকসাহিত্য রূপে। লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের মতে এই লোকসাহিত্যই হল বাক্-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি, যা অ-বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বা নন-মেটেরিয়্যাল ফোকলোর (Non-Material Folklore) -এর অন্তর্গত। এর উপাদান হিসেবে লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ও প্রবচন, লোকসংগীত,

লোকগাথা বা লোকগীতিকা, লোকনাট্য-পালা, লোকোপমা, লোকনাম ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাক্-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি মূলত মৌখিক ভাষাশ্রয়ী হলেও মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে বাক্-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যের বহু উপকরণ লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। আবার অনেক সময় লিখিত সাহিত্যের বহু উপাদান দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মৌখিক ঐতিহ্য প্রবেশ করে ধীরে ধীরে লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, লিখিত সাহিত্য যেমন লোকসাহিত্যের কাছে ঋণী তেমনি লোকসাহিত্যেও লিখিত সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য –

"লোকসাহিত্য কেহ লিখিয়া রচনা করিতে পারে না; যখন ইহার উদ্ভব হয় তখন ইহা মুখে মুখেই রচিত হয় এবং প্রথম অবস্থায় ইহা মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। কিন্তু বহু সমাজেই যখন লেখার এমন ব্যাপক প্রচার হইয়াছে তখন ইহা লিখিয়া লইবার পথও অবরোধ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তীকালে সমাজ যখন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, তখন সকল দেশেই স্মৃতিশক্তির যেরকম অনুশীলন হইত, আজ আর কোথাও তেমন হয় না। সেই জন্য একদিন যাহা স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই আসিয়াছিল, আজ তাহাই লিখিত হইয়া সমাজের স্মৃতির ভার লাঘব করিতেছে।"[১]

বাক্-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ছাড়াও অ-বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির আরও তিনটি শাখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক, বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি - বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হল মূলত মানস-নির্ভর আর আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হল তার ব্যবহারিক বা ফলিত রূপ। লোকায়ত সমাজে নানা বিশ্বাস-সংস্কারকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব পালিত হয়ে থাকে তাই আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক এবং আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বংশপরম্পরায় ঐতিহ্য সূত্রে বাহিত হয় এবং মূলত এই জাতীয় লোকসংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পকলা। দুই, শিল্প-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি - লোকসমাজের শিল্পকেন্দ্রিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিল্পকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বা লোক-শিল্পকলা। চিত্র, অলংকরণ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য - সাধারণভাবে এই চারটি প্রকরণ লোকায়ত শিল্পকলার অন্তর্গত বলে ধার্য করা হয়। বলা বাহুল্য, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনের তাগিদ-ই হল সমস্ত প্রকরণের প্রয়োগকলার মূল উৎস। তিন, দৈহিক-ক্রিয়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি - আদিম যুগে মানুষ বাক্-ভাষা ব্যবহারে সক্ষম হবার আগে থেকেই অঙ্গ-ভাষা ব্যবহারে দক্ষ হয়ে ওঠে। অঙ্গ-ভাষার মধ্যে ইঙ্গিতময় অঙ্গ সঞ্চালনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লোকভঙ্গিমা, লোকনৃত্য ও লোকক্রীড়া, যা দৈহিক-ক্রিয়া কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। এর মধ্যে লোকভঙ্গিমা ও লোকনৃত্য মূলত জাদু-বিশ্বাস ও ধর্ম-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আর লৌকিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিশ্বাস-সংস্কার-অভিজ্ঞতা, জীবন-সংঘাত ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, অবসর বিনোদন ও মানসিক আনন্দবিধান, দৈহিক স্বাস্থ্যচর্চা এবং লোকজীবনের নানা আচার-অনুষ্ঠানের ধারাকে আশ্রয় করে।

লোকসংস্কৃতির আরেকটি মূল ধারা হল - বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বা মেটেরিয়্যাল ফোকলোর (Material Folklore), যেটির উপাদান হিসেবে লোক-কারিগরী, লোকযান, লোক-পরিচ্ছদ, লোক-অলংকার, লোক-বাদ্যযন্ত্র, লোক-খাদ্য ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, লোকসংস্কৃতির বিষয় পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা সংহত জনগোষ্ঠীর সমগ্র জীবন-প্রবাহের সঙ্গে জড়িত। তাই 'লোকসংস্কৃতি' হল একই ধরনের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা ও মানসচর্যার সামগ্রিক রূপ। এটি নিছক কল্পনাবিলাস, মনোরঞ্জন, মৌখিক ঐতিহ্য বা বস্তুমূল্যহীন বিষয় নয় বরং সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, নন্দনতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এর ব্যবহার, অনুশীলন ও চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। সুদূর অতীতকাল থেকেই এই চর্চা ভারতীয় সাহিত্যে

ধরা পড়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন যুগের সাহিত্য তথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য এবং আধুনিক যুগের সাহিত্য বিশেষত কথাসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির অনুষঙ্গ বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। অবশ্য এখানে কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রকরণ উপন্যাসই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির উপাদান আমরা সেভাবে দেখতে পাই না। বরং বঙ্কিম যুগের শেষ লগ্নে আমরা পেয়ে যাই এক স্বতন্ত্র ধারার কথাকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে। অবসর বিনোদনের জন্য বৈঠকি মেজাজ তৈরি করা ছাড়াও কাল্পনিক-রূপকথাধর্মী গল্প ও উপন্যাস সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনবদ্য। তাঁর কাহিনিতে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান আমরা লক্ষ করে থাকি। বিশ শতকের প্রারম্ভে রাজশেখর বসুর রচনাতেও এর আভাস পাওয়া যায়। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন পেশার মানুষজনের জীবন-সংকটের কথা উঠে এলেও লোকসংস্কৃতির উপাদান সেভাবে পাওয়া যায়না, বরং চারের দশকের পর থেকে বিশেষত তারাশঙ্করের হাতে বাংলা উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির অনুরণণ ধরা দিল অনেক গভীরতায় ও একাত্মতায়। তিনি ছাড়াও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র সেন, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অমরেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ লেখকদের নামও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। ছয়ের দশক থেকেই দেশভাগজনিত বিভিন্ন সমস্যার প্রভাব জনজীবনে দেখা দিল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিয়ভূষন মজুমদার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মনোজ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ লেখকদের হাতে উঠে আসতে লাগল ছিন্নমূল মানুষের দুঃখের কথা, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী গ্রামীণ মানুষ ও কলকারখানার শ্রমিকদের সংকটের কথা, আদিবাসী ও উপজাতি শ্রেণির মানুষদের অভাব ও অধিকারের কথা। ফলে কাহিনির পটভূমিরও যেমন বিস্তার ঘটল তেমনি এইসব প্রত্যন্ত মানুষদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকসংস্কৃতির উপাদানের কথাও উপন্যাসে উঠে আসতে লাগল।

বিশ শতকের সাতের দশক থেকেই এপার বাংলার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মহাশ্বেতা দেবী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, ভগীরথ মিশ্র, অমিয়ভূষণ মজুমদার, গৌরকিশোর ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, সমীর রক্ষিত, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের কথাসাহিত্যে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পটভূমিতে সেখানকার মানুষজনের জীবনের সঙ্গে জড়িত লোকায়ত সংস্কৃতির কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে আসতে লাগল। আর এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, যাঁর লেখায় আমরা পেয়ে যাই মূলত রাঢ় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লোকায়ত গ্রামজীবনের কথকতা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচিত কথাসাহিত্যে আমরা লক্ষ করি নাগরিক জীবনচর্যার চেয়েও অধিক গুরুত্ব পেয়েছে রাঢ় গ্রামবাংলার মানুষের জীবন। আসলে, একদিকে পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল আর অন্যদিকে গ্রামীণ পল্লীপ্রকৃতি ও সেখানকার সাধারণ মানুষজনের বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতি তাঁর জীবনের প্রথম চৌত্রিশ বছরে (১৯৩০-১৯৬৪) এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে জীবনের শেষ আটচল্লিশ (১৯৬৪-২০১২) বছর তিনি কলকাতাবাসী হলেও তাঁর রচনায় বারে বারে উঠে এসেছে গ্রামবাংলার পল্লীপ্রকৃতি, সেখানকার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষজনের জীবনচর্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। জীবনের প্রথম পর্বের অনেকটা সময় (প্রায় দীর্ঘ ছয় বছর, ১৯৫০-১৯৫৬) তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা লোকনাট্য 'আলকাপ'-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশেষত জীবনের এই অধ্যায়ে নিজের দেশ সম্পর্কে, গ্রামজীবন ও গ্রামীণ মানুষজনের সংস্কার-সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন - তা পরবর্তীকালে তাঁর রচনার উপকরণ হয়ে উঠেছে। 'আলকাপ' জীবনের শেষ লগ্নে বিবাহের (১৯৫৬ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ) পর নিজেকে কথাসাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় তিনি উপন্যাসকেই বেছে নেন, অবশ্য এর আগেই পাঠককুলের কাছে তিনি ছোটোগল্পকাররূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে (১৯৫৬ - ১৯৫৮) লিখে ফেললেন জীবনের প্রথম উপন্যাস 'কিংবদন্তির নায়ক' (প্রকাশকাল: ১৯৬৯, 'কথাশিল্পী' প্রকাশনী)। মাঠের ফসল পাহারাদার তথা 'জাগাল'দের নিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এই উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যেই রয়েছে

কথাসাহিত্যের এক বিশেষ উপাদানের প্রসঙ্গ। অবশ্য তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নীল ঘরের নটী' ('অয়ন' পত্রিকায় 'নয়নতারা' নামে প্রথম প্রকাশ। 'নবপত্র প্রকাশন' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ - ১৯৬৬)। জুয়ারী দলের নটী নয়নতারা নামের একটি মেয়ের জীবন সংগ্রামের করুণ কাহিনি এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য, পাশাপাশি এখানে উঠে এসেছে গ্রামজীবনের লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান।

সিরাজের বেশিরভাগ উপন্যাসেই কাহিনির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংশ্লিষ্ট হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উপরোক্ত উপন্যাস দুটি এবং 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং) ছাড়াও 'মায়ামৃদঙ্গ' (১৯৭২, দে'জ পাবলিশিং), 'উত্তর জাহ্নবী' (১৯৭৪, প্রকাশভবন), 'গোপনে নির্জনে' (শারদীয় 'অমৃত' পত্রিকায় 'সুন্দর বিষাক্ত ফুল' নামে প্রথম প্রকাশ। শৈব্যা পুস্তকালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ - ১৯৭৪), 'নিলয় না জানি' (১৯৭৬, শৈব্যা পুস্তকালয়), 'নির্জন গঙ্গা' (১৯৮০, প্রকাশভবন) ইত্যাদি উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটি সিরাজের আত্মজৈবনিক উপন্যাস। তিনি 'আলকাপ' নাট্যদলের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় ছ'বছর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন আর সেই অভিজ্ঞতার ফসলই এই উপন্যাস। 'উত্তর জাহ্নবী' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাস, যা উঠে এসেছে আঞ্চলিক লোককবির গীতিকার মাধ্যমে আর উঠে এসেছে এখানকার মানুষের জীবনচর্যায় লোকসংস্কৃতির পরিচয়। গ্রামীণ মানুষের অলৌকিক সত্তা সম্পর্কে বিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'গোপনে নির্জনে' উপন্যাসটি। 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের পীর-ফকির-দরবেশদের জীবন দর্শন ও জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের কথা উঠে এসেছে। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত নিষাদবাগের শ্রমজীবী দেহাতী মানুষদের জীবনের কথকতা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকসংস্কৃতির উপাদানের কথা উঠে এসেছে 'নির্জন গঙ্গা' উপন্যাসে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, জনপ্রিয় ও পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'অলীক মানুষ'। প্রথমবার আমেরিকা ঘুরে আসার পর, ১৯৮৬ সালে গৌরকিশোর ঘোষের পরামর্শে আব্দুর রউফ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় সিরাজকে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার অনুরোধ করেন। তখন আনন্দবাজারে সাংবাদিকতার চাপে সিরাজের বড়ো উপন্যাস লেখার ইচ্ছে কিছুটা হলেও কমে এসেছে। 'অলীক মানুষ' শুরু করলেন ঠাকুরদার (মওলানা সৈয়দ আব্দুল আহাদ আল-হুসাইনী) জীবন নিয়ে, যিনি ছিলেন একজন ফরাজি মওলানা। আলোচ্য উপন্যাসের 'মৌলানা বদিউজ্জমান' চরিত্রটিতে তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। তবে উপন্যাসের ঘটনাটা কয়েক দশক পিছিয়ে উনিশ শতকে নিয়ে গেলেন। উপন্যাসের আটটা পরিচ্ছেদ লেখার পর তিনি দেখলেন, যেভাবে শুরু করেছেন তাতে এই উপন্যাস লিখে শেষ করতে বহু বছর লেগে যাবে। তিনি তখন ভেবেছিলেন, এ লেখা হয়তো সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে না। এরকম একটা অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে তিনি হাতে তুলে নিলেন বোদলেয়ার (Charles Baudelaire) -এর ফরাসি কবিতার সংগ্রহ 'ফ্লাওয়ার্স অফ ইভিল' (The Flowers of Evil, 1857)। এখান থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে উপন্যাসের অধ্যায়ের শিরোনাম করে আবার লেখা শুরু করলেন। ঠিক একই পদ্ধতিতে ভলতেয়ার (Voltaire) -এর 'ফিলোসফিক্যাল ডিকশনারি' (Voltaire's Philosophical Dictionary, 1746), ডেভিড থরো (Henry David Thoreau) -এর 'ওয়ালডেন; অর, লাইফ ইন দ্য উড্স' (Walden; or, Life in the Woods, 1854) ইত্যাদি থেকে কোট (Quote) বা উদ্ধৃত করে লেখাটা চালিয়ে গেলেন। ফলে তাঁর নিজের অজান্তেই উপন্যাসের ফর্মটা বদলাতে শুরু করল।[২] দেশ-কাল সমস্ত একাকার হয়ে গেল। এইভাবে একটানা প্রায় তিনমাস ধরে লিখে চব্বিশটি পরিচ্ছেদে সিরাজ উপন্যাসটি শেষ করেন। টানা দু'বছর ধরে ছাব্বিশটি কিস্তিতে 'চতুরঙ্গ' থেকে 'অলীক মানুষ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে 'দে'জ পাবলিশার্স' গ্রন্থাকারে 'অলীক মানুষ' প্রকাশ করে। এই উপন্যাসটি ইংরেজিতে ছাড়াও প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে 'ভারতীয় ভাষা পরিষদ' এই উপন্যাসকে 'ভুয়ালকা পুরস্কার' -এ সম্মানিত করে। ১৯৯৪ -এ এই উপন্যাসের জন্য তিনি দিল্লির 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার' -এ সম্মানিত হন। ২০০৮ সালে আই.আই.পি.এম. (I.I.P.M. – The Indian

Institute of Planning and Management) 'অলীক মানুষ'কে আন্তর্জাতিক 'সুরমা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' -এ সম্মানিত করে। এই উপন্যাসের সূত্র ধরেই ২০০৯ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে 'ডি.লিট.' (D. Litt.) খেতাবে সম্মানিত করেন তৎকালীন রাজ্যপাল মাননীয় আচার্য শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী।

'অলীক মানুষ' উপন্যাসের নামকরণ, অধ্যায়ের শিরোনাম, কাহিনি বর্ণনের ক্ষেত্রে আমরা দুটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারি, এক, লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং দুই, 'ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম' (Magic Realism) এর প্রভাব। লেখক স্বয়ং বলেছেন -

"আসলে 'অলীক মানুষ' বলতে আমি বুঝিয়েছি 'মিথিকাল ম্যান'। রক্ত মাংসের মানুষকে কেন্দ্র করে যে মিথ গড়ে ওঠে - সেই মিথই একসময় মানুষের প্রকৃত বাস্তব সত্তাকে নিজের কাছেই অস্পষ্ট এবং অর্থহীন করে তোলে। ব্যক্তি জীবনের এই ট্রাজেডি 'অলীক মানুষ' -এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ... এই আখ্যানে প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র দুটি-ই চরিত্র - ধর্মগুরু বদিউজ্জামান এবং তার নাস্তিক, এনার্কিস্ট ও বিদ্রোহী পুত্র শফিউজ্জামান। ... একজন মনে করেন মানুষের নিয়ন্তা ঈশ্বর, অন্যজন ধারণা পোষণ করেন যে মানুষ নিজেই তার নিয়ন্তা।"[৩]

উনিশ-বিশ শতকের পটভূমিতে দীর্ঘ প্রায় একশো বছরের সামাজিক পটপরিবর্তনের ইতিহাসকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মূলত একটি মুসলমান পীরপরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এই সুবিহৎ সময়সীমার ক্যানভাসে যে কাহিনিটি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে মহাবিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখি উৎসব, সশস্ত্র আন্দোলন ইত্যাদি নানা ঐতিহাসিক ঘটনার চূর্ণীকৃত উপাদান লক্ষ করা করা গেছে।[৪] উপন্যাসটিতে মূলত মুসলমান সমাজের কথা বলা হলেও সেখানে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ভাব-ভালোবাসা ও মান-অভিমান এবং ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের ভাব-সংঘর্ষ অকপটে বর্ণিত হয়েছে।

'অলীক মানুষ' আসলে নিজের কাছে একলা হয়ে যাওয়া দুজন মানুষের গল্প। পরাবাস্তবতা ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বে দুটি মানুষ শেষপর্যন্ত দু'রকমভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয়।[৫] একজন ধর্মানুসারী আর অন্যজন ধর্মদ্রোহী -এরা দুজনেই নিজেদের ব্যক্তি-মানুষের পরিত্রাণের পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অবশেষে প্রকৃতির রহস্যময়তা ও প্রবৃত্তির নাগপাশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এদের দুজনের চরিত্রেই আত্ম-বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়, দেখা যায় কখনো আত্মপ্রবঞ্চনা আবার কখনো নৈতিকতা ও আত্মপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে প্রবৃত্তিকেই জয়ী হতে। এই দুজন মানুষ হলেন – ফরাজি মুসলিম ধর্মগুরু বদিউজ্জামান ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র এনার্কিস্ট (Anarkist) বা নৈরাজ্যবাদী ও নাস্তিক শফিউজ্জামান।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র বদিউজ্জামান একাধারে মিষ্টভাষী, ভাবপ্রবণ, খামখেয়ালী, জেদি ও হঠকারী প্রকৃতির। তিনি ছিলেন ফরাজি মুসলিম ধর্মগুরু ও ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক। অলৌকিকত্ব, পৌত্তলিকতাবাদ, মাজার, পীর ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও তাঁর শিষ্যরা বিশ্বাস করত যে তিনি মোজাজা বা অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন, অলৌকিক ঘটনা অনুভবও করতে পারেন। তাদের কাছে তিনি 'বদুপীর' নামে পরিচিত ছিলেন। এই মানুষটির মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে নানা কাল্পনিক লোককথা প্রচলিত হতে থাকে এবং ক্রমশ তিনি কিংবদন্তিতে পরিণত হন, পরিণত হন বদুপীর থেকে অলীক মানুষে।

অন্যদিকে বদিউজ্জামানের কনিষ্ঠ পুত্র শফিউজ্জামান – ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মনস্ক, স্বাধীনচেতা, বাস্তববাদীর পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারী এক মানুষ। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা লক্ষ করি শফিউজ্জামানের ফাঁসির হুকুম শোনার পর তার চোখে এক কালো জিন ও এক সাদা জিন ভেসে ওঠে। নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী অস্তিত্ববাদী দর্শনে বিশ্বাসী শফির মনোবৃত্তির এক বৈপরীত্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। আসলে তার মধ্যে যেমন একটা ব্যক্তিসত্তা আছে তেমনি কাল্পনিকসত্তাও আছে, আছে স্ববিরোধী চরিত্রও। অবশ্য এই স্ববিরোধী চরিত্র আমরা তার পিতা বদিউজ্জামানের মধ্যেও দেখতে পাই। তিনি নিজে আলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী হলেও শিষ্যদের কাছে নিজের দিব্যশক্তির উপর বিশ্বাস রাখেন আর ভাবেন যে তিনি এক অলীক ঘোড়ায় সওয়ার। শুধু তাই নয়, সংসার-জীবনে আপাত উদাসীনতার মধ্যেও আমরা

তাঁর আদিম প্রবৃত্তি তথা শরীরী আবেদন লক্ষ করে থাকি। অবশ্য সে আবেদনে বিফল হলে কাঙ্ক্ষিতের প্রতি কোনো ঘৃণা তৈরি হয়না বরং তাঁর নিজের অসংযমী আচরণের প্রতি আক্ষেপ তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শফির চরিত্রে আমরা দেখতে পাই নিজের প্রতি আক্ষেপের পাশাপাশি ঘৃণাও জন্ম নেয় কাঙ্ক্ষিতের প্রতি।

এ উপন্যাসের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে দৃশ্যমান জগত ও অদৃশ্য জগতের সংঘর্ষের কথা, পাশাপাশি রয়েছে একদিকে মায়া আর অন্যদিকে বাস্তবতা। এই মায়া-বাস্তবতাই লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় জাদু-বাস্তবতা বা ম্যাজিক-রিয়ালিজ্‌ম (Magic Realism) নামে পরিচিত। আসলে মানুষের জীবনটাই অনিশ্চয়তায় ভরা এবং তাকেই সাধারণ মানুষ 'নিয়তি' বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। লোকসংস্কৃতির ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি, মানুষ যখন কোনও ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারেনা, তখনই তাকে অলৌকিক বা অতিলৌকিক বা নিয়তি বলে থাকে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'অলীক মানুষ'-এ এই জাদু-বাস্তবতাকে এক অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, যা অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক বিশ্বাস ও ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। জীবনের নির্মম সত্যকে লেখক উপন্যাসে বাস্তব-অবাস্তব-পরাবাস্তবের সংমিশ্রণের আধারে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই আমরা পেয়ে যাই 'কালো জিন এবং সাদা জিন বৃত্তান্ত', যেখানে কালো জিন অশুভের এবং সাদা জিন শুভের দ্বারা প্রতীকায়িত। এই জিন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও এখানে ধরা পড়েছে –

"…. পবিত্র কোরানে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, আমি জিন ও ইনসান (মানুষ) সৃষ্টি করেছি। জিন বানানো হয়েছে আগুন থেকে, মানুষকে মাটি থেকে। জিনরা অগ্নিজাতক। তারা আলোর মানুষ। বাস করে সপ্তস্তবক আসমানের কোনও একটি স্তবকে (আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় অন্য একটি গ্যালাক্সিতে)। কাজেই জিন আছে। জিন থাকলে দুনিয়ায় তাদের আনাগোনা ঠেকাবে কে?"[৬]

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রোজি ও রুকুর কাছে আমরা পেয়ে যাই লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। রুকুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় লৌকিক ছড়া - *'ফরাজিদের নামাজ পড়া/ঢেঁকির মতো মাথা নাড়া'*।[৭] এছাড়াও লোকসাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ প্রবাদও এখানে উঠে এসেছে, যেমন – 'ঠক বাছতে গাঁ উজোড়'।[৮] বাক্‌-কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্য এবং তার বিশেষ অঙ্গ মিথ বা কিংবদন্তি ছাড়াও লোকায়ত গ্রামজীবনের বিশ্বাস ও সংস্কার এই উপন্যাসের পরতে পরতে উঠে এসেছে। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, শফি রোজির কাছে জানতে পারে কুষ্ঠরোগী আবদুলের বউ ইকরা ওরফে ইকরাতন সম্পর্কে নানা কাল্পনিক কথকতা - *"ইকরা যে ডাইনি। আয়মনিখালার কাছে শুনো। ইকরা রাত দুপুরে গাছ চালিয়ে নিয়ে কোন্‌ দেশে চলে যায়। আবার ফিরে আসে ভোরবেলা আজানের আগে।"*[৯] কোন্‌ গাছটা চালিয়ে নিয়ে যায় সেটাও দূর থেকে রোজি তাকে দেখিয়ে দেয়। শফি জানতে পারে, *"ইকরাদের বাড়ির পেছনে ঘরের চাল ঘেঁষে একটা লম্বাটে শ্যাওড়াগাছ আছে। নিশুতি রাতে ইকরা উলঙ্গ হয়ে চুল এলিয়ে সেই গাছটাতে চড়ে বসে। মন্তর পড়ে। আর গাছটা মূলছাড়া হয়ে আসমানে উঠে যায়। তারপর শূন্যে ভাসতে ভাসতে চলে কোন্‌ অজানা দেশে। শফি প্রথম-প্রথম হেসে উড়িয়ে দিত। পরে তার অবস্থা মনে হত, হয়তো ব্যাপারটা সত্যি। জিন যখন আছে তখন ডাইনিও থাকতে পারে।"*[১০] এ উপন্যাসে জিন, মৃত ব্যক্তির আত্মা, ভূতে পাওয়া, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের কথা নানাভাবে উঠে এসেছে। কিন্তু এটাও আমরা লক্ষ করি, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের কথা এখানে উঠে এলেও তা কখনোই বাহুল্য বলে মনে হয়নি বরং কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আসলে গ্রামবাংলার জনজীবন বিশেষত গ্রামীণ মুসলমান সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বাভাবিক বাস্তবতার দাবিতেই 'অলীক মানুষ'-এ লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের ছায়পাত ঘটেছে। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের যে একাত্মতা ও গভীরতা তাকে তিনি মুনশিয়ানার সঙ্গে এ উপন্যাসে স্বকীয় ও অনবদ্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য - প্রথম খন্ড, ১৯৬২, পৃষ্ঠা. ১১-১২

২. সাক্ষাৎকার: সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কে যেন আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে, হর্ষ দত্ত (সম্পা), বইয়ের দেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা. ১২৮

৩. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, 'অলীক মানুষ' -এ আমি স্বেচ্ছাচারীর আনন্দ পেয়েছি, নাজিবুল ইসলাম মন্ডল (সম্পা.), সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ৩৮

৪. শ্যামল রায়, সিরাজের ত্রয়ী উপন্যাস, গৌরীশংকর সরকার (সম্পা.), ঐক্য পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ১৬৪-১৬৫

৫. বিপুল দাস, অলীক মানুষ : সৌন্দর্য ও বিষাদের প্রতিমা নির্মাণ, নাজিবুল ইসলাম মন্ডল (সম্পা.), সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২২১

৬. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, অলীক মানুষ, পৃষ্ঠা. ১২

৭. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২৫

৮. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৭৮

৯. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪১

১০. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪১

গ্রন্থপঞ্জী:

আহমেদ, ওয়কিল, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপনি, কলকাতা ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ, বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০০৫

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য - প্রথম খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬২

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪

সরকার, পবিত্র, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯১

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, উপন্যাস সমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, উপন্যাস সমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, উপন্যাস সমগ্র ৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, অলীক মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, নানা রসের ৬টি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২

সেনগুপ্ত, পল্লব, লোককথার অন্তর্লোক, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০০০

দত্ত, হর্ষ (সম্পা), বইয়ের দেশ, এবিপি প্রা: লি:, কলকাতা, ৭বর্ষ ৪ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

মন্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পা), সমকালের জিয়নকাঠি : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, নাজিবুল ইসলাম মন্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩

সরকার, গৌরীশংকর (সম্পা), ঐক্য পত্রিকা : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, গৌরীশংকর সরকার, পশ্চিম মেদিনীপুর, আক্টোবর ২০১৩

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্ধমান।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে বিহারের লোকজীবন

অতীশচন্দ্র ভল্লা

সারসংক্ষেপ-

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে বিহার ওতপ্রোতভাবে স্মৃতি যুক্ত।ছোটগল্প -উপন্যাস বারবার উঠে এসেছে বিহার জনজীবন প্রসঙ্গ। লেখক তার লেখনীর মাধ্যমে বিহারের লোকজীবনের কথা, লোক সাহিত্য কথা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে শুরু করে ভৌতিক গল্পের ছবিটি বিহার প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। এমনকি বিহারের পতিতা জীবন আচার-বিচার নিয়েও তার লেখা জুড়ি মেলা ভার। সাহিত্য দর্শনের ব্যাখায় সামাজিক বক্তব্য প্রতিপাদনে ব্যোমকেশ বক্সী হয়ে উঠেছেন স্বয়ং বিহারের উপন্যাসিক ।

সূচক শব্দ-

বিহার, জনজীবন, শরদিন্দু, লোককথা, কথাসাহিত্য, লোকজীবন, ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ, মুঙ্গের,পাটনা,ভাগলপুর

মূল প্রবন্ধ-

"আমার জীবনে একটা বৈচিত্র্য আছে; আমি জন্মেছি উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরে, বড় হয়েছি বিহারের মুঙ্গের শহরে, লেখাপড়া করেছি কলকাতায়, কাজ করেছি বম্বেতে এবং বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছি পুণায়। নিখিল-ভারতীয় বাঙালী যদি কেউ থাকে সে আমি।"[১]'জাতীয়তাবোধে প্রবুদ্ধ বাঙালী লেখকের কোন সময়েই অভাব হয়নি, অখণ্ড ভারতভূমি তাঁদের জন্মভূমি-মাতৃভূমি হওয়া সত্ত্বেও কার্য'- কারণ যোগে যখন তাঁর ভিন্নভাষী রাজ্যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেছেন তখন তাঁরা প্রায়শ নিজস্ব বসত অঞ্চলের জন্য 'মন-পোড়ানি'ভাবে আক্রান্ত হয়ে উঠেছেন, কেউ কেউ, nostalgic বিরহে' সাহিত্য রচনায় নতুন করে প্রেরণাও পেয়েছেন'- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এই রকমের বিরহ-বোধে কখন আপ্লুত হন নি, তথাকথিত 'আপনঘর'-এ ফেরার জন্যে ব্যাকুলও হয়ে ওঠেন নি, (এক্ষেত্রে হলেও হতে পারত, কারণ তাঁর আদি নিবাস ছিল বরানগরের কুঠিঘাট অঞ্চল) ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিসম্বাদে ক্লিন্ন প্রাদেশিকতার ঘূর্ণিঝড়ে একটিবারের জন্যেও তাঁর মনে হয় নি 'নিজস্ব' নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া দরকার, বরঞ্চ তখনই তিনি সেই ১৯৫২ সালে স্থির করেন পুণাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন এবং বাইরের সমস্ত কিছুর বন্ধন ছিন্ন করে সর্বক্ষণের জন্যে বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন, সুতরাং ১৯৫৩ সালের মধ্যে সেই বাড়ি তৈরি হয়ে যায়, ১৫ই আগস্ট সেই 'মিথিলা'য় গৃহপ্রবেশও করেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কলকাতা বা শহরতলী অঞ্চলই হতে পারত তাঁর উপযুক্ত বাসস্থান, অন্তত ভিন্নপ্রদেশবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে সেইটাই ছিল প্রচলিত ধারা।

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে শরদিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করলেও জৌনপুর ছিল তাঁর মাতামহালয়, পিত্রালয় ছিল মুঙ্গের। (জন্ম, ১৮৯৯:৩০ শে মার্চ) পিতামহ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহোদর গোবিন্দকে নিয়ে চলে এসেছিলেন পিতৃপুরুষের আদি নিবাস বরাহনগর-কুঠিঘাট অঞ্চল থেকে পূর্ণিয়ায়। -পূর্ণিয়া কোর্টে'র সেরেস্তাদাররূপে নিয়োজিত হয়ে-ছিলেন, ভাই গোবিন্দ ওকালতির পেশা নিয়েছিলেন ঐ পূর্ণিয়া কোর্টেই। পিতা তারাভূষণও বয়সকালে আইন পাশ করে ওকালতি- জীবন অতিবাহিত।করেছিলেন এই পূর্ণিয়া কোটেই।)মধ্যবর্তী এই কয়টি বছরের কথা বাদ দিলে বলা যায় বাল্য-কৈশোর-যৌবনের উদ্দাম-উচ্ছল-সতেজ দিনগুলি অতিবাহিত করে- ছিলেন ঐতিহ্যবাহী কীর্তিধ্বজ শহর মুঙ্গেরেরই

পরিমণ্ডলে;-ফুটবল- হকি খেলে, 'বাণীমন্দিরের কনসার্ট' পার্টিতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে', থিয়েটারের মহড়া দিয়ে, আড্ডা দিয়ে আর 'চন্দ্রহাস' নামে কবিতা-গল্প লিখে।)

কলকাতার ল' কলেজ থেকে আইন পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে মুঙ্গেরে ফিরে এসে ফটেবলের দল গড়ে হৈ হৈ করে বেরিয়েছেন।) যে কোন লেখকের মূলধন হয় তাঁর পথের সঞ্চয়, অভিজ্ঞতা;- অভিজ্ঞতাগুলিকে কে কোনভাবে ব্যবহার করবেন তার মধ্যে দিয়ে 'নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা'র শেষবিচার হয় বটে,কিন্তু বনিয়াদ গড়ে তোলে ঐ পথই, ঐ সামাজিক পদচারণাই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবনের এই প্রাথমিক কাজটিই করে দিয়েছে মুঙ্গেরের তৎকালীন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা, "বঙ্কিমবাবুর নভেলের মুঙ্গের কেমন জানিনে, কিন্তু প্রকৃত মুঙ্গের যা বারো মাস সমান থাকে এবং যার চোখ আছে সেই দেখতে পায়-সেই মুঙ্গের বাস্তবিকই এত সুন্দর ও এত romantic- অর্থাৎ এত romantic ভাব মনে মনে আনে যে আমি কখন কল্পনাও করিনি মুঙ্গের শহর মুঙ্গের দুর্গ' হতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন, মধ্যে বিস্তৃত পরিখা ও উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। শহরটি জঘন্য। মানুষে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটাকে যে রকম বিশ্রী করে তুলতে পারে সেইরকম বিশ্রী।"[২]

গল্প-উপন্যাসে ঐতিহাসিক রসসৃষ্টিতে এবং অতিলৌকিক অলৌকি- কতার বিস্তারে অধিকাংশ বিশ্বজনই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনায়াস সাফল্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন, সাফল্যের হেতুরূপে চিহ্নিত করেছেন তাঁর 'ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তির, 'প্রতিধ্বনি' গল্পের প্রতিধ্বনি তো কিংবদন্তীর দেশ মুঙ্গেরই একটি প্রতিধ্বনি। 'অশরীরী'তো 'দেহহীন চামেলি'র সেই লাবণ্যবিলাস যার শত-সহস্র অভিজ্ঞান নিয়ে আছে বিলাসব্যসনের শহর মুঙ্গের, ইতস্তত প্রকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কতই না তার পরিত্যক্ত অট্টালিকা।মুঘল-পাঠান আমলের প্রামাণ্য ইতিহাস, অনতিপূর্বের কোম্পানীর শাসন, বিদ্রোহী সিপাহিদের তৎপরতা, নীলকর সাহেবদের উৎপাতকে ঘিরে শতেক কিংবদন্তী মুঙ্গেরের' মায়াজগৎ'কে যেমন তিলে তিলে গড়ে তুলেছে তেমনি প্রকৃতির লীলাও এই অঞ্চলটিকে রহস্যময় করে গড়ে তুলেছে, একই সঙ্গে গিরি-প্রস্রবণ নদী বালিয়াড়ি চড়াই-উৎরাই সমভূমি বনানীর এখানে সহজ সহবস্থান ঘটেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে সহজ সহবস্থানের স্পশ' অনুভব করেছিলেন; অভিজ্ঞতার এই নিরেটে।জমি না থাকলে কি পাওয়া যায় 'চোরাবালি'র মত কাহিনী (যদিও কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে ডুয়ার্স' অঞ্চলে), ভূমিকম্পের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা ভিন্ন কি সৃষ্টি হতে পারতো 'মরণদোলা' কি 'নন্দনগড় রহস্য'- এর মত গল্প?

যে কোন রসের গল্প হোক, গল্পের জন্যে দরকার নির্দিষ্ট পরিবেশ- পারিপার্শ্বিকতা, আর এই পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির জন্যেই লেখকের অজ্ঞাতসারে হলেও এসে উপস্থিত হয় অভিজ্ঞতার জগৎ, লোকজীবননিচয় আশ্চর্য নানান তথ্য। অলৌকিক রসের গল্প 'মধুমালতী', 'চিরঞ্জীব', লৌকিক জীবনের গল্প 'চিড়িকদাস', 'কিন্টোলাল'-এ এই প্রক্রিয়াতেই বিম্বিত হয়ে ওঠে পুণাশহর, মারাঠা জনজীবন, দিল্লীর লোকপরিমণ্ডল। বরদার কাহিনীগুলিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয়। দশকের বিহার প্রদেশ, বিশেষত মুঙ্গের শহর ও তৎসন্নিহিত প্রাকৃত। জীবন। এই প্রসঙ্গে আসতে পারে 'রক্ত-খদ্যোত' 'টিকটিকির ডিম' 'মরণ-ভোমরা', 'অশরীরী', 'সবুজ চশমা', 'বহুরূপী', 'প্রতিধ্বনি', 'আকাশবাণী', 'শূন্য শুধু শূন্য নয়', 'নীলকর', 'নখদর্প'ণ', 'কামিনী', প্রভৃতি গল্পগুলি। সমস্ত কাহিনীগুলিই গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে, যে ক্লাবের সভ্য অতিঅবশ্যই প্রবাসী বাঙালীরা, দিনান্তে সবাই এসে যেখানে উপস্থিত হয়, পরস্পরে কুশল সংবাদ বিনিময় করে; গল্প রঙ্গ-রসিকতা করে, শুধু অদ্ভুৎ করে দূরে সরিয়ে রাখে রাজনৈতিক আলোচনা, কারণ, 'আইন বিরুদ্ধ। বেহার প্রদেশে বাস করিয়া বাঙালীর ক্লাব করিতে হইলে ঐ রকম গুটিকয়েক আইন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

দেবতা-অপদেবতা- ব্রাহ্মণ মনিবদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অটল ভক্তির ভাব নিয়েই তারা তাদের অভাব-দীর্ণ' দিনগুলি অতিবাহিত করে চলে; 'স্টেশনের একমাত্র কলি স্টেশন মাস্টারের হুকুমে অদূরবর্তী তালগাছে চড়িয়া তাড়ির ভাঁড় পাড়িতে' যায় প্রয়োজনে সন্নিকটস্থ দোকানের মুদিই খরিদ্দার দোকানে বসিয়ে রেখে কুলির মাল বয়ে নিয়ে চলে, অদ্ভুত তাদের যুক্তির জগৎ, মানুষের জীবন ধারণের জন্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির যখন প্রয়োজন, ভূতেরও তেমন 'ভোগ'-এর প্রয়োজন হয়, পালা করে তাই 'দেও'-এর উদ্দেশ্যে 'ভোগ চড়ান' হয়, একদিন এক এক রকমের,-'লাড্ডু, মিঠাই, পকৌড়ি, পুরি, হালুয়া' 'পাঁটলি বে'ধে' নিকটস্থ পাকুড়গাছে তাই টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

এই পর্যায়ের সেরা গল্পটি নিঃসন্দেহে 'নীলকর'। 'বরোদার জবান- বন্দীতে' দিশিভূত বিলিতি ভতে, ভালোমানুষ ভূত, দুর্দান্ত ভূত প্রভৃতি নানাভাতের পালা সঙ্গে হয়ে যাবার পর অদ্ভুত এক কিংবদন্তীর প্ররিপ্রেক্ষিত নিয়ে শুরু হয়েছে অশ্লীল ভূত'-এর গল্প। গল্পটির কাহিনীবৃত্ত নির্মাণে, চরিত্রচিত্রণে যেমন দেখা যায় নিপুণ মুন্সীয়ানা, তেমনি দেখা যায় তীক্ষন সমাজচেতনা। মজঃফরপুরের এক দেহাতের লোক জীবনের যে সুন্দর আলেখ্যটি ফ.টে উঠেছে তা এককথায় অতুলনীয়। কাহার, ধানুক প্রভৃতি নিচের তলাকার মানুষেরাই এই গ্রামের গরিষ্ঠাংশ, জমির সঙ্গে যুক্ত থেকেই এদের জীবিকা। পূর্বে যেখানে তারা নীলকরের গোলামি করে নীল চাষ করত, এখন সেখানে জমিদারের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে ধানের চাষ, আখের চাষ করে। যেখানে একদা ছিল 'নীলের কুঠি', এখন সেখানেই গড়ে উঠেছে 'কাছারি বাড়ি', চাষের মরসুমে শহর থেকে জমিদারের প্রতিনিধি এসে 'ফরাস বিছিয়ে তাকিয়া। নিয়ে' বসলে তাদের সেখানে সাধ্যমত 'সেলামি' নিয়ে আসতে হয়।

শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্পগুলি অনেক ক্ষেত্রেই আজগুকি ভৌতিক কল্পনার চরম সীমা স্পর্শ' করেছে, অনেকটাই যেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভট কল্পনাবিলাসের এক অতি-বিলম্বিত, যুগপরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন পুনরাবির্ভাব, তা সত্ত্বেও কতকক্ষেত্রে গল্পোক্ত ঘটনা- সংস্থান, গ্রন্থিবন্ধন এবং নানান প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে যুগ পরিবেশের চিহ্নগুলি যে বহন না করেছে তা নয়। লেখক যদি সত্যিকারের লেখক হন, দীর্ঘ লেখক জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ভোগ করতে চান, তবে কখনই তিনি সম্পূর্ণ' কল্পলোক বা মায়াজগতের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে তাকে নেমে আসতে হয়ই লোকজীবন ও যুগপরিবেশ মধ্যে, কল্পলোক নির্মাণের প্রকরণগুলি তুলে নিতে হয় চলতি জীবনেক্স সঞ্চয় থেকেই।মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় তাঁর সমাজ সংযোগের পরিচয় দেখে, সমাজ জিজ্ঞাসার ঋজ স্পষ্ট উচ্চারণ শুনে-এক্ষেত্রে 'অষ্টমে মঙ্গল' ও 'অপদার্থ' গল্পদুটির কথাই মনে আসে।

বিহারের গ্রামগুলির সামগ্রিক পশ্চাৎপদতা'[৩] শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতায় সম্ভবত একটা স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, তিনি দেখেছিলেন জীবন ও জীবিকাগত প্রথাবদ্ধতায় শ্রম শক্তির বিপুল অপচয় ; নিচের তলার মানুষ যেমন এর ফলে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটাতে পারে না, উপরতলার মানুষও তেমন ক্রমশ হারিয়ে ফেলে তার উদ্যম-উদ্যোগ ও প্রয়োগ বুদ্ধি। 'দিয়ারা মনপজ্খল' এর বর্ধিষ্ণু জোতদার সম্পৎ সিং-এর ছেলে ভূপৎ সিং মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থার পরিমন্ডলে কাজের উৎসাহ প্রেরণা হারিয়ে নিষ্কর্মা অপদার্থ বলে পরিগণিত হয়েছিল।প্রত্যেক লেখকেরই জীবন সম্পর্কে' কিছু বক্তব্য, অভীৎসা থাকে,- (লেখক কেন, সামাজিক মানুষ মাত্রেই) শরদিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সম্পর্কিত অভীৎসাটি হল, প্রত্যেক মানুষ হবে শিষ্ট, ভদ্র, স্থিরীকৃত মূল্যবোধ গুলিতে নিষ্ঠ সত্যিকারের মানুষ। "'দীর্ঘ' তপস্যার ফলে' মানুষ এই মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে, এই মনুষ্যত্বের পরিমণ্ডলটিকে তাকেই সযত্নে রক্ষা করে চলতে হবে", [৪] কিন্তু কার্যত তিনি দেখেছিলেন মানুষের পতন হয় পদে পদে, কখন ব্যক্তির রক্তের মধ্যেই থাকে তার বীজ, কখন সামাজিক বন্দোবস্ত বা সমাজ ব্যবস্থাই হয় বীজাধার।

তিনি একের পর এক 'ব্যোমকেশ কাহিনী' গুলি লিখে গিয়েছেন, কিছু সামাজিক বক্রোক্তি, মৃদু প্রতিবাদ যে এইসব গল্পগুলিতে কিছু নেই তা নয়, "কিন্তু মূলত তিনি সমাজ-চরিত্র বিশ্লেষণকে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ বলেই পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন, প্রচলিত সমাজ জীবনের মধ্যেকার দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, বৈচিত্র্য-বিস্ময় নিয়েই বিভোর হয়ে থাকতে চেয়েছেন; "[৫]।এ বিষয়ে অত্যদ্ভুত এক ক্রান্তিবৃত্ত রচনা করে নিয়েছিলেন, তথাপি সর্বদা তিনি যে সে গতিপথকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন তাও নয়, তাই সমাজবিধির লৌহ নিগড়ে বন্দী মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় তাঁকে মধ্যে মধ্যে অশ্রুপাতও করতে দেখা যায়। 'মন্দলোক' এমনই একটি গল্প। বিহারের পতিতা জীবনের আচার-বিচার সংস্কার নিয়ে এই গল্পটি রচিত হয়েছে। সমাজ নির্ধারিত চৌহন্দির মধ্যে থেকে পতিতাটি মুক্তি পায় নি, মুক্তির অর্থই তার অজানা, সে জানে শুধু ব্যবসার কথা, এও জানে এ ব্যবসার সঙ্গে স্বাস্থ্য-যৌবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক', তাই সে এখন চায় স্বাস্থ্যবতী উভিন্ন যুবতী মেয়ে ঋতুকে ব্যবসায় নামাতে, 'ইহাদের নাকি নানপ্রকার শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান আছে, ঘটা করিয়া কার্যারম্ভ করিতে হয়। ঋতুর শুভ বলিদান কার্য'টা আমার মত সৎপাত্রের দ্বারাই ঋতুর মাতা সম্পন্ন করাইতে চায়,' কারণ সে কৃতজ্ঞ গল্পের কথক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারটির উপর, সেই একদিন তার রোগ- গ্রস্ত মুমর্থ্যে মেয়েটিকে পথ্য ও চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স' কর্তৃক প্রকাশিত 'শরদিন্দ অমনিবাস'-এর পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম খণ্ডে লেখকের গল্পগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি ঐতিহাসিক গল্পকে অন্যত্র রাখলে তাঁর লৌকিক-অলৌকিক জগৎ-এর উপর লেখা গল্পের সংখ্যা হয় ১৬৬টি। এতদ্ব্যতীত চতুর্থ খন্ডের কিশোরপাঠ্য গল্পগুলির মধ্যেও অন্তত ৫টি গল্প আছে যেখানে প্রাকৃত জীবনেরই চিত্র-চরিত্র। অর্থাৎ একত্রীকরণে দাঁড়ায় ন্যূনপক্ষে ১৭১টি গল্প। এর মধ্যে বড় বেশি হলে ৩০টির মত। গল্প হবে যেখানে বিহারের প্রত্যক্ষ পটভূমিকায় গল্পগুলি রচিত হয়েছে, এরই মধ্যে আছে 'মরণদোল'-এর মত গল্প, যেটিকে গল্প না বলে 'রিপোটাজ' বলাই সঙ্গত। ১৯৩৪ (১৩৪০) খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানু- য়ারীর (১লা মাঘ) মুঙ্গের তথা বিহারের আড়াই মিনিট স্থায়ী সেই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প, চল্লিশ হাজার মানুষের নিবাস মুঙ্গের শহর যাতে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হয়েছিল, সাত হাজার মানুষ সমাধিস্থ হয়ে পড়ে- ছিলেন,এই ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে নানান চরিত্রের নানান প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাই এই গল্পের প্রতিপাদ্য)।

('কানু কহে রাই', 'ঘড়িদাসের গুপ্তকথা', 'অবিকল', 'ভাগ্যবস্তু', 'নিষ্পত্তি', 'রোমান্স' প্রভৃতি গল্পগুলির পটভূমিকা বিহার ভূখণ্ডই, গল্পগুলি বহুপঠিত, জনপ্রিয়।' এতদতিরিক্ত কিছু গল্প আছে যে- গুলির পটভূমিকাও বিহার, যদিচ সেগুলি স্বল্পপঠিত; আসলে সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে এক জায়গায় মিল আছে, সেটি হল এক্ষেত্রে পটভূমিকা শুধুই দৃশ্যগত, গল্পগুলিতে স্থানীয় জীবনের কোন রঙই লাগেনি, লোকজীবনের কোন খবরাখবরই পাওয়া যায় নি।লক্ষণীয়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের সংখ্যাগত প্রাচুর্য', বিষয়- বস্তু ও পটভূমিকাগত বৈচিত্য, কোন আঞ্চলিক পটভূমিকায় নাতিনি গল্প লিখেছেন;-বাংলা, (অবিভক্ত) বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, দিল্লী, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণভারত। (ঐতিহাসিক গল্পগুলি এ অংশে উল্লেখিত হচ্ছে না) এই বিপুল বিস্তৃতির কারণ বিশিষ্টতা মণ্ডিত জনজীবনের প্রতি কোন বৈজ্ঞানিক আসক্তি নয়, নূতনয়ের স্বাদ রোমান্সের গন্ধ নিয়ে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে সচেষ্ট হওয়া, মানুষের জীবন যে কত রহস্য- ময় কত রোমাঞ্চকর তাই সারা মন দিয়ে অনুভব করতে চাওয়া। জন- জীবনের প্রতি লেখকের সত্যিকারের আসক্তি যদি জন্মায় তবে লেখক কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্দিষ্ট পরিধি কেন্দ্রিত হয়ে পড়তে বাধ্য, তখন তিনি ডান স্থির ও অচঞ্চল দৃষ্টিতে জীবনকে দেখতে, নির্বিশঙ্কভাবে মন্থন করতে এবং মন্থনজাত সেই বিষামতকে তুলে ধরতে।জীবন সম্পর্কিত এই অতলান্তিক জিজ্ঞাসা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি, এসেছেন 'প্রজাপতি-বৃত্তি অবলম্বন' করে নতন নতেন রসরূপের সন্ধান করতে, যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছেন Hall caine, Rider Haggard, Conan Doyal এর রোমাঞ্চকর উপকথা-রসে।

গল্পের মত শরদিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা পর্যাপ্ত। গোয়েন্দা উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস-এই তিন শ্রেণীতেই উপন্যাসগুলি মূলত পৃথকীকৃত। যদিচ গোয়েন্দা উপন্যাস বা 'বোমকেশ-উপন্যাস' গুলিকে সামাজিক উপন্যাস নামেও চিহ্নিত করা যেতে পারে, প্রতিটি কাহিনীবৃত্তের মধ্যে পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস আছে, ব্যবহারিক জীবনের সমাজবদ্ধ মানুষের সমস্যাও আছে, বিশেষত্বের মধ্যে সব কটি সমস্যার সমাধানই হয়েছে বাঙালী গোয়েন্দা ব্যোমকেশের মাধ্যমে। 'দাদার কীর্তি', 'বিষের ধোঁয়া', ছায়া পথিক', এই তিনটি সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ব্যোমকেশ-কাহিনীর ৩৩টি উপ- ন্যাসকে যুক্ত করলে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬টি।)দাদার কীর্তি' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস, ২৮. ২৬ এযাবৎকাল অপ্রকাশিতই ছিল, লেখকের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে ১৩৮৩ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়,জেনারেল ন্যাপলা', 'গাধার কান', 'স্বামী চপেটা- নন্দ'র নেপাল গিরীণ-সমরেশ-টুন, প্রণব-সুধার প্রাণচাঞ্চল্য যা টাউন- স্কুল-মিশন স্কুলের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা কি 'চড়বাবাজী'কে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, 'দাদার কীর্তি'তে সেই চাঞ্চল্যে রোমান্সের রঙ ধরেছে, সমস্ত উদ্দীপনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কেদার-সরস্বতীর সম্পর্কে', সন্তোষ-অমূল্য-অনাদি-চুনি-প্রভাত-বরদা হযী-পৃথ্বীদের ভাবগতিকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বয়ঃসন্ধির সব লক্ষণ- জুলি।' 'রচনার উপভোগ্যতায় এবং কৌতুক রস প্রবাহের' দিক থেকে আচার্য' সুকুমার সেন এই উপন্যাসটিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

উপন্যাসটি এলাহাবাদে রচিত হলেও পটভূমিকারূপে চিত্রিত হয়েছে শহর মুঙ্গেরেরই পরিমণ্ডল। যদিও স্পষ্ট করে কোন অংশেই স্থানের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে, 'পশ্চিমের কোন শহর'। কিন্তু যে ক্লাবের বর্ণনা আছে তা নিঃসন্দেহে মুঙ্গেরের প্রবাসী বাঙালীদেরই ক্লাব। স্বরদার গল্পগুলিতে এই ক্লাবেরই যথেচ্ছ উল্লেখ আছে, 'মরণদোল' গল্পে এই ক্লাবের সভ্যদের ১৩৪০-এর ভূমিকম্পে বিপন্ন মুঙ্গের শহরবাসীদের উদ্ধার ও সেবাকার্যে' আত্মনিয়োগের কথাও আছে। এটি উপন্যাস, স্বভাবতই এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশও আছে,-'একটি ক্ষুদ্র একতলা বাড়িতে আমাদের ক্লাব।বিহার জীবনের পটভংমিকায় শরদিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প- উপন্যাসগুলিতে প্রবাসী বাঙালী সম্পর্কে' একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, প্রবাসী বাঙালীরা সর্বত্রই একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে ভোলে, ক্লাব, অন্ডো এবং সর্বশেষ যার সম্প্রসারিত রূপ হয় 'বাঙালী টোলা'।ব্যোমকেশ ও বরদা' উপন্যাসটিও মুঙ্গেরের পটভূমিকায় রচিত, পরিমণ্ডলও সেই বহু আলোচিত প্রবাসী বাঙালী সমাজ।চিত্রচোর' উপন্যাসটির পটভূমিকা সাঁওতাল পরগণা' 'এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী।নবোদ্ভূত আলোকপ্রাপ্ত 'নতুন-আধুনিক বিহার'কে প্রত্যক্ষ করা যায়, যে প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ হিসাবে ঐতিহাসিক কারণেই মনে করে ঐতিহ্যবাহী সুশিক্ষিত বাঙালী সমাজকে, তাই তার নিঃশ্বাসেপ্রশ্বাসে আচরণে বাক্য ব্যবহারের প্রতিটি পদক্ষেপেই ছড়িয়ে চলে বিদ্বেষের বিষ, বিহার ভূখণ্ড থেকে সমূলে উৎখাত করাই যার একমাত্র পবিত্র অঙ্গীকার।

কিন্তু তার কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় না। দীপনারায়ণ সিং বিহারের জমিদার শ্রেণীর সেই প্রতিনিধি, যাঁদের রক্তে আছে বিদ্যার সঙ্গে বিত্তের মিশ্রণ, বাঙালী বুদ্ধিজীবী তাঁদের কাছে কোন শত্রুপক্ষ নয়, প্রিয় পরিষদ। তাই জগন্নাথের কার্য কলাপে যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হয়ে বলে ওঠে, 'এরাই হচ্ছে নতুন যুগের বিহারী।বিহার বসবাস কালীন প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে 'নতুন যুগের বিহারী' রূপে একদিকে যেমন দেখেছিলেন জগন্নাথ প্রসাদদের তেমনি একইসঙ্গে দেখেছিলেন পুরন্দর পান্ডেদের, যাদের স্বভাবে আছে পরশ্রীকাতরতা, বৈরিভাবাপন্নতার পরিবর্তে প্রাদেশিকতামুক্ত উদার মানবিকতা, যারা অধমণে'র হীনম্মন্যতা নিয়ে অগ্রস্থিতকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে না, পরন্তু সঙ্গ-সান্নিধ্যে, নিরন্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ থেকে সমদ্ধতর করে তোলবার চেষ্টা করে। পুরন্দার পাণ্ডে এই শ্রেণীর মানুষেরই প্রতিনিধি। 'চিত্রচোর', 'দুর্গ'রহস্য', 'বহ্নি-পতঙ্গ', উপন্যাসে সর্বত্রই তার আছে প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি। 'নন্দনগড়' রহস্য গল্পের হনুমন্ত সিং-রঘুবীর সিং পিতা- পুত্রের মানসিকতার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় এই একই

উদারতা। সামাজিক আচার জাতকর্মের প্রভেদ সত্ত্বেও যেখানে প্রতিবেশী বাঙালী সম্পর্কে বিজাতীয় কোন বিদ্বেষ বা অসহিষ্ণুতার মনোভাব নেই, পরন্তু আছে সমাদরের মনোভাব, মনোজ্ঞ পরিবেশে সহবস্থানের ঐকান্তিক আগ্রহ।

যদিও এই গল্পটিতে আরো অধিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল; বাঙালী বিহারীর মধ্যেকার সম্ভাব-সম্প্রীতির কার্যকারণ, স্থানীয় লোকজীবনের প্রচলিত প্রথা, 'ভ'ইয়া, রাজপুত কামার কুমোর ময়রা গয়লা জুতোর নাপিত' এইসব কিছু নিয়ে এক বিশাল পটভুমিকা মেলে ধরতে পারা যেত, কিন্তু সমস্ত সম্ভাবনা সম্ভাবনার স্তরেই থেকে যায়, গল্পকার অকস্মাৎ চলে যান লোকজীবন পর্যালোচনার বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করে ঐতিহাসিক কল্পনার রাজবর্ত্মে',-পাঁচশো বছর আগের নন্দনগড় সেখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, অতীতের সেই জীবন রহস্য একালের দুই কিশোর 'পাঙ্খা' আর 'হনু'কে গ্রাস করে নেয়। মুঙ্গের ত নিশ্চয়ই, মুঙ্গের ব্যতিত বিহার ভূখণ্ডের সর্বত্রই প্রায় ছড়িয়ে আছে বড় ছোট অনেক গড় বা দুর্গ'। 'সুবে বাংলা'র আমল থেকেই এই দুর্গগুলি গড়ে উঠেছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহীরা এই সব দুর্গের অনেকগুলিকে আশ্রয় করেই করেছে শেষ প্রতিরোধের সংগ্রাম। কিংবদন্তী খ্যাত এইসব দুর্গগুলি শরদিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল গোচরস্থিত। আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী উপন্যাস লিখতে এসেও প্রায়শই ফিরে ফিরে তাকিয়েছেন সেই সমস্ত দুর্গগুলির দিকে। সাঁওতাল পরগণার পটভামিকায় 'দুর্গ'রহস্য' এমনি ধরণের এক উপন্যাস।

উপন্যাসোক্ত ঘটনাকাল বিংশশতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক, পরিমণ্ডল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক জীবনের; যেখানে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে সদাসর্বদা একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে থাকে, পারস্পরিক সম্পর্ক' দাঁড়ায় ক্লেদ ক্লিন্ন তিজতায়, অথচ আভিজাতিক প্রথা বজায় রাখার জন্যে বৎসরান্তে একবার পরিবারের সকলে মিলে 'জঙ্গলের মধ্যে বনভোজনে' যায়, তখন 'বনের মধ্যে চাঁদোয়া টাঙানো হয়; ভৃত্যেরা পাঁঠা কাটিয়া রন্ধন করে; ছেলেরা বন্দুক লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পশুপক্ষীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্তা চাঁদোয়ার তলে বসিয়া চাঁদমোহনের সঙ্গে দু'চার বাজি দাবা খেলেন, তারপর অপরাহ্নে সকলে গৃহে ফিরিয়া' আসে। অনাথায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান; 'খাস-আবাদী জমি থেকে সম্বৎসরের আয় আসে, আর তা দিয়েই তারা যথেচ্ছ জীবন কাটায়, কেউ আফিম খায়, কেউ ভাঙ খায়, কেউ মদ খায়, আর বাসস্থান সন্নিকটস্থ স্থানে বেদেদের তাঁবু পড়লে সকলে সেখানে রাতের অন্ধকারে আসা-যাওয়া করতে থাকে, কেননা 'বেদে জাতির নীতিজ্ঞান কোনও কালেই খুব প্রখর নয়, বেদেনী যুবতী- দের রূপ যত না থাক মোহিনী শক্তি আছে। '[৬]

বেদিনী সংসর্গ ভিন্ন অন্য কারণেও তারা সেখানে যাতায়াত করে, কারণটি সাপের বিষ সংগ্রহের তৎপরতা-প্রবৃত্তিগত ভাবে তারা সাপেরই বংশধর, তুচ্ছ কলহের জের নিয়ে ভাই ভাই-এর খাবারে সংক্রামক ব্যাধির বিষ ঢেলে দেয়' কলেজ হস্টেলে সতীর্থ' বন্ধুকে বিষ খাওয়ায়।ক্ষয়িষ্ণু সমাজের আত্মপরতার ছবিই এ উপন্যাসে আদ্যন্ত থাকার কথা, থাকার কথা রূঢ় কঠিন বাস্তবতা, মোহহীন মমতাহীন জীবন বিশ্লেষণ; যে জীবনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের আসামী সনাক্তকরণ হয়ে উঠবে সমাজের সংগুপ্ত ব্যাধির দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত। কিন্তু না, এ উপন্যাস তা হয়ে ওঠে নি, এ উপন্যাসে জীবনের কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়নি, ঐতিহাসিক পারম্পর্য নিয়ে সমকালীন জীবনকে দেখার চেষ্টাও করা হয়নি, ফলে এ উপন্যাস থেকে গেছে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বহন করে 'রহস্য' উদ্ঘাটনের স্তরেই।প্রকৃতপক্ষে লেখকের মানসিকতাই এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। লেখক কোন সময়েই বাস্তবের বাস্তবতাকে বিলে- ষণাত্মক প্রক্রিয়ায় দেখতে চান না, জীবনকে দেখার নির্দিষ্ট কর্ষিত কোন জীবন-দর্শনও তাঁর নেই, নেই তীর জীবনতৃষ্ণাও; -থাকার মধ্যে আছে সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য, মেধা, বাক্‌বিভূতি আর ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তি; যে কল্পনা সময়বিশেষে লঘু-খেয়ালী এবং অবাধ- সুন্দর, ফলে যা হবার তাই হয়েছে, তাঁর রচনা চিত্তাকর্ষক গল্প- কাহিনী হয়েছে, পরিপ্রেক্ষিত জনজীবনের ভিতর-বাহিরের পরিচয়লিপি তেমন করে তুলে ধরতে পারেনি।

তথ্য সূত্র :

১. শরদিন্দু অমনিবাস সপ্তম খন্ড চলচ্চিত্রের প্রবেশিকা, পাতা -৩৫২

২.তদেব , ষষ্ঠ খন্ড, পাতা -৪১২

৩.Economy of Bihar :S. R. Bose, P. I

৪. শরদিন্দু , অমনিবাস দ্বিতীয় খন্ড আদিম রিপু, পাতা -৮৫

৫. সাহিত্য বিতান :-বর্তমান বাংলা সাহিত্য, মোহিতলাল মজুমদার,পাতা -৩৭৫

৬. শরদিন্দু অমনিবাস,দ্বিতীয় খন্ড, ব্যোমকেশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পাতা-৬২৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দোপাধ্যায় শ্রীকুমার,বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ,কলিকাতা ৭৩

২.The Creation of Modren Bihar : V. C. P Chaudhary, Yugeshwar Prakashan,Delhi, India 1964

....

স্বাধীন গবেষক,বাংলা বিভাগ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় এবং পাণ্ডব গোয়েন্দা : একটি আলোচনা

বিকাশ মান্ডী

সারসংক্ষেপ-

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো গোয়েন্দা কাহিনি শাখাটিও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। কখনো সারানুবাদ কখনো ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে।প্রথম দিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের উদ্দেশ্য করে পরবর্তীতে শিশুকিশোরদের উদ্দেশ্যেও গোয়েন্দা কাহিনি লেখা হতে থাকে। নানা সমস্যাকে অতিক্রম করে বর্তমানে গোয়েন্দা সাহিত্য নিজস্বতায় সাহিত্যের দরবারে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আলোচনায় উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা সাহিত্যের আবির্ভাব। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখের লেখালেখির মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির সূচনা। এঁদের পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোয়েন্দা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। এরপর উল্লেখ করা যায় নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনির পর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আশি নব্বইয়ের দশকে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা কাহিনি বিপুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের সমকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আশি'র দশকে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার সূচনা কিশোর বয়সেই 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তিনি পনেরো বছর বয়সে মা বাবার সঙ্গে কামাখ্যা দর্শনে যান। ফিরে এসে 'কামাখ্যা ভ্রমণ' নামে একটি লেখা তৈরি করেন। যা 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি মূলত ছোটদের জন্যই লেখালেখি করেছেন। একাধিক পত্রিকায় তিনি ছোটদের বিভাগে লিখেছেন। যেমন - 'শারদীয়া বসুমতী', 'জনসেবক', 'শুকতারা', 'শুভতারা', 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনী', 'আনন্দমেলা', 'দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। রমাপদ চৌধুরী, সাগরময় ঘোষ, অবধূত, কবি বিমল মিত্র, সুনীল বসু প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত এই লেখকের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সাধনার সূচনা এবং ১৯৬১ সাল থেকে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'র সাথে যুক্ত থাকলেও ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'ই লেখককে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান তিনি ২০১৭ সালে। রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনি, ভৌতিক গল্প, ভ্রমণ কাহিনি লিখলেও সাহিত্য জগতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বা খ্যাতি লাভ করেছেন গোয়েন্দা কাহিনি সৃষ্টিতে। লেখক কিশোর বয়স থেকেই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছিলেন। মূলত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও ভ্রমণপিপাসু, তাই দেশে দেশে ঘুরে যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর কিশোরমনস্ক গোয়েন্দা কাহিনি পাণ্ডব গোয়েন্দা কাহিনির নান দিক তুলে ধরা হয়েছে।

মূল শব্দ-

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, বাংলা কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, জনপ্রিয়তা, পাণ্ডব গোয়েন্দা,নতুনত্ব, বৈশিষ্ট্য।

মূল প্রবন্ধ-

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের আবির্ভাব এবং বিকাশ পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা কাহিনি শাখাটিতেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট। কখনো তা হয়েছে আক্ষরিক অনুবাদের মধ্য দিয়ে আবার কখনো তা হয়েছে ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির সর্বপ্রথম নিদর্শন ষোড়শ শতাব্দীতে পাওয়া গেলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যথার্থ গোয়েন্দা কাহিনি রচনার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে, পুলিশি কাহিনি দিয়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা কাহিনির আমদানি হয়েছে ইংরেজি থেকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে পুলিশি ব্যবস্থা চালু হয়। সেকালে ঠগী ও ডাকাতদের অত্যাচার উপদ্রব বন্ধ করার জন্য ইংরেজ সরকার কমিশনার শ্লীম্যানের অধীনে কয়েকজন দারোগা নিযুক্ত করেন, যাদের অন্যতম বরকতউল্লা নামক এক চতুর বাঙালি যুবক। তাঁর অসামান্য চাতুর্য ও ধূর্ততার জন্য লোকের মুখে তাঁর নাম হয়ে দাঁড়ায় বকাউল্লা বা বাঁকাউল্লা। পরবর্তীকালে, জনৈক ব্যক্তি ঠগী কমিশনের ফাইল থেকে তাঁর কাহিনিগুলি উদ্ধার করে প্রথমে ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। এর অনেককাল পরে বইটি বাংলায় অনূদিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। প্রখ্যাত সমালোচক ও অধ্যাপক সুকুমার সেন গ্রন্থটি সম্পাদনা করে ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে এ. কে. পাবলিশার্স থেকে প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে চর্চাপদ থেকে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' নামে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিল ও জনপ্রিয় হয়েছিল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর'। লেখক স্বয়ং কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশের সাথে যুক্ত থাকাকালীন দীর্ঘ কর্মজীবনে ব্যক্তিগতভাবে যেসব মোকদ্দমার সাথে যুক্ত ছিলেন সেগুলিই তিনি কাহিনির আকারে 'দারোগার দপ্তর'এ প্রকাশ করেন। 'দারোগার দপ্তর' শুধু শহরে নয়, গ্রামেও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্র বাঙালির ঘরে এর দু'চার সংখ্যা দেখা যেত। একথা অনস্বীকার্য যে, এর আগে এরূপ ধারাবাহিক কোনো গোয়েন্দা কাহিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। এই সিরিজের প্রথম গল্প ছিল 'বনমালী দাসের হত্যা'। এছাড়া আরো প্রকাশিত হয়েছিল 'যমালয়ের ফেরতা মানুষ', 'জুয়াচোরের বাহাদুরি', 'অদ্ভুত হত্যা', 'চোরের গাড়ি চড়া', 'চোরে চতুরে', 'চোরের চক্ষুদান' ইত্যাদি। 'দারোগার দপ্তর'ই প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত ধারাবাহিক গোয়েন্দা কাহিনি সম্বলিত পুস্তিকা।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক অন্যতম একজন সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। তাঁর এই গ্রন্থে নানারকম দেশি বিলাতি কাহিনি থেকে কেচ্ছা ও ক্রাইমের ঘটনা নিয়ে সেগুলি মিলিয়ে মিশিয়ে এক অদ্ভুত স্বাদের রহস্য ও রোমান্স সৃষ্টি করেছেন।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের অগ্রগতিতে 'ভারতী' পত্রিকা ও 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছিল। 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা 'চুরি না বাহাদুরি' নামক একটি গোয়েন্দা গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দেখিয়েছেন ঘটনা পরিকল্পনা এবং কাহিনি বর্ণনায়।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে গোয়েন্দা কাহিনিতে কল্পনার রং চড়িয়ে গোয়েন্দা কাহিনির জগতে চমক আনলেন পাঁচকড়ি দে। তাঁর রচনাগুলি পুরোপুরি মৌলিক নয়, দেশীয় স্থান কাল পাত্রে পরিবেশিত বিদেশি কাহিনি। তাঁর রচিত প্রথম কাহিনি হলো 'সতী শোভনা' । এছাড়াও 'মনোরমা', 'মায়াবিনী', 'নীল বসনা সুন্দরী' ইত্যাদি। পাঁচকড়ি দে'র কৃতিত্ব হল তিনিই প্রথম বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে দেবেন্দ্রবিজয় আর অরিন্দম বসু নামে দুটি ডিটেকটিভ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তিনিই প্রথম কোনান ডয়েলের সৃষ্ট শার্লক হোমসের গল্পের অনুবাদ করেন, যার নাম 'হরতনের নওলা'।

পাঁচকড়ি দে'র সমসময়েই আত্মপ্রকাশ করেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর রচিত গোয়েন্দা কাহিনিগুলি ছিল মূলত ক্রাইম ও অ্যাডভেঞ্চার মূলক। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ক্রাইমকাহিনি পত্রিকা 'নন্দনকানন' সিরিজে প্রকাশিত 'অজয় সিংহের কুঠি' দীনেন্দ্রকুমারের দীর্ঘ ক্রাইম উপন্যাস। 'নন্দনকানন' সিরিজ ছাড়াও বেনামিতে দীনেন্দ্রকুমার বেশ কিছু হুনুরি উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বিখ্যাত সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় গল্প, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি ডিটেকটিভ কাহিনি রচনা শুরু করেন। তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলি হল, 'যকের ধন', 'আবার যখের ধন', 'জয়ন্তের কীর্তি', 'মানুষ পিশাচ', 'জেরিনার কণ্ঠহার', 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' ইত্যাদি। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্রের নাম জয়ন্ত ও মাণিক এবং বিমল ও কুমার। তাঁর অধিকাংশ ডিটেকটিভ কাহিনির বিষয়বস্তু বিদেশি গল্প থেকে গৃহীত হলেও কাহিনিগুলি সম্পূর্ণভাবে লেখা হয়েছিল দেশীয় ছাঁদে। তিনি নিজস্ব একটি প্যাটার্ন তৈরি করেছিলেন গোয়েন্দা কাহিনি রচনার। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন – 'বাংলা ডিটেকটিভ কাহিনীতে ইনি নতুনত্ব আমদানী করলেন দুদিকে : (১) ডিটেকটিভ ভাবনায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঞ্চার; (২) 'ত্রিশূল' ডিটেকটিভ কল্পনা'।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পর বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনি লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। নীহাররঞ্জন সাহিত্য রচনা শুরু করেন গোয়েন্দা কাহিনি দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তাই-ই লিখে গেছেন। তিনি অসংখ্য ডিটেকটিভ কাহিনি লিখেছেন। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি সিরিজের ডিটেকটিভ হলেন কিরীটী রায় এবং সহকারী সুব্রত রায়। তাঁর রচিত কয়েকটি এরূপ কাহিনি হল 'রক্ত লোভী নিশাচর', 'ড্রাগন', 'মারণ ভোমরা', 'নেকড়ের থাবা', 'মৃত্যু বান' ইত্যাদি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ব্যোমকেশকে নিয়ে রচিত তাঁর প্রথম গল্প 'পথের কাঁটা' বেরিয়ে ছিল 'বসুমতী' পত্রিকায়। ব্যোমকেশ বক্সী হলেন মূলত সত্যান্বেষী। শরদিন্দুর কয়েকটি ব্যোমকেশ কাহিনি হল 'সীমান্ত হীরা', 'সত্যান্বেষী', 'মাকড়সার রস', 'চোরাবালি', 'রক্তমুখী নীলা', 'ব্যোমকেশ ও বরদা' ইত্যাদি। অগ্রজ হেমেন্দ্রকুমার রায় কিশোরদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেও তাকে বয়স্কপাঠ্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা কাহিনিকে সাধারণ উপন্যাসের মর্যাদায় তুলেছিলেন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় তাঁর এই অবদান কোনদিনই বিস্তৃত হওয়ার নয়।

শরদিন্দুর ব্যোমকেশ এর ঠিক পরেই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব। সত্যজিতের ফেলুদা কাহিনি সকল বয়সের পাঠককে নিজের দিকে টেনে নেয়। সত্যজিতের ফেলুদা সিরিজের গল্প উপন্যাসের সংখ্যা ৩৫ টি। কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে – 'বাদশাহী আংটি', 'গ্যাংটকে গন্ডগোল', 'সোনার কেল্লা', 'বাক্স রহস্য', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ইত্যাদি।

এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় প্রতিষ্ঠিত বহু লেখক গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় হাত দিয়েছেন। কয়েকজন গোয়েন্দা লেখকের নাম ও তাঁদের সৃষ্ট গোয়েন্দার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'কল্কে কাশি', নারায়ণ সান্যালের 'শার্লক হেবো', দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রজিৎ রায়', পূর্ণেন্দু পত্রী'র 'জাম্বো', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গোয়েন্দা বরদাচরণ', অজেয় রায়ের 'শিব-দেবু', হিমানীশ গোস্বামীর 'রাজা', বিমল কর এর 'কিকিরা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু' ইত্যাদি। এরকম আরো বহু খ্যাতনামা লেখক আছেন যাঁরা গোয়েন্দা কাহিনি রচনার সঙ্গে যুক্ত। স্থানাভাবে এখানে উল্লেখ করা গেল না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখের লেখালেখির মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির সূচনা। এঁদের পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোয়েন্দা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। এরপর উল্লেখ করা যায় নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনির পর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আশি নব্বইয়ের দশকে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা কাহিনি বিপুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের সমকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আশি'র দশকে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন হাওড়া জেলার খুরুট ষষ্ঠীতলায়, ২৫ শে ফাল্গুন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। অবশ্য তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার রামনার কাছে নাড়ুগ্রাম। তাঁর সাহিত্য সাধনার সূচনা কিশোর বয়সেই 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তিনি পনেরো বছর বয়সে মা বাবার সঙ্গে কামাখ্যা দর্শনে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে 'কামাখ্যা ভ্রমণ' নামে একটি লেখা তৈরি করেন। যা 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি মূলত ছোটদের জন্যই লেখালেখি করেছেন। একাধিক পত্রিকায় তিনি ছোটদের বিভাগে লিখেছেন। 'শারদীয়া বসুমতী', 'জনসেবক', 'শুকতারা', 'শুভতারা', 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনী', 'আনন্দমেলা', 'দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। রমাপদ চৌধুরী, সাগরময় ঘোষ, অবধূত, কবি বিমল মিত্র, সুনীল বসু প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় কুড়ি বছর বয়সকালে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনী'তে লিখতেন। ওই সময় 'রবিবাসরীয়'র সম্পাদক ছিলেন রমাপদ চৌধুরী। চিন-ভারত যুদ্ধজনিত কারণে সম্পাদক তাঁকে লেখা পাঠাতে বারণ করেন। ফলত এই বিভাগে লেখা ছাপা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি 'শুকতারা'য় ছোটদের জন্য লেখালেখি শুরু করেন। ছোটদের জন্য তিনি রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনি, ভৌতিক গল্প, ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন। 'দেব সাহিত্য কুটীরে'র অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর লেখা সাবলীল হওয়ায় প্রতিটি লেখাই তিনি ছেপে দিতেন 'শুকতারা' পত্রিকায়। ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার একবার লেখককে বলেছিলেন, "শোনো আমার ওপর অনেক লেখকের রাগ আছে। তার কারণ আমি সবার লেখা ছাপি না। তিন চারটে লেখা ফেরত দিয়ে তবেই একটি লেখা ছাপি। অথচ তোমার লেখা হাতে পেলে আমি সব লেখাই ছেপে দিই।"

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারের পরামর্শেই ছোটদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় হাত দেন। ক্ষীরোদচন্দ্র বলেছিলেন, "... তোমার লেখা খুব সাবলীল। তবে দোষ হচ্ছে কখনও তুমি একরকম লেখা লেখো না। কখনও ভূতের গল্প, কখনও হাসির গল্প, কখনও বা সাধারণ মানের গল্প, কখনও রূপকথা। এভাবে লিখলে তুমি স্ট্যাণ্ড করবে কি করে? এবার থেকে তুমি গোয়েন্দা কাহিনি লেখো।" এই কথাগুলিই লেখককে উৎসাহিত করে। তিনি দারুণ আনন্দে 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র কাহিনি লিখতে শুরু করেন। 'শুকতারা'য় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা আসতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে 'শুকতারা'র সম্পাদকীয় দপ্তরের অদল বদল হলে অপটু আনাড়ি হাতে কাটাছেঁড়া চলতে লাগল

লেখককে উৎখাত করার জন্য। এমন সময় হঠাৎই তিনি লেখার জন্য ডাক পান 'আনন্দমেলা' থেকে। 'আনন্দমেলা'য় 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র কাহিনি উপন্যাসের ফর্মে বেরোতে লাগল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত এই লেখকের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সাধনার সূচনা এবং ১৯৬১ সাল থেকে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'র সাথে যুক্ত থাকলেও ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'ই লেখককে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান তিনি ২০১৭ সালে। রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনি, ভৌতিক গল্প, ভ্রমণ কাহিনি লিখলেও সাহিত্য জগতে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বা খ্যাতি লাভ করেছেন গোয়েন্দা কাহিনি সৃষ্টিতে। লেখক কিশোর বয়স থেকেই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছিলেন। মূলত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও ভ্রমণপিপাসু, তাই দেশে দেশে ঘুরে যে দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। এতদিন ধরে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় যে ত্রিশূল প্যাটার্ন এবং গোয়েন্দা ও তার সরকারীকে নিয়ে কাহিনি রচনার ধারা চলে আসছিল এক্ষেত্রে তা এক ভিন্নমাত্রা পেল। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে প্রথম টিমওয়ার্কের ভাবনা নিয়ে এলেন এই লেখক। এতদিন আমরা গোয়েন্দা চরিত্রে কোনো একজনকে দেখে এসেছি এবং তার সহকারীও একজনকে দেখে এসেছি। লেখক কিন্তু পাঁচজন কিশোর-কিশোরী চরিত্রকে নিয়ে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিকে গড়ে তুলেছেন। সঙ্গে এক চোখ কানা কুকুর - পঞ্চু। এই পাঁচ জনকে নিয়ে গোয়েন্দা কাহিনি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি পাঠ করতে করতে পাঠক চলে যান নিজস্ব নস্টালজিয়ায়। কোথাও যেন পাঠক সেই কাহিনির ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। লেখক অতি সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যান যার ফলে পাঠকমনে স্বতন্ত্র এক জায়গা প্রস্তুত করে নেয়।

লেখক প্রথমে এই কাহিনির নাম দিয়েছিলেন 'পঞ্চপাণ্ডবের অভিযান'। কিন্তু, "ভাবলাম এইরকম নাম দিলে পৌরাণিক কাহিনি ভেবে কেউ যদি না পড়ে? তাই নাম দিলাম 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। টিমওয়ার্ক হলেও লেখক সকল চরিত্রকে সমান প্রাধান্য দেননি। তাদের দলের নেতৃস্থানীয় চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন বাবলুকে। বাকি চরিত্রগুলো কাহিনিতে বাবলুর মতো সক্রিয় হলেও বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দিক থেকে অনেক বেশি সক্রিয় বাবলু।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র কাহিনি গুলি প্রথমে ছোটগল্প আকারে লিখতে শুরু করেন।'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র প্রথম থেকে নবম অভিযানের কাহিনিগুলি ছোটগল্পের আকারে লেখা, দশম থেকে পঞ্চদশ অভিযানের কাহিনিগুলি হয়ে ওঠে বড়গল্প, আর তা উপন্যাসের আকার লাভ করে ষোড়শ অভিযান থেকে। গোয়েন্দা কাহিনির প্রচলিত ফর্ম অনুসারেই লেখক কাহিনিগুলি রচনা করেছেন, অর্থাৎ প্রথমে খুব সাধারণ পরিবেশে ঘটনার সূত্রপাত, তারপর অকস্মাৎ একটি হত্যা বা অপহরণ। আর সেই সূত্র ধরেই সন্দেহ ও তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটে। প্লটের বৈচিত্র চোখে পড়ার মতো। কখনো দামী ও মুল্যবান মূর্তিচুরির প্রসঙ্গ, কখনো সোনার চোরাচালান, কখনো জাল ওষুধের ব্যবসা, কখনো অস্ত্রশস্ত্রের বে-আইনি পাচার আবার কখনো কম বয়সি ছেলেমেয়েদের পাচার প্রভৃতি সময়োপযোগী নানারকম সমস্যাই 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র কাহিনির মূল অপরাধ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।

'পাণ্ডব গোয়েন্দা' কিশোরমনস্ক গোয়েন্দা কাহিনি সত্ত্বেও খুন খারাপি জাতীয় horror element ব্যবহার করেছেন লেখক। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সাথে শত্রুপক্ষের লড়াইয়ের দৃশ্য কাহিনিতে ব্যবহার করে লেখক তাঁর সৃষ্টিকে পূর্ববর্তী

গোয়েন্দাসাহিত্যের ধারার থেকে স্বতন্ত্রতা দিতে চেয়েছেন। এই শ্রেণির গোয়েন্দারা হয় শক্তিশালী এবং অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী। এরা গায়ের জোরের প্রয়োগে বেশি বিশ্বাসী এবং এই কাহিনিগুলিতে গোলাগুলিও চলে প্রচুর।

'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র কাহিনিগুলিতে দেখি রহস্য সমাধানের সূত্রে পাণ্ডব গোয়েন্দারা পৌঁছে গেছে মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড়ে, কখনো মুম্বই, কখনো গিরিডি, কখনো ভাইজাগ, কখনো ইন্দোর, আবার কখনো গোয়া-পানাজি'তে। গোয়েন্দা কাহিনিতে খুন-খারাপি, মারামারি পরিমন্ডলের মধ্যে ভ্রমণের উপাদান যোগ করে তাতে ভ্রমণ সাহিত্যের আস্বাদ আনা, নিঃসন্দেহে লেখকের এক সাধু প্রয়াস।

ভাষা ব্যবহারের দিকেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর ভাষা যেমন স্বচ্ছন্দ, সাবলীল তেমনি টানটান উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতেও তিনি পারদর্শী। কাহিনি বর্ণনার পাশাপাশি সংলাপ রচনার সময় চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে রেজিস্টারের প্রয়োগ বৈচিত্র দেখিয়েছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ব্যবহৃত ভাষার মতোই তিনি সংলাপে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, বাবলু একটি সংলাপে বলছে – "আজকের কাগজে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লটারির রেজাল্ট মিলিয়ে দেখলাম আমি একটা ছোটখাটো অঙ্কের প্রাইজ পেয়েছি।"

আবার, অবাঙালির হিন্দি বাংলা মেশানো বাচনরীতির প্রয়োগও তিনি করেছেন। শ্যামসুন্দরজির সংলাপে দেখা যায় এর প্রয়োগ – "... হামি বেওসাদার আদমি। স্রেফ লকড়িকা বেওসা করি। ও সব সোনা-টোনার বেপারে হামি কুছু জানে না।"

এমনকি সারমেয় পঞ্চুর ভাব ভাবনা প্রকাশের জন্যেও মনুষ্যতর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন – ১) "... সে (পঞ্চু) এবার দারুণ খুশি হয়ে ওর স্বরে জবাব দিল, "ভৌ ভৌ ভৌ"।"

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোয়েন্দা কাহিনি গুলি কোনো নির্দিষ্ট সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রতিটি কাহিনির আলাদা আলাদা নাম থাকত। কিন্তু তাঁর 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র কাহিনিগুলির আলাদা করে কোনো নামকরণ করেননি। শুধু লিখেছেন, 'পাণ্ডব গোয়েন্দা – প্রথম অভিযান', 'পাণ্ডব গোয়েন্দা – দ্বিতীয় অভিযান' ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য তার বর্ণহীন অতীতকে অতিক্রম করে সাহিত্যের খাস দরবারে নিজের স্থান তৈরি করে নিয়েছে। অন্যান্য শাখায় প্রতিষ্ঠিত লেখকও আধুনিক বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় মূলত কিশোর বা ছোটদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সহায়ক গ্রন্থ

- ঘোষ, শাখী, সত্যজিতের ফেলুদা রচনাশৈলীগত অভিনবত্ব, পত্রকথা, ৯বি নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।
- চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ, পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০২০।
- চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ, পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দশম মুদ্রণ জুলাই ২০২১।

- চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ, প্রসঙ্গ : পাণ্ডব গোয়েন্দা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, ডাক -দেশবন্ধু নগর, ই এ ১/৮ বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা ৭০০০৫৯, প্রাক্ শারদ ১৪২০, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা।
- দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ, রহস্য গল্পের নায়কেরা, আত্মজা পাবলিশার্স, বসন্ত কুসুম, আড়িয়াদহ, কোলকাতা - ৫৭, প্রথম আত্মজা সংস্করণ ২০১৯।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ব্যোমকেশ সমগ্র, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০।
- বসু, সমুদ্র, ছেলেবেলা এক্সপ্রেস, বুক ফার্ম, ৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০, মার্চ ২০২২।
- সেন, সুকুমার, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- সেনগুপ্ত, জয়, বইয়ের দেশ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি, সম্পাদক সুমন সেনগুপ্ত, এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা - ১৩০-১৫১।

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

ত্রিপুরার রিয়াং জনজাতির উপাখ্যান : বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাস

ড. মৌসুমী পাল

সারসংক্ষেপ-

উত্তর ত্রিপুরার একটি পাহাড় লংতরাইকে কেন্দ্র করে বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাসটির পটভূমি গড়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের কোলে বসবাসকারী রিয়াং জনজাতির জীবন-জীবিকা, সংস্কার-সংস্কৃতির চিত্র এই উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। জুম চাষীদের উৎসব-অনুষ্ঠান-বিবাহ-জন্ম-মৃত্যু সমস্ত কিছুই যেন নিয়ন্ত্রণ করে লংতরাই পাহাড়। জুম চাষকে কেন্দ্র করে রিয়াং সমাজের অর্থনীতি এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

'লংতরাই' উপন্যাসটি লংতরাই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক বিশ্বস্ত দলিল। সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না মিশ্রিত এদের জীবন। জমির ফসল ঘরে উঠলে এরা যেমন আনন্দে আত্মহারা হয় তেমনি আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দুর্দিনের সময় এদের দুঃখ সীমাহীন। লংতরাই পাহাড় তার অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে বসে থাকে। সেই সম্পদের উপর নির্ভর করে চলে রিয়াং জনজাতির দৈনন্দিন জীবন।

অসুস্থ হলে রিয়াংরা ডাক্তার না ডেকে অচাইকে(পুরোহিত) ডেকে মুরগি কেটে পূজো দেবার কথা চিন্তা করে। এই পূজা প্রথায় বিশ্বাস রিয়াংদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ইঙ্গিত বহন করে। রিয়াং সমাজের দুর্দিনে মহাজানরা চড়া সুদে ঋণ দেয়। জুমের ফসল ঘরে উঠলে সেই ঋণ শোধ করে জুমিয়ারা। তাদের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মহাজনরা তাদের ঠকায়। তারা প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু এর থেকে এরা বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। নিজেদের সুসময়কে কাজে লাগায়।

রিয়াং জনগোষ্ঠীর এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রার বর্ণনায় বাঁক আসে উপন্যাসের শেষাংশে মহামারীর ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায়। তবে পুনরায় এরা ফিরে আসে নিজের জায়গায়। পরিবর্তনের জোয়ার দেখা যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে। যারা জুমিয়া ছিল তারা এখন রাবার চাষ করে। নতুন গঠিত জেলা পরিষদ জুমিয়াদের উন্নত করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে। মহাজনরা যাতে রিয়াংদের ঠকাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে দোকান করেছে। ছড়ার দূষিত জলের বদলে তারা পেয়েছে বিশুদ্ধ জল। তাদের ঘরের শিশুদের জন্য হয়েছে স্কুল। আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। আগের দুঃখময় জীবনকে অতিক্রম করে তারা ভালোভাবে বাঁচতে শিখেছে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিমল সিংহ লংতরাই পাহাড়ে বসবাসরত রিয়াং আদিবাসীদের উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন।

সূচক শব্দ –

রিয়াং জনজাতি, জুম চাষ, লংতরাই পাহাড়, অর্থনীতি, শোষণ, ঋণশোধ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, উত্তরণ

মূল প্রবন্ধ-

উত্তর ত্রিপুরার একটি পাহাড় লংতরাইকে কেন্দ্র করে বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাসটির পটভূমি গড়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের কোলে বসবাসকারী রিয়াং জনজাতির জীবন-জীবিকা, সংস্কার-সংস্কৃতির চিত্র এই উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। লংতরাই পাহাড়ের বিস্তীর্ণ জুম ক্ষেতে তিল, কার্পাস, চিনার, খাকলু, কুমড়া অড়হর ইত্যাদির চাষ হয়। পাহাড় কেটে এরা জুম চাষ করে।

জুম চাষীদের উৎসব-অনুষ্ঠান-বিবাহ-জন্ম-মৃত্যু সমস্ত কিছুই যেন নিয়ন্ত্রণ করে লংতরাই পাহাড়। তাই বনদপ্তর জুম চাষীদের জুম বন্ধ করে অন্যত্র সরে যেতে বললে এরা অসহায় বোধ করে। পাহাড় জুড়ে অভাব। তবুও রিয়াং অধিবাসীরা নিজেদের স্থান ছাড়তে চায় না। কাঠফাটা রোদ, বৃষ্টিহীন মাটি আর ফসলহারা জুম ক্ষেত। জুমিয়ারা কখনো কচুসিদ্ধ, কখনো বুনো আলু সিদ্ধ, কখনো কচি কলার থুর খেয়ে দিন কাটায়। ভবিষ্যৎ অনাহারের দিনগুলির কথা ভেবে তারা শঙ্কিত হয়। তারা বেঁচে থাকার অন্য উপায় খোঁজে।

'লংতরাই' উপন্যাসের প্রারম্ভে জুমের ফসল তোলার সমারোহের পাশে যুবক জরকামুনির প্রেম যেন ফসলের মতোই নানা বর্ণে রঞ্জিত। সুন্দরী নবযুবতী সাজেরুঙ জরকামুনির প্রেম নিবেদনে সাড়া দেয়। দল বেঁধে ফসল তোলা, বাঁশের ঝুড়ি 'খাড়া'য় তিল বাঁধা, টংঘরে মৃত্তিকা বাঁশের চিরুণি বানানো, বাঁশের পাখা বা মাছ ধরার চাপিলা বানানো, কৃষিকাজ শেষে দল বেঁধে ঘরে ফেরা ইত্যাদি চিত্রের মাধ্যমে রিয়াং আদিবাসীদের জীবনধারণের একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে 'লংতরাই' উপন্যাসে।

প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছন্দে ভরা জুমিয়া জীবনে অভাবের সূত্রপাত হয় জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে। জরকামুনির ঘরের খোরাক শেষ। উঠানে ধান কাটার গাই পরিত্যক্ত, শ্যাওলা ধরা। ঘরে ধান ফুরিয়ে যাওয়ার নিষ্ঠুর সংকেত। কাঠফাটা রোদ, বৃষ্টিহীন মাটি আর ফসলহারা জুম ক্ষেত। কখনো কচু সিদ্ধ, বুনো আলু সিদ্ধ, কচি কলার থুর ইত্যাদি খেয়ে দিন কাটে জুমিয়াদের।

'লংতরাই' উপন্যাসটি লংতরাই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক বিশ্বস্ত দলিল। সমালোচকের মতে, "বিমল সিংহ ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ আদিবাসী রিয়াং জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিস্তৃত পরিচয় দান করেছেন তাঁর উপন্যাসটিতে।"[১] সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না মিশ্রিত রিয়াং জনগোষ্ঠীর জীবন। জমির ফসল ঘরে উঠলে এরা যেমন আনন্দে আত্মহারা হয় তেমনি আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দুর্দিনের সময় এদের দুঃখ সীমাহীন। লংতরাই পাহাড় তার অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে বসে থাকে। সেই সম্পদের উপর নির্ভর করে চলে রিয়াং জনজাতির দৈনন্দিন জীবন। কিন্তু সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় বনদপ্তরের বাবুরা। তারা নিষেধ করে জঙ্গল কাটা চলবে না। জঙ্গলের কোন প্রাণী মারা চলবে না। জঙ্গল কাটা নিষেধ করা মানে জুম চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তারা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সিপাহীদের লাঠির আঘাতে সমস্ত প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে যায়।

এই উপন্যাসে সংকটাপন্ন জীবনের আর্তি ও উত্তরণের কাহিনী রয়েছে। পেটে যখন তাদের দারুণ ক্ষুধার আগুন তখন তাদের সম্বল বন আলু বা বন ডুমুরের গোটা। জুম চাষকে কেন্দ্র করে রিয়াং সমাজের অর্থনীতি এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে লংতরাই পাহাড়ের উঁচু টিলার গায়ে জুম ক্ষেতে লাল, হলুদ ও সবুজের সমারোহ। যৌথ শ্রমের বিনিময় প্রথায় জুমিয়ারা ফসল তোলে। অভাবে থেকে পাথর বিক্রি করে দিন কাটায় জুমিয়ারা। আবার এতে বিপদের শঙ্কা করে অনেকে পিছিয়ে যায়। জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে বিক্রি করে। কিন্তু এতেও সরকারীভাবে বাধা পড়ে। বন সংরক্ষণের নামে তাদের উপর চলে শোষণ। দিন চিরকাল সমান যায় না। ফসল উঠলে এরা ঋণ শোধ করে যেটুকু শস্য ঘরে আনতে পারে তা দিয়েই চলে তাদের জীবনোৎসব। জুমিয়ারা ভাবতেই পারে না জুম ছেড়ে অন্যভাবে বেঁচে থাকা যায়।

রিয়াং সমাজের দুর্দিনে মহাজনরা চড়া সুদে ঋণ দেয়। জুমের ফসল ঘরে উঠলে সেই ঋণ শোধ করে জুমিয়ারা। তাদের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মহাজনরা তাদের ঠকায়। তারা প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু এর থেকে এরা বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। নিজেদের সুসময়কে কাজে লাগায়। বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করে। বিয়ের অনুষ্ঠানে এরা আনন্দ করে। নিজেদের সমাজের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান করে বিবাহ সম্পন্ন করে। অভাব অনটনের মধ্যেও রিয়াং জনজাতির লোকেরা বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়। তবে এদের সমস্ত অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে থাকে এদের নিজেদের ঘরে তৈরি লাঙ্গি বা মদ। বাঁশের চোঙের মধ্যে এরা নল দিয়ে অতিথিকে লাঙ্গি দিয়ে আপ্যায়ন করে।

বিয়ের অনুষ্ঠান বা মৃতদেহ সৎকারের অনুষ্ঠান সবকিছুই জুমিয়ারা একসাথে মিলে মিশে করে। মহামারী এলে তারা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে অচাইয়ের শরণাপন্ন হয়। কঠিন অসুখে অচাই যদি মুরগি কেটে পূজা দেয় তবে তাদের কঠিন অসুখ সেরে যায় বলে বিশ্বাস। পাহাড় ও নদী তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে বলে তারা যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানে পাহাড় ও নদীকে দেবদেবীর আসনে বসিয়ে বন্দনা করে।

রিয়াং জনজাতিদের বিবাহ সম্পর্কিত কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। বিয়ের পারস্পরিক কথাবার্তা বিনিময়কে বলা হয় কৌসুমবা ওয়াখাকাইর। তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে মদ একটা মুখ্য ভূমিকা নেয়। রিয়াংদের বিয়ের আসরে কনে থাকে না। বরের পাশে ডান দিকে রাখা একটি বক্ষ আবরণী কনের প্রতিনিধিত্ব করে। বিয়ের অব্যহিত পরেই রয়েছে জামাই খাটা প্রথা। বিয়ের পর তিন বছর জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে থেকে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্ন করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়।

নবজাতকের আগমনে এরা উৎসব-অনুষ্ঠান করে। নবজাতকের নিয়ম সংক্রান্ত কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে রিয়াং জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এই নিয়ম শুরু হয়ে যায় নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই। অচাইকে ডাকা হয় নিয়ম পালনের জন্য। নবজাতক ভূনিষ্ঠ হলে তার নামকরণ এবং বেইবুনামা অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ সমস্ত দেবদেবীর কাছে নবজাতকের মঙ্গল কামনা করা হয়। নবজাতকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে পাহাড় ও নদীকে উদ্দেশ্য করে স্তুতি করা হয়।

এই উপন্যাসে লংতরাই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং আদিবাসীদের উপর বনদপ্তরের দ্বারা শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। বনদপ্তর বাজারে ঢোল পিটিয়ে ফরমান জারী করে জুম কাটা, বাঁশ, ছন কাটা নিষেধ। ফলে আইনের হাঁড়িকাঠে জবাই শুরু হয়ে যায় পাহাড়ের অসহায় জুমিয়াদের। দা, কুড়ুল কেড়ে নেয় বনদপ্তর জুমিয়াদের হাত থেকে। তসীরাম দা ফেরত আনতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে কোর্টে চালান হয়ে যায়। জুমের ফসল মহাজনের কাছে বন্ধক দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে জামিনে ছাড়া পায়। রাবেহারিয়াং জুম চাষ করার জন্য মুলিবাঁশের জঙ্গল কেটে ধরা পড়ে এক মাস জেল খাটে।

শুধু ছন বাঁশ নয়, বন্য জন্তু ধরা বা মারাও নিষেধ। চৈত্র মগ একটি দাঁতাল শুয়োর মেরে বনদপ্তরের হাতে ধরা পড়ে গরু বেঁচে তার মাশুল দেয়। জুমিয়াদের এই অসহায়তার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে লেখকের উক্তিতে – "একটা প্রবাদ আছে বাঘ নাকি সকালবেলা সূর্য প্রণাম করে বলে - প্রভু, দু'পায়া জন্তুর যেন দেখা না পাই। দু'পায়া জন্তু হচ্ছে মানুষ জীব। লংতরাই পাহাড়ের জুমিয়ারাও সকালে প্রণাম করে বলে দু'পায়া বনবাবুদের যেন দেখা না পাই।"[২]

জরকামুনির বাপ রংকারায় বনে উদাল গাছের বাকল সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে বনবাবুর কাছে। গার্ডের দল তাকে বাকল দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যায় রাঙ্গাছড়া বন অফিসে। তাকে মারধর করে। জরকামুনি খবরটা শুনে ভীত হয়। বাপকে খালাস করতে রাঙ্গাছড়া ফরেস্ট অফিসে যেতে ভয় পায়। চেলাফ্রু মগের কুড়াল আটকে রেখেছিল বনদপ্তরের বাবুরা। মুরগী বেঁচে দশ টাকা দিয়ে কুড়ুলটি ফেরত আনে সে। জরকামুনিকে পরামর্শ দেয় – "তুমিও খালি হাতে যেয়ো না। কিছু না পারলেও অন্তত এক বোতল মদ নিয়ে ওদের হাতে পায়ে ধরে দেখো ছাড়ে কিনা।"[৩]

হাসমাই রিয়াংয়ের নেতৃত্বে সবাই বনদপ্তরের এই জুলুমের প্রতিবাদ করতে চায়। শশী সরকার বলে – "আচ্ছা ভাই, তোমরা-আমরা যখন পাহাড়ে যাই, আমাদের উপর এত জুলুম। অথচ এই পাহাড়ে রবি দত্ত, মদনলাল জৈন, বেনু সাহা বড় বড় মহাজন ঠিকাদাররা সব শেষ করছে, ওদের কেউ ধরে না। এক একজন পাঁচটা সাতটা হাতী দিয়ে কাঠ টানে।"[৪] নীলকান্ত ঘোষ বলে – "আরে কি কও বুঝি না। ওরাই তো সরকার।"[৫] জুমিয়াদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে যে অভিযোগ ফুটে উঠেছে তাতে উপন্যাসে বনদপ্তর কর্তৃক তাদের উপর জুলুমের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পিতৃহীন কানুর কুড়ুল ফরেস্টাররা ছিনিয়ে নেয়। নীলকান্ত লাঙ্গলের জন্য একটা কাঠের ডাল কাটতে গিয়ে ধরা পড়ে গাই বিক্রি করে তবে লাঙ্গলের মামলা থেকে রেহাই পায়। বৃদ্ধ সপ্তরাম চৌধুরী বলে – "এই সংসারে সবচেয়ে ছোট জীব পিঁপড়া, তাদেরও খাদ্য আহরণ করার অধিকার আছে। আর আমরা মনুষ্য হয়েও সেই অধিকার কেন নেই বুঝতে পারি না। জুম বন্ধ হলে খাব কি? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জুম বন্ধ হলে না খেয়ে মরবে।"[৬] বনদপ্তর কর্তৃক জুমিয়াদের উপর জুলুমের প্রতিবাদে তাই হাসমাই নেতৃত্ব দেয় – "জুম বন্ধ করতে আমরা দেব না। জুম বন্ধ করলে আমরা যাব কোথায়। দা কুড়াল কেউ কেড়ে নিতে এলে আমরা বাধা দেবো।"[৭]

চীপ কমিশনার একশো একাশি ঘরকে কয়েকটা লুঙ্গা জমি দেখিয়েছিল চাষের জন্য। প্রত্যেককে পাঁচ কানি করে জমি মেপে দিয়েছিল। সঙ্গে চার কিস্তিতে পাঁচশো টাকা। কিন্তু পরের বছর বনদপ্তর সেই জমিতে সেগুন আর গামাইয়ের চারা লাগিয়ে দেয়। জুমিয়ারা প্রতিবাদ করলে আইনি কাগজ দেখতে চায়। অথচ তারাই বলেছিল পাঁচ বছরের আগে জমির কাগজ দেবে না। তারা পরামর্শ দিয়েছিল গরু কিনে লাঙ্গল কিনে চাষ করার। কিন্তু জুমিয়ারা বনবাবুদের কি করে বুঝাবে যে কিস্তিতে গরু কিনতে পাওয়া যায় না। আবার এইসবের জন্য ঘর প্রতি তাদের দিতে হয় কুড়ি টাকা, একটা মোরগ, এক কেজি চাল, একটা ডিম আর এক বোতল মদ। তাই এরা প্রতিবাদে সামিল হয়। কিন্তু বন দপ্তরের সিপাইয়ের লাঠির সামনে এরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়। আর বন দপ্তরের জুলুম অব্যাহত থাকে। এভাবেই বিমল সিংহ তাঁর 'লংতরাই' উপন্যাসে জুমিয়াদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার ও শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসে রিয়াং আদিবাসীদের উপর মহাজন কর্তৃক শোষণের চিত্রও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জুম নিরানীর সময় টাকার প্রয়োজনে রংকারায় ও জরকামুনি ঋণের জন্য মহাজনদের দরজায় দরজায় ঘোরে। তিনদিন হেঁটে মহাজন চৌধুরীকে রাজি করায়। তিনশো টাকা ঋণ চায় তারা। কিন্তু এর বদলে মহাজনের সমস্ত শর্তে রংকারায় ও জরকামুনি রাজি হয়। ঋণ দেবে দুইশো টাকা শোধ করতে হবে তিনশো। আর গ্রামের সর্দার অনন্ত চৌধুরীকে জামিনদার করতে হবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাপ-ছেলে সারা বাজার তন্ন তন্ন করে খুঁজে অনন্ত চৌধুরীকে জামিনদার হবার জন্য রাজী করায়। পরিবর্তে নকুলের দোকানে চা-বিড়ি আর এক বোতল মদ দিয়ে রংকারায় খুশি করে অনন্ত সর্দারকে।

মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেবার পর আসে ঋণ পরিশোধের পালা। ফসলের আগমনীতে ঋণ শোধের তাড়নায় জুমিয়ারা অস্থির হয়। যত আগে ঋণ শোধ দেবে সুদের হারও তত কম। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঋণ শোধ করতে হয় কার্তিক মাসের প্রথম দিকে। রিয়াংরা তখন পাট, কার্পাস, তিল, ধান খাড়ায় করে নিয়ে বাজারে আসে। জুমের ফসলে বাজার ছেয়ে যায় বলে বাজারদর নেমে যায়। জরকামুনি আর তার বাপ রংকারায় তিল আর কার্পাসের খাড়া নিয়ে মহাজনের ঋণ শোধ করতে আসে। তারা নিয়ে আসে মণ দুয়েক কার্পাস আর মণ খানেক তিল। কার্পাসের দাম বাজারে একশো কুড়ি টাকা আর তিল মণ প্রতি দুইশো টাকা। সবমিলিয়ে বাপ- ছেলেতে হিসেব করে মোট চারশো টাকা পাওয়া যেতে পারে। ঋণ শোধ করতে লাগবে তিনশো টাকা আর হাতে থাকবে শ'খানেক টাকা। তা দিয়ে সংসারের জন্য অনেক কিছু কেনা যাবে তা হিসেব করে রাখে রংকারায় ও জরকামুনি।

বাজারের মাঝখানে মহাজন মাখন চৌধুরীর গদি। সামনে প্রকাণ্ড লোহার তুলাদন্ড দিয়ে মাপ নিচ্ছে তার কর্মচারী। পাহাড়ী মেয়েপুরুষেরা সবাই তাদের ফসল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহাজন লাল কাপড়ে মোড়া খাতা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে আছে। ওজনের বাটখারা নিয়ে প্রত্যেকের অভিযোগ কিংবা ক্ষোভ থাকলেও মুখের উপর কিছু বলার সাহস নেই। বেতের ঝুড়ি নিয়ে হিসেবে ফের বাদ দিতে গিয়ে চার-পাঁচ কেজি ওজন হয়ে যায় অনায়াসেই। দাঁড়িপাল্লায় বাটখারার সঙ্গে কয়েকটা ইটের টুকরো দেখে অনেক সাহস নিয়ে জরকামুনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাগত সুরে মহাজন উত্তর দেয় – "তুই কি করে বুঝবি ওজনের হিসেব? দাঁড়িপাল্লার ফের ভাঙ্গতে ওটা কাজে লাগে জানিস না?"[৮] অবলীলায় মহাজন ওজনে ফাঁকি দিয়ে সহজ সরল জুমিয়াদের ঠকিয়ে চলে। রংকারায় ছেলেকে বোঝায় – "তর্ক করে লাভ নেই বাবা। বরং বিপদে আপদে আর কোনদিন ঋণ পাবে না। মহাজন চটে গেলে বড় বিপদ।...... মহাজনের

অনেক ক্ষমতা। থানা পুলিশ হাকিম সব ওদের কথায় উঠে বসে।"[৯] এভাবেই দেখা যায় উপন্যাসে রিয়াং আদিবাসীরা মহাজনের দ্বারা শোষিত হয়। সবকিছু বুঝতে পারলেও তারা এর বিরোধিতা করতে পারে না। অসহায়ভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকে না। সমালোচকের মতে, "'লংতরাই' উপন্যাসটি ত্রিপুরার রিয়াং সমাজের একটি যথার্থ দলিল। একদিকে লেখক রিয়াং আদিবাসীদের রীতিনীতি, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পোষাক, খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির পরিচয় যেমন তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তেমনি অরণ্যভূমিসম্বল সরল মানুষদের ওপর সরকারী ফরেস্টার ও মহাজনদের নিপীড়ন ও শোষণের ছবিও খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।"[১০]

রিয়াং জনগোষ্ঠীর এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রার বর্ণনায় বাঁক আসে উপন্যাসের শেষাংশে মহামারীর ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায়। তবে পুনরায় এরা ফিরে আসে নিজের জায়গায়। পরিবর্তনের জোয়ার দেখা যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে। যারা জুমিয়া ছিল তারা এখন রাবার চাষ করে। কেউ বা লুঙ্গায় বাঁধ দিয়ে মাছের চাষ করে। নতুন গঠিত জেলা পরিষদ জুমিয়াদের উন্নত করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে। সমবায়ের দোকান করেছে। মহাজনরা যাতে রিয়াংদের ঠকাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে দোকান করেছে। কৃত্রিম জলাশয় হয়েছে। ছড়ার দূষিত জলের বদলে তারা পেয়েছে বিশুদ্ধ জল। তাদের ঘরের শিশুদের জন্য হয়েছে স্কুল। আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। আগের দুঃখময় জীবনকে অতিক্রম করে তারা ভালোভাবে বাঁচতে শিখেছে।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিমল সিংহ রিয়াং আদিবাসীদের উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। কলাছড়া গ্রামে মহামারীতে বহু মানুষ মারা গেলে এবং খাদ্যাভাব দেখা দিলে জরকামুনি ও সাজেরুঙ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলে যায়। দু'বছর পরে নতুন বসতি গড়ার স্থান নির্বাচন করে যখন ফিরে আসে তখন তারা দেখে যে তাদের গ্রাম আর সেই গ্রাম নেই। অনেক বদলে গেছে। গ্রামে রাস্তা হয়েছে, বিজলী বাতি এসেছে, হাসপাতাল হয়েছে, স্কুল হয়েছে। মহাজনের শোষণ আর নেই।

জরকামুনি থেকে দশ বছরের বড় হাসমাই রিয়াং লেখাপড়া শিখে অন্যরকম জীবনে পা দিয়েছিল, সম্মিলিত লড়াই করতে শিখিয়েছিল অত্যাচারীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ করেছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রতিবাদের। পরে পুলিশের মার খেয়ে পড়েছিল। হাসমাই রিয়াং জানায় এই পৃথিবীতে সবই তো বদলাচ্ছে। জঙ্গলও তো দিন দিন কমে আসছে। তাহলে তোমার ছেলেটা বড় হয়ে খাবে কি? সে ভরসা দেয় কলাছড়া গ্রামে কত পরিবর্তন হয়েছে। সেই হাসমাই জরকামুনিকে জানায় - "সারাজীবন জুম করে আমরা বাঁচতে পারব না। এ অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া দিনকাল বদলে যাচ্ছে। এখন বাঁচতে গেলে নতুন কোনো বাঁচার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।"[১১]

জুমিয়া জরকামুনি ভাবতেই পারে না জুম ছেড়ে, সেই সংস্কৃতিক জীবন ছেড়ে তার বাপ ঠাকুরদারা যেভাবে জীবন কাটিয়েছিল, এর থেকে অন্যভাবে জীবনে বাঁচা যাবে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে কলাছড়া গ্রাম। উন্নয়নের জাদুতে উপনগরীর মত স্বয়ংসম্পূর্ণ। আগের জুমিয়ারা এখন রাবারের চাষ করছে সেখানে। মহাজনকে সুদ দিতে হবে না এখানে। জুমিয়াদের এখানে কাজের অভাব নেই। জেলা পরিষদ ঋণ দেবে। ধীরে ধীরে তা শোধ দিলেই চলবে। হাসমাইয়ের হাত ধরে সে দেখে এখানে ওজনে কেউ ঠকায় না। তিল-কার্পাসের ন্যায্যমূল্য মেলে। পাওয়া যায় নুন, শুটকি, সুতো, কাপড়। এর নাম সমবায়।

রাঙাছড়া ফরেস্ট অফিসের সামনের লাল রাস্তা কলাছড়ার দিকে চলে গেছে বিদ্যুতের খুঁটি কাঁধে করে। দু'বছর আগে যেখানে ছিল গভীর জঙ্গল সেখানে আজ নির্মাণযজ্ঞ চলছে। বহু মানুষ এতে শামিল হয়েছে। পাশে টলমল জলপূর্ণ কৃত্রিম জলাশয়। সেখানে মাছ চাষ হচ্ছে। জরকামুনি ও সাজেরুঙ দেখে পাহাড়েও হাসপাতাল হয়েছে। পাশ করা ডাক্তার চিকিৎসা করে সেই হাসপাতালে। অসুখ-বিসুখ ভালো হয় মানুষের। মুরগি কেটে ও অচাইয়ের মন্ত্রে চিকিৎসার নামে বুজরুকী হয় না আর এখানে। মানুষের হাসপাতালের পাশাপাশি রয়েছে পশুদের জন্যও হাসপাতাল। ওদের গরু, হাঁস, মুরগির চিকিৎসা হবে সেখানে। রয়েছে আবাসিক স্কুল। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাহাড়ী ছাত্ররা এখানে পড়ে। খাওয়া, পোশাক, বই, খেলাধুলা - সব কিছুর সুযোগ রয়েছে সেখানে।

রাবার প্লেনটেশনে কাজ করছে পাহাড়ের বাসিন্দারা। পাতা মোড়া ভাত নয়, এরা সবাই টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে খাবার নিয়ে যায়। পাহাড়ের জুমিয়ারা জুম চাষ ছেড়ে রাবার চাষে মন দিয়েছে। কচি কচি রাবার গাছের শাখা প্রশাখা যেন জীবন থেকে উত্তরণের কথাই বলছে। জুমিয়া জীবনের কঠোর অসহায়তা থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। লেখকের হাত ধরে জুমিয়াদের পুনর্বাসন হয় 'লংতরাই' উপন্যাসে। লেখক এই জুমিয়াদের জীবনের উত্তরণের চিত্র উপন্যাসের শেষাংশে উপস্থাপিত করেছেন। জুমিয়াদের পুনর্বাসন হয়। রাবার চাষ মুদ্রা আনে। রিয়াং জনজাতির জীবনের এই আর্থসমাজের উত্তরণের চিত্রই এঁকেছেন ঔপন্যাসিক বিমল সিংহ তাঁর 'লংতরাই' উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র-

১) সিংহ, ড. শিশির কুমার, 'বিমল সিংহ-এর গল্প-উপন্যাস ঃ কথাসাহিত্যে নতুন দিগন্ত', ভূমিকা, পৃঃ ১০।
২) সিংহ, বিমল, 'লংতরাই', পৃঃ ২৭।
৩) তদেব, পৃঃ ২৮।
৪) তদেব, পৃঃ ২৯।
৫) তদেব।
৬) তদেব, পৃঃ ৩০।
৭) তদেব।
৮) তদেব, পৃঃ ৩৪।
৯) তদেব, পৃঃ ৩৫।
১০) সিংহ, ড. শিশির কুমার, 'বিমল সিংহ-এর গল্প-উপন্যাস ঃ কথাসাহিত্যে নতুন দিগন্ত', ভূমিকা, পৃঃ ৫৮।
১১) সিংহ, বিমল, 'লংতরাই', পৃঃ ৬৮।

সহায়ক গ্রন্থাবলী-

১) সিংহ, বিমল, 'লংতরাই', ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৮৪, নবচন্দনা প্রকাশনী, রামনগর, রোড নং – ২, আগরতলা, ত্রিপুরা-২।
২) সিংহ, ড. শিশির কুমার, 'বিমল সিংহ-এর গল্প-উপন্যাস ঃ কথাসাহিত্যে নতুন দিগন্ত', ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৩, নবচন্দনা প্রকাশনী, রামনগর, রোড নং – ২, আগরতলা, ত্রিপুরা-২।
৩) 'বিমল সিংহ রচনা সংগ্রহ', ত্রিপুরা দর্পণ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯।

....

সহযোগী অধ্যাপিকা, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’: এক সরল গ্রাম্য প্রেক্ষাপটে জটিল জীবনভাষ্য

মাধাই পাল

বিষয়সংক্ষেপ-

প্রযুক্তির তালে তাল মিলিয়ে কবি-ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে তাদের সৃষ্ট পটভূমি গ্রাম থেকে শহরে উপনীত হলেও তার মূল ভিত্তি এখনও প্রোথিত রয়েছে গ্রামেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ও তার ব্যতিক্রম নয়। গ্রাম্যজীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটির জীবন্ত ছবি তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। বিশেষ কিছু গ্রাম্য বিপর্যয় ও তার করাল গ্রাসে সাধারণ আড়ম্বরহীন জীবন জটিলতার পরিসরে সীমাবদ্ধ। কাহিনীর নায়ক শশী শহুরে জীবনের স্পর্শে এসে নিজে সেই গণ্ডী ভাঙতে পারলেও অন্যদের সেই স্তূপ থেকে বের করতে পারেনি। উপরন্তু সেই গণ্ডীর সীমারেখা কখনও কখনও তাকেও ছুঁয়ে গিয়েছে। শশীর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তনের সাথে গ্রাম্যজীবন-মননের মেলবন্ধন করেছেন লেখক।

চুম্বক শব্দ-

প্রেক্ষাপট, পল্লীসমাজ, মুখ্য কেতন, বিপর্যয়, কদর্যতা, রহস্যময়তা, বাহ্যিক স্পর্শ, দেনা-পাওনার মিল-হিসেব।

মূল প্রবন্ধ

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজজীবন হয়ে উঠেছে শহুরে। গ্রামগুলি পর্যন্ত প্রযুক্তির ছোঁয়াতে হয়ে উঠেছে শহরমুখী। এহেন অবস্থায় বর্তমান শিল্পীদের লেখনীর প্রেক্ষাপটও হয়ে উঠেছে শহরকেন্দ্রিক। শুরুতে কিন্তু গ্রামই মুখ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন “... পল্লীই তখন সব। শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না; কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী, আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে।”[1] বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গ্রাম্যজীবনের বর্ণনা রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে ধীরে ধীরে পটভূমিরূপে শহরের উপস্থাপন । মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির একটি পদ-

“শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।।”[2]

গল্প-উপন্যাসের আখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত পটভূমি হিসেবে বাংলার স্নিগ্ধ গ্রাম্যসমাজই বিরাজ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়ত্রয় পল্লীসমাজকে তাদের সৃজনক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেও তা ছিল একে অপরের থেকে ভিন্ন। কোথাও ফুটে উঠেছে গ্রাম্য পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কোথাও আবার আত্মীয়তা-

“আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।”
-‘আমাদের গ্রাম’, বন্দে আলী মিঞা।

কোথাও রোগ- ব্যাধী, কোথাও বা বেঁচে থাকার লড়াই, কদর্যতা ফুটে উঠেছে। পল্লীজীবনের কাহিনীকার হয়েও তারা একে অপরের থেকে হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র।

গ্রাম বাংলার সমাজের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে তাতে স্থান করে নিয়েছিল জাত প্রথা। সেই প্রথাই মানুষের জীবন-জীবিকার মূখ্য কেতন হয়ে উঠতো। তা যেন অপরিবর্তিত; পূর্ব নির্ধারিত। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাতে তারা গ্রামের বাইরে না গিয়ে গ্রামেই যাত্রা, মেলাতে আনন্দ করত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই এক প্রেক্ষাপট বেছে নিয়েছেন ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা গিয়েছে গ্রাম্য বিপর্যয়। বাজ পড়ে হারু ঘোষের মৃত্যু। শহরের বাতাসে কার্বনের অংশ বেশি থাকে, পাশাপাশি শহুরে গৃহে ব্যবহৃত লোহা, পানীয় ব্যবস্থাতে ব্যবহৃত লোহা, মোবাইল টাওয়ারে, ইলেকট্রিক তার এসব শহুরে পরিবেশ বিদ্যুতের ভালো পরিবাহক। শহরের ঝড়ের সময় মেঘে জমে থাকা বৈদ্যুতিক চার্জ তাই পরিবেশে আস্তে আস্তে ইলেকট্রিক ডিসচার্জের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে কমে আসে। কিন্তু গ্রামে ইলেকট্রিক ডিসচার্জের উপায় কম থাকায় মেঘের মধ্যে অনেকটা করে চার্জ জমা হয়ে থাকে। তাই গ্রামে মাঝে মধ্যেই বাজ পড়ে। পরিবেশদূষণ-মুক্ত আবহাওয়ায় মেয়ে মতির বিয়ের একরাশ স্বপ্ন নিয়ে হারু ঘোষ পাত্র দেখতে জায়। সেখান থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেই আশ্রয়ই তার পরিবারকে নিরাশ্রয় করে। বাজ পড়ে হারু মারা যায়।

গ্রাম্য জীবনের পরিচিত সাধারণ বিপর্যয় হল সাপ ও ভূত। হারু যে জায়গাটিতে মারা গিয়েছে সেটি ছিল সাপের আস্তানা। হারুর মৃতদেহের ওপর দিয়ে যেতে দেখা যায় ‘সবুজ রঙের সরু লিকলিকে সাপ’।গ্রামের পঞ্চুর মৃতদেহও পাওয়া যায় দুই হাতের মুঠোতে এক বড় খরিশ সাপ নিয়ে থাকা অবস্থায়। কিন্তু গাঁওদিয়া গ্রামের লোকজন ভীত হবার সঠিক কারণ না বুঝে অপর এক ভিত্তিহীন কারণকে গ্রহণ করে সেই জঙ্গলে যায় না- “গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালোবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাতে আর সন্দেহ নাই।”[৩]মাটির রাস্তা অতিবৃষ্টিতে যেমন কাঁদা, পিছল হয়, তেমনই জলাভাব আসে বৈশাখে বৃষ্টি না হলে ।

SAMSAPTAK ISSN - 2454-4884 ESTD.-2015 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

গ্রামে সচেতনতার অভাব ছিল। কিছু ছোঁয়াচে রোগ হয়ে উঠেছিল গ্রামগুলির পরিচয়। বিবেকানন্দ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ প্রবন্ধে পাশ্চাত্যের চোখে প্রাচ্য প্রসঙ্গে বলেছেন- “বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচর্ব্বন,অনশন-অর্দ্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান,...”।[৪] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও গ্রাম্য জীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রাম্য সমাজের প্রাগুক্ত দিকটিতে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। বসন্ত রোগের চিকিৎসা করলে যে সাবধানতা মেনে চলতে হয় তা যামিনী কবিরাজের শিষ্য করেনি, তৎকালীন বাংলার সেই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে তেত্রিশ বছরের সেনদিদির আত্মীয় ‘রূপের’ বিনাশ ঘটে। আর এক অসতর্ক ‘গ্রাম্য ব্যাধি ম্যালেরিয়া’ যার কোপে রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র কারও চরিত্ররাই বাদ পড়েনি, আলোচ্য উপন্যাসের মতিই বা কেন বাদ থাকবে। পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে কলেরা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা।

শশী কলকাতায় পড়েছে। সে জানে সচেতনতার অভাবেই গ্রাম্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাই সে নিজের বাড়ি থেকেই সচেতনতার অভিযান শুরু করতে চায়। কয়লা দিয়ে দাঁত মাজা, মাটিতে মুড়ি খাওয়া এসব বন্ধ করতে চায়। আধুনিকতার শক্তিতে গ্রামবাসীকে আহ্বান করার চেষ্টা করে- “এই শক্তিকে সে আবাহন করে আনতে পারে নি বলেই গ্রামে জলাশয়ে আজ জল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরছে,...”[৫] শশী পারে নি, সে বুঝেছে তার পক্ষে সম্ভব নয় এদের মনে চেতনার বিকাশ ঘটানো।

গ্রাম্যজীবন কুসংস্কারে বশীভূত। তারা নিজেদের অসাবধানতাকে দেখে না। তারা নিজেদের সাথে হওয়া বিপর্যয়ের জন্য দোষারোপ করে পাঁজী-তিথিকে। “বারবেলা যখন ছাড়ছে, পায়ে কাঁটাটি ফুটলে দুনিয়ে উঠে অক্কা পাইয়ে দেবে।”[৬] ভুতো জামগাছ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে।ভুতো অসাবধানে গাছে উঠেছে, কিংবা জাম গাছের ডাল ভার সহ্য করতে পারে না। এসবকে কারণ হিসেবে গ্রহণ না করে মূল কারণ বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার বারবেলা।নবীন জেলের বড় ছেলেকে কুমীরে টানার পিছনে টানা হয়েছে একই কারণ- বারবেলা।

এহেন কুসংস্কারময়তায় বিস্তৃত পরিবেশে আমাদের যৌক্তিক মনও কখনও কখনও স্তব্ধ হয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাদব পণ্ডিত চরিত্রটির প্রতি শশীর মনোভাবে তা দেখিয়েছেন। যাদব পণ্ডিত শশীর বিজ্ঞানসম্মত ডাক্তারীবিদ্যাকে অস্বীকার করলেও শশী তার ‘গ্রাম্য মনের অপরিত্যজ্য সংস্কারে’ যাদবের সূর্যবিজ্ঞানের প্রয়োগও কেউ কখনও দেখেনি। “বিদ্যা যাদবের বেশি নয়, পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিও নাই, ধার্মিক ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।”[৭] এমনই গ্রাম্য সরল মন। তারা কাউকে প্রাধান্য দেবে মনে করলেই দিয়ে ফেলে, তাতে সেই ব্যক্তিটির প্রাপ্য গুণ থাক বা থাক।

মুদীর দোকান, জেলে, কবিরাজী, কাঠ কুড়োনি, জমি চাষের পাশাপাশি চতুরতা, দালালি সেটাও করে। “ইংরেজ বিচার ব্যবস্থার বিকাশের ফলে পল্লীসমাজে এক নতুন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। এঁদেরকে মামলা বিশারদ বা দালাল বলা যায়।”[৮]শশীর পিতা গোপাল এই শ্রেণীরই একজন। মেজ মেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিয়ে ছলনার সাথে অসৎ পথে তিনি দেন। ছেলে শশীকে পর্যাপ্ত ফিস নিতে প্রভাবিত করেন। যাদব পণ্ডিতের দেওয়া টাকায় হাসপাতাল নির্মাণে এগিয়ে আসতে চান নিজের আখের গুছোনোর জন্য।“একজন সৎকাজে যথাসর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছে, আর একজন তাতে কিছু ভাগ বসাইতে চায়।”[৯] টাকার বিনিময়ে মানুষ কেনাবেচার রেকর্ড রয়েছে তার। এমন ছোটো ছোটো গ্রাম্য কদর্যতা লেখক গোপালের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

শিক্ষিত হারু যখন গ্রাম্য কদর্যতা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, নিজের কন্যা মতির জন্য সুপাত্রের সন্ধান করেছে তখন হারুকে ‘ভদ্দরলোক’ বলে তুচ্ছ করা হয়। নিতাইএর ভাগ্নের সাথে মতির বিয়ে না দেওয়াতে পরানের ওপর তার প্রভাব ফেলা হয়। নিতাই সুদেবের মামা হলেও সুদেব নিতাইএর নামে মিথ্যে মামলা করে। আবার এ গ্রামের প্রান্তিক শ্রেণীর জেল থেকে ফিরে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলাম বলার মধ্যে নির্মল হাস্যরসের আঁধারে কদর্যতাই ফুটে উঠেছে।

রোগ, ব্যাধী, কদর্যতার পাশাপাশি গ্রাম্যজীবন উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে। দুর্গাপূজা, পুতুল নাচ, বাজি পোড়ানো, মেলা, যাত্রা সব হয়। এসবের নামোল্লেখ করেই লেখক থেমে থাকেননি ।যাত্রার দল এলে যে উন্মাদনা দেখা যেত তা তিনি জীবন্ত করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মতো এখানেও লেখক সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন মতি, কুসুম,জয়ার মধ্য দিয়ে। বিন্দু গ্রাম্য সহজ-সরল সাধারণ জীবন থেকে দূরে গিয়ে রোজকার বিরক্তিময় জীবনে চলে গিয়েছে। গ্রাম্যজীবনে যা রহস্যময় “বিন্দু আজ তাদের কাছে আকাশের পরির চেয়েও রহস্যময়ী। অনেক দিন আগে একবার আসিয়া গ্রামকে চমকাইয়া দিয়াছিল, এবারও দিয়াছে। আবার সে ফিরিয়া যাইতেছে তাহার অজ্ঞাত রহস্যময় প্রবাসে,তাঁদের গাঁয়ের মেয়ে বিন্দু।”[১০]

পল্লীজীবনে রয়েছে শিক্ষার অভাব।কুসুম তার লিভারের জায়গাতে হার্ট রয়েছে বলে জানে। যাদব কথার খেয়ালে বলে সে রথের দিন মারা যাবে, শশীর মুখ হয়ে সে কথা রাষ্ট্র হয়ে যায়। গ্রাম্য জনতা সে বিশ্বাসে জোড় দেয়। যাদব আর তার স্ত্রীকে দেখতে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে। ফুলের মালা, সিদূর, আলতা পড়িয়ে দেয় । শশী যাদব

পণ্ডিতকে এহেন অন্যায় থেকে বাঁচাতে পুরী চলে যেতে বলে। কিন্তু গ্রাম্য সংস্কারে সত্য মিথ্যার মোহবদ্ধ জগতে যাদব পালাতে পারে না।

গ্রাম্য পল্লীজীবনে বেড়ে ওঠা শশীর মনের গঠন গ্রাম্য হলেও কলকাতার বন্ধুদের সংস্পর্শে ও বইয়ের প্রভাবে তার কুলুপ আঁটা মনের অনেকগুলো দরজা জানালা খুলে যায়; গ্রাম ও গ্রাম্যতা সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ বিরাগ দেখা যায়। শেষরাতে ঢেঁকির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, যামিনীর হামানদিস্তা, গোপালের কাশির শব্দ তাকে বিব্রত করে। "গ্রাম! কী শ্রীহীন কদর্য প্রকৃতির এই লীলাভূমি? বর্ষার নির্মল বারিপাতে গলিয়া হইল পাঁক, পচিয়া হইল দুর্গন্ধ।"[১১]

ডাক্তারি পাশ করার পর শশী গ্রামে ফিরে আসে। শশীর কাছে চিকিৎসা করিয়ে ভিজিট দেয় না অনেকেই, শশী তখন গ্রামান্তরে গিয়ে বেশী ভিজিটের কথা ভাবে। তবুও শশীর মূল্যবোধ হারিয়ে যায় না। আধুনিক চিন্তা ভাবনায় কর্ষিত শহুরে মনকে পল্লীজীবনে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তার বিদ্রোহী গ্রাম্যজীবন বিমুখ মন অসহায় মানুষের প্রতি মমতাসিক্ত হয়ে নির্বাপিত হয়। শ্রীনাথের দোকানে এক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য তার মেয়েকে শশী পুতুল কিনে দেয়।আবার আত্মীয় পরিজন থাকা সত্ত্বেও হারুর নির্জনে একা খালের পাশে মারা যাওয়া শোচনীয় লেগেছে। কুমুদ শশীর সাজানো ঘর দেখে বলে 'গ্রামে থেকে গেঁয়ো বনে যাসনি'। শশী বদ্ধ ডোবা জলাশয়পূর্ণ অজ পাড়াগাঁয়ের ব্যবহারিক জীবনকে ভালবাসতে শুরু করে। "একদিন গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া বৃহত্তর বিস্তৃতকর জীবনগঠনের কল্পনা করিয়া সে দিন কাটায়, আর ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এক সপ্তাহ বাহিরে আসিয়া তাহার থাকা চলে না? কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, টাইফয়েড এবং আরও অনেক ছোটোবড়ো রোগে আক্রান্ত যাদের সে ফেলিয়া আসিয়াছে, একে একে তাদের কথা মনে পড়িলে আর একটা দিনও অকারণে কলিকাতায় বসিয়া থাকিবার সংকল্পে নিজেকে তাহার খেয়ালি, বর্বর মনে হইতেছে।"[১২]

জীবনের রহস্য তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে শশীর দৃষ্টির দর্পণে। শহুরে পরিশীলিত মন ও নাগরিক সুলভ যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখা জীবন শশীর। তাই প্রথমে রয়েছে গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে অনীহা, বিতৃষ্ণা। গ্রাম থেকে পালিয়ে 'নূতন জগতে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ' করতে চেয়েছে, পরে গ্রামীণ জটিল ও গভীর জীবন সে উপলব্ধি করেছে। উপন্যাসটিকে গ্রাম্য পল্লীক্যানভাসে এক শিক্ষিত আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের অসহায় অক্ষমতা ও ব্যর্থতার গল্প বলে মনে করা হলেও তা নয় -"মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিরে এসেছে-নইলে মাটি বন্ধ্যা মরু হয়ে যেত। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে যে প্রাণের ধারা শহরে চলে যাচ্ছে গ্রামের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার যোগ আর থাকছে না।"[১৩] হয়তো এই দেনা-পাওনার হিসেব মিলিয়ে রাখতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীকে গাঁওদিয়া গ্রামেই ফিরিয়ে এনেছেন।

তথ্যসূত্র:

১।। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পল্লীপ্রকৃতি'; 'গ্রামবাসীদের প্রতি'; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৯৬২; পৃ-৭১।

২।। 'বৈষ্ণব পদাবলী'; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৭; পঞ্চদশ সংস্করণ ২০০৪; পৃ-৮৯।

৩।। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক; 'পুতুল নাচের ইতিকথা'; প্রকাশ ভবন; ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩; অষ্টচত্বারিংশ মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৩; পৃ-৫।

৪।। স্বামী বিবেকানন্দ, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'; উদ্বোধন কার্যালয়; চৈত্র ১৩৪৫; পৃ-১।

৫।। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ‘পল্লীপ্রকৃতি’; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৯৬২;পৃ-৫৪।

৬।। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক; ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’; প্রকাশ ভবন; ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩; অষ্টচত্বারিংশ মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৩; পৃ-২৩।

৭।।পূর্বোক্ত, পৃ-২৪।

৮।। ঘোষ, বিনয়; ‘সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র’ ৪র্থ খণ্ড পৃ-২৯৭।

৯।। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক; ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’; প্রকাশ ভবন; ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩; অষ্টচত্বারিংশ মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৩; পৃ-১৩০।

১০। পূর্বোক্ত, পৃ-১০২।

১১।। পূর্বোক্ত, পৃ-১৩০।

১২।। পূর্বোক্ত, পৃ-১০৬।

১৩।। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ‘পল্লীপ্রকৃতি’; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৯৬২;পৃ-৪৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পল্লীপ্রকৃতি’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৯৬২।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক; ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’; প্রকাশ ভবন; ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩; অষ্টচত্বারিংশ মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৩

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

....

স্নাতকোত্তর, বাংলাবিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মকথার স্বরূপ সন্ধান

অরবিন্দ সরকার

সারসংক্ষেপ –

আত্মজীবনী স্বরচিত জীবনচরিত। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও আত্মজীবনী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সহজ ভাষায় ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যখন নিজের জীবনের কথা বলেন, নিজের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করেন, তাকে আত্মজীবনী বলা যায়। নিরাসক্তভাবে নিজেকে দেখে, নিজের অতীতের মধ্যে ডুব দিয়ে নিজেকেই বিশ্লেষণ করা বড় কঠিন সে কাজ। এই আত্মজীবনীর মধ্যে জড়িয়ে থাকে আত্মদর্শন, আত্মবিচার ও আত্মোপলব্ধি। আত্মজীবনীর মধ্যে ব্যক্তি শুধু নিজের কথাই বলেন না; তার লেখনীতে ধরা পড়ে অপরের কথা এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময় ও সমাজের কথা। তাই বলা যায়, আত্মজীবনী শুধু ব্যক্তির উত্তরণের কথাই নয়, তা হল ব্যক্তির পারিপার্শ্বের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিকাশেরও ইতিহাস। অর্থাৎ আত্মজীবনী এককভাবে লেখকদেরই তুলে ধরে না। ব্যক্তিগত তত্ত্ব ও তথ্যের আড়ালে জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ ও সংগ্রাম ছাড়াও তার অগ্রগতির ধারাটিকেও ফুটিয়ে তোলে। সে কারণেই আত্মজীবনী উপন্যাস বা নাটকের মতো এক অনন্য শিল্পসৃষ্টি, যা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এই আত্মজীবনী আসলে কী, একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমালোচকরাই বা কী বলছেন, এই আত্মজীবনীর সাথে জীবনী সাহিত্য, স্মৃতিকথা, ডায়েরি বা দিনলিপির পার্থক্যই বা কেমন, বাংলা আত্মকথার উদ্ভব কোথায়, সেই সঙ্গে এর স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য কীরূপ অর্থাৎ আত্মকথার স্বরূপ ও প্রকৃতিকে আমার এই প্রবন্ধের মধ্যে নিবন্ধ করার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ –

সংজ্ঞা, সমালোচকদের মতামত, পার্থক্য, উদ্ভব ও বিকাশ, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, উপসংহার

মূল আলোচনা –

ইংরেজি 'Autobiography'-র বাংলা প্রতিশব্দ হল আত্মজীবনী। আত্মজীবনীর ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাশ্চাত্য আত্মজীবনী সাহিত্যের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক জার্মান পণ্ডিত জর্জমিশ বলেছেন "It can be defined only by summarizing the term, 'Autobiography' implies-the description (graphia) of an individual human life (bios) by the individual himself (Auto)" [১] । সহজ ভাষায় ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যখন নিজের জীবনের বিবরণ দান করেন, তখনই তাকে আত্মজীবনী বলা যায়। এখানে নিজের জীবন বলতে, যে জীবন একান্তই আত্মার আত্মীয় তাকেই বলা হয়ে থাকে। তাই নিজেকে বিশ্লেষণ করাই তার মৌল প্রেরণা। এ যেন অনেকটা নিজেকেই পুনরাবিষ্কার করা। আর এই আবিষ্ক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে নিজ জগৎ ও জীবন। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে নিজেকে অন্বেষণ করা তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । কেবল অন্বেষণই নয়, উভয়ের মধ্যে ঐক্যসূত্রে নিজের সামঞ্জস্য বিধানও তার কর্তব্য।

দূর্বা দেব তাঁর 'আত্মজীবনীর স্থাপত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে নিজের বিবর্তনগত অভিব্যক্তির ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলার নামই আত্মজীবনী। সহজ কথায় বলতে গেলে, ব্যক্তিজীবনের ধারাবাহিক অনুপুঙ্খ বিবরণের পাশাপাশি অন্তর্জীবনের পরিচয়ই হল আত্মজীবনী। আত্মজীবনী আসলে আত্মবিনির্মাণ, নিজের পরিচিত তথ্যের সাহায্যে নিজেরই অজ্ঞাতপূর্ব পরিসরের পুনর্নির্মাণ।" [২] এককথায় আত্মজীবনী হল সেই বিস্তৃত

পরিসর, যেখানে লেখক নিজেই বলেন নিজের কথা, নিজেই দেখেন নিজেকে। তখন লেখক আর নায়ক হয়ে যান একই ব্যক্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে, আত্মজীবনী মূলত: আত্মজিজ্ঞাসারই নামান্তর। তাই তাকে আত্মগবেষণাও বলা যেতে পারে। এইচ.জি.ওয়েলস তাঁর আত্মজীবনীতে তেমনই ইঙ্গিত করেছেন। আত্মজীবনী তাঁর ভাষায় "That is not an apology for life but a Research into its nature." [৩]

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন। বিশ্বলোকের কত বিচিত্র ঘটনা, কত অজস্র অনুভূতি স্রষ্টার মনে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সেই সব প্রতিক্রিয়ার তাড়াতেই শিল্পী তাঁর শিল্প সাধনায় নিত্য নূতন প্রকাশভঙ্গির সন্ধান শুরু করে দেন। এ প্রসঙ্গে দূর্বা দেব বলেছেন- "কেউ হয়তো বিশেষ একটা সময়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে খুঁজে নিতে আগ্রহী হন, আত্মআবিষ্কারে সচেষ্ট হন, লিখতে অগ্রসর হন নিজের জীবনকাহিনী, খুঁজে নিতে চেষ্টা করেন 'পশ্চাতের আমি'-কে। তাই বলে আত্মজীবনী শুধুমাত্র অতীত স্মৃতির রোমন্থনই নয়, বড় আমি ও ছোট আমির দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তির দ্বিরালাপিক উচ্চারণ, হওয়া আর হয়ে-ওঠার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন। সেখানে সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের ছবি খুঁজে নিতে আগ্রহী হয়, যে ছবি সে রেখে যেতে চায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে; নিজেকে তুলে ধরতে চায় উত্তরসূরীদের কাছে অথবা শুধুই আত্মতৃপ্তির জন্যে।" [৪]

কেউ যখন আত্মজীবনী লেখেন, তখন তাঁর মধ্যে অনেক বিষয়ই হয়তো ক্রিয়াশীল থাকে, তবে দুটো বিষয় নিশ্চিতভাবেই থাকে। এর একটি হচ্ছে নিজেকে জানা, অন্যটি হচ্ছে নিজেকে জানানো। কাকে জানানো ? জানানো আত্মজীবনী পাঠকদের। লেখকের আত্ম- আবিষ্কারের যে উল্লেখ আমরা আগে করেছি তার পাশাপাশি থাকে তাঁর আত্মউন্মোচন। যে কারণে আত্মজীবনী লেখককে ঘটনার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে অতীতের কথা বলতে বলতে অনেক সময় বর্তমানেও চলে আসতে হয়। এটি সফলভাবে ঘটানোর মধ্যেই লেখকের কৃতিত্ব নির্ভর করে। আত্মজীবনী লেখার কাজটি সে কারণেই কঠিন। কারণ, সবার পক্ষে ওই আত্মউন্মোচনের কাজটি ঠিকভাবে করতে পারা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আত্মজীবনী এমন এক আখ্যান, যেখানে আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনার এমন এক পরিসর তৈরি হয়, যাতে ব্যক্তিগত অতীত এবং সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষিত উভয়ই সমান গুরুত্বে বিবেচিত হয়। আত্মজীবনীর কাছে বিষয়নিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার দাবি পুরোপুরি করা সম্ভব নয়। কেননা এই ইতিহাসটি মূলত নির্মিত হয় ব্যক্তির ঔচিত্যবোধ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর, যা আবার অনেকাংশে ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই বৃহত্তর ইতিহাসের মধ্যে আত্মজীবনী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে, এমন এক ইতিহাস চেতনা সঞ্চারিত করে, যা ব্যক্তি মানুষের সামাজিক তথা মনস্তাত্ত্বিকবোধে জারিত হয়ে বিশাল কালপ্রবাহকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিচার করতে চায়। ফলে আত্মজীবনী হয়ে ওঠে ব্যক্তির খণ্ডিত 'আমি'-র এমন এক নমনীয় আখ্যান; যা একই সঙ্গে যুগের গণ্ডীতে আবদ্ধ এবং ঐতিহাসিক প্রশ্নে বহুস্তরান্বিত।

যেহেতু আত্মজীবনী একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে আখ্যায়িত ব্যক্তিমানুষের কাহিনি, তাই সেই জীবনের ধারাবাহিকতাকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে তুলে ধরাই আত্মজীবনীর লক্ষ্য। জীবনের ঘটনাপঞ্জি বিবৃত হলেও, আত্মবিশ্লেষণের সুবাদে সেখানে বড় হয়ে ওঠে সত্তার আকাঙ্খা, ব্যর্থতার দহনজ্বালা। আত্মজীবনী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপাদানগুলির ওপর ভর করে উত্তরিত হতে চান কোনো উচ্চতর জ্ঞানের শিখরে। তাই এই জাতীয় সাহিত্য-সংরূপ জীবনের অভিজ্ঞতাকে দিতে পারে একটি নির্দিষ্ট সংহতরূপ। আত্মজীবনের অতীত ও বর্তমান উভয়ই সম গুরুত্বে উপস্থাপিত। কারণ এর বিন্যাসে মূল চরিত্র অতীত থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে এসে স্থিত হয়। ফলে বর্তমান কালের উপস্থিতি শুধুমাত্র আর ঘটনাক্রমের বিবরণ হয়ে থাকে না, বরং সেটি হয়ে ওঠে মূল্যায়নের স্তর। সেখানে স্থান পায় নানাবিধ বিচার বিশ্লেষণ, সমীক্ষা ও সিদ্ধান্তমূলক আত্মবিবৃতি। পাশাপাশি এটিও ঠিক যে, আত্মজীবনী এমন এক যাপন

প্রক্রিয়ার সন্ধান দেয়, যা সমাজ স্বীকৃত সমষ্টিগত জীবন ধারার একরৈখিক মাত্রাকে ছাপিয়ে এক পথের সন্ধান করে। সেটি একান্তভাবেই সেই ব্যক্তির নিজস্ব। ফলে সেটি আর তখন সাধারণের মনস্তত্ত্বে চালিত না হয়ে জীবনীকারের ব্যক্তিগত ইচ্ছাজনিত অবস্থার বা অবস্থানের মানদণ্ডে নির্দেশিত হয়। আর এইভাবে যৌথ জীবন প্রক্রিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে মিলিত হতে থাকে ব্যক্তি মানুষের একান্ত পরিসরের ভূগোল। তৈরি হয়ে যায় এক অন্য সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, যা তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে সামগ্রিক ইতিহাসের মধ্যে সন্ধান করে চলে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত।

আমরা বুঝতে পারি, এইভাবে যে কোন আত্মজৈবনিক আখ্যানই একটি বৃহত্তর সংস্কৃতিকে রূপায়িত করে; আর সেই কারণেই সেটি হয়ে ওঠে বহুস্বরিক। এটি শুধুমাত্র আত্মপরিচয় নির্মাণে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রে নৈতিকতার স্তরবিন্যাসকে অনুসন্ধান করে তাই নয়; পাশাপাশি তুলে আনে সামাজিক জীবনের সাংস্কৃতিক পটভূমিকেও। ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় এবং নিয়ত প্রবহমানতার সঙ্গে যখন মিশে যায় আত্মজীবনীর কথন, তখন তা হয়ে ওঠে এক সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বোধের সংহতরূপ। জীবনের বৃহত্তর সত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বলেই এমন একটি প্রশস্ত কাঠামো নির্মাণ করে নেয়, যা যৌক্তিক নায্যতার প্রশ্নে অনেক বেশি উদার হয়ে ওঠে। যেহেতু ব্যক্তিগত নির্বাচন এবং মতামত এখানে বড় কথা তাই সমাজের নীতির দিকটি মাথায় রেখে লেখা পরিবেশনের দায় তার থাকে না। আর এইভাবে আত্মজীবনী আসলে এক অর্থে পরিবেশনের প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি স্বাধীনতা অর্জন করে নেয়। অতীত দৃষ্টির প্রতি পর্যবেক্ষণগত ভিন্নতা আত্মজীবনীকারকে এমন এক সুবিধাজনক অবস্থান দেয়; যেখানে জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অর্থময়তার বোধকে তিনি প্রকাশ করেন বর্তমানের শৃঙ্খলাবদ্ধ ঐক্যে।

জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে আত্মজীবনীর রকমফের আছে। এ প্রসঙ্গে সোমেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য- "জীবনী লেখার অনেকটা নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের উপর, কিন্তু আত্মজীবনীর চমৎকারিত্ব নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের উপর নয়, আত্ম-উপলব্ধির উপর। তাই ঘটনাযোজনা করে জীবনী লেখা যায়, কিন্তু আত্মজীবনী ঘটনা- সংযোজন মাত্রই নয়। জীবনে যার কোন গভীর দৃষ্টি নেই, গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবন যার বোধকে আচ্ছন্ন করে আছে, তার আত্মকথা কখনো ঐ ঘটনা যোজনার বাইরে যায় না। সুতরাং প্রতিদিনকার তুচ্ছতাকে যে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি, তার পক্ষে সম্ভব নয় আত্মকথার মাধ্যমে জীবনের ব্যাখ্যা করা।" [৫] আবার সুকুমার সেনের মতে, "পাঠ্যবস্তুর রসের বিচারে জীবনী ও আত্মকথা ভিন্ন স্বাদের এবং আত্মকথা মধুরতর!... জীবনী ও আত্মকথা যেন আমচুরের ও কাঁচা আমের অম্বল। ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে রসের গুণাগুণ যেমনই, কাঁচা আমের অম্বলে জিভের ও দাঁতের আরাম বোধ হয় বেশি।" [৬] জ্ঞাতব্য বিষয়, সংগৃহীত তথ্য সংযোজন করে জীবনী লেখা গেলেও আত্মজীবনী লেখা সম্ভব নয়। তাই বলে আত্মজীবনী শুধুমাত্র ইতিহাস নয় আবার ধারাবাহিক জীবনকথাও নয়। আত্মজীবনী হল, সত্তার হয়ে ওঠার কাহিনি, না বলা কথার বাণী। সেখানে নিজেকে জানা যদি উপযুক্ত গুরুত্ব অনুযায়ী উপস্থাপিত হয়, তবেই তা সার্থক। যে জীবন নানা বর্ণে, নানা রসে ফলবান হয়ে ফুটে ওঠে, নিজস্ব অনুভূতি, বিশ্বাস, আদর্শকে তুলে ধরা হয় যেখানে, সে জীবনের কথাই লেখকের মুখ থেকে শুনতে পাই আমরা। যার মধ্য দিয়ে তাঁকে জানা যায়, চেনা যায়, উপলব্ধি করা যায়। তবে ব্যক্তিগত সুখস্মৃতি, শোকসন্তাপ, প্রেম-ভালোবাসা, হতাশা নৈরাশ্যকে এড়িয়ে আত্মকথা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আত্মজীবনীর মতো স্মৃতিকথা বা ডায়েরিও ব্যক্তিগত রচনা। তবে স্মৃতিকথা বা ডায়েরির সঙ্গে আত্মজীবনীর মূলগত পার্থক্য আছে। ডায়েরি হল দিনলিপি, বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ ঘটনার প্রতিচ্ছবি। আত্মপ্রকাশের সেখানে কোনো সম্ভবনা নেই। অর্থাৎ জীবনব্যাপী আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত ডায়েরিতে থাকে না। এই ডায়েরি বা দিনলিপি কড়চার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'পরিচয়' প্রবন্ধে বলেছেন "ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া

অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।” [৭] আবার কোথাও কোথাও তিনি ডায়েরিকে ‘দ্বিতীয় জীবন’ বলেও উল্লেখ করেছেন -- “আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহিনা। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।” [৮] আত্মজীবনীর সঙ্গে স্মৃতিকথার পার্থক্য প্রসঙ্গে Roy Pascal বলেছেন - “The line between Autobiography and memoir or reminiscence is much harder to draw or rather, no clear line can be drawn. There is no autobiography that is not in some respect a memoir, and no memoir that without autobiographical information; both are based on personal experience, chronological, and reflective.” [৯] আত্মজীবনীর মধ্যে যেমন অনেকাংশে ব্যক্তির আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণের একটি সচেতন প্রয়াস থাকে, সেখানে স্মৃতিকথা অনেকাংশে ঘটনা ও সমাজ নির্ভর। আমরা দেখতে পাই আত্মজীবনীর মধ্যে একটি কালানুক্রমিক জীবনচরিত রচনার প্রবণতা থাকে; যা একটি নির্দিষ্ট পাঠক সমাজকে মাথায় রেখে অগ্রসর হয়। অপরপক্ষে স্মৃতিকথা জীবনকাহিনিকে আশ্রয় করে সমসাময়িক ইতিহাসকে অনেকখানি নির্ভরতা দান করে। চরিত্রাশ্রয়ী হবার কারণে আত্মজীবনী যেখানে একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর, সেখানে স্মৃতিকথার ঐতিহাসিক রূপটি নির্ভরযোগ্যতার বিচারে সুদক্ষ ও ক্রিয়াশীল। স্মৃতিকথায় পারিপার্শ্বের প্রাধান্যের পাশাপাশি টুকরো ঘটনা বা ছবি তুলে ধরা হয়। সেখানে লেখকের অবস্থান থাকে প্রচ্ছন্ন।

আত্মকথার মূল সুরটি কিন্তু একেবারেই বাংলা সাহিত্যে বহিরাগত নয়, বরং অনেক বেশি পরিমাণে দেশজ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আখ্যানকাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের একটি স্বতন্ত্র বিভাগই ছিল ‘গ্রন্থোৎপত্তির কারণ’, যেখানে কবির আত্মপরিচয় দেবার একটি প্রথা ছিল। এছাড়া অনুবাদ সাহিত্যেও কবিরা নিজের পরিচয়, জন্মসাল, জন্মস্থান ইত্যাদির উল্লেখ করতেন। তবে একথাও ঠিক, পরিচয় গোপন বা একাধিক নামের ব্যবহার কবি পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছে। কবিরা নিজেদের কাব্যে যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তাকেই আমরা বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের নান্দীমুখ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। সুকুমার সেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ অংশটিকে ‘আত্মকথামণ্ডিত’ বলে বিশেষিত করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই মঙ্গলকাব্য ধারাই আধুনিক বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের অগ্রজ বা পূর্বসূরি।

এরপর আমরা বাংলা আত্মজীবনীর দিকে আলোকপাত করতে পারি। প্রথম বাংলা আত্মজীবনী হিসাবে নাম করা যায় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ‘ইতিবৃত্ত’ (১৮৬৮) এর কথা। আর প্রথম বাংলা মহিলা আত্মজীবনীকার হলেন রাসসুন্দরী দাসী। তাঁর লেখা আত্মজীবনীর নাম ‘আমার জীবন’ (১৮৭৬)। এছাড়াও আমরা মেয়েদের লেখা আত্মজীবনী হিসাবে পেয়েছি বিনোদিনী দাসীর ‘আমার কথা’ (১৯১২), ইন্দিরা দেবীর ‘আমার খাতা’ (১৯১২), সারদাসুন্দরী দেবীর ‘আত্মকথা’ (১৯১৩), নিস্তারিণী দেবীর ‘সেকেলে কথা’ (১৯১৩), প্রসন্নময়ী দেবীর ‘পূর্ব্বকথা’ (১৯১৭), বীণা দাসের ‘শৃঙ্খল ঝংকার’ (১৯৪৮), সরলাদেবী চৌধুরাণীর ‘জীবনের ঝরাপাতা’ (১৯৫৭), মণিকুন্তলা সেনের ‘সেদিনের কথা’ (১৩৫৯)। রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর ধারায় পেয়েছি ধীরাজ ভট্টাচার্য, মধু বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন দেবী প্রমুখ নাট্যশিল্পীর আত্মকথা। আবার কেশবচন্দ্র সেনের ‘জীবনবেদ’ (১৮৮৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ (১৮৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আত্মজীবনী’ (১৮৯৮), রাজনারায়ণ বসুর ‘আত্মচরিত’ (১৯০৯), নবীনচন্দ্র সেনের ‘আমার জীবন’ (১৯০৮-১০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবনস্মৃতি’ (১৯১২), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার বাল্যকথা’ (১৯১৫), শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘আত্মচরিত’ (১৯১৮), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’ (১৯২১), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঘরোয়া’ (১৯৪১) ও ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ (১৯৪৪), বুদ্ধদেব বসুর ‘আমার শৈশব’ (১৯৭৩) প্রভৃতি আত্মজীবনী আমরা পেয়েছি।

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মতো আত্মজীবনীরও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে সাহিত্যের অন্যান্য উপাদান থেকে আলাদা করে রেখেছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলা যায় —

১. আত্মজীবনীর মূল কথা হলো আত্মউন্মোচন। লেখকের জীবনের কিছু তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে আত্মজীবনীতে। কেমন করে সে নতুন নতুন অনুভূতির আনন্দে দুলে ওঠে, কেমন করে বিশ্বলোকের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ তৈরী হয়, কোথা থেকে সে রস সংগ্রহ করে এই কথাগুলিই আত্মজীবনীতে স্রষ্টারা লিখে থাকেন।

২. আত্মজীবনীতে জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গরূপ থাকে। অর্থাৎ যিনি আত্মজীবনী লেখেন তার জীবনের একটা সম্পূর্ণরূপ তার আত্মজীবনীতে ফুটে ওঠে।

৩. আত্মজীবনীকার যে আত্মজীবনীটা লেখেন সেখানে একদিকে তার ব্যক্তিগত জীবন যেমন প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশিত হয় তৎকালীন সমাজজীবন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি। সাহিত্যের গবেষণায় তো বটেই, সমাজবিজ্ঞানীদের জ্ঞান পিপাসাও এগুলি অনেকখানি পূরণ করতে সক্ষম। সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে আত্মজীবনী গুলির মূল্য যাই হোক, একটি জাতির ইতিহাসে এগুলি মূল্যবান সম্পদরূপে পরিগণিত।

৪. আত্মজীবনের চমৎকারিত্ব নির্ভর করে আত্ম-উপলব্ধি ও অনুভূতির উপর, ঘটনা সংগ্রহের উপর নয়।

৫. আত্মজীবনীতে মানুষ আত্মআবিষ্কারে সচেষ্ট হন। অর্থাৎ আত্মজীবনীকার তার জীবনের ফেলে আসা স্মৃতিকে পুনরায় আবিষ্কার করেন। এককথায় আত্মজীবনী আসলে আত্মবিনির্মাণ।

৬. আত্মজীবনীকার নিজের কথা বলার মধ্য দিয়ে আমার ‘আমি’- কে তুলে ধরার একটি সূক্ষ ইঙ্গিত দিতে চান নিজস্ব বয়ানকেন্দ্রিক রচনার নামকরণের মধ্যে।

৭. আত্মজীবনীর অন্যতম অঙ্গীকার হল অকপট স্বীকারোক্তি। কিন্তু এদেশে অপ্রিয় সত্যকথা সামাজিক ভাবেই অনুচিত এবং জনমানসে জৈবিক কোন চিহ্নও অপ্রকাশ্য। সুতরাং অনেক সময় আত্মজীবনী হয়ে ওঠে নীরক্ত শরীরের মতই ফ্যাকাশে। অর্থাৎ মুখ আর মুখোশের তফাৎ বঙ্গদেশের আত্মজীবনীগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

৮. ব্যক্তিবিশেষের বোধ ও বোধির গাঢ়বদ্ধতা এবং তারতম্যের ওপর আত্মজীবনীর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৯. আত্মজীবনী শুধু ব্যক্তির উত্তরণের কথাই নয়, তা হল ব্যক্তির পারিপার্শ্বের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিকাশের ইতিহাস। সেকারণেই আত্মজীবনী উপন্যাস বা নাটকের মতো এক অনন্য শিল্পসৃষ্টি, যা স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

এই পর্যন্তই আমার আলোচনার বিস্তৃতি, আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিমিত নির্যাস। এই নির্যাস নিঙড়েই আমি দেখতে চেয়েছি, দেখাতে চেয়েছি আত্মকথার প্রকৃত স্বরূপকে। আমরা বুঝতে পেরেছি, আত্মকথা বা আত্মজীবনীমূলক রচনা বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা। তথাকথিত সাহিত্যকগণ শুধু নন, বাঙালি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন পেশার মানুষ শুরুর সময় থেকে অংশগ্রহণ করে আসছেন এই ধারায়। এর দরুণ বিচিত্র জীবনরস এবং সমাজ বিবর্তনের নানা অপরিশোধিত উপাদানের আকর বলা যেতে পারে এই ধরনের রচনাগুলিকে। সেই সঙ্গে এও জানতে পেরেছি, আত্মজীবনী হল অকপট আত্মউন্মোচন। আত্মখননের দিনলিপির সঙ্গে যখন যুক্ত হয় দেশ-কাল-সমাজের নানা প্রেক্ষাপট, তখন তা হয়ে ওঠে সময়ের ফসল ও ঐতিহাসিক দলিল, সেই সঙ্গে হয়ে ওঠে বহমান সময়ের জীবন্ত নথি ও যুগান্তরের

চিহ্ন। ফলে এই আত্মজীবনীগুলির সামাজিক তাৎপর্য কোনোভাবেই অস্বীকার করা চলে না; বরং তা হয়ে ওঠে উনিশ শতকের দ্বান্দ্বিকতাপূর্ণ নব চেতনাকে বোঝবার একটি বিশেষ ক্ষেত্র।

তথ্যসূত্র :

১) রায়, আশুতোষ, বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, পৃষ্ঠা-৭০-৭১

২) দেব, দূর্বা, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, পৃষ্ঠা-১৫

৩) রায়, আশুতোষ, বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, পৃষ্ঠা-৭১

৪) দেব, দূর্বা, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, পৃষ্ঠা-১৫

৫) বসু, সোমেন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-১

৬) দেব, দূর্বা, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, পৃষ্ঠা-১৬

৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চভূত, পরিচয় প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫

৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩।

৯) রায়, আশুতোষ, বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, পৃষ্ঠা-৭৫

সহায়ক গ্রন্থ-

চক্রবর্তী, ঈশিতা ও অন্যান্য, নৈঃশব্দ্য ভেঙে: আত্মকথনে ভারতীয় নারী, খোঁজ এখন পরিষদ, কলকাতা-৭০০০০৫, অক্টোবর, ২০০৫

দাশ, উদয়চাঁদ ও চক্রবর্তী, বৈশাখী (সম্পা.), আত্মকথা ও স্মৃতি-আখ্যানের লিপিমালা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০০৯, কলকাতা বইমেলা, ২০২৩

দেব, চিত্রা, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯, নবম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১৭

দাস, জয়িতা, অন্তঃপুরের স্বর: আত্মকথনের স্ত্রী- পর্ব, গাঙচিল, 'মাটির বাড়ি', কলকাতা-৭০০১১১, আগস্ট, ২০১৪

দেব, দূর্বা, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, ভারতী বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০০

দাশ, শিশিরকুমার, আত্মজীবনী: জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা (সম্পা.), কৈলাসবাসিনী দেবী রচনা সংগ্রহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা- ৭০০০০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা (সম্পা.), নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব (কালীপ্রসন্ন ঘোষ) , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ , ১৪১৯

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা, সময়ের উপকরণ: মেয়েদের স্মৃতিকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪

বসু, দক্ষিণারঞ্জন, আত্মচরিতে সমাজচিত্র, ভারত খণ্ড, কলকাতা, প্রথম পর্ব, বৈশাখ, ১৩৫৫

বেগম, মালেকা, আত্মকথা ও স্মৃতিকথায় নারী, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৯

বসু, সোমেন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা-৭০০০২৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩

ভট্টাচার্য, দেবীপদ, বাংলা চরিত সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৮২

ভট্টাচার্য, সুতপা, মেয়েদের স্মৃতিকথা, সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৭

রায় ,আশুতোষ, বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৪

সেন, অভিজিৎ ও ভট্টাচার্য, অভিজিৎ (সম্পা.), সেকেলে কথা: শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা- ৭০০০০৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

সহায়ক পত্র- পত্রিকা

আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৪০২

কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা সংখ্যা, বইমেলা, ২০১৪

কোরক সাহিত্য পত্রিকা, লেখিকাদের লেখালেখি, বইমেলা সংখ্যা, ২০১৭

ছাপাখানার গলি, আত্মজীবনী- এক, মে, ২০২২

ছাপাখানার গলি, আত্মজীবনী- দুই, মে, ২০২২

দীপন, ৯ বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা, জুন, ২০০৬

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

....

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানের দর্পণে প্রতিফলিত অতীতের সুন্দরবনঃ 'গাঙ বাঘিনি' উপন্যাসে

শ্রিয়া দত্ত

সারসংক্ষেপ-

সোহারাব হোসেন তাঁর ' গাঙ বাঘিনি' উপন্যাসে বলেছেন সুন্দরবনের বাউলে কাঠকাটানিয়া মাছমারাদের জীবনের কথা। সুন্দরবন এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার মানুষজন আর দীর্ঘকাল চলে আসা লৌকিক বিশ্বাস ও যাবতীয় মিথ নিয়ে। চরিত্রদের কথোপকথনে উঠে এসেছে বনবিবি- দক্ষিণরায়ের কথা। বাস্তব পরিস্থিতি সেই মিথ ভেঙেচুরে নিজের মতন করে গড়ে নিয়েছে। বনবিবি মিথের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিল সাবাড়ে নারী কাজলা। বিধবা যুবতী অসম্ভব সংযম নিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল অধরের প্রেমের প্রস্তাব। কাজলা জানে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তাকে দেখতে নেই। অধর এই স্বপ্ন দেখেছে। একাধিকবার তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। ধীরে ধীরে অধর একাকার হয়ে গেছে ছোট চামটে দ্বীপে বসতি স্থাপন করতে চাওয়া একটি পুরুষবাঘের সঙ্গে। জম্বুদ্বীপের প্রায় তিনশ' পরিবারের উচ্ছেদ হবার খবরে অধরের যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে উঠে এসেছে মাওবাদী সমস্যার কথা। মায়ানমার থেকে অস্ত্র পাচারের কথা। বাস্তব কিছু চিন্তাভাবনা আদ্যিকালের মিথের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। মিথের নবনির্মাণ ঘটেছে। এই নবনির্মাণ ঘটিয়েছে ছোট চামটেতে নির্বাসিত কাঠকাটানিয়ার দল। তারা কোস্টগার্ড বঙ্কিম মণ্ডলের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ করতে পারে নি। কারণ তারা জানে, সুন্দরবনের কাঠকাটানিয়া হয়ে শক্তিমানের কাছে শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর কাতর আর্জি জানানো চলে। তারপর পিছিয়ে আসা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই। হেরে যাওয়াটাই তাদের নিয়তি। বনবিবি তাদের রক্ষা করে বটে, কিন্তু দক্ষিণরায় নানা রূপ ধরে এসে তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে। মন্ত্র-ক্রিয়াকলাপ- বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলি এই কারণেই বারবার হেরে যায়। কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। সর্বস্ব হারানোর পরেও তারা লড়াই করতে চায়। তখন তাদের সামনে একমাত্র সত্য হয়ে থাকে 'মা বনবিবি মহাযুদ্ধের আখ্যান'। এই আখ্যানের ভাঙাগড়া চলতে থাকে নিরন্তর। মিথের ভাঙাগড়ায় একাকার হয়ে যায় অতীত ও বর্তমানের সুন্দরবন।

মূল শব্দ-

অতীত ও বর্তমানের সুন্দরবন , লৌকিক বিশ্বাস , বনবিবি মিথ , দক্ষিণরায় , জলদস্যু ও মাওবাদী সমস্যা
মিথের নবনির্মাণ , শিকড়বিচ্ছিন্ন মানুষের যন্ত্রণা , বিশ্বাসঘাতকতা

মূল প্রবন্ধ-

বাঘের দেশ সুন্দরবন। জঙ্গলের দেশও বটে। আবার জলের দেশও। সবকিছু মিলিয়ে সুন্দরবন কেবল এক ভূখণ্ড নয়। ভূগোলে পড়া বিদ্যা দিয়ে এর ভূপ্রকৃতির খবর জানা যায়, সৌন্দর্য বিচার করা চলে না। নানা মানুষের নানামাত্রিক দেখার মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রকৃত সুন্দরবন। জীবন্ত হয়ে ওঠে তার মানুষজন আর তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লৌকিক বিশ্বাস ও যাবতীয় মিথ নিয়ে। আসলে-

"আজকের উপন্যাস সাংকেতিক ও ব্যঞ্জনাঋদ্ধ ঘটনায়, চরিত্রের কথায় ও কর্মে, মিথে ও পরমাণু পরিমাণ মননের চিত্রণে নির্দিষ্ট ভূ- খণ্ডের চাল- চিত্রকে প্রতিফলিত করে।"[১]

বলেছেন সোহারাব হোসেন। তাঁর 'গাঙ বাঘিনি' উপন্যাসের ভূমিকায়। বলেছেন সুন্দরবনের বাউলে কাঠকাটানিয়া মাছমারাদের জীবনের কথা। ১৪১৭ বঙ্গাব্দের উৎসব সংখ্যা 'আরম্ভ' পত্রিকায় 'গাঙ বাঘিনি' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ। সামান্য রদবদলের পর ১৪১৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কোস্টগার্ড অধর চাকরির সূত্রে সুন্দরবন এলাকায় বাস করছে বছর পাঁচেক। সে দেখেছে নদীতে নদীতে মিতালি বাদার দ্বীপগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অসাধারণ করে তুলেছে। তার চোখে কলস ক্যাম্প কখনও রায়মঙ্গল মাতলা আর সাগরের কোমল আলিঙ্গনে ঘুমন্ত শিশুর মত নিষ্পাপ সৌন্দর্যের অধিকারী। কখনও আবার মোহময়ী, সুন্দরী যুবতী। জল জঙ্গলময় সুন্দরবন তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে অধরের চোখে। আর ফরেস্টার অফিসার অনিশ্চয়বাবু তাঁর পালায় অতীত সুন্দরবনকে দেখিয়েছেন। সে পালার কাহিনি সুন্দরবনের অতি পরিচিত বনবিবি-দক্ষিণরায়ের বিরোধের কাহিনি। তবে লোকপ্রচলিত কাহিনি থেকে এ পালার কাহিনি অনেকটাই সরে এসেছে। অনিশ্চয়বাবুর মতে, এ যেন ইতিহাসেরও আগের কালের কথা। এতটাই অতীত যে পুরাণ ইতিহাস সব একাকার হয়ে গেছে। পুন্ড্রক্ষত্রিয়রা বাদা অঞ্চলের ভূমিপুত্র। সাগর- নদীর মাছ, বাদার কাঠ- মোম- মধু প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে দরিদ্র ও বন্য জীবনযাপন তাদের। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ঝড় সুনামির কাছে তারা চির- অসহায় ছিল, আর অসহায় ছিল স্থলের বণিক বেরাহিম গাজির হামলার সামনে। দক্ষিণরায়কে মুখপাত্র করে তারা বেরাহিম গাজির আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। দক্ষিণরায়ের পুজো শুরু হয়েছিল।

"কিন্তু পৌরাণিক গ্রন্থে ব্যাঘ্রবাহন কোন দেব- দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বাংলাদেশে প্রচারিত ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়ের পৌরাণিক অস্তিত্ব নাই। অস্ট্রিক লোকধর্মই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া দক্ষিণরায়ে পর্যবসিত হইয়াছে।"[২]

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য অনুসরণে বলা যায় সুন্দরবনের এ এক মিথ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মিথ বদলেছিল। কালক্রমে রক্ষক দক্ষিণরায়ই হয়ে উঠেছিল ভক্ষক। স্থানীয় লুণ্ঠনকারী দক্ষিণরায়ের লুঠ করার দিনক্ষণ বা লুঠের পরিমাণের কোনও স্থিরতা ছিল না। কপিলমুনির কাছে কৈফিয়ত দেবার ভয়ে সে বন্ধু- সহচর বড়খাঁ গাজির সাহায্যে সব ধনসম্পদ লুকিয়ে ফেলেছিল। সেই 'আঠের ভাটির সম্পদ' বাদার কাঠকাটানিয়াদের কথায় এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। তারা বিশ্বাস করে ছোট চামটে দ্বীপ থেকে যে গরান তরা ধুন্দুল পাশুর গাছ তারা নিয়ে যেতে এসেছে, তাইই প্রকৃত 'আঠের ভাটির সম্পদ'। প্রাণ বাজি রেখে এই সম্পদ পাবার অভিযানকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে।

ক্ষমতাবানের অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন অসহায় মানুষ দৈবী শক্তির কাছে তার প্রতিকার খোঁজে। সুন্দরবনের লোকজীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বেরাহিম গাজির কন্যা বনবিবি একসময়ে হয়ে উঠেছিলেন এই বন্য মানুষগুলির রক্ষাকারিণী। তাদের বনবিবি বাল্যকাল থেকেই দক্ষিণরায়ের চক্রান্তে বনবাসিনী। কপিলমুনি তাঁকে বর

দিয়েছিলেন। তারপর সুন্দরবনের সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বনবিবি দক্ষিণরায়কে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। বন্য মানুষ আসলে এভাবেই নিজেদের মতন করে মিথ নির্মাণ করে নেয়। কল্পনায় গড়ে তোলে দেবদেবীর মূর্তি।

“সুন্দরবনের লোকসমাজে লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সমন্বয় ও সহাবস্থানের অকৃত্রিম উদাহরণ হল বনমাতা বনবিবি যে বাউলে মউলে সহ সুন্দরবনের শ্রমজীবী মানুষদের জল জমিন জঙ্গলে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকে এমনটাই বিশ্বাস।”[৩]

বনবিবির মূর্তির মধ্যে কোনও আড়ম্বর নেই। আটপৌরে মূর্তি তাঁর। যে দুখেকে বাঁচানোর জন্য দক্ষিণরায়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ, সেই বালক দুখে বনবিবির মূর্তির কোলে অথবা পদতলে স্থান পেয়েছে। মাতৃত্বের প্রকাশে বনবিবি সুন্দরবনের লোকসমাজের খুব কাছের একজন হয়ে উঠেছেন। বনবিবির প্রতি সাধারণ মানুষের এই সম্ভ্রমবোধের কথা জানত বলেই সকলের সামনে নিজেকে জীবন্ত বনবিবি রূপে উপস্থাপিত করেছে কাজলা। বাঘের পেটে আপনজনকে দিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া নারী কাজলা। বিধবা হবার আগে পর্যন্ত কাজলা সুন্দরবনের আর পাঁচজন নারীর থেকে আলাদা ছিল না। সাঁইদারের কাছে ঘরের পুরুষকে সঁপে দিয়ে সে নানান লৌকিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে স্বামীকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সেই লৌকিক আচার তাকে বলেছিল সধবা যুবতী নারীকে শাঁখা- সিঁদুর ত্যাগ করে, মাথায় তেল না দিয়ে, চুলের পরিচর্যা না করে, সাজসজ্জা বিসর্জন দিয়ে স্বামী ফিরে আসার অপেক্ষা করতে হবে। দিনের বেলা উনুনের ছাই ওড়ানো চলবে না, তাতে বনে পুরুষের চোখে আঁধি সৃষ্টি হবে। এসব লৌকিক আচার পালন করে মানসিক শান্তি মিলতে পারে, কিন্তু বনে থাকা স্বামীকে রক্ষা করা যায় না। কাজলাও পারেনি তার স্বামীকে রক্ষা করতে। বৈধব্য এলেও কাজলার শরীর থেকে যুবতী বাঘিনির আতপগন্ধ মুছে যায় নি। কাজলা জানে এ গন্ধ মুছে যাবার নয়। গন্ধে উন্মত্ত বাঘকে ঠেকানোর জন্য সে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে কাঁটাতার। ছোট চামটের কাঁটাতারের বেড়া পেরোতে পারেনি ডাঙাডুলির বাঘ। যুবতী বাঘিনির আতপগন্ধে শিকড় ছিঁড়ে আসা সেই বাঘ শেষ পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। নতুন করে শিকড়ের আশ্রয় খুঁজতে থাকা অধরও উন্মত্ত হয়েছে এই আতপগন্ধে। যতবার সে কাজলাকে পেতে চেয়েছে, ততবার কাজলার অসম্ভব সংযম কাঁটাতারের বেড়ার মত তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। কাজলা বলেছে-

“তফাত যাও বাবু! ... আমি বনবিবি! জ্যান্ত বনবিবি! মা বনবিবি আমার ওপর ভর করেছেন।”[৪]

নিজেকে বনবিবি বললেও কাজলা নিজের শরীরে অনুভব করে আতপগন্ধ ছড়ানো এক যুবতী বাঘিনির অস্তিত্ব। সেই বাঘিনি চায় উন্মত্ত পুরুষবাঘের কাছে ধরা দিতে। আবার কাজলা এটা জানে যে, একজন সাবাড়ের জীবনে শিকড় থাকতে নেই। সাবাড়ে ম্যানেজারের অধীনে কাজ করতে হয় তাদের। জাল আর নৌকা নিয়ে দিনের পর দিন নদীতে কাটাতে হয়। বাড়িঘরের কথা ভুলে যেতে হয় কয়েক মাসের জন্য। হঠাৎ বান এলে বা আচমকা ঝড় এলে কী হতে পারে সেকথা জোর করে ভুলে থাকতে হয়। ন্যূনতম দামে সারাদিনের মাছের সঞ্চয় তুলে দিতে হয় খটিদারের হাতে। পেটের ভাত জোগাড় করার জন্য নদীর বুকেই যার জীবন কাটে, ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলে তার চলে না। ছোট চামটেতে অধর তাকে প্রস্তাব দিয়েছে সাতজেলের বিধবা পাড়ার ঘরখানি ভেঙে ফেলে নতুন করে ঘর বাঁধতে। কাজলা উত্তর দিয়েছে- “বাদার বাংলো আর গোমরের পাড় অ্যাক লয় বাবু! ... বাদায় দু’দিনের জেবন। গোমরে চেরকালের!”[৫]

জীবনের অনিশ্চয়তাকে চিরসঙ্গী করে নেওয়া সাবাড়ে নারী কাজলা গোমরের রুগ্ন শিকড়টুকুর মায়া ত্যাগ করতে পারে না। শিকড় ছিঁড়ে আসার যন্ত্রনাকে ভয় পেয়েছে কাজলা।

অধরের মনে এ ভয় নেই। শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রনা তার বুকে প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ ঘটায়। বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে ঢাকায় বাস করত অধর। ১৯৭১- এর মুক্তিযুদ্ধ তার জীবনের যাবতীয় স্থিরতা কেড়ে নিয়েছিল। ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্য জনসভায় স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরিণাম অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ আর নির্বিচার গণহত্যা। অধর প্রথমে দেশ ছাড়তে চায়নি। ফরিদপুরের ধ্বজি গ্রামে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল আশ্রয়ের সন্ধানে। গ্রামও রক্ষা পায়নি সেই নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে। অধর এরপর চলে এসেছিল 'ইন্ডিয়া'তে। সে ভেঙে দিয়েছিল কাঁটাতারের ভেদবেড়া। অধর এই বেড়া মানে না। অধর বিশ্বাস করে কাঁটাবেড়া দিয়ে ভূখণ্ডকে ভাগ করে ফেলার সত্যিই কোনও মানে হয় না। আর যদি কাঁটাতারের বেড়া থাকে তাহলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে টপকে যেতে হয়। কাঁটাতারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল অধর। যতবার ব্যার্থ হয়েছিল ততই বেড়ে গিয়েছিল তার জেদ। কখনও লোকের বাড়িতে মাহিন্দারির কাজ, কখনও দোকানের কর্মচারীর কাজ, কখনও আবার হকারি করে দিন কাটিয়েছিল সে। বারবার উচ্ছেদ অপমান এমনকি মারধর সহ্য করেও দাঁতে দাত চেপে লড়াই করে গিয়েছিল সে। শেষ পর্যন্ত অধর কোস্টগার্ডের চাকরি পেয়েছিল। ছোট চামটের ওয়াচ- টাওয়ারে বসে সে দেখেছিল ডাঙাডুলি থেকে সাঁতরে আসা পুরুষবাঘটার দ্বীপে প্রবেশের মরিয়া চেষ্টা। বাঘটা যতবার লাফ দিয়েছে, কাঁটাতারের বেড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, ততবার অধরের বুকে ব্যথা বেজেছে। অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করেছে বাঘটা কখন নিজের উদ্দেশ্যে সফল হবে। এ যেন এক স্বপ্ন। শিকড় ছেঁড়া মানুষের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বলে-"সত্যিকারের পুরুষ হার মেনে অমন ফিরে যায় না।"[৬]

প্রত্যেকটি শিকড় ছেঁড়া মানুষই চায় নতুন শিকড়ে আশ্রয় খুঁজতে। অধরও চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। আসলে এ স্বপ্ন পূরণ হবার নয়। কারণ পুরাণ- রূপকথা- মিথের ওপরে স্থান করে নেয় বাস্তব। সেই বাস্তবের নির্মম অঙ্গুলিহেলনে অধরের স্ত্রী তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। পাঁচ বছরের মধ্যেই সংসারজীবনে ইতি টেনেছিল অধর। চাকরিসূত্রে সুন্দরবন এলাকায় এসে সে ভালোবেসেছিল কাজলাকে। কিন্তু কাজলাকেও সে পেল না। আসলে বাঘিনির আতপগন্ধে পাগল পুরুষবাঘের সামনে একমাত্র সত্য কাঁটাতারের বেড়া। এ সত্য বড় নির্মম। এ সত্য তাকে যতই ক্ষতবিক্ষত করুক, এ সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই। অধরের তাই রাগ হয়। সীমান্ত প্রহরী অধরের কাছে এই বেড়াটা বড় বেশি সত্য বলেই সে জোরের সঙ্গে বলে- "আমি ওই বেড়া মানিনে!"[৭]

শেষ পর্যন্ত ওপার থেকে আসা পুরুষবাঘটির নির্মম মৃত্যু হয়। মিথ বলে পুরুষবাঘের মৃত্যুতে নদীর বুকে চরের জন্ম হয়। শরীরে আতপগন্ধ ছড়ানো শত যুবতীর অশ্রুজল যখন মাটিতে মেশে, তখন মাটির গর্ভে সন্তান আসে। সেই সন্তান হল চর। সেই চর বড় হতে হতে দ্বীপ হয়। সেই দ্বীপে মানুষ ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কাজলা জানে সবুজ সে দ্বীপ সাগরের তল ফাটিয়ে মাটিতে শেকড় গেড়ে দিতে পারে না। ব্যর্থ পুরুষরস ও অশ্রুজলের মিলনে জন্ম নেওয়া দ্বীপের সামর্থ্য নেই ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূর্ণ করার। ঘটেছেও তাই। জম্বুদ্বীপের মানুষগুলির শান্তির নীড় তছনছ হয়ে গেছে। পুলিশ- কোস্টগার্ডের মিলিত অভিযানে জম্বুদ্বীপ থেকে প্রায় হাজার- বারোশ মানুষকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ এই, তারা সেখানে 'বেআইনি' বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের শুঁটকি মাছের ব্যবসা থেকে অর্জিত

টাকার লোভে জলদস্যুরা আসছিল। জলদস্যুরা শুধু দ্বীপেই ডাকাতি করছিল না, তার সঙ্গেই সর্বস্বান্ত করছিল সাগর পাড়ি দেওয়া নৌকোগুলিকে। অধর এই সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাজলা প্রশ্ন তুলেছে-"ঘর ভাঙলে, বসত উচ্ছেদ হল্যে, রক্ত বেরোয় না বাবু?"[৮]

রক্ত হয়ত বেরোয়, কিন্তু সে রক্তক্ষরণ চোখে দেখা যায় না। জম্বুদ্বীপে বউ- ছেলে- মেয়ে নিয়ে বাঁধা স্বপ্নের ঘর ভেঙে যাবার যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হয়েছে কাঠকাটানিয়া মন্টা। সর্বস্ব হারানোর কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে। এই কান্নাটুকুই চোখে দেখা যায়। উত্তর পাওয়া যায় না মন্টা আর কোনদিন তার পরিবারের মানুষগুলির সন্ধান পাবে কিনা। কেন এমন হল, সেই উত্তর কিন্তু খুব সহজেই মিলে যায়। বাস্তবের কাছে উত্তর না খুঁজে মিথের কাছে উত্তর খোঁজা হয় বলেই এত সহজে এ উত্তর মেলে। হানিফ সাঁইদার কথক- দরবেশ কিংবা ঠাকুরের মত করে শোনায় কপিল মুনি- বনবিবি- আর দক্ষিণরায়ের এক নতুন বৃত্তান্ত। দ্বীপের ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার বৃত্তান্ত। জম্বুদ্বীপের নাম এই ভাগাভাগির মধ্যে একবারও উল্লিখিত হয়নি বলেই এই দ্বীপে বাস করা মানুষগুলিকে সারাজীবন অস্তিত্বরক্ষার জন্য লড়াই করে যেতে হবে। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলে অসহায়ভাবে পরাজিত হতে হবে। এই পরাজিত মানুষগুলিকে রক্ষা করতে কোনও বনবিবির আবির্ভাব হয় না। কারণ, তাদের বনবিবি ভেক ধরতে পারে না। দক্ষিণরায় পারে। সে বারবার রূপ বদল করে হানা দেয় মানুষের নিশ্চিন্ত আশ্রয় কেড়ে নেবার জন্য। কখনও সে আসে জলদস্যু রূপে, কখনও বা পুলিশ- নেভিবাবু- কোস্টগার্ডের রূপ ধরে, কখনও সে ছদ্মবেশ নেয় মাওবাদীর। এভাবেই উত্তর খুঁজতে খুঁজতে বাস্তব কিছু চিন্তাভাবনা আদ্যিকালের মিথের সঙ্গে মিলেমিশে যায় । মিথের নবনির্মাণ ঘটে। আর এই নবনির্মিত মিথ বলে, শক্তি প্রয়োগ করে 'বনের বাবু'- র হাত থেকে বাঁচা না গেলেও ছলে আর কৌশলে বাঁচা নিশ্চয়ই সম্ভব। জম্বুদ্বীপের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কাঠকাটানিয়ার দল সাময়িকভাবে ছোট চামটেতে নির্বাসিত হয়েছে। তারা জানে ছোট চামটেতে বেআইনিভাবে কাঠ কাটতে আসার জন্য যে কৌশল তারা অবলম্বন করেছিল, সেই কৌশলই তাদের বিপন্মুক্ত রাখতে পারত। হানিফ সাঁইদার কাজলাকে বলেছে যুবতী বাঘের আতপগন্ধকে ব্যবহার করার কথা। সাঁইদার হিসেবে সে জানে এ কাজ পাপ। কিন্তু, সকলের মঙ্গলের জন্য পাপ- পুণ্যের ভাবনা থেকে কাজলা অনায়াসেই সরে আসতে পারত। সাঁইদার জানে- "আতপগন্দোর গব্ভ পালি বাবুটা শান্ত হোতো। ছোটো চামটের ঘাটে দুই ট্রলার বাঁধা থেকতো। শুধু তিন- তিন বার নয়, পাঁচবার রোমজানের ট্রলার হয় কলসে, নায় হ্যলিডেতে, নায় ঠাকুরানে গব্ভ খালাস কোরতো। আর ... আমরা সকলায় রামগঙ্গায় ফিরতি ট্রলার নোঙর কোরতি পারতুম!"[৯]

উদ্দেশ্যসিদ্ধি আর আত্মরক্ষার তাগিদ এভাবেই ভেঙেচুরে দেয় যাবতীয় মিথ। কাজলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এতদিনের বনবিবি মিথ একমুহূর্তে তছনছ হয়ে গেছে। অস্তিত্বহীনতার ভয় কাজলাকে ঘিরে ধরেছে। আর হানিফ সাঁইদার খুব সহজে এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে- "বনের যোবতি বনে চরতে!"[১০]

আসলে কাঠকাটানিয়ার দল শাস্ত্রবচনের বাস্তবায়ন চায় না। তারা চায় না নতুন দ্বীপের জন্ম দেখতে। তারা সবার প্রথমে চায় সুরক্ষা। এই সুরক্ষার জন্য যুবতী নারী কাজলাকে ব্যবহার করতেও তারা পিছপা নয়। কাজলাও বিশ্বাস করে যে, সে গোমরের শিকড় ছিঁড়লেই গোটা দল উদ্ধার পাবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস আতপগন্ধ পেলে পুরুষবাঘ পাগল না হয়ে থাকতেই পারে না। এই বিশ্বাস নিয়ে কাজলা উন্মাদ অধরের সামনে গেছে। কিন্তু তার এটা জানা ছিল না, পুরুষবাঘের কাঁটার

আঘাত সহ্য করার একটা সীমা আছে। কাঁটার আঘাতে রক্ত ঝরতে ঝরতে পুরুষবাঘ একসময় মরে যায়। বহুদূর থেকে সাঁতরে আসা বাঘটির মৃত্যুসংবাদ অধরকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। গুলি চালিয়েছে অধর। আহত হয়েছে কাজলা।

কোস্টগার্ড বঙ্কিম মণ্ডল এই ঘটনার আকস্মিকতাকে ব্যবহার করে নিজেদের সুরক্ষিত করে ফেলেছে। বেআইনি কাঠ- পাচারে সহায়তা করার সন্দেহ পড়তে শুরু করেছিল তাদের ওপর। বঙ্কিম জানে যাবতীয় সন্দেহের ভার তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলার এটাই একমাত্র সুযোগ। যুবতী বাঘিনির আতপগন্ধের লোভে যে কাজ তারা করেছে, তার ফলশ্রুতিতে তাদের চাকরিজীবন যে কোনও মুহূর্তে বিঘ্নিত হতে পারে। বাঘিনির আতপগন্ধের লোভ মানুষের জীবনকে কতটা অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিতে পারে, অধরের জীবনকাহিনি শোনার পর তা বঙ্কিমের অজানা ছিল না। অধর অনিশ্চয়তাকে ভালবাসতে পারে, বঙ্কিম পারে না। অধর জলদস্যু- বেআইনি কাঠকাটানিয়া- মাওবাদী- অনুপ্রবেশকারীর রাজত্ব চাইতে পারে, বঙ্কিম পারে না। কারণ অধর কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে আসা ক্ষতবিক্ষত- রক্তাক্ত পুরুষবাঘ, বঙ্কিম তা নয়। বঙ্কিম চায় না পুরুষবাঘ হতে। বাঘিনির আতপগন্ধে পাগল পুরুষবাঘ হবার মধ্যে যে উত্তেজনা আছে, সেটুকু পাবার জন্যই বঙ্কিম কাঠকাটানিয়ার দলের সাথে ছোট চামটেতে এসেছিল। কিন্তু উত্তেজনার বশে অধরের মত আত্মহারা হতে সে পারে না। তাই নিপুণ কৌশলে সে উপরমহলের চোখে কাঠকাটানিয়ার দলটাকেই 'মাওবাদী' বানিয়ে দিয়েছে। ছোট চামটেতে লুকিয়ে থাকা হাজার মাওবাদীর মধ্যে এই নিরীহ কাঠকাটানিয়াদের ফেলে চলে যেতে বঙ্কিম দু'বার ভাবেনি। অপরাধবোধের কোনও চিহ্ন তার মধ্যে দেখা যায় না। কারণ সে এক ফাঁকা সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করে ফেলেছে- "কলসে ফিরে, আমি কোনও- না- কোনও ইলিশমারা ট্রলারে তোমাদের কথা জানিয়ে দেবো। তারা এসে তোমাদের উদ্ধার করবে।"[১১] হানিফ সাঁইদার প্রতিবাদ করতে পারে নি। কারণ সে জানে, সুন্দরবনের কাঠকাটানিয়া হয়ে শক্তিমানের কাছে শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর কাতর আর্জি জানানো চলে। তারপর পিছিয়ে আসা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই। হেরে যাওয়াটাই তাদের নিয়তি। বনবিবি তাদের রক্ষা করে বটে, কিন্তু দক্ষিণরায় নানা রূপ ধরে এসে তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে। এই মিথের সাথেই মিলেমিশে যায় এক দৃঢ় বিশ্বাস-"জেলে মাঝির জান। কুনো দাম নাই। কুনো ভরসা নাই। কখুনো হাসি, কখুনো কান্না!"[১২]

সুন্দরবনের জেলে- মাঝি- কাঠকাটানিয়ারা জানে, দক্ষিণরায় যখন মানুষের রূপ ধরে, তখনই সে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তার মতিগতি বোঝা যায় না, তাকে বিশ্বাস করলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে একমুহূর্ত দেরি করে না। হানিফ সাঁইদার বাঘবন্দির মন্ত্র জানে, বাঘ-বাঘিনির দাঁতে খিল লাগানোর মন্ত্র তার অব্যর্থ, কোনও বিষাক্ত সরীসৃপের গড়বন্ধন মন্ত্রের গণ্ডি পেরোনোর সাধ্য নেই, কিন্তু মানুষ- বন্দির মন্ত্রটাই তার শেখা হয়নি এখনও। আসলে এ মন্ত্র শেখা যায় না। মন্ত্র- ক্রিয়াকলাপ- বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলি এই কারণেই বারবার হেরে যায়। কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। সর্বস্ব হারানোর পরেও তারা লড়াই করতে চায়। তখন তাদের সামনে একমাত্র সত্য হয়ে থাকে 'মা বনবিবি মহাযুদ্ধের আখ্যান'। এই আখ্যানের ভাঙাগড়া চলতে থাকে নিরন্তর। মিথের ভাঙাগড়ায় একাকার হয়ে যায় অতীত ও বর্তমানের সুন্দরবন।

তথ্যসূত্র-

(১) 'গাঙ বাঘিনি', বলার কথা (ভূমিকা), সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(২) 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৮, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড , কলিকাতা- ৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ- ১৯৬৬
(৩) 'সুন্দরবনের পুঁথি ও পাঁচালি', পৃষ্ঠা ১৪, গৌতমকুমার দাস, সোপান, কলকাতা- ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা, ২০২০
(৪) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ২৪, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(৫) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ৮১, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(৬) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ১২৭, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(৭) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ১০৩, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(৮) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ১২৯, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(৯) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ১৫১, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(১০) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ১৫১, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(১১) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ১৬৪, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১
(১২) 'গাঙ বাঘিনি', পৃষ্ঠা ১৩, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি-

(১) দাস, গৌতমকুমার, সুন্দরবনের পুঁথি ও পাঁচালি, সোপান, কলকাতা- ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা, ২০২০
(২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড , কলিকাতা- ৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ- ১৯৬৬
(৩) হোসেন, সোহারাব, গাঙ বাঘিনি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১১

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী : ফিরে দেখা ও পর্যালোচনা

প্রসেনজিৎ দাস, ড. উৎপল মণ্ডল

আবহমান কাল ধরে বয়ে চলা মানব জীবনে কতই না বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। জীবন সংগ্রামের নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে ইতিহাস রচিত হয়। আর এই ইতিহাস রচনার উপযুক্ত উপকরণ মানব সমাজের ধাপে ধাপে সঞ্চিত হয়ে নদী প্রবাহের মতো অবিরাম গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কাল সীমানায় খুব বেশি দূর এগোবো না। বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে ঘটে যাওয়া মন্বন্তর নিয়ে আলোচনা করব। এই মন্বন্তর বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের মানুষ অনাহারে কঙ্কাল রূপ ধারণ করেছিল। গানের ভাষায় -

"ভুল না রেখ মনে বাঁচবে যত কাল
সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাল।
তুলে রব লড়াই এল দেশে
চোরেরা সব দল বাঁধে ভাই রক্ষকেরই বেশে
তারা বাগিয়ে ভুঁড়ি হাঁকায় জুড়ি লুটের মালে লালে লাল।।
এল কাল পঞ্চাশের আকাল।।"[১]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে 'ভারতছাড়ো' তথা আগস্ট আন্দোলন, ভারতবর্ষে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা। এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে নেমে আসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' এর মতো অভিশাপ। এর ফলে সারা বাংলাদেশে ৩৫ লক্ষ্য মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল।

গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) বিদগ্ধ মননশীল কথা সাহিত্যিক। তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে তিনি তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচিত মন্বন্তর ত্রয়ী ‘পঞ্চাশের পথ' 'ঊনপঞ্চাশী' ও 'তেরশ পঞ্চাশ'। এই তিনটি উপন্যাস আলাদা আলাদা পর্বে রচিত হলেও অসংলগ্ন নয়। এগুলি মূলত সমকালীন ইতিহাসের দলিল কিংবা ডকুমেন্টারি উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। গোপাল হালদারের এই উপন্যাসগুলির ব্যপ্তি ১৯৪২ সালের এপ্রিলের শেষ থেকে ১৯৪৪ সালের এপ্রিলের মধ্যভাগ পর্যন্ত। লেখকের কথা অংশে তিনি বলেছেন - "প্রথম পর্বের নাম 'পঞ্চাশের পথ' ; মোটামুটি এর ঘটনাকাল ১৯৪২ এর এপ্রিলের শেষ (বৈশাখ, ১৩৪৯) থেকে ১৯৪২ এর আগস্টের প্রথমভাগ (শ্রাবনের শেষ, ১৩৪৯) পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্বের নাম 'পঞ্চাশের উপান্ত'; মোটামুটি এর ঘটনাকাল ১৯৪২ এর আগস্ট (শ্রাবন, ১৩৪৯) থেকে ১৯৪২ এর ডিসেম্বরের শেষ (পৌষ, ১৩৪৯) পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্বের নাম '১৩৫০'; মোটামুটি এর ঘটনাকাল ১৯৪৩ এর জানুয়ারি (পৌষের ফসলের সময়, ১৩৪৯) থেকে ১৯৪৪ এর এপ্রিলের মধ্যভাগ (চৈত্র, ১৩৫০) পর্যন্ত।”[২] মহামন্বন্তরের মহাকাব্যিক দলিল চিত্র হিসাবে এই উপন্যাস গুলির প্রথম দুটি পর্বে ঔপন্যাসিক পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে সমসাময়িক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন এবং তৃতীয় পর্বে মন্বন্তরের সম্পূর্ণ বর্হিপ্রকাশ তুলে ধরেছেন।আমরা যদি তিনটি উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনা করি তবে দেখা যাবে এই ঘটনাধর্মী উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামক ইতিহাসই এই উপন্যাস গুলির প্রধান নায়ক। সেই জন্য গোপাল হালদার ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য নিজের চোখে দেখা ঘটনা ও সমকালীন মানব জীবনকে অবিকৃত রেখেই

ইতিহাসের দলিল রচনা করতে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন- "সত্যকারের যে কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে এই সমস্যা। ঘটনাকে বিকৃত করা চলে না, মানুষকে অবান্তর করে তোলাও চলে না। সেরূপ উপন্যাসে আসলে ঘটনাই মহানায়ক।"[৩]

তবুও আমরা উপন্যাস গুলিতে নানান চরিত্রের আগমন ও প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করি। তাই কেউ ঘটনার স্রোতের অনুকূলে এগিয়েছে কেউ বা স্রোতে ভেসে গেছে। তিনটি পর্বে যে দুটি চরিত্র সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে তারা হলেন বিনয় ও সুধা। তাদেরকেই আমরা এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা হিসেবে ভূষিত করতে পারি। বার্মা থেকে প্রত্যাগত "বিনয় দেখতে চায় তার স্বদেশ, চিনতে চায় তার দেশের লোককে।"[৪] আর সেই সূত্রেই নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুধার সঙ্গে। কিন্তু বিনয় রাজনীতি বিমুখ। সে সুধাকে বলেছে- " আমি কিন্তু পলিটিকসে নেই, আগেই বলছি মিস গুপ্তা।"[৫] অপরদিকে সুধা হলো কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যা। এবিষয়ে বলাবাহুল্য ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার ছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে 'পিপলস রিলিফ কমিটি'র সদস্যরূপে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে মন্বন্তর পিরিত মানুষদের কে খুব কাছে থেকে দেখেছেন।অর্থাৎ - "নিজের চোখে দেখা ঘটনা ও মানুষকে যথাসাধ্য অবিকৃত রূপেই লেখক উপস্থিত করেছেন উপন্যাসের পাতায়।"[৬]

আমরা যদি চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস লক্ষ্য করি তবে দেখা যায় তখন সারা বিশ্ব জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের আতঙ্ক থেকে রক্ষা পায়নি। ব্রিটিশদের বিরোধী শক্তি জাপানের আক্রমণ আশঙ্কায় নিজেদের কে যুদ্ধের রণাঙ্গনে সজ্জিত করতে থাকে ব্রিটিশ শাসক। ফলস্বরূপ এই সময় যুদ্ধের করাল ভাবমূর্তি বাংলাদেশের বুকে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে সমাজজীবনকে বিদ্ধস্থ করে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার জাপানি আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর ঘাঁটি তৈরি করে। এছাড়া সেনাবাহিনীর রসদ সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ সরকার দেশের যাবতীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে নিজেদের আয়তে রাখতে শুরু করেছিল। এমনকি দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত শস্য নষ্ট করে দেওয়া হয়। যানবাহন চলাচল নির্দিষ্ট করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামকে একদিন অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে অন্যত্র স্থানান্তরে নির্দেশনা জাড়ি হয়। গৃহচ্যুত মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। পথে ঘাটে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষের মৃতদেহ। পঞ্চাশের মন্বন্তর যেন সাধারণ মানুষের মৃত্যুকেই তাড়া করেছিল। এই মন্বন্তর সম্পর্কে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন- "এদিকে যুদ্ধের প্রসার, দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাপান তরতর করে এগুচ্ছে। সিঙ্গাপুরও তাদের দখলে। অবিভক্ত বাংলায় তখনই ঘনিয়ে এল কালো ঘন মেঘ। ব্রিটিশ সেনাদের খাদ্য যোগানোর জন্য শুরু হল গ্রাম বাংলার উজার করে ধান চাল সংগ্রহ। আর এর সুযোগ নিল বাংলার রাঘব বোয়াল, মজুতদার, চোরাকারবারি ও আড়তদার। ইস্পাহানীর মতো মজুতদারকে চাল সংগ্রহের এজেন্ট নিয়োগ করা হল। রাতারাতি বাজার থেকে ধানচাল উধাও হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে চালের দাম হু-হু করে বেড়ে চলল এবং তা গ্রামের মানুষের- বিশেষ করে খেতমজুর, ভাগচাষি, প্রান্তিক চাষি, কুটির শিল্পী ও জেলেদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। অবিভক্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে শুরু হল হাহাকার। হাড় জির জিরে কঙ্কালসার নরনারীর মিছিলে কলকাতা ভরে গেল। কিন্তু শহরেই বা চাল কোথায়! যা আছে তাতো বৃত্তবানদের জন্য। শুরু হল ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে উচ্ছিষ্ট খাওয়ার প্রতিযোগিতা। আর মায়ের কোলে মাথা রেখে সন্তান ও মা-র মৃত্যু অথবা মা-র বুকের দুধ পাবার জন্য শিশু তার মাই-এর বোঁটা চুষে চলছে, কিন্তু সে জানে না তার মা অনেক ক্ষন আগেই চিরকালের জন্য খিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এই ধরনের কত মর্মান্তিক দৃশ্য সেদিন চোখে দেখেছি।"[৭]

এছাড়া ১৯৪২ সালে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা অনুভব করে ব্রিটিশ সরকার সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলি থেকে দশজনের বেশি বহনকারী নৌকা গুলিকে সাধারনের কাছ থেকে কেড়ে নেয় বা পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেয়। ফলে মৎস্যজীবীদের দুর্দশা করুন অবস্থা অনুমান করা যায়। এছাড়া চাষীদের নাঙ্গল, চাষের সরঞ্জাম কেড়ে নেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ যা চাষীদের হাত পা কেটে দেওয়ার সমতুল্য বিষয়। গোপাল হালদার প্রতিটি উপন্যাসকে তথ্যসমৃদ্ধ করে যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে মন্বন্তরের ইতিহাস আর আলাদা করে লেখার প্রয়োজন নেই বললেই চলে।

কালসীমার দিক দিয়ে "পঞ্চাশের পথ" উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মন্বন্তর শুরু হওয়ার প্রাক্কালে।প্রথমেই দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী সৈন্যরা বার্মা দখল করে নিলে অনেক ভারতীয় বার্মা থেকে ভারতের চলে আসে। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্রিটিশ সৈন্য সমাবেশ করা হয় এবং শুরু হয় 'ডিনায়েল পলিসি।' উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার বিনয় মজুমদার, যিনি বার্মা থেকে ফিরে এসেছেন ভারতে। বার্মাতে তাঁর জন্ম হলো ভারতবর্ষ তার নিজের স্বদেশভূমি। সোনাকান্দি বিনয়ের নিজস্ব গ্রাম। সেখানেই এসে আশ্রয় নিয়েছে। যুদ্ধের দিনগুলোতে বিনয় বুঝতে পেরেছিল - "গ্রামেই থাকতে হবে এখন বাঁচতে হলে- শহরতো রেঙ্গুনের মত মৃত্যুর ফাঁদ হবে জাপানের বোমার মুখে।"[৮] কারণ কলকাতা শহরে জাপানি বিমান হামলার সম্ভাবনা প্রবল। সোনাকান্দিতে নিজের বাড়ি সংস্কার করে বসবাসের উপযোগী করার উদ্যোগ নিতে সরকার থেকে আদেশ এসেছে বাড়ি ছাড়তে হবে। "সোনাই নদীর ধার ধরে তারা ঘাটি তৈরি করবে, আগলাবে বাংলা। অতএব, সোনাকান্দি হবে তাদের একটা আস্তানা, বিনয়ের বাড়িটাতেই তাদের কর্তারাও আপাতত বাস করতে পারবে। 'গ্রাম তোমরা ছাড়ো- চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে।' কোথায় গাড়ী, কোথায় লোকজন, কোথায় কে যাবে? এ যেন আবার বার্মা ছাড়া পালা।"[৯]

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা জানে গ্রামের বড়লোক একমাত্র বিনয় মজুমদার। তাই সবাই বিনয়ের কাছে ছুটে এসেছে সাহায্যের আশায় বিনয়ও তাদের সঙ্গে এগিয়ে গেছে। এই উপন্যাসে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবটাই মানুষের দুর্দশার মুখ্য কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সবাইকে একদিনে বাড়িঘর ছাড়তে হল। ক্ষেতের ফসল পড়ে রইল ক্ষেতে, গাছের ফল, পুকুরের মাছ পরে রইল- কত পুরুষের ভিটা পারে রইল পিছনে। কথা ছিল তারা সরকারের থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে। ক্ষতিপূরণের আশায় অসংখ্য মানুষ লাইনে দাঁড়িয়েছে কিন্তু কোথায়? কবে? তার জন্য ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সরকার আরো নতুন আদেশ জারি করে- "ফসল নষ্ট করে ফেলতে হবে; নৌকা থানায় জমা দিতে হবে; সাইকেল, মোটর সব সরকার নিয়ে নেবে- কিন্তু কৈ তার ক্ষতিপূরণ?"[১০] সরকারি আমলা, কর্মচারীরা তাদেরকে নানা অজুহাতে ক্ষতিপূরণের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত চায়। কিন্তু ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায় কমিউনিস্ট কর্মীরা। একই উদ্দেশ্য বিনয়ও ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে সোনাপুর, চাঁপাডাঙ্গা, মথুরাপুর, মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে। কমিউনিস্ট কর্মী সুধা গুপ্ত, কৃষক কর্মী যতীন দাসের সঙ্গে বিনয় সঙ্গী হয়েছে।"বিনয় বলে: আমি কিন্তু পলিটিকসে নেই আগেই বলছি মিস গুপ্তা। "[১১]

বিনয় রাজনীতি না করলেও ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। চাঁপাডাঙ্গা'য় সৈন্যদের জন্য জমি দখল করা হচ্ছে সুধা গুপ্তরা সেখানে যাবে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সহযোগিতা করার জন্য, ক্ষতিপূরনের টাকা পাইয়ে দেবার জন্য। বিনয়ও রাজি হয়েছে তাঁদের সঙ্গে যেতে। চাঁপাডাঙ্গায় সুধার জনসেবা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্পষ্টবাদীতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিনয়কে আপ্লুত করে। এমনকি সুধাকে ঘিরে বিনয়ের মনে অনুরাগের করে সঞ্চার হয়।চাঁপাডাঙ্গার কাজ শেষ করে বিনয় কলকাতায় ফিরে এসেছে ভগিনী হেনার বাড়িতে। তাঁর ভগ্নিপতি শচীপ্রসাদ একজন বড় ব্যবসায়ী। শচীপ্রসাদ বিনয়কে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয় করান এবং বিনয়কে ব্যবসায়ী হতে পরামর্শ দেন। বিনয় সকল ব্যবসায়ীর উন্নতি দেখে ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শচীপ্রসাদ বিনয়কে ঔষধের কারখানা করতে সহযোগিতা

করে। অপরদিকে হেনা চায় বিনয় চিত্রাকে বিয়ে করুক। চিত্রা হল শচীপ্রসাদের বন্ধু মিষ্টার মিত্তিরের বোন। চিত্রাকে বিনয়ের পছন্দ হয়। "সুশ্রী সে, আর স্মিতহাসিনী, তরুনী। স্মিতহাসিনী কিন্তু মিতভাষিণীও। দেখলেই বোঝা যায়, মিষ্টার মিত্তিরের বোন- আর সে বুদ্ধিমতী। মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে, আছে সহজ শ্রী আর হ্রী, শোভনতা আর সংকোচ। "[১২]

পরবর্তীতে বিনয় ফিরে এসেছে নিজের গ্রাম সোনাকান্দিতে। এই গ্রাম ছেড়ে বিনয় পনেরো কুড়ি দিন মাত্র বাইরে ছিল তাতেই গ্রামের চেহারা বদলে গেছে। "ফৌজী জোয়ার যেন আরো উজান বইছে। এখানে-ওখানে স্টেশনের চারিদিকে তাঁবু, লোক-জন, কুলি-মজুর, খাকী পরা নানা বিভাগের ফৌজী পাইক-লস্কর, তাদের ছোট বড় কর্তা, স্টেশনে দেশী ও বিলাতী রেল- কর্মচারীরাই যেন তাদের মধ্যে লোপ পেয়ে গেছে, সব ফৌজী লোকের হাতে।"[১৩] বিনয়ের আলাপ হয় কমিউনিস্ট নেতা মজিদ, শিবুদা, মীর শাহেদুদ্দিন, লীগের নেতা জাহিদুদ্দিন, কন্টাক্টর ইদ্রিস মিয়া, খাঁ বাহাদুর সাহেব, বাঈ আম্মা'র সঙ্গে। এই বাঈ আম্মাকে দেখে বিনয়ের সামনে একটা নতুন পৃথিবী জেগে উঠে। পরিচয় হয়েছে সীতা রায়ের সঙ্গে। যিনি নারী বিদ্যামন্দিরের হেড মিস্ট্রেস। সে এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে স্কুলের জন্য মেয়ে জোগাড় করে কিন্তু যুদ্ধের আবহে স্কুল উঠে যেতে পারে এমনই তার আশঙ্কা।

কলকাতা থেকে আসার সময় বিনয় হেনাকে কথা দিয়ে এসেছিল ক্ষতি পূরণের টাকা পেয়ে পুনরায় কলকাতায় ফিরে যাবে। ক্ষতিপূরণের টাকা সে পেয়েছে কিন্তু সোনাকান্দিতে বিনয়ের কাজ শেষ হয়নি। সীতাও বিনয়কে কলকাতায় ফিরে যেতে নিষেধ করছে। আমরা দেখি বিনয়ের মানসিকতার দোলাচলতা শুরু হয় চিত্রা ও সুধাকে কেন্দ্র করে। হেনা বিনয় কে বারবার চিঠি লিখেছে কলকাতায় ফিরে যেতে। হেনা চায় বিনয় চিত্রাকে বিয়ে করুক। কিন্তু চিত্রার প্রতি বিনয়ের আগ্রহ দিন দিন কমে যায়। বিনয়কে অনুরক্ত হতে দেখা যায় সুধার প্রতি। এই সোনাকান্দিতে কিন্তু বিনয়ের ভালোলাগার আরেকটি পর্ব উন্মোচিত হয়েছিল স্কুল টিচার সীতাকে অবলম্বন করে। যদিও প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়নি তথাপি সীতার প্রতি স্নেহ ও বন্ধুত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে এগিয়ে যায়। এরপর বিনয় গ্রামের সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় নিজেকে ব্যস্ত করে নেয়। সকলের স্বার্থে সে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মে নিযুক্ত হয়। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দেশের আকাশে বাতাসে দারুন উত্তেজনা দেখা দেয়।বিনয়ও নিজেকে সংগ্রামী হিসেবে মনে করেছে। এরপর দেখা যায় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ক্রীপস মিশনের আলোচনা ভেঙ্গে যায়। সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে অগাস্ট আন্দোলন। তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার দ্বারা বে-আইনি ঘোষিত হয়। বিনয় সংবাদপত্রে দেখল- "মহাত্মা গান্ধী গ্রেফতার, সমস্ত কংগ্রেস নেতারাই ধৃত, কংগ্রেস বে-আইনি ঘোষিত, বোম্বাই-এ দাঙ্গা ও আগুন।"[১৪] ঠিক এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি "জনযুদ্ধ নীতি" গ্রহণ করলে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের সহায়তা করে এবং জেলবন্দি অনেক কমিউনিস্টকে মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ বলে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বিনয় কমিউনিস্টদের এই "জনযুদ্ধ নীতি" নিয়ে সকলের কাছে প্রশ্ন রাখে। সাধারণ মানুষও কমিউনিস্টদের এইরূপ মনোভাব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। বিনয় বুঝতে পেরেছিল এই সুযোগে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের কাজে লাগানোই ছিল ব্রিটিশ সরকার মূল উদ্দেশ্য। এরপরই বিনয়ের কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। সে অনুভব করে- "কাজের দিন এল দেশের, কাজের দিন এলো এবার সকলের, ভারতবর্ষের সকল মানুষের প্রাণ ঘোষণা করছে- 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"[১৫]

মন্বন্তর ত্রয়ী'র দ্বিতীয় পর্ব হল "উনপঞ্চাশী"। উপন্যাসটি রচনার সময় গোপাল হালদার এর নাম রেখেছিলেন "পঞ্চাশের উপান্ত"। আমরা এই উপন্যাসটিকে "'ঘটনার চিত্র' কিংবা 'সময়ের ডায়েরি' হিসাবে বর্ণনা করতে পারি। ঔপন্যাসিক বলেছেন- "এই গ্রন্থ ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক কথাচিত্র, অর্থাৎ ইতিহাসকে বিকৃত না করেও স্বীকার করা মানুষকে; আবার কোনো একজনার কথাকেও একান্ত না করে প্রাধান্য দেওয়া নানা মানুষের কথাকে, ঘটনা চিত্রকে।"[১৬] উপন্যাসটিতে দেখা যায় মন্বন্তর শুরুর প্রাক্কালে বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতির অসমবর্ণ্ঠন, শাসন ব্যবস্থায়

ব্যর্থতার চিত্র। আমরা দেখি কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন, যার মুখে জনতার বিভিন্ন স্থানে সরকারি অফিস ভাঙচুর,ডাকঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ঘটনা, ট্রাম বন্ধ করে দেওয়ার দৃশ্য। এই সব ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হয়ে সামনে দাঁড়ালো ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও মিলিটারী। ফলস্বরূপ এঁরা জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়, বেপরোয়া ভাবে গুলি করে অসংখ্য কংগ্রেস কর্মীদের হত্যা করে এবং গ্রেফতার করে।

"উনপঞ্চাশী" উপন্যাসটি শুরু হয়েছে গান্ধীজী'র "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। "মহাত্মাজী গ্রেফতার, পন্ডিত নেহরু গ্রেফতার, মৌলানা আজাদ গ্রেফতার- বোম্বাই আগুন, দাঙ্গা।"[১৭] কংগ্রেসের এই অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে মুসলিম লীগ সমর্থন করেনি। মুসলিম লীগের নেতা মীর শাহেদুদ্দীন মনে করে কংগ্রেসকে মূলত অখন্ড হিন্দুস্তান প্রস্তাব নাকচ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়া। তাদের ধারণা কংগ্রেস দেশ স্বাধীন করে নিলে তারা অর্থাৎ মুসলিম লীগ হবে তাদের অধীন। উপন্যাসে দেখা যায় গান্ধীজীর "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" এই আহ্বান সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল।

"উনপঞ্চাশী" উপন্যাসে দেখা যায় জাপানী বিমান আক্রমণের সম্ভাবনায় কলকাতার সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাতের বেলায় অপ্রত্যাশিত সাইরেনের শব্দে মানুষের মধ্যে ভয়, অসহায়তা, স্তব্ধতা ও প্রাণে বাঁচার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। বিনয় অনুভব করছে আজ মানব সভ্যতার বিপর্যয়, অভিশাপ স্বরূপ যুদ্ধ ও হিংসাত্মক রাজনীতি। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে মানুষ কলকাতা ছেড়ে নানা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। যুদ্ধের আতঙ্কে দু:স্থ, রুগ্ন, ত্রস্থ - সবাই চলছে, ছোটখাটো পোটলা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী চলছে, সঙ্গে রয়েছে তাঁদের পুত্র কন্যা। ভিটেমাটি ছেড়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে অবলম্বন করে শহর ছেড়ে নিরাপদে আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে তাঁরা। কমিউনিস্ট কর্মীদের আমরা দেখি দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের জন্য দিনরাত নিরলস খেটে যেতে। সোনাপুরে প্রমথ, মজিদ, শিবুদা থেকে শুরু করে কলকাতায় অমিতদা,সধা গুপ্ত, প্রমুখরা সোনাপুর চাঁপাডাঙ্গা, মেদিনীপুরে বারবার মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনয় দেখেছে মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে কলকাতার বাজারে। চলছে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দলাদলি। ব্যবসায়ীরা কালোবাজারী করে বাজার থেকে সমস্ত চাল কিনে নিয়ে কৃত্রিমভাবে চালের অভাব তৈরি করছে। এছাড়া দেখা যায় কল কারখানার অভিজাত মালিকরা কংগ্রেসকে সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে আর তারা যুদ্ধের একটাও কন্টাক্টও হাতছাড়া করেনি, একটা কারখানাও বন্ধ করেনি। তাঁরা শ্রমিকদের চালের লোভ দেখিয়ে তৈরি করছে যুদ্ধের সরঞ্জাম। তাই বিনয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। "... দেশের প্রতি জাতির প্রতি যদি কেউ আজ বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তবে তা করছে কে, তা আমি দেখেছি। করেছে তা দেশের ধনিকেরা - যারা কংগ্রেসকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে, আর নিজেরা একটা যুদ্ধের কন্ট্রাকট ও ছাড়েনি, একটা কল বন্ধ করে নি। করেছে কাগজওয়ালারা - যারা জাতীয়তার ব্যবসা ফেঁদেছে, আর 'নিরুপায়' বলে অজুহাত দেখিয়ে আজ যুদ্ধ ও যুদ্ধব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনে ও মুনাফায় ফেঁপে উঠছে।" [১৮]

দেখা যায় চল্লিশের দশকের শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নিজেদের ন্যায়-নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে কেউ দালালি করছে কেউ বা কন্ট্রাকটর হয়েছে। মুরারি সেন, শচীপ্রসাদ, ধরমবীর মেহেরা, মুকুন্দ পাল, ইদ্রিস মিয়া মুনাফার মৃগয়ায় মেতে উঠেছেন। মুরারির ব্যাঙ্ক টাকায় পূর্ণ হয়েছে। বাঙালি ব্যবসায়ীরা মারোয়ারী কিংবা পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কেউ কেউ নতুন নতুন শিল্প কারখানা তৈরি করছে। চারিদিকে শুধু টাকা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের দুর্দশার আর অন্তর রইল না। ধান নেই, চাল নেই, তেল নেই, নুন নেই, বস্ত্র নেই। বিনয় দেখেছে জোতদার, মহাজন, সরকারি এজেন্টের ঘরে লাখ লাখ মন চাল জমেছে। "আউশ ফুরিয়ে গেছে, চাউল বারো টাকা উঠেছে - দিনে দিনে। এখন তো চাউল,

কেরোসিন, চিনি, নুন, দেশলাই কিছুই মিলে না।"[১৯] খাদ্যশস্যের অগ্নিমূল্য দামের জন্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। অন্যদিকে অধিক মুনাফা লাভের জন্য - "ইব্রাহিম ভাইর গুদামে চা'ল জমছে লাখ লাখ মন, এতদিন শিলেটের চাল এসেছে, এ দিকের চা'ল এর পরে যাবে। সব চা'ল জাহাজ ভরতি কলকাতা যাবে বিদেশের জন্য। তা ছাড়া, এই শিলেটের ওদিকে চা'লই আবার ইব্রাহিম ভাইর থেকে কিনছে কাছারের চা-বাগানওয়ালারা। শিলেটের ওদিক থেকে নৌকায় আসে সুর্যিপুর, সেখান থেকে যায় গোয়ালন্দ, কলকাতায়, আবার পরে ফেরত যায় কাছারে আসামে সেই শিলেটের চাল।" [২০]

উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধই 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'কে সৃষ্টি করেছে। এই উপন্যাসের যুদ্ধ ও মন্বন্তরের আবহেই মানুষ মধ্যে বিপরীতমুখী স্রোত তৈরি হয়েছে। সারা দেশব্যাপী আগস্ট আন্দোলনের দুন্দভি বিনয়ের মনে যে উন্মাদনার আঁচ এনেছিল তা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায়। সে কখনোই ভাবতে পারেনি কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। চারিদিকে ক্ষেত শূন্য, গ্রামবাসী গৃহহারা, দিশেহারা, কাজ নেই, বাড়ি নেই, খাবার নেই, নৌকা নেই, দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। কলকাতায় দেখা যায় অসংবদ্ধ জনতা ট্রাম চালানো বন্ধ করে দিয়েছে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে, আগুন লাগিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। 'জনযুদ্ধ নীতি'তে কমিউনিস্ট দলের উপর সকলের সন্দেহ। এরাই নাকি গুপ্ত চোরের কাজ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবকে পন্ড করে দিয়েছে। আবার সুধা বিনয়কে ডাকে তাঁদের মিছিলে যোগ দিতে। সুধার কাছে অগাস্ট আন্দোলন মূলত 'জনশক্তি জাগরণ' ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু বিনয় প্রশ্ন করে মানুষ খুন হচ্ছে, ভিটামাটি ছেড়ে শূন্য হয়ে পথে পথে ফিরছে, তেল নেই, কুইনাইন নেই, তবু কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করছে। তবে এটা কি জনশক্তি'র সংগঠন? বিনয় দেখে গ্রামে হাটে দোকানে চালের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি কোথাও কোথাও চালের দুষ্প্রাপ্যতা শুরু হয়েছে। গভর্নমেন্ট কর্তৃক চাল কেনার এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। কলকাতা ছাড়া অন্যত্র চাল সংগৃহীত করা নিষেধ। পরিশেষে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের আচ বিনয়কে উৎপিরিত করে। "নিজেকে বিনয় শুধু বাইরের আর ভিতরের নানা ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিচ্ছে - এক তালহারা, ছন্দোহারা উনপঞ্চাশী ঘিরে ধরেছে দেশকে, - সকলকে; বিনয়কেও অন্তরে বাহিরে। - বিনয় তার কাছে পরাজয় মানবে না, না, কিছুতেই না। বিনয় বাঁচবে, বাঁচাবে মানুষকে - দেখাবে সকলকে সে দেশকে ভালবাসলে, ভালবাসলে তার দেশের দরিদ্র-দুর্ভাগাদের।" [২১]

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী'র তৃতীয় পর্ব "তেরশো পঞ্চাশ"। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি বিনয় সুধার সঙ্গে অভিমান করে কলকাতা থেকে পুনরায় সোনাপুরে ফিরে এসেছে। সোনাপুরে- "মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায়না; ইস্কুল-কলেজ বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়। ভুখ মিছিলও শুরু হয়েছে।"[২২] বাজারে চালের দাম টাকায় তিনসের। চিনি কেরোসিন লবণ কাঠ কয়লা কিছুই নেই। সে বছর জমির ফসল ভালো হয়নি। ইব্রাহিম ভাইয়েরা চর থেকে ধান কিনে নিয়ে অন্যত্র চালান করে দেয়। কলকাতায় বোমা পড়ে, বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ফলে কলকাতার মাল গ্রামের বাজার গুলিতে পৌঁছায় না। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। ঠিকাদার, দোকানদার, ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সরকারি এজেন্টরা চাল কিনে গুদামজাত করে, সাধারণ মানুষ চাল কিনতে পায় না। গ্রামের মানুষ কেউ - "আধপেটা খাচ্ছে। আর বলে, বাঁচাও, বাঁচাও মরিয়া হয়ে কেউ এক আধটা ধানের গাড়ী কিংবা নৌকা লুট করতে যায়। ভদ্রলোকেরা তাদের ধরিয়ে দেয়। কেউ আরোও হতাশ হয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে।" [২৩] এমন পরিস্থিতিতে গ্রামে 'জনরক্ষা সমিতি' গঠন করা হয়। যতই দিন এগিয়ে যেতে থাকে শুধু নেই, নেই রব। দুর্দিন দুর্ভিক্ষে রূপ নেয়। সীতা বিনয়কে বলে যুগীপাড়ায় সুতা না পেয়ে তাঁরা তাঁতের কাজ বন্ধ করে রেখেছে। কেউ বিষ খেয়ে মরেছে আর কেউ দালালের হাত ধরে চলে যাচ্ছে ফৌজদের ক্যাম্পে।

দুর্ভিক্ষের এই পরিস্থিতিতেও জেলা বোর্ডের নির্বাচন নিয়ে শুরু হয় ভোটের মহড়া। কংগ্রেস ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃংখল মোচন করতে চায়, মুসলিম লীগ চায় দ্বিজাতি তত্ত্ব। অপরদিকে কমিউনিস্টরা ইংরেজদের যুদ্ধকে সহযোগিতা করছে। আপাতত তারা দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবছে না। বন্দি অবস্থায় গান্ধীজি অনশন শুরু করে। খবরের কাগজের এই সংবাদ বিনয়কে ভাবায়। সোনাপুরের সরকারি চাকুরে নির্মল দাশগুপ্ত বলে - দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরছে সেদিকে কারো নজর নেই, সবার অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় গান্ধীজীর অনশন নিয়ে। না খেতে পারে মানুষ আত্মহত্যা করতে থাকে। এখন এই আত্মহত্যার খবর কোন পুরনো ঘটনা নয়। আসছে অনাহারে মৃত্যুর খবর। সোনাকান্দি, সর্ষেখালি, সল্লাখালি, মহেরপুরে মানুষ খাদ্য অভাবে কচু, গাছের পাতা, ফল-মূল ইত্যাদি খেয়ে পেটের খিদে মিটাবার চেষ্টা করছে। এই দৃশ্য বিনয় নিজে দেখেছে। বেগমপুরার বেশ্যাপাড়ায় মেয়ে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে কলেরা, ম্যালেরিয়া লোক মারা যাচ্ছে। চালের দাম পাঁচ টাকায় পৌঁছে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বিনয় এ. ডি. এম সাহেবকে সবকিছু জানিয়ে একটা সমাধান করার অনুরোধ জানান। "মিস্টার ব্যানার্জি বলেন কিছু করবার পথ রেখেছেন আপনারা? চমৎকার আপনাদের মন্ত্রী, মেম্বর, নেতারা সব। একটা ঘাটতি জেলা, তাকে বাড়তি জেলা বলে বলা হল - মন্ত্রীরা দেখলেনও না। এখন আমরা যত লিখি, তারা বড় ব্যস্ত - আইন-সভা চলছে। কলকাতাকে সামলাতে না পেরে মন্ত্রীরা বিপদে পড়েছে। সিবিল সাপ্লাই'র কর্তারা সেখানে ব্যস্ত। আমরা আমাদের এখানকার অফিসারদের সমস্ত চাউল দিচ্ছিলাম। বড় কর্তারা আমাদের উল্টো বলেন, 'তোমাদের বাড়তি জেলা। সেখান থেকেই জিলার চা'ল সংগ্রহ করে নাও।"[২৪]

প্রমথ, শিবু, মজিদ প্রমুখরা ভুখা-মিছিল বের করে। তারা গ্রামে গ্রামে খাদ্য সম্মেলন করছে। বিনয় কমিউনিস্ট কর্মীদের এইরকম কর্ম-নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছে। সেও গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তখন সে খাদ্য কমিটি, পিপলস রিলিফ কমিটির প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু বিনয়, প্রমথ, সীতার কাছে আই. বি থেকে অভিযোগ আসে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় অনশনে মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করছে এবং যার ফলে যুদ্ধ সুপরিচালনায় বিঘ্ন হতে পারে। তাই বিনা অনুমতিতে সভা সমিতি, মিছিল, শহর ত্যাগ করার নিষেধ করা হয়।

এভাবে ১৩৫০ এর নতুন বৈশাখ আসে। সোনাপুরে বৈশাখের মেলা বসবে কিন্তু মানুষের মধ্যে সেই আনন্দটুকু স্মিমিত হয়ে গেছে। কারণ ক্ষুধা আছে, যুদ্ধ আছে। অভাব মানুষের নিত্যদিন, নেই শুধু মৃত্যুকে জয় করার অধিকার। তেরশ পঞ্চাশে'র শুরুতেই সাইরেন বেজে ওঠে। জাপানিদের বোমা বর্ষণে চালের দাম পঁচিশ টাকা থেকে ত্রিশ টাকায় পৌঁছায়। এই দামে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। বিনয় বুঝতে পারে শিক্ষিত মানুষের দল ফিরছে মানুষের শিকারে আর মুনাফার নেশায়। "সুর্যিপুরের বারো টাকার চাল বিশ টাকায় বিক্রি হতে লাগলো! তার পর সেই তের টাকার কেনা চালের সোনাপুরে ও বেগমপুরের হাটে বাজারে বেরুল পঁচিশ টাকা! ক'দিন আগে বাজারে চা'লের দর উঠেছিল - পঁচিশ ছাড়িয়ে ত্রিশে।"[২৫]

এরপর সরকার থেকে রিলিফের চাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিনয়কে কমিশনার সাহেব বন্টনের ভার দেন। চাল বন্টন নিয়ে মহিমবাবুরা বিনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, সে পক্ষপাতিত্ব করছে। মুসলমানদের সে চাল বেশি দিচ্ছে। ক'দিনের মধ্যে রিলিফের চাল দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় লঙ্গরখানা। দলে দলে মানুষ চলছে লঙ্গন খানায়।তাদের হাতে ভাঙ্গা থালা, মাটির পাত্র, টিনের কৌটা। নানা ভেজাল লঙ্গরখানায় খিচুড়িতে। এই অখাদ্য খেয়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যা খাদ্য, তা প্রেসিডেন্টের আত্মীয়রা চোরা বাজারে বিক্রয় করে দিচ্ছে। উপন্যাসে দেখি একসময় বিনয় আবার কলকাতা যায়। সেখানে গিয়ে দেখছে ইব্রাহিম শুধু একা চালের ব্যাপারী নয়, মুরারী সেন ধরমবীর মেহেরা,

পরমেশ্বর প্রসাদ হর সুখলাল প্রমুখরা কলকারখানা ছেড়ে দিয়ে মজুতদারের ব্যবসায় নেমেছে। পাটের ব্যবসায়ীরা, কলকারখানার মালিকরা চালের বাজারে নেমে পড়েছে।

তেরশ পঞ্চাশে'র দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষগুলি মন্বন্তরের পাশাপাশি মহামারীতে আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন জায়গায় টাইফয়েড ও কলেরা দেখা দিয়েছে, ম্যালেরিয়া বাড়ছে বসন্ত ফুটছে গায়ে গায়ে। দু'দিনের জ্বরে মারা যায় বাঈ-আম্মা, শিবুদা। এদিকে কুইনাইন পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায় তার আকাশ ছোঁয়া দাম। টাকার বিনিময়ে কুইনান পাওয়া গেলও তাতে ভেজাল। এই মন্বন্তরে মুনাফার লোভে বিনয়ের ভগ্নিপতি শচীপ্রসাদ কর্মশক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিনয়কে দিয়ে ঔষধের কারখানা করিয়েছে। তাতেও ঔষধের কারখানা খাঁটি ওষুধ তৈরি হয় না। কলকাতা থেকে বিনয়ের কাছে টেলিগ্রাম আসে ইরা মারা গেছে টাইফয়েডে। ইরা শচীপ্রসাদের মেয়ে অর্থাৎ বিনয়ের ভাগ্নি। শিল্পপতি শচীপ্রসাদের একমাত্র কন্যা ইরার মৃত্যু হয়েছে তাঁর মামা বিনয়ের 'ন্যাশনাল মেডিসিন কোম্পানি'র শক্তিহীন ও ভেজাল ওষুধ খেয়ে।

গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ী'র প্রতিটি পর্বে আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে আমরা একথা বলতে পারি যে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ একদিনে আসেনি। করাল মন্বন্তর ধীরে ধীরে বাংলাকে গ্রাস করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্যময় পরিস্থিতিকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল। ফলে দেশবাসীদের শোচনীও পরিস্থিতির দিকটি বারবার নাকচ করে গিয়েছে। সেই সময় দেশ-বিদেশের সৈন্যরা দলে দলে এসে বাংলাদেশকে ভরিয়ে দিয়েছিল। তখনই হাজার হাজার সংগ্রামী স্বদেশীদের বন্দী করা হয়। বার্মা থেকে আসা অসংখ্য শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিলো। এছাড়া মন্বন্তরের কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক বড়ো করে দেখিয়েছেন মজুতদারী, কালোবাজারীকে। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার তাঁর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বইতে লিখেছেন- "পার্লামেন্টের বিতর্ক - সভায় মি: পেথিক লরেন্স করেকটি খাঁটি কথা বলেয়াছিলেন। 'বাঁচিয়া থাকবার জন্য যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহা কিনিবার অসংখ্য লোকের নাই। মুদ্রাস্ফীতিই এই অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধির কারণ। ইহার জন্য আর কেহ নয় - একমাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টই দায়ী।" [২৬]

SAMSAPTAK ISSN-2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

তথ্যসূত্র -

১. গোস্বামী ডঃ সনাতন : তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়া তার, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯, পৃষ্ঠা-১০৫

২. হালদার গোপাল : পঞ্চাশের পথ, ২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা, ইকনমিক প্রেস হইতে রত্নেশ্বর বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পুথিঘরের পক্ষ হইতে সতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ - অক্টোবর, ১৯৪৪, লেখকের কথা অংশ, পৃষ্ঠা - ৩

৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪

৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৫

৫. ঐ , পৃষ্ঠা - ৯

৬. ধর অমিয় : গোপাল হালদারের জীবন ও সাহিত্য, অতএব প্রকাশণী, বৈশাখ ১৩৯৯, মে ১৯৯২, কলকাতা

৭. চট্টোপাধ্যায় কাশীনাথ (সংকলন ও সম্পাদক) : উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর,সেরিবান, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০০, গৌতম মিত্র কর্তৃক সেরিবান বাখরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩৩৭৭ , সংকলকের প্রতিবেদন অংশ

৮. হালদার গোপাল : পঞ্চাশের পথ, ২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা, ইকনমিক প্রেস হইতে রত্নেশ্বর বসু কর্তৃক মুদ্রিত, ও ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পুথিঘরের পক্ষ হইতে সতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ – অক্টোবর, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা - ১৩

৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪

১০. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৫

১১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৯

১২. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৩

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৬৮

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ৩১১

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩১২

১৬. হালদার গোপাল : ঊনপঞ্চাশী, পুথিঘর ২২,কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৪৬, লেখকের কথা

১৭. ঐ,পৃষ্ঠা - ১

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১২

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা - ১২৮

২০. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৬৭

২১. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৭৬

২২. হালদার গোপাল : তেরশ' পঞ্চাশ, পুথিঘর ২২,কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা - ১১

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৯

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ২০৫

২৬. মুখোপাধ্যায় শ্রী শ্যামাপ্রসাদ: পঞ্চাশের মন্বন্তর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠ – ২৬

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

আকর গ্রন্থ -

১. হালদার গোপাল : পঞ্চাশের পথ, পুথিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

২. হালদার গোপাল : ঊনপঞ্চাশী, পুথিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

৩. হালদার গোপাল : তেরশ পঞ্চাশ, পুথিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

৪. হালদার গোপাল : মন্বন্তরের তিনপর্ব পঞ্চাশের পথ, ঊনপঞ্চাশী, তেরশ পঞ্চাশ, প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, ২০১৫

....

গবেষক , বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর , বাংলা বিভাগ , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

জয়া মিত্রের নির্বাচিত গল্প : ভাববিশ্বের অন্তর্মুখিতা

বীথিকা তালুকদার

সারসংক্ষেপ –

জয়া মিত্রের গল্পের বহুমুখী স্বর ও সুর কেমনভাবে আধুনিক গল্পবলয়কে সমৃদ্ধ করেছে তার স্বরূপ সন্ধান। সময়ের সরণি ধরে আধুনিকতার বাঁকবদল, আখ্যানের নানাবিধ বলয়, সাংকেতিক সুর থেকে চিন্তার নানাবিধ অন্বয় অন্বেষণ। গল্পযাত্রায় একাধিক বিশ্লেষণ, অন্বেষণ, অভিমুখ বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর গল্পের পরম্পরাকে কোন বলয়ে ধাবিত করেছে তার জরুরি প্রয়াস এই প্রবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ –

জয়া মিত্রের গল্প, ভাবনার বহুমুখী বিশ্লেষণ, নির্মাণের আধুনিকতা, আখ্যানের দ্বিবাচনিকতা, সময়ের ভঙ্গিল স্বর।

মূল প্রবন্ধ-

বাংলা গল্প ভাবনার নানামুখী বিচ্ছুরণে দিগন্ত বলয়ে প্রসারিত হয়েছে। সমস্যার নানা বিশ্লেষণ, মানব মনের নানা অলিগলি, বাস্তবের নানা তরঙ্গমুখর দ্বান্দ্বিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তা যথার্থ হয়ে উঠেছে। তেমনি দশকে দশকে তা নতুন বিভঙ্গ নিয়ে কালের সীমারেখা অতিক্রম করে কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে । গত শতকের সাতের দশক থেকে বাংলা গল্পে বহুমাত্রিক জীবনচেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রান্তিক মানুষের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি, গ্রামজীবনের নিপুণ বাস্তবতা, জমিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা কৃষক সমাজ, বর্গাদার, ভাগচাষি, কলকারখানার শ্রমিক, মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ভঙ্গুর ছবি, মূল্যবোধের অবক্ষয় বড় আকারে প্রধান্য পেয়েছে। তেমনি আটের দশক ও নয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ন, ভোগবাদ, বন্ধ কারখানার ধর্মঘট, জাদুবাস্তবতা, রাজনীতির নানা পরম্পরা, উদার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ, আন্তজার্তিকতার প্রসঙ্গ বাংলা গল্পের বৃত্তে প্রবেশ করেছে। বাংলা গল্পবলয়ের অন্যতম লেখিকা জয়া মিত্র পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-শহরের বাস্তবতা, ভূমি সংস্কার, মধ্যবিত্ত জীবনের আর্তসংকট, নাগরিক ভোগবাদ, আধিপত্যবাদী সমাজ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ, নারীর অন্তর্গহনের প্রতিচ্ছবি নিদারুণ বাস্তবতায় ব্যক্ত করেছেন। আমরা এই আলোচনায় জয়া মিত্রের বিশেষ কিছু গল্পকে প্রাধান্য দিয়েছি।

জয়া মিত্রের 'পুরোনো বাসন' (১৯৯৯) গল্পটি এক স্মৃতি রোমন্থনের আখ্যান। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাঙালি পরিবারের রীতিনীতি, আদবকায়দা, চিন্তাভাবনার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে। গল্পের শুরু হয়েছে একটি পেতলের পুরোনো জগ বিক্রি নিয়ে। যা একসময় সরোজনলিনীর সংসারের আর পাঁচটা জিনিসের মতো খুবই প্রিয় ছিল কিন্তু তার পুত্রবধূ সুমনার মতে এখন আর কেউওই বাসনে খায়না। সুমনার পছন্দ কাচের, স্টিলের, পলিথিনের সুন্দর বাসন। সংসারের নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক মানুষের মূল্যবোধ, রুচি-পছন্দ, আদব-কায়দা সব কিছুই বদলে যেতে থাকে। সেই পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক অঙ্কিত হয়েছে স্বাধীন,সুমনা,তিন্নি চরিত্রের মধ্য দিয়ে।এই পঞ্চাশ বছরের জীবন প্রবাহে সরোজনলিনী দেখেছেন কীভাবে বহুদিনের অভ্যস্ত রুচি, পছন্দ, নিয়মকানুন একে একে জায়গা ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে। গল্পে সেই পরিবর্তনের উল্লেখ রয়েছে এইভাবে—

"অবশ্য একা সুমনার কেন, চারপাশের সমাজেরই তো রুচি বদলাচ্ছে। ধীরে সুস্থে, চিকণ সুন্দর করে কাজ করার অভ্যাস চলে যাচ্ছে মানুষের। সন্তু বলে সময় নেই। সুমনাও বলে তাই।"[১]

অথচ সরোজনলিনী জানতেন সংসারের প্রতিটি কাজের আলাদা নিয়ম থাকে সেই নিয়ম প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব যাকে বলা হয় বংশের ধারা আর সেই ধারা বজায় রাখত পরম্পরা অনুযায়ী পরিবারের পুত্রবধূরা। সেই সময়ের বাঙালি পরিবারের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রুচি, আদর্শ,সংস্কার, প্রথা, অনুষ্ঠানের বিবিধ পরিচয় পাঠক জানতে পারে সরোজনলিনীর কথায়—

"এই লক্ষ্মী ছেড়ে যাবার ভয়ে আর লক্ষ্মী বসানোর আকাঙ্ক্ষায় কত কাজ যে নিয়ম মেনে করতেন তাঁরা। বাসি কাপড় ছাড়া তো বটেই, রাঁধতে বাড়তে বাসন ঝন্‌ঝন্‌ করবে না.... সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে ধূপধুনো আর তুলসিতলায় প্রদীপ দেওয়া তো আছেই। আরও কত যে ঊনকুটি চৌষট্টি রকম নিয়ম ছিল ঘর-গৃহস্থালি জুড়ে।'[২]

এই গল্পে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পাশাপাশি স্বাধীনতা পরবর্তী দাঙ্গা, দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু বাঙালিদের আগমন ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কথাও উঠে এসেছে। লেখিকা এই গল্পে তুলে ধরেছেন কীভাবে সেদিন সবকিছু হারিয়ে আসা মানুষগুলো আবার নতুন করে শিকর মেলবার চেষ্টা করছিল নতুন মাটিতে।বাঁচার তাগিদে উদ্বাস্তু মানুষেরা সে সময় স্থায়ী বাসিন্দাদের জমি, বাসস্থান জবর দখল করছিল।সরোজনলিনীর কথায় উঠে এসেছে উদবাস্তুদের সেই জীবন যন্ত্রনার ছবি—

"সে সময়ে ওরকম বাড়ি বন্ধ করে গেলে বাড়ি দখল হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। যে মানুষরা নিজেদের সবকিছু হারিয়েছে অমন নিষ্ঠুরভাবে, তাদের আর কোনো কিছুতে সংকোচ কিংবা ভয় ছিল না।"[৩]

'লোকশিক্ষা' (১৯৯৭) গল্পে ফুটে উঠেছে ইদানীং কালের ক্ষমতাসীন, প্রতাপশালী পার্টিকর্মীদের লোভ-লালসার বাস্তব চিত্র। পার্টির নানা সাংগঠনিক এবং জনসংযোগমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত নেতারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ মানুষের উপর যে নৃশংস অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন করে থাকে তার সুস্পষ্ট চিত্র একেঁছেন জয়া মিত্র তাঁর এই আখ্যানে।এই গল্পে একদিকে রয়েছে শাষকশ্রেণির দুর্নীতি,দমনপীড়ন,নির্যাতনের দৃশ্য আর একদিকে রয়েছে শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের চরম দুরবস্থা। আখ্যানে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে শহরের বিত্তবান, ক্ষমতাবান পার্টিকর্মী(বরাবর এক পার্টি করেননা স্বার্থানুযায়ী দল বদল করে থাকেন)প্রণব দাস এবং তার দুইভাই সুরেন ও বীরেন। সুরেন রেলের কন্ট্রাক্টর আর বীরেন পাড়ার মস্তান তারচ্যালা, চামচাদের সংখ্যা অনেক।লেখিকা বীরেনের জীবনযাপনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"বীরেন দামী সিল্কের লুঙ্গি পরে, গলায় বাবা'র লকেট দেওয়া ভারী সোনার চেন, আঙুলে গোটা তিনেক আংটি, তার চেহারা দাদাদের চেয়ে ভারী।...প্রায় সারাদিন তার কাটে এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে বসে। সেটাই তার দোকান কাম অফিস- 'গোল্ডেন সান ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরি।' অবসর সময়ে রাস্তায় মেয়ে দেখা, দোকানে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে দোস্তদের নিয়ে নীল ক্যাসেট দেখাই তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যসন।"[৪]

আর অন্যদিকে শোষিত নিপীড়িত মানুষদের প্রতীক হিসেবে লেখিকা তুলে ধরেছেন দুর্গা চরিত্রটিকে। দুর্গা নির্ভীক,স্বাধীনচেতা, স্পষ্টভাষী তার বিশ্বাস কাউকে ঠকানো বা নিজে ঠকে যাওয়া দুটোই সমান অন্যায় আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই তার স্বভাব। কিন্তু দুর্গার এই স্বভাব নিয়ে সবসময় একরকম দুশ্চিন্তায় এবং আশঙ্কায় থাকে তার স্বামী সমীর। সমীর বরাবর শান্ত স্বভাবের খেলাধুলো অন্তঃপ্রাণ ছেলে তার বিশ্বাস জীবনে যাদের খুঁটির জোর কম থাকে

তাদের ন্যায় অন্যায়ের কথা বলতে নেই। কিন্তু দুর্গা ভালোবাসায় বিশ্বাস করে মানুষে বিশ্বাস করে সে মনে করে মানুষ লক্ষ্মী মানুষই বল ভরসা বিপদের দিনে মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু গল্পের শেষে দুর্গার জীবনের এই শিক্ষাই ভুল প্রমানিত হয়। সেই ভয়ংকর সর্বনাশের দিনে দুর্গা যখন সবকিছু শেষ হবার আগে বাঁচার জন্য আর্তনাদ করছিল তখন দূরে দাঁড়িয়ে মানুষ ঘেঁষাঘেঁষি করে দেখছিল। আর দুর্গা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বলছিল—'তোমরা দেখছ? বাচাঁও—' কিন্তু সেদিন কেউ বাঁচাতে আসেনি দুর্গাকে। সাহায্য করতে আসেনি। রক্ষা করেনি কেউ দুর্গার।আর তখনি যেন দুর্গার শিক্ষা হতে থাকে।

'উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী' (২০০২) গল্পে রয়েছে উন্নয়নের নামে প্রগতির নামে এক বিনাশের দর্শন। উন্নয়নের নামে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের ছন্দকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করার ইতিহাস। জয়া মিত্র তাঁর এই গল্পে দেখিয়েছেন কীভাবে রাষ্ট্রপ্রধান তথা সরকারের স্বার্থ অনুযায়ী দরিদ্র মানুষে উপর স্বেচ্ছাচার খামখেয়ালিপনার নিষ্ঠুর রণতাপের বিজয়দর্প। আখ্যানের শুরু হয়েছে ঊষালতার প্রসঙ্গ দিয়ে। গল্পের মূল চরিত্র ঊষালতা তার চার ছেলেমেয়ে ও স্বামী সুবলকে নিয়ে সংসার। আর এই সংসারের প্রতিটি মানুষের অন্নদাতা ঊষালতা কারন তার স্বামী সুবল পাঁচবছর আগে বাস্তুচ্যুত হবার সময় থেকেই সব কাজে উৎসাহ হারিয়ে একরকম জবুথবু হয়ে গেছে অথচ একসময় এই সুবলেরই এত নামডাক ছিল লোকে বলত সুবল মাঠে নামলে স্বয়ং লক্ষ্মী এসে বসেন মাঠে।প্রশস্ত হাইওয়ে নির্মাণের জন্য ঊষালতাদের মতো ত্রিশ-বত্রিশটি পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। ক্ষেতে মাঠের চাষবাসের কাজের অভ্যেস বদলে ঊষালতার মতো সমস্ত মেয়েরা বাবুদের বাড়ির কাজ শিখে জীবনধারণ করছিল। ঊষালতা ছ'টা বাড়ির বাসনমাজা,কাপড়কাঁচা, ঘরমোছা, মসলা পেশার কাজ করে বেঁচে থাকার অর্থ উপার্জন করে। কারণ উদ্বাস্তু হয়ে তারা যেখানে এসেছিল সেখানকার স্থায়ী ছেলেরা আলাদা আলাদা গ্রাম থেকে আসা উদ্বাস্তু ছেলেদের কারখানায় কাজের সুযোগ দিতনা। ফলে তারা গাঁয়ের গোরু-ছাগল চরাত সামান্য কিছু খাবারের বিনিময়ে। অথচ একসময় তাদের নিজেদের দু'বিঘা করে জমি ছিল নিজের ঘর সংসার ছিল। উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার তাদের বাস্তুহারা করেছিল। গল্পে তার উল্লেখ রয়েছে এইভাবে—

> "ভরা ভর্তি বর্ষার মধ্যে মস্ত বড় বড় গাড়ি এনে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিল তাদের ঘর। রাত্তির তিনটের সময়ে, সব লোক ঘুমে, তার মধ্যে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সকলকে বলল,—শিগগির ঘর থেকে বেরোও, নইলে চালচাপা হয়ে মরবে—"[৫]

এভাবেই উষালতাদের মতো দরিদ্র মানুষদের এত কালের ঘর সংসার বহু যত্নে রাখা গৃহস্থালি সবকিছুই এক রাত্রিতে তছনছ হয়ে যায়। তারপর তারা বিভিন্ন প্রান্তে যে যার মতো ছড়িয়ে পরে একটু মাটির সন্ধানে একটু আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু এই শেষ নয় , এত কিছুর পরেও তাদের জীবনে শান্তি নেমে আসেনি। রাষ্ট্রশক্তি তাদের খামখেয়ালি মতো উদাসীন মনোভাব নিয়ে বারংবার গৃহহারা করেছে , কখনও চাষ করা ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। গল্পে দেখা যায় নতুন গ্রামে এসে সেই বঞ্চিত মানুষ গুলো আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে সরকারের লোককে ঘরপ্রতি দুশো টাকা দিয়ে চাষের জমি সংগ্রহ করে। আর যখন সেই জমিতে মা লক্ষ্মী যেন মাঠভর্তি ধান দু'হাত উপুড় করে দিয়েছিলেন ঠিক তখনই সরকারের লোক বিনা নোটিশে সর্বহারাদের এই বেঁচে থাকার অন্ন নষ্ট করে দেয়। হাইটেনশান ইলেকট্রিক লাইন, প্রশস্ত রাস্তা তৈরির নামে ট্রাক ভর্তি পাথরকুচি, স্টোনচিপ্স চাপিয়ে দিল সেই ধানের উপর। সেই করুণদৃশ্য ফুটে উঠেছে গল্পের সিন্ধুবালা চরিত্রের আর্তনাদের মধ্য দিয়ে—

"ও বাবুগো, অপরাধ হয়ে গেছে আমাদের, নাক কান মলছি। তবু একটা দিন সময় দাও গো, পায়ে পড়ি,আমরা কাইটে লুবো ধানটো। ধানের চালের ভাত তো তোমরাও খাও বাবু—ধান লক্ষ্মী, তার বুকে পাথর চাপাতে নাই। দয়া কইরে কেবল আইজকার দিনটি দাও বাবু—"[৬]

কিন্তু বাবুরা সেই আর্তি শোনেনি কারণ রাষ্ট্রশক্তির কাছে দরিদ্র শ্রেণির ক্ষতির কোনো মূল্য তো কোনো কালেই নেই। সাধারন মানুষের প্রতি দরিদ্র মানুষের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ততা, দায়িত্বহীনতাই তো বারবার প্রকট হয়ে ওঠে এটাই তো প্রত্যাশিত।

'কুরুক্ষেত্রের আগে' (২০০২) গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু ভালোবাসা। জয়া মিত্রের একাধিক আখ্যানে উঠে এসেছে এই ভালোবাসার কথা যে ভালোবাসা জীবনে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। গল্পে দেখা যায় মণিমালাপ্রবীরকে (গ্রাজুয়েট বি.এস.সি পাশ) ভালোবেসে সবকিছু ছেড়ে বাড়ির অমতে পালিয়ে বিয়ে করেছিল মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন ছ'মাসের মধ্যেই ভেঙে যায় বাস্তবের মাটিতে তা আর সত্যহয়নি। চেনা প্রবীর একটু একটু করে মণিমালার কাছে অচেনা হতে থাকে প্রথমে মদের নেশা, তারপর লটারি খেলা, কয়লার ডি.ও.বিক্রি এক কথায় 'পাতালে যাবার যতো রকম পথ, বিনা বাধায় নেমে যাচ্ছিল প্রবীর'। কিন্তু মণিমালা হাল ছাড়েনি আত্মহত্যার কথা ভাবেনি দুই ছেলেমেয়েকে ভালোবেসে তাদের অবলম্বন করে বেঁচে থাকার অন্ন জোগাড়ের দায়িত্ব নিয়েছিল। সকাল-সন্ধে লোকের বাড়িতে টিউশানি, আর দুপুরে একটা পিসিওতে কাজ করে অসহায় মণিমালা অর্থ উপার্জন করে। গল্পে মণিমালার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই ভাবে—

"কিন্তু বাঁচ্চাদুটো তারই শরীর থেকে পৃথিবীতে এসেছে,তাদের দায়িত্ব তাদের বাবা ভুললেও সে তো ছাড়তে পারেনা, ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না। ওরাই এখন মণিমালার জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের ভালোবাসার জন্যই সে বেঁচে আছে, নাহলে কবে শরীর ছুঁড়ে দিত ছুটন্ত বিশাল যে কোন একটা ট্রাকের তলায়। কিন্তু নিজের মতো জীবন থেকে শ্যামলাকে খোকাকে সে বাঁচাবেই।"[৭]

লেখিকার এই আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু আসলে ভালোবাসা, যে ভালোবাসা মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। আত্মহত্যা মানে তো হেরে যাওয়া, বেঁচে থাকাটাই জীবন আর এভাবেই মণিমালার মতো অসংখ্য অসহায় নিরুপায় নারীরা বেঁচে থাকে। জয়া মিত্রের এই গল্পে আর একদিকে রয়েছে নিম্নবর্গীয় নিরুপায় নারীদের যাদের পরিবারে কোনো পুরুষ রক্ষক নেই তাদের প্রতি সমাজের ক্ষমতাশালীদের অত্যাচার, অশালীন আচরণ। মণিমালার তেরো বছরের মেয়ে শ্যামলা ঘরের বাইরে বেরোতে পারে না গুণ্ডা বদমাশদের অত্যাচারে। কিন্তু মণিমালার ক্ষেত্রে হয়েছিলএক অন্ধকার চিত্রনাট্য। পিতাই বহিরাগত মস্তানদের সাহায্য করেছিল কন্যাকে তুলে নিয়ে যেতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী কতটা বিপদগ্রস্ত সেই অন্ধকার দিক লেখিকা তীব্র ব্যঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। সেই দ্রৌপদীর সময়কাল থেকেই পুরুষ নিজের নারী, জায়া, কন্যাকে বাজি ধরেছে। নিজেই তুলে দিয়েছে ক্ষমতাবানদের হাতে। এক্ষেত্রে রক্ষকই যেনভক্ষক হয়ে ওঠে তা গল্পের শেষে মণিমালার কথায় শোনা যায়—

"প্রবীর ইদানিং দিনের বেশিরভাগ রাত্রের বেশ খানিকটা কাটায় অন্য এক বিবাহিতার ঘরে।...এসব ক্ষেত্রে পাড়ার ছেলেরাই বাগড়া দেয়, হল্লা করে। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। বোধ হয় কোনো অলিখিত বদলাবদলির সমঝোতা হয়ে গেছে। ... সে আর তার ছেলেমেয়ে সেই খেলায় একটা মাংসের টুকরো। একটা টোপ মাত্র।"[৮]

'নিবিড় পাঠ' (২০০৪) গল্পটি একটি স্মৃতি আখ্যান। আত্মজৈবনিক উপাদানকে তিনি এই উপমহাদেশের ঘর-বাইরের দ্বন্দ্বে নিপুণ বিন্যাসে দুলিয়েছেন। যুগের দ্বন্দ্ব, উত্তাল রাজনীতি, নারীশিক্ষা, আত্মচেতনা—সমস্ত কিছু মিলিয়ে সময়ের সুরকে এমন বিন্যাসে নির্মাণ করেছেন যার নান্দনিক মূল্য বড় প্রখর। এই স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে এক দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস। হ্যাঁ দীর্ঘ সময়, কারণ গল্পে তিন প্রজন্মের সমসাময়িক কালের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা বৃত্তান্তের পরিচয়তুলে ধরেছেন লেখিকা তাঁর এই আখ্যানে। স্বদেশি আন্দোলনে সারাদেশে উত্তাল আবহাওয়া, অনুশীলন সমিতিতে যুবকদের লাঠিখেলার চর্চা থেকে শুরু করে রংপুরে বেয়াল্লিশের স্বাধীনতা আন্দোলন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতছাড়ো আন্দোলন, আবার কোথাও কমিউনিস্ট পার্টির আলোচনাসভা গঠন। রাশিয়ার মেয়েদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশ, বিহার, ইউ.পি—সমস্ত জায়গায় সাধারণ মানুষ তথা মেয়েদের চরম দুরবস্থার বর্ণনা রয়েছে এই ভাবে—

> "সব জায়গায় কী যে অবস্থা, সে তোরা চিন্তা করতে পারবি না। একেবারে সাধারণ সব লোকজন—কীভাবে যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল...পুরুষ মানুষরা, দলে দলে মেয়েরা—পুলিশের মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে।"[৯]

তবুও সাধারণ মানুষেরা থেমে থাকেনি। স্টেশনে সমস্ত কলেজে মিলিটারিদের ক্যাম্প, রাস্তাঘাটে মেয়েদের ওপর আমেরিকার নিগ্রো মিলিটারিদের অশালীন আচার-আচরণ। শুধু কি তাই? দিনদুপুরে মেয়েদের তুলে নিয়ে যেতঠিক যেমন স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পর সত্তরের উত্তাল দিনে বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পুলিশ তুলে নিয়ে খুন করেছিল। ফলে মেয়েদের কলেজ তো দূরস্থান রাস্তায় বেরোনোও বন্ধ হয়ে যায়। আর একদিকে বিশ্বসমর চলাকালীন সারা শহর জুড়ে ব্ল্যাকআউটের নির্দেশ, কাপড়ের অভাব,কেরোসিনের অভাব, জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। স্বদেশি আন্দোলন-বস্ত্র সংকট, বিশেষ করে মেয়েদের শাড়ির কালোবাজার। একটি শাড়ির দাম সেসময় চল্লিশ টাকা যুদ্ধের পূর্বে যে শাড়ির দাম ছিল ছয় আনা। স্বাধীনতার কিছু দিন পরেই আবার ছেষট্টিতে খাদ্য আন্দোলন, রেশনে, বাজারে কোথাও চাল নেই, কেরোসিন নেই। দলে দলে গ্রামের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে মিছিলে আর পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে জয়া মিত্র গল্পভুবন সাজিয়েছেন। শুধু কাহিনি নয় বিশ্লেষণে সমাজের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে সময়ের প্রকৃত সত্যকে তুলে এনেছেন। তৃতীয় বিশ্বের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো চিহ্নয়ানে এই গল্পগুলি ভীষণ প্রাসঙ্গিক। সাহিত্যের পরিসর অতিক্রম করে তা হয়ে উঠেছে কালের কণ্ঠ। ব্যক্ত-অব্যক্ত, ভৌগোলিক চিহ্নায়ন, বিশ্লেষণের নানা পরম্পরা, ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ও সময়ের সুতীব্র শ্বাসাঘাত গল্পগুলিকে বাংলা গল্পচর্চার গুরুত্বপূর্ণ দলিল করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. পুরনো বাসন, জয়া মিত্র, গল্পসমগ্র, পুনশ্চ, কলকাতা-১০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩২১।

২. তদেব, পৃ. ৩২৯।

৩. তদেব, পৃ. ৩২৫।

৪. লোকশিক্ষা, তদেব, পৃ. ২৭১।

৫. উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী, তদেব, পৃ. ৩৪৪।a

৬. তদেব।

৭. কুরুক্ষেত্রের আগে, তদেব, পৃ. ৩৫৬।

৮. তদেব, পৃ. ৩৫৭।

৯. নিবিড় পাঠ, তদেব, পৃ. ৩৭৩।

....

পিএইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ ,উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বীরঙ্গনা নারী

হুমায়ুন কবির

Abstract-

Birangana female character can be found in Indian literature as well, such as Vishpala, Mudgalini, Vedic women's struggle. In our discussion of medieval Bengali literature, Dharmamangal and Geetika literature, the identity of a woman in battle can be found. In our discussion, 'Veerangana' refers to a woman with a warrior spirit or an armed warrior spirit. In Dharmamangal Kavya, we see the Dom women Lakhai, Dashi Dhumsi and the queen Kalinga and Kanara taking the form of Virangana in the battlefield. In the Ashwamedha Parva of the Kashidasi Mahabharata, Veeranganas are mentioned in the realm of women. It is in this Ashwamedha Parva that Jana can be seen in the form of Jaya encouraging the war. In 'Prachin Purvabanga Gitika' 'Firoz Khan Dewan-Sakhina Bibi Pala', the topic of Firoz Khan's wife Sakhina dressing up as a man and fighting in the battlefield is mentained. The valor of Banga Ramani with sword is shown in 'Rangmala Sundari Chowdhury Larai Pala.' In 'Maniktara Dakater Pala', when Maniktara, the wife of leader Basu, gets a bow and arrow, Maniktara alone becomes more powerful. Although women were restricted by the male-dominated social structure during Muslim rule, some women stepped outside the family and showed heroic courage.

Keywords –

Birangana women, Bengali literature and culture, medieavalperiod.

মূল প্রবন্ধ –

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য পর্যন্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নারী চরিত্রের প্রসঙ্গ থাকলেও বীরঙ্গনা নারী চরিত্র অপ্রতুল। আমাদের আলোচনায় ‘বীরঙ্গনা’ বলতে রণনিপুণা কিংবা অসিহস্তে বীর্যময়ী লড়াকু মনোভাবাপন্ন নারীকে বোঝানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে মধ্যযুগের সাহিত্যে নারী চরিত্রের উল্লেখ করাঙ্গুলিমেয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরঙ্গনা নারীর প্রাচীন পটভূমিরূপে বৈদিক সাহিত্যেও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বিশপলা, মুদ্‌গলিণী প্রভৃতি বৈদিক নারীর রণসংগ্রাম।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মমঙ্গল এবং গীতিকা সাহিত্যে যুদ্ধে অবতীর্ণা নারীর বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য শাখার ধর্মমঙ্গলের বীর রসের আখ্যানে রয়েছে নর নারীর রণবিদ্যা। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি ডোম শ্রেণির

নারী লখাই, দাসী ধুমসি এবং রাজমহিষী কলিঙ্গা ও কানাড়াকে রণক্ষেত্রে বীরঙ্গনা রূপ ধারণ করতে দেখি। এইসব বীরঙ্গনা নারীর পরিচয় ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল'কাব্য অবলম্বনে নিম্নে গ্রহণ করা হল—

ধর্মমঙ্গল কাব্যে শ্রেষ্ঠ বীরঙ্গনা নারী চরিত্র লখাই। লখাই কালু ডোমের স্ত্রী এবং সদা ডোমের ভগিনী। অর্থাৎ বোঝা যায়, অন্ত্যজ ডোম শ্রেণির নারী। মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা উঁচু শ্রেণির নারীর মতন অন্তঃপুরবাসিনী নয়, প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত। ডোম শ্রেণির প্রান্তিক নারীরা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। লখাই ডোমনীর মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তার বীরত্ব কেবল রণক্ষেত্রে প্রকটিত হয়নি, নিজের স্বামী, সন্তানকেও যুদ্ধে যেতে উৎসাহ প্রদানেও তার মহনীয়তা লক্ষণীয়।

লাউসেনের ময়না গড়ে বসতি স্থাপন করে লখাই স্বদেশ রক্ষায় যুদ্ধ করে ডোম জাতির যুদ্ধ প্রিয়তার ভূমিকা পালন করে স্বজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছে। লাউসেন রাজার আদেশ ক্রমে পশ্চিম উদয় গেলে লখাইকে রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে যায়। নারী হলেও লাউসেনের লখাইয়ের প্রতি সে আস্থা ছিল। লখাই চরিত্রের মুখেই তার স্বরূপ উন্মোচন হয় লাউসেনের মাতুল মহামদের সঙ্গে কথোপকথনে—

"বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।"[1]

এই উক্তিতেই নারীর তেজস্বিতা প্রকট হয়ে পড়ে। তাছাড়া কাব্যে বর্ণিত যুদ্ধে তার অগ্রণী ভূমিকা পালনের মধ্যেও ফুটে ওঠে নির্ভীক বীরঙ্গনা নারীর তেজস্বিকতা। 'জাগরণ পালা'য় ডোমনী লখাইয়ের রণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন কবি। বিপক্ষ শিবিরের হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সৈন্য লখাই প্রেরিত বাণে ধরাশয়ী। লখাইয়ের পরাক্রমে বিপক্ষ দলের সৈন্যের ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর ছবি ধরা পড়ে—

"লখের তরাসে কারো মুখে নাহি রা।
কেহ বলে পাত্তর পুত্রের মাথা খা।।
হাতে প্রাণ করি কেহ পার হল নদী।
কাটা গেল কত সেনা কে করে অবধি।।
দণ্ডেক দাঁড়ায়ে লখে চেয়ে দেখে রঙ্গ।
কবিরত্ন ভণে সবে রণে দিল ভঙ্গ।।"[2]

হাজারো সৈন্য রণে ভঙ্গ চিত্র লখাই চরিত্রের রণ কৌশলের পরাক্রমী মূর্তির অবভাস। নারী হয়েও পরাস্ত হয়ে ভীত সৈন্য প্রাণ বাঁচাতে পলায়নপর। রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন বীরের ধর্ম নয়। এভাবেই একজন নারীর পরাক্রমী শক্তির কাছে বিপরীত সৈন্যের রণনীতি, শক্তি পরাজয় হয়।

বীরঙ্গনা নারী লখাই শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দেয়নি, বিপক্ষ দলের রণনীতি সম্পর্কেও ধারণা তৈরি করতে সক্ষম। পলায়নপর সৈন্যগণ প্রতিহিংসা চরিতার্থে পুনরায় আগত হয়ে আক্রমণ হানবে সে সম্পর্কে অবগত। লখাই রণনীতি অবগত হয়ে সুপ্তিমগ্ন পতি কালু ডোমকে নানাভাবে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রেরণা দিলেও যেতে চায়নি। তখন পুত্রকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছে লখাই। যুদ্ধে ভীত পুত্রের উদ্দেশ্যে কঠিন বার্তা শুনিয়েছে বীরঙ্গনা এই নারী—

"মোরদুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি।।"[3]

যুদ্ধে বড়ো ছেলের মৃত্যুর পরও লখাই ছোটো ছেলে শুকাকে যুদ্ধে যেতে উদ্যত করেছে। পুত্রের মৃত্যু নিরস্ত করতে পারেনি, স্বদেশ রক্ষায় নিজের পুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। তবে সন্তানের মৃত্যুতে বীর নারীর হৃদয়েও জননী সত্তার প্রগাঢ়তা উত্থিত হয়েছে। মাতৃ স্নেহের আবিলতা প্রকাশ পেয়েছে।

লাউসেনের স্ত্রী কলিঙ্গা ও কানাড়ার রণঙ্গিনী বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় 'জাগরণ পালা'য়।কলিঙ্গা ও কানাড়া পতিপরয়ণা নারী হিসেবে পাঠক জানলেও যুদ্ধবিদ্যায় তাঁদের নিপুণতা লক্ষ করা যায় লাউসেনের অবর্তমানে মাতুল শ্বশুর মহামদের ময়নাগড় আক্রমণে। অসি হস্তে পাটরানি কলিঙ্গা সর্বপ্রথম মহামদের সৈন্য সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। শিশু পুত্র চিত্র সেনকে কানাড়ার হস্তে সমর্পণ করে যুদ্ধ বেশে অশ্ব পৃষ্ঠে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁর রণ কৌশলে শত্রুপক্ষ প্রথমে পরাস্ত হলেও শেষ পর্যন্ত লড়াকু কলিঙ্গা বন্দি হবার উপক্রম অনুমিত হয়ে শৌর্য ও আত্মগরিমা বজায় রেখেআত্মহত্যা করেন। শত্রু পক্ষের হাতে বন্দিনী হতে মেনে নিতে পারেননি। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও কবি তাঁর বীরঙ্গনা মূর্তিরই পরিচয় দিয়েছেন।

কলিঙ্গার মৃত্যুতে কানাড়া সহোদরার মতোই দিদিগো বলে সাশ্রুনেত্রে শোক প্রকাশ করেছেন। এরপর কানাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কানাড়ার রণনিপুণতা বোঝাতে কবি বলেছেন—

"দাতে ধরে লাগাম দুহাতে ধরে খাঁড়া।
সেনাগণে হানে রাণী রণেদিয়া তাড়া...।।
সাঙ্গি শেল ঝকা কানড়া ফলা সাটে।
সামালিয়া সাহসে সমরে সেনা কাটে।।"[৪]

কানাড়া বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রতিপক্ষ সৈন্যদের পরাভূমকরেছেন। কানাড়ার বীরত্বের পরিচয় লাউসেনকে বিবাহ করার মধ্য দিয়েও পাওয়া যায়। বল যুদ্ধে বিজয়ী হয়েই সে কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে লাভ করেছেন। বীরঙ্গনা রাজমহিষী কানাড়ার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে আসা ভাটকে বিতাড়নের ঘটনায়।
কবি কানাড়া চরিত্রের বীরত্বসূচক বিশেষণ 'সমরসিংহিনী', 'ভবানী রণভীম' ব্যবহার করে বীর্যময়ী আস্ফালনই প্রকটিত করেছেন।

এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে দাসী ধুমসিরও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দাসী অর্থাৎ রাজমহিষী কানাড়ার দাসী ধুমসি। তবে রাজমহিষীর কোনো দৈহিক সেবা নয়, জীবন সেবার মধ্যদিয়েই বীরত্বের প্রকাশ দেখিয়েছে দাসী ধুমসি। মাতুল শ্বশুরের সঙ্গে কানাড়ার সংগ্রামে ধুমসি দাসী রণসাজে সজ্জিত হয়ে সংগ্রাম করেছে। শত্রু পক্ষের সৈন্যের মাঝে নিজেকে আঘাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে 'ঢাল' এবং নিজে বিপক্ষ দলকে আঘাত করতে 'খাঁড়া' নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। প্রতিপক্ষ সৈন্যদের মাঝে ধুমসি দাসীর রণ সংগ্রাম বোঝাতে কবি লিখছেন—

"ধূমসী তামসী রণে পড়ে ধুন্ধুমার।
হাতী ঘোড়া সিফাই পড়িছে একাকার।।
এক চাপে রুষিয়া চঞ্চল ঢাল চালি।
ধূমসী সম্মুখে যোঝে ষোল শত ঢালি।।"[৫]

ধুমসি দাসী বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেছে। বীরবলে পরাজিত মহামদ ধুমসি কর্তৃক ধৃত হয় এবং মহামদকে দাসী ধুমসিরাজমহিষী কানাড়ার হস্তে সমর্পণ করে। লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ময়নাগড় রক্ষার্থে কানাড়াকে সাহায্য করতে যে শুধু বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ধুমসি দাসী এমন নয়, পূর্বেও গৌড়েশ্বরের ময়নাগড় আক্রমণ প্রতিহত করতে এই ধুমসি দাসীর বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কাশীদাসি মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে নারী রাজ্যে বীরঙ্গনাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন দিগ্বিজয় যাত্রার সময় যজ্ঞের ঘোড়া প্রমিলার রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রমিলার নির্দেশে যজ্ঞের ঘোড়াকে বন্ধন করা হয়। নারী রাজ্যে নারী হস্তে ধৃত ঘোড়ার সংবাদে মনে শঙ্কা প্রকাশ করেন পাণ্ডুর নন্দন। প্রমিলার রাজ্যের নারীগণকে কবি 'মহাবলবতী' বিশেষণে অভিহিত করেছেন। কবি কৃত অর্জুনের বয়ানে নারীগণের বীরঙ্গনা মূর্তির পরিচয় ফুটে ওঠে—

"অবলা প্রবলা হয়ে ধরে ধনুঃশ্বর।
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর।।
দরশনে ভায় পাই যুঝিব কেমনে।
পরাজয়ে অপযশ থাকিবে ভুবনে।।"[৬]

অর্জুন সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছায় নারীগণে নানা অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদেরকে পরাক্রমী প্রমাণ করতে প্রস্তুত রাখে। তবে অর্জুনদের সঙ্গে কোনোরকম যুদ্ধ শেষপর্যন্ত হয়নি। ফলে নারীগণের যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় প্রদানের অবকাশ ঘটেনি। কিন্তু কবি যুদ্ধের প্রাক্‌প্রস্তুতি পর্বের যে মূর্তি অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁদেরকে বীরঙ্গনা বলে উল্লেখ করতে হয়।

এই অশ্বমেধ পর্বেই যুদ্ধে উৎসাহদাত্রী জায়া রূপে জনাকে দেখা যেতে পারে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরলে অর্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে জনা পুত্র প্রবীরের মৃত্যু হয়। প্রবীর পিতা রাজা নীলধ্বজ সংগ্রাম না করে মিত্রতা করতে চাইলে স্ত্রী জনা পুত্র নিধনের প্রতিশোধ কামনায় মুখর। পুত্র শোকার্ত মাতা পতিকে সংগ্রামী করে তুলতে বলেন—

"সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জুন নিধনে মোর শোক নিবারণ।।"[৭]

নীলধ্বজ যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে প্রীতি স্থাপন করতে চাইলে জনা স্বামী নীলধ্বজের ক্ষাত্রচিত বীরত্বে ধিক্কার জানায়, কেন-না যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। স্বামীর চরণ ধরে অর্জুন বধের প্রতিশোধ কামনায় উন্মত্ত করে তুলে চেষ্টা করেন। এও জানান স্বামীর বর্তমানে নারী হয়ে প্রতিশোধ কামনায় নিজে উদ্যত হওয়ায় কলঙ্কের কারণ হতে পারে। লোক সমাজে কলঙ্কের ভয় না থাকলে অকপটে জনা জানায়'আমি করিতাম রণ।'[৮]

মৌখিক সাহিত্য গীতিকার মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরঙ্গনা নারী চরিত্রের উল্লেখ মেলে। ঐতিহাসিক চরিত্র নির্ভর গীতিকার পালাগুলির মধ্যে ইতিহাসের সেইসব বীরঙ্গনাদের পরিচয় মেলে যারা যুদ্ধে বিজয়িনী। এ প্রসঙ্গে 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাধারণ গৃহবধূ বা বাড়ির দাসী পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করে বীর্যবত্তার পরিচয় রেখেছেন তাদের আলোচনা করা হল ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' অবলম্বনে।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা'য় ফিরোজ খাঁরস্ত্রী সখিনার পুরুষ বেশে সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত। ফিরোজ খাঁ দেওয়ান বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রথম দুইদিন সমানভাবে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ করে। বিপদ ঘটে তৃতীয় দিন। বিপক্ষের কামানের গোলার আঘাতে আহত ফিরোজ খাঁকে বন্দি করে। বন্দি স্বামীকে উদ্ধার করারজন্য শুরু হয় পত্নী সখিনার বীরত্ব সূচক রণ সংগ্রাম। বিবি সখিনা রমণী বেশ পরিত্যাগ করে পুরুষ বেশ ধারণ পূর্বক রণসাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। মোঘল সৈন্যের বিপক্ষে সখিনার রণ কৌশলের বর্ণনায় পালাকার বলছেন—

"আগুন লাগাইল বিবি
কেল্লা তাজপুর সরে।।
বড়ো বড়ো ঘর দরজা

পুইড়া হইল ছাই।
রণে হাইর্‌ল বাদ্‌শার ফৌজ
সমরের সীমা নাই।।
দিনের দুইপর গোঁয়াইল
হালিয়া পড়ে বেলা।
ঘোড়ার উপর থাইক্যা বিবি
লড়িছেএকেলা।।"[৯]

বাদশার সৈন্যের সঙ্গে সখিনা বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আড়াই দিন পর্যন্ত সশস্ত্রে যুদ্ধ চালিয়েছিল। পরাক্রমী মনোভাবের সখিনা পরাজয় স্বীকার করেনি, পরাজয় স্বীকার করে মোঘল সৈন্যদল। স্বামীকে উদ্ধারের জন্য পিতার সৈন্যদলের সঙ্গে লড়াই সখিনা চরিত্রকে বীরত্বের মর্যাদা দিয়েছে। যুদ্ধে অবতীর্ণ বীরঙ্গনা নারী চরিত্র সখিনার জুড়ি গীতিকায় দ্বিতীয় আর নেই।

স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমে মোঘল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ী বীরঙ্গনা নারী সখনা চরিত্রের ভিত্তি ঐতিহাসিক। এ প্রসঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক বলেছেন—"মৈমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার জঙ্গলবাড়ী আর কেল্লা তাজপুর নেত্রকোনা মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চলে পাতয়াড়া বা 'পাতুড়ী'নদীর তীরে অবস্থিত।...ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়া বহু ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি স্বামী উদ্ধারের জন্য সখিনার যুদ্ধ সত্য ঘটনা। কেল্লা তাজপুরের নিকটে যে মাঠে সখিনার সঙ্গে উমর খাঁর পরিচালনাধীন বাদশাহী ফৌজের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও দেখাইয়াছিলেন।"[১০]

তলোয়ার হাতে বঙ্গ রমণীর বীরত্বের পরিচয় মেলে পূর্ববঙ্গ গীতিকার অপর একটি পালা 'রঙ্গমালা সুন্দরী চৌধুরীর লড়াই পালা'য়। এই পালার ভিত্তি ঐতিহাসিক না হলেও সামাজিক তাৎপর্য বিদ্যমান।জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের যোদ্ধা শক্তিমান সেনাপতি চাঁদ ভাণ্ডারী অপর এক মুসলমান জমিদার ইঙ্গা চৌধুরীর বাড়িতে নিশীথে আক্রমণ করতে উপনীত হয়। ইঙ্গা চৌধুরী এবং ভ্রাতা ভেলু চৌধুরীর সঙ্গে চাঁদ ভাণ্ডারীর প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়।প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে অনুজ ভ্রাতা রেজা চৌধুরী। শক্তিশালী চাঁদ ভাণ্ডারীর হস্তে নিহত হয় ইঙ্গা চৌধুরী ও ভেলু চৌধুরী। স্বামীর পরিণাম দেখে অন্তঃপুর থেকে ছুটে আসে ইঙ্গা চৌধুরীর স্ত্রী। চাঁদ ভাণ্ডারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। পতি ঘাতকের প্রতি প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে—

"কোলের পলা নাবাই থুই কিরিচ টানি লইল।
কিরিচ হাতে করি বিবি ঘরর বাইর হইল।।
আউলা ঝাউলা মাথার কেশ চৌক্ষে আগুন জ্বলে।
আচম্বিতে আইল বিবি সেই না রণ থলে।।"[১১]

'কিরিচ' হস্তে চৌধুরী স্ত্রীর প্রতিহিংসা পরায়ণা রণমূর্তি চেহারা দর্শনে শক্তিশালী চাঁদ ভাণ্ডারী ভীত সন্ত্রস্ত।প্রতিহিংসা প্রজ্বলিত নারীর চেহারাচাঁদ ভাণ্ডারীর মনে হয়েছে সাক্ষাৎ 'জয়কালী মা', স্বয়ং তিনি তার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করতে আসছেন। প্রমাদ বুঝে পলায়ন করে চাঁদ ভাণ্ডারী। এই সবলা বাহু মুসলমান বধূ পুরুষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে পারতেন তার প্রমাণ এই পালাটি।

'মাণিকতারা ডাকাইতের পালা'য় ডাকাত দলের নেত্রী বাসুর স্ত্রী মাণিকতারা প্রত্যুৎপন্নমতির পাশাপাশি সাহস এবং বীর্যের অধিকারী ছিল। মাণিকতারা তীর চালনায় দক্ষতা লাভ করেছিল। নারী হয়েও ওস্তাদের (দারু ও সুমারু কোচের সাকরেদ মাণিকতারা) কাছে রীতিমতো প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। গায়ে ছিল অত্যধিক বল। তীর ধনুক হাতে পেলে

মাণিকতারা একাই হয়ে ওঠে ‘একশ মাণিকতারা’। এমন বীর্যের অধিকারী মাণিকতারাকে একা ঘরে রেখে যেতে স্বামী বসু শঙ্কিত হলে স্বামীকে অভয় প্রদান করে সাহসী এই নারী—

“মনে তুমি জাইন আমি একাই শতেক নারী।
বিশ যোয়ানের মাথা আমি একলা খাইতে পারি।।”[১২]

মাণিকতারার বীরত্বের প্রকাশ শুধুই তার মুখের কথায় প্রকাশ নয়। বাসুর প্রতিপক্ষ কালুচোরা বাসুকে পীড়া দিয়েছে— এক পা ভেঙে খোঁড়া করে দেয়। একসময় কালুচোরা বাসুর বাড়ি আক্রমণ করলে মাণিকতারা বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রতিরোধ আক্রমণ শানিয়েছে। ভীত স্বামী বসু কালুচোরার ভয়ে স্ত্রী মাণিকতারাকে পালানোর পরামর্শ দিলে মাণিকতারা স্বামীকে ব্যঙ্গ করেছে। তীর ধনুক হাতে শতনারীশক্তি সম্পন্ন মাণিকতারার সঙ্গে ভীষণ প্রকৃতির কালুচোরার দলের লড়াইয়ের বর্ণনায় মাণিকতারার বীরত্বই পালাকার প্রকাশ করেছেন—

“বাড়ীর সামনে মাণিকতারা একলা মাইয়া খাড়া।
পঞ্চ আছে পিছনে তার তীরের বোঝা ধইরা...।।
বড়ো বড়ো যুয়ান মর্দ তীরে পইড়া গেল।
কালুচোরার বুকে তীর ইপার ওপার হইল।।”[১৩]

মাণিকতারার শরাঘাতে কালুচোরার মৃত্যু হয়। শুধু তাই নয়, তার দলের জোয়ান শক্তিশালী মাণিকতারার কাছে পরাহত। এহেন বীর্যময়ী সাহসী নারী পরবর্তীতে ডাকাত দলের সর্দারনেত্রী হন।

মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পরিমণ্ডলে নারীর পর্দাপ্রথা, গৌরীদান প্রথা প্রভৃতি নারীর জীবন অবদমিত করে রাখলেও দেখা যায় কোনো কোনো নারী পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এবং বীরত্বব্যঞ্জক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য এবং সমাজ দুই প্রেক্ষিতেই একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।আলীবর্দি খাঁর (রা. ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী বেগম শরফুন্নেসা স্বামীর সঙ্গে সমরাভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। নবাব সরফরাজ খানের (১৭০০-১৭৪০ খ্রি.) সেনাপতি গাউস খানের পত্নীর রণকৌশলের কথা বলা যায়। সমাজ ব্যতিরেকে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের বেহুলার মৃত স্বামীকে নিয়ে একাকী সাহসিকতাপূর্ণ যাত্রার কথাও এখানে স্মর্তব্য। মুসলমান শাসনামলে নারীগণ পুরুষ নির্দেশিত সমাজ কাঠামোয় অবরুদ্ধ থাকলেও এইসব রমণীগণ সাহস, বীরত্বের জন্য স্মরণীয়া হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র-

১.মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পা.), ‘ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২,পৃ-৬০৩

২.তদেব, পৃ-৬১৩

৩.তদেব, পৃ-৬২৩

৪.তদেব, পৃ-৬৫৪

৫. তদেব, পৃ-৬৫৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), ‘কাশীদাসী মহাভারত’ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ,কলকাতা-৭০০০০৯,তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৯,পৃ-৪২৮

৭. তদেব, পৃ-৪০১

৮. তদেব, পৃ-৪০২

৯. মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (পঞ্চম খণ্ড), ফার্মা কে,এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ-২০৪-২০৫

১০. তদেব, পৃ-১৩৩-১৩৪

১১.ঐ,'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (চতুর্থ খণ্ড), ফার্মা কে,এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ-১৬৮

১২. তদেব, পৃ-২৭৯

১৩. তদেব, পৃ-২৮৭-২৮৮

সহায়ক গ্রন্থ-

১। গঙ্গোপাধ্যায়,শম্ভুনাথ, 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ২০১১

২। চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা : পুনর্বিচার', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ প্রকাশ,জুলাই ২০২১

৩। চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, 'বঙ্গ রমণীর বিস্মৃত ইতিহাস', মনীষা, কলকাতা-৭০০০০৬,প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ১৩৬৭।

৪। পট্টনায়ক, পুলক রঞ্জন, 'নারীচেতনার আলোকে মঙ্গলকাব্যের নারী', সাহিত্যশ্রী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৭

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), 'কাশীদাসী মহাভারত' (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ,কলকাতা-৭০০০০৯,তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৯

৬। মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পা.), 'ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২

৭। মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (চতুর্থ খণ্ড), ফার্মা কে,এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২

৮। মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (পঞ্চম খণ্ড), ফার্মা কে,এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৩

৯। সেন, দীনেশচন্দ্র, 'বাংলার পুরনারী', দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী,কলকাতা,প্রথম সংস্করণ,১৯৩৯

১০।সেন, দীনেশচন্দ্র, 'বৃহৎ বঙ্গ' (২য় খণ্ড),দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩,দে'জ পুনর্মুদ্রণ, মাঘ১৩৯৯

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম

ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

কান্না উপন্যাসের একটি নিবিড় পাঠঃ প্রসঙ্গ প্রান্তিকতা ও প্রতিবন্ধকতা

ড. সঞ্জীব রজক

সারসংক্ষেপ-

প্রতিবন্ধকতা হলো একটি সমস্যা। সাধারণভাবে মানুষের কোনো একটি অঙ্গ যদি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কার্যক্ষমতা হারায় তাহলে ব্যক্তির ওই অবস্থাকে প্রতিবন্ধকতা বলা হয়। সেই প্রতিবন্ধকতা যদি আমাদের দেশে যোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা শতকরা চল্লিশ ভাগের বেশি বলে বিবেচিত হয় সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী বলা হয়। প্রতিবন্ধকতার নানান ধরনগুলো হলো- দৃষ্টিগত, শ্রবণজনিত, অস্থিগত, মানসিক, বহুবিধ ইত্যাদি।

তবে সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার ধারণাও বদলেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রতিবন্ধকতা ছিল দেবতা বা ঈশ্বরের অভিশাপ। রামায়ণ ও মহাভারতে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন আছে। নিদর্শন হিসেবে অন্ধক মুনি ও ধৃতরাষ্ট্রের নাম করা যেতে পারে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে প্রতিবন্ধকতাকে দেখা হয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্যা হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর মানুষ অঙ্গহানির শিকার হয়। এই পর্যায়ে নতুনভাবে প্রতিবন্ধী চর্চা আরম্ভ হয়। এই সময় থেকে প্রতিবন্ধী চর্চার তাত্ত্বিকরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিবর্তে সামাজিক নির্মাণ তত্ত্বটিকে গুরুত্ব দেন। তারা প্রতিবন্ধকতা বিষয়টিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা হিসেবে দেখার কথা বলেন। সামাজিক নির্মাণের কয়েকটি উদাহরণ হলো- রান্না করা মেয়েদের কাজ, কালো মানুষরা সুন্দর নয়, ইত্যাদি।

প্রান্তিক বা প্রান্তেবাসি বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয় কোনো দেশ বা রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। তবে ব্যাপকার্থে এর অর্থ হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। সে দিক থেকে প্রতিবন্ধী মানুষরা প্রান্তিকতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। 'কান্না' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রয়েছে কলকাতার বস্তি অঞ্চলের জনগোষ্ঠী এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার শিকার জন ও অস্থি প্রতিবন্ধকতা যুক্ত লনার কথা। আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কান্না' উপন্যাসে প্রান্তিকতা ও প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গটি অনুসন্ধান করে দেখব।

মুল শব্দ-

প্রান্তিকতা, প্রতিবন্ধকতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, অস্থি প্রতিবন্ধকতা, প্রচলিত মিথ, সমাজমনস্কতা বা সমাজসচেতনতা।

মুলপ্রবন্ধ-

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় কাল ১৮৯৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তী কালে তিনি বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। "তারাশঙ্কর একদা 'কল্লোলে'র দলে ঠাঁই পেয়েছিলেন, কিছু কিছু কবিতাও লিখেছিলেন কিন্তু পরে তিনি নিজের প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হন। মানব জীবনের বিশাল রূপ কথাসাহিত্যের মারফতে ফুটিয়ে তোলাই যে তাঁর একমাত্র ব্রত তা তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন এবং 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর খোপ থেকে বেরিয়ে বিশাল প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন।"[১] দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তিনি কথাসাহিত্যে সাফল্যের চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন। মূলত রাঢ় বাংলার জীবনচিত্র চিত্রনের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় হলেও তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। 'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯ খ্রীঃ), 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রীঃ), 'কালিন্দী' (১৯৪০ খ্রীঃ), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপন্যাস রচনার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। কোনো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, দেহধারি মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের কাহিনি শিল্পের সততায়

চিত্রিত করেছেন। নবীন ও প্রাচীনের মধ্যে নবীনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠা এবং প্রাচীনের কালের অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়ার দর্শন বারবার তাঁর সাহিত্যে ফিরে এসেছে। নিজের অভিজ্ঞতার জগতকে তিনি বাংলা সাহিত্যে নির্মোহ দৃষ্টিতে পরিবেশন করেছেন। সে প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তাঁর উপন্যাসে মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তি, জীবন ও সমাজের ছবিটি অপূর্ব করুণায় ও মমতায় বর্ণিত হয়েছে। একটা যুগের অবসান হচ্ছে, আর একটা যুগ আসছে। পুরাতন গ্রামীণ জমিদারী আবহাওয়া চলে যাচ্ছে, আর সেই শূন্য স্থান পূরণ করতে আসছে শিল্পপতির দল। গ্রাম জনপদ যন্ত্রদানবের কৃপায় রাতারাতি আধা শহরে পরিণত হচ্ছে।"[২]

আমাদের আলোচ্য 'কান্না' উপন্যাসের পটভূমি কিছুটা আলাদা। এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং বস্তিবাসী মুসলিম সমাজের জীবনযাত্রার ছবি। এই উপন্যাসের পটভূমি জুড়ে রয়েছে যেমন বস্তবাসী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ তেমনই প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষের জীবনের ছবি। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আমরা যেমন কপিলার পাশাপাশি উপেক্ষিতা নায়িকা হিসেবে মালার উপস্থিতি লক্ষ্য করি তেমনই এই উপন্যাসে প্রতিবন্ধকতার শিকার লনার অবস্থান। আর উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বা নায়ক চরিত্র হলো দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধী জন। জনের বিচিত্র জীবনকথা এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর সমাজে তার অবস্থান এই উপন্যাসের উপজীব্য। আমরা এই উপন্যাসে যেমন প্রান্তিকতা ও প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করব, পাশাপাশি চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে লেখক কতখানি প্রচলিত মিথ বা সমাজমনস্কতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন সেই বিষয়টি অনুসন্ধানও এই গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রান্তিকতা ও প্রতিবন্ধকতাঃ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেমন স্থান পেয়েছে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথা এবং নাগরিক জীবনের নানা জটিলতা তেমনই গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের কাহিনি তিনি অসীম মমতায় চিত্রিত করেছেন। সে প্রসঙ্গে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তিনি বীরভূম অঞ্চলের অতি সাধারণ শ্রেণীর বেদিয়া, বাজিকর, সাঁওতাল, আউল-বাউল, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি রহস্যময় ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তাদের জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাও এতদিন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল।"[৩] সেই প্রেক্ষাপটে মাঝেমধ্যে উঠে এসেছে প্রতিবন্ধী মানুষের কথা। 'পঞ্চপুত্তলী', উপন্যাসের ফড়িং মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে দৃষ্টিহীন চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। 'তমসা' গল্পের পঞ্চে, 'ভুবনপুরের হাট' উপন্যাসের নব ঠাকুর এবং 'কান্না' উপন্যাসের জনের জীবনের বেঁচে থাকার সকরুণ ইতিবৃত্ত কথাসাহিত্যে তিনি চিত্রিত করেছেন। আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই মানুষগুলো আসলে প্রান্তিক বা প্রান্তেবাসী।

কান্না উপন্যাসের আলোচনাঃ

আমাদের আলোচ্য 'কান্না' উপন্যাসটি ১৯৬৫ খ্রীঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি তাঁর 'রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে' স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক বা কেন্দ্রিয় চরিত্র হলো জন। সে ঘটনাচক্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার শিকার। তার পাশাপাশি অস্থি প্রতিবন্ধকতা যুক্ত লনার অবস্থানটিও লক্ষ্য করার মতো। তবে জনের জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনি এই উপন্যাসর মূল উপজীব্য।

জন কোনো এক ভদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতার এক বস্তি অঞ্চলে নানির কাছে। একদিন সেখান থেকে পালিয়ে ফাদারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফাদারের প্রচেষ্টায় তার জীবনে রুচিশীল শিক্ষা-দীক্ষার সূচনা হলেও বস্তি জীবনের অমোঘ আকর্ষণ তার চরিত্রে সক্রিয়। একদিন কৈশোরে যে রশ্মিকে তার ভালো লেগেছিল সেই স্মৃতি সে ভুলতে পারে না। ঘুমের মধ্যে নানির নাম ধরে কেঁদে ওঠে। এসবের মধ্যেও তার সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ তাকে একজন যন্ত্রী ও গায়ক করে তোলে। পিছনে পড়ে আছে প্রথম কৈশোরের প্রেমের স্মৃতি আর বস্তি জীবনের বন্য আনন্দের আকর্ষণ। সঙ্গীতের সূত্র ধরেই তার জীবনে একাধিক নারীর আগমন ঘটে। অস্থি প্রতিস্পর্ধী লনার

সান্নিধ্য তাকে সুখী করতে পারে না। ফাদারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সে যথেচ্ছ জীবন যাপন করে। একদিন পুরোনো প্রেমিকা রশ্মির সঙ্গ করতে গিয়ে তার ডাকাত অভিভাবক পল্টনের দ্বারা সে আক্রান্ত হয়ে চোখের দৃষ্টি এবং গলার স্বর হারায়।

প্রকৃতপক্ষে বন্য জীবনের আকর্ষণ আর নারী সঙ্গ লাভের প্রবণতা থেকেই তার জীবনে দৃষ্টিহীনতা নেমে আসে। দৃষ্টিহীন জীবনে যখন সে আর গাইতে পারে না তখন বেহালা বাজিয়ে উপার্জন করে। কখনো ভিক্ষাবৃত্তিও করতে হয় তাকে। এই বিপর্যায়ের দিনে তার আবার লনার কথা মনে পড়ে। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপন্যাসের একটি চিঠির উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য- "অন্ধ হয়েছি। আমার চোখ কেড়ে নিলে, পাপ নিলে, এমন কণ্ঠস্বর নিলে তবু এর কি অমোঘ আকর্ষণ ডেভিট, অন্ধ আমি নারী দেহ খুঁজছি।"[৪]

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে মানুষ মানুষকে প্রতিবন্ধী বানায় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। জন একদিন উৎশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য পল্টনের হাতে দৃষ্টি হারিয়েছে। মানুষকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে অর্থোপার্জনের প্রসঙ্গটিও লেখক সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন। "এই উপন্যাসে আমরা পাচ্ছি ছোটো ছেলেমেয়েদের খোঁড়া অন্ধ বানিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে (ব্যবসার) বাধ্য করার কথা।"[৫] বস্তি নিবাসীনি জনের নানি আসলে একজন শিশু পাচারকারী মহিলা। জনকেও সে বেচে দিতে চেয়েছিল পাঁচশো টাকার বিনিময়ে। উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় এবং জনের প্রতি তার স্নেহের উদ্রেক হওয়াতে জন রক্ষা পেয়েছিল। অর্থের বিনিময়ে শিশুদের নিয়ে গিয়ে একদল মানুষ তাদের প্রতিবন্ধী বানিয়ে ভিক্ষে করায়। তাই মানুষের প্রতিবন্ধকতা যে একটি শোষণের মাধ্যম এই উপন্যাসে সেকথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার যারা গায়ক জনের আকর্ষণে একদিন তাকে আপন করে নিয়েছিল দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর তারা সবাই জনের সঙ্গ ত্যাগ করেছে।

সঙ্গীতবিদ্যাকে এখানে জনের জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। জনের জীবনের যাবতীয় উত্তরণ এবং বেঁচে থাকা তা এই সঙ্গীত দক্ষতাকে কেন্দ্র করে। কখনো সে সুকণ্ঠ গায়ক আবার কখনো বেহালাবাদক যন্ত্রী বা পথের ভিখারি। দৃষ্টিশক্তি না থাকার সঙ্গে মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির যে কোনো সম্পর্ক নেই সে বিষয়টিও এখানে লক্ষণীয়। তবে জন দৃষ্টি হারানোর পর নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছেছে। তাই সে বলে, "চোখ নিলে, পাপ নিলে।"[৬] সম্ভবত জনের করুণ জীবনবৃত্তান্ত চিত্রনের মূলে প্রভাব ফেলেছে লেখকের ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতি- "পরিণত বয়সে তিনি চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক অন্ধ ফিরিঙ্গি বেহালাবাদক ভিক্ষাজীবি দেখে আকৃষ্ট হন। তার অপূর্ব সুর জ্ঞান ও মর্যাদাব্যাঞ্জক আচরণ তার প্রতি আকৃষ্ট হবার অন্যতম কারণ। এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না, সহানুভূতিশীল তারাশঙ্করের কাছে অন্ধ মানুষটি তার জীবনের ব্যর্থতার কথা বলে থাকবে।"[৭] ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্ট জন চরিত্রটি বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধকতার অন্য ধরনকে তুলে ধরেছে। তবে দৃষ্টিহীনরা জন্ম থেকেই সঙ্গীতে পারদর্শী এমন একটি অবৈজ্ঞানিক ধারণা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত আছে। বাংলা সাহিত্যেও নানা ক্ষেত্রে এই নেতিবাচক ধারণাটির অনুসৃতি লক্ষ্য করা গেছে। 'সহজ পাঠ' গ্রন্থে চারবার দৃষ্টিহীনতা প্রসঙ্গ আছে এবং প্রত্যেকবারই তা গানের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো দার্শনিক কবি হয়তো দৃষ্টিহীনদের গান গাওয়ার অনুষঙ্গটি প্রতীকি অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাদের বাস্তব মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেন নি। তবে শিশুরা অল্প বয়সে এই চিত্রকল্পের সঙ্গে যখন পরিচিত হয় তাদের মনে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। তুলনায় তারাশঙ্করের সৃষ্ট পটভূমি অনেক বেশি বাস্তব ধর্মী। তবে গানের অনুষঙ্গটি অনুরূপ। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনির্বাণ মুখার্জী তার 'সহজ পাঠের অন্ধরা' নিবন্ধে লিখেছেন-"দৃষ্টিহীনদের রক্তমাংসের মানুষ ভাবার পরিবর্তে একটা রূপক হিসেবে দেখার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক মনোভঙ্গির মূল শিকড়।"[৮] তাই জন চরিত্রের মধ্যে প্রচলিত মিথের অনুসৃতি ঘটেছে বলা যেতে পারে। তবে তারাশঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন সঙ্গীতরসিক মানুষ। তাই শুধু এই চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে নয়, নানা রচনায় বারবার সঙ্গীতের অনুষঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে।

কলকাতার বস্তি অঞ্চলের প্রেক্ষাপট লেখক যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা তাঁর বাস্তব জীবন বোধ ও সমাজমনস্কতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনের মধ্যে দিয়ে সমাজে দৃষ্টিহীনদের অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অস্থি প্রতিবন্ধকতার কারণে লনার চরিত্র একটু নিষ্প্রভ বলে মনে হতে পারে কারণ তার জীবনের গতি একটু স্লথ যে কারণে সক্রিয়তাও তুলনায় কম। তবে এই উপন্যাসের মূল বিষয়গুলোকে এইভাবে বলা যেতে পারে- প্রতিবন্ধকতা হলো একটি শোষণের হাতিয়ার এবং মানুষ নানান স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিবন্ধকতাকে ব্যবহার করে। একটি নীতিগত দর্শনকেও এখানে লেখক ধরার চেষ্টা করেছেন সেটি হলো অনিয়ন্ত্রিত আসক্তি বা বন্যতা মানুষকে নিম্নগামী করে। তবে লেখক জন চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে প্রচলিত মিথের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। সর্বোপরি সারা উপন্যাসে সমাজ জীবনকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা তাঁর সমাজমনস্কতাকেই মনে করিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্রঃ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি.: কলকাতা, ১৯৯১। পৃ. ৪৯৮।

২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৮।

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৮।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স: কলকাতা। পৃ. ৩০১।

৫। ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী। সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী, পরম্পরা: কলকাতা, ২০১১। পৃ. ৪২।

৬। তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১।

৭। পূর্বোক্ত, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ. ৩০০।

৮। রজক, সঞ্জীব ও মণ্ডল দৈবকী। সম্পাদিত, ইতিহাস ও সাহিত্যের আলোকে প্রতিবন্ধকতা, ধী পাবলিকেশন: কলকাতা, ২০২৩। পৃ. ৮৯।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD. 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

....

সহকারী অধ্যাপক ,বাংলা বিভাগ , সুশীল কর কলেজ

বাবু কালচার থেকে নবচেতনায় উত্তরণ : প্রসঙ্গ উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ

ইতিষা নন্দী

সারসংক্ষেপ-

সময় উনিশ শতক। সমাজটা অবশ্যই কলকাতার। উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে এই নতুন নগরী যখন বিচিত্র কোলাহলের শহরে রূপ নিয়েছে, তখন তার উচ্ছৃঙ্খলতার সাথে সমগামী হয়েছে উদ্যম। বিপুল তার আয়োজন, প্রচণ্ড তার আকর্ষণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম শহর হিসেবে সে গড়ে উঠল এক মহা মহোৎসবে। উনিশ শতকের যুক্তি-প্রশ্নের তর্কে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের মূল্য নির্ণয়ে অচলায়তনে ফাটল ধরল। অচলায়তনের নাম চিরাচরিত বাঙালি সমাজ। ১৭৫৭-এ পলাশির যুদ্ধে ঘটে যাওয়া শাসকের পালাবদলে বণিকের মানদণ্ড পরিণত হলো রাজদণ্ডে। পলাশির যুদ্ধ জয় ও দেওয়ানি লাভের পর রাজ্য শাসনের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন শাসক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নগর কলকাতাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন বাংলার নতুন রাজধানী হিসেবে। অস্তমিত হল মুর্শিদাবাদ, জেগে উঠল কলকাতা। গেল ফার্সি, এল ইংরেজি। জাঁকজমকময় কলকাতা তখন কাঁচা টাকার মুখ দেখছে। সেই টাকার লোভে গ্রাম থেকে উঠে আসা অর্থশালী ভুঁইফোড় এক সম্প্রদায় ইংরেজদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে দেওয়ানি-দালালি-মুৎসুদ্দিগিরি করে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলেন বিত্তবান শ্রেণিরূপে। তারাই পরিচিতি পেতে শুরু করলেন 'বাবু' সম্প্রদায় নামে। তাদের চোখের সামনে ভাসতে লাগলো নবাবি আমলের আভিজাত্য। স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন নবাবি বিলাসিতার। উনিশ শতকের পুঁজির দাম্ভিকতায় দু-হাতে অর্থ উড়িয়ে নটীর নূপুরে ও মদের পেয়ালায় ডুবিয়ে দিলেন তারা তাদের বৈভবময় জীবনকে। বিবি, বাঈজি, বারাঙ্গনা, বাণিজ্য, বাজি, বুলবুলি, বোতল, বাগানবাড়ি, বটতলা, বৌ-বাজার—এই 'ব' কালচারকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল 'বাবু কালচার'। এর পাশাপাশি উনিশ শতকের বেসামাল কলকাতাকে নতুন চিন্তা ও যুক্তিবোধের আলোকে উজ্জীবিত করতে তৈরি হল নবচেতনার। এই নতুন চিন্তার ঢেউ উঠতি বাবুরা আনেননি, আনতে চানও নি। তা আনলেন অন্য এক দল। এঁরা আলালের ঘরের দুলাল নন, এঁরা মধ্যবিত্ত। বিদ্যাই হল এঁদের প্রধান হাতিয়ার। তাঁদের হাত ধরে এতদিন ধরে সমাজের বুকে প্রচলিত থাকা প্রথাগুলির বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠতে থাকল। ভীত নড়ে উঠল চিরাচরিত সমাজ জীবনের। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল দল প্রমুখদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে চলতে থাকল একের পর এক সংস্কারমূলক আন্দোলনের ঢেউ। নয়া নগরী কলকাতা উঠতি বাবুদের বেসামাল চিত্র থেকে সংস্কারকদের হাত ধরে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে থাকল।

সূচক শব্দ-

উনিশ শতক, কলকাতার সমাজ, প্রচণ্ড আকর্ষণ, বাবু সম্প্রদায়, 'ব'- কালচার, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সংস্কারমূলক আন্দোলন।

মূল প্রবন্ধ-

সমাজ ও সাহিত্য একটি চলমান প্রবাহ। আমাদের সমাজ যেমন সৃষ্টির সাথে জড়িত, তেমনি সৃষ্টিও সমাজেরই ফলশ্রুতি। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের আবর্তে তাকে হয়তো সীমাবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু নদী যেমন বাঁক নেয়, তেমন ভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেও আসে কিছু বাঁক বদলের পরিবর্তন। তার থেকেই বোঝা যায় সমকালের মানুষ, তার সমাজ ও কৃষ্টিকে আমরা একটু সন্ধান করলেই দেখতে পাবো সমাজের এই বাঁক বদলের প্রতিক্ষণে লুকিয়ে আছে কী ও কেন-র দ্বন্দ্ব। তার-ই সন্ধান প্রশ্নে আমরা বলতে পারি পশ্চাদ্‌পটের ইতিহাস উপেক্ষিত বা অবহেলিত হলে যেমন চিত্র পরিস্ফুটন হয় না, সেইভাবেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের পটভূমি বিশ্লেষিত না হলে

উনিশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের সম্যক্ অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটা অনেকটা প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর ইতিহাসের মতো। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের যথার্থ আধুনিকতার ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। যদিও এই শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে চলেছে আধুনিকতার প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস, এবং দ্বিতীয়ার্ধেই ঘটেছে আধুনিকতার অবশ্যম্ভাবী বিকাশ। যুক্তি-তর্কের প্রশ্নে, মানবতাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মূল্য নির্ণয়ে অচলায়নে ফাটল ধরল। অচলায়তনের নাম মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ। আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্থিতিশীল, চিরাচরিত ধারণায় আবদ্ধ গ্রামীণ বাঙালি সমাজের কাছে বাইরের বৃহত্তর জগৎ-এর পরিচয় ছিল অনেকটাই অজানা। আর তাই প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, বহুপ্রকার বিধিনিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ অচলয়াতনেরই আর এক নাম। কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর সেখানে দেখা দিল ফাটল। তার-ই সমাজ ইতিহাসের পর্যলোচনা করতে গিয়ে দেখি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় যে সময় বিভাজন করেছেন, সেখানে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি হিসাবে প্রায় সুনিশ্চিতভাবে ১৭৬০-এ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সময়কেই নির্ধারণ করেছেন। এ কথা মানি না। কারণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে মনে প্রশ্ন জাগে আঠারো শতকে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনায় ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর থেকেও কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় তার তিন বছর আগে ১৭৫৭-এ পলাশির যুদ্ধে ঘটে যাওয়া শাসকের পালাবদলের ইতিহাস ? যেখানে বণিকের মানদন্ড পরিণত হল রাজদন্ডে। এই সিংহাসনের পালাবদলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারায় এতদিনের প্রচলিত বহু বিশ্বাসের বুকে জন্ম দিল সংশয়ের, সমাজকে করে তুললো চঞ্চল ও আলোড়িত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি তখন নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হতে থাকল নতুন শাসকের দ্বারা। যার প্রভাব পড়ল সমকালের সমাজ, ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর। সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল এতদিনের পরিচিত চিত্রপটটি। তাই একটি যুগের অবসানে ও নতুন যুগের আগমনে একজন কবির মৃত্যুর থেকেও অনেক বেশি তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে শাসকের পালাবদলের ইতিহাস।

আমরা যে সময় পর্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করছি সেটি এমন একটি সময়, যখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে নবাবি আমল, ইংরেজ শাসনের শিকড় তখনও ছড়িয়ে পড়েনি সমাজের গভীরে। এই নয়া শাসকশ্রেণি এদেশে তাদের ভীত মজবুত করতে চালু করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন তারা। জন্ম দিলেন সরকারের পরম বিশ্বস্ত বিত্তবান নতুন এক জমিদার শ্রেণির। বাংলা নবাবের শাসককালীন সময়পর্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই ছিল স্বাধীন বাংলার রাজধানী। পলাশির যুদ্ধ জয় ও দেওয়ানি লাভের পর রাজ্য শাসনের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন শাসক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নগর কলকাতাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন বাংলার নতুন রাজধানী হিসাবে। এই সময় থেকেই কলকাতা হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলার প্রাণকেন্দ্র। গড়ে ওঠে কলকাতা কেন্দ্রিক এক নতুন জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে নতুন রাজশক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ক'বছরের মধ্যেই স্বাক্ষর রাখল আপন শোষণ কৃতিত্বের। এল মন্বন্তর। ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ ভেঙে দিয়েছিল বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বাংলার অগনিত মানুষের প্রাণ। ১৭৭২-এ পাঁচশালা, ১৭৯০-এ দশশালা ও ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যেমন বদলেছে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো, তেমনই বিনষ্ট হয়েছে গ্রাম ও নগর জীবনের সুস্থিরতা। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে নয়া শাসকের রাজস্ব বৃদ্ধির চাপ। এই দুই-এর যাঁতাকলে পড়ে মৃতপ্রায় মানুষ বাঁচার তাগিদে পাড়ি জমাচ্ছে নগর কলকাতায়। সেই সুযোগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন অভিজাত বংশের শূন্যস্থান দখল করতে এগিয়ে এল ইংরেজ সান্নিধ্যে অর্থশালী ভুঁইফোড় এক সম্প্রদায়। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে ইংরেজি অনুগৃহীত শহরবাসী এই হঠাৎ নবাবের দল বাঙালি সমাজ জীবনে রাতারাতি আপন আসর করে নিল। এই সময় থেকেই কলকাতা নগরী চলে গেল বেশকিছু মধ্যস্বত্ত্বভোগী ধনী উঠতি জমিদার ও হঠাৎ করে বড়োলোক হয়ে ওঠা বাবুদের হাতে। গবেষক বিনয় ঘোষ এই

প্রসঙ্গে বলেছেন – "বাংলার নতুন শ্রেণিবিন্যাসের যুগে যাঁরা এইভাবে সমাজকে ভেঙেচুরে ফেললেন তাঁরা হলেন ব্রিটিশ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীশ্রেণি এবং তাঁদেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন বাংলার বনেদী ও হঠাৎ জমিদারশ্রেণী।" [১]

মানুষের আশ্রয়ের রূপ ধর্মের থেকে বদলে হল কর্মে। প্রতিষ্ঠা পেল অর্থ যার সম্মান তার। ক্ষমতা যার সমাজ তার। বাঙালি সমাজে এতদিনে বর্ণকৌলীন্যের সমাপ্তি হয়ে ঘোষণা হল বিত্তকৌলিন্যের সূচনা।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট হঠাৎ ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজন - এই বাবু সম্প্রদায় একদিকে যেমন জনসাধারণকে শোষণ করতে শুরু করল, অন্যদিকে তেমন নিজেদের স্বার্থেই এরা ইংরেজদের প্রতি অতি বিশ্বস্ত, সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মে হয়ে উঠল একান্ত বিশ্বাসী। তারা ইংরেজদের অধীনে নানা প্রকার বৃত্তি ও ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেল এক নতুন বিত্তবান শ্রেণি রূপে। তারাই পরিচিত হতে শুরু করল 'বাবু' সম্প্রদায় নামে। এই বাবুরাই ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল কলকাতার মূল স্তম্ভ। এই নয়া নগরী তখন আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ইংরেজদের সংস্পর্শে কলকাতা তখন কাঁচাটাকার মুখ দেখছে। সেই টাকার লোভে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মামলা-মোকদ্দমা, চাকরি-বাকরির জন্য দলে দলে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে এই নতুন শহরে। কলকাতা বৃদ্ধি হয়ে উঠছে কল্লোলিনী তিলোত্তমায়। বৃদ্ধি পেতে শুরু করে কলকাতাকে কেন্দ্র করে মানুষের উন্মাদনা। এই সুযোগে দেওয়ানি-দালালি-মুৎসুদ্দিগিরি করে অনেকের কপাল রাতারাতি ফিরে যেতে থাকে। উদ্বৃত অর্থ তাঁরা বিনিয়োগ করছেন ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ে। নতুন শহর কলকাতা হয়ে উঠল এইসব ধনীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। টাকাই হয়ে উঠল এইসব শিশুদীক্ষাহীন হঠাৎ নবাবদের শক্তির মূল উৎস। বংশকৌলীন, আভিজাত্যকে, পিছনে সরিয়ে, টাকার জোরে সমাজে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন এই বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিরা। যারা সমাজের কাছে 'বাবু' সম্প্রদায়ের সাথে পরিচয় ঘটালেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলায়', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', -এ আঠারো শতকের কলকাতার কল্লোলিনী হয়ে ওঠা এবং তাকে কেন্দ্র করে নতুন 'বাবু' সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে এই নতুন ধনী বাবুদের সম্পর্কে বলেছেন -

> "এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমনী সংঘটনকামি ভাঁড়ামি ও রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিংবা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসনে অধিকতর ধণাঢ্য হইয়াছেন।" [২]

এই ধনী সম্প্রদায়ের টাকায় কলকাতা যেন প্রাণ পেল। তাদের ধন সম্পত্তির জৌলুস ও বৈভবে বদলে গেল সংস্কৃতির অভিমুখ। বদলে যেতে থাকল তিনটি গ্রামকে নিয়ে গড়ে ওঠা কলকতার স্বরূপ।

এইরকম এক পরিবেশে সমাজের রূপান্তরের চিত্রকে নিজের চোখের সামনে দেখেছিলেন ভবানীচরণ, কালীপ্রসন্নের মতো ব্যক্তিবর্গরা। ওতপ্রোতভাবে তাঁরা জড়িয়ে গিয়েছিলেন উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে। তাই সহজেই ধরতে পেরেছিলেন নতুন গড়ে ওঠা বাঙালি সমাজের বাবু-কালচারকে। তাঁদের 'নববাবুবিলাস' বা 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-র পাতা ওল্টালেই দেখা যায়, তাঁরা দেখিয়েছেন শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে এই শহরের মানুষ রেহাই পায়নি কোনোদিন-ই। একদিকে বেঁচে থাকার লড়াই আর অন্যদিকে খোসামুদি ও উমেদারি করে দিন কাটানো -এই ছিল কালীপ্রসন্ন, ভবানীচরণের কলকাতা।

মানুষের বৈভবের ঢলে কলকাতা গ্রাম থেকে নগর হয়ে উঠলেও এই নতুন বাবু সম্প্রদায় নবাবি আভিজাত্যকে টিকিয়ে রেখে জাহির করতে চাইতেন নিজেদের বংশ কৌলিন্যকে। তাদের চোখের সামনে ভাসত নবাবি মহলের অভিজাত্য। তারা স্বপ্ন দেখতেন নবাবি বিলাসিতার। তাই হাতে যখন টাকা এল তখন ইংরেজদের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে অপূর্ণ স্বপ্নকে সার্থক করতে চাইলেন তারা। নবাবি জৌলুসের চাহিদার সাথে মেতে উঠলেন হঠাৎ পাওয়া বৈভবের দম্ভে। তাদের অবসর যাপনের আসরে জন্ম নিল খেউর, আখ্ড়াই, হাফ আখ্ড়াই, কবিগান, পাঁচালি, ও যাত্রা দলের। নতুন বাঙালি সমাজের সাথে পরিচয় হল আমোদের আয়োজনে নাগরিক রুচির। এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচায় নক্শায়’ লিখেছেন -

“হাফ আখ্ড়াই, ফুল আখ্ড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝাকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা, বাগ্দী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্লো। এই সময় হাফ আখ্ড়াই ও ফুল আখ্ড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষেরা হাফ আখড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগ্লেন।” [৩]

এই আমোদের চিত্রে নাগরিক রুচিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘জলসাঘর’ গল্পে মহিম গাঙ্গুলির মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তারা ‘চন্ডীমঙ্গলে’র ধনপতির পায়রা উড়াবার মতো অবসর যাপনের উপায়কে নিয়ে এলেন উনিশ শতকের পুঁজির দাম্ভিকতায়। বুলবুলির লড়াইয়ে দুহাতে উড়িয়েছেন টাকা। সর্বত্র নগর কলকাতা জুড়ে চলেছে এই মধ্যযুগের রাজমহলের পরিবেশকে ফিরিয়ে আনার খেলা। তাই দেখি ভারতচন্দ্রের পর কবি-আখ্ড়াই-তরজা গান প্রভৃতি সাহিত্য সংস্কৃতির স্বরূপগুলি আশ্রয় নিয়েছে এই দালাল-মুৎসুদ্দি-দেওয়ানদের বৈঠক খানায়। নটীর নূপুরে ও মদের পেয়ালায় তারা ডুবিয়ে দিলেন তাদের বৈভবময় জীবনকে। গ্রামের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে শহরের অট্টালিকায় আসা এই বাবুরা বুলবুলি, কবির লড়াই, হাফ আখ্ড়াইয়ের দল, শখের যাত্রাপাটি ও মদমেয়ে মানুষের জন্য অনর্গল অর্থব্যয় করতে লাগলেন। খ্যামটা নাচ আর ঝুমুর গানের নেশাশক্তিতে বেসামাল হয়ে রইল নতুন নগরের নাগরিক কালচার। এই ধনাঢ্য লোকেদের কেবল ধন-ঐশর্যই ছিল, ছিল না কোন শিক্ষা দীক্ষা, সুনীতি ও সৎ আদর্শের কোনো বালাই। সেই কারণে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের গতি তখন চালিত হচ্ছিল নিম্ন ও বিকৃত পথেই। সমাজের অগ্রগতিতে এদের পরবর্তী প্রজন্মও বিনা ক্লেশে অপরিমিত ধনসম্পদ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রশয় পেয়ে বিলাস ব্যসনকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য করে সমাজের বুকে ‘বাবু’ আখ্যা লাভ করে বসল। কালীপ্রসন্ন তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’য় প্যাঁচার তীক্ষ্ণ চক্ষু ও শাণিত চঞ্চু দিয়ে সমাজদেহের এই নীতিহীন ও গ্লানিকর ব্যাধিকে আঘাত করেছেন রঙ্গকৌতুকে। তিনি দেখিয়েছেন এইসব বাবুদের খোসামুদে, মোসাহেব, ইয়ার, দালাল শ্রেণির লোকেরা কীভাবে নীচ পরামর্শ ও কলুষিত আচরণের দ্বারা সমাজের মধ্যে অন্যায় ও পাপের গতিকে করে তুলেছিল অবারিত। রমেনকুমার সর তাঁর ‘ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা-সংগ্রহ’ গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এই প্রসঙ্গে লিখছেন - “ইংরেজ রাজত্বের সূচনাকালে যেকোনোভাবে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন একদল মানুষ। প্রচুর টাকা থাকলেও সমাজে তেমন মান্যতা পেতেন না তাঁরা। লোকসমাজে পরিচিত হবার জন্য তাই তাঁরা বাবা-মার শ্রাদ্ধ, ছেলে-মেয়ের বিয়ে, কাঙালি ভোজন, বুলবুলির লড়াই-এ জলের মতো টাকা খরচ করতেন। বিদ্যের দৌড় বেশিদূর না হলেও, লোকের সম্ভ্রম আদায়ের জন্য নানা ভাষার বই কিনে আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেন। কিন্তু ভুলেও কোনওদিন কোনও বই খুলে দেখতেন না। ... ভোগেই জীবনের সার্থকতা -অল্প বয়স থেকেই এই বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠতেন তাঁরা। সমাজের চারপাশে এই নববাবুদের ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন ভবানীচরণ।” [৪]

স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন সমাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়ে শিথিল। বিলাস ব্যসনের বৈভবের তলায় ঢাকা পড়ে জ্ঞানের নির্মল আলোকে বুদ্ধির পরিশীলিত দীপ্ত ও মুক্ত চিন্তা তখনও ভেদ করতে পারেনি উনিশ শতকের সমাজকে।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ জীবনে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল পরস্পর বিপরীত দুটি স্রোতধারা। একদিকে বেশ্যাবিলাস, মদ্যাশক্তি, বাল্যবিবাহ, নারীর বৈধব্য যাতনা, বাবু কালচারের পুরোনো প্রথা সংস্কার; অন্যদিকে তার সাথেই যুক্ত হয়েছিলো নতুন স্রোতধারা। পাশ্চাত্য চেতনার আলোকে ঘুমন্ত ভারতবাসী জেগে উঠেছিল নতুন প্রভাতে। সমাজের বুকে এই নতুন চিন্তার ঢেউ এই উঠতি বাবুরা আনেননি, আনতে চানও নি। তা চাইলেন অন্য একদল। এই অন্যদল নটীর নূপুরে বা মদের পেয়ালায় ডুব দিলেন না, চোখ খুলে সামনের দিকে তাকালেন। স্বপ্ন দেখলেন এক নতুন সমাজের। এঁরা আলালের ঘরে দুলাল নন, এঁরা মধ্যবিত্ত। সকালের ঘুম ভাঙা চোখে এই মধ্যবিত্তরাই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করে জন্ম দিলেন এক নব্যশিক্ষিত যুব সমাজের। তাদের কাছে ইংরেজ আগমন হয়ে উঠল আশীর্বাদ স্বরূপ। নবাবী আমলের ক্ষীণকার অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান, প্রধানত চাকুরিজীবি এই মধ্যবিত্তশ্রেণি উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন আপন স্বাতন্ত্র্য ও মহিমায়। আধুনিক সমাজ ইতিহাসে মধ্যবিত্তের যে একটি বিশেষ স্থান আছে সেই ভূমিকা তাঁরা পালন করে চলেছিলেন নিরন্তর। সেটি হল সমাজ ইতিহাসের পালাবদলের। বিদ্যাই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান হাতিয়ার। এই বিদ্যা যে শুধুমাত্র নব অর্জিত পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা-ই নয় ; কালপ্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যাও নতুন করে শ্রদ্ধামিশ্রিত হয়ে স্থান পেল সমাজে। এই বিদ্যা ও চরিত্রশক্তির জোড়ে একদিকে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' রূপে সমাজে সম্মানিত হলেন, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্টিও সমাজের বুকে নিজেদের আসন করে নিলেন। কিছু কিছু বাঙালির মনে ধীরে ধীরে আস্তে লাগল নবচেতনা ও নবজিজ্ঞাসার সূত্র। এতদিন ধরে সমাজকে কড়া শিকলে বেঁধে রাখার জন্য প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা, দাসপ্রথার মতো হাজারো প্রতিবন্ধকতাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠল একের পর এক। নবজিজ্ঞাসা যাঁদের মনে জন্ম নিল, তাঁরা তাকে কিছুটা ছড়িয়ে দিতে চাইলেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সমাজে যুক্তিবাদের আলো প্রবেশ করলেও সংস্কারের ক্ষেত্রে যুক্তিই একমাত্র হাতিয়ার হয়ে উঠল না। যুক্তি জন্ম দিল সংশয়ের, তা থেকে এল জিজ্ঞাসা। এই প্রথম প্রবাহমান সমাজ নড়ে উঠল। এক্ষেত্রে সমাজের মধ্যে দেখা দিল দুটি রেখাপাতের বিভাজন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা সমাজ জীবনে প্রবেশ করার ফলে প্রাচীন ও নবীন আদর্শের যে ঘোরতর সংঘাত বেঁধে ছিল তাতে তৎকালীন জনহিতৈষী সমাজ নায়কদের মধ্যে কেউ কেউ ধারণ করলেন নবীন আদর্শের জয়ধ্বজা, আবার কেউ বা আঁকড়ে রাখলেন প্রাচীন আদর্শের সনাতন দণ্ডটিকেই। এক্ষেত্রে প্রথম দলে নাম লেখালেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো ব্যক্তিরা। অন্যদিকে দ্বিতীয় দলের পাল্লা ভারি করলেন রাধাকান্ত দেব ও ভাবানীচরণের মতো ব্যক্তিত্বরা। এর পাশাপাশি জন্ম নিল তৃতীয় একদল। যাঁরা চিহ্নিত হলেন উগ্রপন্থী সংস্কারকরূপে। তাঁরা কিছুটা যুক্তিবাদী, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আচার-আচরণে দীক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, নবীনবয়স্ক এইসব সংস্কারকরা আমূল পরিবর্তন চাইলেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার। তারাই ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের ছেলের দল। এঁরা যে শুধুমাত্র সামাজিক বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করলেন তাই-ই নয় ; বরং সামাজিক স্রোতকেও চালিত করতে চাইলেন উল্টো পথে। সেক্ষেত্রে তাঁরা অনেকেই সম্পূর্ণ বর্জন করতে প্রয়াসী হলেন নিজেদের সাংস্কৃতিক ধারণাকেও। আর এসবের সাক্ষী হয়ে রইল বাংলার অগণিত দরিদ্র মূক জনসাধারণ; যারা পল্লীবাসী, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত বা সর্বহারা, কিংবা বঞ্চিত বাংলার উনিশ শতকের শহুরে নবজিজ্ঞাসার আলোক থেকে। এই প্রসঙ্গে স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬)' গ্রন্থে বলেছেন - " এই আলোড়নের সূত্র ধরেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালীসমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ল। রক্ষণশীল যাঁরা, তাঁরা সবক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক স্থিতিতে বিশ্বাসী, এবং এই স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে প্রবৃত্ত। দ্বিতীয় একদল মধ্যপন্থী (সমাজে এঁদের পরিচয় 'হাফ লিবারাল', 'হাফ রিফরমর' ইত্যাদি নামে) প্রাচীন আচার রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে কিছুটা সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। দু'কুলই তারা বজায় রাখতে চেয়েছেন।" [৫]

সমাজে উদ্ভূত এই রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী বা উগ্রপন্থীর দল - সবাই নিজেদের মতো করে শুরু করলেন শাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা দিতে। সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ, কৌলিন্য প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে শাস্ত্র থেকে শুরু হল প্রমাণ খোঁজার লড়াই। সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যাদেরকে আশ্রয় করে সমাজকে পাল্টা প্রশ্ন করার হাতিয়ার করা হয়েছিল, সেই সাধারণ মানুষদের সাথেই বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না শাস্ত্রগ্রন্থের। প্রচলিত দেশাচার -ই তাদের কাছে মান্যতা পেত এক এবং একমাত্র সত্য শাস্ত্র বিধান বলে। এই কারণেই রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে এগিয়েও মুখাপেক্ষী হতে হয় প্রচুর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার। অবশ্য রামমোহন বা বিদ্যাসাগর শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলেও দুজনেই তাদের শেষ আবেদন রেখেছিলেন মানবিকতার কাছে। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন জাগে মনে সত্যিই কি শাস্ত্রের নিয়মনীতি বুঝিয়ে বা আইন করে সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার ? সমাজমন কি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েছিল এই পরিবর্তনের ডাককে ? হয়তো না। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই দেখা যায়, উনিশ শতকের যে অমানবিক প্রথাগুলি সমাজের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল সেই প্রথাগুলিকে নিষিদ্ধ করতে আদালতে পেশ করা যুক্তি-তর্কের লম্বা তালিকাকে মেনে নিয়েছিল জনমন। কিন্তু যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নটি মানবিকতার চেয়ে বেশি সংস্কারগত হয়ে ওঠে সেখানে আইন করেও সংস্কারকরা সক্ষম হননি ব্যাপক কোন পরিবর্তন আনার। কারণ, সমাজমন তাকে স্বীকার করে নেয়নি। বিধবা বিবাহের আইনের ব্যর্থতাই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। এক্ষেত্রে আমরা একটু গভীর ভাবে নজর দিলেই দেখা যায় এসময়ে বাঙালি নারী যেন 'ক্যাপটিভ লেডি' আর তার উদ্ধারেই যেন সংস্কারকরা কৃতসংকল্প। বিস্ময়ের কথা, এই সময় সংস্কারকরা যেন কেবল উৎপীড়িত নারীর দুঃখ মোচনেই অগ্রসর, সর্বসান্ত জনগনের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁরা রইলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকলেও নবচেতনার জাঁকজমক-এর আলো থেকে তারা রয়ে গেলেন অবহেলিত, উপেক্ষিত। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি উনিশ শতকের এই নবোদিত সমাজ এতদিনের বাবু কালচারে ডুবে যাওয়া সময় ও পরিস্থিতিকে করে তুলল কিছুটা চঞ্চল ও আলোড়িত। অচলায়তন আবার ভাঙতে শুরু করল। এই প্রসঙ্গে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন – " বলিতে কি, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ (খৃষ্টাব্দ) প্রর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইন্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশচন্দ্রের আবির্ভাব, সোম প্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্ম সমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।" [৬]

রাজধানী কলকাতার যখন এই অবস্থা, তখন কলকাতার বাইরে সুবিস্তৃত পল্লীঅঞ্চল জুড়ে চলছিল বৃহৎ বাংলাদেশে সমাজপতিদের অনিয়ন্ত্রিত শাসন। তারা সমাজের কাছে নিজেদের আভিজাত্যকে বজায় রাখতে ও অস্তিত্বের প্রশ্নে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ করতে ধর্মরক্ষার নামান্তরে প্রবর্তন করেছিলেন নিয়ম, বিধি-নিষেধের বজ্রআঁটুনি। তার ফলশ্রুতিতেই দেখি কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের বন্যাস্রোত বয়ে গেছে সমাজের বুকে। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, ১৭৬৪ শকের ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা 'বিদ্যদর্শন' পত্রিকায় একজন পল্লীবাসী পত্রলেখক এ বিষয়ে যা জানিয়েছেন সেটি হল এইরূপ –"কুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধ করি বঙ্গদেশের ব্যক্তিমাত্রই বিদিত আছে।যে অবদি এই ঘৃণিত কার্যের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষ্কর্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্ব্বদাই নগরমধ্যে বসতি করেন, পল্লীগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না, গ্রাম্যসমাজে যাঁহার কুলীন রূপে পূজা হইয়াছেন, তাহাদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয় তাঁহারাই বল্লাল সেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" [৭]

দেশের যখন এই পরিস্থিতি তখন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন প্রমুখের সহযোগিতায় আপ্রাণ চেষ্টা চলছিল বিধবাবিবাহের প্রবর্তনের। তাঁদের এই মানবতাবাদী প্রচেষ্টায় ক'জন বিধবার বিবাহ হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়, এর ফলে সমাজের বুকে যে নারীর মূল্য প্রতিষ্ঠার লড়াই চলেছিল সেটিই আলোচ্য বিষয়। ইতিপূর্বে রামমোহন যার সতীদাহ প্রথা বন্ধ করবার মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, সেটিই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্নের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবর্তন, কৌলিন্যপ্রথা রহিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সেই ধারাকে অবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রেখে ধীরে ধীরে নারীর সামাজিক বন্ধন মুক্তির ও নারীমুক্তির আন্দোলনের পথকে করে তুলেছিলেন সুগম। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয় ধর্মের দলাদলির প্রশ্নে ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মজীবন ও ধর্মবিশ্বাস চিরকাল অধরা থেকে গেলেও কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতমের ছদ্মনামে সমাজে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধর্মীয় দল-উপদলের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন নির্দ্বিধায়। আসলে তাঁরা এই ধর্মআন্দোলনের পথ থেকে সামাজিক ও সংস্কৃতিক আন্দোলনের দিকেই ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সমাজের গতিকে। কালীপ্রসন্ন সিংহ রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে বা কখন কখন কলমের ধারে উগ্র পদ্ধতির বিরুদ্ধে আঘাত হানবার চেষ্টা করলেও তার পাশাপাশি 'জ্ঞানান্বেষন' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরের' পাতায় পাতায় সমাজের নানান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করে গেছেন সমানতালে। এইভাবেই আমরা তাঁদের তৈরি করা পথের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে পদার্পণ করলাম আধুনিক যুগের রাজপথে। সবকিছুর উপরেও আলোচনার সাপেক্ষে এ কথা সত্য যে, আমাদের জাতীয় জীবনে নবজাগরণের মহিমা ও পাশ্চাত্যের অনুকরণের ধারা সঞ্চিত হয়েছে একই সঙ্গে। তার কারণও বোধহয় এই যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর বা কালীপ্রসন্নের মতো সমাজ প্রবর্তকেরা নবজাগরণের এই আলোকধারা যতটা নিজেরা পান করতে পেরেছেন ততটা হয়তো দান করতে পারেননি। এবং যতটা দান করেছেন ততটা হয়তো সংস্কৃতিবান উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি পেরিয়ে আপামর জনসাধারণের কাছে গনমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। এইখানেই কোথাও যেন রয়ে যায় উনিশ শতকের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা। সমাজ প্রবর্তকদের এই নবজাগরণ পরিণত হতে পারেনি গণজাগরণে। উনিশ শতকে হয়নি, আজও হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই গণজাগরণ আজও দিন গুনে চলেছে ভবিষ্যতের জঠরে। তবু তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় তৈরি হওয়া এই গণজাগরণ উজ্জীবিত করে চলবে আগামীকে, আগামী সময় ও প্রজন্মকে।

তথ্যসূত্র :

১. বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, পৃষ্ঠা - ৫

২. রমেনকুমার সর (সম্পাদিত), ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় রচনা - সংগ্রহ, পৃষ্ঠা – ১৭২

৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নকশা, সমাজ কুচিত্র পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), পৃষ্ঠা – ১৭

৪. রমেনকুমার সর (সম্পাদিত), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা - সংগ্রহ, পৃষ্ঠা - ২০

৫. স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), পৃষ্ঠা - ১১৭

৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা - ৬২

৭. স্বপন বসু, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা – ১২০

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ, বিনয়, বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯

২. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (১৮২৬-১৮৫৬), পুস্তক বিপণি , কলকাতা, ২০০৯

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.), হুতোম প্যাঁচার নকশা, সমাজ কুচিত্র , পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪২১

৪. বসু, স্বপন, চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ২০০৩

৫. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১৯

৬. মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১

৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৭

৮. সর, রমেনকুমার (সম্পা.), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা- সংগ্রহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২০১৩

৯. সুর, অতুল, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৫৭

১০. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ১৩৯৮

....

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

শচীন দাশের ‘লাশ ভাইস্যা যায়’: ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে কলকাতা ও নোয়াখালির সমাজচিত্র

মেহেবুব আলম

সারসংক্ষেপ-

দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়ে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের শেষ আঘাতটি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা প্রথম কলকাতা থেকে শুরু করে একের পর এক নোয়াখালিতে, পরে বিহারে এবং আরও পরে পাঞ্জাবে সংঘটিত হয়ে গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে শচীন দাশের একটি বিখ্যাত উপন্যাস হল *লাশ ভাইস্যা যায়* । এই উপন্যাসে প্রথমে তিনি কলকাতার গ্রেট ক্যালকাটার দাঙ্গা ও নোয়াখালির দাঙ্গার চিত্র অঙ্কন করেছেন। যদিও তিনি এই সমস্ত দাঙ্গাগুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী নন, তবে দাঙ্গায় আক্রান্তের উত্তর প্রজন্ম। আখ্যানে গোরার পরিবারকে সামনে রেখেই তিনি দুটি দাঙ্গার (কলকাতা ও নোয়াখালি) চিত্রকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। গোরার চোখ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন— মুসলিম লিগের নেতাদের ষড়যন্ত্র, হিন্দুদের বিরুদ্ধে গোপনে সংগঠন-উস্কানি ও ভীতি প্রদর্শন, বেছে বেছে শুধু হিন্দু বাড়িতে আক্রমণ, হিন্দু নারীদের ধর্ষণ, হত্যা-লুঠ ইত্যাদির মাধ্যমে দাঙ্গার যে ভয়াবহতাকে কিংবা নেতিবাচক দিকগুলি আখ্যানে তুলে এনেছেন, এক কথায় তা সামাজিক দলিলে রূপান্তরিত হয়েছে।

সূচক শব্দ—

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির দাঙ্গা, আনসার বাহিনী, মুসলিম লিগ, রাজাকার বাহিনী, ধর্ষণ, ধর্মান্তর, দেশ ত্যাগ।

মূল প্রবন্ধ-

শচীন দাশ (১৯৫০-২০১৬) সত্তরের দশকে লেখনী জগতে প্রবেশ করেছেন ছোটগল্পের হাত ধরেই। তবে তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিত। তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নদী ও বাদাভূমির তীরবর্তী অঞ্চলের জনজীবন ও তাদের জীবনসংগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর জীবনকে যদি দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে জল ও সেচ দপ্তরে কর্মরত ছিলেন, সেই কর্মের অভিজ্ঞতা স্বরূপ নদ-নদী, সুন্দরবন ও বাদাভূমি তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল, ফলে তাঁর সাহিত্যে তা চিরন্তন স্থান করে নিয়েছে। *অন্ধ নদীর উপাখ্যান* (২০০৪), *নদী তরঙ্গের আয়না* (২০০৯), *নুন দরিয়া* (২০১১), *জল জঙ্গলের রয়ানি* (২০১৩) ইত্যাদি উপন্যাসগুলি তারই যথার্থ উদাহরণ। ঠিক তেমনি তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে রয়েছে ছেলল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় স্বজন হারানোর দুঃখ, দেশহীনতা কিংবা দেশ হারার যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু জীবনের অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা, উত্থান-পতন ইত্যাদি বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। *উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ* (২০০৮), *বর্ডার* (২০১০), *লাশ ভাইস্যা যায়* (২০১৪), *এক পয়সার ট্রাম* (২০১৬) ইত্যাদি উপন্যাসগুলি তাঁরই উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। শচীন দাশের জীবনের এই দুই পর্বেরই ছাপ রয়েছে তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পগুলিতে। কিন্তু তাঁর এই দুই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে আমি আমার আলোচনা শুধুমাত্র ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস *লাশ ভাইস্যা যায়* –এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

আমরা জানি দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রভাব শচীন দাশের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে পড়েনি। কেননা তিনি জন্মেছিলেন দেশভাগের কয়েক বছর পর। অবশ্য তাঁর পিতৃপুরুষেরা সরাসরি দাঙ্গার শিকার হন এবং ফলশ্রুতিতে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হন। এপারে পৌঁছে উদ্বাস্তু কলোনিতে ভূমিষ্ঠ হন শচীন দাশ। জন্ম-শৈশব-কৈশোরের শিক্ষা ও বেড়ে ওঠা সমস্ত কিছুই সেই উদ্বাস্তু কলোনিকে ঘিরেই। এই কলোনি নির্ভর জীবনযাপন একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকেও পুষ্ট করেছে। নিজে দাঙ্গায় আক্রান্ত না হয়েও পিতৃপুরুষের দাঙ্গার সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা হয়ে উঠেছে শিল্পগুণ সম্পন্ন। যে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না অথবা যে স্মৃতিকথা তিনি পিতৃপুরুষের মুখে শুনেছেন ও জেনেছেন, সেই অচেনা-অদেখা স্মৃতি উত্তর প্রজন্মের কাছে কীভাবে ধরা পড়েছে, তা আমরা *লাশ ভাইস্যা যায়* উপন্যাসের নিরিখে দেখার চেষ্টা করব। তার পাশাপাশি আমরা আলোচ্য পত্রে চল্লিশের দশকের ধর্মীয়-রাজনৈতিক ইতিহাস ও সমাজবাস্তবতার নিরিখে অন্বেষণের চেষ্টা করব দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র উপন্যাসে কতটা জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

দুই

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ করা গেলেও ১৯৪৭-এর বাংলা ভাগকে রোধ করা যায় নি। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। তার পূর্বে ১৯৪৬ সালে বাংলার বুকে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সংঘটিত হবার ফলে গোটা দেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক তলানীতে ঠেকেছে। কলকাতার এই দাঙ্গা সংঘটিত হবার পেছনে অনেকেই তৎকালীন বাংলা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীকে দোষী মেনেছেন। কেননা মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করে। সংগ্রামের দিন হিসেবে ১৬ আগস্ট দিনটিকে নির্দিষ্ট করা হয়। আবার ওই দিন সুরাবর্দী সরকারি ছুটি ঘোষণা করলে কলকাতার সাধারণ মানুষ এক ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা করতে শুরু করে। সেদিন মুসলিম লিগের সম্পদকীয় আহ্বানে ঘোষণা করা হয়েছে—

"মনে রেখো, শুক্রবার ১৬ অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে হবে, মুসলমানরা পাকিস্তান দাবিতে অংগীকারবদ্ধ।"[১]—অবশ্য এই দিনটি শান্তিপূর্ণ রাখার আহ্বানও জানানো হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে কলকাতার বুকে চলে বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা ইতিহাসের পাতায় 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে কুখ্যাত। এই প্রাণঘাতী সংঘর্ষ চলেছিল ১৬-১৯ আগস্ট পর্যন্ত। ২৮ আগস্ট এক সরকারি নোটে বলা হয়েছে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৪০০ জন, আহতের সংখ্যা ছিল ১৬০০০ জন, গৃহচ্যুতের সংখ্যা ছিল ১০০০০ জন।[২] এই ঘটনার ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই কলকাতার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গে। নোয়াখালির দাঙ্গা ঘটার পশ্চাতে গোলাম সারওয়ারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেখানে দাঙ্গা শুরু হয় ১০ অক্টোবর। অবশ্য তার পূর্বেই এই দাঙ্গার ছক তৈরি করা হয়েছিল। লিগের তাতে প্রত্যক্ষ মদত ছিল। এখানে দাঙ্গা চলে দীর্ঘ সাতদিন ধরে। বিশেষভাবে আক্রান্ত এলাকাগুলি ছিল রামগঞ্জ, লখিমপুর, বেগমগঞ্জ, লামচর, নবগ্রাম এবং শ্রীরামপুর। ২৪ অক্টোবরের সংবাদপত্র থেকে জানা যায় গৃহচ্যুত মানুষের সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়ে গেছে।[৩] দুটি দাঙ্গার পেছনেই যে দুজনের নাম উঠে আসে, তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা দলগত স্বার্থ চরিতার্থে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, যা উভয়ের অত্যন্ত নিম্ন ও হীন মানসিকতার পরিচায়ক।

কলকাতা ও নোয়াখালি এই দুটি স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে শচীন দাশের রচিত উপন্যাস *লাশ ভাইস্যা যায়*। উপন্যাসটি কৃতি প্রকাশনী থেকে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি, ২০১৪ সালে। উপন্যাসটিকে তিনি অগ্রজ কথাকার প্রফুল্ল রায়কে উৎসর্গ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দাঙ্গা থেকে দেশভাগের মধ্যবর্তী সময়ের একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনশীল ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আখ্যানের প্রধান চরিত্র গৌরাঙ্গ। তবে তার পরিবারের ও পরিচিত সকলেই তাকে ডাকে গোরা বলে। গোরাদের যৌথ পরিবার। এই পরিবারের প্রধান কর্তা গোরার জেঠা শিবনাথ, তবে বাড়ির অন্দর মহলে গোরার জেঠিমা তরুলতার

নির্দেশই শেষ কথা। পরিবারের সকলে এই দুজনকে যথেষ্ট সমীহ করে। এই পরিবারের সকলে চায় গোরা চাকরি করুক কিন্তু গোরা তা চায় না। সে আরও পড়তে চায়—লক্ষ্য গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন। তার এই স্বপ্ন দেখাকে সমর্থন করেছিল তার ফুলকাকিমা মাধবীলতা ও আকিমুন। আকিমুন হল গোরার বাল্যকালের বন্ধু আইনুলের বোন। এই আকিমুনের সঙ্গে গোরার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আইনুল ও গোরার ভ্রাতৃসুলভ যে সম্পর্ক সে সম্পর্কের মাধ্যমে আখ্যানকার তৎকালীন সময়ে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয় মিলশ্রমিকদের ধর্মঘট চলাকালীন মালিকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডার গুলিতে আহত শওকতকে প্রাণে বাঁচিয়ে তুলেছিল এই গৌরাঙ্গ। সম্প্রীতির এই চিত্রগুলি পূর্ববঙ্গে চল্লিশের দশকের শেষের দিকে ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে থাকে। এই সম্প্রীতি বিনষ্টের অন্যতম কারিগর হল মুসলিম লিগের নেতাগণ। গৌরাঙ্গের সঙ্গে আইনুলের অবাধ মেলামেশার কারণে একদা লিগের একদলকর্মী আইনুলকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করে—

"হিন্দু পোলাগো লগে তর এত মেলামেশা কীয়ের রে...কী হেইয়্যা বুঝবি খন। কয়ডা দিন সবুর কর...পাকিস্তানডা হউক আগে।"[৪]

লিগের নেতাদের এমন বাক্য হিন্দুদের প্রতি চাপা ক্ষোভকে উসকে দেয়। পাঠকমাত্রই বুঝতে পারেন যে, খুব দ্রুত একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। আর ইতিমধ্যেই কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। আবার সেদিনেই সুরাবর্দী সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। আখ্যানে দেখা যায় ঐদিন মুসলিম লিগ মিছিল বের করে, সকলের মুখে থাকে একই স্লোগান, 'মুসলিম লিগ জিন্দাবাদ, কায়েদ-এ আজম জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। এই ঘটনার বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় মণিকুন্তলা সেনের একটি বক্তব্যে—

"কলকাতায় '৪৬-এর ১৬ অগস্ট সুরাবর্দি সরকার ছুটি ঘোষণা করল এবং মুসলিম লীগ একটা মিছিলে যোগ দিতে আহ্বান জানাল মুসলিম জনতাকে। এই মিছিল থেকে কিছু একটা অঘটন ঘটবে এটা সবাই অনুমান করেছিল। সুতরাং হিন্দুরাও বিভিন্ন পাড়ায় তৈরি হল।...মিছিলটা ধর্মতলায় এলে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ছোরাছুরিতে হতাহত বেশ কিছু লোক। তারপর চলে দোকানে লুঠপাট। মিছিল যত এগোয় মারামারি ও লুঠপাট ততই চলতে থাকে।...'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে হৃদকম্প উপস্থিত হল কলকাতার নিরীহ নাগরিকদের মনে।"[৫]

মণিকুন্তলা সেনের বক্তব্যের সঙ্গে আখ্যানের কাহিনির একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আখ্যানে দেখা যায় মুসলিমদের হিংসাত্মক আক্রমণের জবাব দিতে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দুরাও ছিলেন প্রস্তুত। সেই প্রসঙ্গটিও আখ্যানে পাওয়া গেছে—

"পাড়ার ব্যায়াম সমিতি আর ক্লাবে প্রচুর পরিমাণে লাঠি আর মুগুর জোগাড় করে রেখেছি। তা ছাড়া এর ওর বাড়ির ছাদে ইটও তুলতে শুরু করেছি কাল থেকে।...আসুক না একবার।"[৬]

মুসলিমদের আক্রমণের প্রতিশোধে পরদিন হিন্দুরাও পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে অনেক মুসলিম বস্তিতে অগ্নিসংযোগ করে। উভয় সম্প্রদায়ের এহেন হিংসা-ক্ষোভ চরিচার্থ করতে রক্তের যে হোলিখেলা শুরু হয়, তাতে অসংখ্য সাধারণ নিরপরাধ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দাঙ্গার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি নিরঞ্জনের অফিসের ড্রাইভার অসাম্প্রদায়িক, সৎ ও নির্লোভ শামিমও। সে মুসলিম হলেও একটি হিন্দু মেয়েকে কয়েকটি মুসলিম যুবকের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দাঙ্গার ভয়ঙ্কর পটভূমিতেও আরও একবার আখ্যানকারের সম্প্রীতির ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। দাঙ্গার সেই উত্তাল সময়ে সকলে যখন স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়েছে, ঠিক তখন কিছু অসাম্প্রদায়িক মানুষ কোনও পক্ষেই যোগ না দিয়ে নিজেদের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শামিম নামক চরিত্রটি হল তারই প্রতীক। আখ্যানকারের এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আখ্যানে দাঙ্গার সময়ের অমানবিক যাবতীয় ঘটনাবলীর মধ্যে একখণ্ড মানবিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

কলকাতার বুকে সংঘটিত দাঙ্গায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদেরই তুলনামূলক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। দাঙ্গার সেই ভয়াবহ প্রভাব কিছুদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সুদূর পূর্ববঙ্গেও। এখানে প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় মুসলিম লিগের কর্মীরা মিছিল বের করে, সভা-সমিতি করে পূর্ববঙ্গের স্থানীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, সারা পূর্ববঙ্গ জুড়েই লিগের ছাত্র-সংগঠনের কাজকর্মও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতা দাঙ্গার একটা প্রতিশোধ নিতে তারা যেন প্রস্তুত। তাই কলকাতা দাঙ্গার খবরকে অতিরঞ্জিত করে লিগের নেতারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে বেড়ায়। আখ্যানে দেখা যায় গোরার মামাতো বোনের বিবাহ উপলক্ষ্যে গোরার পরিবারের প্রায় সকলে উপস্থিত হয় চাঁদপুরে। সেখান থেকে গৌরাঙ্গ (গোরা)-রা পাত্রের বাড়ি সন্দীপে যায়। ইতিমধ্যে সেখানকার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভের রূপ ধারণ করে। নোয়াখালিতে মুসলিম লিগের এম.এল.এ গোলাম সারওয়ার প্রচার চালান, “কলকাতায় হাজারে হাজারে মুসলমান ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। তিনদিন ধরে চলে এই হত্যাকাণ্ড। কাজেই তার বদলা না নিলে আল্লাও বুঝি শান্তি পাবে না।”[৭]

গ্রামের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে একটি বিশ্বাস বিদ্যমান যে, ‘সারা বিশ্বের মুসলিম মাত্রই মুসলিদের ভাই’— আর সেই ইমোশনকে কাজে লাগিয়ে গোলাম সারওয়ার সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কলকাতা দাঙ্গার পটভূমি টেনে এনে একটা ক্ষোভের সঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। এতে তিনি সফলও হয়েছেন ঠিকই, তবে ইতিহাস তাকে কখনও ক্ষমা করেনি। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, নোয়াখালির আশি শতাংশ দরিদ্র বর্গাকার, প্রান্তিক চাষিরা শুধুমাত্র জমিদারের ওপর অসন্তুষ্টের কারণেই হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালায়নি। বরং তাদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী লিগের নেতাদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থও ছিল এই দাঙ্গার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যাইহোক কলকাতার দাঙ্গায় যেমন মুসলমানদের অধিক ক্ষতি হয়েছিল, তেমনি নোয়াখালিতে লিগের নেতারা সাধারণ মুসলমানদের দিয়ে হিন্দুদের চরম ক্ষতি সাধন করে এর একটা প্রতিশোধ নিতে সফল হয়েছিল। আবার হিন্দুরা এর পাল্টা প্রতিশোধ নিয়েছিল বিহারের দাঙ্গাতে। বিহারের পরে পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশেও একের পর দাঙ্গার আগুনে একদা জ্বলে উঠেছিল গোটা দেশ। যেভাবে একটি প্রদেশের দাঙ্গা আর একটি প্রদেশের মানুষকে উৎসাহিত করেছে, যেভাবে মধ্যযুগের বর্বরতা বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যে লক্ষ করা গেছে, তা থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, এতদঞ্চলের মানুষ যেন তাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পরিণত হয়েছে মানুষ খেকো হিংস্র পশুতে। এই প্রসঙ্গে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কলকাতার জীবনে দাঙ্গা’ প্রবন্ধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছে—

“একটি দাঙ্গা আর-একটি দাঙ্গার পটভূমি রচনা করে যায় ; বিগত দাঙ্গার ইতিহাস পরবর্তী দাঙ্গার প্রেরণা হয়।”[৮]

তিন

দাঙ্গা চিরকাল নারীকে অপমানিত, অসম্মানিত ও কলুষিত করেছে। কেবল লালসার বশে নয়, শত্রুকে অপমান করতে, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভেঙে ফেলতেও নরপিচাশরা হানাদেয় নারীর ওপর। এই প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন— “হিন্দুস্তান-পাকিস্তান-এর সমগ্র সংঘাত-পর্বটি পুরুষের সৃষ্টি। তারই ধারাবাহিকতায় ভারত ভেঙে ভাগ করা এবং বাস্তুত্যাগের এই সমস্যা সৃষ্টি করা—এসবই পুরুষের কীর্তি। নারী এর কোনোটিই ঘটায়নি। কিন্তু নারীকেই গ্রহণ করতে হয়েছে এই বিদ্বেষ-মন্থনের তীব্র গরলের সম্পূর্ণ পাত্রটি। দুই সম্প্রদায়ের নারী নিত্য অপমানিত হয়েছে এবং ধর্ষিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে।”[৯]

আখ্যানে লক্ষ করা যায়, নোয়াখালি দাঙ্গার ক্ষেত্রেও আখ্যানকার নারীর সম্মানহানীর দিকটিকে গভীর মর্মস্পর্শীর সঙ্গে তুলে ধরেছেন। গোরার মামাতো বোনের হবু শ্বশুরবাড়িতে একদল মুসলিম দুষ্কৃতি ঢুকে পড়ে এবং তারা বাড়ির স্ত্রীদের ধর্ষণ করে, আর বাড়ির মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়। একইরকম চিত্র দেখা যায় সেগ্রামেরই পরমেশ্বরের বাড়িতেও। পরমেশ্বরের স্ত্রীকেও ধর্ষণ করে সেই একই দুষ্কৃতিরা। তার মেয়ে দুটিও সেই উন্মত্ত ধর্ষকদের লালসার

শিকার হয়েছে। আবার অন্যদিকে ধর্ষকদের কবল থেকে রক্ষা পায়নি গোরার ছোটো কাকিমা মাধবীলতাও। তাকেও সারারাত ধরে গণধর্ষণ করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্ষিতা মাধবীলতাকে তার স্বামী দেবনাথ পুনরায় গ্রহণ করতে চায়নি। ফলে মৃত্যুই তার একমাত্র পথ অবশিষ্ট ছিল। মাধবীলতা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন সেময়ের ধর্ষিতা নারীদের করুণ পরিণতিকে, যাদের সমাজে ও সংসারে কোথাও গ্রহণ করা হয়নি। তাদের মুক্তির একটি মাত্র উপায় ছিল আত্মহত্যা। আখ্যানে মাধবীলতাকেও সেই পথ অবলম্বন করতে হয়েছে।

দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ বল্লভ নামক চরিত্রটি নিহত হয়। অন্যদিকে পরমেশ্বরকে কলমা পড়িয়ে, গো-মাংস খাইয়ে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। আবার গোরার জেঠামশাই শিবনাথকেও একদা লিগের মুসলিমরা হত্যা করে। এছাড়াও বিভিন্ন হিন্দু পাড়াগুলিতে আগুন লাগিয়েছে আনসার বাহিনীর লোকজন। আখ্যানে বিভিন্ন দিক থেকে মুসলিমদের যে পৈশাচিক অত্যাচারের বর্ণনা তুলে ধরেছেন আখ্যানকার, তা যেন মধ্যযুগের সমস্ত বর্বরতাকেও হার মানায়। নোয়াখালিতে হিন্দুদের ওপর এই অকথ্য অত্যাচারে স্বয়ং গান্ধিজীও সেখানে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নোয়াখালির এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণকাণ্ড, লুঠতরাজ ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তাই গান্ধিজীর উদ্দেশ্য ছিল শুধুই সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাই নয়, বরং তার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক ও সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজে পীড়িতদের নিয়োজিত করেছেন। তাঁর উদ্যোগে নেলী সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে 'নোয়াখালি রিলিফ কমিটি' গঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল দুর্গত নারীদের উদ্ধার, আশ্রয়, অপহৃত মেয়েদের অনুসন্ধান ও পুনর্বাসন দেওয়া। নোয়াখালিতে গান্ধিজীর আগমনের ফলে ইতিবাচক সাড়া পড়ে। তিনি ৯ ডিসেম্বর রামগঞ্জে পৌঁছান আর ১০ ডিসেম্বর থেকে ত্রাণ কাজ শুরু করে অল্প দিনেই ১৩০৭ জনকে উদ্ধার করেছিলেন। নোয়াখালিতে তাঁর ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউটের ১৭টি ক্যাম্প ছিল।[১০] এই ক্যাম্পের কথা আমরা আখ্যানেও পেয়েছি। রামগঞ্জ থানার সামনে তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করা হয়েছিল। যে ক্যাম্পে নৃপেন, অক্ষয় ও গৌরাঙ্গরা এসে উঠেছিল। এই দাঙ্গার রেশ কেটে গেলেও গ্রামের হিন্দুদের আশ্রয় নিরাপদ ছিল না, কেননা প্রতি মুহূর্তে তাদের বাসস্থান ত্যাগের ভীতি, প্রাণনাশের ভীতি, ইজ্জতহানির ভীতি প্রদর্শন করত আনসাহ বাহিনীর লোকজনেরা। আখ্যানে গোরার জেঠামশাই শিবনাথকেও একদা হত্যা করা হয়েছে রাতের অন্ধকারে, দাঙ্গা নিষ্পত্তির পরেও। অথচ শিবনাথ গ্রামে বিপুল পরিচিত ছিলেন, সকলের কাছে তিনি অত্যন্ত সৎ ও প্রিয় মানুষ ছিলেন। কিন্তু দাঙ্গার উত্তাল দিনে তার এই সমস্ত গুণাবলিগুলি তার প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। শিবনাথের মৃত্যু নোয়াখালির সমস্ত সাধারণ হিন্দুর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়, গোটা পূর্ববঙ্গের প্রতিটি হিন্দু পরিবারের পিতৃপুরুষের ভিটা তাদের কাছে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই বাস্তুত্যাগ তথা দেশত্যাগই একমাত্র তাদের প্রাণ রক্ষা করতে পারে।

লিগের নেতাদের প্ররোচনায় প্রায় গোটা পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা পা দিয়েছিল। আইনুলের মতো যুবকরাও পিছিয়ে ছিল না কোনও অংশে। লিগের লোকেদের সঙ্গে এখন তার ওঠাবসা। তাই গোরার সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটাই শিথিল হতে হতে অবশেষে সেই সম্পর্ক আর শেষ পর্যন্ত টেকে না। ব্রিটিশ সরকার দেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন জুন মাসে। আগস্টের মুসলিম লিগের চিরকাঙ্ক্ষিত নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয় বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে। গোরার বন্ধু আইনুল এখন মুসলিম লিগের সদস্যে পরিণত হয়েছে। এখন তার সর্বদাই 'আনসার বাহিনী' ও 'রাজাকার'-দের সঙ্গে ওঠাবসা। তাই গোরার সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন অনেকটাই শীথিল। আনসার বাহিনীও ধীরে ধীরে গোটা পূর্ববঙ্গে তার আধিপত্য বিস্তার করতে প্রস্তুত। র‍্যাডক্লিফের কলমের একটি খোঁচায় পূর্ববঙ্গের সমস্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরাই যেন অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। অতঃপর গোরার পিতা সোমনাথ তাদের সমস্ত ভিটেমাটি বিক্রি করে এ দেশ ছেড়ে চিরকালের জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটে গোরার পরিবারের দেশ-ত্যাগের মাধ্যমে। গোরার পরিবারের মতো এমন অগণিত পরিবার তৎকালীন সময়ে মান ও প্রাণ বাঁচাতে দেশান্তরী হয়েছিল রাতের অন্ধকারে।

আখ্যানকার কলকাতা ও নোয়াখালি এই দুই অঞ্চলের দাঙ্গাকে তাঁর আখ্যানবৃত্তে নিয়ে এলেও, ভয়াবহতার দিক থেকে যেমন নোয়াখালির দাঙ্গা কলকাতা দাঙ্গার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাঁর আখ্যানেও নোয়াখালির অধিক গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। আখ্যানের অধিকাংশ ঘটনাই ছিল পূর্ববঙ্গের। আর এই নোয়াখালি অঞ্চলে দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্কের ওঠা-নামা, হিন্দুদের গোমাংস খাইয়ে হত্যা, কলেমা পড়িয়ে ধর্মান্তর, হিন্দু নারীদের বলপূর্বক ধর্ষণ, লুঠ, গৃহে অগ্নিসংযোগ সমস্ত কিছুই তিনি দেখিয়েছেন গোরার দৃষ্টিতে, যা সংবেদনশীল পাঠকের কাছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত ঠেকে। নিজের পূর্ব পুরুষদের দেশত্যাগের চিত্রকে অঙ্কন করতে গিয়ে আখ্যানকার নিজের অজান্তেই যেন ওপার বাংলার সমস্ত দাঙ্গা আক্রান্ত মানুষের ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আখ্যানকারের পারিবারিক বিষয়টি লাভ করেছে সর্বজনীনতা।

পার্টিশন সাহিত্য ধারায় এমন কিছু সাহিত্যিক রয়েছেন যাঁরা সরাসরি দাঙ্গায় আক্রান্ত হননি ঠিকই, তবে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা সরাসরি সেই দাঙ্গার শিকার। এক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বপুরুষের ভয়ঙ্কর অভিঙ্গতাকে স্মৃতিকথা হিসেবে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। আমরা শচীন দাশকে সেই সাহিত্যিকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কারণ তিনি দাঙ্গায় আক্রান্তের উত্তর প্রজন্ম হিসাবে অগ্রজদের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে কখনও কখনও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছেন এমন এক জগৎ যা হুবহু সত্য না হয়েও নিতান্তই কাল্পনিক নয়, বরং সত্য-মিথ্যার মাঝে যার অবস্থান।

তথ্যসূত্র—

১) বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, তৃতীয় সংশোধিত ও পরিমার্জিত প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৩

২) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৪) দাশ শচীন *লাশ ভাইস্যা যায়* কৃতি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫৭

৫) সেন মণিকুন্তলা 'সেদিনের কথা' *জনজাগরণে নারীজাগরণে* থীমা, কলকাতা, জলিমোহন কল ২০১০, পৃ. ১৫৭

৬) দাশ শচীন *লাশ ভাইস্যা যায়* পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৮) বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ 'কলকাতার জীবনে দাঙ্গা', *অনুষ্টুপ* (অনিল আচার্য সম্পাদিত), সপ্তবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ. ৯

৯) চক্রবর্তী সুমিতা 'দেশ বিভাগ : ছোটগল্পে নারী' *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১২, পৃ. ৯৯

১০) দাস সুহাসিনী *নোয়াখালি : ১৯৪৬*, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথমপ্রকাশ; ফেব্রুয়ারি২০০৪, পৃ. ১২-১৩

....

গবেষক , কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার

কর্নেল কাহিনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের প্রতিফলন

সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আতেকা খাতুন

সারসংক্ষেপ -

বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন, বোহেমিয়ান জীবন ভাবনা কৌতূহলী পাঠকের কাছে সর্বদা আকর্ষণের বিষয়বস্তু। কবি হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আলকাপে প্রবেশ করেন এবং কথাসাহিত্যিক রূপে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করেন।

তাঁর গোয়েন্দা কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি। কর্নেল কাহিনিতে ব্যক্তি সিরাজ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। কর্নেল কাহিনি পর্যালোচনা করলে লেখক সিরাজ ও ব্যক্তি সিরাজ প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেন। তাঁর জীবন দর্শন, সমাজ ভাবনা, ধর্মীয় চিন্তা, শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর মনোভাব, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত কিছু নিয়ে লেখক থেকে গেছেন তাঁর কর্নেল কাহিনিতে। কর্নেল ও কর্নেল কাহিনি হয়ে উঠেছে লেখকের প্রতিবিম্ব।

মূল শব্দ-

ব্যক্তি সিরাজ, কর্নেল, জীবনদর্শন, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি,

মূল প্রবন্ধ-

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৯২৯ সালের ১৪ই অক্টোবর, সোমবার একাদশীর দিন মুর্শিদাবাদের খোসবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন, বোহেমিয়ান জীবন ভাবনা কৌতূহলী পাঠকের কাছে সর্বদা রহস্যময়। শৈশবে মাতৃহারা সিরাজ হয়ে ওঠেন প্রকৃতির সন্তান, উপভোগ করেন উদ্দাম শৈশব জীবন, যৌবনের মূল্যবান ছয়টি বছর বিলিয়ে দেন লোকনাট্য আলকাপে। ফলত সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশে বিলম্ব ঘটে। সাহিত্যিক পিতা-মাতার সান্নিধ্যে তিনি ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, মায়ের মত কবিতা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চান কিন্তু তিনি কাব্যজগতে নিজেকে মেলে ধরতে ব্যর্থ হন। বাংলা সাহিত্যের লীলাক্ষেত্র কলকাতা থেকে ধাক্কা খেয়ে সাহিত্যের রণভূমি ত্যাগ করেন এবং দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ফিরে আসেন অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র নিসর্গপ্রকৃতির কোলে। সাহিত্য জগত থেকে নিজেকে অনেক দূরে স্থাপন করতে চান এবং চূড়ান্ত সময়ে তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর তো লেখক হবার কথা ছিল। দূরে চলে যাওয়া থেকে ফিরে আসেন তিনি কিন্তু সেই মুহূর্তেই সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিবেশ করতে সাহস পাননি। প্রত্যেক সফল শিল্পীর আপন শিল্প কর্মের জগতে নিজের সঙ্গে ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে কঠিন লড়াই থাকে, এই লড়াই তাকে লড়ে যেতে হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকেও সেই লড়াই লড়তে হয়েছিল ভীষণভাবে। ছোটবেলায় মায়ের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় লেখক নিজের অজান্তেই একা হয়ে যান কিন্তু সেই একাকীত্ব তাঁর তীব্র হয়ে ওঠে যখন অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে তিনি কলকাতা পাড়ি দেন আর সেখানে গিয়ে সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে ভেঙে যায়। ব্যর্থ- ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সীমাহীন ক্ষোভ, দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ফিরে আসেন প্রকৃতি মায়ের কোলে। একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা তীব্রতা পায়, সেই নিঃসঙ্গতা কাটাতে হাতে তুলে নেন বাঁশের বাঁশি। ছোটবেলার বন্ধু কালীপ্রসাদ বেসরা তাঁকে এই বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছিলেন, আর এই বাঁশি-ই লেখককে আনন্দময় জীবনের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল আলকাপে প্রবেশ করে। তিনি তাঁর জীবনের সেরা সবটুকু যেমন আলকাপে ঢেলেছিলেন তেমনি আলকাপও লেখককে জীবনের সেরা উপহার গুলো দিতে থাকে। লেখকের শিল্পী সত্তার স্ফুরণ ও বাস্তবায়ন ঘটাতে সাহায্য করে আলকাপ। তাঁর মুখে মুখে রচিত পালাগুলি মঞ্চস্থ করার পরিসর দান করে আলকাপ। আলকাপ দলের সঙ্গে মেলা থেকে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে

গ্রাম বাংলার মানুষের বিচিত্র বিস্ময়কর জীবনকে মূল অবধি উপলব্ধি করেন। ঘর পালানো অস্থির চিত্তের কিশোর সিরাজ পালাতে পালাতে আলকাপে এসে হঠাৎ করে আবিষ্কার করেন হয়তো এই আনন্দের খোঁজেই বারবার ঘর ছেড়েছেন তিনি। যা পাওয়ার লোভে তিনি ঘর ছাড়তেন, কিশোর থেকে যুবক হয়ে যান তা খুঁজে পেতে। যৌবন জীবনের মূল্যবান ছয়-ছয়টি বছর আলকাপে অতিবাহিত হয়। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে সময়টি দীর্ঘ সময়, 'আড়াইহাজার রাত, ষাট হাজার ঘন্টা'। আবারো লেখকের অস্থির চিত্ত ছটফটিয়ে ওঠে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য ছেড়ে সভ্যতার দালান বাড়িতে ফেরার জন্য। আলকাপ থেকে লেখক নিজের শিল্পী সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন, ততদিনে নিজেকে আবিষ্কার করার আত্মবিশ্বাস জেগেছে মনে, ফলত লেখক ফিরে আসেন। আলকাপ জগতের মায়া ও মুগ্ধতার শেকড় লেখককে গভীর পর্যন্ত আবিষ্ট করেছিল, তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন ১৯৫৬ সালে। আলকাপের মায়া ত্যাগ করতে, অস্থির চিত্তে স্থিরতা আনতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৯৫৬ সালের ১৩ জুন। নববধূর সঙ্গে লেখক তাঁর স্বপ্ন, আনন্দের উৎস, দুঃখ-হতাশা-কষ্ট, স্বপ্ন ভাঙার বেদনা ভাগ করে নিলে আদর্শ জীবনসঙ্গিনীর মতো নববধূ হাসনে আরা সিরাজ লেখককে তাঁর স্বপ্নপূরণের পরিসর দান করেন, হয়ে ওঠেন লেখকের স্বপ্ন পূরণের অনুপ্রেরণা।

প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে 'নীলঘরের নটী', ইতিপূর্বে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রথমে ছদ্মনামে ও পরে স্বনামে বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। সাহিত্যে তাঁর পদার্পণ ঘটে, তিনি তাঁর লেখায় আলকাপ জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের রূপ দিতে থাকেন। বিচিত্র বিস্ময়কর লক্ষ কোটি মানুষের কথাকে সাহিত্যে ব্যক্ত করেন। তবে কখনোই শুধুমাত্র সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেননি তিনি। তাঁর সাহিত্য সর্বদা সমাজ জীবনে এক বিশেষ বার্তা বহন করে আনে। অন্ত্যজ প্রান্তিক মানুষের কথা চির আধুনিক করে সাহিত্যে উপস্থাপন করেন, মানবিক, আবেদনময়ী করে। গ্রামীন সরলতা ও সহজতার উল্টো পিঠে, যে হিংসা ও হননের রূপ রয়েছে তাকে তিনি চিত্রায়িত করেছেন, যা তাঁর পূর্বে কেউ অঙ্কন করেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সর্বভুক পাঠক, চারপাশে বইয়ের পাহাড় মাঝখানে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বাড়ির সদর দরজা পেরোলেই নিসর্গ প্রকৃতি। বই ও প্রকৃতি এই দুই শিক্ষক লেখককে গড়ে তোলেন তাদের মত করেই, যেখানে কোন বাঁধন নেই, মুক্ত উদ্দাম জীবন, অবলীলায় অবহেলায় পাপ ও পুণ্য, অমৃত ও বিষ একইসঙ্গে পান করেছেন লেখক। তাই জারিত হয়ে লেখকের লেখনি দ্বারা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। মননশীল সাহিত্য রচনার পাশাপাশি আকস্মিক ও অপরিকল্পিতভাবে, পাঠকের দাবি পূরণে প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেন ১৯৭১ সালে। ছোটবেলা থেকেই রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা গল্পের তিনি ছিলেন অক্লান্ত পাঠক। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা গ্রন্থ কেনার জন্য বাবার কাছ হতে মিথ্যে বলে টাকা হাতিয়েছিলেন এবং চুপিচুপি হেমেন্দ্রকুমার বাবুর সমস্ত গোয়েন্দা গ্রন্থ কিনে পাশের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গোয়েন্দা-রহস্য-রোমাঞ্চ গ্রন্থের নেশা লেখক জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। গোয়েন্দা গল্প লেখা তাঁর কাছে অনেক বেশি সহজ ছিল, যখন তাঁর মনে হতো লিখে লিখে মগজ খালি আর লেখা বেরয় না তখনও তিনি অনায়াসে জমজমাট রহস্যে ভরপুর গোয়েন্দা গল্প লিখে দিতে পারতেন। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। এই গোয়েন্দা কাহিনিতে লেখক নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। তাঁর জীবন দর্শন, সমাজ ভাবনা, ধর্মীয় চিন্তা, শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর মনোভাব, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, লেখক সিরাজ, ব্যক্তি সিরাজ খুব সুন্দরভাবে থেকে গেছেন কর্নেল কাহিনিতে। তাই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে চিনে নিতে তাঁর কর্নেল কাহিনিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা হলো।

কর্নেল কাহিনি থেকে উদ্ধৃতি হুবহু তুলে আনা হলো যেখানে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে—

১. পাপের বেতন মৃত্যু (কর্নেল সমগ্র ৩, পৃষ্ঠা ৭৯৪)

২. আশ্চর্য মানুষের জীবনের এই বাসনা কামনার ব্যাপারটা! যাকে ভালোবাসি, তার সাত খুন মাফ।(ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫৯)

৩. প্রকৃতিতে যেন মৃত্যুর জন্য কোন শোক নেই, দুঃখ নেই, কান্না নেই।...হত্যা এত স্বাভাবিক মনে হয় প্রকৃতিতে। হত্যা যেন এখানে জরুরি নিয়ম। অথচ মানুষ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও অন্যরকম। সে প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান। মৃত্যুর জন্য সে কাঁদে। হত্যার জন্য সে শাস্তি দেয়। (ঐ, পৃষ্ঠা ৭৯৫,৭৯৬)

৪. হয়তো প্রেম অর্থাৎ ভালোবাসা মানে একটা ব্যক্তিত্বকেই ভালোবাসা। ব্যক্তিত্ব জিনিসটা দেহ মন মিলিয়ে একটা অস্তিত্ব। সুন্দর মানুষ জঘন্য কুৎসিতেরও প্রেমে পড়ে থাকে সে কারণে। দেহ নয় দৈহিক ব্যক্তিত্ব হচ্ছে আকর্ষণের বস্তু। (ঐ, পৃষ্ঠা ৮০৭)

৫. যদি তুমি কারুর সর্বনাশ না করে থাক, তোমার সর্বনাশ কেউ করবে না। মানুষ মানুষকে কি এমনি এমনি খুন করে রে ভাই ? ঘা খেয়ে খেয়ে , ঘা খেয়ে যখন আর সহ্য করতে পারে না, তখন—(ঐ, পৃষ্ঠা ৮৪৪)

৬. ঈশ্বর পৃথিবীতে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস রেখেছেন আর নির্বোধ হারামজাদা মানুষ খালি ঝগড়াঝাঁটি করে। (কর্নেল সমগ্র ৪, পৃষ্ঠা ১১৬৬)

৭. এটাই নিয়ম। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ অন্যকে না দেখালে জীবন ও রোজগার নিরর্থক ঠেকে। (ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭২)

৮. ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি —স্বাধীন হয়ে জন্মায়। কিন্তু স্বাধীন হয়ে বাঁচতে বা মরতে পারেনা। তাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে এবং মরতে দেওয়া উচিত নয় কি? (ঐ,পৃষ্ঠা ১১৭৪)

৯. হত্যার মুহূর্তে মানুষ অন্ধ হয়ে ওঠে। হিংসা তাকে অন্ধ করে। (ঐ, পৃষ্ঠা ১২১৫) এছাড়া, 'বিশেষ করে সংকটে পড়লে মানুষ মাত্রই দুর্বল হয়ে যায়'। 'যে একবার জীবনে ব্ল্যাকমেইলড হয়, সে সবসময়ই সবকিছুতেই ব্ল্যাকমেইল হওয়ার প্রবণতায় ভোগে।' 'সত্য জিনিসটা এমনই কিছুতেই তাকে গোপন রাখা যায় না'। 'টাকার লোভ বড় লোভ। মানুষ ক্রমশ টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে।' 'ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে'। 'আসলে রক্ত সম্পর্কে মানুষের একটা প্রেমিটিভ আতঙ্ক আছে'। 'মানুষের ক্ষেত্রে ভয় পেলে অতীতে দুটো রিঅ্যাকশন দেখা গেছে। হয় তারা জোট বাঁধে, নয় তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটাই মোটামুটি ঐতিহাসিক নিয়ম ছিল। কিন্তু পোস্ট মর্ডানিস্ট পিরিয়ডের রিয়্যাকশনটা অন্যরকম। অ্যাবসোলিউট এলিয়েনেশন—চরম বিচ্ছিন্নতা। তবে কাপড়-চোপড়ের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই যে উলঙ্গ এই বোধটা থাকা উচিত।' 'বিশ্ব প্রকৃতিকে পাপ-পুণ্য মিলেমিশে আছে। হয়তো থাকবে—যতদিন না পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যায়।' 'প্রেম মানুষকে নির্বোধ করে'। 'বিপদেও মানুষের আদিরিপু মাথা চাড়া দেয়, ভাবা যায় না। মানুষ এক হারামজাদা জীব, বুঝলি? প্রত্যেকটা মানুষ বর্ন ক্রিমিনাল। কেউ পারে, কেউ পারেনা—এই আর কি !' 'পাপের জন্য নরক-ই বরাদ্দ। কিন্তু কেউ কেউ বেঁচে থেকেই নিয়তির কাছে সেই শাস্তি পায়। যন্ত্রণায় তার অস্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।'ইত্যাদি। এরকম অসংখ্য উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায় যেখানে লেখক মানুষের মধ্যে দেখেছেন সহজাত অপরাধীকে। ক্রোধ, হিংসা, লোভ এর পাশাপাশি অবৈধ প্রেমও মানুষকে অতলল গহ্বরে নিমজ্জিত করে। তার বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন গভীরতার নেপথ্যচারী শক্তি যেন মানুষের প্রকৃত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে আবহমানকাল। তার হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। কিছু অলৌকিক রয়ে গেছে আড়ালে।

কর্নেল কাহিনিতে তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি—

১. অসংখ্য নতুন মেয়ে সিনেমায় নামবার জন্য অমিয়র কাছে আসত। আমি জানি, অমিয় তত কিছু মহাপুরুষ ছিল না। কিন্তু সেজন্য আমি ওকে দোষ দিই না। লাইনটাই হয়তো এরকম সব সময়। লোভের ফাঁদ পাতা। (কর্নেল সমগ্র ৩, পৃষ্ঠা ৭৫৮)

২. সিনেমা মানুষের নৈতিক পতন ঘটাচ্ছে (ঐ, পৃষ্ঠা ৭৭৪)

৩. আজকাল যা অবস্থা, ছেলে বাবাকে খুন করাটা তো সামান্য ব্যাপার। মূল্যবোধের যা অবক্ষয় ঘটেছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি সবখানে (ঐ, পৃষ্ঠা ৮০৯)

৪. সামাজিক ঘেরাটোপের বাইরে যে মেয়ে হাঁটতে পেরেছে, সে খুব সহজে তথাকথিত আনসোস্যাল এলিমেন্টদের মতোই প্রতিহিংসাপরায়ণা হতেই পারে (ঐ, পৃষ্ঠা ৮১৭)

৫. পৃথিবীটাই যে পাপে ভরে গেছে (ঐ, পৃষ্ঠা ৮৪৮)

৬. আইনের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্যই আইন, আমাদের সমাজটা আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে অন্যায়টায় এখন স্বাভাবিক। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে সমর্থন করা দূরে থাক, অন্যায়কারীর পক্ষ নিয়ে আমরা তাকেই লাঞ্ছিত করি। (ঐ, পৃষ্ঠা ৮৫১)

৭. পুলিশ আর ভূত উভয়কেই মানুষ ভয় করে স্যার (ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৪৩)

৮. মার্ডারের কথা বলছো—এ তো আজকাল ডাল ভাতের শামিল (কর্নেল সমগ্র ৫, পৃষ্ঠা ১৫৯৮)

৯. হয়তো কালের নিয়ম। অধুনা সব কিছুর সঙ্গে অশুভ জড়িয়ে যাচ্ছে। স্নেহ পাওয়ার কথা যেখানে, সেখানে এসে পড়ছে কদর্য ব্যভিচার।... দয়ামায়া স্নেহ ভালোবাসা—এসব মানবিক বোধের আর কোন ঠাঁই নেই। টাকা করি সম্পত্তি এসব জিনিসই বড় হয়ে উঠছে (৫. পৃষ্ঠা ১৬৮৮,১৬৯০), প্রভৃতি। এছাড়া 'সাধারণ মানুষেরা পুলিশকে এমনিতে এড়িয়ে চলে' আমাদের দেশের নিউ জেনারেশন এর একটা অংশ যে-কালচারে (সাহেবি কালচার) আক্রান্ত।' এরকম শতাধিক উদ্ধৃতি তুলে আনা সম্ভব, যেখানে দেখা যায় সামাজিক অবক্ষয়, প্রশাসনিক অরাজকতা, নাগরিক আধিপত্যবাদ, বর্তমান প্রজন্মের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নিয়ে লেখক চিন্তিত। এমনকি রাজনীতি সম্পর্কেও লেখকের মনোভাব খুবই স্পষ্ট– 'এখনকার কালচার বলতে পারেন—এই খুনখনি আর দাঙ্গা হাঙ্গামা। রাজনীতি দেশটাকে উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছে। (কর্নেল সমগ্র ৪, পৃষ্ঠা ১২৪০)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিদেশি সাহিত্য চষে পড়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত মেলে 'নগ্ন নির্জন হাত' গল্পে। এই গল্পে ব্যক্তি সিরাজ বিশেষভাবে ধরা দিয়েছেন। জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন, 'আমার প্রিয় লেখক জর্জ সিমনোঁর গোয়েন্দা অমনিবাস পড়তে মন দিলাম টেবিলবাতির আলোয়।' (কর্নেল সমগ্র ৬, পৃষ্ঠা ১৮৪২) সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত জয়ন্ত চৌধুরী কর্নেল কাহিনির অন্যতম এক চরিত্র। তাঁর লেখনীতেই কর্নেল কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিজে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক। সুতরাং জয়ন্ত চৌধুরী তাঁরই এক সত্তা। সাংবাদিক হওয়ার দরুন মানুষের কাছ থেকে লাভ করা অভিজ্ঞতাও ব্যক্ত হয়েছে নানাভাবে। 'আপনারা কাগজের লোকেরা কি মশাই বাতাসে গন্ধ শুঁকে টের পান?'(ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৪৬) লেখক মনে করেন, 'তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে দক্ষ রিপোর্টার হওয়া যায় না। মুখ জয়ন্ত ! মানুষের মুখই হল মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রথম এবং স্বাভাবিক মাধ্যম।' (ঐ, পৃষ্ঠা ১৯২৪), 'ভূতের ভয় যতই পাই, ভুতে বিশ্বাস করাটা কেমন বিচ্ছিরি লাগে যেন। তাছাড়া আমার মতে, গল্পের ভূতে মজা আছে। সত্যি কারের ভূতে মজা কোথায়?' (কর্নেল সমগ্র ৪, পৃষ্ঠা ১৪৩১) লেখক ব্যক্তি জীবনে ভুতে ভয় পেতেন কিন্তু ভূত বিশ্বাস করতেন না, তাই কবরস্থানে রাত কাটিয়েছেন ভূত দেখার জন্য, আর বাঁশি বাজিয়েছেন ভয় থেকে বাঁচতে। এভাবেই লেখক উঠে এসেছেন কর্নেল কাহিনিতে।

'কলকাতার নাড়িনক্ষত্র আমার জানা', 'আমার খুব চেনা জায়গা। প্রতিটি ইঞ্চি আমি চিনি।' এখানে প্রথমটি বলা হয়েছে কলকাতা সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি বলা হয়েছে স্টেডিয়াম সম্পর্কে তবে একথা সত্য যে গ্রাম সম্পর্কে লেখকের একই উক্তি ছিল। গ্রামের প্রতিটি ইঞ্চি ইঞ্চি তিনি চিনতেন। এমনকি কলকাতার প্রতিটি অলিগলি তার নখদর্পণে ছিল তাঁর এই গুণটি তিনি আরোপ করেছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের উপর। 'আমার পথে আমি নিঃসঙ্গ'(কর্নেল সমগ্র ৩, পৃষ্ঠা ৮৩৫)। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সত্যিই নিঃসঙ্গ ছিলেন, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে, গ্রামীণ জীবনকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করার একাকী আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে গেছেন তিনি। ক্ষুদ্র আত্মকথার শিরোনামে ব্যবহার করেছেন 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি' নিজেকে নির্বাসিত, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গ পথযাত্রী মনে করতেন, সে কথাই ব্যক্ত করেছেন কর্নেল কাহিনিতে। ব্যক্তি সিরাজ ছিলেন অনেক বেশি মানবিক এবং আদর্শ বোধে উন্নীত। কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মধ্যে সেই গুণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি

গোয়েন্দা চরিত্র হলেও আর সকল গোয়েন্দাদের মত অতিমানবিক হয়ে ওঠেননি। 'নিশুতি রাতের ডাক' উপন্যাসে স্ত্রী এবং কন্যার শোচনীয় পরিণতি দেখে, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা বোধের দ্বারা বিচলিত হয়ে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছিলেন শিব শঙ্কর বাবু। তাঁর অসহায়তায় চোখে জল দেখা গেছে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের। আবার যে সমস্ত চরিত্র অসামাজিক, অমানবিক, খুনি তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেননি কর্নেল। এছাড়া অন্যায়কারী বিপুল শক্তিশালী, প্রতাপশালী হলেও তার কাছে কখনো মাথা নত করেননি কর্নেল। 'লাল ফিতের আড়ালে' গল্পে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শিল্পপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী জগদীশ নায়েক কর্নেলের কাছে ফাইল নিতে এসে পকেটে হাত ঢোকালে, কর্নেল মুহূর্তে রিভলবার বের করে বলেন, 'ডুয়েলে হেরে যাবে নায়েক! পকেট থেকে খালি হাত বের কর।...তোমার মত জঘন্য খুনিকে এখানে কুকুরের মত মেরে ফেলে রেখে যেতে আমার হাত কাঁপবে না। ওঠাও হাত!' কর্মজীবনে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অন্যায়ের সাথে কখনো আপোষ করেননি, এরকমই মানসিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন তিনি, তাঁরই প্রতিরূপ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মধ্যে দেখা যায়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ব্যক্তি জীবনে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, মানবতাবাদী উজ্জ্বল এক চরিত্র। তিনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের চেহারা সান্তা ক্লজের মতো রূপায়ণ করলেও তাঁকে খ্রিস্টান রূপে বাস্তবায়িত করেননি। প্রথমদিকের দুটি গল্পে পরিণতমনস্ক গোয়েন্দা কাহিনি 'সুন্দর বিভীষিকা' এবং কিশোর গোয়েন্দা গল্প 'প্রতাপগড়ের মানুষ খেকো'-তে কর্নেলকে খাঁটি পাদ্রির মত বুকে ক্রস আঁকতে দেখা যায়। কর্নেলের এই ধর্মীয় অভ্যাস লেখকের নিজেরই পছন্দ হয়নি, তাই প্রায় দুই শত গোয়েন্দা কাহিনিতে আর কোথাও কর্নেলকে এমন আচরণ করতে দেখা যায় না। কর্নেল হয়ে উঠেছেন রহস্যভেদী, প্রকৃতিপ্রেমী, মানবিক চরিত্র। আলোচনা থেকে দেখা যায়, লেখক সিরাজ ও ব্যক্তি সিরাজের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, জীবনভাবনা, কর্নেল কাহিনিতে খুব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং বলাই যায়, কর্নেল কাহিনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজেরই প্রতিবিম্ব।

....

উপাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় অন্তর্বর্তী বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

জগদীশ গুপ্তের 'অসাধু সিদ্ধার্থ': বাংলা উপন্যাসে প্রথম ভিলেন নায়ক

বাণী রায়

মানুষের বাস্তব জীবনের আখ্যান হল উপন্যাস। উপন্যাসে যেমন একটি কথাবস্তু অর্থাৎ স্টোরি থাকা প্রয়োজন, তেমনি উপন্যাসে অপরিহার্য হল চরিত্র। চরিত্র অর্থে ব্যক্তি। কারণ, আখ্যান হল ঘটনার সমাহার এবং বাস্তব জীবনে ঘটনা যারা ঘটায় তারাই হল ব্যক্তি। আর বাস্তবের এই ব্যক্তিরা যখন ভাষাশিল্পে প্রতিরূপায়িত হয় তখন তাদের বলা হয় চরিত্র। উপন্যাসের তত্ত্ববিদরা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই উপন্যাসেরচরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। চরিত্র, আলোচকদের মতে প্রধানত দুই প্রকার। কেন্দ্রীয় চরিত্র ও পার্শ্বচরিত্র। উপন্যাসের ঘটনাগুলি প্রধানত যেসব চরিত্ররা ঘটায়, যাদের ভিড়ে আখ্যানে ঘটনা ঘটে তারাই হল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই কেন্দ্রীয় চরিত্ররা কেমন হবে, সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বিধি নেই। কিন্তু সাধারণত কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, কর্মক্ষমতা এবং সততা প্রত্যাশিত। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের পরিকল্পনা সেরকম নয়। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, লেখক তাঁর আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে সচ্চরিত্র নয়, অসাধু রূপেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। জগদীশ গুপ্ত অনেক দিন থেকেই বাংলা সাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। জীবনের নিষ্ঠুর, কঠোর, অমঙ্গলদায়ক, প্রতারক চেহারাকে তুলে ধরেছিলেন কোনো কোনো লেখক। তাঁদেরই একত্রে 'কল্লোল' পর্বের লেখক বলা হয়। জগদীশ গুপ্ত তাঁদেরই একজন। "নিঃশব্দে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। এবং 'অন্তরালের সাহিত্যিক' রূপে একরকম নিঃশব্দে তিনি প্রস্থান করলেন।"[১] জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে এরকম উক্তি বোধহয় একেবারেই মিথ্যা নয়। বাস্তবিকই জগদীশ গুপ্তকে সমকালীন পাঠকবর্গ তাঁর সাহিত্যিক মর্যাদা ততখানি দেননি, যতটা তাঁর প্রাপ্য ছিল। জগদীশ গুপ্ত যখন সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করেন তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভাধর লেখকের রচনার দ্বারা পাঠকসমাজ ছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ। কাজেই এই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েও তিনি যে তাঁর প্রতিভার ভাস্বরতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — "রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের।"[২]

আমাদের আলোচ্য 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটি জগদীশ গুপ্তের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। আগেই বলা হয়েছে উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসের নায়ক একজন ধূর্ত, ঠকবাজ, প্রতারক, মিথ্যাশ্রয়ী যুবক। উপন্যাসের শুরুটিও বড় অদ্ভুত ধরনের — 'সিদ্ধার্থ তার নামই নয় — নাম তার নটবর, নিরলঙ্কার নটবর — "ঘোষ বোস গুহ মিত্তির" ইত্যাদি কুলাধিকারীর পরিচয় একটিও তার নামের পশ্চাতে কখনো ছিল না।' (প্রথম পরিচ্ছেদ)। প্রয়োজনে, নটবর নিজের নামের সঙ্গে কখনো সখনো দাস শব্দটা জুড়ে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিত। কাজেই উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোটেও সৎ প্রকৃতির নয়। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদের আমরা সাধারণত সৎ, ভদ্র, নম্রস্বভাবের দেখে এসেছি জগদীশ গুপ্তের নায়ক তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র যে একজন ছদ্মবেশধারী ব্যক্তি তা আমরা আগেই জেনেছি। তার আসল নাম নটবর, বাদবাকি সবটাই তার বানানো পরিচয়। এখান থেকেই বোঝা যায় যে, সে কোনো ভদ্র পরিবারের শিক্ষাদীক্ষায় বড় হয়ে ওঠা কোনো শিক্ষিত মার্জিত যুবক নয়। লেখক তার সম্পর্কে অনেক তথ্যই পরবর্তীকালে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

তার পিতৃ-প্রদত্ত নাম নটবর হলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে সিদ্ধার্থ নাম গ্রহণ করেছে। নটবরের সিদ্ধার্থ হওয়ার পেছনে হয়তো উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। কারণ সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পড়লে আমরা দেখতে পাব নটবরের পূর্বপরিচয় মোটেই গৌরবজনক নয়। হয়তো সেই পরিচয় গোপন করার জন্য এবং এতদিন যে নোংরা, কুৎসিত পরিবেশে সে ছিল, সেখান থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং উন্নত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা তার মনে জেগে উঠেছিল। জগদীশ গুপ্ত নটবরের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে পাঠককে অবগত করেছেন। নটবর ছিল এক ব্রাহ্মণের জারজ পুত্র। কোনো এক বৈষ্ণবীর গর্ভে তার জন্ম। পরবর্তীকালে সে এক চায়ের দোকানে চাকরের কাজও করেছে। পরে ঘটনাচক্রে শখের থিয়েটারে যোগদান এবং সেই সূত্রে অল্প কিছু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছে। সব শেষে অর্থলোভের বশবর্তী হয়ে সে ছিল কোনো এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যা-সহচর। তারপর সেই বৃদ্ধা গত হলে তার টাকায় সে শুরু করে এক ব্যবসা। কিন্তু ব্যবসায় লাভের পরিবর্তে হয় লোকসান এবং বাজারে তার প্রচুর ঋণ জমে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে সিদ্ধার্থ যা কিছু অসৎ কাজ করেছে, সবের মূলেই রয়েছে আর্থিক সংকট। তার এই ঋণজর্জর অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়েই উপন্যাসটির সূচনা।

এরকম পরিস্থিতির মধ্যে সিদ্ধার্থরূপী নটবরের দোটানা মনোভাবকে লেখক ব্যক্ত করেছেন খুব সুন্দরভাবে। তাকে যখন ঋণ পরিশোধের উপায় হিসেবে একটি মিথ্যা কাগজে সই করবার জন্যতার বন্ধু দেবরাজ একরকম বাধ্য করছিল তখন নটবরের মনের মধ্যে — 'সত্যই একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যতদূর অধঃপতিত এবং হীনতায় মগ্ন বলিয়া সিদ্ধার্থ পরিচিত তাহা একেবারেই ভুল না হইলেও, দুর্বিপাকের পাঁকের ভিতর পড়িয়াও তার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মনে দেবরাজের অনুমানের অতীত একটা স্থানে সু ও কু-এর কলহ এখনো ঘটে।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)।এখান থেকেই বোঝা যায় নটবরের মধ্যে অল্পকিছু হলেও শিক্ষার সুফল প্রবেশ করেছিল। কারণ, যে কাজটা করানোর জন্য বন্ধু তাকে উৎসাহিত করেছিল সেটা তার ঋণ পরিশোধের উপায় হলেও সেটা যে মোটেই সৎ কাজ নয়, এবং কাজটা করা অনুচিত, এই বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। প্রভুর এই অসহায় অবস্থা দেখেও তার চাকরটির দুর্ব্যবহার পাঠককে কষ্ট দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে নটবরকে লেখক যতই নীচ-চরিত্রের ব্যক্তি হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করুন না কেন, একটা জায়গায় সিদ্ধার্থের জন্য পাঠকের পাশাপাশি তাঁরও সহমর্মিতা ও মমত্ববোধ কাজ করেছে।

সিদ্ধার্থের চেহারা, আচার-আচরণ সবই ভদ্র পরিবারের মার্জিত যুবকের মতো হলেও সে সবসময়ই মানুষকে প্রতারণার করার সুযোগ খোঁজে। কারণ তাকে বাঁচতে হবে সেভাবেই। তবু একসময় জীবন তার কাছে হয়ে উঠছে দুর্বিষহ। সে ভেবেছে এই জীবনযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ মৃত্যু। তাই সে আত্মহত্যা করার জন্য এক নির্জন পাহাড়ি এলাকায় কোনো এক জলপ্রপাতের ধারে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। একদিকে অর্থাভাব, আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে চরম অপমান, অন্যদিকে নিজের পূর্বজীবন ইতিহাসকে স্মরণ করে সে বার বার হীনম্মন্যতায় ভুগেছে। লেখক বর্ণনা করেছেন — 'সিদ্ধার্থের মনে হইতে লাগিল, সে যেন গলিত কর্দ্দমকুণ্ডের কৃমি, মানুষের পাদস্পর্শের যোগ্য নয়। কোথাও একটু দুর্বলতার ফাঁক ছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া দুনিয়া তাকে ভুলাইয়া ফুসলইয়া প্রবঞ্চক, ইতর সাজাইয়াছে।' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশে নটবর যত মন্দ কাজই করুক না কেন, এই কাজ করার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে অপরাধবোধ।

বাংলা সাহিত্যে এই সিদ্ধার্থ চরিত্রটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী লেখকের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। সে জন্মাবধি অসৎ, প্রতারক পরিবেশে বড় হয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না। কারণ, সে ছিল দরিদ্র। আশৈশব অসৎ কর্মেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু তার মনের মধ্যে সুস্থ ও সৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা আছে – তা বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক। অথচ সে কোনোদিনই ভালো কাজ করেনি বলে এই জীবন থেকে বেরিয়ে আসবার অন্য কোনো পথের কথাও সে ভাবতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করতে পারেনি অজয়াকে দেখে। এখানে অজয়ার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অজয়া শিক্ষিতা, সম্পন্ন পরিবারের একজন তরুণী। সে তার দাদার সঙ্গে পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে এসে পাহাড়ের পাদদেশে বসে দাদার সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করছিল। সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। সিদ্ধার্থ আড়াল থেকে তাকে দেখেছে। জগদীশ গুপ্ত এই অংশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়েছেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মানসিকতা-ই আমরা এই উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি, বিশেষ করে এই বর্ণনায় – 'অতলে গর্জন করিতেছে মৃত্যু, কিন্তু সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত। অসীম – আঁধার সাগরের উপর জ্যোতির্ময় শতদল ফুটিয়া তাহারই অঙ্গ প্রভায় দিগন্ত পর্যন্ত স্বর্ণ প্রভাতের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল সম্মুখ কত রঙের মেঘ স্তরে স্তরে সাজান, রঙের আর শেষ নাই... পুষ্পস্তব হিল্লোলে হিল্লোলে আকাশের গা বাহিয়া ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিয়া দিক্‌সীমানায় লীন হইয়া গেছে।' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। প্রকৃতির এই সুন্দর চিত্র সিদ্ধার্থের চোখে উপভোগ্য রূপে ধরা দিল অজয়াকে প্রথমবার দেখার পর।

এইখানেই সিদ্ধার্থের মনোভাবকে এক আশ্চর্য কৌশলে তুলে ধরেছেন লেখক। সিদ্ধার্থ মরবে বলে ঠিক করেছিল। দূর থেকে অজয়াকে দেখে সেই ইচ্ছা সে পরিত্যাগ করে। কিন্তু মৃত্যু-ইচ্ছা ত্যাগ করবার মূলে কোনো সুস্থ সুন্দর শুভচেতনা নেই। সে মনের অবচেতনে মৃত্যু থেকে পরিত্রাণের পথই খুঁজছে। অজয়াকে দেখে তার মনে পড়ে গেল বন্ধুর কথা। সম্পন্ন পরিবারের কোনো মেয়েকে বিবাহ করলে সে দারিদ্র থেকে মুক্ত হতে পারে। অজয়াকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে ঠিক-ই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই মুগ্ধতার সঙ্গে জেগে উঠেছে লোভ। জেগে উঠেছে তার প্রতারক বুদ্ধি। যদি এই মেয়েটিকে সে কোনো রকমে করায়ত্ত করতে পারে তাহলে মিটবে তার আর্থিক সমস্যা। অজয়াকে দেখে তার মুগ্ধতা মিথ্যা নয়, কিন্তু সেই মুগ্ধতা বিশুদ্ধও নয়। যেভাবেই হোক অজয়াকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবার কামনা তার মনে জেগেছে। এই কামনার মূলে আছে তার স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা। সৌন্দর্যমুগ্ধতা ও স্বার্থপরতার এই কুশল মিশ্রণ জগদীশ গুপ্তের কলমে যেভাবে ফুটে উঠেছে তার তুলনা সহজে পাওয়া যাবে না।

সিদ্ধার্থের শক্তি, সাহসিকতা ও মনোবল এবং অজয়ার দাদা রজতের মুখে তার প্রশংসা শুনে অজয়া স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধার্থের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। পরে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাহিনি এগিয়ে গেছে। কাহিনির মাঝে মাঝে আমরা সিদ্ধার্থের বিবেক দংশনের পরিচয় পেয়ে থাকি। অজয়াকে খুব কাছ থেকে দেখেও সে প্রেম নিবেদন করতে পারেনি, বিবেক তাকে বাধা দিয়েছে। লেখক বর্ণনা করেছেন – 'সে অপবিত্র। মনে হইতেই তাহার সমগ্র চিত্ত, একাগ্রতা ভাঙিয়া, আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। যে মন্দিরে সে প্রবেশ করিতে চায় অশুচি অন্তর লইয়া তাহার প্রবেশ করিবার অধিকার আছে বলিয়া তাহার কিছুতেই মনে হইল না।' (সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

তবুও শেষ পর্যন্ত অজয়ার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। এর পরেও কিন্তু উপন্যাসের প্লটে আছে এক মোচড়। ছলচাতুরীর দ্বারা একটু একটু করে যে সিদ্ধার্থ একদিন অজয়ার মন জয় করেছিল। কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায় সিদ্ধার্থের আসল পরিচয়। এবং পুনরায় সে প্রতিপন্ন হয় একজন মিথ্যাবাদী, ঠক, প্রবঞ্চক রূপে। শেষ পর্যন্ত অজয়ার সঙ্গে তার বিবাহ ভেঙে যায়। সিদ্ধার্থরূপী নটবরের অজয়াকে ঘিরে সব স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার সেই স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতা সে উপন্যাসের শেষে ব্যক্ত করেছে – 'ভগবান জানেন

আমি নিরপরাধ; নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসেছিলাম; ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। ...কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই?' (অষ্টম পরিচ্ছেদ)। এখানে লক্ষ করি সিদ্ধার্থ নিজের পরিণামের জন্য দায়ী করেছে তার নিয়তিকে।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী জগদীশ গুপ্তের গল্প বা উপন্যাসের বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যর্থতার মূলে এক নিষ্ঠুর নিয়তির বীভৎসতাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন—"জগদীশচন্দ্র মানবজীবনের নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতার অন্তরালে এক ক্রূর রহস্যময় শক্তির নিগূঢ় প্রভাব অনুভব করেছেন। সেই রহস্যময় শক্তি তাঁর রচনায় কখন দুর্লঙ্ঘ্য পরিবেশগত প্রভাবরূপে দেখা দিয়েছে—যে পরিবেশের হাত থেকে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি একান্ত দুর্লভ। ... 'অসাধু সিদ্ধার্থ' গল্পে নটবরের জীবনে এই দুর্লঙ্ঘ্য পরিবেশের মর্মান্তিক প্রভাবের ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই পরিবেশই এখানে তার নিয়তি।"[৩]

এই প্রসঙ্গে আমরা সাহিত্য-সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যটিও তুলে ধরতে পারি। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাস প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য --"মানবজীবনের নিষ্ফলতা ও বর্বরতার আড়ালে এক ক্রূর রহস্যময় শক্তির নিগূঢ় প্রভাব সম্পর্কে লেখক সদা সচেতন। সংশয় লেখককে নিয়ে গেছে দুঃখে, হতাশায়। তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতা প্রাধান্য পেয়েছে।"[৪] তাছাড়াও আরও এক স্থানে আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন — "কল্লোল-গোষ্ঠীর রোমান্টিক ভাবালু — জীবনদৃষ্টি থেকে জগদীশ গুপ্ত বাংলা গল্পকে এক রুক্ষ নির্মোহ অন্ধ-নিয়তি-তাড়িত হতাশাময় জনহীন দেশে স্থানান্তরিত করেছিলেন যেখানে আর্তমানুষ নিরুপায় অসহায় হয়ে হাহাকারে ভেঙে পড়ে।"[৫]

প্রত্যেক মানুষের চরিত্রের ওপরই তার পরিবেশের অনেকটা প্রভাব থাকে। একথা স্বীকার করেও বলা যায়, দরিদ্রএবং পারিবারিক বন্ধন বহির্ভূত অনেক মানুষই আছে যারা সর্বদাই সিদ্ধার্থের মতো নষ্ট চরিত্র হয়ে যায় না। সে স্বভাবতই লোভী, স্বার্থপর এবং প্রতারক। অসৎ প্রবৃত্তি সর্বদাই তার মনে জাগরূক থাকে। মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন অনুভব করলেও কোনো সময়ই সে অসততার পথ থেকে সরে আসেনি। এই কারণেই 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্ধার্থ তথা নটবরকে বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাসের প্রথম ভিলেন নায়ক। তার প্রবৃত্তিও অসৎ। অসৎ কাজ করতেও সে বিরত হয় না।

সিদ্ধার্থের পূর্বসূরি রূপে কিছুটা মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপকে। তারও আছে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, কিন্তু সে-ও এক প্রতারক। কিন্তু উপন্যাসের শেষে বিমলাকে স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার প্রতারক পরিকল্পনা ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে বিমলার প্রতি তার প্রেমিক হৃদয়। যদিও তাতে তার কর্মপন্থার পরিবর্তন হবে তেমন ইঙ্গিত উপন্যাসে নেই। আর কিছুটা মনে পড়তে পারে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের সুরেশকে। কিন্তু সুরেশ ও সিদ্ধার্থের মধ্যে মূলেই পার্থক্য আছে। সিদ্ধার্থ স্বভাবতই এক প্রতারক, কিন্তু সুরেশ নিজের স্বার্থে কখনও কাউকে পরিকল্পিতভাবে প্রতারণা করেনি। অচলার প্রতি আকর্ষণের জন্য একবার সে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারার পরে প্রায়শ্চিত্তও করেছে। বলা যায় নিজের মৃত্যুকে সে নিজেই আহ্বান করেছে। কিন্তু সুরেশের মহত্ত্ব সিদ্ধার্থের ছিল না। সে আত্মদানের মধ্যে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা ভাবতেই পারেনি। এজন্যই সে নিয়তির কথা বলে এবং সে আত্মপক্ষ সমর্থনও করে। নিজের অপরাধ সে নিয়তির চক্রান্ত বলে চালাতে চায়। সেই অজুহাতে সে হয়তো সমাজের কাছে ক্ষমাও প্রত্যাশা করে। সে বলেছে — 'এর কী ক্ষমা নেই?' কিন্তু অপরাধীকে সমাজ কেন ক্ষমা করবে? সমালোচক লিখেছেন — "কেউ তাকে ক্ষমা করে না। নটবর চলে যেতে যেতে শেষ সত্যটি উচ্চারণ করে যায় — সিদ্ধার্থ বেঁচে নেই। উপন্যাসে আগাগোড়াই অদৃশ্য সিদ্ধার্থ এইভাবে এক অপ্রাপ্য শুদ্ধতার স্বপ্ন হয়ে থাকে। নিজেকে উজাড় করে দিয়েও নটবরেরা তার নাগাল পায় না।"[৬]'অসাধু সিদ্ধার্থ' সবদিক থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অভিনব ও

ব্যতিক্রম। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ক রূপে সিদ্ধার্থের মতো ব্যক্তিকে এর আগে কোনো লেখক কল্পনা করেছেন বলে মনে হয় না। 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) এবং 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসের সঙ্গে 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের পার্থক্য সুস্পষ্ট। সন্দীপ এবং সুরেশ কেউই উপন্যাসের নায়ক নয়। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের পাশে সন্দীপ এবং 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিমের পাশে সুরেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তারা পার্শ্বচরিত্রের বেশি কিছু নয়।

'অসাধু সিদ্ধার্থ' এক কঠোর বাস্তবস্পর্শী সামাজিক উপন্যাস। মানুষের সমাজ ভালো এবং মন্দ ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। নটবর তথা সিদ্ধার্থের মতো প্রবঞ্চকেরা সমাজেরই অঙ্গ। সেই সঙ্গে সমাজের পরিস্থিতিও যে এই নটবরদের গড়ে ওঠার মূলে কিছুটা দায়ী, তাও অস্বীকার করা যায় না। 'অসাধু সিদ্ধার্থ'-এর মতো এত নৈর্ব্যক্তিক সত্যভাষী উপন্যাস বাংলা ভাষায় কমই লেখা হয়েছে।

উল্লেখসূত্র :

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ — বাংলা কথাসাহিত্য : নানা দর্পণে', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০৩ / মে ১৯৯৬, পৃ. ৫৬

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ২৩০

৩.গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৪৬

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২১, পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৩৩৪

৫. চার-এর অনুরূপ, পৃ. ৩৩৪

৬. সুমিতা চক্রবর্তী, 'উপন্যাসের বর্ণমালা', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬, পৃ. ৭৩

....

গবেষক-সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

নজরুল-কাব্যে নারী ও প্রেম : নির্বাচিত কবিতার আলোকে

মোরশেদুল আলম

সারসংক্ষেপ

কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেই কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর আবির্ভাব এক অপার বিস্ময়। প্রতিভার এমন সর্বতোমুখী ভাস্বর দীপ্তি দেখা যায়নি আর কোনো মহত্তম শিল্পীর জীবনে। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁর স্বর্ণরথ সঞ্চরণ করেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রই সপ্তাশ্বের দ্যুতিময় স্পর্শে হয়ে উঠেছে বর্ণময়। নজরুলের অসামান্য বাণীরচনাশক্তি অফুরন্তভাবে উৎসারিত হয়েছে অনন্য রূপ-ভঙ্গিমায় এবং অন্তহীন বৈচিত্র্যে; এবং তা যেন 'দেখে দেখে আঁখি না ফেরে'। বাঙালির শত-সহস্র বৎসরের সাহিত্যসাধনা যেন ঐ একটি কালজয়ী যুগপুরুষের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করেছিলো। সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর (১৯১৯-১৯৪২) ধরে নজরুল অতন্দ্র সাধনায় যে অসামান্য রূপসৃষ্টি করে গেছেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব, অকল্পনীয়। নজরুল-শিল্পীমানসের একটি অনিবার্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে - সেটি কোথাও সীমিত ক্ষেত্রে স্থির থাকে নি, বরং এটি একটি চলমান সত্তা রূপে নিত্য-নতুনের অভিসারে বারেবারে করেছে বাঁক পরিবর্তন; এবং সেই বাঁকের মুখে মুখে কত-না বৈচিত্র্য, কত-না ঐশ্বর্য, কত-না রূপবিভূতির বৈভব! বাস্তবতার যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তির ক্ষরণ, রেনেসাঁসীয় ব্যক্তিত্ববোধের আভিজাত্য, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির শূন্যতা-বিহার নিয়ে নজরুল ইসলাম নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন সমস্ত নাগরিক পঙ্কিলতা ও ক্লেদ থেকে; আশ্রয় খোঁজেন নারী, প্রেম এবং নিসর্গের সারল্য ও ব্যক্তিসত্তার মনোভূমে। তাছাড়া অকারণ বিষাদ, আদর্শময় সৌন্দর্যধ্যান, বিস্ময় ও রহস্যবোধ, প্রকৃতিপ্রীতি, নারীপ্রেম ও সুদূরাভিসার প্রভৃতি রোম্যান্টিকতার যে সকল অনিবার্য ধর্ম- তার সমস্ত কিছুই দৃষ্ট হয় নজরুলের কাব্যে। বিদ্রোহী, কিন্তু চরম রোম্যান্টিক কাজী নজরুল ইসলাম তাই কোথাও একাগ্র নারী এবং প্রেমভাবনায় স্থিত নন; নারীপ্রেমের অন্তরালে অন্তর্লীন যে বিষাদময় নান্দনিক সৌন্দর্য - তার সত্যস্বরূপ সন্ধানে তিনি অর্জন করেন প্রেমময় দর্শনের ধ্যানদৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে একটা বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই নজরুলের শিল্পী-মানসের বৈশিষ্ট্যবিন্দু। তাই সঙ্গতকারণেই বলা যেতে পারে, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় প্রেম ও নারীর উপস্থিতি যেমন প্রাকৃত, প্রাত্যহিক, সংবেদী, সংরাগময় এবং ইন্দ্রিয়জ; তেমনি অন্তর্বয়নের স্তরবহুলতায় প্রাতিস্বিক ও স্বতন্ত্র; এবং বিচিত্রমাত্রার বর্ণান্তরে নিগূঢ়, জটিল ও রহস্যব্যঞ্জিত। বলাবাহুল্য, নারী ও প্রেমের এই নিগূঢ় ব্যঞ্জনা মূলত কাজী নজরুলের অনুভবে, অনুভাবে, অনুধ্যানে এবং পরিচর্যা-বৈচিত্র্যে।

সূচক শব্দ -

কাজী নজরুল ইসলাম, যুগপুরুষ, ভাস্বর দীপ্তি, রেনেসাঁসীয়, বাণীরচনাশক্তি, সৌন্দর্যধ্যান, রোম্যান্টিকতা, প্রেম ও নারী।

মূল প্রবন্ধ -

বাস্তব জীবনের যে অপূর্ণতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির যে দ্বন্দ্বময় জটিলতা, তার থেকে রোম্যান্টিক শিল্পী-মানস পরিত্রাণ খোঁজে নিসর্গ, নারী, প্রেম ও অখণ্ড সৌন্দর্যধ্যানের মধ্যে; এবং সেই অনিবার্য কার্যকারণসূত্রে নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর কবিতাসমূহের প্রধান লক্ষণবিন্দু মূলত 'ভাব-বিভোরতা'। এই আত্মভাব বিভোরতাই সমুদয় জ্বালা-যন্ত্রণা এবং অপ্রাপ্তির সমাধান দেয়; রোম্যান্টিকতায় আপাদমস্তক আক্রান্ত একজন সাহিত্যশিল্পী নিজেকে সমর্পণ করেন সেই রহস্যময়তার হাতে। নজরুলও শেষাবধি কল্পনায় অদ্বয় সত্য লাভ করে হন সুস্থির, স্থিত; রোম্যান্টিক অভিসার স্থিতি পায় সেই মিস্টিক রহস্যময়তায়। এরই সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে নজরুলের নারী এবং প্রেমভাবনামূলক কবিতামালায়।

চির আকাঙ্ক্ষিতা প্রেয়সী যাকে আঘাত করেছে, করেছে প্রত্যাখ্যান; গ্রহণ করেছে অন্য এক পুরুষকে, সেই নারীর উদ্দেশে ব্যথাতুর অভিমান ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর রোম্যান্টিক প্রেমের এক আস্বাদ্য বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে নজরুলের

'অভিশাপ' কবিতায়। এই কবিতাটি মূলত এক মানবিক অভিমান-ক্ষুব্ধ অনুভূতির রক্তরাগে রঞ্জিত রোম্যান্টিক কবিমানসের অনবদ্য শৈল্পিক ভাষ্য। একদা ঈপ্সিতা এক নারী, যার নাম আমাদের জানা নেই, সেই নারী সম্প্রতি প্রেম-অভীপ্সু এক প্রেমিকের প্রতি অমনযোগিনী; পরিণামে তীব্র অভিমানী সেই প্রেমিকের মরণ-বাসনা এই কবিতাটির পঙক্তিতে পঙক্তিতে ঘনিয়ে তুলেছে এক বিষাদময়তার সকরুণ সুর। শুধু তাই নয়, এই বিষাদকে কখনো ঘনীভূত করেছে প্রেমিকার সাথে প্রাক্তন সেই প্রেমিকের মধুময় মিলনের স্মৃতিচারণ; আবার কখনো-বা আসন্ন বিরহিণীর অবচেতনে মৃত প্রেমিকের 'স্মৃতির অত্যাচার' 'অভিশাপ' কবিতাটিতে যোগ করেছে এক নবতর স্বতন্ত্র মাত্রা :

"স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে,
কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় উঠবে ও-বুক ছমকে
জাগবে হঠাৎ চমকে !
ভাববে বুঝি আমিই এসে
বসনু বুকের কোলটি ঘেঁসে,
ধরতে গিয়ে দেখবে যখন-
শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!
বেদনাতে চোখ বুঁজবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে !"
(অভিশাপ : দোলন-চাঁপা)

কাজী নজরুলের 'অভিশাপ' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে 'অপরিচিতা'-র শেষ স্তবকটি বিস্ময়করভাবে বারবার মনে করিয়ে দেয় 'অভিশাপ' কবিতার অনুষঙ্গ :

"তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণচাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুল বীথির ছায়াখানি মধুর মূর্চ্ছা ভরা।
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন মালা গাঁথা
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা।
সেদিন আমি আসবো নাতো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলাম গান।"[১]

-এই কবিতাটির সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' কবিতাটির ঠিক এক বছর পূর্বে রচিত নজরুলের 'অভিশাপ' কবিতার কতিপয় চরণগুচ্ছ :

১. "আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে-ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কন-
কাঁদবে কুটির অঙ্গন !
শিউলি-ঢাকা মোর সমাধি
পড়বে মনে, উঠবে কাঁদি !

বুকের মালা করবে জ্বালা,
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে !"
(অভিশাপ : দোলন-চাঁপা)
২. "আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা রাত্রি,
থাকবে সবাই- থাকবে না আর এই মরণ-পথের যাত্রী !
আসবে শিশির-রাত্রি।
থাকবে পাশে বন্ধু-স্বজন,
থাকবে রাতে বাহুর বাঁধন,
বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আনবে মনে-
বিষিয়ে ও-বুক উঠবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে !"
(অভিশাপ : দোলন-চাঁপা)

চিত্রকল্পজনিত সাদৃশ্য থাকলেও এই দুই কবিতায় দুই প্রেমিক-হৃদয়ের ভাবগত দূরত্বটুকুও অনস্বীকার্য। প্রথম কবিতায় মধুর বিদায়ী বিষণ্ণতার শৈল্পিক রূপায়ণ সংলক্ষ্য; দ্বিতীয় কবিতায় উন্মোচিত প্রতিশোধ-স্পৃহায় কিছুটা নিষ্ঠুর, তিক্ত অভিমান-ক্ষুব্ধ বিষাদে আচ্ছন্ন একটি প্রেমিক-হৃদয়ের সত্যস্বরূপ। 'অভিশাপ' কবিতার শেষ স্তবকটি কবিতার মূলভাব থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন; এবং সমগ্র কবিতায় যে মৃত্যুর বিষাদময়তা, শিউলি-ঢাকা সমাধির সর্বপ্লাবী রিক্ততা, জোয়ার-জলে তরণী-যাত্রার বেদনাময় স্মৃতিচারণায় ছড়ানো ছিলো যে ব্যথা-সংরাগ, কবিতার শেষ স্তবকটিতে নজরুলের সংবেদনশীল কবিসত্তা সেইসব ভাবের বিরোধিতা করেছে যেন :

"আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হানতো,
সেই আঘাতই যাচবে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত-
আসবে তখন পান্থ।
হয়তো তখন আমার কোলে,
সোহাগ-লোভে পড়বে ঢলে,
আপনি সেদিন সেধে-কেঁদে
চাপবে বুকে বাহু বেঁধে,
চরণ চুমে পূজবে।"
(অভিশাপ : দোলন-চাঁপা)

কবির ভাবনায় অনুতপ্ত নায়িকার কাছে যন্ত্রণাদগ্ধ প্রেমিক নায়কের ফিরে আসা- সেটি কি নেহাত-ই কল্পনায়, নাকি নিছক স্বপ্নে- কবিতাটির সমগ্র জৈব-অবয়বে এর কোনো স্পষ্টতর, সদর্থক উত্তর নেই।

দুই.

জীবনের প্রায়-অন্তিম পর্যায়ে রচিত কাজী নজরুল ইসলামের নারী এবং প্রেমভাবনা বিষয়ক কবিতাগুলোতে লেগেছে সর্বপ্লাবী এক নৈরাশ্য, বিষাদ ও বিষণ্ণতার করুণতম সুর। এর পেছনে সম্ভবত ক্রিয়াশীল এক বিদুষী নারী মিস ফজিলতুন্নেসা; গণিতশাস্ত্রে এম.এস.সি, উচ্চাভিলাসিনী। বিবাহিত নজরুল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে গিয়ে তাঁকে দেখেন প্রথম বার; দ্বিতীয় বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধু ড. কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়িতে ফজিলতুন্নেসাকে দেখেন এবং তাঁর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই নারী নজরুলকে গ্রহণ করতে পারেননি প্রেমিকের মর্যাদায়। ফজিলতুন্নেসা নাম্নী এই নারীর নির্মম প্রত্যাখ্যানের আঘাতে নজরুলের রুদ্র বীণায় বেজেছে যে বেদন-বেহাগ, সেটিই বেশি করে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো হয়তো-বা সংগীত এবং অধ্যাত্ম-জগতের দিকে জীবনের অন্তিম প্রান্তে। আমাদের জানা নেই 'প্রিয়া তোমায় দিয়েছে দাগা, বন্ধু পীড়ন সহ্য কর'[২] -হাফিজের এই পরামর্শ কাজী নজরুল মেনে নিতে পেরেছিলেন কিনা শেষাবধি।

যাই হোক, কাজী নজরুলের জীবন-প্রবাহের শেষ প্রান্তের উল্লেখযোগ্য কবিতাসমূহের মধ্যে 'গোপন-প্রিয়া' একটি প্রাতিস্বিক ও অনবদ্য সৃজন। প্রসঙ্গত আমাদের এই তথ্যটি মনে রাখা প্রয়োজন, জীবনের অন্তিম প্রান্তে রচিত তাঁর নারী এবং প্রেমভাবনামূলক কবিতাসমূহের মধ্যে এককভাবে কেবল ফজিলতুন্নেসাই নন, তাঁর পূর্বোক্ত যন্ত্রণা ও বেদনাদাত্রী নারীরাও আছেন যথারীতি। প্রথম স্ত্রী নার্গিস আসার খানমকে বহুদিন পরে একটি চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন : 'আমার চক্রবাক নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ তুমি? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে।'[৩]

নজরুল ইসলামের নারী এবং প্রেমভাবনা বিষয়ক অন্যান্য কবিতার মতো 'গোপন-প্রিয়া'-তেও লেগেছে এক অতৃপ্ত বাসনায় প্রেমের সংরক্ত উত্তাপ। 'গোপন-প্রিয়া' কবিতাটি যখন রচিত হয়, তখন নজরুল ইসলাম ছিলেন চট্টগ্রামে, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের বাড়িতে। সেখানে সারাদিন হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে কাটিয়ে নজরুল মধ্যরাতে যখন বাড়িতে ফিরতেন, তখন দেখতেন- খাবার ঢাকা দেয়া থাকতো তাঁর টেবিলের উপরে; থাকতো কিছু পান, কেতলি ভরা চা ও টেবিলের ওপর সযত্নে রক্ষিত থাকতো কবিতা লেখার জন্য খাতা-কলম। বেগম শামসুন্নাহারই যে এগুলি গুছিয়ে রাখতেন নজরুলের অলক্ষ্যে, সেটি বলাইবাহুল্য।[৪] কিন্তু 'অলক্ষ্যে' থাকা এই নারী কি নজরুলের সামনে আসেননি কখনো? এ-প্রসঙ্গে শামসুন্নাহারের ভাষ্য : 'চট্টগ্রাম ও কলকাতায় দীর্ঘকাল কবির সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং মমতার সম্পর্ক সত্ত্বেও আমি কখনো তাঁর সামনে বেরুইনি।'[৫] এই কথা যদি সত্য হয়, তবে 'গোপন-প্রিয়া' কবিতায় লেখা এইসব কথামালা একটা বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে নিঃসন্দেহে :

১. "ও-পার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়া খানি।...
নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয়।"
(গোপন-প্রিয়া : সিন্ধু-হিন্দোল)

২. "বন্ধু তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও,
দূরে যত রও, এ-হিয়ায় তত নিকট হও।...
ওগো আমার আড়াল থাকা ওগো স্বপন-চোর,
তুমি আছো আমি আছি এই তো খুশি মোর।"
(গোপন-প্রিয়া : সিন্ধু-হিন্দোল)

৩. "রাত্রে যখন একলা শোব- চাইবে তোমার বুক,

নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ।...
কল্পনাতে আঁকবো তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ
ঘুমে-জাগায় জড়িয়ে রবে, সেই তো চরম সুখ।"
(গোপন-প্রিয়া : সিন্ধু-হিন্দোল)

- 'গোপন-প্রিয়া' কবিতার সমগ্র বক্তব্যে নয়, এইসব টুকরো টুকরো আবেগী উচ্চারণে অন্তরাল-বর্তিনী নারী 'শামসুন্নাহার' কি কিছুটা হলেও প্রতিবিম্বিত? অথচ সমগ্র কবিতাটিতে বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে যেই নারীর প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ, কামনা-বাসনাময় সংরক্ত প্রত্যাশা ধ্বনিত-রণিত হয়েছে যে-নারীকে আবর্তন করে, সেই প্রসঙ্গটি শামসুন্নাহারের সঙ্গে নজরুলের হার্দিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অভাবিত। এই কবিতাটির শেষপ্রান্তে নজরুলের প্রেমজ-বাসনার একটি বিশিষ্ট সুর ধ্বনিত হয়েছে এভাবে :

"যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠবে বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ !
নাই-বা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান।"
(গোপন-প্রিয়া : সিন্ধু-হিন্দোল)

আমাদের মনে রাখতে হবে, কাজী নজরুলের প্রেম এবং নারীভাবনামূলক অধিকাংশ কবিতার সারকথা এই রোম্যান্টিক বাসনার বিস্তার এবং অপ্রাপ্তি-জনিত এক মধুময় যন্ত্রণা; এবং সেই অনিবার্যসূত্রে 'গোপন প্রিয়া' কবিতাটি তাঁর অধিকাংশ প্রেমভানামূলক কবিতারই বক্তব্যবাহী।

তিন.

কাজী নজরুল ইসলামের 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতায় অনুরণিত হয়েছে এক স্বার্থপর নারীর জন্য এক স্বার্থহীন পুরুষের আত্ম-হাহাকার ও হার্দিক যন্ত্রণা। এই কবিতাটির প্রথম দুই পঙক্তির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায় মিস ফজিলতুন্নেছাকে লেখা তাঁর সেই চিঠির বক্তব্য : 'এই বেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। তোমায় এর ঊর্ধ্বে নিয়ে যাব আমি, আমি তোমায় সৃষ্টি করব।'[৬] কাজী নজরুল ইসলামের এই বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় কাব্য-পঙক্তিটি এই মুহূর্তে স্মরণযোগ্য :

"নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন- এ মোর অহঙ্কার।"
(এ মোর অহঙ্কার : জিঞ্জির)

বলাবাহুল্য, প্রেমিকারূপী নারীর প্রেম-প্রত্যাখ্যাত এক পুরুষ এই কবিতার নায়ক। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে কাজী নজরুল ইসলাম হতেই হবে, এমন তথ্য প্রমাণের চেষ্টা অবান্তর। তবে একথাও সত্য যে, এই ধরনের কবিতাগুলি 'Ode' জাতীয় রচনা হলেও হতে পারতো; কিন্তু স্বীয় ব্যক্তি-সত্তাকে মূলত নজরুল এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় রূপদানের চেষ্টাই করেননি কখনো :

"তৃষ্ণা-ফোরাত কুলে কবে 'সাকিনা' সমা
এক লহমার হলে বধু, হয়ে মনোরমা।
মুহূর্তে সেই কালের রেখা
আমার গানে রইল লেখা-

চিরকালের তরে প্রিয় ! মোর সে শুভক্ষণ
মরণ পারে দিল আমায় অনন্ত আজীবন।"
(এ মোর অহঙ্কার : জিঞ্জির)

-এই কবিতাটির মৌল ভাববস্তুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্গত সেই 'অপরিচিতা' কবিতাটির পঞ্চম স্তবকের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতাটির নায়ক যে গান লিখেছে, তা গাইবে অ-মনোযোগিনী নারীর নতুন কোনো প্রেমিক; আর 'অপরিচিতা'-র নায়কের ভাষ্য হলো- তার ভালোবাসার প্রেয়সী গাইবে তারই গান- তবে অন্য কোনো একজন ভালোবাসার প্রেমিক মানুষের জন্য।

নজরুল ইসলামের প্রেমমূলক কবিতায় নারী কোনো স্বর্গীয় আইডিয়ার মধ্যে অবস্থিত নয়; অথবা বলা যেতে পারে- আবদ্ধ থাকেনি কখনোই। তাই সঙ্গতকারণেই নজরুল সেই চির-ঈপ্সিতা নারীকে মাটির পৃথিবীতে সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা অনুভূতিলোকের প্রিয়া রূপে পেতে চান; দেবী রূপে নয়। স্বপ্নময়ী এই নারীকে বাস্তবলোকে পাবার জন্য তাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় সংক্ষোভ-জিজ্ঞাসা :

"চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধুলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে !
ঊর্ধ্বে তোমার- তুমি দেবী,
কি হবে মোর সে রূপ সেবিয়া?
চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুঃখে-অভিমানে নয়ন টলমল !"
(এ মোর অহঙ্কার : জিঞ্জির)

'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের অপর একটি কবিতাতেও এই একই বেদনার্ত জিজ্ঞাসার অনুরণন সংলক্ষ্য :

"তুমি বসি রবে ঊর্ধ্বে মহিমা-শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ-দেবী? কভু মোর তরে
নামিবে না প্রিয়া রূপে ধরার ধূলায়?"[৭]

-এই 'স্বপ্নময়ী' প্রেয়সী কবি নজরুলের যাপিত জীবনে নিষ্ঠুর বাস্তব জগতেরই এক নিষ্ঠুরা নারী; এবং এই নিষ্ঠুর বাস্তবের মৃন্ময়ী সেই নারীকে তিনি সাজাতে চেয়েছেন অপরূপা কল্পময়ী করে কখনো কখনো :

"আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।"
(এ মোর অহঙ্কার : জিঞ্জির)

রূপময়ী এই প্রেয়সীকে একান্ত নিজের করে পাবার সীমানায় ধরা সম্ভব হয়নি বলেই কাজী নজরুলের সৃষ্টিতে এতখানি আবেগ, এতখানি অভিমান, এত রূপময় স্তব আর এতটা অপরূপ বন্দনা :

"নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায় !

তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হলো মগন !
কাজ কি জেনে- কাহার আশায় গাঁথছ ফুল-হার,
আমি তোমার গাঁথছি মালা, এ মোর অহঙ্কার।”
(এ মোর অহঙ্কার : জিঞ্জির)

-এই বেদনাবোধ নজরুলের নারী ও প্রেম বিষয়ক সমস্ত কবিতাকে করে তুলেছে বিষাদ গম্ভীর এবং অশ্রু ভারাতুর। বিশেষ করে, রচনাকালীন সময়ে এসব কবিতায় যতখানি মারাত্মক বেদনার প্রতিক্রিয়া ছিলো, তার চেয়ে বহু-বহু গুণ বেশি হয়ে সেই বেদনা বাজে তাঁর যাপিত জীবনের শেষপ্রান্তে, অসুস্থ হবার পর, নির্বাক আড়ষ্টতার পর। যেন সেই নির্বাক অসুস্থ মানুষটি তাঁর আসন্ন পরিণামের পূর্বাভাস দিচ্ছেন এইসব প্রেম-অতৃপ্ত অশান্ত কাব্য-পঙক্তিতে। এই রক্তাক্ত হার্দিক অনুভূতিমালার স্পষ্ট প্রমাণ- 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' কবিতাটি। এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে কবির আসন্ন ভীষণ নীরবতার, অবসর গ্রহণের ইশারা হয়েছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

চার.

বলাবাহুল্য, 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' কবিতাটিতে এক রহস্যময়ী বেদনাতুর নারীকে আবিষ্কার করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই কবিতাটি সম্পর্কে তিনি তাঁর পরম সুহৃদ এবং অকৃত্রিম বন্ধু অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখেছিলেন : "তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নামটা বদলে 'রহস্যময়ী' করেছি।”[৮] অন্য একটি চিঠিতে তাঁকে লিখলেন :

> “রহস্যময়ী' কবিতাটি তুমি কোথায় পেলে সেদিন? যাক, যে রূপেই পাও না কেন, কেমন লেগেছে ওটা তোমার? এখানে সাহিত্যিক আসরে পড়েছিলাম ওটা; সকলেই ভয়ানক প্রশংসা করেছেন। বড় বড় রথীরা বলেছেন, ঐটিই আমার লেখা শ্রেষ্ঠ Love poem।”[৯]

-এই কবিতাটির যিনি উদ্দীষ্টা নারী, তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক বন্ধু মোতাহার হোসেনের ছিলো নৈমিত্তিক যোগাযোগ। তাই সঙ্গতকারণেই আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে এই রহস্যময়ী নারী আর অন্য কেউ নন- তিনি অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের অত্যন্ত স্নেহ-ধন্যা মিস ফজিলতুন্নেছা। অতএব চিঠিতে লেখা এইসব কথা যে একটু অন্যভাবে ফজিলতুন্নেছাকেই শোনানো, তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক, এই সুদীর্ঘ কবিতাটিতে নজরুল উপলব্ধি করেছেন, যে নারী একদা গোধূলি-ম্লান পরিবেশে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে নিয়েছিলো বরণ করে, হয়তো-বা দীর্ঘ রাত্রির প্রহর গুলোয় অনেক কাছাকাছি ছিলো; কিন্তু নিশি শেষে সেই নারী নিষ্ঠুরার মতো বলে বসেছে একটি মধুর যন্ত্রণার কথা- 'সেই গান গাওয়া পাখি কোয়েল আর কবি'- উভয়েই এই নারীকে জ্বালায়, অকারণে শুধু জ্বালায় :

“পোড়ামুখী আম্রবনচ্ছায়ে
দিবানিশি ডাকে, শুনে কান ঝালাপালা !
জানি না তো কুহু-স্বরে বুকে ধরে জ্বালা।
উহার স্বভাব এই তোমারি মতন
অকারণে গাহে গান, করে জ্বালাতন।
নিশি না পোহাতে বসি বাতায়ন-পাশে
হলুদ চাঁপার ডালে, কেবলি বাতাসে
উহু উহু উহু করি বেদনা জানায় !
বুঝিতে নারিনু আমি পাখি ও তোমায়।”

(তুমি মোরে ভুলিয়াছ : চক্রবাক)

গোধূলি-মদির পরিবেশ ও রাত্রির চন্দ্রদীপ জ্বলা মোহময় আবেষ্টনী কেটে গেলে দিনের তীব্র আলোয় এই নারী হয়তো-বা আর চিনবে না ব্যথাতুর গীতিময় কবিকে :

“হয়তো দিবসে এলে নারিব চিনিতে,
তোমারে করিব হেলা, তব ব্যথা-গীতে
কেবলি পাইবে হাসি সবার সুমুখে,
কাঁদিলে হাসিব আমি সরল কৌতুকে
মুছাব না আঁখি-জল। বলিব সবায়-
‘তুমি শাঙনের মেঘ, যথায় তথায়
কেবলি কাঁদিয়া ফেরো, কাঁদাই স্বভাব!”
(তুমি মোরে ভুলিয়াছ : চক্রবাক)

-এই সরল নাটক (Duplicity)-টুকু বেদনাহত নায়কের পক্ষে ছিলো কেবলমাত্র দুঃসহই নয়, চরম অপমানকরও বুঝি। এই রহস্যময়ী নারীর ব্যবহার যদি নিছকই কবি কল্পনা না হয়, তবে সেটি কাজী নজরুল ইসলামের সংবেদনশীল কবি-হৃদয়ের জন্য নিশ্চিতভাবে গভীর পীড়াদায়ক। গণিতশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির প্রথমা ঐ নারী কি স্কুলের শেষ পরীক্ষা না দেয়া কবি মানুষটির সঙ্গে সকলের সামনে হার্দিক সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করেছিলেন? নাকি রাতের মদির পরিবেশে যেখানে দেহ-মনের সমস্ত আড়াল সরে গিয়েছিলো হাজার দৃষ্টির আলোয়, সেটি কি গোপন করতে চেয়েছিলেন সেই নারী? নাকি মাত্র তিন দিনের স্বল্প পরিচিত মানুষটিকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন? এরূপ অনুমানের প্রথম সূত্র কবিতাটির অন্তর্ময় আবহ; আর অন্যদিকে সুহৃদ মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের চিঠিটি দ্বিতীয় সূত্র হিসেবে বোধহয় সম্ভবত বেশি নির্ভরযোগ্য :

“যে বেদনার সাথীকে কবিতায় কল্পনায় স্বপ্নে খুঁজে ফিরেছি; রূপে রূপে যার স্ফুলিঙ্গ দেখেছি- তাকে পেয়েছিও বুকের বেদনায়, চোখের জলে। কয়েক মুহূর্তের দেখা; তারি মাঝে তার কত বিরক্তি-ভাজন হয়েছি, হয়তো-বা কত অপরাধও করে ফেলেছি। পাওয়ার বেভুল আনন্দে যে আত্মবিস্মৃতি আমার ঘটেছে, তা তার ঘটে নি।... আমার সকল চিন্তা, কল্পনা, হাসি, গান, ঘুম, জাগরণ - সব কিছুতে দিবা-রাত্রি জড়িয়ে আছে ঐ কয়েক মুহূর্তের স্মৃতি। ঐ তিনটি দিন আমার কাছে অনন্ত কালের মতো অক্ষয় হয়ে রইল। তার আঘাত, তার বেদনা, অশ্রু আমার শাশ্বত লোকের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে।... সুন্দর দেবতাও প্রথমে হয়তো দেখা দেন রুদ্র রূপে; সে আঘাত কি সকলে সইতে পারে !”[১০]

-সংবেদনশীল নজরুলও কি পেরেছিলেন সহ্য করতে ঐ নারীর প্রেম-প্রত্যাখ্যাত সুতীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক আঘাত? নাকি ‘ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স’-এর শিকার হতে হয়েছিলো তাঁকেও গণিতশাস্ত্রের বিদুষী, সুশিক্ষিতা ঐ নারীর নির্মম প্রত্যাখ্যানে? কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা নজরুলের আর একটি চিঠিতে সেই ‘কমপ্লেক্স’ রীতিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

“আমার এতদিনে ভারি ইচ্ছে করছে অঙ্ক শিখতে।... যদি আমি বি.এ. টা পাশ করে রাখতাম, তাহলে আমিও দেখিয়ে দিতাম যে - এম.এ. তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একজন কবিও হতে পারে ইচ্ছে করলে। যদি ঢাকায় থাকতাম, তাহলে তোমার কাছে আবার একবার যাদব চক্রবর্তীর Algebra নিয়ে বসে যেতাম - একেবারে $(a+b)^2$ থেকে শুরু করে। সত্যি ভাই মোতিহার, আমায় অঙ্ক শেখাবে? তাহলে

ঢাকায় যেতে রাজী আছি। এমন অঙ্ক শিখিয়ে দিতে পারে না কেউ, যাতে করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম.এ. কেও হারিয়ে দিতে পারি ! এখন কেবলি মনে হচ্ছে - কী ছাই করলাম কবিতা লিখে; তার চেয়ে অঙ্কের প্রফেসর হলে ঢের বেশি লাভবান হতে পারতাম।"[১১]

-এই অতৃপ্তির সুতীব্র অভিমান নিয়ে নিজ মনোভূমে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত নজরুল লেখেন :

"হোক ভুল, হোক মিথ্যা, হোক এ স্বপন,
-এইবার আপনারে শূন্য রিক্ত করি
দিয়া যাব মরণের আগে ! পাত্র ভরি
করে যাব সুন্দরের করে বিষপান।
তোমারে অমর করি করিব প্রয়াণ
মরণের তীর্থ-যাত্রী !...
তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক !
নিশি শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক।...
সত্য হোক প্রিয়া
দীপালি জ্বলিয়াছিল- গিয়াছে নিভিয়া।"
(তুমি মোরে ভুলিয়াছ : চক্রবাক)

পাঁচ.

'মরণের তীর্থ-যাত্রী' কবি কাজী নজরুলের বিষণ্ন কণ্ঠে ঐ একই সুর ধ্বনিত-স্বনিত হলো 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' কবিতাতেও। এখানেও সেই একই কাহিনি; কেবলমাত্র এতে নজরুল যুক্ত করলেন বৈষ্ণবীয় প্রেম-ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যময় অনুভব আর রাবীন্দ্রিক জন্মান্তরীণ প্রেম-প্রসঙ্গ :

১. "দেখিনু চাহিয়া ও মুখের পানে- নিরশ্রু নিষ্ঠুর !
বুকে চেপে কাঁদি, প্রিয় ওগো প্রিয়, কোথা তুমি কত দূর?
এত কাছে তুমি গলা জড়াইয়া
কেন হুহু করে ওঠে তবু হিয়া
কী যেন কী নাই কিসের অভাব এ বুকে ব্যথা-বিধুর !
চোখ ভরা জল, বুক ভরা কথা, কণ্ঠে আসে না সুর।"
(সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে : চক্রবাক)
২. "মোদের মাঝারে শত জনমের শত সে জলধি বহে
বারে-বারে ডুবি, বারে-বারে উঠি জন্ম মৃত্যু দহে !
বারে-বারে মোরা পাষাণ হইয়া আপনারে থাকি ভুলি,
ক্ষণেকের তরে আসে কবে ঝড়, বন্ধন যায় খুলি।"
(সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে : চক্রবাক)

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নবজন্মের ইশারায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বেজে ওঠে বেহালার সুকরুণ সুর :

"মনে পড়ে যায় অভিশাপ-বাণী, উড়ে যায় বুলবুলি,

কেঁদে কও, 'প্রিয় হেথা নয়, হেথা লাগিয়াছে বহু ধূলি।'...
কে জানিত হায় মরণের মাঝে
এমন বিয়ের নহবত্ বাজে !
নব-জীবনের বাসর দুয়ারে কবে 'প্রিয়া' 'বধূ' হবে-
সেই সুখে, প্রিয় সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে।"
(সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে : চক্রবাক)

-এই আসন্ন শীতল কালো মৃত্যুর নীরবতার কথা আছে কাজী নজরুলের অন্যান্য কবিতাতেও :

১. "আমার কণ্ঠ হইবে নীরব নিখিল-কণ্ঠ-মাঝে
শুনিবে আমারি সেই ক্রন্দন, সে গান প্রভাতে সাঁঝে।"[১২]
২. "চলে যাব যবে এই ধরা ছাড়ি অজানা গ্রহের দেশে
রবে শুধু মোর কবিতা ও গান, মোর স্মৃতি যাবে ভেসে।"[১৩]
৩. "সেই চাঁদ উঠেছে গগনে তোমার আমার সন্ধ্যা-তিমির শেষে,
আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে, যেথায় সকল আঁধার মেশে।"[১৪]
৪. "আজ চলে যাই-
এই পৃথিবীরে আর লাগে নাক ভালো।"[১৫]

-বলাবাহুল্য, এই বিষাদ-গম্ভীর ও মৃত্যু-অধিক মরণের ছায়া-ঘেরা দাহন নজরুলের প্রেম ও নারীভাবনা বিষয়ক কবিতাগুলির অনিবার্য পরিণতি; বিষণ্ন, করুণ, অসহ্য, উত্তপ্ত অথচ আকর্ষণীয়।

আমাদের বলতে দ্বিধা নেই, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় নারী এবং প্রেম কবি-প্রাণের নিশ্চিত আশ্রয়, সংবেদনময় চেতনার ভিত্তিভূমি। তাঁর কবিতায় শিল্পীমানসের যে ক্রমবিবর্তন সংলক্ষ্য, সেটি মূলত তাঁর নারী এবং প্রেমভাবনাকে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়েই ক্রমসম্প্রসারিত, সুতীব্র ও তীক্ষ্ণমুখী। চলমান সমকালীন বিশ্ব আর যাপিত জীবনের সারবস্তুকে আত্মস্থ করতে গিয়ে তাঁকে আত্মস্থ করতে হয়েছে নারী এবং প্রেমের অন্তঃসারকে। তাই সঙ্গতকারণেই নজরুলের কবিতামালায় নারী এবং প্রেমের পরিচর্যা নানা নবতর মাত্রায়, বিবিধ কার্যকারণে এবং বিচিত্র করণ-উপকরণ ও অন্তঃকরণে প্রাতিস্বিক, বিশিষ্ট, রূপময় এবং নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় গভীরতলবিহারী।

তথ্যনির্দেশ

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'অপরিচিতা, *পূরবী,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৫ম সং-১৯৬০।
২. ইসলাম, কাজী নজরুল, *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ,* শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, কলকাতা, ১ম সং-১৯৩০, পৃ. ১২১।
৩. তদেব, 'চিঠিপত্র', *নজরুল রচনা সম্ভার,* ৩য় খণ্ড, আবদুল আজীজ আল আমান (সম্পা.), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম সং-১৯৫১, পৃ. ৪৭২।
৪. আমান, আবদুল আজীজ আল, *নজরুল পরিক্রমা,* ১ম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী,কলকাতা, ১ম সং-১৯৪২, পৃ. ৩৫০।
৫. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার, *জ্যৈষ্ঠের ঝড়,* আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১ম সং-১৯৬৯, গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৯।
৬. চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ, *কাজী নজরুল,* এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সং-১৯৫২, গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২১৭।
৭. ইসলাম, কাজী নজরুল, 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', *চক্রবাক,* ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১ম সং-১৯২৯।
৮. তদেব, 'চিঠিপত্র', *নজরুল রচনা সম্ভার,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮।

৯. তদেব, পৃ. ৪৬০।

১০. তদেব, পৃ. ৪৫৫।

১১. তদেব, পৃ. ৪৫৩।

১২. তদেব, 'আড়াল', *চক্রবাক,* পূর্বোক্ত।

১৩. তদেব, 'দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ : ৪', *নজরুলের কবিতা সমগ্র,* কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ৩য় সং-২০১৯।

১৪. তদেব, 'সুখ বিলাসিনী পারাবত তুমি', *শেষ সওগাত,* ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সং-১৯৫৮।

১৫. তদেব, 'আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা', *নজরুল রচনা সম্ভার,* পূর্বোক্ত, গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২৬৮।

মূলগ্রন্থ

আমান, আবদুল আজীজ আল, (সম্পা.), *নজরুল রচনা সম্ভার,* ৩য় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম সং-১৯৫১।

ইসলাম, কাজী নজরুল, *নজরুলের কবিতা সমগ্র,* কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ৩য় সং-২০১৯।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আমান, আবদুল আজীজ আল, *নজরুল পরিক্রমা,* ১ম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী,কলকাতা, ১ম সং-১৯৪২।

খান, আজহার উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল,* ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১ম সং-১৯৬৯।

গুপ্ত, সুশীল কুমার, *নজরুল-চরিত মানস,* ভারতী লাইব্রেরি, কলকাতা, ১ম সং-১৯৬০।

ঘোষ, জ্যোতির্ময়, *সত্য যে কঠিন,* গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম সং-১৯৫৬।

চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ, *কাজী নজরুল,* এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সং-১৯৫২।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'অপরিচিতা, *পূরবী,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৫ম সং-১৯৬০।

সিংহরায়, জীবেন্দ্র, *কল্লোলের কাল,* কথাশিল্প, কলকাতা, ১ম সং-১৯৫৭।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার, *জ্যৈষ্ঠের ঝড়,* আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১ম সং-১৯৬৯।

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উনাহত-সিংড়া কলেজ, বগুড়া, বাংলাদেশ

আসামের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

ড. প্রদীপকুমার পাত্র

সারসংক্ষেপ –

বাংলা কবিতার অগ্রগতি ও বিকাশে আসামের কবিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আসামে রসময় দাস, অশোকবিজয় রাহা, জগদীশ ভট্টাচার্য, পরমানন্দ সরস্বতী, সুধীর সেন, অনুরূপা বিশ্বাস, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, ছবি গুপ্তা, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, শক্তিধর চৌধুরী, মনোজিৎ দাস, অতুলরঞ্জন দেব, অমলেন্দু গুহ, ভরত ঘোষ, দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, পদ্মাদেবী, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, করুণাসিন্ধু দে প্রমুখ কবি কবিতাচর্চা করেছেন। তাঁদের কবিতায় দেশ-কাল-সমাজের কথা, চিরায়ত উপলব্ধির (প্রেম, প্রকৃতি, নিসর্গ) প্রসঙ্গে, লোকসংস্কৃতির নানা দিকের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাঁদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছেন। আসামের কবিরা উত্তাল সময়ের স্বরক্ষেপণে, বাঙালির আত্মপ্রত্যয় জাগরণে, সংবেদনশীল সত্তার প্রকাশে, চিরায়ত উপলব্ধি পরিবেশনে, আঙ্গিক নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও বরণ করেছেন। রসময় দাস, অশোকবিজয় রাহা, জগদীশ ভট্টাচার্য, সুধীর সেন প্রমুখ কবি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম, প্রকৃতির দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণা, আত্মাপ্রত্যয় জাগরণে, সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রেরণাশক্তি হিসাবে, কলানুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

সূচক শব্দ –

অগ্রগতি, চিরায়ত উপলব্ধি, আত্মপ্রত্যয়, উত্তরণ, সংবেদনশীল সত্তা, প্রেরণাশক্তি, কলানুষঙ্গ।

মূল প্রবন্ধ-

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কবিতার পাশাপাশি বহির্বঙ্গের বাংলা কবিতাচর্চার দিকটিও সমভাবে আলোচনার দাবি রাখে। বহির্বঙ্গের বাংলা কবিতার বড়ো স্থান জুড়ে রয়েছে— আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, দিল্লিসহ প্রাদেশিক ভারতীয় ভূখণ্ডে বাংলায় লেখা কবিতা। আসামে রসময় দাস(১৯০৪ খ্রি. – ১৯৭২ খ্রি.), অশোকবিজয় রাহা(১৯১০ খ্রি. – ১৯৯০ খ্রি.), জগদীশ ভট্টাচার্য(১৯১২ খ্রি. –), পরমানন্দ সরস্বতী(১৯১৫ খ্রি. – ১৯৮০ খ্রি.), সুধীর সেন(১৯১৬ খ্রি. – ১৯৯৩ খ্রি.), অনুরূপা বিশ্বাস(১৯৩২ খ্রি. –), শক্তিপদ ব্রহ্মচারী(১৯৩৭ খ্রি. – ২০০৫ খ্রি.), ছবি গুপ্তা(১৯৩৮ খ্রি. –), বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য(১৯৩৯ খ্রি. –) প্রমুখ কবি কবিতাচর্চা করেছেন। এঁদের পাশাপাশি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, শক্তিধর চৌধুরী, মনোজিৎ দাস, অতুলরঞ্জন দেব, অমলেন্দু গুহ, ভরত ঘোষ, দেবরঞ্জন ধর, ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, বিমল চৌধুরী, শান্তনু ঘোষ, দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, পদ্মাদেবী, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, করুণাসিন্ধু দে প্রমুখ কবিও আসামে বাংলা কবিতা রচনা করেছেন। আসামের বাংলা কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে ননীগোপাল দেবনাথ ‘ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা’ সংকলনগ্রন্থের ‘সংকলন সম্পর্কে কিছু কথা’ অংশে লিখেছেন— “যুগযন্ত্রণার ছবি যাঁদের মননকে বিদ্ধ করেছিল, কিন্তু হৃদয়কে স্নাত করে রেখেছিল গ্রামীণ জীবনের সাহজিকতা, সরলতা আর অবিনাশী সত্যের কোমল স্পর্শ। এঁরা যেন চৈত্রের দাবদাহে দগ্ধ হয়েও চাতক পাখির মতো খুঁজে বেড়িয়েছেন সজল মেঘধারার। ফলস্বরূপ তাঁদের কবিতার ভাব, ভাষা ও প্রকাশরীতি আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছিল।”[১] দেশ-কাল-সমাজের কথা প্রকাশে, চিরায়ত উপলব্ধির প্রসঙ্গে, যুগযন্ত্রণা থেকে উত্তরণের তাগিদে, সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্-এর প্রতিষ্ঠা করতে আসামের কবিরা প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গ্রহণ করেছেন।

বরাক উপত্যকার কাব্যচর্চার ইতিহাসে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন কবি রসময় দাস। একসময় 'শিক্ষক', 'জনশক্তি', 'বলাকা'সহ কলকাতার 'দেশ', 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী' প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। যদিও কালের প্রেক্ষাপটে তিনি যেন বিস্মৃতির অন্ধকারে নির্বাসিত হয়েছেন। কবি রসময় দাসের 'মর্মবাণী'(১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'অন্তঃশীলা'(১৩৪৯ বঙ্গাব্দ), 'সোনার হরিণ'(১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) কাব্যগুলি পাঠ করলেই তাঁর কাব্য-কবিতার স্বরূপ অনুধাবন করা যায়।

রসময় দাসের 'মর্মবাণী' কাব্যের মূলসুর হল— প্রেম পিপাসা, প্রেম প্রতিমার অস্তিত্ব, প্রেমের মিথুন মূর্তিটি পরিবেশন, গ্রাম-প্রকৃতির সৌন্দর্য, কবির স্মৃতিচারণা, বিষাদ ও হতাশাবোধ। 'অন্তঃশীলা' কাব্যের অন্যতম প্রধান বিষয় হল— প্রেম। কবি ভাষা, ছন্দ, অলংকারের সাহায্যে প্রকৃতির মধ্যে মানস প্রতিমার ছবি এঁকেছেন। এই কাব্যের 'শিশির' কবিতায় প্রকৃতির আঙিনায় প্রেমের চিরন্তনরূপ প্রকাশ পেয়েছে। ঊষাকে দেখে আকৃষ্ট হয় শিশির। বসন্তের সবুজ ঘাসে মিলিত হয়, সূর্যের কিরণে উজ্জ্বল্যতার প্রকাশ এবং তাপ বৃদ্ধির ফলে তার অবলুপ্তি। এভাবে প্রকৃতিই রচনা করে মিলন সংগীত এবং বিরহের বেদনাভার—

"বসন্তের নব দূর্বাদলে
রজনীর নয়নের নীর
রবি-করে করে ঝলমল
একবিন্দু রজত শিশির"

প্রকৃতির এই সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। 'সোনার তরী'(১৮৯৩ খ্রি.) কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় লিখেছেন—

"হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা – পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে —
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেঘলা-পরা তব কটিদেশ ;"

প্রেম, প্রকৃতি-নিসর্গের প্রকাশে রসময় দাস রবীন্দ্রানুসারী। যদিও উভয় কবির মধ্যে প্রকরণগত পার্থক্য রয়েছে।

আসামের বাংলা কবিতার জগতে অশোকবিজয় রাহা স্মরণীয় নাম। তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে— 'ডিহাং নদীর বাঁকে'(১৯৪১ খ্রি.), 'রুদ্র বসন্ত'(১৯৪১ খ্রি.), 'ভানুমতীর মাঠ'(১৯৪২ খ্রি.), 'জল ডম্বরু পাহাড়'(১৯৪৫ খ্রি.), 'রক্তসন্ধ্যা'(১৯৪৫ খ্রি.), 'শেষ চূড়া'(১৯৪৫ খ্রি.), 'উড়ো চিঠির ঝাঁক'(১৯৫১ খ্রি.), 'যেথা এই চৈত্রের শালবন'(১৯৬১ খ্রি.), 'ঘন্টা বাজে পর্দা সরে যায়'(১৯৮১ খ্রি.), 'পৌষফসল'(১৯৮১ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অশোকবিজয় রাহার কাব্যবিশ্বে নদী, পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, আকাশ, সমুদ্র ইত্যাদির প্রাধান্য বেশি। লোকসংস্কৃতির নানা দিক তাঁর কবিতায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। উনিশ বছর বয়সী কবি অশোকবিজয় রাহার কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০ পৌষ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এক পত্রে লেখেন— "তোমার কবিতাগুলিকে অকুণ্ঠিত মনে ভালো বলিতে পারিলাম। ইহার মধ্যে কেবল লেখার নৈপুণ্য নহে কবিত্বের পরিচয় পাইলাম।"[২] এরপর অশোকবিজয় রাহা কবিতা রচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেন।

অশোকবিজয় রাহা কবিতায় প্রকৃতির অসাধারণ চিত্রকল্প উপস্থাপন করেছেন। তাঁর 'রুদ্র বসন্ত' কাব্যের 'বর্ষা' কবিতায় প্রকৃতির ছবি রয়েছে—

"আকাশে মেঘের ক্লেদ, কাদা – জলে পৃথিবী - মহিষ,
মাঝখানে ভেসে আছে পিঠ
পিচ্ছিল পিঠের গায়ে ঝুলে আছে শেওলার চাপ,

গোছা – গোছা জোঁক।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সোনার তরী’ কাব্যের ‘বর্ষাযাপন’ কবিতায় বর্ষার ছবি এঁকেছেন—

“দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,
বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো,
সমস্ত আকাশ জোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া
চিমমিকে বিদ্যুতের আলো।”

প্রকৃতির বর্ণনায় উভয় কবির মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

আসামের আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে জগদীশ ভট্টাচার্য হলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৩৪৬ – ‘৪৭ বঙ্গাব্দে ‘বৈজয়ন্তী’ নামক মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার সূত্র ধরে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য ঘটে। তাঁর কাব্য ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে— ‘অষ্টাদশী’(১৯৩৩ খ্রি.), ‘ক্ষণশাশ্বতী’(১৯৪১ খ্রি.), ‘ব্ল্যাকবোর্ড’(১৯৪১ খ্রি.), ‘প্রেমকে মৃত্যুকে’(শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৫), ‘একটি আলোর পাখি’(শ্রাবণ ১৩৭৯), ‘লোকায়ত’(শ্রীপঞ্চমী ১৩৮১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর ‘অষ্টাদশী’ কাব্যের ‘প্রথমা’ কবিতায় প্রেমাসক্তির অপূর্ব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে—

“আমার প্রিয়ার তনু অষ্টাদশ বৎসরের দান,
গর্বিত স্রষ্টার চোখে প্রিয়া মোর স্বপ্নিত বিস্ময়,
কৌতূহলী পুরুষের মনোমাঝে মোহ স্বপ্নময়
অজ্ঞাত রহস্য নিয়ে লীলাহাস্যে সদাস্পন্দমান।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘মানসী’(১৮৯০ খ্রি.) কাব্যের ‘অনন্ত প্রেম’ কবিতায় সুন্দর প্রেমের ছবি এঁকেছেন—

“আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে, মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।।”

প্রেমের ছবি অঙ্কনে জগদীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও প্রেমের গভীরতা প্রকাশে উভয় কবির মধ্যে বেশ ফারাক লক্ষ করা যায়।

বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতা ইতিহাসে সুধীর সেন স্মরণীয় নাম। তিনি ১৯৫৬ সালে ২৪টি বাংলা কবিতা নিয়ে প্রথম কাব্য ‘এক ফালি ঘাস’ প্রকাশ করেন এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ৪৬টি কবিতা নিয়ে তাঁর ‘দর্পণে তিনটি মুখ’ কাব্যটি প্রকাশিত হয়। সুধীর সেন রোমান্টিক ভাবধারার কবি। নারীর সৌন্দর্য বা যৌবনের প্রেম, প্রকৃতির বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর সংগত রোমান্টিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘এক ফালি ঘাস’ কাব্যের ‘শ্রীলতা ঘুমায়’ কবিতায় কবি লিখেছেন—

“শয্যাতলে সহচরী শ্রীলতা ঘুমায়ে আছে
যুগ্মবাহু মৃণাল কোমল।।”

তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয় হল প্রেম, প্রেমহীনতা ও নিসর্গ চেতনা। চিরায়ত উপলব্ধি প্রকাশে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার মিল রয়েছে। তাঁর ‘প্রভাতসংগীত’, ‘মানসী’, ‘সোনার তরী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি’ প্রভৃতি কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় রোমান্টিক চিন্তা-চেতনা লক্ষ করা যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর আসামের কাব্যচর্চার জগতে একজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। তিনি ১৯৬৩ সালে ‘অতন্দ্র’ কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি আসামের কবিতার জগতে একটি যুগান্তকারী পর্বের সূচনা করে।

তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে— 'সময় শরীর হৃদয়'(১৯৭১ খ্রি.), 'এই পথে অন্তরা'(১৯৭৬ খ্রি.), 'অনন্ত ভাসানে'(১৯৮৪ খ্রি.), 'কাঠের নৌকা'(১৯৯৪ খ্রি.), 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'(২০০৪ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম কাব্য 'সময় শরীর হৃদয়'— "সমকালীন পটভূমিকায় রচিত, ব্যক্তি মানসের সময় শরীর হৃদয়ে সম্পৃক্ত, নিমগ্ন, যন্ত্রণাক্ত, আসক্ত তথাপি উদাসীন"[৩]। তাঁর কবিতায় নারী ও প্রকৃতি উভয়েই লক্ষ করা যায়। কবি কখনও প্রেমিক আবার কখনও প্রতিবাদী। কখনও গৃহী কখনও সন্ন্যাসী। তবে সব কিছুর মাঝে বিষাদময়তাই তাঁর কবিতার মূলসুর হিসাবে উঠে এসেছে। যন্ত্রণাময় সময়ের কালবেলায় দাঁড়িয়ে কবি কবিতার কায়া নির্মাণ করেছেন। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ নানাভাবে উঠে এসেছে। 'সময় শরীর হৃদয়' কাব্যের 'সাহিত্য সভায় অপঠিত ভাষণ' কবিতায় কর্কশ সময়ের কথা বলতে গিয়ে কবি রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ এনেছেন—

"এই প্রগাঢ় ঋতুর সাহিত্য-বাসরে
ধূপকাঠির জ্বালানো গন্ধ, রবীন্দ্রনাথের ছবি,
মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত বিদগ্ধ মণ্ডলী
আমার বলতে না–পারার অক্ষমতা ক্ষমা করবেন"।

পূর্বোক্ত কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় কালের নিয়ম মেনে ইতিহাসের এগিয়ে চলার দিকটি প্রকাশ করেছেন। কবি জানিয়েছেন সময় অতিক্রান্ত হলেও বাঙালির শুভ চৈতন্য রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল স্মরণ করবে—

"ইতিহাস দ্রুতগতি, বিশ্বকবি তুমিও তো বিস্তৃত সুদূর
নিত্য যারা মুখোমুখি আমরা বাঙালি আর আমাদের
রবীন্দ্র ঠাকুর।"

কবির স্থির বিশ্বাস কালের আবর্তনে পৃথিবী যতই এগিয়ে চলুক — বাঙালি সত্তা কোনোদিন রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারবে না। বাঙালির রক্তে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উক্ত কাব্যের 'ওঁ মধু' কবিতায় কবি 'রবীন্দ্রগীতি'র প্রসঙ্গ এনেছেন।

সত্তর দশকের উত্তাল রাজনীতি, ঘুণধরা সমাজ, অস্তিত্বের সংকট, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি তাঁর 'এই পথে অন্তরা' কাব্যের অন্যতম বিষয়। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর জীবন ও কবিতা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচক বিশ্বতোষ চৌধুরী 'কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কাব্যসমীক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন— "কবি শক্তিপদ জীবনচর্চা ও জীবনচর্যায় নির্লিপ্ত উদাসীন, নিরাসক্ত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। তাই তাঁর কবিতাও স্মৃতিকাতরতা, ঐতিহ্যপ্রিয়তা, বিষাদময়তা এবং চিত্রকল্পের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আধুনিকতার তারসপ্তকে বাঁধা।"[৪] তাই তাঁর কবিতায় ঈশ্বর নয়, মানুষ আরাধ্য। অস্তিত্বের সংকট, তার থেকে উত্তরণের পথ অন্বেষণ, জীবনকে নিষ্কণ্টক ভাবে চালনা করা প্রভৃতি কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছেন। উক্ত কাব্যের 'মনসাপুজোর পাঁঠা' কবিতায় কবি নিজের জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্র জীবনের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন—

"মনসা পুজোর পাঁঠা ঘাস-পাতা চিবোয় রোদ্দুরে
জানেন রবীন্দ্রবাবু, আমাদেরও ছেলেবেলা ছিল
সামান্য জীবনস্মৃতি, জীবন না ঘুণপোকা, খায় কুরে কুরে"।

'এই দৃশ্যে নদী নয়' কবিতায় কবি রাবীন্দ্রিক নায়িকার প্রসঙ্গ এনেছেন—

"রাবীন্দ্রিক নায়িকার মতো
এসেছিলে চৈত্রের উৎসবে"।

পূর্বোক্ত কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভক্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন—

"সমস্ত শব্দকে আমি তোমার উদ্দেশ্যে ধাবমান
করেও দেখেছি তুমি তারো চেয়ে বড়ো

বাক-বন্ধনের কোনো অহংকার তোমাকে বাঁধে না
মূঢ় পদধ্বনি বাজে চরণের ধ্বনিত নূপুরে, ...”

কবি ‘কর্তব্য-বিমূঢ়’ হয়ে চিৎকার করে রবীন্দ্র স্তোত্র উচ্চারণ করেছেন। তবে কবি উপলব্ধি করেছেন ‘যত পৌরোহিত্য চাই কর ভোজ্যের কাঙাল’ তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে সীমানা দিয়ে বাঁধা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ অসীম, অনন্ত।

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী আধুনিক প্রগতিবাদী, রোমান্টিক ও প্রতিবাদী, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। তাঁর কবিতায় মানুষই আরাধ্য। ‘কাঠের নৌকা’ কাব্যের ‘হে কবিতা, ক্ষমা করো’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

“এই বাঁক ঘুরে গেলেই রবি-বিষ্ণুদের যে রমরমা বাজার
তার মনোহারী দোকানে নানা রঙের রবীন্দ্রনাথের মতো রঞ্জক সাবান”।

‘দ্বন্দ্ব অহর্নিশ’ কাব্যের ‘রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-মানিক শ্রদ্ধাস্পদেষু’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণ মানুষ রূপে উপস্থাপন করেছেন। বয়স বাড়লে চোখে ছানি পড়ে, দাঁতের নানা সমস্যা হয়। বিদ্যুতের বাতি নিভে গেলে লণ্ঠন সকল মানুষই জ্বেলে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার ব্যতিক্রম নন। এভাবে কবি উক্ত কবিতায় রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ এনেছেন। উক্ত কাব্যের ‘ত্রিস্রোতা’ কবিতায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এনেছেন। বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের অবাধ প্রবেশ। তাঁকে বাদ দিয়ে সাহিত্যচর্চা করা সম্ভব নয়—

“যতই ছাড়াতে যাই আষ্টেপৃষ্ঠে তত বাঁধে জট;
এ-কেমন মায়া তব গুল্মকুলে হে প্রবৃদ্ধ বট।”

কবি জানিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য সাহিত্যিকেরা গুল্ম হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বটবৃক্ষ — যার ছায়ায় সকলে স্বস্তি পায়। ‘আদিদাস’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা এনেছেন। ‘অনামিকা অথবা যে-কোনো নামে’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়ি জোড়াসাঁকোর প্রসঙ্গ রয়েছে।

কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর ‘অগ্রন্থিত কবিতা’র নানা কবিতায় রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়। ‘আত্মজীবনী বিকল্পে’ কবিতায় কবি ১১ মাত্রার তানপ্রধান ছন্দের পর্ব রচনার চেষ্টা করেছেন, তবে পারেননি এবং ‘রবীন্দ্রনাথও শেষপর্যন্ত আসফল’ হয়েছেন। আমরা জানি, তানপ্রধান ছন্দের পূর্ণপর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়। ১১ মাত্রার হলে তাকে একাবলী বলা হয়। যদিও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন ‘ছন্দ-জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে জানিয়েছেন— “শুধু অক্ষর গণনার উপরে ভিত্তি করে কোনো ছন্দ রচিত হতে পারে না। কারণ ছন্দের মূলতত্ত্ব অক্ষর নয়, ধ্বনি। ... অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলে একটি ধ্বনিতত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বটি এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ শেষাংশ মাত্রাবৃত্তধর্মী ও অনেকাংশ স্বরবৃত্তধর্মী। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের একটি যৌগিক ছন্দ।”[৫] অক্ষরগণনাকে প্রাবন্ধিক বেশি গুরুত্ব না দিলেও ছন্দ রচনায় অক্ষরের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। ১১ মাত্রার তানপ্রধান ছন্দ রচনা করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিও পারলেন না তা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছে—

“মহর্ষি দেবেন্দ্রের চতুর্দশ সন্তান রবীন্দ্রনাথ
কেন যে এগারো মাত্রার পর্ব রচনা করতে পারলেন না”।

‘এ আমার ঘর-বাড়ি’ কবিতায় কবি রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এনেছেন—

“রবীন্দ্রনাথকে খুঁটি ধরে, তাঁর আগে-পরে
অনেক কবির কবিতার লাইন পিঁপড়ের মতো মগজে হাঁটছে”।

‘হাওয়া কেবলি তড়পাচ্ছে’ কবিতায় রবিঠাকুরের কথা রয়েছে—

“ ঘুমের মতো আকাশ
মেঘের মতো ঘুম

কখনো ঘোড়া, কখনো কলার বাগান
কখনো দাড়ি - সমেত রবিঠাকুর।"

উত্তাল পরিবেশ থেকে প্রেরণাশক্তি হিসেবে বাঙালির মনে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করতে, সমকালের স্বর প্রকাশে, তা থেকে উত্তরণের পথ এবং কলানুষঙ্গ অনুধাবনের জন্য কবিরা কবিতায় নানা ভাবে রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ এনেছেন। কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী সময়ের কর্কশরূপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আলোকবর্তিকারূপে রবীন্দ্র শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর 'সি-অফ' কবিতায় সেই কথা প্রকাশ পেয়েছে—

"রেডিয়ো-তে রবীন্দ্র-সংগীত
শুনতে পেয়ে শান্ত হল মন-টা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শ্যামলী' কাব্যের 'হঠাৎ - দেখা' কবিতায় লিখেছেন—

"একটুকু রইলেম চুপ করে ;
তারপর বললেন,
'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।' "

কবি জানিয়েছেন সময় অনুযায়ী প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকাশ ঘটে। যখন যা দরকার তখন তার প্রকাশ ঘটে। দিনের বেলায় সূর্য-উজ্জ্বল আবহাওয়ায় আমরা তারাদের দেখতে পাই না। তবে যখনই সূর্য অস্ত যায় তখন তারার প্রকাশ ঘটে। উদাহরণ হিসেবে কবি প্রকৃতির অনুষঙ্গ আনলেও এর অভ্যন্তরের অর্থ সমাজজীবন। কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী রাবীন্দ্রিক বক্তব্য 'যাও পাখি, বলো তারে' কবিতায় এনেছেন—

"আসলে কিছুই মোছা যায় না
সব তারাই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর অন্ধকারে
মহাকবি বড় সুন্দর করে বলেছেন।"

এভাবে আলোচনা করে দেখা যায় যে, আসামের কবিরা উত্তাল সময়ের স্বরক্ষেপণে, বাঙালির আত্মপ্রত্যয় জাগরণে, সংবেদনশীল সত্তার প্রকাশে, চিরায়ত উপলব্ধি (প্রেম, প্রকৃতি, নিসর্গ) পরিবেশনে, আঙ্গিক নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও বরণ করেছেন। রসময় দাস, অশোকবিজয় রাহা, জগদীশ ভট্টাচার্য, সুধীর সেন প্রমুখ কবি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম, প্রকৃতির দিকটি থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বড়ো জায়গা জুড়ে আছেন। তিনি ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণা, আত্মপ্রত্যয় জাগরণে, সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রেরণাশক্তি হিসাবে, কলানুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. দেবনাথ, ননীগোপাল(সম্পাদিত), ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১১, পৃ. ৬

২. দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত সূত্র – ১, পৃ. ৪১

৩. ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ, কবিতা সংগ্রহ, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগরতলা বইমেলা ২০১৯, পৃ. ২৫১

৪. প্রাগুক্ত সূত্র – ১, পৃ. ১২৯

৫. সেন, প্রবোধচন্দ্র, ছন্দ-জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১১১–১১২

গ্রন্থপঞ্জি

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৫৬
২. ব্রহ্মচারী, শক্তিপদ, কবিতা সংগ্রহ, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগরতলা বইমেলা ২০১৯
৩. দেবনাথ, ননীগোপাল (সম্পাদিত), ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১১
৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র, নূতন ছন্দ পরিক্রমা, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬
৫. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র ও অন্যান্য, সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চবিংশতিতম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮
৬. ঘোষ, ড. মঞ্জুলী(সম্পাদিত), আজকের বাংলা কবিতা : বঙ্গ ও বহির্বঙ্গ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৩

....

বাংলা বিভাগ, পি. আর. এম. এস. মহাবিদ্যালয়, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সুনীল মাজির কবিতায় অদৃশ্য আলোর ছায়া

ড. সমীর প্রসাদ

বাংলা কবিতাচর্চার ধারায় এক-একটি দশক নিয়ে আসে সৃষ্টির নতুন ঢেউ, উঠে আসেন প্রতিশ্রুতিমান এক-একজন কবি, যাঁদের কলমের জোরে বাংলা কবিতার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আশির দশক সেইদিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়-পর্ব, আর এই দশকেই বাংলা কবিতায় আবির্ভূত হলেন কবি সুনীল মাজি। যদিও তাঁর সলতে পাকানো পর্বের শুরু অনেক আগেই, অর্থাৎ কৈশোরেই, কিন্তু পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি এবং গ্রন্থপ্রকাশের প্রেক্ষিতে তাঁর কবিসত্তার উন্মেষকাল আশির দশক। পেশাগত সূত্রে যৌবনে তিনি ছিলেন বায়ুসেনা, কিন্তু ভেতরে সর্বদাই সক্রিয় ছিল তাঁর সৃজনশীল কবিসত্তা। একসময় আকাশপথ থেকে নেমে এলেন মাটিতে, শিকড়ের কাছে, নদী ও ফসলের বীজক্ষেতে, নদীকেন্দ্রিক সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্যে। শুরু হলো সাদা পৃষ্ঠার বুকে অক্ষর-শস্য সৃজনের সাধনা। ফিরে এলেন শিক্ষকতার পেশায়। ক্রমশ নিজস্ব শব্দসাধনা ও ঘনিষ্ঠ পরিশ্রমে গড়ে তুললেন নিজস্বতা চিহ্নিত সৃজন পৃথিবী। সুনীল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন স্বতন্ত্র কাব্যদর্শন ও ভিন্ন অভিমুখের ব্যতিক্রমী কবি হিসেবে।

যে কোনও কবির জন্মস্থান ও বেড়ে ওঠার পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁর ভাবনার জগৎটি নির্মাণ করে দেয়, সৃষ্টির মূল সুরকে বেঁধে দেয়। সুনীলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কৃষি-জীবনের আখ্যান, বীজতলা আর দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর জলধারা তাঁর জীবন ও কাব্যের ধ্রুবপদটিকেই শুধু নয়, বেঁধে দেয় কবিতা-যাত্রার দীর্ঘ পথটিকেও, পাকাপোক্তভাবেই। সুনীল লোকজীবনের সেই কবি, যাঁর কবিতার ভূগোলে জায়গা করে নেয় লোকায়ত জীবনের ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ-দৈববিশ্বাস, সর্বোপরি আলোকময় জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। জীবন তমসাবৃত, যে জীবন থেকে উত্তরণের আলোর তৃষ্ণা তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি অগ্নি ও আলোর সাধক। কবিতারচনা তাঁর কাছে সুর অর্থাৎ দেবতারও সাধনা।

২

কবি-জীবনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অসংখ্য কবিতা-গদ্য এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সুনীল বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছে নিজেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন একজন ঐতিহ্য-সচেতন মানবিক প্রত্যয়ের কবি হিসেবে। রামায়ণ-মহাভারত- গীতা-বৈষ্ণবদর্শন ও লালনের বাউল গানের তত্ত্বের নির্যাসে গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও দর্শনের জগৎ। মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কবি সুনীলের কবিতার কেন্দ্রমূলে থাকে সাম্যবাদী দর্শন। তিনি একদিকে যেমন গ্রামজীবনের অতীত ঐতিহ্য-সচেতন অন্যদিকে তেমনি ছুঁয়ে থাকেন সমসময় ও মহাসময়কে। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর যৌথ কাব্যগ্রন্থ ‘লাশসাঁতার’ (২০১৮)। সাধারণত বুঝতে অসুবিধা হয় না এ কবিতার বইটির রচনা ও প্রকাশ এক অস্থির রক্তঝরা সময়ের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু ঠিক তাও না, বইটির প্রত্যেকটি কবিতার মর্মগত সুরে বেজে উঠেছে শাশ্বত সময়ের ও জীবনের অন্তর্গত অভিজ্ঞান। সুনীল তাঁর বর্তমান কাব্যগ্রন্থের দুই পঙ্‌ক্তির সূত্র কবিতায় লিখছেন— *কেবল বৃষ্টি নয়, শিশিরও স্নাত করে স্নিগ্ধ করে / ঘাস-পাতা-মাটি* এবং গ্রন্থের ব্যাক কভারের ব্লার্বের সংক্ষিপ্ততম গদ্যটিতে লিখেছেন— *একটিই জীবন। কখনো অতীত। কখনো বর্তমান। ক্রমশ ঢেউ ভাঙছে। অব্যাহত ভূমিক্ষয়। তবু সৃষ্টির অনন্ত প্রয়াস। স্বর পেয়ে যাচ্ছে ভেসে আসা মৃতদেহ। জলকে প্রণাম। লাশ সাঁতার আজ তোমার আমার নাম।* এই দুটি উচ্চারণ সূত্রে স্পষ্ট হয়ে যায় কবি সুনীলের বর্তমান কাব্যগ্রন্থের নামকরণের দ্ব্যর্থক তাৎপর্য। কবিতাগুলির মূল বক্তব্যের কেন্দ্রে আছে নশ্বর মানবজীবন, যে জীবন শ্রম-ঘাম-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, অসংখ্য মৃত্যুর ছোবলে বিষজর্জর, একটি জীবন্ত লাশস্বরূপ, সেই জীবনের গভীরে তবুও অব্যাহত অনন্ত সৃজন-প্রয়াস। যে জীবন স্বপ্ন দেখে আলোর, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবহমান জল সমার্থক সেই জীবনরূপ লাশ ভেসে চলেছে অনন্ত সময়-

সমুদ্রের ঢেউয়ে, কবি সুনীল জীবন ও মৃত্যুকে এভাবেই একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ রূপে দেখেছেন, মেলে ধরতে চেয়েছেন মানুষরূপী জীবন্ত লাশের তীর ও নোঙরহীন ভেসে চলা জীবনদর্শনের এই যে নেতিবাচকতা ও ইতিবাচকতার দ্বন্দ্ব বা বিরোধাভাস, এর ভেতর-রহস্যে নিয়ে যান কবি, তুলে ধরেন সম্পূর্ণ চেনা অথচ একেবারেই অচেনা জীবন। লাশসাঁতার অসাধারণ এক নতুন শব্দবন্ধ, যার অভিঘাত অতি সাম্প্রতিক সময়কালকেও স্পর্শ করে, দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেয় গ্লোবাল প্যানডেমিক-এর মৃত্যু-মিছিলের বাস্তবে, যখন গঙ্গার জলধারায় মৃত লাশ ভেসে যায়। সুনীলের কবিতায় অবশ্য এই নিষ্ঠুর সময়ের স্বর উঠে আসেনি। কিন্তু গ্রন্থের নামকরণে সময়-সচেতন পাঠকমাত্রেই এমনটা ভাবতেই পারেন। ফিরে আসি 'লাশ-সাঁতার'-এর অন্তর্গত চোরাস্রোতে, যা কাল-কালীদহে জন্ম-মৃত্যুর দংশনক্ষত জীবনের অন্তর্গত ভাষ্যে। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'নিষিক্ত কথা'। নিষিক্ত অর্থে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত। অন্যদিকে শব্দটির আর একটি অর্থ ফুলের পরাগ সংযুক্ত হয়েছে এমন অর্থাৎ ফার্টিলাইজড নিষেক—দুটি অর্থেই হতে পারে। সুনীল লিখেছেন—

বুকেই জন্ম তোমার। আমার অন্ধকার পাথরের বুকে।
বুকের গভীর স্রোতে ভাসা ফুল, অক্ষরের শিলালিপি।
ভেসে যাও মোহনার আলোর প্রবাহের মতো
এই তো আছি বিষাদের পট জুড়ে যন্ত্রণার ক্রুশচিহ্ন....
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থে মাথা রেখে আমার বুকেই জন্ম তোমার।
ধুতুরাবীজ খেয়ে নেশাগ্রস্ত পুরুষ আমি। অন্ধকার ঘষে
ঘষে ছুঁয়ে ফেলি শরীরের বৃত্তি। অনন্ত নেশাখোর চোখ নীল
নীল—অঙ্গদেশের মানচিত্র ছুঁয়ে যেখানে এর সমাধা নেই
সে আমার পুরুষচক্র—সে তোমার গর্ভচক্র নিষিক্ত
সময়ের প্রতিধ্বনি : কবে আসছ, আসে না কেন?

এ কবিতার বক্তব্যে মহাজীবনে ও আলোয় উত্তরণের ভাবনা ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে দেশ-কাল ও সময়ের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে। বিষাদ-আক্রান্ত জীবনের তমসা, সময়ের উপকূল নবজন্মের স্বপ্ন যুগপৎ পুরুষচক্র ও গর্ভচক্রের উল্লেখের মধ্য দিয়ে অর্থ-সংহতি লাভ করেছে, যা সম্পূর্ণ সৃষ্টিবিজ্ঞান-আধারিত। ব্যক্তিগত জীবনে সেনাবাহিনীতে কর্মসূত্রে তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি তথা যুদ্ধের বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত। ফলত তাঁর কবিতায় সেইসব অভিজ্ঞান ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটবে সেটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিকতার ঊর্ধ্বে নিজেকে বিশ্বজীবনের অঙ্গীভূত করে দেখেন বলেই লিখতে পারেন— *রোমের যুদ্ধে আমার পোড়া দেহ মিশরের যুদ্ধে আমার সাজানো পিরামিড*। বুঝতে অসুবিধা হয় না কবি সুনীল ইতিহাসের পিরামিডের থেকে রোমের যুদ্ধের অতীতকে ব্যক্তিজীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। কেননা তিনি তো মানব-সভ্যতার ঐতিহ্যকে নিজের রক্তের স্পন্দনে অনুভব করেন। কবিতাটির মধ্যে কখনও বা নিজেকে তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা শিবের ভূমিকায় দেখেছেন। তিনি অস্বীকার করতে পারেন না জন্ম-জন্মান্তরের প্রবহমানতায় নানা প্রাণীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই অবতীর্ণ হয়েছি বর্তমান মানবজীবনে। তাই তো বলেন— *অনেক জন্মের কথা বুকে নিয়ে তোমাকে আঁকছি রামধনু*। সুতরাং জীবন-যুদ্ধের অনাদি অভিজ্ঞান আর রোমসাম্রাজ্যের যুদ্ধে দগ্ধ দেহের স্মৃতি যেন কবিতাটির বক্তব্যকে বর্তমান থেকে ধূসর অতীতের দিকে নিয়ে যায়।

জীবনের আলো ও অন্ধকারের কথা, নিসর্গ, বিস্মৃত অতীত ও স্বপ্নের কথা কবি সুনীলের কবিতায় উঠে এলেও শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠেছেন আলোক তৃষ্ণার কবি। জন্মনদীর তীরবর্তী জীবন-প্রবাহ, প্রকৃতি ও জ্যোৎস্নাহীন অমাবস্যার রাত্রি ভাষা পায় তাঁর উচ্চারণে— *কতদিন চাঁদ দেখা হয়নি আমার / ....আমার বিশ্বাস, গায়ে চাঁদের আলো পড়লেই কেউ উচ্চারণ করবে না / যুদ্ধ অসত্র বিস্ফোরণ-নগ্নতা*। 'আলো' নামের এই কবিতায় কবি একদিকে ফেলে আসা শৈশবের প্রতি নস্টালজিক হয়ে পড়েন, অন্যদিকে যুদ্ধের কথা এক ধরনের বিরোধাভাস গড়ে তোলে। এখানেও

এসেছে জন্মের কথা—তখনই জন্ম হয় 'সাগরসঙ্গম'— এ যেন তাঁর জীবননদীর সঙ্গে মহাজীবনের মিলন, তাই তো বলেন— *জ্যোৎস্নায় আমার চোখে মুক্তো ভাসাচ্ছে মুণ্ডেশ্বরী।* সুনীল একাধারে প্রকৃতিপ্রেমিক, বাস্তব সময় ও সমাজ সচেতন। আসলে সবকিছুর শেষে নতুন আরম্ভের স্বপ্ন-সৃজনের তথা সময়-অতিক্রমী। একমাত্র সেই বিশ্বাসেই তিনি জানিয়ে দিতে পারেন— *গান প্রাণেরই আহ্বান..../ আমি যত স্থির হই তত বন্ধনে বাঁধা পড়ি।* 'সম্পর্ক' নামক কবিতার এই সমস্ত উচ্চারণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় বিযুক্তি নয়, সংযুক্তিই তাঁর কাব্যদর্শনের মূলকথা। আধুনিকের এককেন্দ্রিক জীবনদর্শনে কবি সুনীল বিশ্বাসী নন। কারণ আবাল্য যৌথ পরিবার ও গ্রামীণ সমাজবদ্ধ বা সংঘ জীবন থেকে তিনি পাঠ নিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ জীবনদর্শনের, সর্বোপরি মার্কসবাদী তত্ত্বের মূল কথা সাম্যবাদ তাঁর জীবনের অনেকরকম মৃত্যু ও অন্ধকার থেকে উত্তরণের তৃষ্ণা কবির বর্তমান কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মূল সুর হয়ে উঠেছে। জীবনকে, জীবনের ভেতর ও বাহিরকে বহু কৌণিক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'আলোফুল' কবিতাটি। লিখেছেন—

আমরা কেউ চাইছি না অন্ধকার নেমে আসুক
আমরা চাইছি মুখের ত্বকে-চোখে রশ্মিকণাগুলো দেখা যাক
... ...
মৃত স্বপ্নের চেয়ে অন্ধকার আর কিছু নেই
চলো, এই অন্ধকারের মধ্যেই অভিযান হোক।

অসাধারণ এই উচ্চারণ, ভীষণ ভাবায়। কবিমাত্রেই স্বপ্নদর্শী, সেই স্বপ্ন দিনবদলের, সমাজবদলের, বিশেষ করে তীব্র মানবতাবাদী ও শুদ্ধ চেতনার কবির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সন্দেহ নেই কবি সুনীল মাজি সেই ধারারই প্রথম সারির কবি, যিনি কবিতায় ঘুরে ফিরে আলোর কথা বলেন। বলেন নবজীবন উত্থানের কথা। 'লাশসাঁতার' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর বোধকরি এটাই, আর গান তার অবয়ব। ফলে কবি আলোর কথা বলতে গিয়ে এই গানকেই ছুঁয়ে থাকেন। বলেন— *গান গাও, এইসব ঘনিষ্ঠ দিনের গান / গানের অভিযানে রাত্রিবৃক্ষে ফুটে উঠুক ফুল।* 'রাত্রিবৃক্ষ' অসাধারণ একটি শব্দবন্ধ, আর এর মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে যায় কবির অনন্ত আলোর তৃষ্ণা। মহাকাশের চাঁদ-তারা-জ্যোৎস্না আর প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের সঙ্গে কবির আত্মার নিবিড় একাত্মতা, জন্মান্তরের সম্পর্ক। আকাশ ও সমুদ্রের নীলের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার অস্তিত্বের আভাস যা তাঁর 'বৃষ্টি ওড়ার দিন' কবিতায় ফুটে ওঠে— *নীল সাগরের বুকে শুয়ে আছে রাধা তার বুকে বাজছে সানাই, কানাই।* 'আকাশ' একদিকে মহাজীবনের বিস্তার আর 'সমুদ্র' মহাজীবনের অনন্ত প্রবাহমানতার প্রতীক। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির অন্তঃসারের মূল আধার আসলে নদী। নদী কবি সুনীলের কবিতায় জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যে জীবন প্রকৃত অর্থে জন্ম ও মৃত্যুর ঘাটে-ঘাটে লাশস্বরূপ ভেসে চলেছে মহাপরিত্রাণের বা মহাজীবনে উত্তরণের অভিসারে। সুতরাং নদীর সাথেই জীবনের অন্তহীন বন্ধন। এ বন্ধন গার্হস্থ্য বন্ধন, আর তা কবি স্পষ্ট করে দেন 'গার্হস্থ্য' কবিতায়— *আমার সাথে বিবাহের কথা ছিল একটি নদীর / সূর্যের হলুদ রঙ মেখে নদীস্নানে নামতেই / চোরাবালিতে ডুবে গেল। / ...কিসের সন্ধানে একা একা পরিক্রমায় / কখন যে পড়ে গেলাম সাগরে।* নদীর মিলন ঘটে সাগরে, রূপকার্থে জীবনরূপ নদীর মহামিলন তাই মহাজীবনেই এমনই গভীর অর্থ-দ্যোতনা মূর্ত হয়ে ওঠে এ হেন উচ্চারণে।

৩

এই সময়ের বাংলা কবিতার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় কবিতার বক্তব্য সেই অর্থে কিছুই নেই কিন্তু মুখ্য হয়ে উঠেছে অর্থ-ব্যঞ্জনাহীন কথার মারপ্যাঁচ বা আম্বিগুইটি, বলতে চাইছি না কবিতার অর্থ বাংলা অভিধানভিত্তিক. কিন্তু একটা নতুন ভাবনার বা বক্তব্যের ইঙ্গিত-ইশারা তো থাকতে হবে, এবং মানবমনের অনেক না-বলা কথার উদ্ভাসকে তো জাগিয়ে দিতে হবে। সেসব খুব কম কবির কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়। সন্দেহ নেই সুনীল মাজি তাঁদেরই একজন।

তাঁর কবিতায় ইহজীবনের পাশাপাশি আছে ঐশী জীবনের হাতছানি। 'স্নান' কবিতায় লিখেছেন— *স্নান করার আগে ফুল পাতার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ জরুরি/ ফুল-পাতার স্পর্শের আগে স্নান করা খুবই জরুরি / ঝরনার মন্ত্র আর গানে নদী পেরিয়ে চলে যায় চাঁদ-দিগন্তে।* কবিতার মর্মগত সত্য-শিব ও সুন্দরের অভিব্যক্তি কবিতার নান্দনিক গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়। আসলে একটি ভালো কবিতা পড়লে মন ভরে যায় ডিভাইন প্লেজারে। এই দিব্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে 'দিব্য' কবিতায়, যেখানে কালাতীত প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে, এই প্রেমের মূলে সেই জ্যোতি বা অনশ্বর প্রাণচেতনা— *ছাই থেকে ফিনিক্স পাখি উড়ে গেল অই।/ ....যার কোনও দেশকাল নেই।/ কালাতীত এক প্রেম ছাই হলে আলো হয়ে জ্বলে / আর সংকেত দেয়।* এই ছাই আসলে নশ্বর দেহভস্ম আর পাখি প্রাণের প্রতীক, এখানেও সেই লালনের প্রাণপাখির অনুষঙ্গ। ভাবতে অসুবিধা হয় না সুনীল 'দিব্যভাস' রচনা করতে চান, তাই তো বলেন—'অই পথই মুক্তির পথ।'

একদিকে পরাজগৎ, অন্যদিকে অপরাজগৎ— এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থান থেকেই সুনীলের কবিতার ভাষ্যনির্মাণ। গ্রামীণ লোকায়ত জীবনের আবহে রচিত 'পরাদর্শন' কবিতায় কবি সুনীল লিখেছেন—

শবাসনে শুয়ে প্রাচীন লোকগান হয়ে ওঠে ফুটন্ত ভাত, নক্ষত্র
সন্ধ্যাপাঠে কেরোসিনের অভাবে গাঁ-দেশের ছেলেমেয়েরা রূপকথা
হাত ছুঁয়ে গা ছুঁয়ে শীত রাতে ছেঁড়া কাঁথা
খনির ভেতর নানান আকরিক ধাতব ধ্বনি
স্বপ্নের হীরে বেড়ে ওঠে এভাবেই
সঙ্গে আসে। আকাশ জড়িয়ে সারারাত শুয়ে থাকে দ্বীপ।

এই দ্বীপ আসলে জীবন, 'যে জীবন দোয়েলের-ফড়িঙের' অন্ধকার জড়িয়ে নবজীবনের স্বপ্ন দেখা দ্বীপের মানুষের অনটনের বেঁচে থাকার মধ্যেই পরাজীবনের ভাষ্য গড়ে ওঠে। 'শব' শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থক। জীবনকে শব হিসেবে দেখার মধ্যেই কবির জীবনাতীতের বোধ সঞ্চারিত হয়ে যায়। 'আকাশ' এখানে মুক্তির সংকেত রচনা করে। 'সাঁকো' কবিতায় সময়কে সাঁকোর রূপকে ধরেছেন মহাসময়ের সংযোগসূত্র রূপে। যে বিষয়টি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সুনীলের কবিতায়, সেটি হল জীবন থেকে মহাজীবনে, অন্ধকার থেকে আলোয়, সময় থেকে মহাসময়ে উত্থানের স্বপ্ন। তৃতীয় বিশ্বের সমূহ সংকট অন্ধকার ভাষা পায় তাঁর বাস্তব সংবেদী দৃষ্টিকোণে, 'টিপছাপ' কবিতায়—

আমার চোখ আছে চোখ নেই। অন্ধকার। তবু নয়ন জ্বলে।
জ্বল জ্বল আকাশ দাউ দাউ ক্ষুধা। তৃতীয় বিশ্ব।
ভূমি আছে ভূমি নেই, বীজ আছে শস্য নেই—হায় অন্ধকার
চুরি গেছে প্রোটিন শ্বেতসার।

সবকিছু থেকেও কিছুই না-থাকার জীবনের গভীর ক্ষত ও অসুখ উঠে আসে কবিতাটিতে, যে জীবন থেকে চুরি হয়ে গেছে সত্য-শিব ও সুন্দরের মাহাত্ম্য। আদর্শ-মনুষ্যত্ব-বিবেক- মূল্যবোধহীন খোসাকাল ও খোসাজীবনের অন্তঃসারশূন্যতার অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দেয় কবি মাটি থেকে কোনওভাবেই বিচ্যুত হয়ে কবিতায় কল্পনার স্বর্গ সংরচনা করতে চাননি, শিকড়কে ছুঁয়ে থেকে শূন্যের রহস্যভেদ করতে চেয়েছেন। যে আগুন থেকে মানবসভ্যতার জন্ম, সেই আগুনই লালন করেন কবি তাঁর আত্মায়, যদিও তাঁর কবিতায় এই আগুন বহুমাত্রিকতায় ঘুরে-ফিরে এসেছে, কখনও শরীরের কখনও প্রেম ও খিদের আগুন রূপে। 'অগ্নিদ্বীপ' কবিতায় শরীরের আগুনের কথা যেমন এসেছে, তেমনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্পর্কের অন্তর্গত আগুনের প্রসঙ্গটিও, সুনীল লিখেছেন—

কতটা আগুন? আমার জন্য কতটা আগুন রেখেছ
তোমার শরীরে? চতুর্পাশে বড় হিম পড়ে—ঘাসের মাথায়
....

কৃষ্ণ আর রাধার সম্পর্কে আগুন ছিল—সেই আগুনের
ছোঁয়ায় মানুষ আলো গায় প্রেম।

সত্যিকারের প্রেম আগুনের মতো পবিত্র, যার মধ্যে থাকে রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'ত্যাগের বীর্য, যা সামাজিক রীতিনীতি-সংস্কার-বৈধ-অবৈধ সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে স্বমহিমায় দীপ্তিমান হয়ে ওঠে, রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রেমাগ্নি ছিল বলেই তাঁদের প্রেম বিশ্ববন্দিত, প্রেম যেখানে পূজায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের এই প্রেম জীবাত্মার ও পরমাত্মার বা ভক্ত ও ভগবানের, যা জীবনকে মহিমান্বিত করে। যে প্রেম আলো সমার্থক, মানব জীবনকে শুদ্ধ ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটায়। কৃষিক্ষেত, নদী আর অনন্তের আহ্বান মিলেমিশে এক ভিন্নতর মাত্রা সংযোজন করে সুনীলের কবিতায়। জীবনের গভীরতর বিষাদ-রোমন্টিকতা আর স্বপ্নময়তার সংশ্লেষে সুনীলের কবিতা বর্ণময়, তীব্র ইন্দ্রিয় সংবাদী।

যে কোনও বড়মাপের কবি যুগপৎ সমসময় ও অনাগত সময়ের দিকে তাকিয়ে তাঁদের কবিতার বক্তব্য-বিশ্বকে গড়ে তুলতে চান। আলোচ্য কবির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা দেখিনা। তিনি কত বড় কবি সে বিচারে যাচ্ছি না, বলতে চাইছি তাঁর বড় মাপের চিন্তাজগতের কথা। ছোবলক্ষত সময়ের বিষ, যন্ত্রণা বা অসুখ, রাজনৈতিক বাস্তবতায় নেকড়ে ও শৃগালের খাদ্যে পরিণত হওয়া গণতন্ত্র, সংবিধানের করুণ পরিণতি, সর্বোপরি ফসিল প্রজন্মের কথা উঠে এসেছে সুনীলের 'ছোবল' কবিতায়, যা একজন বিবেকবান সময়-সচেতন কবিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। সভ্যতার অন্তর্গত ক্ষয় ও বিনষ্টির অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল উত্তরণের ভাবনাই বার বার নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। সময়ের অন্ধত্ব, মানুষের অন্তর্গত অন্ধত্ব ঈষৎ জীবনানন্দের স্বরভঙ্গিতে ভাষা পেয়েছে 'চিড়িয়াখানায় নগরে' কবিতায়—

চশমা পরেও মানুষ দেখতে পায় না হাত আর পায়ের মধ্যে কতটা তফাৎ
আমরা যারা... তারা অন্যের ভেতর নিজেকে দেখে
অন্যের ভেতর নিজের চেহারা অরুচি দেখে পুলকিত হয়
....
এগিয়ে যায় যান, মানব কল্যাণ....

অন্ধরা অন্যের ভেতর নিজেদের চেহারা ও রুচি দেখে পুলকিত হয় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে, বিপরীতটা তাহলে পুলকের স্থান দখল করত বিষাদই। এ কবিতা আমাদের বিবেকের দর্পণের সামনে দাঁড় করায়। 'যুদ্ধ' কবিতায় বর্তমান বন্ধ্যা সময়ের কথা উঠে এসেছে দ্বিবাচনিক বন্ধ্যাত্বের অনুষঙ্গে—

অধিকাংশ স্ত্রী প্রজাতি বন্ধ্যা হয়ে গেছে
নারী-পুরুষ পরস্পরের কাছে যেতে চাইছে না
বিবমিষা ভাব
শরীরী ঘৃণা
শরীর কিনে নিচ্ছে শুক্রাণু
সিঙ্গল মাদার....
মাতৃগর্ভেও কমে আসছে জল
নাভিতলে ছুরির দাগ
ক্ষত হচ্ছেন না—উঠে আসছে হেমন্তের সন্তান
মা'র কান্না নেই শিশুর কান্না নেই
হায়া অদ্ভুতভাবে কমে আসছে ঢেউ।

কবিতাটির উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য অত্যন্ত বাস্তব এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। 'ঢেউ' শব্দটির মধ্য দিয়ে যে অন্তহীন জীবন-নদীর প্রবাহের অনুষঙ্গ উঠে আসে তাতে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না কবি বর্তমান নয় চিরবর্তমান সময়ের চলিষ্ণুতার কথা বলেন, আর নিয়ে যান নব-নবজন্মের অভিসারে। সুনীল নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার নানাবিধ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কবি। কবিতা কেবলমাত্র বাস্তবের অভিজ্ঞান নয় একথাও তিনি জানেন এবং মানেন, ফলে তাঁর কবিতার শরীর নির্মাণ ও ভেতরের সত্তায় গভীরভাবে মিশে থাকে ইহজাগতিক এবং পরা-জাগতিক চেতনার উদ্ভাস। নক্ষত্রজগৎ আর সুদূরের প্রতি কবির সীমাহীন রোমান্টিক অনুভব তাঁর কবিতাকে ঈষৎ মহাসময়ের ও মহাজগতের ইশারায় পৌঁছে দেয়। জীবনের গভীরতর ধ্যান, বিশ্বজীবনের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আত্মিক বাসনা সুনীলের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার অন্তর্গত স্বর হয়ে উঠতে চেয়েছে। 'সুর ও সমর্পণ' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

ভাব ও ভাবনার সম্মিলনে চিরে চিরে—খুঁড়ে—
কণ্ঠের স্বরের ভেতর জেগে উঠুক সুর।
....
এই মহাকালে এক ক্ষুদ্র কণার মতো ছায়া
ছায়ার ভেতর এক আলোর বিন্দু স্বপ্ন হোক।
স্বপ্নের ভেতর মাতৃগর্ভ—বীজ ওই যেন অনন্তকাল।

এককথায় সুনীলের কবিতার গভীরে থাকে চিরন্তন জীবন-পিপাসা, আলো হয়ে, বীজের ও ফসলের স্বপ্ন হয়ে জেগে ওঠার শাশ্বত পিপাসা। একজন সাধকের মতো তিনি অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছনোর কথা বলেন বার বার। কবিতা যে নিছক প্রেম-রোম্যান্টিকতা-কল্পনার হাতছানি নয়, মানুষের শুদ্ধ চেতনার ও শুভবোধের জাগরণ ঘটায় সে কথাই যেন ঘুরেফিরে তাঁর কবিতার মূল সুর হয়ে ওঠে।

৪

কাব্যসাধনাকে নিছক কলাকৈবল্যবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দেখতে চান না যে সমস্ত কবি, বরং এই বৌদ্ধিক চর্চাকে দেখতে চান সত্য-শিব ও সুন্দরের অনুধ্যান হিসেবে, কবি সুনীল মাজি অবশ্যই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ফসল ফলানো ও অক্ষরচাষকে তিনি সমার্থক মনে করেন। ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থান ও পারিবারিক কৃষিকর্মের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত এই বিশেষ ধরনের দার্শনিক অনুভব বোধকরি কবির কাব্যচর্চাকে এই বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছে। কবিতার মূল বক্তব্যে তিনি মানুষের স্বপ্ন ও জীবন-পিপাসাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মাঝে-মধ্যে স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন ও বিষণ্ণ কবির মনোজগতে ছায়াপাতে কবিতার উচ্চারণ আমাদের পাঠকদের বর্তমান থেকে অতীতের গর্ভে নিয়ে যায়। যে কৃষিক্ষেত ও আলপথ-এর জীবনধারা থেকে তিনি উঠে এসেছেন আজকের আজকের এই নাগরিক জীবনপ্রবাহে, মাঝেমধ্যে সেখানেই ফিরে যাওয়ার আকুলতা তীব্র হয়ে ওঠে তাঁর 'রোদ' কবিতাটির উচ্চারণে— *তাদের স্মৃতিপথ ধরে কতটা মায়ামুক্ত চেতনার পাখি।/ নিজেরই আলপথে শুয়ে দেখি আকাশ, এখনও অনেক পথ বাকি।* এই চেতনাই তাঁর কবিতার মূল সম্পদ, যে চেতনায় একজন পাঠক দীক্ষিত ও শিক্ষিত হয়ে ওঠেন কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে, পৌঁছে যান বোধ ও বোধির উত্তুঙ্গ শিখরে। এই সময়ের বাংলা কবিতায় যদিও এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সেই অর্থে লক্ষ্য করা যায় না, কেবলই বিযুক্তি ও অবক্ষয়ের প্রতিফলন এক বিশেষ ধরনের গতানুগতিকতা সৃষ্টি করে, সুনীল অবশ্য এসবের থেমে বেরিয়ে এসে নিজস্ব ঘরানায় স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বাস করেন কবিতা শুধু শব্দের খেলা নয়, নির্মাণের কায়দা-কানুন নয়, বোধের কর্ষণ, চেতনার চাষবাস। প্রকৃত জীবনবাদী কবি কখনই কবিতায় না-জীবনের কথা তুলে ধরেন না, এমনকি হতাশা-স্বপ্নহীনতা ও ব্যর্থতার কথাও—তিনি যা নেতিবাচক তাকে এড়িয়ে চলেন, যা ইতিবাচক তাকে তুলে ধরেন। গতানুগতিক পথ থেকে সরে এসে নতুন পথের আবিষ্কার ও অনুসরণ যে কবির জীবনচর্যা ও কাব্যচর্চায় মূল তৃষ্ণা হয়ে ওঠে কবি সুনীলকে সেভাবেই চিনে নিই, বিশেষ করে যখন তিনি 'হাত' কবিতায় লেখেন—

এই হাত তছনছ করে ভেঙে দেয় গতানুগতিক পথ
কবিতার মতো নানা আঙ্গিক ভঙ্গিমা—প্রাচীন ছন্দ থেকে
বেরিয়ে জামাকাপড় চেনা হাসি চেনা খাবার ত্যাগ করে
এই জীবনেই লুকিয়ে আছে অন্য স্বাদ—তার খোঁজে
গদ্যের শরীরে মৃত্তিকায় যদি আঁচড় দেয়—গীতলতায় জড়ানো
পুরোনো ইমেজ ভেঙে আরও কঠিন স্বরে ডেকে ওঠা।

বেঁচে থাকার পুরোনো অভ্যেস থেকে বেরিয়ে আসতে চান কবি, বেরিয়ে আসতে চান কবিতার প্রাচীন নির্মোক থেকে—যদিও সেই একই জীবন একই কবিতা। কিন্তু কবি তারই ভেতর থেকেই বের করে আনতে চান নতুন ছন্দ, নতুন চিত্রকল্প—আর এভাবেই তাঁর কবিতা গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে উঠতে চায় এবং সেক্ষেত্রে তিনি অনেকটাই সফল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যক্তিগত জীবনের কথা, বেদনা ও ব্যর্থতার উপলব্ধি কখনোই সুনীলের কবিতায় ছায়া ফেলে না। তিনি যেন ব্যক্তিগত বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত অনুভব ও বক্তব্যকে বিশ্বজনীন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে না পারলে সে কবিতা কখনোই গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

বর্তমান বা ইহজগতকে নয় চিরায়ত ও পরা-জগতকে ছুঁয়ে থাকতে চান যে কবি তিনি প্রেমকে ইন্দ্রিয়গত সীমার ঊর্ধ্বে দেখতে চান শাশ্বতের আশ্রয় ও আশ্রম হিসেবে, বেরিয়ে আসতে চান চিন্তার জট থেকে, কারণ তিনি স্পর্শ করতে চান অতীন্দ্রিয় আনন্দ লহরী—এমনই ভাষ্য গড়ে ওঠে কবি সুনীলের কবিতায়। 'তীর্থ' কবিতায় তাই বেজে ওঠে মুক্তি-পিপাসু হৃদয়ের আর্তি—

চলো একটু ঘুরে আসি—
শ্বাস ছাড়া আমার আর কোনও আবাহন নেই।
... ...
বড় ভারী লাগছে চিন্তার জট
প্রেম দর্শন নয়—প্রেম সম্পূর্ণার আশ্রয়, আশ্রম।
এসো চিরায়ত ছুঁই; স্পর্শ করি চলো আনন্দ লহরী।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—এই সত্যকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে কবিতাটি। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে রক্ত-মাংসের এই শরীর অর্থহীন। ইহজাগতিক যা কিছু সবই মিথ্যা, সত্য কেবল ওই শ্বাসটুকু যাকে ধরে রাখা যায় না—এ আসলে সিপরিচুয়াল লিবার্টি, অন্তত আলোচ্য কবিতাটির মূল বক্তব্যে এমনটাই বুঝে নিতে পারি। কবি শাশ্বতের মধ্যেই পৌঁছতে চান, ছুঁয়ে থাকতে চান আনন্দ লহরী—বুঝতে অসুবিধা হয় না কবি হিসেবে তিনি সম্পূর্ণরূপে অতীন্দ্রিয়বাদী, ঔপনিষদিক আনন্দবাদে বিশ্বাসী। বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক ড. অজিত ত্রিবেদি তাঁর 'আধুনিক কবিতা : নির্মিত বহুরূপ' (১৪১৮) প্রবন্ধগ্রন্থের কিছু বাক্যবিনিময় অংশে লিখেছেন—

বার বারই মনে হয়েছে, সব দশকেই প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রশ্রয়ে প্রচারিত, সম্মানিত কবিদের সমান্তরাল অনেক শক্তিশালী কবির কাব্যকৃতির ওপর সেই অর্থে প্রচারের আলো এসে পড়েনি, গুরুত্বপূর্ণ কোনও আলোচনায়ও স্থান হয়নি তাঁদের, অথচ বাংলা কবিতার প্রবল সম্ভাবনা, শক্তি, ঐশ্বর্য-ঐতিহ্য ও ভবিষ্যতকে তাঁরা একইসঙ্গে নির্মাণ, ধারণ তথা লালন করে চলেছেন।

সন্দেহ নেই, আলোচ্য কবি সুনীল মাজি-র ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বক্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে সত্য। তিনি এই ধারারই একজন প্রবল সম্ভাবনাময় কবি, যিনি ইতোমধ্যেই তাঁর কলমের জোর ও সৃজন-স্বাতনত্র্যকে প্রমাণ করে দিয়েছেন কনটেম্পোরারি বাংলা কবিতাচর্চার ধারায়। যদিও প্রতিষ্ঠানের প্রচারের আলোয় তিনি উদ্ভাসিত নন, বিশাল প্রচারও পাননি, কিন্তু মূলত লিটল ম্যাগাজিনকে আশ্রয় করেই তাঁর কবিসত্তার যে বিকাশ ও কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা তা অস্বীকার করার কোনও উপায়

নেই। তিনিই সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যাঁর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বড় প্রতিষ্ঠানের বদান্যতা না পেলেও একমাত্র লিটল ম্যাগাজিনে লিখেই বা কোনও গোষ্ঠীতন্ত্রের মধ্যে না থেকেও একজন কবি নিজস্ব নির্জন সৃজন-সাধনার মধ্য দিয়ে একদিন না একদিন স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন।

কবিতা অবশ্যই হৃদয়ের কথা বলে, শুদ্ধ চেতনা ও আলোকিত উজ্জীবনের পথ দেখায়। কাল আর মহাকালের ধারায় জীবনের যে বিবর্তন, মনুষ্য-চেতনার দিগ্বলয় ঘটে বার বার, কবিতায় তারই অনুরণন ঘটে। কবি সুনীল নিজেও বিশ্বাস করেন কবিতাকে জীবনের প্রতি মুহূর্তের আলোকিত উপলব্ধি উচ্চারণ হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে। সৈনিক জীবনের নানান বর্ণময় অভিজ্ঞতা, পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত আটপৌরে জীবনের অফুরন্ত রসদ তাঁর কবিসত্তাকে বিভিন্ন মাত্রায় বিবর্তিত ও উজ্জীবিত করেছে সৃষ্টির এষণায়। প্রেমকে তিনি পূজা হিসেবে দেখেন, হৃদয় সেই পূজার মন্দির। একজন হৃদয়বাদী কবির সংবেদী অনুভূতি তাই সুনীলের কবিতাকে বুদ্ধির থেকে হৃদয়ের আলোয় বেশি উদ্ভাসিত করে। মস্তিষ্ক-নির্ভর আধুনিক কবিতা কখনোই মানুষের হৃদয়কে জয় করতে পারে না যদি না হৃদয়ের কোনও উত্তাপ থাকে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয়, বুদ্ধি এবং হৃদয় দুটোরই মিশ্রণ সুনীলের কবিতায় একেবারে ফিফটি ফিফটি এমনটা বলা যাবে না, হৃদয়ের স্পর্শ তাঁর কবিতায় বেশি। যেহেতু তিনি গভীর অনুভব ও সাধনমার্গের কথাই কবিতার বাচনরূপে তুলে আনতে চান। বিষয়বস্তু ভার তাঁর কবিতায় কোনওভাবেই মুখ্য হয়ে ওঠে না, মুখ্য হয়ে ওঠে অনুভূতি ও উপলব্ধির দিকটিই। নাগরিক জীবন কবিকে কোনওভাবেই তৃপ্ত করে না। বরং ক্লান্ত করে। তিনি যে গ্রামীণ জীবনের শিকড়-এর মধ্যেই বেঁচে থাকার রসদ ও শিল্পের উপকরণ খুঁজে পান সে কথা সচেতন পাঠক হিসেবে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ব্যক্তিগত কবিতাচর্চায় সুনীল বিদেশি কোনও কাব্য আন্দোলন বা মতবাদে বিশ্বাসী এমনটাও মনে হয় না। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি ঐতিহ্যের অনুগত থাকতে চান জীবনযাপন ও কবিতার সৃজনকর্মে। আধুনিক কবিতায় যে বিষয়টি একসময় গৌণ হয়ে উঠেছিল প্রবল পাশ্চাত্যের অনুকরণে, কবি সুনীল সে কথা জানেন বলেই সচেতনভাবেই তিনি ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাননি। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাচ্যের মাটির মধ্যেই আছে অমূল্য সম্পদ। ফলে কবি সুনীলের কবিতা পড়তে পড়তে বারবার আমরা মাটির গন্ধে মুগ্ধ হই, শিকড়ের শ্বাসে অক্সিজেন নিই, বদ্ধজীবন থেকে সীমাহীন আকাশ ও নক্ষত্রের দিকে উড়ে যাই মুক্ত বিহঙ্গের মতো। সন্দেহ নেই বর্তমান কবিতাচর্চার প্রেক্ষিতে এ এক মূল্যবান প্রাপ্ত আমাদের একজন পাঠক হিসেবে। বাংলা কবিতায় পুরাণের কাহিনি ও চরিত্রসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ উঠে এসেছে এক-এক কবির কবিতায় এক-একরকম বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষিতে। কবি সুনীলের কবিতায় একইভাবে উত্থাপিত হয়েছে পুরাণের নানা চরিত্রের কথা যেমন হরগৌরী কিংবা গঙ্গা-যমুনাকেন্দ্রিক পৌরাণিক আখ্যান। জীবনকে ভেতর ও বাহির দুই দিক থেকেই দেখার ও দেখানোর আশ্চর্য দার্শনিকতা কবির কবিতা রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তা আমাদের বিস্মিত করে। 'লীলা' কবিতায় তিনি লিখেছেন— *আলোর নৈবেদ্য দিয়ে যে রচনা করে নদী / সেই পাহাড়ের বুকে থাকতে পারে কি অন্ধকার?* কিংবা লিখেছেন— *সব চোখে গঙ্গা-যমুনা হরগৌরীর বাস / তাই সৃষ্টি ও ধ্বংসের ভেতর আলো-অন্ধকারে লীলা চলে।* এখানেই বুঝতে পারা যায় তিনি জীবনের উপরিতলের ঘটনা ও বাস্তবতাকে নিয়ে লেখেন না শুধু, জীবনের গভীরে সৃষ্টিতত্ত্বের ভেতরে প্রবেশ করে তুলে আনেন বিশ্বস্রষ্টার লীলারহস্যকে। কবিতাকে এইভাবে বিভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেন আবার তার নির্মাণ ও ভাষাশৈলীকে নতুন বৈশিষ্ট্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে কখনোই তিনি কাউকে বা কোনও তত্ত্বকে সামনে রাখেন না। নদী ও সমুদ্র নানাভাবে কবি সুনীলের কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর চেতন-বিশ্বকে নতুনভাবে গড়ে দিয়েছে। নদীর উৎস খুঁজতে গিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন জীবনের উৎস-সন্ধানে যা তাঁর 'দৃষ্টি' কবিতায় স্পষ্ট— *জলের খোঁজে আমি চোখে সাগর খুঁজেছি / যদি তার দৃষ্টির তট পেয়ে যাই / তবে তো মোহনা ধরে খুঁজে পাবো নদীর উৎস / জলের বাগানে মালি-মাঝি আমি আবহমানকাল / কেবল অশ্রু হয়ে অশ্রুর ভেতর ভেসে গেছি।* জীবন থেকে মহাজীবনের দিকে এই যে অনন্ত ভেসে চলা এ তো প্রকৃত জীবন-সন্ধানী কবির জন্ম-মৃত্যু ভ্রমণের অভিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নয়। নদী তাই সুনীলের কবিতার কেন্দ্রীয় শক্তি বা আধার। যে জীবন অধরা

তাকে ধরতে চাওয়া ও ইহজীবনের অঙ্গীভূত করে নেওয়াই যেন কবির জীবনের আর এক সাধনা, এভাবেই তিনি সীমা থেকে অসীমে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে নিয়ে যান আমাদের চেতনা ও ভাবনাকে। পচা-গলা সভ্যতার কঙ্কাল চেহারা ফুটে ওঠে কখনো-কখনো তাঁর বাস্তববাদী চেতনার ফলশ্রুতি হিসেবে, 'এই সময়' কবিতায় লিখেছেন—

কেন না নদীপারের পার্কে পাওয়া গিয়েছে চোদ্দজন কিশোরীর
আধপোড়া কঙ্কাল
ধূসর ধোঁয়ায় যেন এক পিরামিডের দেশ
... ...
ধর্ম-দর্শন ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতি চরম বিদ্বেষ
তাদের ঘৃণার আগুনে বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর তাপ, পরমায়ু

সভ্যতার অন্তর্গত ক্ষয় ও মানবিক মূল্যবোধ তথা আদর্শের অধঃপতন এভাবেই কবির কবিতায় ধরা দেয়, বিবেকে আঘাত হানে। চেতনাকে জাগিয়ে দেয়। কবিতা যদিও নীতিশিক্ষার বিষয় নয় কিংবা মানুষকে জ্ঞানদানের ব্যাপারও নয়, কবিতা অবশ্যই ভেতর থেকে জাগিয়ে দেওয়া এবং চেতনাকে নাড়িয়ে দেওয়ার এক শব্দগত অভিঘাত। জীবনের শোক-তাপ-বিষাদ-ব্যর্থতাকে অতিক্রমের তথা মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনার প্রকাশ সুনীলের কবিতাকে অন্যরকম তাৎপর্যে উন্নীত করেছে। 'চক্র' কবিতায় সুনীল তাঁর জন্মনদীর কাছে ফিরে আসেন এভাবেই— *মুণ্ডেশ্বরীর এক পার থেকে অন্য পারে যেতেই / দশক শেষ হয়ে গেল কিংবা একটি শাড়ি মোড়া সিঁদুরে মেঘ চোখের জল ফেলতে / ফেলতে বেড়ে চলেছে দর্শক, শতক।* এ সমস্ত উচ্চারণ থেকে আমরা চিনে নিই যথার্থ কবিকেই যিনি শেষ পর্যন্ত চেনা জীবন বা ফেলে আসা স্মৃতিকে কবিতার বিষয়বস্তু করেও শেষ পর্যন্ত তাকে কবিতার ব্যঞ্জনা ও রসগত আবেদনে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। বিষয়বস্তু কখনোই একটি ভালো কবিতার শেষ কথা নয়, ভালো কবিতা প্রকৃত অর্থে ভেতর-সত্তায় বিষয়বস্তু ও নির্দিষ্ট অর্থ-সীমাকে অতিক্রম করে যায় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থে নয়, বরং অর্থহীনতায় উত্তীর্ণ হয়। অভিধান-এর সাহায্যে কবিতার অর্থ নির্ণয় করা অর্থহীন, কবিতার রসটাই আসল, নানা অর্থময় ইঙ্গিতই আসল শর্ত একটি ভালো কবিতার।

৫

কবিতা মাত্রেই আলো ও অন্ধকারের সংক্রীড়া, চেনা বিষয় বা পরিচিত জগৎ থেকে দূরবর্তী এক বিশেষ ধরনের ইঙ্গিত ও ইশারায় শাব্দিক নির্মাণ। কবির তৃষ্ণা অন্ধকার জয়ের, উত্তরণের। 'ভোর' যে কবির মৌল প্রার্থনা, তিনি তো অন্ধকার রাত্রিশেষের মধ্য দিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল আলোর পথযাত্রী। ঠিক এখান থেকেই কবি সুনীলের বর্তমান কবিতাটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন—

অন্ধকার বৃক্ষ থেকে আধারের বাকলগুলি খসে পড়ে কবুতরের ডাকে
এক উজ্জ্বল আলোর বল কথা বলতে ছুটে আসে দরজা-জানালায়
দ্বীপঘর জেগে ওঠে, ঘুম-ভাঙা চোখে দেখতে থাকে স্মৃতির বিস্ময়
... ...
অদ্ভুত শক্তি এক নির্বাচন করে পাঠায় এক অশরীরী বোধ—
তাকে যে টানে তার জন্য ফুল তোলে মালা গাঁথে নদীবুকে
জোয়ারেই পাখি ঘরে ফেরে জোয়ারেই পাখি ঘর ছাড়ে

জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাপনের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জাগরণের চেতনা, শরীরবোধের বাইরে এসে 'অশরীরী বোধ' কবিকে মহাজীবনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। 'পাখি' এবং 'জোয়ার' দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এই কবিতায়, 'পাখি' অর্থ প্রাণ-পাখি, 'জোয়ার' অর্থ জীবননদীর প্রবাহ। এভাবেই চেনা জীবন থেকে অচেনা জীবন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে নিয়ে যায় কবির চিন্ময় অনুভূতির এই সমস্ত উচ্চারণ। কবিতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বোধ্যতার মধ্যে না নিয়ে গিয়ে

খুব সহজ বোধ্যতায় অতলস্পর্শী অনুভবের দিকে পৌঁছে দেন কবি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতায় মূলতই জীবনের নেতিবাচক দিকগুলির চর্বিত-চর্বণ যখন আমাদের পাঠক-রুচিকে ক্লান্ত করে, জীবনের অর্থহীনতা-বোধে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে, ঠিক তখনই কবি সুনীল মাজির কবিতা অনেকটাই অক্সিজেন যোগায়। অন্তত পাঠক হিসেবে এ আমার একান্তই ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। যখন কবিতা থেকে গভীর জীবনবোধ, ইতিবাচক চিন্তা-চেতনা ও শুভবোধ অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রকৃত জীবন সংরাগে দৃপ্ত সুনীলের কবিতা আমাদের চেতনায় শুশ্রূষা হয়ে ওঠে।

কবিতায় বিভিন্ন পুরাণ, লোককথা ও জাতককথার সংমিশ্রণে এক নতুন ধরনের বক্তব্য গড়ে তোলেন কবি, যা তাঁর কবিতাকে বহুমাত্রিক করে তোলে। 'জাতককথা' তেমনই একটি কবিতা। এ কবিতায় বৈষ্ণব সাহিত্য, মহাভারত ইত্যাদির চরিত্র উঠে এসেছে যার মধ্য দিয়ে কবির গভীর জীবনবোধের স্বরূপকে চিনে নিতে পারি। ভেতর-অনুভব আলোকিত ও শুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন—

আমার ভেতরটা ম ম করে
আমি এক রশ্মির মতো সুতোয় পা দিয়ে
জ্যোৎস্নার বাগানে যাই
আমার তর্জনী থেকে মধ্যমা একই মুদ্রায় থাকে
আমার অনামিকা থেকে বের হয়ে আসে জ্যোর্তিময়ী
ম নামের আদ্যক্ষরে যে নারীকে চিনি আমি
সে সব প্রাচীর ভেঙে আমার দিকে ওষ্ঠ এগিয়ে দেয়
... ...
তার স্পর্শে আমার ভেতরটা যখন ম ম করে
তখন শতজন্মের দরজা খুলে ঘুরে বেড়াই
সব পুরুষ-নারী একজন্মে কৃষ্ণ একজন্মে রাই

বুঝতে পারি কবি সুনীলের জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে প্রাচীন পুরাণ ও বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে বৈষ্ণবদর্শনের মূলকথা যে অদ্বয়-তত্ত্ব, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই রক্তমাংসে আধারিত, আমরা এক জন্মে রাধা আর এক জন্মে কৃষ্ণ—এমন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সে কথাই ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ যদি ভগবান, রাধা তাহলে সাধিকা। কৃষ্ণ যদি পরমাত্মা, রাধা তাহলে জীবাত্মার প্রতীক। জন্মে জন্মে এভাবেই ভক্ত ও ভগবানের লীলা খেলা চলছে। 'পতন' কবিতায় আবার তিনি নিয়ে যাচ্ছেন সেই কৃষ্ণ প্রসঙ্গে, কৃষ্ণের বাঁশির সুরে—

হাত থেকে পড়ে গিয়ে আমার কৃষ্ণের বাঁশি ভেঙে গেল
এখন চুম্বনের মতো ফুঁ দেওয়ার নেই কোনও স্থান, প্রাণ
সুরের ঢেউয়ের যে জোয়ার ছিল একদিন—এক নয়া ঘূর্ণি
বিস্ফোরণে ঝটকায় পড়ে গেল বাঁশি।...
... ...
ভয়ংকর এই শূন্যতায় আলোহীন আগুনের ভেতর
যাবতীয় পার্থিব আধা-পার্থিব কামনা-বাসনা জ্বলতে
জ্বলতে ঘুমঘোর অস্তিত্বহীন অমানিশায় সংকোচন করল
স্বপ্ন এই....।

সুনীলের কবিতা আগুনের, তৃষ্ণার, দহনের, আলোর ও উজ্জীবনের। অন্ধকারময় ইন্দ্রিয় সীমায় বদ্ধ জীবনের কেন্দ্রে আলোর পাহারা রূপে তাঁর কবিতা জেগে থাকে আমাদের বোধে, চেতনা জুড়ে। প্রতিমুহূর্তে এই যে আলো ও

আগুনের কথা উঠে আসছে কবিতায়, এ তো এককথায় শুদ্ধ জীবনের ও পূর্ণতারই তাৎপর্য বহন করে। ইন্দ্রিয়গত পতন থেকে অতীন্দ্রিয় উত্থান-এর দিকে নিয়ে যান কবি।

‘দশক’ কথাটি যথেষ্ট বিতর্কিত। বাংলা কবিতার দশক বিভাজনে এই শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হয়। দশবছর সময়কাল বিচারে এই দশক অভিধাটি ব্যবহৃত হলেও অন্তত একজন কবির কাব্যরচনার সময়পর্বকে ধরার বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই শব্দটি মনে করি অনেকটাই যুক্তিহীন বা অবৈজ্ঞানিক। সময়ের একটি চিহ্নস্বরূপ কিন্তু তা দিয়ে একজন কবিকে বা তার কবিতাকে বিচার করা অসম্ভব। ‘শূন্য দশক’ অর্থে ‘zero-decade’ অর্থাৎ আরম্ভেরও আরম্ভ থেকে কিনা এই প্রশ্ন উঠে আসে। আসলে এটি একটি নেতিবাচক শব্দবন্ধ। এর সত্যিই কোনও অর্থ হয় না। যাই হোক এই ‘শূন্য দশক’ নামে বর্তমান কাব্যগ্রন্থ সুনীল তিনটি কবিতা লিখেছেন। একই শিরোনামের ‘৮’ নম্বর কবিতায় তিনি লিখেছেন—

আমি পৃথার হাত ধরলাম। আকাশের চারপাশে
চকচক করছিল মেঘ-বিদ্যুৎ। মধ্যবিন্দু হাঁ করে দেহের
চারপাশে ঘুরছি। এই মেঘের জন্য চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল।

‘পৃথা’ মহাভারতে বর্ণিতা কুন্তী। এই পৃথা বা কুন্তীর মধ্য দিয়ে পুরুষ মানুষ সম্পর্কে একটা মেসেজ দিতে চেয়েছেন কবি। লিখলেন— *পৃথা বলল : পুরুষ মানুষ বিড়ালের জাত, সুযোগ পেলেই....* এ ধরনের পঙ্‌ক্তির মর্মগত তাৎপর্যের বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, সেদিকে না গিয়ে বলতে পারি কবি সুনীলের এ কবিতায় মহাভারতীয় চরিত্র-অনুষঙ্গের বিনির্মাণ ঘটেছে। এই শিরোনামের ‘১৩’ নম্বর কবিতায়ও লিখেছেন— *অনেক পুরুষকে হিজড়া ভাবি অনেক হিজড়াকে নারী ভেবে বসি।* কিংবা ‘১৭’ নম্বর কবিতায় লিখেছেন— *দিতির সন্তানরা মুছে দিতে পারে চিত্রমালা / তবু এই ব্রহ্মময় ভূমি, অক্ষত পৌরুষ—আগুনের তেজে / আকাশের বুক থেকে মুছে যায় নি মেঘ?* দিতির সন্তান অর্থাৎ দানব বা অশুভ শক্তি। এভাবেই নারী ও পুরুষের অন্তর্গতস্বরূপ ও রহস্য উন্মোচিত হয়েছে জীবনরূপ মেঘ-চন্দ্রের সাংকেতিকতায়। আসলে নির্দিষ্ট কোনও অর্থে নয়, অর্থময় ইঙ্গিতের মধ্য দিয়েই বুঝে নিতে হয় কবির অব্যক্ত বক্তব্যটি। সুনীল জীবনকে, জীবনের গভীরতর তাৎপর্যকে এভাবেই বৃক্ষ-নদী-মেঘ-চন্দ্র ও আকাশের ব্যস্ত পটভূমিকায় দেখে নিতে চান, উন্মোচিত করতে চান তার ভেতরের রহস্যটি। ফলে ‘শূন্য দশক’ অর্থাৎ দশ সংখ্যা, অন্যদিকে শতাব্দীর দশভাগের এক ভাগ এই বিশ্লেষণের গণিত-অর্থ এখানে মুখ্য বিষয় নয়, ‘শূন্য’ অর্থে খালি বা ফাঁকা—এই তাৎপর্যেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর শেষ পরিণতি শূন্যে বা ব্রহ্মে মিলনের কথাই যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

৬

কবিতাকে প্রচলিত অর্থ-বোধের বাইরে যথার্থ রসগত বিচারে দেখাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। কবির কবিতার অর্থ তাই কখনোই শেষ কথা নয়, শেষ কথা কবিতা হয়ে ওঠা। সুনীল এসব জানেন এবং বিশ্বাস করেন, কবিতার অন্তর্গত রহস্য ও অভিমুখ কিভাবে কোনদিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় রূপক-উপমা ও প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, যেগুলি তাঁর কবিতায় অসামান্য দক্ষতায় ব্যবহৃত হয়েছে। ‘ওয়াসা’, ‘ক্ষতচিহ্ন’, ‘বরফ’, ‘নকল’, ‘বাবার গ্রামে এসে’, ‘লালন কথা’ ইত্যাদি কবিতায় ঘুরে-ফিরে উঠে এসেছে জীবনের ক্ষত, বিষাদ, তৃষ্ণা, স্বপ্ন, মাটি, নদী ও নক্ষত্রময় জীবনের নানামাত্রিক উপলব্ধি বা উৎসারণের কথা। জীবনের মায়া সম্মোহন, আলো-অন্ধকার, সর্বোপরি নবজন্মের সূর্যতৃষ্ণা এই কবির প্রত্যেকটি কবিতার ধ্রুবপদ রূপে বেজে ওঠে বার বার। ‘লালন কথা’ কবিতায় প্রাণ-পাখি রূপকের আধারে উন্মোচিত হয়েছে জীবনের গভীর রহস্য, লিখছেন—

পাখিটি দু’ডানায় উড়ে ভেসে উঠতেই শরীরের পরিচয় হারিয়ে গেল
একটু আগে পাখিটি বাসায় ছিল। বাসাকে নির্মাণের আগে....
...   .
তৃষ্ণায় ঘুম ভেঙে গেল। মায়া মায়া অন্ধকারে সব দরজা বন্ধ।

উত্তর নেই দক্ষিণ নেই। কিছুতেই মনে করতে পারছি না
কোনদিকে মাথা, বিষুবরেখা।
... ...
বুকের তৃষ্ণায় জাগে প্রেম আর জিহ্বার পিপাসায় কাম জাগে।
বুকের পিপাসা শ্বাসে-শ্বাসে মাথার ভেতর দিয়ে আকাশ চায়
তার আলো চাই মেঘ-জল চাই
করতলে বীজ ধরে সে যেন অনন্তের প্রার্থী।

অনন্তের প্রার্থনা এবং 'সূর্যই জন্মতৃষ্ণা' জানিয়ে দেন কবি, যে কারণে তিনি বলেন— 'অন্ধকার ঘুম ভেঙে গেলে আমি সূর্যের মুখ খুঁজি'— এই সূর্য বা আলোর অন্বেষণই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থের ধ্রুব সুর হয়ে ওঠে।

আশির দশকের বাংলা কবিতায় কবি সুনীল মাজি এভাবেই তাঁর নিজস্বতা চিহ্নিত অবস্থানটি তৈরি করে নেন সম্পূর্ণ লিটল ম্যাগাজিনকে আশ্রয় করেই। অকৃত্রিম উচ্চারণ, ভাষা, ফর্ম, উপমা ও অলংকার মিলেমিশে তাঁর কবিতার যে চরিত্র ও অভিমুখ গড়ে ওঠে তাতে একথা নিশ্চিন্তেই বলা যায় সুনীল প্রকৃত অর্থে একজন সৎ ও স্বতন্ত্র ধারার কবি। আজকের সাহিত্য জগতের নানা গোষ্ঠীতন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা সত্ত্বেও তিনি নিজস্ব কলমের জোরে, প্রকৃত অক্ষরসাধকের ভূমিকায় নির্জনে কলকাতা থেকে দূরে গ্রাম বা মফঃস্বলে থেকে ক্রমশ বাংলা কবিতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন বা সত্যিই সহজসাধ্য নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। অন্তত 'লাশসাঁতার' কাব্যগ্রন্থের প্রেক্ষিতে সুনীলকে যেভাবে যতটুকু বুঝে ও চিনে নিতে পেরেছি নিতান্তই তা এক গণ্ডুষ জলে সমুদ্রের ধারণা দেওয়ার অক্ষম প্রয়াস স্বীকার করতেই হয়।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

তথ্যসূত্র:

১. এবাদুল হল, ভবেশ বসু, অভিষেক রায়চৌধুরী ও ভবানীপ্রসাদ গুইন (সম্পাদিত), 'সুনীল মুণ্ডেশ্বরী', উডপেকার, কলকাতা—৪৯, এপ্রিল ২০২২।

২. লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল, সৈকত পট্টনায়ক (সম্পা.), 'কৃষ্ণ প্রহরের কবি, কবিতার সৈনিক', তূর্য, কলকাতা—০৯, জুন ২০১৫।

....

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সানরাইজ বিশ্ববিদ্যালয়, আলোয়ার, রাজস্থান

নবনীতা দেব সেনের 'সীতা থেকে শুরু' : নারীজীবনের 'আন্তরকাহিনী' অন্বেষণের পথে

রিবা দত্ত

সারসংক্ষেপ –

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হন নবনীতা দেব সেন। তিনি নারী জীবনের ইতিবৃত্তকে বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'সীতা থেকে শুরু' গল্প গ্রন্থটি মূলত নারী কেন্দ্রিক। পৌরাণিক কাল থেকে শুরু করে আধুনিককালে নারীদের জীবনযাত্রার ছবি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি কল্পনার পরিমণ্ডল থেকে বাস্তবতার মাটিতে এনে আমাদের হাজির করেছেন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র এখানে স্থাপিত হয়ে ওঠে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে নারীদের জগৎ ও জীবনের পট পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু এরই মাঝে তারা নানা কারণে অপমান, অবহেলা, বঞ্চনার শিকারও হয়েছে। নবনীতা দেব সেন তাঁর 'সীতা থেকে শুরু' গল্প সংকলনে নারীদের এই কঠিন বন্ধুর যাত্রা পথকে যেমন সুগম করতে চেয়েছেন, তেমনি তাদের সংগ্রামী জীবনে এগিয়ে চলার বার্তাকেও সম্প্রচার করেছেন।

সূচক শব্দ –

আধুনিক, নারী, রামায়ণ-মহাভারত, দুঃখ-যন্ত্রণা, পুরুষতান্ত্রিক, মা, আত্মমর্যাদা।

মূল প্রবন্ধ -

বাংলা সাহিত্য জগতের স্বনামধন্য লেখিকা হলেন নবনীতা দেব সেন (১৯৩৮-২০১৯)। সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন। তবে মূলত কবি ও ভ্রমণকাহিনিকার হিসেবে পরিচিতি পেলেও কথাসাহিত্যে তাঁর সুদূর প্রসারী প্রভাব বর্তমান। নারী কণ্ঠের বহুস্বরিকতা তাঁর কথাশিল্পে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা তাঁর ছোটগল্পের জগতে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। নবনীতা দেব সেনের কথন, বর্ণন ও চয়ন রীতির স্পর্শেই গল্পগুলি বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্যতম গল্পগ্রন্থ হল 'সীতা থেকে শুরু' (১৯৯৬)। যেখানে তিন পর্বের মধ্য দিয়ে ত্রিবিধ সময়কালের প্রেক্ষাপটে নারীকেন্দ্রিক জীবন দর্শনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চিরন্তনকাল ধরে নারীর জীবনে ঘটা দুঃখ-দুর্দশা, বিরহ-বেদনা, তাদের ব্যক্তিত্বের সংকট এবং জটিলতা পূর্ণ জীবন অতিবাহনের নানাদিক এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আদি-মধ্য-অন্ত্য তিন পর্বে ('পর্ব এক : পৌরাণিকী', 'পর্ব দুই : মাতৃয়ার্কি', ও 'পর্ব তিন : আধুনিকী') রচিত গল্পের সাহচর্যে কৌতুহলী পাঠক প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সমকাল অর্থাৎ আধুনিক সময়ের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়। এই গল্পগ্রন্থটি উৎসর্গিত করা হয়েছে রাধারানী দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর মতো তিন সুলেখিকার উদ্দেশ্যে। নবনীতা দেব সেনের লেখালেখি সম্পর্কে অনিতা অগ্নিহোত্রী বলেছেন - "নবনীতার লেখায় অবশ্যই আছে নারীর জন্য, পৃথিবীর পঞ্চাশ শতাংশের জন্য এক বিশেষ সহমর্মিতা, তাদের সমানাধিকার, তাদের জন্য মর্যাদার জীবন, হিংসামুক্ত অস্তিত্বের জন্য গভীর উদ্বেগ। নিজের বাড়ির আপনজন, ফুটপাতের মুকুট-পরা পাগলিনী, রামায়ণের সীতা এবং তাঁর হাতের মায়ায় গড়া অসংখ্য নারীচরিত্রের মধ্যে এই চিন্তন, দর্শনের প্রতিফলন।"[১] 'সীতা থেকে শুরু' এই গল্পগ্রন্থেও তিনি নারীজীবনের কথাকেই তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে চেয়েছেন।

'পৌরাণিকী' পর্বে গল্পকার রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির নবতর মূল্যায়ন ঘটিয়েছেন। সেখানে পৌরাণিক চরিত্রগুলি নতুন ব্যঞ্জনার স্পর্শে নবজন্ম লাভ করেছে। মহাকাব্যের যেকোনো নারী চরিত্র সে সীতাই হোক বা দ্রৌপদী, শূর্পনখায় হোক কিংবা অম্বা দুঃখ, শোকাগ্রস্ত ও যন্ত্রণাদায়ক জীবন পেতেই যেন তাদের জন্ম হয়েছে। কারণ 'তাদের দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়।'[২] তাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনি প্রচার লাভ করে। তাই নবনীতা দেব সেন এ পর্বের কাহিনিগুলির মধ্য দিয়ে নারীকে সেই দোলাচল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন। এখানে মূলত কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী। তিনি বলেন - "আমার চেষ্টা মেয়েদের স্থানটি সামনে এগিয়ে নিয়ে আসা। 'কর্ম' থেকে সরিয়ে 'কর্তা'র জায়গায় বসানো। আমার পৌরাণিক গল্পগুলিও তাই।"[৩] হয়তো, কিছু ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ মুক্তময় পরিবেশকে তুলে ধরতে পারেননি। কিন্তু সেই পরিবেশ গঠনের যে সম্ভাবনা ছিল তার সংকেত দিয়েছেন। যেমন- 'মূল-রামায়ণ' এ লঙ্কার অশোক বনে বন্দিনী সীতা হনুমানের সহায়তায় মুক্তি লাভ করলেও তাঁকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ফল অভিযোগের কারণে পুনরায় ফিরে যেতে হয় রাবণ রাজ্যে। আসলে সীতা তো রামায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে রামের বিজয় গাঁথা সম্প্রচার পায়। তাই বাল্মিকী সীতাকে রাবণ রাজ্যে পুনরামনের জন্য তাঁর নারীত্বের অবমাননা করে বলেন - "আর আপনাকেও সত্যি বলিহারি যাই মা সীতাদেবী। সুলক্ষণা রাজকন্যা রাজবধূ হয়ে, একটা সামান্য মুখপোড়া হনুমানের গলা ধরে ঝুলে পড়তে আপনার লজ্জা-ঘেন্না হলো না? পরপুরুষের স্পর্শে আপনার কি পাপের ভয়ও করলো না? নাকি সেসব রাক্ষসের খপ্পরে পড়ে-"[৪] একথা শুনে সীতা বাল্মিকীর অভিযোগের বিরুদ্ধে পান্ডিত্যপূর্ণ প্রতিবাদ করেছেন। তিনি মুখ বুজে সব মেনে নেননি, তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। সীতার এই বলিষ্ঠ কণ্ঠ বাল্মিকী সহ্য করতে পারেননি, কারণ পুরুষ শাসিত সমাজ তো চিরকালই নারীকে অবদমিত করে রাখতে চায়। তাই বাল্মিকী প্রতিজ্ঞা করেন - "তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো! একেবারে আমার সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চির অবস্থা করে ছেড়ে দেবো! কলম যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার হাতে!"[৫] এই কলম তো আসলে সমাজের সৃষ্ট পুরুষের শাসন দন্ড। এরপর সীতার কী পরিণিতি হয়েছিল তা আমাদের সকলেরই জানা। আসলে গল্পকার ধ্রুপদী কাহিনির সত্যতাকে ক্ষুন্ন করতে চাননি। তিনি শুধু এক মুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টির যে সম্ভবনা ছিল সেদিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। 'অমরত্বের ফাঁদে' গল্পে আমরা রামের প্রকৃত স্বরুপ যে কী, তার পরিচয় পাই সীতা-সরমা-ত্রিজটার পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে। সেখানে রামের কাছে সীতার নারীত্বের কোনো মর্যাদা নেই। তিনি শুধু উপভোগ্য বস্তুমাত্র। তাই অনায়াসেই রামের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে পেরেছে - "অমন কত সীতাই আমার হবে, যদি কপালে বউ থাকে; কিন্তু লক্ষ্মণ ভাইটি তো আর হবে না?"[৬] সীতা রামের এই হৃদয়বিদারক আচরণের বিরুদ্ধাচারণ করেন। তাঁর একসময় মনে হয় - "এই পুরুষশাসিত সমাজে নারী ক্রীড়ানক মাত্র।"[৭] কিন্তু সেই সীতাই পুনরায় রামের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। আসলে নবনীতা দেব সেনের সীতা আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাই "প্রতারক পুরুষেরা একবার ডাকলেই... /সব ভুলে পা বাড়াই নতুন ভুলের দিকে।" যমজ পুত্রের জননী, অযোধ্যার রাজরানী ও ভারতবর্ষের মহাকাব্যের নায়িকা হওয়ার বাসনায় সীতা সব ভুলে রামকে ক্ষমা করে দেন। তবে গল্পে নারদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে এক অন্যতম দিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অবস্থিত একজন পুরুষ রাম যেখানে নারীকে অশ্রদ্ধা, অপমান করছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে নারদ পুরুষতন্ত্রের আসল স্বরূপ **উদঘাটন** করেছেন।

'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে শূর্পনখা এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সাহসী, মুক্তমনা নারীর প্রতীক হয়ে উঠেছেন। কাম জ্বরে জর্জরিত হয়ে শূর্পনখা রাম-লক্ষ্মণের কাছে প্রণয় নিবেদন করেন। কিন্তু সমাজের চোখে তো রাজকন্যাদের প্রণয় নিবেদনের অধিকার নেই। আবার নারীর কামজ্বর থাকাও অপরাধ, সেটা শুধু পুরুষেরই 'স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া'। তাই শূর্পনখার প্রেম প্রস্তাব তাঁদের দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন বাণ নিক্ষেপ করেন - "প্রণয় নিবেদনের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দেবার কথা আসে কেন? রাজপুত্রেরা তো রাজকন্যাদের

হামেশাই প্রণয় নিবেদন করছেন। তাঁরা তাতে লজ্জাও পান না, অসম্মানিতও হন না, লোকচক্ষুর ভয়ও করেন না? আমিও তো রাজকন্যা !"[৮] এই চিন্তা-চেতনায় আমাদের প্রচলিত ভাবনার জগতে আঘাত হানে। পুরুষ শাসিত সমাজের অমানবিক আচরণের সম্মুখীন হয়েই, শূর্পনখা সীতাকে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান বাণী প্রেরণ করেছেন। শূর্পনখার এই ভবিষ্যৎ ভাবনায় সত্য হয়ে উঠেছে 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পে। নবনীতা দেব সেন রামায়ণের সীতা চরিত্রের বিনির্মাণ শুধু গল্পে করেননি, তাঁর 'বামাবোধিনী' উপন্যাসেও দেখিয়েছেন। সেখানে অংশুমালা লৌকিক রামকথার সাহায্যে সীতার জীবন বর্ণনা করেছেন -

"তোর কোলে জন্মিলাম মাতা বসুন্ধরা।
কোন পাপে জন্ম মোর এত কষ্টে ভরা।।
কী দোষ করিল সীতা, জন্মেই ছাড়িলে।
অনাথ করিয়া মোরে এত দুঃখ দিলে।।
না জানি কে মাতা পিতা গর্ভ সোদর নাই।
স্রোতের শেওলা হৈয়া ভাসিয়া বেড়াই।।
ভাসিতে ভাসিতে আসি কোন বা তপোবনে।
কোথায় যাইবো কালি কেহ নাহি জানে।।
চৌক্ষে পানি নাই গো সীতার মুখেতে নাই বাণী।
মহারণ্যে একাকিনী সোনার পুতলিখানি।।"[৯]

গল্পেও সীতা একদিকে নিজের জন্ম রহস্যের সন্ধান করেছেন, অন্যদিকে শঠ, প্রবঞ্চক, অমানবিক, অবিবেচক রামের প্রতি সীতার বিদ্বেষ বর্ষিত হয়েছে। ধ্রুপদী কাহিনির যথার্থতাকে বজায় রেখেই সীতার মধ্যে প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে - "অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ পত্নীকে যিনি স্বমোহিমায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না, বরং ভীরুর ন্যায় নির্বাসন দিয়ে মন্দজনের নিন্দাবাক্যকেই জয়ী করেন, সেই দুর্বল, প্রবঞ্চক, অসাধু প্রেমিকের অন্নবস্ত্র আশ্রয় আমার আর আকাঙ্ক্ষিত নয়।"[১০] আশ্রমবাসিনী সীতা নিজের আত্মমর্যাদা ও সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। তারই প্রতিফলে কুচক্রী রামের ষড়যন্ত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ সভায় সীতার আত্মবিসর্জন ঘটানো হয়। যা সত্যিই এক শোচনীয় পরিণতি। এই পরিণতির কথাই আমরা যেমন মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' উপন্যাসে পাই, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পেও এর ছবি রয়েছে। 'হৈমন্তী' গল্পের অপু বলেছেন- "যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে।"[১১] এই লোকধর্মকে বড় করে দেখাতে গিয়েই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতে নারীদের চিরকাল বলি হতে হয়।

অম্বা ও শকুন্তলা দুই নারীর প্রতি পুরুষ শাসিত সমাজের অসম্মান, দুর্ব্যবহার, অবমাননার চিত্র 'অম্বোপাখ্যান' ও 'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্' গল্পে পাওয়া যায়। 'অম্বোপাখ্যান' এ একদিকে রয়েছে শাল্বের মতো পুরুষেরা যারা নারীর প্রতি বিশ্বাসহীন হয়ে তাদের অপমান, প্রত্যাখ্যানে পিছু পা হন না, অন্যদিকে ভীষ্মের মত ব্যক্তিত্ববান পুরুষ যারা নারীকে সম্মান করেন, তার আত্ম নিবেদনকে গুরুত্ব দেন। আর 'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্' গল্পে দুষ্মন্তের মতো বহুগামী পুরুষ কর্তৃক স্ত্রী শকুন্তলা কীভাবে অপমানিত, অবহেলিত হয়েছে তার চিত্র পাওয়া যায়। রাজা দুষ্মন্ত এতটাই ব্যভিচারী যে - "নিত্য নবীন শয্যাসঙ্গিনীর খোঁজে তাঁর প্রাণে শান্তি নেই, হৃদয়জ্বালাও আর মেটে না।"[১২] তবে শলভার মতো বুদ্ধিমতী নারীর কৌশলে শেষপর্যন্ত অপদস্ত হতে হয় দুষ্মন্তকে। দুই গল্পেই এক শান্ত, সরল, পরিচ্ছন্ন পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন গল্পকার।

'মাতৃয়ার্কি' পর্বে নবনীতা দেব সেন বারোটি স্কেচের মধ্য দিয়ে, তাঁর শয্যাশায়ী বিধবা মাকে অবলম্বন করে কৌতুক রসের আয়োজন করেছেন। 'মাতৃয়ার্কি' (মাতৃ+ইয়ার্কি) নামের মধ্যেই রয়েছে একটা অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রসন্নময় রসময়তা। সেখানে 'পিতৃতান্ত্রিক' সমাজের প্রতি এক বক্রোক্তির বাণ চালানো হয়েছে। পাঠক মহলের কাছে নিজের কীর্তিমান মা'কে নিয়ে এইভাবে হাসির খোরাক পরিবেশনের ক্ষমতা সত্যিই অনবদ্য। পৌরাণিক কাল অতিক্রান্ত হয়ে আমরা মাতৃতান্ত্রিক কালে এসে পদার্পণ করেছি। যেখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রাধান্য পেয়েছে। এই মাতৃতান্ত্রিক নারীদের সম্পর্কেই নবনীতা দেব সেন বলেছেন - "তাঁরা বাল্যে পিতাকে যৌবনে পতিকে এবং বার্ধক্যে পুত্রকে অনায়াসে-অঙ্গুলি সঞ্চালনে পদানত রাখেন। শুধু পুরুষজাতি কেন, তাবৎ মনুষ্যসমাজ তথা সসাগরা বসুন্ধরা তাঁদের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব মেনে নেয়। এঁরা এঁদের জীবনের সব কিছুকেই অনায়াস স্বায়ত্ব-শাসনে রাখেন। দ্বিতীয় কোনো শক্তির তোয়াক্কা করেন না।"[১৩] পুরুষবিহীন সংসার মানে বিবর্ণ নয়, সেখানে হাসি-খুশি-আনন্দ থাকে। তারই প্রমাণ স্বরুপ এই বারোটি স্কেচ। এখানে রোগশয্যায় শায়িত বিধবা মা, তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্না মেয়ে ও দুই নাতনীকে নিয়ে মাতৃতান্ত্রিক সংসারটি গঠিত হয়েছে। 'মাতৃয়ার্কি [অর্থাৎ বন্দে মাতরম্!]' অংশে গল্পকথক খুকু তাঁর তেজোদ্দীপ্ত, সাহসী, প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী, দৃঢ় চিত্তের অধিকারিণী মায়ের রূপকে চিত্রিত করেছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে বারোটি স্কেচের মধ্যেও সে রূপটি ধরা পড়েছে। সেখানে প্রবল শারীরিক অসুস্থতাতেও মায়ের কাব্য প্রেমের উপাসনা ব্যক্ত হয়েছে, কখনো বা নাতনীদের সাথে দিদিমার দুষ্টু মিষ্টি মুহূর্তের কথা রয়েছে, নাতনীদের তিনি অভিভাবকের মতো বুঝিয়েছেন, শুধু পাশ্চাত্যের মেডুসা, জেসন, ল্যাবিরিনথ, থিসিয়াস জানলেই হবে না , আমাদের দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও জানতে হবে। আবার তিনি খুকুকে গীতা পাঠের দ্বারা মন শান্ত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। অথবা শুধু জৈব কর্মে যুক্ত না থেকে সৃজনমূলক কর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মচিন্তার পথে অগ্রসর হতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, জীবনে ঘটে যাওয়া যেকোনো নঞর্থক ঘটনাকে খুকুর মা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেন, ফলে মানব মনের দুঃখ-কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়ে যায়। তিনি এও বলেন, জীবনে চলার পথে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনায় শিক্ষণীয়। আবার বাজেট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, দেশের অর্থনৈতিক সংকটের প্রকৃত কারণ কী ? তা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি জাতপাতের প্রসঙ্গে ও পণপ্রথা মতো সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সরব হয়ে হরিবাবুর সাথে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। কখনো তিনি খুকুর সাথে জ্ঞান চর্চা, সাহিত্য চর্চা করেছেন। কখনো বা বিভিন্ন দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে, বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের গল্প শুনিয়েছেন। সেখানে সিস্টার নিবেদিতা, সারদা দেবী, শ্রীমার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এইভাবেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ছোট ছোট চিত্রের সহযোগে একটি বৃহৎ ক্যানভাসকে সুসজ্জিত করে তুলেছেন গল্পকার।

তৃতীয় পর্বের গল্পে আমরা সাম্প্রতিক কালে এসে হাজির হয়। সেখানে পাঁচটি আধুনিক শহুরে মেয়ের জীবন কথা ব্যক্ত হয়েছে। সাধারণত নারীর কাছে মাতৃত্বের স্বাদ এক অন্যতম অনুভূতি । যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তুল্য। এই মাতৃত্বের ধারণাকে কেন্দ্র করেই এখানে তিনটি গল্প রচিত হয়েছে – 'এলিজাবেথান সিস্টেম', 'পরভৃৎ' ও 'প্রোপ্রাইটার'। তবে তিনটি গল্পকেই তিন রকম ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজে নারী সন্তান ধারণে অসফল হলে, তাকে নানা কটুকথার সম্মুখীন হতে হয়। গল্পকার এই ধ্যানধারণাকে উপেক্ষা করে এক বিকল্প ভাবনা উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন 'এলিজাবেথান সিস্টেম' গল্পে। কৃষ্ণা বসু তাঁর 'পিতাদের পৃথিবী' কবিতায় বলেছিলেন - "মা তো তার সন্তানের কেউ নয়, হায়,/ কেউ নয় সন্তান মায়ের-মাঝখানে/ খাড়াখাড়ি পরাক্রান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে/ পিতাদের পৃথিবীর প্রবল প্রতাপ।" এই ধারণারই ভিন্ন স্বর প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পে। সেখানে নবনীতা দেব সেন দেখালেন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির দ্বারা মেয়েরা পুরুষ ছাড়া মা হতে পারে, কিন্তু পুরুষ একক দক্ষতায় পিতা হতে পারে না। তাই পিতার পিতৃত্ব মায়ের একটি কথার উপর নির্ভরশীল। মায়ের একটি নেতিবাচক শব্দে পিতার পিতৃত্ব টলে যেতে পারে। গল্পে ছোড়দা ও বৌদি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্পকার এক অভাবনীয় উত্তরণের সংকেত দিয়েছেন। অন্যদিকে 'পরভৃৎ' গল্পের কথা

বলতে গিয়ে আমাদের মনে আসে কবিতা সিংহের কণ্ঠে উচ্চারিত সেই কথা - "সত্যকার সঙ্গমের রণ/ কে দেবে তোমায় নারী?/ কোথায় সে পুরুষোত্তম?" গল্পে সরমাও সেই পুরুষোত্তমের খোঁজ পায়নি। মা হওয়ার অদম্য ইচ্ছা সত্ত্বেও সৌমেন সরমার স্বপ্নপূরণ করেনি। ছোট ছোট দেওর, ননদকে সন্তানের মতো লালন-পালন করতে বলেছে। কিন্তু সরমার হৃদয় আপন সন্তানের সুর শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত, তার গর্ভে আশার আলো এসে হাজির হয়। সন্তানধারনকারী সরমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু রমেনের কাছে শোনা কঠিন সত্যের আঘাতে সরমার রঙিন স্বপ্ন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কারণ সৌমেন অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। সেই নারীরই ভালোবাসার বীজ সে সরমার গর্ভে রোপিত করেছে। লজ্জা, ঘৃণার প্রবল দংশনে সরমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। সে স্বামীর দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওঠে। সরমা এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উত্তরিত হতেই, সিদ্ধান্ত নেয় অন্যের সুখস্বপ্নকে সে নিজের গর্ভে লালন করবে না, তাকে ধ্বংস করবে। এখানে তার মননের আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান বড় হয়ে উঠেছে। আর আমরা তো প্রাচীন কাল থেকেই শুনে আসছি - "নারীর নিজদেহের ওপর তাকে অধিকার দেয়নি শাস্ত্র, এবং সব দেশেই প্রাচীন কালে শাস্ত্রই ছিল সংবিধান। এই শাস্ত্রবিধি বলেছে, নারীর যৌনতার ওপরে পূর্ণ অধিকার তার স্বামীর এবং প্রকারান্তরে তার শ্বশুরবাড়ি এবং তারও ওপরে সমাজের।"[১৪] গল্পে যেন এই ভাবনার মূলেই আঘাত হানা হয়েছে। মাতৃত্ব বিষয়কেন্দ্রিক আরেকটি গল্প হল 'প্রোপাইটার'। দাম্পত্য সম্পর্কে যদি প্রতিকূলতার মেঘ ঘনিয়ে আসে , তবে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করায় শ্রেয়। যেখানে দ্বন্দ্ব-বেদনার ঘনঘটা তৈরি হয়, সেখানে সতী-সাবিত্রী হয়ে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। তাই 'প্রোপ্রাইটার' গল্পের শুভমিতা বিবাহ বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন করে, নতুনভাবে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হয়। তবে প্রথমপক্ষের সন্তানের প্রতি মাতৃত্বের আবেদনকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। যেমনভাবে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'শিখার ঠিকানা' গল্পের শিখার মধ্যে সন্তান প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। তেমনিভাবেই শুভমিতা বাৎসল্য রসের তাগিদে পুত্র শুভাশিসকে কাছে পেতে তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আসলে মা ও সন্তানের সম্পর্ক তো চিরন্তন, যা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পবিত্র সম্পর্ক। তাই - "এবারে আর চিঠিপত্র নয়, নিজে চলে যাবে শুভমিতা। গোবিন্দ ঘোষাল লেনকে আর ভয় করছে না। দেবাশিস এখন আর সরিয়ে রাখতে পারবে না শুভকে।"[১৫] একসময় শুভমিতা যেমন প্রেমহীন দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছিল, তেমনিভাবেই এখন সন্তানের প্রতি হৃদয়স্পর্শী ভালবাসা থেকে তাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

'মুখর নৈঃশব্দ্য' গল্পটিতে নামহীন এক নারী ঘ নামক পুরুষকে ভালোবেসে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছিল। 'ঘ' নিজের জীবন গুছিয়ে নিলেও, নামহীন এই মেয়েটি তার সহজ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। সে চারিত্রিক দৌর্বল্য যুক্ত ও ভোগলালসা পূর্ণ ক, খ, গ, ঙ নামধারী একাধিক পুরুষের সাহচর্যে এসেছে। সেখানে উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদে কর্মরত মানুষেরা কীভাবে অধঃপতনের পথে যাত্রা করছে তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে মেয়েটি সন্ধান করেছিল প্রকৃত প্রেমিকের, স্বপ্ন দেখেছিল ঘর বাঁধার। তার সেই স্বপ্নই এক লহমায় ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়। তার জীবনের এই দোলাচল অবস্থায় এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তাই গল্পকার অন্তিম এসে তাকে যীশুর পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়েছেন। সে যীশুকেই জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে মেনে নিয়েছে - "আমার আত্মার পূর্ণ অধিকার, আমার চিরকাল, আমি তাই দিয়ে দিয়েছি যীশুকে-যীশুই একমাত্র বলীয়ান পুরুষ, যীশুই প্রকৃত শক্তিমান, আমি কেবল তাঁরই।"[১৬] গল্পকার 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ' গল্পটিকে নতুন ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন। সেখানে গল্পকথক একজন বিবাহিত নারী। যে অবিবাহিত অধ্যাপিকা বান্ধবীর সাথে আড্ডা জুড়েছে। গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হল সংসার মাঝে গল্পকথকের অস্তিত্ব সংকটের টানাপোড়েন। একসময় কলেজের ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ন, দক্ষ সেতার বাজিয়ে, ফিলোসফি পাশ করা এক মুক্তমনা নারী, সামাজিক নিয়মেই সংসার জীবনে পদার্পণ করে। কিন্তু সংসারী হয়ে সে আপন অস্তিত্বের খোঁজ পায় নি বরং তাকে নিঃসঙ্গতা, উদাসীনতা, একাকীত্বতা গ্রাস করেছে। বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক ভোগবাদী নাগরিক সমাজের চিত্রটিই এখানে ধরা পড়েছে। গল্পকথক এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। তবে সংসারকে অস্বীকার করে নয়। সংসারের মধ্যে

থেকেই নিজেকে আত্ম-অন্বেষণ, আত্ম-আবিষ্কার করতে চেয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের জীবনে নতুন প্রাণ বায়ুর সঞ্চার ঘটাতে চায়। তাই বন্ধু গীতুর কাছে চাকরির ইচ্ছা প্রকাশ করে - "হ্যাঁরে গীতু, তোদের ওখানে ফিলসফিতে কোনও ভেকেন্সি নেই? আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড।... এখন আমার কাছে আলিপুরও যা, গদাধরপুরও তাই। এটা কি একটা লাইফ হল? হয় ভীষণ হেকটিক্, আর নয়তো বোরিং! বরং তোদের ওখানটাই বেশি রিফ্রেশিং হবে।"[১৭] এই জীবনই তাকে নতুনভাবে নিজেকে জানার, চেনার সুযোগ করে দেবে। কারো কন্যা-স্ত্রী-জননীর পরিচয়ে নয়, এ আত্মপ্রতিষ্ঠাই তাকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সন্ধান দেবে।

'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থে এইভাবেই নবনীতা দেব সেন পৌরাণিক তথা প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আমাদের আধুনিক পরিমন্ডলে এনে হাজির করেছেন। সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক নানা কারণেই নারীদের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক, সমস্যা পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে হয়। নারীজীবনের এই কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর যাত্রাপথকেই তিনি সুগম করতে, নারীদেরকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে ও তাদের হয়ে সমানাধিকারের দাবী জানাতে চেয়েছেন। এই গল্পগ্রন্থে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই সমাজের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে, এই অন্তহীন যাত্রা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র :

১| দেব সেন, নবনীতা, সম্মাননা প্রণতিপত্র, অহর্নিশ, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, নভেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা : ৪০।
২| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ১০।
৩| নবনীতা দেব সেনের মুখোমুখি, বইয়ের দেশ, এবিপি প্রাঃ লিমিটেড, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ০১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা : ১২৬।
৪| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ২০।
৫| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ২১-২২।
৬| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ৪০।
৭| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ৪৩।
৮| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ৩১।
৯| দেব সেন, নবনীতা, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দশম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা : ২৭৮।
১০| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ৫৬।
১১| ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, শেষ পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৮৮, একত্র প্রচার : পৌষ ১৪১৮, পৃষ্ঠা : ৫৫৬।
১২| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ৭২।
১৩| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ৮১।
১৪| ভট্টাচার্য, সুকুমারী, বিবাহ প্রসঙ্গে, ক্যাম্প, ২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৮, পৃষ্ঠা : ১৮।
১৫| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ১৫৬।
১৬| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ১৬৪।
১৭| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা : ১৬৯।

সহায়ক গ্রন্থ :

১| দেব সেন, নবনীতা, সীতা থেকে শুরু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০০।

২| নবনীতা দেব সেন সম্মাননা প্রণতিপত্র, অহর্নিশ, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, নভেম্বর ২০১৯

৩| নবনীতা দেব সেনের মুখোমুখি, বইয়ের দেশ, এবিপি প্রাঃ লিমিটেড, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ০১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২।

৪| ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, শেষ পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৮৮, একত্র প্রচার : পৌষ ১৪১৮।

৫| ভট্টাচার্য, সুকুমারী, বিবাহ প্রসঙ্গে, ক্যাম্প, ২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৮।

৬| দেব সেন, নবনীতা, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, দশম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২১।

৭| সেনগুপ্ত, মল্লিকা, সীতায়ন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৬।

৮| ভট্টাচার্য, সুতপা, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪।

৯| ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, (সম্পাদিত), কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক, আশাদীপ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪।

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

দেবনারায়ণ গুপ্তের শ্যামলী নাটক: প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান

রিঙ্কু প্রামাণিক

সারসংক্ষেপ -

একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন সকলেই চেয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের মধ্যে নানান শারীরিক সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কেউ চোখে দেখে না, কেউ কানে শোনে না, কারো বা চলাফেরার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ আর পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তিদের থেকে এদের কোনো না কোনো ভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ লক্ষ করা যায়। যার ফলে তাদের প্রাত্যহিক জীবন নানান বাধা এবং প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকে। এই প্রতিবন্ধকতা ব্যক্তি বিশেষে ক্ষণস্থায়ী আবার অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীও হয়ে থাকে।

নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মূলত পাঠের জন্য হলেও নাটক প্রধানত অভিনয়ের জন্য। প্রতিটি নাটকে এক বা একাধিক চরিত্র থাকে। নাটকের কাহিনী বা ঘটনা মূলত নাটকের এই পাত্রপাত্রী বা চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। যাদের মধ্যে অন্যতম হল প্রতিবন্ধী চরিত্র। 'প্রতিবন্ধী' শব্দের অর্থ বাধাপ্রদ অর্থাৎ সমাজের আর পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তি থেকে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রতিনিয়ত এরা বঞ্চনার শিকার- এই সকল ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে নাট্যকারেরা নাটক রচনা করলেন, যাদের মধ্যে অন্যতম একজন নাট্যকার হলেন 'দেবনারায়ণ গুপ্ত' (৭ ডিসেম্বর ১৯১০-১১ মে ২০০০)। তাঁর রচিত 'শ্যামলী' নাটকে প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থানকেও খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যারা 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' ব্যক্তি হয়েও এই অপূর্ণতাকে নিজের বিকাশের পথে বাধা মনে না করে তাকে জয় করে এগিয়ে চলেছেন কেবলমাত্র মনের জোরে- তা আমরা অনেকেই জানি না। একটি বিশেষ অঙ্গের বৈকল্য তার অন্যান্য অঙ্গকে বিকল করে না। যে অন্ধ সে অনুভবে প্রখর, আর তার দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধকতার অন্যদিকে রয়েছে সুতীব্র ঘ্রাণশক্তি- কেউ ভালো গান গায়। এই সমস্ত 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' নারীদের মধ্যে 'শ্যামলী' যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক এবং চরিত্র তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। নাটকের শুরুতে শ্যামলীকে সমাজ এমনকি তার পরিবারও বঞ্চিত, অবহেলিত করলেও শেষে কিন্তু সে নাটকের মধ্যে নিজের যথাযোগ্য পরিচিতির স্থান নিজেই গড়ে তুলেছে, যা নাটকটিকে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে ভূষিত করেছে তা আমাদের মেনে নিতেই হবে।

মূলশব্দ –

নারী, ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নাটক, সামাজিক অবস্থান।

মূল প্রবন্ধ -

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?"[১]
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সবলা কবিতা)

'নারী ক্ষমতায়ন' শব্দটি নিজেই বোঝায় যে নারীরা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়- তাদের ক্ষমতায়ন করা দরকার।এই বেদনাদায়ক সত্য বহুকাল ধরেই বিদ্যমান। সম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীদের তুচ্ছতা ও ক্ষমতাহীনতার অতল গহ্বর থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ শুরু হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজ সারা বিশ্বে নারীর স্বাধীনতাকে অনেক ক্ষেত্রে দমন করেছে। ফলে নারীদের কোনো মতামত দেওয়ার অনুমতি ছিল না। নারীরা তাদের নিজের মনের ঘরে বন্দি ছিল। সময় বাড়ার সাথে সাথে তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের জীবনের অর্থ কেবল গৃহে সেবা করার চেয়ে অনেক বেশি। যত বেশি সংখ্যক নারী মানবসৃষ্ট বাধা অতিক্রম করতে শুরু করেছে, বিশ্ব নারীর উত্থান ততবেশি করে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাস সঠিক কোনো তারিখ থেকে শুরু হয় না, এটি একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া। নারী যেই সময় থেকে তার অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠবে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তার নিজের প্রতি বিশ্বাস ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে যেমন নানান ধরনের আন্দোলন গড়ে ওঠে পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারেরাও নারীর বিকাশ এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে হাতে কলম ধরেছেন। যার মধ্যদিয়ে তাঁদের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান আলোচনার পূর্বে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতে পারে – একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন সকলেই চেয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের মধ্যে নানান শারীরিক সমস্যা লক্ষ করা যায়। যেমন- কেউ চোখে দেখে না, কেউ কানে শোনে না, কারো বা চলাফেরার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ আর পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তিদের থেকে এদের কোনো না কোনো ভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও আচরণ লক্ষ করা যায়। যার ফলে তাদের প্রাত্যহিক জীবন নানান বাধা এবং প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকে। এই প্রতিবন্ধকতা ব্যক্তি বিশেষে ক্ষণস্থায়ী আবার অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীও হয়ে থাকে।Disability & Health Overview অনুযায়ী প্রতিবন্ধী (Disability) সম্পর্কিত তথ্য এখানে উদ্ধার করা হল- What is Disability?

"A disability is any condition of the body or mind (impairment) that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities (activity limitation) and interact with the world around them (participation restrictions)"[২]

আবার World Health Organization (WHO) প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত যে মত প্রকাশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে-

"Disability is a part of being human. Almost everyone will temporarily or permanently experience disability at some point in their life. Over 1 billion people about 15% of the global population currently experience disability, and this number is in creasing due to the prevalence of noncommunicable diseases."[৩]

সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ নাটক। সামগ্রিকভাবেই সাহিত্যে থাকে জীবনের সমালোচনা। নাটককে আরও বলা হয় সমাজের দর্পণ। নাটক আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে বিশাল স্থান দখল করে আছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। আমাদের জীবনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রেরণা-ক্ষোভ সবকিছুই প্রতিফলন ঘটে নাটকের মঞ্চে। জীবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া ছোট ছোট গল্পগুলোই অভিনয়শৈলীর মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া মঞ্চ নাটকের মূল উদ্দেশ্য। নাটক জীবনের কথা বলে। নাটক হচ্ছে সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কখনো কখনো সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় নাটক। সামাজিক অনাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও কুসংস্কার নিয়ে তৈরি নাটক আমাদের সমাজকে সব সময়ই নাড়া দিয়েছে, পরিবর্তন এনেছে সমাজ

মননে। নাট্যকার যেমন মঞ্চায়নের কথা ভেবেই নাটক লেখেন, তেমনি নাট্যপরিচালকও দর্শকদের কথা চেতনে অবচেতনে ভেবেই নাটক পরিচালনা করেন। ফুল আপনিই ফোটে কতশত, কিন্তু মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তার সৌন্দর্যের সার্থক প্রকাশ ঘটে। নাটকে অভিনীত জীবনকথা ও দর্শকদের জীবন চেতনায় গ্রহণ- বর্জনের দ্বারাই সার্থক হয়ে ওঠে। নাট্যকারেরা যেখানে বহু নাটক রচনার ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন তথা উত্থানকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ফলে নারী বিশেষ মর্যাদার আসনে ভূষিত হয়েছেন। উক্ত আলোচনাটি নারীর ক্ষমতায়ন কেন্দ্রিক হলেও এখানে মূলত 'বিশেষ ভাবে সক্ষম' নারীর উত্থান, বিকাশ এবং ক্ষমতায়নকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নাটকে যে সকল প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলিকে দেখা যায় তারা তো সব কল্পিত চরিত্র। বাস্তবের ছবিকে নাট্যকারেরা কল্পনার মৌহজালে বাস্তবোত্তর করে তোলেন এবং প্রতিবন্ধী বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাহলে কেনই বা এই সকল প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নাট্যকারেরা নাটক লিখতে গেলেন?

যে কোনো নাটকের মধ্যে দিয়েই নাট্যকার দর্শক এবং সমাজকে কোনো না কোনো বার্তা দিয়ে থাকেন। বাংলা যে সকল নাটক প্রতিবন্ধী নারীদের নিয়ে নাট্যকারেরা রচনা করেছেন, সেখানে নারীর অবস্থান কেন্দ্রিক সামাজিক নানান দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমাজ জীবনে এই সকল প্রতিবন্ধী নারীর অবস্থান নাটকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি 'বাধাপ্রদ' অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সমাজের আর পাঁচজন স্বাভাবিক ব্যক্তি থেকে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানান ক্ষেত্রে নানান বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সেখানে বিশেষত প্রতিবন্ধী পুরুষ অপেক্ষা প্রতিবন্ধী নারীর অবস্থান আরো শোচনীয়। এমনকি সমাজ, অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের মানুষজনও এদের দিনের পর দিন অগ্রাহ্য করেই চলেছে। ফলত তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হিসেবে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এই সকল নারীরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী হলেও মনের দিক দিয়ে এরা অক্ষম নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাচিক প্রতিবন্ধী 'সুভা' প্রসঙ্গে বলেছিলেন- "যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না।"[৪] – প্রতিবন্ধী নারীদের সংকট এখানেই। একটি অঙ্গের বৈকল্যের ফলে সমাজ এদের অচল মনে করলেও এই সকল নারীদের অন্য অঙ্গগুলি যথাযথ ও পরিপূর্ণ ভাবে সক্ষম হয়ে ওঠে, যাকে কেন্দ্র করেই প্রতিবন্ধীরা তাদের অক্ষম অঙ্গটির চাহিদা পূরণ করে এবং নানান বাধা-বিঘ্ন জয় করে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেন। যার অসংখ্য উদাহরণ আজও আমাদের কাছে আছে।

প্রতিবন্ধী নারীর জীবনকথাকে নাটকের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত (৭ ডিসেম্বর ১৯১০–১১ মে ২০০০)। তাঁর 'শ্যামলী' (১৯৫৩) নাটকে শ্যামলী নাম্নী বোবা কালা এবং কিছুটা মানসিক দিকেও অসুস্থ নারীর জীবনকথা উঠে এসেছে। বাঙালি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিবন্ধী কন্যাকে নিয়ে পিতা মাতার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। শ্যামলীর প্রকৃতি প্রেম, মুগ্নতা দিয়ে এই নাটকের সূচনা। বৃষ্টি-মেঘ-আকাশের সৌন্দর্য সে এক মনে অনুভব করছে। ফলে বোঝায় যাচ্ছে শ্যামলী শারীরিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী হলেও প্রকৃতির রূপ আস্বাদন থেকে কিন্তু সে বঞ্চিত নয়। বাড়ির ছাদের উপর উঠে প্রত্যাহ সে আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ সহ মেঘের যে রূপ তা উপভোগ করে। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে শ্যামলী প্রতিবন্ধী হলেও সে কিন্তু সৌন্দর্যের পূজারি। নাটকের মধ্যে তাকে নিয়ে বিবাহ প্রহসন এবং বিবাহোত্তর পর্বে নানান ধরনের জটিলতার পরিচয় আছে। যার মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধী নারী তথা শ্যামলীর সামাজিক অবস্থান, গুরুত্ব এবং নাটকের শেষে নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করার যে লড়াই তা নাট্যকারের সৃষ্টিশৈলির মধ্যদিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। ধনী ঘরের পুত্র অনিলকে রূপসী কন্যা দেখিয়ে যখন বিবাহ মুহূর্তে 'বিশেষ চাহিদসম্পন্ন' নারী শ্যামলীকে সম্প্রদান করা হল তখন বিবাহ আসরে হৈ চৈ আরম্ভ হল। তখন শ্যামলীর পিতা সেই মুহূর্তে বললেন - "পীতাম্বর // যে বিয়ে তোমরা দিতে এসেছ, এ সে বিয়ে নয়- সে কনেও এ নয়। এটি আমার বোবা কালা বড় মেয়ে।"[৫]

শ্যামলী একজন প্রতিবন্ধী নারী হওয়ার ফলে তার বিয়ে দিতে না পারায় গ্রামের মুরুব্বীরা কন্যার পিতাকে একঘরে ও জাতিচ্যুত করার হুমকি দিয়েছেন। তাই সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যই পিতা এই অভাগা কন্যাটিকে একবার গোটা কতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর (ছোট মেয়ে) বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিয়েছেন কেবল। এর জন্য পিতা সকলের সামনে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বলেছেন এই অক্ষম কন্যার সাথে বিয়েকে বিয়ে মনে না করাই ভালো। সমাজের মুখ রাখতে গিয়েই কন্যার পিতাকে এই হীন ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ শ্যামলীর মতো 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' বোবা কালা মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না। আবার বিবাহিত কন্যা ঘরে থাকলেও সমাজে মুখ দেখানো মুশকিল- তাই এই বাধ্যতা, নীচতা এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন মনভাবের প্রতিফলন। এমনকি শ্যামলীর মা নিজেই নিজেকে বলেছেন- পূর্ব জন্মে সে নিজে কোনো পাপ করেছিল, তাই এই জন্মে অক্ষম কন্যা তার গর্ভে এসেছে। অর্থাৎ খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে সমাজে মনুষ্যসৃষ্ট গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনভাব, শিক্ষার অভাবের জন্যই প্রতিবন্ধী নারীরা আজও সমাজের পাশাপাশি পরিবারেও অনেক ক্ষেত্রে শোষিত, অত্যাচারিত হয়েই চলেছে। তাই ভাগ্যের পরিহাসে শ্যামলীর সাথে শিক্ষিত যুবক অনিলের বিয়ে হলেও বরপক্ষের লোকেরা এই বিয়েতে সম্মতি দেয়নি। শিশির বলতে থাকে-"শিশির // সুন্দরী মেয়ে দেখিয়ে কালা-বোবা মেয়ে গছিয়ে দিলেন! মাসীমাকে গিয়ে কি বলব? মুখ দেখাব কি করে?"[৬] পাশাপাশি শ্যামলীর পিতাও মেয়ের প্রতিবন্ধকতাকে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকেন-"পীতাম্বর // কিন্তু ও যে কালা বোবা, পাগল, বুদ্ধিহীন।"[৭]

অনিল পাত্র হিসেবে সে মনে করে যে তার কোনো অপমান হয়নি এবং এই বিয়ে সে মেনে নেয়- শ্যামলীকে সে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দেবনারায়ণ গুপ্ত অত্যন্ত কৌশলে প্রতিবন্ধী নারীর বিবাহ সমস্যাকে নাটকের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং প্রতিবন্ধী নারীকে কেন্দ্র করে সমাজের অন্যান্য সুস্থ সবল মানুষদের চিন্তাভাবনাকে দেখিয়েছেন। এমনকি শ্যামলীর পিতামাতাও মনে প্রাণে চায় না তার প্রতিবন্ধী মেয়ে প্রতিবন্ধকতার কারণে সংসার জীবনযাপন করুক। তাই বারবার অনিলকে নতুন করে বিয়ে করার কথা বলেন। অর্থাৎ খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মানেই তারা প্রতি ক্ষেত্রেই বন্দি। তাদের আর পাঁচজন স্বাভাবিক বধূদের মতো সংসার জীবনযাপন করার অধিকার নেয়। তারা কেবল সমাজে বঞ্চিত, অবহেলিত হয়েই থাকবে। কিন্তু শ্যামলী প্রতিবন্ধী নারী হলেও সে কখনো তার অক্ষমতাকে জীবনে চলার পথে বাধা মনে করেনি। সে অনবরত সমাজ তথা পরিবারের তুচ্ছ এবং সংকীর্ণ ধারণাকে পিছনে ফেলে কেবল মনের জোরে সামনে এগিয়ে গেছেন এবং অন্তরের লুপ্তশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। শ্যামলী বোবা কালা হলেও সে কিন্তু অনুভব করতে পারে; বুঝতে পারে সমাজ, পরিবার তাকে কী বলতে চাইছে। কিন্তু তা হলেও অনিলের মা সরলা তাকে অক্ষমতার কারণে মন থেকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। পরিবার, পরিজন সমাজ শ্যামলীকে উপযুক্ত নারী হিসেবে গ্রহণ না করলেও অনিল কিন্তু শ্যামলীকে পত্নি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন, তার পিছনে ঢাল হয়ে দাড়িয়েছেন।নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে সমাজ তথা দর্শক সাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন- শ্যামলী কালা বোবা কিন্তু তারও সুন্দর মন নামক বস্তু রয়েছে। একটা অঙ্গ সচল না থাকলেও অন্য অঙ্গগুলি সুস্থ ও সবল রয়েছে। যার মাধ্যমে আর পাঁচজন মানুষের মতই সুখ, দুঃখ, বেদনা, অভাব, আনন্দ, তৃষ্ণা সে অনুভব করতে পারে। তার উপর সে নারী, যে নারী একজন স্বামীর স্ত্রী, প্রণয়ীর প্রণয়িনী, কারও বা সন্তান। শারীরিক অঙ্গ অক্ষম বলে কী শ্যামলীর কখনো নারীত্বের এইসব স্বভাবগুলি প্রকাশ পাবে না? শ্বশুরবাড়িতে গেলেও শ্যামলীর মন তার নিজের বাড়ি ও পিতামাতার দিকেই চেয়ে থাকে। এখানেই শ্যামলী আর পাঁচজন স্বাভাবিক নববধূর সমভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এমনকি পাড়ার দরিদ্র ছেলে মেয়েরা যখন তাকে পাগল মনে করে তার পিছনে লাগে তখন কিন্তু শ্যামলী ছেলে মেয়েদের অত্যাচার, বিরক্তের হাত থেকে বাঁচা এবং তাদের খিদে মেটানোর জন্য সকলের হাতে খাবার তুলে দেয়। অর্থাৎ এখানে

শ্যামলীর মানবিক দিকটিও যথাযথ ভাবে লক্ষ করার মতো। সে বিয়ের পর স্বামীর সাথে প্রথম বাপের বাড়ি গেলে অনুভবের (অক্ষমতার কারণে) মাধ্যমে তার পিতাকে সে আদর করে এবং ইশারার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করে- অনিল খুব ভালো মানুষ। নারায়ণী (শ্যামলীর মা) যখন অনিলের জন্য মিষ্টি আনলো, সে খেতে না চাইলেও শ্যামলী কিন্তু জোর করে মিষ্টি খাইয়ে দেয় এবং অনিল বাড়ি ফেরার মুহূর্তে শ্যামলী তাকে হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করে। সুতরাং বলা যেতেই পারে, প্রতিবন্ধী নারী হলেও শ্যামলীর মধ্যে সুস্থ সবল গৃহবধূর মতোই স্বামীর প্রতি চিন্তা-ভাবনা, শ্রদ্ধা বর্তমান। অতিথি আপ্যায়নের ক্ষমতাও যে শ্যামলীর রয়েছে তা শিশিরকে (অনিলের বন্ধু তথা শ্যামলীর বোনের স্বামী) চা দেওয়ার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়। এমনকি অনিলের ছবি দেখে শ্যামলী যে নিজের মাথায় ঘোমটা টেনে নেয়- এই সকল দৃশ্য দেখে শিশির হতবাক। কারণ হিন্দুধর্মে স্বামী এবং গুরুজনেদের দেখামাত্র নববধূর ঘোমটা মাথায় দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। শ্যামলীর এই সকল আচরণ দেখে বলা যেতেই পারে শ্যামলী 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' নারী হলেও সে কিন্তু তার অক্ষমতার কাছে কখনো পরাজয় স্বীকার করেনি। সকল সময় সে চেষ্টা করেছে অক্ষমতাকে পিছনে ফেলে তার অন্তরের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর। পাশাপাশি নাটকের অন্তিমে লক্ষ করা যায় অনিলের মা একসময় শ্যামলীর আচরণ ও স্বভাবে প্রসন্ন হয়ে তাকে বুকে টেনে নেয়। সুতরাং শ্যামলী প্রতিবন্ধী নারী হলেও তার মধ্যে যে বোধশক্তি রয়েছে তা যথাযথ ভাবেই বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে আরও একজন নারীর কথা এখানে না বললেই নয়, তিনি হলেন হেলেন কেলার। তিনি শুধু আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মণীষীদের ছোট ছোট গল্পের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া কোনও মহামানবী নন, সিনেমায় উঠে আসা কোনও অলৌকিক, অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন' নারী নন, হেলেন কেলার প্রতিবন্ধী ও নারী আন্দোলনে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত করার একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গর্ভপাতের অধিকার খারিজের রায়ের ঘোষণা শোনার পর তাই ১৯১৪ সালে করা তাঁর একটি উক্তি অত্যন্ত সময়োপযোগী মনে হয়- "No one has ever given me a good reason why we should obey unjust lows."[৮] হেলেন কেলার জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে সবর ছিলেন আজীবন এবং তাঁর কাজের মধ্যে নারীর অধিকারের বিষয়গুলি বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি শিক্ষকের সহায়তায় তার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছেন, সেগুলি সত্ত্বেও তিনি জীবনে সফল হয়ে উঠেছেন। শান্ত হয়ে যাচ্ছেন এমন মানুষদের তিনি প্রেরণা দিচ্ছেন। হেলেন কেলার এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তৈরি করেছেন নিজের পরিচিতি। এই সমস্ত দিকগুলিকে বিবেচনা করে বলা যেতেই পারে দেবনারায়ণ গুপ্তের 'শ্যামলী' নাটকে প্রতিবন্ধী নারী শ্যামলী নাটকের শুরুতে সমাজ ও পরিবারে ফেলনা হিসেবে স্থান পেলেও সময়ের সাথে তিনি নিজের পরিচিতি নিজেই গড়ে তুলেছেন, যা নাটকটিকে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে ভূষিত করেছে তা আমাদের মেনে নিতেই হবে।

তথ্যসূত্র-

১. https://www.cdc.gov/ncbddc/disability.

২. https://www.who.int/health topices.

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, অশোক বুক এজেন্সী, ৩৬বি কলেজ রো, কলকাতা-০৯, পৃ-৪৮৬

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, শুভম্ পাবলিশার্স, ৭নং শ্যামাচরণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১১৭

৫. গুপ্ত, দেবনারায়ণ, শ্যামলী, মন্ডল এন্ড সন্স পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ১৬/বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৯, পৃ: ৫২

৬. তদেব, পৃ: ৫৩

৭. তদেব, পৃ: ৫৬

৮. https://sanger.hosting.nyu.edu/articles/keller/

সহায়ক গ্রন্থ-

১. গুপ্ত, দেবনারায়ণ, শ্যামলী, মন্ডল এন্ড সন্স পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ১৬/বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৯, ১৩৯৪

২. Joshi, Nayan, Disability Laws, M/s. Kamal Publishers, New Delhi-110017, Edition: 2021

৩. Mishra, Dr. Premananda, Introduction to Disabilities, Neelkamal Publications PVT. LTD, Hyderabad-500001, First Edition : 2019

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, অশোক বুক এজেন্সী, ৩৬বি কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০২

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, শুভম্ পাবলিশার্স, ৭নং শ্যামাচরণ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৭

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

SAMSAPTAK ISSN: 2454-4884 ESTD: 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

বিস্মৃতির অন্তরালে বন্দে আলী মিয়া

রিন্টু বাঙ্গাল

সারসংক্ষেপ:

অবিভক্ত বাংলার বহুমুখী প্রতিভাধর কবি ও কথাসাহিত্যিক বন্দে আলী মিয়া সমকালে হারিয়ে যাচ্ছেন পাঠকের চেনা পরিধি থেকে। তাঁর লেখায় যে প্রকৃতি-প্রেম-মৃত্যুচেতনা ও মুল্যবোধ রয়েছে তা বর্তমানে অবক্ষয়ের যুগে সঠিক দিশার অন্যতম কাণ্ডারি। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রকার— বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যেগুলি 'সূক্ষ্মশিল্প' (কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র) তিনি প্রায় সকল ধারাতেই উজ্জ্বল নজির গড়েছেন। ১৯২৭ সালে চিত্র বিদ্যায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে ছাত্র জীবনেই তিনি 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্ম জীবন শুরু করেন ওই সময় থেকেই সাহিত্য সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দিতে থাকেন। তাঁর জনপ্রিয় কব্যগ্রন্থ 'ময়নামতীর চর' পাঠ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসা করেছিলেন। 'স্বপ্নসাধে', 'বোকাজামাই', 'লীলাকমল', 'কামাল-আতাতুর্ক', 'মধুমতির চর' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। রেডিওতেও কাজ করেছেন জনপ্রিয়তার সঙ্গে। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা তাঁর সৃষ্টির জগতে কোন মলিন প্রভাব ফেলেনি। সাহিত্য ভাণ্ডারকে নানান ভাবে সমৃদ্ধ করে তিনি একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন। বাংলার এই অমর কবি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। বর্তমানে বহু বিদেশী ও নবীন কবি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে; কিন্তু আমাদের কাছের কবি, হৃদয়ের কবি বাদ পরছেন সেই চর্চা থেকে। পূর্ববঙ্গের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও এই কবি-সাহিত্যিক-চিত্রকারকে নিয়ে চর্চা শুরু হোক। তাঁর বহু সৃষ্টিকর্ম যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ। পাঠক চাইলেও এই ধ্রুপদী সাহিত্যিকের সাহিত্যরস থেকে বঞ্চিত। তাঁর রচিত বই গুলি নতুন করে প্রকাশিত হোক। আবারও শিশুপাঠ্য হিসাবে পাঠ্যক্রমে ফিরিয়ে আনা হবে বাংলার এই প্রজ্ঞাবান সাহিত্যিককে— এটাই আশা রাখা যায়।

মূলশব্দ -

১) বহুমাত্রিক প্রতিভাধর২) প্রকৃতিচেতনা৩) প্রেমচেতনা৪) মৃত্যুচেতনা৫) মূল্যবোধ৬) লোকসংস্কৃতি ৭) বিস্মৃত সাহিত্যিক

মূল প্রবন্ধ-

"ভুলে থাকা নয় সে ত ভোলা;
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েচ যে দোলা।"[১]
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিস্মৃত অমর কথাসাহিত্যিক ও কবি বন্দে আলী মিয়া। তিনি অবিভক্ত বঙ্গদেশের মাটি ও মানুষের মূল ধারার সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভাধর এক ব্যক্তি। তিনি একজন বহু মাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী জীবন শিল্পী ও সমাজ মনস্ক মানুষ। তাঁর লেখা পড়লে আজও মনের আকাশ জুড়ে এক অনন্য অনুভূতি জেগে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের জগতে শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিক রূপে তিনি স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। তাঁর লেখার পটভূমি ছিল গ্রাম বাংলার পরিবেশ, প্রকৃতি আর সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। তার সাথে তিনি ছিলেন জীবনীকার ও স্মৃতিকথার কুশলী লেখক। চিত্রশিল্পেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর এই অসাধারণ ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন দেশের কথা। সর্বপরি বলা যায় এমন কোনো বিষয় নেই যে তাঁর সাহিত্যের পাতায় উঠে আসেনি। কিন্তু যুগবিভাগের সংকটময় পরিস্থিতেও এই বাংলায় তাঁর কার্য অব্যাহত ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাতৃভূমি বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন

করলেও তাঁর অমর সৃষ্টির অবদান আজও অম্লান রয়ে গেছে। দেশ-কাল ভেদে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও, আমার ক্ষীণ দৃষ্টিতে মনে হয় স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না। সময়ের আবর্তনে তাঁর স্বপ্নময় বাসনা ও সৃষ্টির সফলতা প্রায় ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সর্ব স্তরের পাঠকেরা এই অতীতের লেখককে নিয়ে কোনো ভাবেই চর্চা করছে না। যেখানে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে উঁচু স্তর পর্যন্ত পঠন-পাঠনের জন্য রচনাগুলি সংরক্ষণ করা উচিত ছিল, তা আজ সব কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। তাই সাহিত্যিচর্চার ক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়া এই ধ্রুপদী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। বিশাল সাহিত্যাকাশে হারিয়ে যাওয়া মিটিমিটি তারাদের আবার উজ্জ্বল আলোকে ফিরিয়ে আনার ভার পাঠককেই নিতে হবে।

সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না, আবার জীবনকে বাদ দিয়েও সাহিত্য হয় না। অর্থাৎ এরা একে অপরের পরিপূরক। যুগে যুগে, দেশ-দেশান্তরে সাহিত্য মানুষকে নানান বৈচিত্র্যে মূর্তমান করে তুলেছে। শিল্প মাত্রেই সাহিত্য নয়, তবে সাহিত্য মাত্রেই শিল্প। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধে বলেছেন, "কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা।"[২] এর মধ্যে অন্যতম হল কাব্য তথা সাহিত্য। তিনি সাহিত্যকে 'সূক্ষ্মশিল্প' বলে অভিহিত করেছেন। সাহিত্যিক হলেন সেই শিল্পী যিনি জীবন অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞাগত দর্শন ও ভাষার মাধুর্যে 'সূক্ষ্মশিল্প' রচনা করেন। সমাজের প্রতিটি কোণায় সাহিত্যিকের সজাগ দৃষ্টি; সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সাহিত্যিকের অনায়াস যাতায়াত। সেই সূত্রেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিধিতেই বন্দে আলী মিয়ার সৃষ্টি-ভূমিতে ফুটে উঠেছে গান, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্যনাটক, গীতি নকশা, রূপকথা, জীবনী, ছোটোদের জন্য অফুরন্ত রচনা ও স্মৃতিকথা। একাধিক বিষয় নিয়ে লেখালিখি করেছেন। এ সবই তাঁর সৃষ্টির ফসল যা সারা বাংলাকে নতুন আলোয় আলোকিত করেছে এবং তাঁর কলমের ছোঁয়ায় সাহিত্যি ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই বিচিত্রগামী প্রতিভা নদীর স্রোতের মতো মোহনার দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ সালে ১৫ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মুনশি উমেদ আলী মিয়া ও মাতা নেকজান নেসা ছিলেন শিক্ষানুরাগী। পিতা-মাতার একমাত্র আদরের সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাবনাতেই। বন্দে আলী মিয়া সাহিত্য কীর্তিতে যে উচ্চতায় উঠতে পেরেছিলেন তার জন্য তিনি মনে করেন তাঁর মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। মায়ের মুখে প্রথম থেকেই অফুরন্ত গল্প ও রূপকথা শুনতে শুনতে বড়ো হন তিনি। জীবনের শুরুতে প্রথাগত শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। শুধু তাই নয় পরবর্তী সময় লেখককে লেখালেখির কাজেও উৎসাহ জুগিয়েছেন তাঁর মা। কয়েক বছর বন্দে আলী মিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাংলা দেশের পাবনা শহরের মজুমদার অকাদেমিতে ভর্তি হন। পরবর্তী সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়া শেষ হলে ১৯২৩ সালে তিনি চিত্র বিদ্যা নিয়ে কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট অকাদেমিতে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে চিত্র বিদ্যায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে ছাত্র জীবনেই তিনি 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্ম জীবন শুরু করেন ওই সময় থেকেই সাহিত্য সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দিতে থাকেন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশ পায়। ১৯২৭ সালে তাঁর প্রথম বই 'চোর জামাই' প্রকাশিত হয়। বিশেষত এটা শিশুদের জন্য লেখা। পরবর্তীকালে ১৯২৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষাকতা করেন। এর মধ্যে তিনি ১৯৩১ সালে তার প্রথম উপন্যাস 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' রচনা করেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ময়নামতীর চর'। তাঁর প্রথম কবিতার বই সব পাঠকদের মুগ্ধ করে। সাহিত্য আলোচকদের মনেও দাগ কাটে ওই কাব্যগ্রন্থ। ওই সময়েই আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে উঠে আসেন তিনি। এরপর তাঁকে আর কোনো দিন ফিরে তাকাতে হয়নি। তারপর থেকেই বন্দে আলী মিয়ার লেখা নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতার জীবনে তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের পরিচয় ঘটে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত তাঁর আর এক কাব্যগ্রন্থ 'অনুরাগ'। এরপর ধারাবাহিক ভাবে 'স্বপ্নসাধে', 'বোকাজামাই',

'লীলাকমল', 'কামাল-আতাতুর্ক', 'মধুমতির চর' প্রভৃতি কবিতার বই পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার পাশাপাশি তিনি শিল্প কলাতেও সুনাম পান। তিনি ছবি আঁকতেন মনের বিশাল ক্যানভাসকে ছবিতে উদ্ভাসিত করতে। বইয়ের প্রচ্ছদ চিত্র চিত্রায়ণ থেকে পেশাদারি ছবিও তিনি অনেক এঁকেছেন।

১৯৪৭ সাল ইতিহাসের পাতায় হাসি-কান্না মেশানো এক স্মরনীয় বছর। পূর্ববাংলাকে আলাদা করে দেওয় হয় নির্মম ভাবে। এ যেন নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া। তিনি দেশ ভাগ মেনে নিতে পারেননি। ওই সময় তিনি গভীর বেদনায় ভেঙে পড়েন। তিনি চেয়েছিলেন দুই বাংলাকে এক সূত্রে বাঁধতে। দুই বাংলার মিলনের চেষ্টায় অনেক লেখালেখিও করেন। সেই লেখা আজও পড়লে আমাদের চিবুক ভিজে যায় চোখের জলে। এক সময় সব কিছু ত্যাগ করে বাধ্য হয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে নিজের গ্রামে চলে যান। কিন্তু সেখানে ফিরে কাজ না পেয়ে বড়ো বেকার হয়ে পড়েন। সংসার চালাতেও সমস্যায় পড়তে হয়। এরপর বই লিখে আর ছবি এঁকে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরবর্তীকালে 'কিশোরপরব' ও 'জ্ঞানবার্তা' নামে শিশু পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বিশেষত কবি হিসাবে বিখ্যাত হলেও সাহিত্যের প্রায় সব বিষয়ে তিনি বলিষ্ঠ ভাবে বিচরণ করেছেন। তাঁর 'পদ্মানদীর চর', 'দিবাস্বপ্ন', 'তাসের ঘর', 'মনের ময়ূর', 'নীড়ভ্রষ্ট', 'ডাইনি বউ', 'রূপকথা' বা 'অরণ্য গোধূলি' পড়লে মনের আকাশ সমৃদ্ধ হয়।

১৯৬৮ সালে তাঁর লেখা 'দক্ষিণ দিগন্ত' বেরোয়। তিনি নাট্যকার হিসেবেও বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। 'বৌদিররেষ্টুরেন্ট', 'জোয়ার-ভাটা', 'গাধা-হাকিম', 'উদয়প্রভাত', ও আরো অনেক উচ্চমানের নাটক পাঠককে উপহার দিয়েছেন। হাস্যকৌতুক সৃষ্টিতে তিনি দক্ষ ছিলেন। বাচ্চাদের জন্য তাঁর লেখা কয়েকটা জীবনী আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। এই সব বই পড়লে বাচ্চারা এমনকি পথভ্রষ্ট প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরা আদর্শ মানুষ হওয়ার রসদ পায়। উদাহরণ স্বরূপ— 'হাজী মহসিন', 'বেগম রোকেয়া', 'ছোটোদের সিরাজদৌল্লা', 'হিটলার', 'শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁর লেখা রূপকথার বই পড়ে আমরা সমৃদ্ধি না হয়ে পারি না। গান লেখাতেও তিনি এক রকম দক্ষ শিল্পী ছিলেন।

তাঁর সাহিত্য সাধনায় ব্যক্তিগত জীবনের কোনো প্রভাব পড়েনি। জীবনকালে নানা সমস্যার, জটিলতার সম্মুখীনও হয়েছেন। সুখ যেমন তাঁর সাথী ছিল, তেমনি দুঃখও ছিল তাঁর জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। সুখে ছিল শান্তি, আর দুঃখে ছিল নির্মমতা ও অস্থিরতা। জীবন যুদ্ধে তিনি বারবার পরাভূত হয়েও শেষে জয়ী হয়েছেন। জানা যায় যে আর্থিক টানাপোড়েনে তিনি মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে প্রকাশকের কাছে বই বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর অনেক রচনাবলী এখনো বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁর রচিত এমন অনেকগুলো বই রয়েছে যে তার কপিও তাঁর কাছে ছিল না। বন্দে আলী মিয়া দুঃখকে আঁকড়ে ধরে ধৈর্যের সাথে প্রবাহমান সময় অতিবাহিত করলেও কখনো সাহিত্য চর্চায় পিছুপা হননি। বাংলা সাহিত্যকে এত কিছু দিয়েও, তবু তিনি অনাদরে বিস্মৃতির অন্তরালে রয়ে গেলেন। কেন তিনি আজ বড়ো প্রাসঙ্গিক হয়েও আড়াল হয়ে যাচ্ছেন? পাঠক সমাজের কাছে তার উত্তর আজও অধরা। তাঁর লেখা বই পড়লে মনের প্রসারতা বাড়ে। মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয় যে লেখক, সেই লেখককে যদি উপেক্ষিত হতে হয় তবে এই লজ্জা পাঠকেরই।

মূল্যবোধচর্চা আজকের বর্তমান সমাজে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। মানুষকে সৎ, সুস্থ মানবিক ও বিবেকবান করে তোলাটাই হল মূল্যবোধ। মানুষের মধ্যে আজ মূল্যবোধের বড়ো অভাব দেখা দিচ্ছে। তাই আজ মানুষের মধ্যে এত লোভ, হিংসা, দাঙ্গা প্রবল হয়ে উঠছে। কিন্তু বন্দে আলী মিয়ার নানা কবিতায় মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন 'আমাদের গ্রাম' কবিতাটি প্রত্যেকের পরিচিত। এই কবিতায় সাম্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সাথে থেকে সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার যে মানসিকতা সেটাই মূল্যবোধর পরিচয়—

"আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে— নাহি কেহ পর
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,

এক সাথে খেলি আর পাঠশালা যাই।"

গ্রাম বাংলার চিরাচরিত রূপ চোখের সামনে অন্যনসুন্দর ভাবে ধরা দেয়। সেই সঙ্গে গ্রামের সহজ-সরল মানুষের জীবন যাত্রাকেও অবচেতন মনে একেবারে কাছ থেকে দেখতে পারেন। ক্ষণিকের জন্য মনে হবে, আপনি বোধ হয় বাংলাদেশের কোন এক গ্রামে দাঁড়িয়ে আছেন। মূল্যবোধের ব্যথাদীর্ণ আরও একটি কবিতা 'বড়ো বুবু'। পল্লী বাংলার পল্লী তনয়ার বিদায় বেহাগ সুর করুণ আর্তিতে ভরা। মানবিক আবেদনে 'ননদ'-এর মৃত্যু যন্ত্রণা বৌদির জীবনকে কতখানি দুঃখিত করে এবং আলোড়িত করে তা কবিতার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। আবার মাতৃ স্নেহের প্রতি বাৎসল্য রূপ 'মা' কবিতায় দেখা যায়। মা হারা সন্তানের বেদনাময় জীবন গ্রামীন সভ্যতার নিবিড় অনুভূতিতে সন্তানের মধ্যে ধরা পড়েছে। পৃথিবীতে মা ছাড়া সন্তানের বেঁচে থাকাটা একেবারেই যেন অর্থহীন। শুধু মূল্যবোধই নয়, লেখক সহজ-সরল ভাষার মধ্যে দিয়ে একটি বিষয়কে জীবন্তভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপনা করতে পারতেন। স্মৃতিসহায়ক ছন্দের দোলাচলতায় তাঁর কবিতাগুলি আরও মোহময় হয়ে ওঠে।

কথিত আছে, বন্দে আলী মিয়ার লেখা 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত পুলকিত হয়েছিলেন। তাই তিনি বন্দে আলি মীয়ার প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বন্দে আলী মিয়া আপন বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছিলেন বলে তিনি মনে করেন। বিশ্বকবির ওই মূল্যায়ন যথার্থ। অত্যন্ত সাধারন ভাষায় এই কাব্যের নানা কবিতার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছ প্রকৃতি চেতনা, নর-নারীর প্রেম, লোকসংস্কৃতি ও মৃত্যু চেতনা প্রভৃতি বিষয়।

'ময়নামতীর চর' কাব্যে কবি গ্রাম বাংলার জন জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে প্রকৃতিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সেই প্রকৃতি মানবজীবনের দুঃখ-সুখের নিত্য সঙ্গী। নদী মাতৃক বাংলাদেশের গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু সবই কাব্যে আলোকপাত করেছেন তিনি। গ্রামবাংলার ঐতীহ্যময় সমস্ত কিছুই প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শুধু মাত্র প্রকৃতি চেতনা নয়, তাঁর লেখার মধ্যে একই সঙ্গে লোকসংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় 'ময়নামতীর বটগাছ' কবিতায়। শাশ্বত লোকায়ত ভাবনা ও লোকসংস্কৃতির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন 'ভাঁড়ালার মজিদ' কবিতায়। চিরদিন ধরে অন্ধ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভাঁড়ালার মজিদকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নানা সমস্যার সমাধানের জন্য উপস্থিত হয়। তার পরিবর্তে প্রতিদিন চলতে থাকে অনুষ্ঠান। তাদের বিশ্বাস প্রকৃতিও যেন ভাঁড়ালার মজিদকে ভয় পায়। আবার 'ঝপঝপের দহ' কবিতায় কোনো এক গ্রামের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার মানুষের হৃদয়ের ভাষা ধরা পড়েছে ধর্মীয় লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে। একটি গাছকে কেন্দ্র করে মানুষের মানত করা কত না নৈবেদ্য পূজা-উপাচার সমাজ জীবনের ধর্মীয় বোধকে তুলে ধরেছে। মানব জীবনের লৌকিক রীতি-নীতি সবই সংরক্ষনের দলিল।

বন্দে আলী মিয়ার মানব জীবনের মহামূল্য সম্পদ প্রেম-চেতনা। যাকে হাতিয়ার করে সমগ্র বিশ্বকে জয় করা যায়, সেই ভালোবাসা নানা কবিতায় ফুটে উঠেছে ভিন্ন রূপে। যেমন— 'নানা আর নানি' কবিতায় ফুটে উঠেছে দাম্পত্য জীবনের মধুর স্মৃতিচারণা। ঘর গেরস্থলীর অতিসাধারণ জীবন যাত্রার সরলতা মন ছুঁয়ে যায়। কবিতার লাইনে লাইনে সাজানো রয়েছে দাম্পত্য প্রেমের পুষ্পমালা। কথাও আবার বিচ্ছেদের কান্না। 'ভাতার মারা পাথার' কবিতায় দু-ই দেখা যায়। বৈশাখের তপ্ত দুপুরে মাজু সোনা হাল চষে, আর তার স্ত্রী আসে জল-খাবার দিতে—

"ডান হাতে ভাত আর পানি লয়ে ভাঁড়ে
বউ তার আল্ বেয়ে আসিচে খামারে।"[৩]

কিন্তু বউ এসে দেখে—

"ঠক্ঠকে কাঁপে গা'ও— পা'ও না ওঠে
কাঁকালের ভাত পানি মাটিতে লোটে—"[৪]

প্রকৃতির দাবদাহে মাঠঘাটের সঙ্গে একটি সুখের সংসারও ফুটিফাটা হয়ে যায়। 'সোনার বরণ মেয়ে' কবিতায় কবির রোমান্টিক চেতনা পুরানো দিনের ভালোলাগাকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। ভালোবাসার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে কিংবা গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পাড়ি দেওয়া। অবশেষে ব্যর্থ প্রেম নিয়ে ফিরে আসে প্রেমিক। ভালোলাগার প্রথম আলোয় মনের মাধুরী দিয়ে গড়া সেই প্রেয়সী। না পাওয়ার বেদনায় অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা বাতাসের মতো ঘুরে ঘুরে কাঁদে। তবুও প্রেম অধরা আদর্শে বেঁচে থাকে। 'রাঙা শাড়ি' কবিতায় কবি গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের ছবি এঁকেছেন। সাধারণ ভাবে জীবন-যাপন করার মধ্যে জমিলা রাঙা শাড়ী পাবার স্বপ্ন দেখেছিল, আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে এবং প্রেমিকার রাঙা শাড়ির স্বাদ মেটাতে গিয়েই সাজনকে চিরতরের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। মুক্ত আকাশের পাখিকে খাঁচায় ভরে জীবনে স্বপ্ন দেখে যারা, তাদের জীবনেও যেন অমোঘ নিয়তি অভিশাপ আনে। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি জমিলার ও তার মায়ের ক্ষেত্রেও।

শুধু মাত্র কবিতার ক্ষেত্রে নয় ছোটো গল্পেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটোবেলায় রূপকথার গল্প শোনেনি কিংবা পড়েনি এমন মানুষ বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবেনা। যদিও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার গল্পেও এসেছে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন। ছোটোবেলায় বড়োদের কাছ থেকে রূপকথার অসংখ্য নানা ধরনের গল্প শোনার মধুর স্মৃতি কম বেশি সবারই আছে। কিছু কিছু গল্প সবার মনে গেঁথে যেত। এসব রূপকথায় প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার কথা কাব্যিক ও প্রতীকী উপায়ে প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া এই ধরনের গল্পের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে ভালো-মন্দের দিকটিও থাকে, যা শিশুদের চিন্তার বিকাশে সহায়তা করে। যেমন— 'শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা', 'হাদিসের গল্প' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেডিওতে চাকরি করার সময় ছোটোদের জন্য প্রচারিত 'সবুজ মেলা' নামে অনুষ্ঠানে তিনি গল্প দাদু হিসাবে শিশুদের মন জয় করে নেন। ওই অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করতে নিজেই শিশুদের উপযোগী গল্প শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিতেন। তাঁর এই সব উদ্যেগে বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠান আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর পরেও বন্দে আলী মিয়া ছোটদের জন্য এমন অসংখ্য গল্প রচনা করেছেন।

সংগীত রচনার ক্ষেত্রেও বন্দে আলী মিয়া পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত গানের বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'কলগীত', 'সরলীলা' প্রভৃতি। পল্লীগীতি থেকে শুরু করে দেশাত্মকবোধক গান, মরমি গান, এমনকি হাসির গান কোনো কিছুই বাদ যায়নি তাঁর রচনা সম্ভার থেকে। খ্যাতিমান শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর গানে সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানির জন্য তিনি পালাগান ও নাটিকাও রচনা করতেন। সেগুলো রেকর্ড আকারে বের হলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য সেগুলিকে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাঁর সৃষ্ট অনেক সৃষ্টিই অবলুপ্তির পথে।

শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বন্দে আলী মিয়া ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরষ্কার এবং ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পুরষ্কার লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' শীর্ষক সম্মাননা প্রদান করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি রাজশাহীর উত্তরা সাহিত্যে মজলিশ পদে ভূষিত হন। ১৯৮৮ সালে মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন বন্দে আলী মিয়া। দুর্ভাগ্যবশত তিনি জীবদ্দশায় একুশের পদক কিংবা স্বাধীনতা পদকের কোনটাই দেখে যেতে পারেননি। তাঁর রচনা যেকোনো মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাঁর সৃষ্ঠিকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে হলে সব দেশের বাংলা ভাষী মানুষকে উদ্যোগ নিয়ে আগিয়ে আসতে হবে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কবি নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী যেমন সরকারি ভাবে পালন করা হয়, ঠিক একই ভাবে কবি বন্দে আলী মিয়ার জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৯৭৯ সালের ২৭ জুন বন্দে আলী মিয়া ভবোলীলা সাঙ্গ করে, সবাইকে কাঁদিয়ে চিরতরে চলে যান। রাজশাহীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে লেখক বন্দে আলী মিয়ার লেখার বিষয় বস্তু ও রসগ্রাহী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা

যায় যে যত দিন বাংলা ভাষা থাকবে, তত দিন কবি বন্দে আলী মিয়া ধ্রুবতারার মতো বাংলা সাহিত্যিকে আলোকিত করে যাবেন। এর জন্য আমরা সবাই তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর কাব্যে, গানে, গল্পে যে প্রকৃতি ভাবনা, লোকসংস্কৃতি, নর-নারীর প্রেম সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা চিরকালীন। এই সমস্ত বিষয় গুলি বিশ্লেষণের আলোকে আজকে মূল্যবোধ জাগরণের দিন এসেছে। তাঁর রচিত রচনাগুলি পাঠের মাধ্যমে সমাজ ভাবনাকে আরো বলিষ্ঠ করার প্রয়োজন সাধিত হতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন কয়েকটি কবিতা সমূহের রীতি-নীতি কীভাবে যুগের সাথে সাথেও হারিয়ে যায়নি। তাঁর মনস্তাত্তিক অন্তর্দৃষ্টি লেখার অনেক গভীরে প্রবেশ করে। কবিতাগুলিকে তিনি প্রেম ভাবনা, স্বদেশ চেতনা, দৈনন্দিন জীবনচিত্রের লোকগাথা, গ্রামবাংলার প্রকৃতি আরোহন করে উপমা দিয়ে সাজিয়েছেন। এক কথায় তিনি মানবিকতার কবি, ঐতিহ্য রক্ষার কবি, লোক সংস্কৃতির কবি, মূল্যবোধের কবি ও প্রেম চেতনার কবি। বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে তাঁর সৃজনশীলতা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ণ করার কাজ আমাদেরই নিতে হবে। তা না হলে এত বড়ো মাপের কবি, সংহতির কবি ও জাতীয়তাবাদের কবির সঙ্গে অবিচার করা হবে। বর্তমানে বহু বিদেশী ও নবীন কবি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে; কিন্তু আমাদের কাছের কবি, হৃদয়ের কবি বাদ পরছেন সেই চর্চা থেকে। পূর্ববঙ্গের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও এই কবি-সাহিত্যিক-চিত্রকারকে নিয়ে চর্চা শুরু হোক। তাঁর বহু সৃষ্টিকর্ম যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ। পাঠক চাইলেও এই ধ্রুপদী সাহিত্যিকের সাহিত্যরস থেকে বঞ্চিত। তাঁর রচিত বই গুলি নতুন করে প্রকাশিত হোক। আবারও শিশুপাঠ্য হিসাবে পাঠ্যক্রমে ফিরিয়ে আনা হবে বাংলার এই প্রজ্ঞাবান সাহিত্যিককে— এটাই আশা রাখা যায়।

তথ্যসূত্র

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ সংখ্যক কবিতা, ‘বলাকা’, এলাহাবাদ, ইন্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড, ১৯১৬, পৃ ২১

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প”, শুভাশীষ চ্যাটার্জী, ‘বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য খণ্ড)’, কলকাতা- ০০৯, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ১৪২৯, পৃ ২৩৬

৩ বন্দে আলী মিয়া, “ভাতার মারা পাথার”, ‘ময়নামতীর চর’, কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৩২, পৃ ৩৩

৪ তদেব, পৃ ৩৪

সহায়ক গ্রন্থ

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য খণ্ড), এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পুনর্মুদ্রণ- ১৪২৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বলাকা, ইন্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড, এলাহাবাদ, প্রথম প্রকাশ- ১৯১৬।

মৈত্র, স্বপন, বন্দে আলী মিয়া: জীবন ও সাহিত্য, মান্না পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২২।

মিয়া, বন্দে আলী, ময়নামতীর চর, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩২।

মিয়া, বন্দে আলী, শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা-১১০০, একুশে বইমেলা-২০০৯।

মিয়া, বন্দে আলী, হাদিসের গল্প, বৃন্দাবন ধর য়্যণ্ড সন্স্ লিঃ, আশুতোষ প্রেস, ঢাকা, ১৩৫২।

....

গবেষক ,প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

শৈলেন ঘোষের উপন্যাসে রূপকথা ও মূল্যবোধের প্রসঙ্গ

রিয়া পাল

সংক্ষিপ্তসার -

শৈলেন ঘোষ বাংলা শিশুসাহিত্যে এক প্রথিতযশা নাম।তিনি দীর্ঘজীবন নিরলস সারস্বত সাধনায় রত থেকেছেন একজন যথার্থ শিশু-কিশোর সাহিত্যিক রূপে। তাঁর যে অনন্য সৃষ্টিকর্ম-বিশেষত ছোটদের জন্য লেখালেখি তা বিস্ময়কর ও কৌতূহল-উদ্দীপক। তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যে পরিচিতি অর্জন করেন প্রথম উপন্যাস 'টুইটুই' রচনার মাধ্যমে। এরপর তিনি লিখে ফেলেন প্রায় ষাটটির মতোন উপন্যাস। লেখকের সমসাময়িক বিমল ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকেরা শৈলেনের উপন্যাস রচনার মধ্যে আধুনিক রূপকথার যে বিশিষ্টতা লক্ষ করেছিলেন, তাতে তাঁরা প্রত্যেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন । তাঁর উপন্যাসগুলি মূলত রূপকথাধর্মী হলেও তার অন্তরালে রয়েছে এক সুগভীর বক্তব্য, কিন্তু তা নীতিকথা বা আরোপিত উদ্দেশ্যমূলক কাহিনি নয়। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিবিধ ও বৈচিত্রময়। তিনি সহজ, সরল ভাষায় গল্পের মাধ্যমে শিশুদের বুঝিয়ে দিতে চান প্রকৃতি প্রদত্ত সমস্ত জীবেরা তাদের বন্ধু।তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠ করলে শিশুদের পাশাপাশি বড়োরাও সমান ভাবে মুগ্ধ হবে। লেখক পরিচিত রূপকথার ধ্যান-ধারণা থেকে ব্যতিক্রম ঘটালেন নতুন চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে। তাঁর রচনায় প্রভূত আকর্ষণীয় বিষয়কে শিশু-কিশোরদের মনের উপযোগী করে রচিত করলেন। সেখানে মজার ছড়া ও হেঁয়ালির মতো মনোরঞ্জনের বিষয় আছে কিন্তু তা আজগুবি নয়, সবই অর্থবহ। যা তাঁর প্রতিটি উপন্যাসকে নতুনত্বের মাত্রা দিয়েছে এবং পাঠকের হৃদয়েও স্থায়ী আসন তৈরি করে নিয়েছেন। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় লেখকের পাঁচটি উপন্যাসকে নির্বাচন করে সেখানে রূপকথার প্রসঙ্গ ও মূল্যবোধ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেই বিষয়টি জেনে নেবার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ -

রূপকথা , পাশ্চাত্য সাহিত্য, মনস্তাত্ত্বিক, লোককথা, নৈতিক মূল্যহীনতা, বিষয়বস্তু, কল্পপ্রবণ।

মূল আলোচনা -

রূপকথা বলতে সাধারণতভাবে আমরা বুঝি রূপকের ছদ্মবেশে যে সমস্ত কাহিনি গল্প করে শিশুদের শোনানো হয়, সেখানে তারা কল্পনার মাধ্যমে নিজস্ব এক প্রতীকী ভুবন তৈরি করে।রূপকথার বিষয় নির্বাচনে থাকে অবাধ স্বাধীনতা, সেখানে লেখকেরা শিশুদের পরিক্রমা করায় সমস্যাবহুল ঘটনাকে,এক ফ্যান্টাসির মাধ্যমে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই রূপকথার পরিবর্তন ঘটেছিল প্রথম । আধুনিক মনোভাবাপন্ন লুইস ক্যারল, হ্যান্স অ্যান্ডেরসন, জে.এম.ব্যারি, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, প্রমুখ লেখকদের লেখাতে রূপকথার বিষয় মনস্তাত্ত্বিক ভাবাবেগে রচিত এবং তা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে এক উঁচু আসনে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। অন্যদিকে আমাদের প্রাচীন রূপকথার উদ্দেশ্য ছিল যে, মা, ঠাকুমা, দিদিমারা মুখে-মুখে গল্প বানিয়ে শিশুদের সেগুলি শুনিয়ে ঘুম পাড়াতো। এইসব গল্পপ্রাচীন লোককথা, পুরাণ, রাজা-রাণী, রাক্ষস-খোক্ষস , রাজপুত্রের দুঃসাহসিক অভিযানমূলক কাহিনি প্রভৃতি বিষয়ের সম্ভার থাকত তাদের কাছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এই মৌখিক কাহিনিগুলিই গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'।

এছাড়াও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়ের মতন প্রতিষ্ঠালব্ধ সাহিত্যিকেরা অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন শিশুসাহিত্যকে।প্রখ্যাত সমালোচক সুকুমার সেন রূপকথা সম্পর্কে বলেছেন --

> **রূপকথা আসলে অপূর্ব কথা বা অপরূপ কথা। অবান্তর অপ্রধান ছোটো আখ্যায়িকা। বাংলায় যাকে বলি 'রূপকথা' তা হল যথার্থ উনিভার্সাল লিটারেচার অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্থে বিশ্বসাহিত্য।**[১]

অন্যদিকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'রূপকথা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন -

> **রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্য ঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে।**[২]

শৈলেন ঘোষ শিশু-কিশোরদের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ থেকে তাদের সাথে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করতেন, এবং বিশ্বাস করতেন শিশুদের ছোটো থেকেই মানসিক বিকাশের প্রয়োজন সেটা গল্প শুনে বা পড়ে যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন; এতে শিশুদের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। শৈলেন ঘোষের উপন্যাসে প্রাচীন রূপকথা অর্থাৎ ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, শুকপাখি, রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-রাক্ষসী, পরীদের প্রসঙ্গ তুলনামুলক ভাবে খুবই কম। তিনি উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র আনলেন। মুখ্য চরিত্রে দেখা গেলো প্রত্যেকেই সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়ে। তারা তাদের উপস্থিতি বুদ্ধি, সাহসিকতা ও মানবিকতায় উজ্জ্বল। তাঁর রচনাগুলিতে বিশেষভাবে দেখা যায় রূপকের মোড়কে বাস্তব জীবনের সমস্যা, ঈর্ষা, লোভ ও ভালোবাসার প্রকাশ রয়েছে। লেখক অধিকাংশ সময় তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে মানবজীবনের অন্যায়, অপরাধ, বঞ্চনা, নৈতিক মূল্যহীনতাকে রূপকথার চরিত্রদের মধ্যে দেখিয়ে থাকলেও, কীভাবে জীবনকে বিপন্ন করে সততার পথে চলতে হবে তা প্রতিটি কাহিনিতেই সূক্ষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলি পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদশের থেকেও অনেক বেশি স্বাভাবিক ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর উপন্যাসগুলিতে শিশুরা যেমন মাত্রাতিরিক্ত কল্পপ্রবনের সুযোগ পাবে , তেমনই তা সাহিত্যগুণেও গুণান্বিত।এছাড়া তাঁর রূপকথামূলক উপন্যাসে অসম্ভব অবাস্তবতা উপাদান থাকলেও একটি সর্বজনীন আবেদনও রয়েছে সেখানেই উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন -

> **শৈলেনবাবু রূপকথার জগতে যে জোয়ার আনলেন তা এক ভাবনার রূপকথা।আগেকার আঙ্গিক ওপ্রকরণ দুটোর কোনওটাকেই গ্রহণ করলেন না। তাঁর ভাষা সাধারণ নয় এবং গল্প বলাটাই মুখ্য নয়। ভাষার সঞ্চার করেছেন এক মৃদু কাঙ্ক্ষিক লাবন্য। শিশুরাও এ ভাষা বুঝবে, আবার এই ভাষার যাদুটিও উপভোগ করবে।**[৩]

টুইটুই (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)

শৈলেনের প্রথম উপন্যাস 'টুইটুই' দুইটি পাখির প্রেক্ষাপটে রচিত। তাঁর পাখির সঙ্গে ছোট বয়স থেকেই ছিল হৃদ্যতা। সেই পাখি যখন অকস্মাৎ উড়ে যায় তার ব্যথা তিনি সারাজীবনেও ভুলতে পারেননি। সেজন্য তাঁর প্রথম উপন্যাস পাখিকে অবলম্বন করে লেখা। এখানে দুই পাখি এক রাজার রাজপ্রাসাদে গান গাইতে থাকে মনের আনন্দে। কঠিন হৃদয় রাজার মনে কোন আনন্দ নেই সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন তাদের মেরে ফেলার। একটি পাখি রাজার তীরের আঘাতে প্রাণ হারায়। লেখক তখন অবলীলায় প্রশ্ন রাখেন-**'আচ্ছা দুঃখ হলে পাখির চোখে জল আসে না ? মিষ্টি-মিষ্টি চোখে ফোঁটা ফোঁটা জল ?'**[৪] রাজা পাখিটির অন্য সঙ্গীটিকে মারার জন্য ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বেরিয়ে যান। হঠাৎ রাজাকে চোর সন্দেহে গ্রামবাসী তাড়া করে তখন দৌড়াতে দৌড়াতে এক অজানা জায়গায় পৌঁছে যায়। একটি ছোট্ট ছেলে শান্ত ও তার বোন চুমকি রাজাকে সেবা-শুশ্রূষা করে ভালো করে। রাজাকে তারা প্রশ্ন করে **'নিশ্চয় তোমার মায়ের জন্য মন কেমন**

করছে?।'[৫] রাজা তাদের প্রশ্নে জলভরা চোখে বলে ওঠে- 'আমি যে অনেক বড়ো হয়ে গেছি।' রাজা দুটি ছোট্ট ছেলে মেয়ের সাথে স্নেহের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজের মৃত ছেলে মেয়েকে তাদের মধ্যে দেখতে পান। রাজা তাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারেন, যে দুটি পাখিকে রাজা মেরে ফেলতে চেয়েছিল তাদের বন্ধু ছিল পাখি দুটি। রাজার নিজেকে তখন খুবই নিষ্ঠুর মনের মানুষ অনুভূত হয়। শান্ত তার বোনের পাখি খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে এবং রাজার কাছে সে জানতে চাইবে পাখির কি অপরাধ ! এদিকে রাজা এবং চুমকি শান্তকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। রাজার রাজ্যে শান্তকে শূলে চড়ানো হবে সেই সময় রাজা, চুমকি এসে পৌঁছায় মহলে। রাজার কোলে মেয়েকে দেখে প্রত্যেকে হতবাক হয়, শান্ত ও চুমকি তাদের বন্ধুর পরিচয় জানতে পারে। এবার রাজা সারা রাজ্যে ঘোষণা করে এরা তার ছেলে মেয়ে। তখন হঠাৎ করেই পাখিরা ডেকে ওঠে, গাছে ফুল ফোটে, সবার মুখে হাসি। ঔপন্যাসিক শিশুদের যে ভালোবাসতেন তা আমরা প্রতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করতে পারি। শিশুদের আনন্দে প্রকৃতিও মুখরিত হয়ে ওঠে। কখনো তাদের দিয়ে বলিয়েছেন সরল বিশ্বাসের কথা- **'আমার মা বলত, কাউকে খারাপ ভাবতে নেই। সকলে ভালো। আমরা যদি কারো অনিষ্ট না করি তা হলে অন্যে কেন আমাদের অনিষ্ট করবে ?'** [৬] এইরকম আন্তরিক কথাবার্তা অথচ তাঁর ভেতরের গূঢ় অর্থের যে আবেদন তা বাংলা শিশুসাহিত্যে এর আগে সেভাবে চোখে পড়ে না। তিনি শিশুদের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এক হিংসা ও দ্বেষমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

মিতুল নামে পুতুলটি (১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ)

মিতুল ও রাজকন্যা দুই পুতুলের বাস্তব জীবন সংগ্রামের কাহিনি লেখক তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় পুতুল দুটি হয়ে উঠেছে রক্ত-মাংসের মানুষের মতো অনুভূতিপ্রবণ। লেখক মিতুলের পরিচয়ে বলেছেন- **"নামটি মিতুল। ছোট্ট পুতুল। দুষ্টু-দুষ্টু চোখ। মিটিমিটি চাইবে। টুকটুকে ঠোঁট। মুচকি মুচকি হাসবে। ভারি দস্যি ছেলে! দেখলে আর চিনতে বাকি থাকে না!"** [৭] এখানে তিনি শিশুদের রূপকথার মাধ্যমে এক অন্য জগতে নিয়ে যান যেখানে পুতুল ভাই ও বোনের অকৃত্রিম ভালোবাসার সাক্ষী থাকে তারা। মিতুল চরিত্রটিকে লেখক গড়ে তুলেছেন এক সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত, ও মানবিক। পুতুলওয়ালার খেলায় প্রাণ পায় এই দুই পুতুল। পুতুলওয়ালা মিতুল ও রাজকন্যার নাচ দেখিয়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করার পর নতুন রঙ-বেরঙের পুতুল নিয়ে আসে, তখন মিতুল ও রাজকন্যাকে ছুঁড়ে ফেলে আবর্জনার মধ্যে। রাজকন্যাও একসময় মিতুলকে সহ্য করতে পারতো না তার হিংসে হতো মিতুলের নরম বিছানা আদর-যত্ন দেখে। এখন তাদের দুজনের অবস্থা একই রকম, মিতুল রাজকন্যাকে বলে 'তুমি কাঁদছ রাজকন্যা?' মিতুল নিজের হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। লেখকের রচনা এখানেই অনন্য হয়ে ওঠে। রাজকন্যা বলে ওঠে- **' আমায় কী আর ও নামে মানায় এখন ? আমি তো আর রাজকন্যা নই। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু। আমায় অন্য নামে ডেকো।'**[৮] মিতুল তাকে 'বোনটি' বলে ডেকে ওঠে। তারা দুজনেই তখন মানুষদের আচরণের কথা ভাবে,হঠাৎ মিতুল বলে ওঠে- **' আমরা চলে যাব অনেক দূরে। যেখানে পুতুলওয়ালা নেই। পুতুলওয়ালার মতো মানুষ নেই। নিষ্ঠুর মানুষ।'**[৯] লেখক এখানে মানুষের এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির পাশাপাশি দেখিয়েছেন ভালো মানুষদের। যেখানে দুই পুতুলকে এক মেথর কোলে তুলে পরম যত্নে বাড়ি নিয়ে আসে, কিন্তু মেথর বৌ রাত্রিতে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নানা ঘটনায় রাজকন্যা এক ঠাকুরদা পেঁচার পিঠে পড়ে অনেক দূরে চলে যায়। মিতুল তার খোঁজ নেয় শেয়ালের কাছে। শেয়াল রেগে মিতুলকে বলে ওঠে- ' কেরে তুই ? ছোটো-খাটো, বেঁটে-খাঁটো, গেঁড়ি-মেড়ি-তেড়ি!' লেখক উপন্যাসে প্রায়শই এই রকম মিষ্টি-মধুর ঝগড়া, ও ছড়ার ব্যবহার করেছেন। এরপর মিতুল এক ডাকাতদের বাড়িতে পৌঁছায় সেখানে গিয়ে বুঝতে পারে তারা অন্যের ধন-সম্পত্তি লুট করে এখানে রাখে। ছোট্ট মিতুল একাই ডাকাতদের জব্দ করে তারপর ঘর ভর্তি মনি-মুক্তো চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে বোনের উদ্দেশ্যে। বাস্তব জীবনে মিতুল খেয়াল করে প্রায় মানুষেরা স্বার্থপর তার ভাবনা- **'দু পা অন্তর বিপদ! পৃথিবীতে কেউ যেন শান্তিতে**

থাকতে চায় না। সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে! বিচ্ছিরি!'[১০] লেখক এখানে বাস্তব জীবনের অনুভূতি পুতুলের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

মিতুল পথে দেখা পায় এক অসহায় পাগল ছেলের। তার গান শুনে সবাই তাকে মারতে আসে, ছেলেরা আবার ছড়া করে বলে-

'কটকটিকটকটি
ল্যাক প্যাকে সিং।
হাড়গিলে বক যেন,
টিং টিং টিং!'

ছেলেটার নাম কটকটি শুনে মিতুল হেসে ওঠে, সে জানায় আসল নাম ডুংরি । কিন্তু তার এই নামটাও কে রেখেছিল তা মনে নেই। ছেলেটি অভুক্ত ও তার সরল মুখ দেখে মিতুলের মায়া হয়। মিতুল তখন ছেলেটির সাথে বাজারে গিয়ে নাচ দেখায় ও অনেক টাকা হলে পেট ভরে ডুংরি খাবার খায়। মিতুলের নিজের দুঃখের পাশাপাশি অন্যের দুঃখেও তার মন যে ভারাক্রান্ত হয় এখানে সেই মানবিক গুণাবলীর পরিচয় আমরা পেয়েছি। মিতুল আবার দেশ-বিদেশে নাচ দেখাতে শুরু করে ডুংরির জন্য। সেখানেই এক জায়গায় বোন রাজকন্যার দেখা পায়। রাজকন্যা এক রাজার পুতুল মেয়ে হয়ে নাচ দেখায়। রাজা মিতুলের নাচ দেখে অবাক হয় এবং রাজকন্যা মিতুলের কাছে হার স্বীকার করে নেয়। রাজা অপমানে ডুংরিকে বন্দি করে, এদিকে মিতুল রাজকন্যাকে নিয়ে রাজমহল থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে। যাবার আগে এক চিঠি ও চাবি সে ডুংরিকে দিয়ে যায়। এদিকে রাজার প্রহরীরা মিতুল ও রাজকন্যার পিছু নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। ডুংরি চিঠি খুলে দেখে মিতুল তার জন্য এক ধন-সম্পত্তি ভরা বাড়ির চাবি দিয়েছে কিন্তু সে বাড়ি তাকে নিজেকে খুঁজে নিতে হবে, এবং মিতুলকে সারাজীবনের জন্য ভুলে যেতে বলে। মিতুল ও রাজকন্যা নদীর জলে লালপদ্ম ও নীলপদ্ম হয়ে ফুটে থাকে। শিশু-কিশোরেরা এই উপন্যাস পাঠে কল্পনা বিস্তারের প্রভূত সুযোগ পায়। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটিতে ছন্দ-মাধুর্যে, ঘটনার বৈচিত্রে, সুনিপুণ কাহিনির আবেষ্টনে শিশু-কিশোরদের মনের সুকুমার বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন রূপকথার ছদ্মবেশে। এই কারণেই তাঁর এই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে শাশ্বত।

বাজনা (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)

বাজনা একটি ছোট্ট ছেলের নাম। তার মা ভালোবেসে এই নামে ডাকে। কিন্তু খুবই দুষ্টু প্রকৃতির বাজনা। মায়ের কথা একদম শোনে না। মা তাকে নদী থেকে ঘটিতে ভরে জল আনতে বলায় বাজনা অন্য কোথাও গিয়ে একবার ছোটটুন বাঁদরের ডাকে পেয়ারা গাছে ওঠে নয়তো নদীতে মাঝিভাইকে দেখে বলে তার সাথে যাবে। আবার জলে রাজহাঁসদের বলে তোমাদের পিঠে চেপে দোল খাবো। রাজহাঁস বাজনার কথা শুনে বলে 'আমার পিঠে চাপলে তোমার ভার সামলাবে কে? আমিও মরব, তুমিও ডুববে।' বাজনা নদীতে নেমে জল নেবার সময় জলের ভেতর থেকে বড়োমাছ যেই তার নাম ধরে ডেকেছে, অমনি বাজনা লোভে পড়ে মাছটিকে ধরতে যায়। এবং তার ঘটি জলের নীচে তলিয়ে যায়। মাছ বাজনার এই কার্যে উচিত জবাব দিয়ে জানায় **'যেমনকে তেমন। লোভ করলেই দুর্ভোগ।'**[১১] শৈলেনের আখ্যানে শিশুরা নীতি, আদর্শ এবং সত্য অনুসন্ধিৎসার একটি পথ খুঁজে পাবে। ছোটরা নিজেদের অজান্তেই মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং ভালো-মন্দের একটি পার্থক্য করে নিতে পারবে। উল্লেখযোগ্য এই যে, শিশুদের মনে যেন কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সেই বিষয়েও তিনি সদা সতর্ক থাকেন। লেখকের উপন্যাসগুলি পাঠের মাধ্যমেই আমরা তা সহজে অনুধাবন করতে পারি।

শৈলেন অনেকটাই প্রকৃতি প্রেমিক। প্রকৃতি তাঁর রচনায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে। শিশুদেরও বাইরের পরিবেশ, জীবজগতের প্রতি যে দায়বদ্ধতা আছে সেটা কৌশলে তিনি উপস্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা দেখি, বাজনা বাড়ির জানালা থেকে বৃষ্টির ফোঁটাকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টিতে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে তাদের উৎসের কথা 'ও বিস্টি, বিস্টি-ফোঁটা, তোমরা কোত্থেকে আসছ?'লেখক এইরকম সত্য ও গভীর অনুসন্ধিৎসু কথা প্রায়শই ব্যবহার করেছেন। তিনি শিশুদের কল্পনার জগতে পাড়ি দেবার সুযোগ করে দিলেও কখনোই অতিরঞ্জিত কোনো ঘটনাকে প্রাধান্য দেননি। শিশুদের স্বাভাবিক শৈশবে কোন বদ্ধ চিন্তা যেন তাদের কল্পনায় বাঁধা সৃষ্টি না করে সেদিকে তিনি সচকিত থাকতেন সবসময়। তাঁর এই সুদূরপ্রসারী ভাবনাচিন্তা শিশুসাহিত্যের জগতে নিজের স্থানটিকে অক্ষুণ্ণ করে রেখেছে। লেখকের এই উপন্যাসটির সাথে আমরা ক্যারল রচিত অ্যালিস এর মিল পেয়েছি। এখানে বাজনা অ্যালিসের মতো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে যে তার নাম বদল করবে তারপর স্বপ্নের জগতে নানারকম দুঃসাহসিক কার্যাবলীর পর হঠাৎ মায়ের ডাকে স্তম্বিত ফিরে পায়, তখন বাজনা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে –**"এমন সুন্দর নাম পৃথিবীতে আর কারো নেই। মায়ের আদর যেমন মিস্টি, তার নামটাও তেমনি মিস্টি ! মা যে-নামে ডাকে সেই নামই তো সুন্দর! সবচেয়ে ভালো !"**[১২]বাজনার স্বপ্নে আমরা অদ্ভুত সব প্রাণীদের দেখা পায় খেলনা টাট্টু হয়ে ওঠে জীবন্ত সে বাজনাকে নাম পরিবর্তনের জন্য নিয়ে যায় গো-বদ্যির কাছে তারপর এই কাল্পনিকতা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে। শৈলেন ঘোষ শিশুদের মনে এক বিশুদ্ধ আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছেন, সেখানে সত্যিকারের কোন ইতিহাস, ভূগোলের তথ্য নেই, কিন্তু শিশুদের মনে কোন ভুল বার্তা যেন না যায় সেইজন্য উপন্যাসের শেষে দুষ্টু বাজনা তার নাম পরিবর্তন চায় না মায়ের মুখে তার নাম শুনে চোখে জল আসে এ প্রসঙ্গের উল্লেখও আছে। এই নিখুঁত ঘটনাবর্ণনা যেন আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক দিনের ঘটনা। লেখক এইভাবেই চেনা বাস্তব জগত থেকে বৈচিত্রপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করে শিশুদের চিত্তকে উচ্ছ্বসিত করে তুলতেন।

হুপ্লোকে নিয়ে গপ্পো (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

শৈলেন ঘোষের প্রতিটি উপন্যাসের উপাদান মনের গহীনে লুকানো ভিন্ন ভিন্ন চিত্তাকর্ষক সব চরিত্র নিয়ে কল্পিত। যা শিশুদের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছাড়া এইসব কাহিনি রচিত এককথায় অসম্ভব। এই উপন্যাসটিতে লেখক অভিনবত্বের ছোঁয়া দিয়েছেন। ছোট্ট ঝুমকির বাড়িতে হুপ্লো নামে বাঁদরটি থাকে। হুপ্লো এখানে প্রধান চরিত্র। লেখক তার মুখ দিয়েই পুরো কাহিনিটি বিবৃত করিয়েছেন, এর ফলে শিশু পাঠকরা যেমন আকর্ষিত হবে তেমনি গল্পটিকে উপভোগ করবে। ঔপন্যাসিক কাহিনিটির মধ্যে প্রতিটি দৃশ্যের বিচিত্র নামকরণ করেছেন যা আমাদের মনকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে সহজেই যেমন- 'হুপ্লো আর চচ্চড়ি-ভাজা-বুড়ির ছাগল', 'হুপ্লো আর হাঁসছানার ডিগবাজি', 'হুপ্লো আর নাচের বাঁদর, নাচের ছাগল', 'গাধার নাম গোবর্ধন আর একটা বাঘ', 'বাঘও রেগেছে, হুপ্লোও ভেগেছে' এইরকম মজার সব নামকরণ এর আগে তেমনভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না বললেই চলে। দৃশ্য ব্যতীত সংলাপ বর্ণনাও কৌতুকময়। হুপ্লো, ছাগল ও বাঁদর তাদের সুখ-দুঃখের কথা পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করার মুহূর্তে ছাগল আবেগপ্রবণ হয়ে জানায় :

> **মেয়েদের সাজ-পোশাকগুলো কেমন যেন হাবজা-গোবজা! এই আমার খুড়-শাউড়ি, তারও ভারি ভাবনা!' বর বাঁদরটা তেড়েমেড়ে উঠল ছাগলটাকে, 'কথায়-কথায় খুড়-শাউড়ি, খুড়-শাউড়ি করিসনি তো!কী রকম আদেলপনা দেখ! যেন আর কারো খুড়-শাউড়ি নেই! ছাগল বলল, 'নেই-ই তো। তুই তো একটা বাউণ্ডুলে। ওই নেচেই বেড়াবি। বিয়েও হবে না, আর শাউড়িও হবে না। হুপ্লো জিজ্ঞাসা করে ছাগলকে তার বউ কোথায়? বউ এর কথা শুনতেই ছাগলের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, 'অনেকদিন ভাই দেখিনি তাকে। বউ এর জন্য মনটা বড্ড কেমন-কেমন করে। ছেলেপুলে নিয়ে কেমন আছে কে জানে!**[১৩]

ছোটদের উপযোগী এই রকম সহজ সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে বিষয়কে পরিবেশন করেছেন। শিশু-কিশোরদের মনের কৌতূহল যে সব বিষয়ে থাকে তার প্রতি গভীর মনযোগ থাকে তাঁর, সেজন্য প্রতিটি রচনাতেই এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। জীবজন্তুদের এমন কৌতুককর পরিচয় প্রদান চলিত রীতিতে এই প্রকাশভঙ্গি অতুলনীয়। হুপ্পো তার বুদ্ধির সাহায্যে বন্দী ছাগল, ও বাঁদরদের উদ্ধার করে এবং নিজে পুলিশের সাহায্যে ফিরে আসে ঝুমকির কাছে।

আমার নাম টায়রা (১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

এই উপন্যাসটিতে টায়রা এক ছোট্ট মেয়ে কিন্তু তার মনে আছে অসীম মায়া ও করুণা। তার বাবা নদীতে মাছ ধরতে যায় সেজন্য টায়রা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে কত কষ্ট করে বাবা তাদের জন্য। বাড়ির পাশেই একটি ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে মানা ও তার অন্ধ মা থাকে। টায়রা মানাকে ভাই বলে এবং ওদের সব খেয়ালরাখে। টায়রা মায়ের মুখে রামায়ণ এর 'দশরথ কর্তৃক অন্ধ মুনি বধ' এবং মহাভারতের 'অভিমন্যু বধ' গল্প শুনে তন্ময় ভাবে। এদিকে হঠাৎ বৃষ্টিতে টুংরি নদীতে বান আসে মানা এবং মানার মা দুজনেই মারা যায়, এই শোকে টায়রা বোবা হয়ে যায়, কারণ আজ যে মানার জন্মদিন ছিল। নদীর স্রোতে টায়রাও হারিয়ে যায় এক গভীর জঙ্গলে ডাকহরকরা তাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। জঙ্গলের বাঘ ও হরিণ টায়রাকে খুব ভালোবাসে, ও তাদের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু টায়রার মন থাকে উদাস মা, বাবার কথা মনে পড়ে কিন্তু নিজের গ্রামের রাস্তা যে সে হারিয়ে ফেলেছে তাই ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। এরপর জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়ে টায়রা সেখানে এক বুড়ি মা তাকে সন্তান স্নেহে রাখে। ডাকাতরা টায়রাকে অমানুষিক অত্যাচার করে ঘোড়ার আস্তাবল পরিস্কার করা থেকে শুরু করে ঘর মোছা, রান্না সব তাকে এক করতে হয়। বুড়ি মা সাহায্য করতে এলে দুজনকেই খুব মারে। ঘোড়াটি সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ ডাকাতকে এক লাথি মেরে গভীর কুয়োতে ফেলে দিয়ে টায়রাকে তার পিঠে বসিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে যায়। দৌড়াতে গিয়ে অনেক গ্রাম, জঙ্গল, নদী পেরিয়ে টায়রা পোঁছে যায় তার গ্রামের বাড়ি সেখানে মা, বাবার কথা মনে পড়ায় কান্নায় ফেটে পড়ে চিৎকার করে মা বলে ডেকে ওঠে, টুংরি নদীর ধারে তাদের বাড়িতে গিয়ে মা, বাবাকে ফিরে পায়।

এই উপন্যাসটিতে লেখক কোন নীতিগল্প বা উপদেশ দেননি। শুধুমাত্র শিশুদের বিশুদ্ধ আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলেছেন সেখানে বিচিত্র ঘটনার ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। ছোটদের চিন্তা-ভাবনার জগতকে প্রসারিত করেছেন সেখানে নির্মল হাস্যরস ও ছড়ার ব্যবহার করেছেন। টায়রা চরিত্রটিতে আমরা সাহসী, বিনয়, নিষ্ঠা, শ্রম, সদাচার, পরোপকারী, সত্যবাদী এই সমস্ত সদগুণ থাকলে নিজেই নিজের ভাগ্য জয় করতে পারবে- ছোটদের মত করে তাদের মনে এই নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে বুঝিয়েছেন গল্পের মাধ্যমে। দৈনন্দিন জীবনের নিরন্তর ভালো-মন্দের কাহিনিগুলি তিনি রূপকথার আশ্রয়ে চিত্রিত করেছেন এবং সেখানে সফলতাও প্রাপ্ত করেছেন। প্রকৃতির বিস্ময়কর পরিস্থিতির কথাও শিশুদের জানিয়েছেন এবং শিশু ও কিশোরদের ভালো-মন্দ দুই দিকটির সাথেই তাদের কৌশলে পরিচয় দিয়েছে ও নিখুঁত ছবিটি তুলে ধরেছে। শিশুদের মানসিক ভাবে সমস্ত দিক থেকেই বলিষ্ঠ রূপে গড়ে তোলাই একজন যথার্থ শিশুসাহিত্যিকের কাজ, এই উপন্যাসটিতে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি।

পরিশেষে বলা যায়, শৈলেন ঘোষ একাগ্র মনোভাব, গভীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে এমন সব প্রাণবন্ত চরিত্রকে জীবন্ত রূপে গড়ে তুলেছেন যেগুলি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যকে ঋদ্ধ করে তুলেছে। কখনো প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে শিশুদের সহজ সরল মন, আবার কখনো অসম্ভব সাহসী হয়ে লড়াই করেছে বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে। লেখক প্রতিটি চরিত্রকে অপরূপ সহমর্মিতা ও মমত্বের সাথে হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। রূপকথার মিতুল, বাজনা, হুপ্পো, শান্ত, টায়রা রূপকথার চরিত্র হলেও তার রূপ পরিবর্তন করেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এবং সফলতা প্রাপ্ত করে এক নজির গড়ে তুলেছেন। রূপকথার এই নব প্রয়াসকে সামনে রেখে

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা তথা মনন প্রকাশের এক প্রতিবাদের ভাষ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমরা বলতেই পারি, শৈলেনের এই উপন্যাসগুলি নব যুগের রূপকথার বাণীবাহক।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার, প্রবন্ধ সংকলন ১, বিশ্বসাহিত্য: রূপকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ:ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ৭৪৭।

২.বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, রূপকথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলকাতা সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯৪৭, পৃ. ১৮৫।

৩. ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ, তিতলি সাহিত্য পত্রিকা, শৈলেন ঘোষ বিশেষ সংখ্যা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২, নদীয়া, পৃ.৫।

৪. ঘোষ, শৈলেন, টুইটুই, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ২০১০, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রন ২০১৬, পৃ. ৩।

৫. তদেব, পৃ. ১৪।

৬. তদেব, পৃ. ১৬।

৭. ঘোষ, শৈলেন, মিতুল নামে পুতুলটি, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ২০১০, দ্বিতীয় পুনমুদ্রন ২০১৬, পৃ. ৪৭।

৮. তদেব, পৃ. ৫১।

৯. তদেব, পৃ. ৫২।

১০. তদেব, পৃ. ৭২।

১১. ঘোষ, শৈলেন, বাজনা, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ২০১০, দ্বিতীয় পুনমুদ্রন ২০১৬, পৃ. ১০২।

১২. তদেব, পৃ. ১৬৮।

১৩. ঘোষ, শৈলেন, হুপ্লোকে নিয়ে গপ্পো, উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ ২০১০, দ্বিতীয় পুনমুদ্রন ২০১৬, পৃ. ১৯২।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. উল হক, আনসার, ২০০ বছরের বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাস, পারুল প্রকাশনী, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ: ২০১৬।

২.গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ(১৮০০-১৯০০), কলকাতা ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

৩. সেন, নবেন্দু, প্রসঙ্গয়ানে বাংলা শিশুসাহিত্য, সাহিত্যলোক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট ১৯৯২, নতুন সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

৪.ভট্টাচার্য গোস্বামী, মহুয়া, বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন ১৯৫০-২০০০, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১১।

....

গবেষক, বিশ্বভারতী, বাংলা বিভাগ

বাংলা নাটকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

রোহিত মণ্ডল

সারসংক্ষেপ-

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ছ'টি বছরের মধ্যে রচিত বাংলা নাটকগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্বের ফসল। বাংলা সাহিত্যে এই মহাযুদ্ধের প্রভাব এবং তার প্রতিক্রিয়াই শিল্পীর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। সমকাল এবং সমসাময়িক ঘটনাগুলি একজন সৎ, বুদ্ধিজীবী এবং অনুভূতিশীল মানুষের চিন্তা ও মননে যে ছাপ ফেলে তারই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নাট্যসাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিতে।বাংলা নাটকগুলিতে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধত্তোর সমাজ-মানসের চালচিত্রবিরল নয়। যুদ্ধের মতো একটি প্রাণঘাতী মারণযজ্ঞ সময় ও সমাজকে স্থিরতর হতে দেয়নি। দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের সূচনা করেছে তার বিষময় ফলাফল সমকাল ও পরবর্তী কালের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাংলার সমাজ-মানস ও সৃষ্টিশীলদের রচনায় তারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা ও তাণ্ডবে মানবসমাজের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছে। সেই সূত্রে সমকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্যের দর্পনে ফুটে উঠেছে ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধের টুকরো টুকরো চিত্রগুলি।

বাংলার সমাজ জীবনে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ বহুল পরিমাণে এবং বহুমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ মিলিটারি সৈনিকদের উপস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন; এছাড়া মন্বন্তর, রেশন, কনট্রোল, কালোবাজার, চোরাকারবার, মজুতদারি, শহর থেকে গ্রামের প্রান্তিক সীমানা পর্যন্ত জনজীবনে সামাজিক সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। নাট্যসাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এই বহুমাত্রিক দিকগুলিকে রূপায়িত করা হয়েছে। যাঁদের কলমে বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক সংকট বা অবক্ষয় সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে তাঁরা হলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলায় যে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল সেই চিত্রই তাঁদের নাটকে দেখা মেলে। নাটকগুলিতে চিত্রিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে অনাহার ও মৃত্যুর তীব্রতা।

মূলশব্দ-

খাদ্য-সংকট, বস্ত্র-সংকট, কালবাজারি, চোরাকারবার, মজুতদারি, কাপড় ও কেরোসিনের সংকট, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, খাদ্যের প্রত্যাশায় মানুষের গ্রাম থেকে শহরে আগমণ, নারীর শরীর বিক্রয়, নারীর সম্ভ্রমহানি।

মূল প্রবন্ধ -

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী অর্থনৈতিক দুর্দশার ফলে ইটালিতে ফ্যাসিবাদ ও জার্মানিতে নাৎসীবাদ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী শক্তি খুব দ্রুত ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স প্রথম দিকে এই আগ্রাসী জাতীয়তাবাদকে প্রথমদিকে তোষণ করলেও হিটলারের অনমনীয় বিস্তার নীতি শেষ দিকেতাদেরকেও জার্মানির বিরোধী পক্ষে পরিণত করে। ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাত্র দুই-দশকের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ববাসীকে পুনরায় আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একুশ

বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশি বিধ্বংসী ও ভয়াবহ ছিল। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ তো বটেই, সমুদ্রগর্ভেও এই যুদ্ধ সুবিস্তৃত হয়েছিল। মারণাস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল ও লোকক্ষয়ের ক্ষেত্রে বিধ্বংসী আকার ধারণ করে এই যুদ্ধ-বলি হয় অগণিত মানুষ, তা জনগণের জন্য নিয়ে আসে অকথ্য দুঃখ-দুর্দশা আর লাঞ্ছনা। নিহত হয় পাঁচ কোটির বেশি মানুষ। বৈষয়িক ক্ষতির হিসেবে দাঁড়ায় চার লক্ষ কোটি ডলার। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অসংখ্য শহর আর গ্রাম, বিলুপ্ত হয়ে যায় মানব প্রতিভার বহু মহান সৃষ্টি, ক্ষত, রোগ আর অনাহারের দরুন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে কোটি কোটি মানুষ।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বৈনাশিক মনোভাব ও ব্যাপকতা এবং তার ফলশ্রুতি এতটাই সুদূর প্রসারিত যে মানবজাতির ইতিহাসে তা এক অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছে। সমগ্র মানুষের জীবনপ্রবাহ এই একটি মাত্র যুদ্ধের সংঘর্ষে অকল্পনীয় ভাবে কেঁপে উঠেছিল। এই যুদ্ধ রণভূমির সীমানা অতিক্রম করে, দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে, সমগ্র ব্যক্তি-মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ন্যায়-নীতি, ভালো-মন্দ, সমাজ-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মাধর্ম-বিশ্বাস, সাহিত্য-সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অভিনব চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি ব্যপ্তি ও গভীরতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই সময়পর্বে আমাদের বাংলা সাহিত্যেও গতি-পরিবর্তনের বেগ লক্ষ করা যায়। আধুনিক সাহিত্যের যে দুটি প্রধান গুণ জীবনমুখীনতা ও বাস্তবধর্মিতা — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই তার স্বরূপটি প্রকাশ পেল বাংলা সাহিত্যে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে আর কখনও সার্বজনীন ভাবে দুঃখ, বেদনা বা যন্ত্রণা এবং সংকট প্রভৃতির সত্যরূপ এত নিবিড় ভাবে উপলব্ধ হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অতি জটিলতম সময়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ছ'টি বছরের মধ্যে রচিত বাংলা নাটকগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্বের ফসল। বাংলা সাহিত্যে এই মহাযুদ্ধের প্রভাব এবং তার প্রতিক্রিয়াই শিল্পীর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। সমকাল এবং সমসাময়িক ঘটনাগুলি একজন সৎ, বুদ্ধিজীবী এবং অনুভূতিশীল মানুষের চিন্তা ও মননে যে ছাপ ফেলে তারই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নাট্যসাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিতে। বাংলা নাটকগুলিতে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সমাজ-মানসের চালচিত্র বিরল নয়। যুদ্ধের মতো একটি প্রাণঘাতী মারণযজ্ঞ সময় ও সমাজকে স্থিরতর হতে দেয়নি। দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের সূচনা করেছে তার বিষময় ফলাফল সমকাল ও পরবর্তী কালের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাংলার সমাজ-মানস ও সৃষ্টিশীলদের রচনায় তারই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা ও তাণ্ডবে মানবসমাজের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছে। সেই সূত্রে সমকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্যের দর্পনে ফুটে উঠেছে ভেঙে যাওয়া মূল্যবোধের টুকরো টুকরো চিত্রগুলি। বাংলার সমাজ জীবনে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ বহুল পরিমাণে এবং বহুমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ মিলিটারি সৈনিকদের উপস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন; এছাড়া মন্বন্তর, রেশন, কনট্রোল, কালোবাজার, চোরাকারবার, মজুতদারি, শহর থেকে গ্রামের প্রান্তিক সীমানা পর্যন্ত জনজীবনে সামাজিক সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। নাট্যসাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এই বহুমাত্রিক দিকগুলিকে রূপায়িত করা হয়েছে। যাঁদের কলমে বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক সংকট বা অবক্ষয় সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে তাঁরা হলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলায় যে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল সেই চিত্রই তাঁদের নাটকে দেখা মেলে। নাটকগুলিতে চিত্রিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে অনাহার ও মৃত্যুর তীব্রতা। মন্বন্তরের সূত্রে খাদ্য-সংকট, বস্ত্র-সংকট, কালবাজারি, চোরাকারবার, মজুতদারি, কাপড় ও কেরোসিনের সংকট, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, নারীর শরীর বিক্রয়, নারীর সম্ভ্রমহানির কথা বারবার তাঁদের সৃষ্টিতে ঘুরে ফিরে এসেছে।

বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের হোতা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭খ্রি.-১৯৭২খ্রি.)। তিনি ছিলেন সঙ্গীতকার, অভিনেতা ও বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক। তাঁর যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পরিবেশে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল রূপ। তাঁর প্রথম নাটক একাঙ্ক নাটক 'আগুন' প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায়। নাটকটি, ঐ বছরেই নাট্যভারতী মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। পাঁচটি দৃশ্য সহযোগে গঠিত ক্ষুদ্রতর নাটকটিতে দুর্ভিক্ষ, অভাব, দারিদ্র ও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটকে তুলে ধরা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে কৃষকেরা শহরের রেশনের দোকানে চালের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষেরাও এখানে এসেছে চালের জন্য। সাধারণ মানুষ দু'মুঠো অন্ন দিয়ে নিজেদের পরিবারের উদরপূর্তি করতে চায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণেই দেশের সাধারণ মানুষদের আজ হা-অন্ন অবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দেশ জুড়ে খাদ্যের সংকট ও সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে এ নাটকে। পাশাপাশি শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটকে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তাঁর পরবর্তী 'জবানবন্দী' নাটকেরঘটনাও সমসূত্রে বাঁধা। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায় এবং গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় নাটকটি ১৯৪৪ খিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। চার'টি দৃশ্য সম্বলিত এই একাঙ্ক নাটকটিতে একটি কৃষক পরিবারের অভাব-অনটন-দারিদ্র ও জীবনের সংঘাতময় কাহিনি বর্তমান। সীমাহীন দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় কৃষক পরিবারটি গ্রাম ছেড়ে কোলকাতা শহরে আসে। কোলকাতার ফুটপাতে পড়ে থেকে তথাকথিত ভদ্র সমাজের ঘৃণা ও অবহেলার পাত্র হয়ে সপরিবারে অতি কষ্টে দিন কাটায়। ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে কৃষক পরিবারের শিশুপুত্রটি একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। মৃত্যু হয় বৃদ্ধেরও। অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় এবং খাদ্য ও অর্থের বিনিময়েপতিপরায়ণা কৃষক বঁধুটির নারীত্ব লাঞ্ছিত হয়। নাটকে দুর্ভিক্ষ তাড়িত জীবন, শহুরে মানুষদের লোভ-লালসা, তাদের উদাসীন মানসিকতা এবং নারী-লোলুপতাকে নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কণ করেছেন।'জবানবন্দী' নাটকে"অব্যাহত গ্রামজীবন ও শস্যের অনন্ত ইতিহাসে, দুর্ভিক্ষকে যুক্ত করেও, মানুষের সংকল্পকে দুর্ভিক্ষের চেয়ে বলীয়ান করে তুলেছে।"[১] পরের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন'-তে তার পরিণতি ঘটেছে।

বিজন ভট্টাচার্য রচিত আমাদের অতিপরিচিত নাটক 'নবান্ন'— যে নাটকটি অভিনয় প্রতিভার জন্য ইতিহাস হয়ে আছে।নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায়। 'নবান্ন' নাটক সম্বন্ধে নাট্যকার বলেছেন যে — "যেদিন ঘরে অন্ন ছিলো না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি নবান্ন লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েবিদেশী শাসকের অত্যাচার ও মন্বন্তরের ফলে এবং কালোবাজারী মুনাফাখোরদের নির্মমতায় যে কৃষকদের শোচনীয় জীবনচর্যা ও দুরাবস্থা এবং গ্রাম পরিত্যাগ করে একমুঠো অন্নের জন্য কলকাতার রাস্তায় ভিকিরির মত ঘুরে বেড়ানো এবং শেষ পর্যন্ত নতুন ধানের উৎসবে নবান্নের প্রাণ চেতনায় আনন্দে বেঁচে ওঠা"[২] —এই কাহিনিই চিত্রিত হয়েছে 'নবান্ন' নাটকে। নাটকটির মধ্যে মেলে পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণা, বিদেশী শাসকের অত্যাচার, কৃষকদের দারিদ্রপূর্ণ জীবনের মর্মন্তুদ জীবনচিত্র। এরই সঙ্গে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলায় মানুষের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমিনপুর গ্রামের কৃষকদের সহজ-সরল জীবন-যাপন কেমন করে তছনচ হয়ে গেল তারই বাস্তব সম্মত রূপ। পাশাপাশি ধরা পড়েছে মহাজন শ্রেণি ও কালোবাজারি ব্যবসাদারদের লোভ-লালসা এবং আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার রূপটি। দুর্ভিক্ষের দিনে দেশে সাধারণ মানুষ যখন একমুঠো অন্নের জন্য কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত সেখানে কিছু মানুষ কালোটাকার প্রাবল্যে বিলাস-ব্যসনে দিনপাত করছে। নাটকে উল্লেখিত বড়োকর্তা, ২য় ও ৩য় ভদ্রলোকের সংলাপে তা ধরা পড়ে—

"৩য় ভদ্রলোক। ব্ল্যাক আউটের বাজারে চলাফেরা করাই দায়, আর...

বড়োকর্তা। আর ব'লো না ভায়া। একে ব্ল্যাক আউট, তার ওপর এই ওয়েদার।

আমারই দুরদৃষ্ট আর কি। এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা....

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঁ। তারপর কতজনকে নেমন্তন্ন করলে?

পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষা-বিধানে লটকে যাবে যে বাবা।"[৩]

নাটকে আমিনপুর নামে এক গ্রামের মানুষজন এভাবেই বিপন্ন হয়ে বাঁচার আশায় ছুটে গেছে শহরে। কিন্তু সেখানে তাদের আশ্রয় হয়েছে ফুটপাতে কিংবা নোংরা পার্কে। অনিয়মিত লঙ্গর পরিষেবা এই বিশাল সংখ্যক আগন্তুককে দিনান্তে একবার খাদ্য যোগান দিতে হিমসিম খেয়েছে। তার উপর মজুমদার, মহাজনেরা খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রেখে কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি করায় শহুরে নিম্নবিত্তদের শুরু হয়েছে অনশন, অর্ধাসন। এই পরিস্থিতিতে জাপানী আক্রমণে তীব্রতা বেড়েছে—অনিশ্চয়তা হয়ে উঠেছে নিত্যসাথী। পথে পথে পড়ে আছে অজস্র মানুষের মৃতদেহ। সে সময় কিছু সংখ্যক মানুষের লোভও বড় বীভৎস রূপে অনাবৃত হয়েছে। পুলিশ উৎকোচ নিয়ে মহাজনকে চোরাকারবারিকে ছেড়ে দিয়েছে। নারীপাচারকারীরা অতি সক্রিয় হয়েছে; তারই মধ্যে আবার নাম কিনতে ব্যস্ত চিত্র সাংবাদিকরা—কঙ্কালসার রমণীর ছবি তুলে বাংলার ম্যাডোনা দিয়ে বাজারে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে। আমিনপুর থেকে আসা প্রধান কুঞ্জ-রাধা, নিরঞ্জন বিনোদনীও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় পরস্পরে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা শুধু নিজের উদর পূর্তির তাড়নায়। শেষে সরকারি খবর এবং কারও কারও মুখে উড়োখবর শুনে তাঁরা ঘরে ফেরে। সেখানে সমবায়ের মাধ্যমে ফসল সংগ্রহে চিন্তা বা ধর্মগোলা, একত্রে পরিশ্রমে খেটে ফসল তোলা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের আবার গুছিয়ে নেয় এবং নবান্ন উৎসবের আয়োজনে মেতে ওঠে। নাটকেতেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের কুখ্যাত সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের দিশাকেই দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সমাজ-সচেতন বলিষ্ঠ বাস্তববাদী নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭খ্রি.-১৯৫৯খ্রি.)। তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর নাটকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট রচনা, নাট্যবিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনা-ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। বাংলার দুর্ভিক্ষ তেরশ পঞ্চাশ মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রাম-বাংলার দরিদ্র মানুষের অভাব-অনটন, ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের উপর ধর্মীয় এবং সামাজিক নিপীড়নের আলেখ্য অবলম্বনে 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭) ও'ছেঁড়া তার' (১৯৫৩) –এই দু'খানি নাটক রচনা করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।তাঁর 'দুঃখীর ইমান'নাটকটি পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করেই রচিত। আর স্বভাবতই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি হল বাংলার মন্বন্তর। নাটকটি ১৯৪৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায়। নাটকের বিষয় সম্পর্কে নাট্যকারের কথায়—"ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে এই চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল, যারা ধনলোভীর লোভের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল, তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি।"[৪] এই নাটকেরও কাহিনি গড়ে ওঠেছে হিন্দু-মুসলমান কৃষক সমাজকে কেন্দ্র করে। ধর্মদাস একজন জনমজুর, তাঁর স্ত্রী নাম বিলাতী। দুর্ভক্ষের সময় কেউ জনমজুর খাটতে চায় না, তাঁর স্ত্রী বিলাতী পরের ঘরে চিঁড়ে কুটে কোনো রকমে তাদের সংসারের দেখভাল করে। দর্মদাসকে তার দাদা রঘুনাথ তার নায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলে সে চুরি করে তা আদায় করতে গেলে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল কিছু দিনের জন্য। সে কারনেই সে আজ সকলের চোখে জেল ফেরৎ দাগী আসামী। গ্রামের সকলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখত। বাজারে চাল নিতে গিয়ে মারামারি করায় সিভিক গার্ড জামালকে জেলে নিয়ে যায়। তার ছেলে বচিরুদ্দির দায়িত্ব নেয় ধর্মদাস। গ্রামে এমন সময়ে পর পর কয়েকটা চুরি হওয়ায় রঘুনাথের অভিযোগে ধর্মদাসকে পুলিশ ধরতে এসে কিছু না পেয়ে ফির যায়। ইতিমধ্যে জামাল মুক্তি পেয়েছিল। তার বাড়ী থেকে পাওয়া যায় এক বস্তা চাল। পুলিশ জামালকে ধরে নির্যাতন শুরু করলে ধর্মদাস তখন নিজের সব অপরাধ স্বীকার করে। রঘুনাথের আপত্তি সত্ত্বেও দারোগা জামাল ও ধর্মদাসকে ছেড়ে দেয়। জনতা এই দাগী দুঃখী মানুষের মহত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। এই নাটকে নেই কোন জীবন জিজ্ঞাসা, আছে মানবিক অনুভূতির প্রকাশ। নাটকে অঙ্কিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাব ও অর্থনৈতিক সংকটই মানবসমাজে ভাঙন ধরিয়ে দেয়, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ, হারিয়ে যায় তাঁর মনুষ্যত্ব –এই ভয়ংকর

রূপ। অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন "বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের দুরন্ত আক্রমণে আমাদের দেশের খাদ্য গেল, সম্পদ গেল, জীবন ধারণের সামান্যতম দ্রব্যও নিমেষের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল, সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্রহীণ প্রেতের মত পথে প্রান্তরে ঘুরিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে মানুষের চিরপোষিত নীতি, ধর্ম, সংস্কার দুর্যোগের ঝড়ে জীর্ণ পত্রের মত খসিয়া পড়িল। সমাজের এই অসহনীয় বাস্তব অবস্থা নাটকে উদ্ঘাটিত হয়েছে।"[৫]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকের কাহিনি গড়ে ওঠেছে কৃষক জীবনকে কেন্দ্রকরে। এ কৃষক মধ্যবিত্ত বাবুদের মতো লেখা পড়া জানা কৃষক। নায়ক রহিমুদ্দি আর ফুলজানের সুখের সংসারে পরিস্থিতির চাপে সামান্য ভুল চালে কিভাবে রহিমের জীবন শেষ হয়ে গেল, তার সংসার ভেঙে গেল তারই ছবি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালোছায়া উত্তর বঙ্গের অজ পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ায়, আকালের দিনে সুদখোর মহাজনের গরীব চাষিদের শোষণ-বঞ্চনা, তাদের লোভ ও কুটিলতার দিকটি নাট্যকার তুলে ধরেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সুবাদের কলকাতার রাজপথে যে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ভয়ংকর মারণ উৎসবের প্রতীকি ব্যঞ্জনা রহিম চরিত্রটি।

'ছেঁড়া তার' নাটকে নাট্যকার মূল্যবোধের সংকট ও তার অবক্ষয়ের চিত্র পরিস্ফুটন করেছেন। অবক্ষয় পরিস্ফুটনে নাট্যকার তিনটি স্তরকে অবলম্বন করেছেন—প্রথম স্তরে দেখা যায় রহিম মানুষের মূল্যবোধ, তার মানবিকতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। বিপদগ্রস্ত বিপথযাত্রী মানুষকে সে পথ দেখিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পত্নীর আর পুত্রের প্রতি তার গভীর প্রেম, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব পালন করতে না পারার সুগভীর বেদনা তাকে ভ্রষ্ট করেছে। বাঁকাপথ ধরেছে সোজা পথের মানুষ যে তার কাছে বাঁকাপথ ধরেছে সে। মানুষের আসল শক্তি তার সততায়, চারিত্রিক দৃঢ়তা সেখানেই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব যেখানে সততই সে চরিত্রের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু এই জনপ্রিয় মানুষটি মনুষ্যত্বের আলোক বর্তিকা হাতে ধরা প্রমেথিউস শেষ পর্যন্ত নিজের জন্য বেছে নিয়েছে চরম দণ্ড। কেন না বর্হিমুদ্দি চেয়েছে হাকিমুদ্দিকে জব্দ করার জন্য বাঁকাপথে চলতে। নিজের স্ত্রী তার কাছে এত ভাল বোধ হল যে, সে পত্নীকে তালাক দিয়ে বসল। যে রহিম শহরে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছে সে যে কেনই বা স্ত্রীকেও সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি তাই আশ্চর্য। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় ফুলজানকে। রহিমের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘর-সংসার করতে করতে তার আদর্শ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রহিম যেমন যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের মূল্যবোধকে বদলে নিতে পারে, ফুলজান কিন্তু তা পারেনি। সে হাদীসের ব্যাখ্যাকে জীবনের সব ভেবে নিয়েছে। ফলে যে অমঙ্গলের আশঙ্কায় তার হাদীস নির্ভরতা তাও আর রইল না। কারণ, যার অমঙ্গলের ভয়, সেই চলে গেছে মঙ্গল-অমঙ্গলের সীমানার বাইরে। এমন এক সময়ে তার মনে সহানুভূতি জাগে যখন আর উপায় নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। তৃতীয় স্তরে রয়েছে হাকিমুদ্দি। এই চরিত্রটি মূল্যবোধের প্রতীক। মানুষের বিপদে ও দুর্দিনে মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সে চেয়েছে শুধু নিজের সম্পত্তির বৃদ্ধি। সে নিজে প্রজাদের ক্ষুধা ও অভাবের সুযোগে তাদের ক্ষিপ্ত করেছে।

গণনাট্য সংঘের সম্পাদক গণনাট্য ও আন্দোলনের বিশিষ্ট পুরুষ দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -.খ্রি১৯০৮) ১৯৯০খ্রি(.। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজের সমস্যা ও সংকট দেশবিভাগের অভিশাপ ,ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের অসহায় , - জীবন ধারণ হিন্দু -মুসলমানের-বর্বর সাম্প্রদায়িকতা, শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং কৃষকশ্রমিকদের - অসহায় জীবনচর্যা তাঁর নাটকে সার্থক রূপ পেয়েছে।পঞ্চাশের মন্বন্তরকে অবলম্বন করে তিনি লেখেন 'দীপশিখা' (১৯৪৩) নাটক। নাটকটি অভিনীত হয় রঙমহল মঞ্চে।তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের করুণ ছায়া নেমে এসেছে বাংলায়। ভিক্ষাজীবীরা কোলকাতার পথে পথে ঘুরেও ভিক্ষা পায় না। শুরু হয়েছে কালোবাজারী। বাজারে জিনিস পত্রের দাম ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সমাজে বসবাসকারী নিম্নশ্রেণির মানুষদের মধ্যে বাঁচাও বাঁচাও রব উঠেছে। চাষীরা বাঁচার আশায় গ্রাম ছেড়ে কোলকাতা শহরে পাড়ি দিয়েছে। চাষীবউ ভিখারিণীতে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে আছে দুটি শিশু পুত্রকন্যা। একদিন এক চাল ব্যবসায়ী গাড়ি বোঝাই চালের বস্তাগুলি মুটের সাহায্যে গোদামজাত করছিলেন। চাল গুদামজাত

হওয়ার পর গাড়ি চলে যায়। ছেড়া বস্তা দিয়ে সামান্য চাল রাস্তায় পড়ে থাকে কিন্তু মহাজনের নজরে আসেনি। ভিখারিনী চাষীবউ সেই চাল কুড়িয়ে আঁচলে তোলায় মহাজন তা দেখতে পায় এবং তাকে চোর বলে শাসন করতে থাকে ও পুলিশে দেবার ভয় দেখায়। চাষীবউ কান্নাকাটি করতে থাকে। উপায়হীন অবস্থায় মহাজনের হাতে কামড় বসিয়ে পুত্রকন্যা নিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের কালো মেঘ আরও ঘনিয়ে আসে। প্রতিরোধের একটি ক্ষীণ চেষ্টাও দেখাযায়। বুভুক্ষিতের ভুখামিছিল আইন সভার দিকে চলে। সেই মিছিলে নেতৃত্ব দেয় এক শিক্ষিতা তরুণী — নাম লতিকা। কিন্তু শুরু হয় কোলকাতার উপর জাপানী বিমান হামলা। সকলেই আশ্রয় নেয় এয়ার রেড শেলটার-এ। এরূপ বিপৎকালীন অবস্থায় একই আশ্রয় স্থলে দেখা যায় সেই মহাজন ও কৃষক রমণীকে। চরম খাদ্য-সংকটের দিনে চারদিকব্যাপী হাহাকার রব। কঙ্কাল মানুষের দল কোলকাতার পথে পথে 'একটু ফ্যান দাও, একটু ফ্যান দাও' বলে ঘুরতে থাকে। একমুঠো অন্নের জন্য ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সন্তানের মুখের গ্রাস মাতা কেড়ে খায়। অনাহারে চাষী রমণীর পুত্রের মৃত্যু হয় ও একদিন মেয়েটিও হারিয়ে যায়। বাঁচার সমস্ত আশা তার ফুরিয়ে যায় — অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে থাকে। সেবা দলের লোকেরা হাসপাতালে পৌঁছে দেয় কিন্তু পুত্রকন্যা শোকগ্রস্ত চাষীবউ হাসপাতালের খাবার খাওয়াতে অনিহা প্রকাশ করে। এরূপ সময়ে সেখানে আসে লতিকা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে লতিকা তাকে আশ্রয় শিবিরের নিয়ে যায়। সেখানে হারানো শিশুদের মুখের দিকে চেয়ে নিজের মেয়েকে খুজতে থাকে। অবশেষে একদিন হারানো মেয়ের সন্ধান পায়। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। এমন সময় খবর পায় পাশের ঘরের দুটি শিশু মারা গেছে। সংবাদ পেয়ে চাষীবউ তার মেয়ে নীলাকে দৃঢ়হস্তে বুকের কাছে টেনে নেয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে —"না না, একে আমি একে আমি ছেড়ে দোব না।"[৬]

বস্তুত সেদিনের বাংলা নাটকে মানুষের অন্নাভাব, দারিদ্র ও শ্রেণিশোষণ ও যুদ্ধ প্রসঙ্গই হয়ে উঠেছিল নাটকের মূল বিষয়। বিজন ভট্টাচার্য,তুলসী লাহিড়ী,দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও বিভিন্ন নাট্যকারের শিল্পী-চেতনায় যুদ্ধ প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি।জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের 'চালের দর' (১৯৪৩),মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' প্রভৃতি নাটকের বিষয়বস্তুতে বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।শচীন সেনগুপ্তের 'রাজধানীর রাস্তায়' ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন সাধনকুমার ভট্টাচার্য, মন্বন্তরের সংকট নিয়ে একাঙ্ক নাটক 'নমুনা' লিখেছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' নাটকে আছে যুদ্ধের উল্লেখ। গ্রাম-বাংলার পটভূমিকায় সাম্প্রদায়িক সমস্যার দিকটি চিত্রিত হয়েছে এই নাটকে। নাট্যকার সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলকারণ দেখিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা। কিন্তু জাপানী বোমার ভয়ে তারা যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ আশ্রয় নিয়েছে মন্দির কেউ বা মসজিদে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তখন বিলুপ্ত। জাতীয় সংকট এসে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিকে মুছে দিয়েছে। নাটকের শেষে তারা বিভেদ ভুলে, একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে, রুখতে হবে জাপানকে —সংকল্পটি ধ্বনিত হয়েছে।

উৎস নির্দেশ -

১। রায় কুমার,বাংলা একাঙ্ক নাটক সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট ইণ্ডিয়া,নয়াদিল্লী-১৬, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৪

২। ভট্টাচার্য বিজন, নবান্ন, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৯, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬১, পৃষ্ঠা-ভূমিকা অংশ

৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯

৪। লাহিড়ী শ্রীতুলসীদাস, দুঃখীর ইমান, ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬, দ্বিতীয় প্রকাশ পৌষ ১৩৬০,পৃষ্ঠা-১

৫।ঘোষ অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস,জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা-৬, ২য় সংস্করণ ১৩৬২,পৃষ্ঠা-৩২৯-৩৩০

৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস(আধুনিক যুগ), এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি:, কলিকাতা-৬, ২য় সংস্করণ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-৪৭০

গ্রন্থপঞ্জি-

আকরগ্রন্থ-

১। বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র, দীপশিখা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-৬

২। ভট্টাচার্য বিজন, নবান্ন, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৯,৪র্থ সংস্করণ ১৯৬১

৩। লাহিড়ী শ্রীতুলসীদাস, দুঃখীর ইমান, ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬, দ্বিতীয় প্রকাশ পৌষ ১৩৬০

সহায়ক গ্রন্থ-

১। ঘোষ অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস,জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা-৬,২য় সংস্করণ ১৩৬২

২। বসু স্বপন ও দত্ত হর্ষ, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,পুস্তক বিপণি,কলকাতা-০৯,তৃতীয় প্রকাশ আগস্ট২০১৫

৩। ভট্টাচার্য আশুতোষ, নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি:, কলিকাতা-৬, ২য় সংস্করণ ১৩৬৭

৪। ভৌমিক ড. নির্মলেন্দু, তুলসী লাহিড়ী ছেঁড়া তার, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা-০৯,

৫। রায় কুমার,বাংলা একাঙ্ক নাটক সংকলন, ন্যাশনাল বুকট্রাষ্টইণ্ডিয়া,নয়াদিল্লী-১৬, প্রথমপ্রকাশ২০০১

....

কলেজ টিচার (SACT) , বাংলা বিভাগ , পি আর এম মহাবিদ্যালয় , বাঁকুড়া ,

বাংলা ধাঁধায় কীটপতঙ্গ প্রসঙ্গ

ড. শান্তনু ভট্টাচার্য

সারসংক্ষেপ-

লোকসমাজের সভ্যতা জনিত উৎকর্ষতার প্রতিফলন লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন : বস্তু কেন্দ্রিক, খেলাধূলা কেন্দ্রিক, বিশ্বাস-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক, বাক্ কেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক, লিখন বা অঙ্কন কেন্দ্রিক ইত্যাদি। বাক্ কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ধারাটি মুখে মুখে রচিত, মুখে মুখে প্রচলিত, স্মৃতিবাহিত ও শ্রুতিনির্ভর। ধাঁধা লোকসংস্কৃতির এই বাক্ কেন্দ্রিক ধারার অন্তর্ভুক্ত। ধাঁধা শব্দটি এসেছে 'ধন্দ' বা 'ধন্ধ' শব্দ থেকে, যার অর্থ ধাঁধিয়ে দেওয়া বা সমস্যায় ফেলা। ধাঁধায় পরিচিত বিষয়কে অপরিচয়ের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। ধাঁধা প্রশ্নমূলক। ধাঁধার উত্তরটি অবশ্য প্রশ্নের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। উত্তর দাতার বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ধাঁধার মধ্যে থাকে নির্মল কৌতুক যা সকলের মনকে ছুঁয়ে যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ধাঁধার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নানা বিষয় নিয়ে ধাঁধা তৈরি হয়েছে। ধাঁধাকে বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন :দেবদেবী কেন্দ্রিক, নরনারী কেন্দ্রিক, প্রকৃতি কেন্দ্রিক, জীবজন্তু কেন্দ্রিক, গার্হস্থ্যজীবন কেন্দ্রিক, আখ্যান কেন্দ্রিক, গণিত কেন্দ্রিক ইত্যাদি। জীবজন্তু কেন্দ্রিক ধাঁধাগুলোর মধ্যে অনেকটা জায়গা নিয়ে রয়েছে কীটপতঙ্গ প্রসঙ্গ। এমনই কিছু কীটপতঙ্গ কেন্দ্রিক বাংলা ধাঁধা নির্বাচন করে তার অনুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ –

ধাঁধা, হেঁয়ালি, কীটপতঙ্গ, লোকসাহিত্য, লোকসমাজ।

মূলপ্রবন্ধ -

'ধাঁধা শব্দটির উৎপত্তি 'ধন্ধ' শব্দ থেকে। ধন্ধ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সংশয়, ধোঁকা'। বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন : 'হেঁয়ালি', 'কউটো', 'কিচ্ছা', 'কলই', 'ফোর', 'রাতকথা' 'ভাঙ্গানী', 'শোলক', 'ভিঠাক', 'ধন্ধহাসি', 'ঠল্লক', 'প্রহেলী', 'পুদুর', 'কড়সার', 'উখানা' ইত্যাদি। ধাঁধার প্রায় ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Riddle'। Riddle শব্দটি এসেছে 'Readin' থেকে, যার আভিধানিক অর্থ 'to give advice'। জার্মান ভাষায় ধাঁধাকে বলে 'Rat(h)sel, গ্রিক ভাষায় 'Ainigma', ল্যাটিনে 'Aenigma', ফরাসিতে 'Enigma'। সংস্কৃত প্রহেলিকা শব্দ থেকে 'হেঁয়ালি' শব্দের উৎপত্তি মনে করা হয়। (সংস্কৃত প্রহেলিকা >প্রহেলিআ>হেলিআ >হেঁলিয়া >হেঁয়ালি)।

ধাঁধা বলতে বোঝায় 'A periphrastic presentation of an unmentioned subject the design of which is to excite the reader or hearer to the discovery of the meaning hidden under a studied obscurity of expression'।[১] অধ্যাপক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, 'ধাঁধা হল সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত মৌখিক রচনা যা প্রজন্ম পরম্পরায় ঐতিহ্যকে নির্ভর করে টিকে থাকে, যাতে আপাতভাবে যে বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে শ্রোতা মনে করে, প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ কিন্তু ভিন্নতর বিষয়কে কৌশলে উপস্থাপিত করা হয় প্রশ্নাকারে, যার উদ্দেশ্য শ্রোতার বুদ্ধি পরীক্ষা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের স্বীকৃত সমাধানটি ইতিপূর্বে জানা কিনা তার পরীক্ষা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতার যৌথভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে যার ফলশ্রুতি কৌতুক রস্বাসাদন, তাকেই বলে ধাঁধা।'[২]বিশিষ্ট গবেষকের মতে 'ধাঁধা আসলে হল এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার; এদিক থেকে দেখলে একে প্রবাদেরই জ্ঞাতি বলে গণ্য করতে পারি। এ-দুয়ের মাধ্যমেই একটি জাতিকোমের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের বহু বিচিত্র সব অভিব্যক্তি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাঁধা-তথা-হেঁয়ালির মধ্যে একটা সাদাসিধে ভঙ্গি থাকে

এবং অপ্রত্যাশিত কিংবা অকল্পিত কিছু তুলনা-উপমা রূপকাশ্রিতভাবে প্রকাশিত হয় এর ভিতর। সাদৃশ্য এবং আপাত-বৈপরীত্য-এ-দুইই ধাঁধার গঠনে অন্তর্লীন সক্রিয়মূল শক্তিরূপে থাকে; হয় এটি নয় অন্যটি।'[৩]

ধাঁধার উপস্থাপনে থাকে প্রশ্নমূলকতা। পরিচিত বিষয়কে অপরিচয়ের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। প্রধানত ধাঁধায় উত্তরদাতার বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রশ্নের আকারে ধাঁধা উপস্থাপিত হওয়ায় প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার এই দুইয়েরই স্পষ্ট উপস্থিতি থাকে। ধাঁধার মধ্য দিয়ে নির্মল কৌতুকের প্রকাশ ঘটে। কোনো কোনো ধাঁধায় জাদুক্রিয়ার সংযোগও লক্ষ করা যায়। ধাঁধার ব্যবহার অতি প্রাচীন। মিশরীয় 'বুক অব ডেড', ঋকবেদ সংহিতা, ওল্ড টেস্টামেন্ট, গ্রিক পুরাণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক কাহিনিমালা ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে ধাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে ধাঁধার প্রসঙ্গ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিভিন্নপ্রকার মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য ইত্যাদিতে ধাঁধার বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

নানা বিষয়ে ধাঁধা রচিত হয়। যেমন : দেবদেবী কেন্দ্রিক, নরনারী কেন্দ্রিক, প্রকৃতি কেন্দ্রিক, জীবজন্তু কেন্দ্রিক, গার্হস্থ্যজীবন কেন্দ্রিক, আখ্যান কেন্দ্রিক, গণিত কেন্দ্রিক ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য কীটপতঙ্গ কেন্দ্রিক ধাঁধাগুলি জীবজন্তু কেন্দ্রিক ধাঁধার অন্তর্গত। লোকসমাজ কেবলমাত্র নরনারী কেন্দ্রিক নয়। সেই সমাজে যেমন মানব-মানবী আছে তেমনি নানা গাছপালা জীবজন্তুও আছে। সকলকে নিয়েই তাদের সহাবস্থান। তাই লোকজীবন থেকে যখন লোকসাহিত্য উঠে আসে তখন স্বাভাবিকভাবেই সকল প্রাণীর কথাই তাতে ধরা দেয়। ধাঁধার মধ্যেও আমরা জীবজন্তুর তথা কীটপতঙ্গের প্রসঙ্গ বারে বারে উঠে আসতে দেখি। যে কীটপতঙ্গগুলো প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাদের শারীরিক গঠন, স্বভাবচরিত্র, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে একাধিক ধাঁধা তৈরি হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা কীটপতঙ্গ কেন্দ্রিক কিছু ধাঁধার বিশ্লেষণ করে রসাস্বাদন করব। এ বিষয়ে বলা প্রয়োজন লোকসমাজ যে সকল কীটপতঙ্গের সঙ্গে প্রতিনিয়ত জীবনযাপন করে তাদের কথাই ধাঁধাগুলোতে উঠে এসেছে। যেমন : মশা, মাছি, বোলতা, মৌমাছি, মাকড়সা, জোনাকি, উকুন ইত্যাদি। এইসকল কীটপতঙ্গের জন্য প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয় লোকসমাজ। তাই তাদের কথাই হেঁয়ালির মাধ্যমে প্রকাশ করে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করে চলেছে লোকসমাজ যুগ যুগ ধরে।

প্রথমে আসা যাক আমাদের অতিপরিচিত মশার প্রসঙ্গে। মশার সর্বত্র যাতায়াত বিষয়ে একটি ধাঁধায় পাওয়া যায়—

গায়েন লয়, বায়েন লয়, তবু গুন গুন করে
বৌ লয়, বিটি লয়, থাকে সব ঘরে।

অর্থাৎ গায়ক বা বাদক নয় তবুও মশা গুন গুন করে। স্ত্রী বা কন্যা নয় তবুও ঘরে ঘরে থাকে। সাধারণত পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরই ঘরে থাকার প্রবণতা বেশি। তাই গৃহবধূ বা বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে মশার তুলনা টানা হয়েছে।

উড়া দেয় পাখি নয়/বনে থাকে অরিন নয়
বীর পালোয়ান কেউরে না ডরায়/এক থাপ্পড়ে মারা যায়।

মশা উড়ে বেড়ায় কিন্তু পাখি নয়। আবার বনে বনে ঘোরে কিন্তু হরিণ নয়। বীর পালোয়ান কাউকেই মশা ভয় পায় না, সকলকেই সুযোগ পেলে কামড়ায়। আর এক থাপ্পড়েই সে মারা যায়।

আবার,

পুন পুন গুন গুন/ঘুণ পুক্ নয়
বাঘ রাইক্ষসের মত/মানু গরু খায়
ছয়খান পাও আছে/না রয় মাটিত্
চাইর পাখে উড়া দেয়/ নাম কও চাই পণ্ডিত।

মশার ওড়ার শব্দ হয়, যা গুন গুন শোনায়। কিন্তু সে ঘুণ পোকা নয়। ঘুণ পোকা কাঠ খায়। আর মশা বাঘ রাক্ষসের মতো মানুষ গোরু ইত্যাদির রক্ত খেয়ে থাকে। ছয়খানা তার পা, মাটিতে বেশি বসে না। চার পাখায় উড়ে বেড়ায়।

মাছির প্রসঙ্গে ধাঁধায় আছে— একটুখানি পাখির সর্ষের মতো চোখ

বাচ্‌ড়ায় বসে, মুচড়ায় গোঁফ।

সর্ষের মতো ছোটো ছোটো মাছির চোখ। ছোটো পাখির মতো সে। আর মাছি বসার পর তার সামনের পা দুটি একটার সাথে অন্যটা স্পর্শ করে। এই স্পর্শ করাটা যেন কোনো পুরুষ মানুষের গোঁফে তা দেওয়ার সমতুল্য।

আবার অন্যত্র পাওয়া যায়— এমন বেটা বীর/রাজার পাতে বসে মারে ক্ষীর।

মাছি সর্বত্র বসে। কোনো বাছ-বিচার করে না। রাজার পাতে বসে ক্ষীর খাওয়ারও সাহস তার আছে।

শুঁয়োপোকার সারা শরীরে যে শুঁয়ো থাকে সে কথাও ধাঁধায় উঠে এসেছে—

পশু নয়, পক্ষী নয়, জীব মধ্যে ধরি
অগণন বাণ তার পৃষ্ঠের উপরি
না জানিয়া কেহ যদি স্পর্শ করে তারে
সেই ক্ষণে লক্ষ বাণে বিদ্ধ করে তারে।

শুঁয়ো ও পোকাপশু নয় আবার পাখিও নয়। সারা গায়ে তার তীক্ষ্ণ লোম। না জেনে তাকে যদি কেউ স্পর্শ করে তাহলে সেই তীক্ষ্ণ লোম স্পর্শকারীর শরীরকে বিদ্ধ করে।

মৌমাছি দলবদ্ধ জীবনযাপন করে। একসঙ্গে অনেকে মিলে চাক তৈরি করে। এই চাকেই তারা সঞ্চয় করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্য তথা মধু।

বাঁধন বেঁধে যায়, আর দেখেছে তায়
উড়ে যায় মোর খঞ্জন পাখি, বাজনা বেজে যায়।

এখানে মৌমাছির চাক বাঁধার প্রসঙ্গ আছে। তার উড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই যে শব্দ হয় তাকে বাজনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মৌমাছিকে খঞ্জনা পাখির রূপকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে।

আশমানেতে তিরিবিড়ি চৌডালেতে বাসা
গাই বড়ো হাটিহুটি দুধ বড়ো মিঠা।

আকাশেতে মৌমাছি উড়ে বেড়ায়। অনেক উঁচু ডালে মৌমাছি বাসা বাঁধে। মৌমাছির সঙ্গে এখানে গোরুর তুলনা করা হয়েছে। গোরুর দুধ যেমন পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু। মৌমাছির মধুও তেমনি খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। গোরুর দুধের সঙ্গে মৌমাছির মধুর তুলনা করা হয়েছে।

গাইত গোপিনী দুধ তো মিঠা
ষোলোশ গোপিনীর একটি পিঠা।

বহু গোপিনীর মাঝে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন, তেমনি বহু মৌমাছি ঘিরে থাকে তাদের মৌচাককে। এখানে মধুকে মিষ্টি দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মৌমাছিদের দলবদ্ধ জীবন এবং মৌচাককে রক্ষা করার যে ঘোর আর্তি তা শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীদের কৃষ্ণকেন্দ্রিক প্রেমের সমতুল্য বলে মনে করা হয়েছে।

উইপোকা প্রসঙ্গে ধাঁধায় আছে—

একটুখানি পক্ষীটি/বালির মতন চক্ষু
বড় বড় বৃক্ষের সঙ্গে/লড়াই করিতে যায়।

উইপোকাকে ছোটো পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উইপোকার চোখ আকারে বালির দানার মতো ক্ষুদ্র, কিন্তু তাও সে বড়ো বড়ো গাছের ওপর বাসা বা ঢিবি তৈরি করতে সক্ষম।

মাকড়সার শরীরের গঠন নিয়ে ধাঁধা আছে—

অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু/বসে আছে রাম ঠাটু।
শুকনো মাটিতে পেতে জাল/আহার করে চিরকাল।

মাকড়সার আটটা পা, পাগুলিতে যে ভাঁজ তাকে ষোলো হাঁটু বলা হয়েছে। শুকনো মাটিতে সে জাল তৈরি করে। এই জালে নানা পোকামাকড় আটকা পড়ে যায়। পরে মাকড়সা তাদের আহার করে।

শূন্যে যায়, শূন্যে আসে, শূন্যে বান্ধে ঘর
বিধাতা করিছে অর গধানতে কমর।

মাকড়সা শূন্যে জাল বাঁধে। এখানে জাল বাঁধাকে ঘর বাঁধা বলা হয়েছে। বিধাতা মাকড়সার দেহকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে মাকড়সার গলা ও কোমরকে পৃথক করা যায় না।

লোক ধাঁধায় বোলতার বিষয়ে আছে—

হলদিয়া বরণ গাও, খাটিকার মতো পাও
চুট্টৎ করিয়া চুমা খাইল, যম রাজার মাও।

বোলতার গায়ের বর্ণহলুদ। বোলতার কামড়ে ভীষণ জ্বালা করে। যমরাজের মায়ের চুম্বনের সঙ্গে তাই তার তুলনা করা হয়েছে।

এতটুকু বামুনদা/ ছুঁ দিলে হায় গো মা।

বোলতা আকারে ছোটো, কিন্তু কামড় দিলে ভীষণ জ্বালা যা মাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

খইড়কা লাকান পাও/অলদি লাকান গাও
ভুনভুনাইয়া পাকায়/যারে হূঙ্গা দেয়
হে চেঁচায়।

বোলতার সরু সরু পা। হলুদ গাত্রবর্ণ। যাকে হুল ফোটায় সে বিষ জ্বালায় চিৎকার করে।

হলুদে ডুবু ডুবু বিনোদিনী রাই।
ধরিয়া চুমু খেয়ে কাঁদায়ে পলায়।

বোলতার হলুদ গায়ের রঙ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী রাধিকার সৌন্দর্যের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। বোলতার চুমু অর্থে কামড় যা ভীষণ জ্বালাময়। ফলে সৌন্দর্য এবং বিষজ্বালা বোলতার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

ডাঁশ মাছি প্রসঙ্গে ধাঁধায় বলা হয়েছে—

ছয় গোটা পদ যার কবরী বদন
ললাট দীঘল রুধির ভক্ষণ
হাতি খায়, ঘোড়া খায়, আর খায় বাঘ

পথে ঘাটে খেতে যায়, যারা পায়ে লাগ।

ডাঁশ মাছির দেহের গঠন বর্ণনা করা হয়েছে। ছয়খানা পা তার। কপাল অপেক্ষাকৃত বড়ো। রক্ত ভক্ষণ করে। হাতি, ঘোড়া, বাঘ সকলকেই কামড়ায়। পথেঘাটে যাকে পায় তাকেই কামড়ায়।

জোনাকি বিষয়ে ধাঁধায় আছে—

জ্বলে চলে ছোঁয় না পানি/বল দেখি কোন প্রাণী?

জোনাকি রাতের অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে। জোনাকির এই বৈশিষ্ট্যকে ধাঁধাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। জোনাকি জল স্পর্শ করে না।

আকাশ হাতে পাইলে/চইম্‌কি চইম্‌কি আগুন জ্বলে
ছাওয়ায় হাতেত্ দিলে/ তাঁয় কিচির মিচির করে।

জোনাকি আকাশে যখন উড়ে বেড়ায় তখন আলো জ্বলে। কিন্তু ছায়ায় জোনাকিকে ধরলে সে 'কিচির মিচির' করে। এখানে কিচির মিচির অর্থে জোনাকির আপত্তি করাকে বোঝায়।

অনেকধাঁধা আছে উকুনকে কেন্দ্র করে। উকুন চুলের মধ্যে থেকে মানুষের রক্ত খেয়ে জীবনধারণ করে। খুব দ্রুত বংশবিস্তার করে।

কাল কাসিন্দের মাঠেরে ভাই/কাল হরিণ চরে
রাজার ব্যাটার সাধ্য নাই যে/ধরে খেতে পারে।

কালো কেশের মধ্যে কালো উকুন সহজেই মিশে যায়। ফলে কেশ থেকে উকুন আলাদা করা সম্ভব হয় না। রাজার ব্যাটার পক্ষেও সম্ভব হয় না এই আলাদা করা।

কালো কচুর বাগানে, কালো হরিণ চরে
দশজন ধরে, দুইজনে মারে।

উকুনকে দশ আঙুলে ধরা হয় এবং দুই আঙুল দিয়ে টিপে মারা হয়। এখানে সেকথাই বলা হয়েছে।

তেলাপোকা প্রসঙ্গে ধাঁধায় আছে—

চাইর পাখে উড়া দেয়/হে নায় পাখি
কি নাম আজব চিজ/কও চাই দেখি।

তেলাপোকার চারটি পাখা, উড়ে যায়। কিন্তু সে পাখি নয়।

ফড়িং সম্পর্কিত ধাঁধা—

উড়ে যায় ঘাস খায় নয় সে গোরু
ছয়খানি পা তার চারখানি সরু
হাতির মতো দাবনা তার উটের মতো পিঠ
কচ্ছপের মতো বুক তার ঘোড়ার মতো মুখ।

ফড়িং উড়ে বেড়ায়, ঘাস খায়। ছয় খানা তার পা। চারখানা সরু। হাতি, উট, কচ্ছপ, ঘোড়া প্রাণীদের শারীরিক গঠনের সঙ্গে ফড়িং-এর তুলনা টানা হয়েছে। এমন নানা প্রাণীর সঙ্গে তুলনা টেনে ধাঁধার উত্তরদাতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পিঁপড়ের কথাও ধাঁধায় পাওয়া যায়—

লালবরণ ছয় চরণ/পেট কাটিল হাঁটে
মূর্খে কি ভাঙ্গাইবে/পণ্ডিতেরই ফাটে।

পিঁপড়ে লালবর্ণের। ছয়টা পা। পিঁপড়ের পেট কেটে দিলেও সে হাঁটতে থাকে।

এট্টখানা ছ্যামড়ারা দুধভাত খায়
আড়াই হাত মাটির তলায় যুদ্ধ অরতি যায়।

পিঁপড়ে আকারে ছোটো। দুধভাত অর্থাৎ মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে ভালোবাসে। মাটির নীচে বাসা বেঁধে বসবাস করে।

রাজার পোআ ভাত খায়
পিঁড়ার তল দি হাফ্ যায়।

পিঁপড়ে সারিবদ্ধভাবে খাবার থালার পাশ দিয়ে যাতায়াত করে। এ বিষয়ে সে কাউকে পরোয়া করে না। কে রাজা কে প্রজা সে বিবেচনা তার নেই।

এক মরদ মরিয়া গেল/হাজার জন হইল গোঠ
কেমন করিয়া ভরেয়া দিবে/ফোর কোনা হইল আঁট।

একটি মৃতবস্তুকে কেন্দ্র করে হাজারটা পিঁপড়ে একত্রিত হয়। তারা দলবদ্ধভাবে সেই মৃতবস্তুকে নিয়ে বাসার দিকে রওনা দেয়। বাসার গর্তে একসঙ্গে প্রবেশ করতে যাওয়ায় গর্তের মুখ সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

এমনি নানা কীটপতঙ্গের কথা ধাঁধায় উঠে আসতে দেখা যায়। এই সকল ধাঁধা এক অর্থে লোকশিক্ষারও কাজ করে। শিশু যখন এই কীটপতঙ্গ কেন্দ্রিক ধাঁধাগুলো শোনে তখন এই কীট পতঙ্গ সম্পর্কে তার একটা ধারণা হয়। পূর্বে যখন টেলিভিশন, মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি আসেনি তখন এইসকল ধাঁধার মাধ্যমেই কীটপতঙ্গ প্রসঙ্গে একটা ধারণা তৈরি হত শিশুর মনে। একটা ধাঁধার উত্তর শোনার পর নিশ্চয়ই সেই কীটপতঙ্গকে নিয়ে একাধিক প্রশ্ন গড়ে উঠত শিশুটির কল্পনায়। উত্তর তাকে একটা প্রাথমিক শিক্ষা দিত। এছাড়া এই ধাঁধাগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা যুক্ত থাকে। কীভাবে উত্তরদাতাকে বিভ্রান্ত করা যায় তার একটা চেষ্টাও থাকে। আর সর্বোপরি থাকে বিশুদ্ধ আনন্দ। উত্তরটি না দিতে পারলে প্রশ্নকর্তার, আর যথাযথ উত্তর দিতে পারলে উত্তরদাতার। সহজ সরল লোকজীবনে এটাই বা কী কম পাওয়া।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, ড. দুলাল (সম্পা.), বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৮৮
২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.), ধাঁধা : স্বরূপ সন্ধান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৫৬
৩. সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১৬৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.), ধাঁধা : স্বরূপ সন্ধান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮ খ্রি.

....

সহকারী অধ্যাপক, অচ্ছুরাম মেমোরিয়াল কলেজ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ : গ্রাম ও শহর জীবনের সংঘর্ষ

ড. দেবযানী ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্তসার-

কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে জীবনের বাস্তব ভূমিতে পদচারণা করেছেন। এই লেখক জীবনকে দেখেছেন বাস্তব ভূমিতে অভ্যস্ত জীবন যাত্রার শৃঙ্খলে নয়; দুর্দমনীয় জীবন প্রবাহের মধ্যে তিনি জীবনের রহস্য সন্ধান করেছেন। যেখানে মানুষ প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে পুরাণো বিশ্বাস ও আশ্রয়কে ফেলে যায়। চরিত্র গঠনে সমাজ সত্তার চৈতন্যকে তুলে ধরে পরিবর্তিত মূল্যবোধকে যাচাই করে দেখার সূচনা ঘটালেন মানিক তাঁর উপন্যাসে। বিভিন্ন চরিত্র গুলোর মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস থেকে শশীর জীবন গ্রাম ও শহরের পটভূমিতে কিভাবে সংঘাত সৃষ্টি করেছে তাই আমার গবেষণা পত্রে দেখানোর প্রয়াস করেছি।'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে দেহজীবি মানুষ রূপেই দেখেছেন। এই উপন্যাসের শুরু হয়েছে শশির গ্রামে ফেরা, হারু ঘোষের মৃত্যু দিয়ে। হারু ঘোষের শবদেহ নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করার সময় নবীন মাঝি মন্তব্য করে যে আমরা সবাই নিয়তির হাতের পুতুল। এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন প্রতি পদে সংঘাতের শিকার হচ্ছে। শশী শহর থেকে গ্রামে এসে হাঁপিয়ে উঠেছে গ্রামবাসীর জীবন-ধারণ পদ্ধতি দেখে। শিক্ষা দীক্ষার কোন বালাই নেই, মনে হয় কোন অদৃশ্য শক্তির প্রকোপে সকলেই যন্ত্র চালিতের মতো জীবন অতিবাহিত করছে। শশীর মুখ দিয়েও লেখক বলিয়েছেন- ও ভগবান, একটা লাইব্রেরী পর্যন্ত যে এখানে নেই।শহরের অভ্যস্ত জীবন প্রবাহে পরিচালিত শশী গ্রামে এসে জীবনের টানাপোড়েনে আপন সত্তাকে নিয়ে আবহ সচেতন হতে চেষ্টা করে চলেছে।

মূল শব্দ-

আঞ্চলিকতা, গ্রাম ও শহর জীবন, বেঁচে থাকার সংঘর্ষ, শশী চরিত্রের উত্তরন।

মূলপ্রবন্ধ-

কথাসাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে জীবনের বাস্তব ভূমিতে পদচারণা করেছেন। তিনি যে জীবনকে দেখেছেন, তা বাস্তব ভূমিতে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার শৃংখলে নয়, দুর্দমনীয় জীবন প্রবাহের মধ্যে তিনি জীবনের রহস্য সন্ধান করেছেন। যেখানে মানুষ জীবন প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে পুরণো বিশ্বাস ও আশ্রয়কে পেছনে ফেলে যায়। চরিত্র গঠনে সমাজ সত্তার চৈতন্যকে তুলে ধরে পরিবর্তিত মূল্যবোধকে যাচাই করে দেখার সূচনা ঘটালেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি ১৯৩৬ সালের ২১ মে, বাংলা ১৩৪৩ জৈষ্ঠ্য মাসে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে আধুনিক জটিল জীবন জিজ্ঞাসার বহমান ধারায় এক দৃঢ় তরঙ্গবেগ সঞ্চার করেছে। আধুনিকতা ও আধুনিকতার সীমিত লক্ষণ পার হয়ে জীবনের গভীরতার উপলব্ধির আভাস এনে দেয় উপন্যাসটি। আপন অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির যে যন্ত্রণা ও সংকট জীবনের সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে সত্তার যে অনিঃশেষ জিজ্ঞাসা আধুনিক ব্যক্তি মানুষের চেতনার দর্পণে জীবন রহস্যের সেই চিরায়ত অনুভবগুলো এক অভিনব শিল্পরূপ

পেয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ব্যক্তি সত্তার এক অপরূপ মহাকাব্য, জটিল অথচ গভীর চেতনালোকের আলোছায়ায় ব্যক্তি মানুষের পথ চলার একটি আশ্চর্য ইতিকথা।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে দেহজীবি মানুষ রূপেই দেখেছেন। এই উপন্যাসের শুরু হয়েছে শশির গ্রামে ফেরা, হারু ঘোষের মৃত্যু দিয়ে। হারু ঘোষের শবদেহ নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করার সময় নবীন মাঝি মন্তব্য করে যে আমরা সবাই নিয়তির হাতের পুতুল। এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন প্রতি পদে সংঘাতের শিকার হচ্ছে। শশী শহর থেকে গ্রামে এসে হাঁপিয়ে উঠেছে গ্রামবাসীর জীবন-ধারণ পদ্ধতি দেখে। শিক্ষা দীক্ষার কোন বালাই নেই, মনে হয় কোন অদৃশ্য শক্তির প্রকোপে সকলেই যন্ত্র চালিতের মতো জীবন অতিবাহিত করছে। শশীর মুখ দিয়েও লেখক বলিয়েছেন- ও ভগবান, একটা লাইব্রেরী পর্যন্ত যে এখানে নেই।শহরের অভ্যস্ত জীবন প্রবাহে পরিচালিত শশী গ্রামে এসে জীবনের টানাপোড়েনে আপন সত্ত্বাকে নিয়ে আবহ সচেতন হতে চেষ্টা করে চলেছে। লেখকের ভাষায়-

"গ্রাম ছাড়িয়া নূতন জগতে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার কল্পনা শশীর মনে জোরালো হইয়া আসে। সে বুঝিতে পারিয়েছে জোর করিয়া সরিয়া না গেলে সে কোনোদিন এই সংকীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাইবে না। ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া চলিতে থাকিলে জীবন শেষ হইয়া আসিবে, তবু নাগাল মিলিবে না ভবিষ্যতের। তা ছাড়া জীবন বিপুল ও মনোরম সমারোহ সে আনিতে চায় তাহা সম্ভব করিতে হইলে শুধু গ্রাম ছাড়িয়া গেলেই তাহার চলিবে না, আত্মীয়-বন্ধু সকলের সঙ্গে মনের সম্পর্কেও তাহাকে ভুলিতে হইবে।"[১]

শশীর শৈশব কেটেছে গাওদিয়া গ্রামে। পিতা গোপাল সচেতন ভাবেই শশীকে মানুষ করেছেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়তে যাওয়ার সময় শশীর হৃদয় ছিল সংকীর্ণ, চিন্তা-শক্তি ছিল ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল। নিতান্ত গ্রাম্য পরিসরে সংকীর্ণ জীবনালোখে তার ভবিষ্যত বাধা ছিল। কিন্তু কলকাতা শহরে এসেই শশীর অনুভূতির জগতকে পরিবর্তন করে দেয় বই এবং বন্ধু। বিশেষ করে কুমুদ। কুমুদ ছিল বরিশালের ছেলে, লম্বা কালো চেহারা স্বভাবত বেপরোয়া ক্ষ্যাপাটে। কুমুদের সান্নিধ্যে আসার জন্যই শশী উদভ্রান্ত হয়ে গেল, কারণ "জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন রসালো মানুষের জীবন?"[২] গ্রামে অর্থাৎ বাল্যকালের বাস ভূমিতেই শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী করতে আসে। কারণ যে গ্রামের সে সন্তান, গ্রাম্য নর-নারীর মধ্যে গ্রামের মাটি মেখে, জলবায়ু শোষণ করে সে বড় হয়েছে তাকে সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারছে না। শহরের জীবন যতটুকু পারে সে বজায় রেখেছে যা তার মনে ছাপ রেখে গেছে দাগ নয়, বই এবং কুমুদ এই দুয়ের কল্যানে পাওয়া অনেক বৃহত্তর আশা আকাঙ্খাও ক্রমে সে চিন্তা ও কল্পনাতে পর্যবসিত করে ফেলতে লাগল।

ডাক্তার শশী গ্রামে প্রথম পদার্পণ করে কর্তব্য ও কর্মের মধ্য দিয়ে। হারুর মৃত দেহকে যে মূহুর্তে শশী আবিষ্কার করেছে, তা একান্তই কল্পনার অতীত ছিল। শহরে মানুষ হয়ে আসতে না আসতেই শশী দেখতে পেয়েছে, "সন্ধ্যার আবছা আলোয় গাছে ঠেস দিয়া ভূতের মত একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে।"[৩] সে অঞ্চলকে গ্রামের লোক সাপের রাজ্য বলে জানে। সেখানে পাগল ছাড়া মানুষ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। গ্রামের অশিক্ষিত মাঝি গোবর্ধন নৌকা নিয়ে দ্রুত গমন করার প্রয়াস করে। গোবর্ধনের ধারণা এসময় এখানে মানুষ কোথা থেকে আসবে, এ শশীর চোখের ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছু নয়। তাই এ স্থানে ত্যাগ করে মানে মানে বাড়ী ফেরার কথা ভাবছে গোবর্ধন। কিন্তু কলকাতার কলেজে ডাক্তারি পাশ করে আসা শশী গোবর্ধনের কোনো আপত্তিই কানে তোলেনি। কাছে গিয়ে হারুকে দেখামাত্র শশী চিনতে পেরে গেছে এবং বলতে লাগলো, "ওরে গোবর্ধন, এ যে আমাদের হারু। এখানে ও এল কী করে?"[৪] শেষ পর্যন্ত হারুর মৃতদেহকে সঙ্গে করে শশী ও গোবর্ধন নৌকায় করে গ্রামে নিয়ে যায়। গ্রামের কুসংস্কারকে শহর ফেরত শশী

সম্পূর্ণ এড়াতে না পারলেও গোবর্ধনের কথায় সে আপত্তি করেছিল, "দূর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই... ছুঁলাম-বা, কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন?' শশী ভেবে দেখল কথাটি মিথ্যে নয়, কেননা মৃতদেহ পড়ে গেলে সর্বাঙ্গ কাদামাখা হয়ে যাবে, তার চেয়ে গোবর্ধন স্পর্শ করলে শবের এমন কোনো অপমান হবে না কারণ হারুর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। তাই শশী ভাবতে থাকে,-"মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।"[৫] শহরের আবছায়ায় মানুষ হয়েও শশী গ্রামের কুসংস্কার একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি। এই দোলাচল মনোভাব শশীর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীর মধ্যে দুটি চারিত্রিক গঠন সৃষ্টি করেছেন। শশীর মধ্যে একদিকে যেমন কল্পনা, ভাবাবেশ ও রসবোধের অভাব নেই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধন-সম্পত্তির প্রতি মমতাও তার যথেষ্ট। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে না মিশলে একথা কেউ টের পাবে না, তার ভেতরে জীবনের সৌন্দর্য শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার পদ্ধতি আছে। সংসারে টিকে থাকার জন্য যে বুদ্ধি, সংযম ও প্রকৃতির প্রয়োজন শশীর মধ্যে তা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে, তার সকলেই তাকে ভয়ে ও খাতির করে চলে। শশী গোপালের একমাত্র ছেলে, মেয়ে তিনটি। বড়মেয়ের নাম বিন্ধ্যবাসিনী, বড়গাঁর নায়েব শ্যামাচরণ দাসের বড় ছেলে মোহনের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিয়ে হয়েছে। মেজ মেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিয়ে হয়েছে কলকাতার বড়বাজারের নন্দলালের সঙ্গে। ছোট মেয়ের নাম সিন্ধু। বয়স আট বছর। কেউ যদি সিন্ধুকে কখনও বলে, সে বড় হয়ে কী করবে, সে বলে পুতুল খেলবে।

হারুর মৃত্যুর পর শশী মতির চিকিৎসা করে চিকিৎসার অজুহাতে শেষ পর্যন্ত শশী মতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ক্রমে মতিকে উপলক্ষ করে কুসুম শশীকে নিয়ে প্রেমের খেলায় মেতে উঠে। যে কুসুমকে বাড়ীর প্রত্যেকে ভয় করে, সেই আবার শশীর জন্য বেগুনক্ষেতে অপেক্ষা করছে। চাঁদ ওঠার আভাস দেখে কুসুম যেন শুনতে পায় লোকগীতির অসাধারণ এক পংক্তি।

"ভিনদেশি পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইলা কন্যা প্রথম যৌবন।"[৬]

কুসুম, পরানের সঙ্গে ঘর করেছে কিন্তু সাংসারিক জীবনে সে সুখী নয়। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে কুসুম আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করেও শশীকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। স্বামী পরাণ স্ত্রী কুসুমকে মাতৃত্ব সুখ দিতে না পারায় কুসুমের মনে বিরক্তিবোধ ও কুটিলতা পূর্ণ ভাবনা স্থান করে নিয়েছে। কুসুম অপুত্রক বলেই পরানের পুরুষত্বের প্রতি স্ত্রীর সন্দেহের বীজ প্রবেশ করেছে। যার ফলে সে গ্রামের উচ্চশিক্ষিত, সুন্দর কর্মঠ যুবক শশীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পিতার আচার-ব্যবহারে শশীও যেন কুসুমের মতই বিপর্যস্ত ছিল। তাই শশী সিদ্ধান্ত নিল গ্রাম ছেড়ে সে শহরে চলে যাবে। কুসুমকে সে সরাসরি বলে দিয়েছে-

"অনেক দিন থেকে তোমায় ক-টা কথা বলব ভাবছিলাম বউ। বলি বলি করে বলতে পারি নি? বলা কিন্তু দরকার নয়? আমরা ছেলে মানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝে সুঝে কাজ করা দরকার। এক তো দ্যাখো পরান আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল ওর শুধু অপকারই করেছি। তবু, তাও আমি গ্রাহ্য করতাম না বউ। এই বৃষ্টিতে তুমি এলে, তোমার কাছে সরে বসতে না পেরে আমার যা কষ্ট হচ্ছে, কারও মুখ চেয়ে আমি তা সইতাম না। কিন্তু আমি গাঁয়েই থাকব না বউ। আজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে, আর কখনও ফিরব না।"[৭]

একমাত্র কুসুমের উপস্থিতি শশীকে আগলে রেখেছে, গ্রামের অন্ধ সংস্কারচ্ছন্ন মানুষ থেকে। যামিনী কবিরাজের ঘৃণাবোধ, সেনদিদির স্নেহ, ভুতোর মা লক্ষীমণির মনোভাব শশীকে সংঘাতের সম্মুখীন করে। ভুতোকে শহরে

চিকিসা করানোর ব্যবস্থা শশী করতে পারেনি ভুতোর মায়ের ব্যবহারে। শশী লক্ষীমণিকে উপেক্ষা করে ভুতোকে শহরে নিয়ে গেলে হয়তো আজ এই ছেলে মায়ের বুকে ফিরে আসতে পারতো। অবশেষে উপযুক্ত চিকিৎসা না হওয়ার জন্য ভুতো মারা গেল। কিন্তু গ্রামের প্রবীন পঞ্চানন চক্রবর্তী শশীকে বোঝাতে লাগলেন-"ভুতো যেদিন পড়ল আছাড় খেয়ে, দিনটা ছিল বিষ্যুদবার। খবর পেয়ে মনে কেমন খটকা বাধল। বাড়ি গিয়ে দেখলাম পাঁজি, যা ভেবেছিলাম। ছেলেটাও পড়েছে, বারবেলাও হয়েছে খতম। লোকে বলে বারবেলা, বারবেলা কি সবটাই সর্বনেশে বাপু?"[৮] এভাবেই ভুতোর মৃত্যুর সঙ্গে অন্ধ সংস্কারচ্ছন্ন পঞ্চানন চক্রবর্তী আরও একটি কাহিনি বর্ণনা করলেন, যেখানে বারবেলাকে অবলম্বন করেই নবীন জেলের বড় ছেলের মৃত্যু হয়।

যাদব পণ্ডিত শশীকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ভিত্তিকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। তার উত্তরে শশী জানায় যে ডাক্তারি শাস্ত্র একার নয়। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক সারা জীবন পরীক্ষা করে ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু যাদবের বক্তব্য "আদি জ্ঞান যার নেই পরবর্তী জ্ঞান সে পাবে কোথায় শশী?"[৯] কিন্তু গ্রাম্য মনের অপরিত্যজ্য সংস্কারে শশী যাদবকে ভক্তি করে বলেই তর্ক করেনি, শহরের চিন্তা ভাবনায় লালিত শশী গ্রামের লোকের এই বার্তাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চায় না বলেই হয়তো সে তর্ক করতে অসমর্থ।

ডাক্তার হয়ে গাওদিয়া গ্রামে এসে শশীকে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখী হতে হয়েছে। সূর্য বিজ্ঞানী যাদব পণ্ডিত, সেনদিদির স্বামী যামিনী কবিরাজ আরও অনেক 'ব্যক্তি শশীর আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেননি। শশী সেনদিদির স্নেহ মধুর সম্পর্ক বৃদ্ধ যামিনীকে ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলেছিল। শশীকে দেখলেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। বিশেষভাবে বসন্ত রোগে আক্রান্ত সেনদিদির চিকিৎসার দায়িত্ব যখন শশী নিয়ে নেয়। সেনদিদির স্বামীর দেওয়া ঔষধ খায় না কারণ স্বামীর ঔষধ জীবনদায়ী না হয়ে মৃত্যুবাণ আশঙ্কার বীজ রয়েছে তার মনে। সংসারে লাঞ্ছিত এই সেনদিদির মনে বেঁচে থাকার যে তাগিদ এবং শশীকে পেটের ছেলে ভেবে নেওয়ার মনোভাবেই শশীর কর্মতৎপরতাকে বাড়িয়ে তোলে। প্রৌঢ় গোপালের সঙ্গে সেনদিদির মেলামেশা শশীকে আহত করে। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান সেনদিদির গর্ভধারণের খবর শুনে পিতার প্রতি শশীর অনেক ঘৃণা হয়। সেনদিদি অনেকবার শশীর সঙ্গে শহরে যেতে চেয়েছে কিন্তু শশী নিয়ে যায়নি। কারণ শশী চায়না যে সেনদিদি অন্য কারো পরিবার নষ্ট করুক। সুন্দরী সেনদিদির রোগ ধরতে পেরে শশীর অনুভব হয়েছে- "গাওদিয়া গ্রামে কলিকাতা শহরে, দেশ বিদেশে কোথাও শশী যার (তার) মতো রূপসী দেখে নাই, শুধু রূপের জন্যই হয়তো যে মিথ্যা কলংক কিনিয়াছে, এ কী রোগ ধরিয়াছে তাহাকে?"[১০] পরমা সুন্দরী স্ত্রীর দাস হয়েই বুড়া বয়সে যামিনী দিন কাটিয়ে দিতে পারতো। কেনই বা যামিনী ঠাকুরদা সেনদিদিকে নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করেন, তার প্রবোধ অনুভব করে শশী হয়তো ভাবে সীতা, হেলেন, ক্লিউপেট্রার মতো যার অসাধারণ রূপ থাকে তাকে ঘিরে অনেক খাপছাড়া কাণ্ডই ঘটতে থাকে জগতে।

গাওদিয়া গ্রামের মেয়ে মতি অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখতো ছোটবাবু শশীকে কেন্দ্র করে। তার ইচ্ছা শহরের বউ হবে। কেননা তার ধারণা কাজকর্ম বিহীন বকুনি, কলহ, নোরাংমি নেই শহরে। শহরের স্বামীরা বউকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে রেখে শুধু আদর করে হঠাৎ শশীর বন্ধু কুমুদকে দেখে মতি সহজেই মুগ্ধ হলো। যে মতির কাছে স্বপ্নের মানুষ শশী দুর্বোধ্য সেই মতির কাছেই শশীর বন্ধু কুমুদ কত সহজভাবে ধরা দিল। অদৃষ্টই যেন ঢোঁড়া সাপে কাটার ঘটনার সূত্র ধরে গাওদিয়ার প্রাকৃতির পটে কুমুদ মতির চার চক্ষুর সাক্ষাৎ ঘটলো। অবশেষে শহরবাসী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান কুমুদের স্ত্রী হয়ে মতি কলকাতা শহরে চলে গেল। কিন্তু স্বামী কুমুদের আচরণ মতির সম্পূর্ণ কল্পনাকে জলে মিশিয়ে দিল। শহরের নির্দিষ্ট ঘর ছেড়ে সে এক মিনিটের জন্য বের হতে পারেনা। বন্ধুদের সঙ্গে রাত এগারটা পর্যন্ত কুমুদ আড্ডা দেয়। কুমুদের বন্ধুরা মতিকে চা, পান যোগানোর প্রয়োজন মনে করিয়ে দেয়। পাশে বসে সে একটু কাঁদতেও

পারে না রাগে দুঃখে গাওদিয়া গ্রামে পাখি হয়ে উড়ে যেতে সাধ হয় মতির। যখন মতি কুমুদকে বলে গ্রামে চিঠি লিখবে তখন কুমুদ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, "আমায় বলনি গাওদিয়ার কথা ভুলে যাবে, কোনো সম্পর্ক থাকবে না গাওদিয়ার সঙ্গে। ভালো করে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিইনি বিয়ের আগে, আমার সঙ্গে আসতে হলে জন্মের মতো আসতে হবে? চিঠি লেখালেখি চলবে না, তা-ও বলেছিলাম মতি।”[১১]

এদিকে গ্রামের পরিবেশে শত চেষ্টা করেও শশী নিজেকে খাপ খাওয়াতে অপারগ হয়ে সে শহরে চলে যাওয়ার সংকল্প করে। শশী গাওদিয়াকে মনে করেছে পরবাস। বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তির জন্য সে গাওদিয়া থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় যায় বই কিনতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামে বসে ডাক্তারি শাস্ত্রের নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা পড়ে। প্রচুর জ্ঞান লাভের জন্য সে বিলেত যাবে, নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি শিখে এসে জীবনে উন্নতি করবে এমন উচ্চাশায় সে আত্মমগ্ন হয়েছে। শশী যাদব পণ্ডিতের কাছে তার জ্ঞান ও সুখ ঐশ্চর্য সম্পর্কে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বলেছিল, "চলে আমি যাব ঠিক... শুধু শহরে গিয়ে ডাক্তারি করার ইচ্ছা থাকলে কোনো কথা ছিল না, এত বড়ো বড়ো কথা আমি ভাবি। বিদেশ যাব, ফিরে এসে কলকাতায় বসব, মানুষের শরীর আর মনের রোগ সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণা করব, দেশ বিদেশে নাম হবে, টাকা হবে।"[১২] এটাই হলো শশীর স্বপ্ন ও বাস্তব।

শশী দ্বিধা দোলাচলতায় অস্থির। নিভৃত মনে সে এত দ্বিধান্বিত স্বভাবের, সেই জন্য কোনদিনই সে তার স্বপ্নকে সত্যি করতে পারেনি, একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। এটাই তার নিয়তি। শশীর চরিত্রে সাধারণত দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একদিকে শশীর মধ্যে কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নেই, অন্যদিকে সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধন-সম্পত্তির প্রতি মমতাও তার যথেষ্ট। কুমুদ তাকে জীবনের সূক্ষ কল্পনার সন্ধান দিলেও সে যে মহাজন গোপালের আত্মজ সেটা বার বার স্পষ্ট হয়েছে তার আচরণে। আসলে শশী কুসুমকে যেমন বুঝতে পারেনি, তেমনি সে নিজেকেও বুঝে উঠতে পারে নি। ফলে কুসুমের ভালোবাসা নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। কুসুম গাওদিয়া ছাড়ার সংকল্পের কথা জানিয়েছে শশীকে। এই প্রথম শশী বুঝতে পারল কুসুম বিহীন গাওদিয়া তার কাছে মরুভূমির মতোই শূন্য। সে অসহায়ভাবে কুসুমের কাছে প্রেম ভিক্ষা করে, "নিজের মন কি মানুষ সব সময় বুঝতে পারে বউ? অনেকদিন অবহেলা করে কষ্ট দিয়েছি বলে আজ রাগ করে তার শোধ নিতে চলেছ, এমন তো হতে পারে আমি না বুঝে তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তোমার পরে কতটা মায়া পড়েছে জানতে পারিনি? তুমি চলে যাবে শুনে এতদিনে আমার খেয়াল হয়েছে? তা ছাড়া তোমার কথাই ধরি, তুমি বললে মানুষ বদলায়-বেশ, আমি অ্যাদ্দিন তোমার সঙ্গে খেলাই করেছি, আজ তো আমি বদলে যেতে পারি বউ?"[১৩] অজস্র আকুলতা সত্ত্বেও শশী কুসুমকে ফিরে পায়নি। কুসুম চিরকালের মতো গাওদিয়া ছেড়ে চলে গেছে। রেখে গেছে শশীর জন্য তিক্ষ্ণ বাক্যবাণ, "মানুষ কী লোহায় গড়া যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না?”[১৪]

এরপর শশীর কাছে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। গাওদিয়ার সংকীর্ণবৃত্ত থেকে প্রতিমূহুর্তে মুক্তি কামনা করতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গাওদিয়ায় আবদ্ধ হয়ে গেল। পিতা গোপালের নিজ হাতে তৈরী বিষয়ের জগতে শশী চিরতরে আবদ্ধ হয়ে গেল। পিতার কীর্তিকাণ্ড কিছুই শান্ত শশীর চেতনায় পৌঁছায় না, তাই জীবন সম্বন্ধে তীব্র সচেতন শশী শেষ পর্যন্ত গ্রাম জীবনের মধ্যেই নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। যে শশী সংকীর্ণ গ্রাম্যজীবনে পড়ে রইল সে শশী কিন্তু আগের মতো স্বপ্ন দেখে না শশীর শুধু গ্রাম ছাড়ার কল্পনা নয়। অনেক কল্পনাই শশীর জীবনে নিস্তেজ হয়ে এসেছে। শশী কখনোই কুমুদ হতে পারেনি। কুমুদের মতো বাঁধনছাড়া জীবন শশীর নয়। তাই অশান্ত আশাহীন জীবনে শশী নিঃস্ব হয়ে গেছে। শশীর মনে হয়-যা চেয়েছিল কিছুই সে পায়নি। সাধারণ চরিত্র হয়েও হতে চেয়েছিল অসাধারণ। তাই গাওয়াদির পরিবেশ-প্রকৃতি মানুষের চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দুকে সে উঁচু টিলা থেকে দেখতে গিয়ে একা হয়ে যায়।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশী। তাই শশীকে ঘিরেই প্রত্যেকটি চরিত্র উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। শহর মুখী মানুষের প্রবজন থেকে আরম্ভ করে তৎকালীন বিপরীত ঘটনা হিসেবে খাদ্য শস্যের উৎপাদন কমে আসার জন্যই গ্রামবাসীরা শহরের অভিমুখে যাত্রা করার প্রয়াস করে। কিন্তু শহর থেকে গ্রামে আসার পর শশী গ্রামের মানুষের মানসিক চিন্তাধারার মধ্যে আপন সত্ত্বাকে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সে শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ' মনোভাব পোষণ করে গ্রামেই থেকে গেল। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে গ্রাম ও শহরের দ্বৈততা প্রকাশ পেয়েছে, নিতান্তই সাহিত্যের বাস্তব ভিত্তিকে স্পর্শ করে। দোলাচল মনোভাবনায় শশী গ্রামে প্রত্যেকের প্রদান হয়ে উঠেছে শহরের মাটিতেই। অবশেষে বলতে হয়, কুমুদের আচার আচরণই শশীকে পরবর্তী জীবনে সফল মনোবল ভুগিয়েছে। শহর পরিত্যাগ করে শশী তাই গ্রামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

তথ্যসূত্র:-

১/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পুতুল নাচের ইতিকথা', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২১ মে ১৯৩৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, ষড়ত্বাবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ. ১১১।

২/ তদেব, পৃ.১৬।

৩/ তদেব, পৃ. ৬।

৪/ তদেব, পৃ.৭।

৫/ তদেব, পৃ. ৯।

৬/ তদেব, পৃ. ৬।

৭/ তদেব, পৃ. ১২৫।

৮/ তদেব, পৃ. ১৩।

৯/ তদেব, পৃ. ২৫।

১০/ তদেব, পৃ. ৩২।

১১/ তদেব, পৃ. ১৪৯।

১২/ তদেব, পৃ. ১২৫।

১৩/ তদেব, পৃ. ১৪৯।

১৪/ তদেব, পৃ.১৪৯।

আকর গ্রন্থ:

১/ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পুতুল নাচের ইতিকথা', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২১ মে ১৯৩৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, ষড়ত্বোবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২।

সহায়ক গ্রন্থ:

১/ গোপিনাথ রায়চৌধুরী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুস্তকমেলা , জানুয়ারি -১৯৯৮।

২/ ড. দেবেশ কুমার আচার্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), চতুর্থ মুদ্রণ-এপ্রিল ২০১৪, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা।

৩/ ড. স্বস্তি মণ্ডল: শশীর স্বপ্ন শশীর বাস্তব: পুতুল নাচের ইতিকথা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া, ২২শে আশ্বিন ১৪০৬, কলকাতা।

৪/ ড. সমরেশ মজুমদার: বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর (১৯২৩১-১৯৪৪), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২১নভেম্বর, ১৯৮৬, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, বইমেলা।

৫/ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্য জীবন, তারাশঙ্কর রচনাবলী (২য় খন্ড), কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯।

৬/ সুবোধ দেবসেন: বাংলার কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯।

....

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর , সংস্কৃত বিভাগ , এম.বি.বি.কলেজ , আগরতলা, ত্রিপুরা

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজভাবনা

ড. সুজিত কুমার সাহু

সংক্ষিপ্তসার-

লেখক সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি অতীতের সঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে জোড়াতালির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু গল্পকার বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন এ কারণে, বর্তমান প্রজন্ম অতীতের অমলিন চেহারাকে ধরে থাকতে চাইছে না। বর্তমান সমাজে প্রেম, মাতৃত্ব, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ সব কিছুতে বিকৃত চিন্তাচেতনা উপস্থিত হয়েছে। বিবেকবোধ, নৈতিক মূল্যবোধের অবনমন ঘটেছে। তাই দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, নিঃসঙ্গতা প্রতিটি জীবনকে অশান্ত ও অস্থির করে তুলেছে।

সূচক শব্দ-

বিপ্লবী, সহযোগিতা, রাজনীতি, সোশ্যালিজম, ক্যাপিটালিজম, কালোবাজারি, আত্মচেতনা, পাবলিসিটি, ম্যানুপুলেশান, মাতৃত্ব।

মূল প্রবন্ধ-

সঞ্জীব চন্দ্রচট্টোপাধ্যায় একজন গল্পকার যিনি সমাজের ছোট-বড় বাস্তব ঘটনাগুলিকে তাঁর গল্পগুলিতে সরাসরি তুলে ধরেছেন। একালের যুবকদের মতো স্পষ্ট কথা বলতে তিনি ভালোবাসেন। মানুষ যে মানুষের দ্বারাই উৎপীড়িত, অবহেলিত ‘বুদবুদ’ গল্পে তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। অর্থই সমাজের মানুষ মাপার মাপকাঠি। সমাজে অর্থশালী ব্যক্তি মান-সম্মান-ইজ্জত-যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি অনায়াসে লাভ করতে পারে। সমাজে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে এক যুবকের বক্তব্য হল—

> “আর মানুষ মারার উৎসব তো লেগেই আছে। কারুর একটু বেচাল দেখলেই ডজন খানেক টপকে দিন। সব সময় একটা-দুটো মাল পকেটে মজুত। আমাদের কাছে জীব-জন্তুর দাম আছে, মানুষকে আমরা পশু বলেও মনে করি না। মানুষ হলো ভূসিমাল, তরফের বিচিলি গোছা গোছা আঁটি বাধা গরুর খাদ্য।”[১]

সমাজে আবেগপ্রবণ অনুভূতিগুলির মূল্যমান নীচে নেমে এসেছে। বিপ্লবীদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ স্বার্থানুরাগে পরিণত হয়েছে, বিপ্লবী শব্দের সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েছে। এক অর্থে মানুষ ক্রমশ পৈশাচিক হয়ে উঠেছে। লাতিন-আমেরিকা-ভিয়েতনাম-আফ্রিকা-ভারতবর্ষ প্রত্যেক দেশের সামাজিক চিত্র পাশাপাশি ভাবে একই খাতে বয়ে চলেছে, পলিটিক্সের সফল কূটনীতিবিদসমাজে ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত। লোকার ব্যবসাদার এবং চোর—এরাই সমাজে বড়লোক। মানুষ তার চিত্ত বিনোদনের জন্য সাহিত্য চর্চা করে থাকে। যাত্রা, সৌখিন থিয়েটার, বারোয়ারী, কালচারাল ফাংশানের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মানুষেরা আনন্দ ফুর্তি করে থাকে। লেডিস্টেনো টাইপিস্ট এবং টেলিফোন অপারেটরদের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। সমাজে ভাতৃত্ববোধ, জাতীয়তাবোধের আসল অর্থটিই হারিয়ে গেছে। গল্পকার আক্ষেপ করে বলেছেন—

> "স্বগতোক্তি কানে এলো, 'সহযোগিতা! পাশাপাশি বসে সহযোগিতা হচ্ছে না, সহযোগিতা হবে সারা দেশ জুড়ে। পাশাপাশি বসে ঘেন্নায় মরে যাচ্ছে মুখে বলছে, সবার ওপরে মানুষ সত্য, সমালোচনা করছে সাদা চামড়ার দল কালোদের কেন ঘেন্না করে।"[২]

শহুরে জীবন ছোট্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে আবদ্ধ। বিছানার চাদর, টেবিলক্লথ, সোফা সেট, পালিশ করা ফার্নিচার, বিদেশী কায়দায় সাজানো ফুল, জল ও তেলের রঙে আঁকা দু-একটি পিকচার দিয়ে ছিমছাম করে সাজানো। চিত্র, শিল্প নিয়ে শহুরেরা নিজেদের জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট, সুখী করে তুলতে চায়। কিন্তু শহর এখন জঙ্গলের চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। মানুষের স্বভাবে বিলাসিতা, হিংসা ও স্বার্থপরতা বেড়ে গেছে। মিছিল, অসংখ্য যানবাহনে পরিপূর্ণ শহরের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে 'আলো অন্ধকার' গল্পের কাবেরী অন্য এক জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছে।

> "আমি তখন বলতে চাই—'দিস ইস লাইফ মাই ডিয়ার লেডী'। তখন এই অফিস অথবা জীবন সংগ্রাম কিংবা শহর জীবনের কাটাকাটি হানাহানি অথবা রাজনীতি ইত্যাদি অনেক দূরে থাকে। যেন সমুদ্রের গর্জন। কানে আসছে কিন্তু যেহেতু জলে নামিনি সেই হেতু যেন একটা অন্য স্বাদ। সব মিলিয়ে জীবন।"[৩]

মানুষ নিরাপদ ভাবে জীবন যাপন করতে চায়। সমস্যা ও কোলাহল সহ্য করতে করতে মানুষ নিঃস্পৃহ হয়ে পড়েছে। চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতেও বেশিরভাগ মানুষ উদাসীন হয়ে দিন কাটায়। লেখক সমাজের বিভ্রান্তকর পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন—

> "চৌরঙ্গীর মোড়ে তখন জমজমাট অবস্থা। চারদিক থেকে পতাকাধারী মানুষের মিছিল একের পর এক আসছে। কোনো যানবাহনই চলার রাস্তা পাচ্ছে না। এই শতকের মানুষ প্রায়শই সমস্যাগুলোকে দার্শনিকের চোখে দেখে থাকেন। কোনো কিছুই আর তেমন করে মনে দাগ কাটে না। মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে না।"[৪]

সোশ্যালিজম, ক্যাপিটালিজম সমাজে আসল ও নকল বস্তু পাশাপাশি অবস্থান করছে। সাদা বাজার ও কালো বাজার দুটো পথেই মানুষ কারবার করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য গড়ে উঠেছে কমিটি। তবুও সমাজের মানুষকে সজাগ থাকতে হবে। এর কারণ সম্পর্কে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "আমরা চোরকে চুরি করতে দেবো, গৃহস্থকে সজাগ হতে দেবো, দুর্নীতি রোধের জন্যে কমিটি করতে দেবো, সাধুকে সৎ হতে দেবো, অসতীকে সতীসাধ্বী করার চেষ্টা করবো না, ভেজাল জিনিসের দোকানি, আসল জিনিসের দোকান দুটোই খোলা রাখবো, গুণ্ডা দমন করবো না, সাধারণ মানুষকে পাহারা দেবো, কারুর জীবিকা কেড়ে নেবো না। আমাদের সব নীতিই পজেটিভ, ইতিবাচক।"[৫]

সমাজের কর্মসূচী নিয়ে গল্পকার সমাজ কর্তাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। গৃহস্থ, ফুটপাথের মানুষ, পণ্ডিত, মূর্খ, মাস মাইনের কর্মচারী, বয়, বেয়ারা, চাষি, শ্রমিক ইত্যাদি বিচিত্র মানুষের মধ্যে আলাদা আলাদা সামাজিক মূল্য রয়েছে। যদিও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের ভোটদানে সমান অধিকার রয়েছে। তবে সমাজে ক্ষমতা দখলের পরেই মানুষকে বঞ্চিত করে সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে সমাজপতিরা। মজুতদারেরা কালোবাজারি গড়ে তোলে। সমাজে

সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মূল্যবৃদ্ধির মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাছাড়া ধনীরা ব্যাঙ্কলকার, কম ট্যাক্সের এবং ডিক্লেয়ারড ইনকামের সুযোগ নেই। সমাজের সুবিধাভোগী মানুষেরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, ট্যাক্স, বেহিসেবী খরচের সঙ্গে বিলাসময় জীবনযাপন করে থাকে। মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবীদের উপর শোষণ চালিয়ে ধনীরা আরো সুযোগ ও শ্রমহীন উপার্জনের সন্ধান খোঁজে। আত্মচেতনার দিকটি সমাজে আসলে একটা অভিনয়ের মতো প্রকাশ হয়ে চলেছে। লেখক তাই মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন—

> "নিজেকে ঠিক মতো চেনো কি? কখনও অ্যাসেস করে দেখছো? দেখার চেষ্টা করেছ কোনোও দিন? পার্সেন্টেজ অফ স্বার্থপরতা কতো, উদাসীনতার পার্সেন্টেজ কতো, লোভ কতো, লালসা কতো, ভণ্ডামি কতো। সময় পেলে একবার খতিয়ে দেখো।"[৬]

মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা কমেছে, বেড়েছে রাগ ও অভিমান। ক্ষমতার লড়াইয়ে সমাজের কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। জনপ্রতিনিধির উপরই শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। বর্তমান সমাজের দাবীগুলিকে গল্পকার সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বুদবুদ' গল্পে তুলে ধরেছেন।

> "একই সঙ্গে, কে হবে বারবনিতার বাবু, বনিতার কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, কৃষকের কৃষি, শিল্পের শিল্পী, মালিকের বন্ধু, শ্রমিকের দাবি, দাসের দাস, ফাঁকি, শাসনর জুলুম, অপব্যয়ীর অপব্যয়, মিতব্যয়ীর মিতব্যয়। কে হবে বিদেশের স্বার্থ—স্বদেশের স্বদেশ চেতনা।"[৭]

সমাজে শিক্ষকেরা একপ্রকার শিল্পী। তাঁরা মূলত: শিশুর মতো। স্বভাববশতই আদর্শ মানুষ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। দেনপাওয়ার সমাজে শিক্ষকেরা সবচেয়ে বেশি উদাসীন। ডিরেক্টর, প্রডিউসার এরা সমাজে ভুরি ভুরি সম্মান পায়। পাবলিসিটি ও ম্যানিপুলেশানের যুগে শিক্ষকদের মর্যাদা অনেকটা পিছিয়ে। একদল জোচ্চোর, লম্পট, সুবিধেবাদী, ধান্দাবাজদের হাতে সমাজে শিক্ষকদের মান হারিয়ে গেছে। পাপ, মদ, নারী ও অহংকারে লালসা সমাজের ন্যায়-নীতিকে পঙ্কিলতায় ডুবিয়ে দিয়েছে। অতীত ও মর্তমানের সমাজের চেহারার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা দিয়েছে। সমাজের নির্জন পথে এখন কেবল দু-একজন হিতকারী রয়েছে। বাস্তবিক সময় সামনের দিকে না পিছনের দিকে বয়ে চলেছে সমাজের চেহারা দেখে তা বোঝা বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে।

শিক্ষকেরা সমাজে গুণী, শিল্পী নির্মিত করে থাকেন। 'বত্রিশ নম্বর বিছানা' গল্পে মাস্টার মশাইয়ের করুণ অবস্থার ছবি তুলে ধরেছেন। যাঁরা সাধনার, নিষ্ঠার ও ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন তারাই সমাজের কাছে থেকে সবচেয়ে বেশি অবহেলা পেয়ে থাকেন। অসহায়ভাবে, নীরবে শিক্ষকের পার্থিব জগৎ থেকে চলে যাওয়ার সময় তার হাতে গড়া অজস্র মানুষের থেকে পাশে দাঁড়াবার কেউই থাকে না। গল্পকার আক্ষেপ করে বলেছেন—

> "নীরবে, নিঃশব্দে ভরা নদীর কূল থেকে নৌকো খুলে যাবার মতো প্রদোষের ম্লান আলোয় শঙ্করনারায়ণ চলে গেলেন। বড়ো অভিমানী ছিলেন। কাউকে জানতেও দিলেন না। বিদায় জানাতেও কেউ এলো না। জীবন পারাবারের তীরে কেউ এসে দাঁড়ালো না। বললো না, 'আবার এসো।"[৮]

যুগোপযোগী রুচির পরিবর্তন মানুষের মধ্যে দেখা গেছে। বাড়ি-ঘর-রাস্তাতে আধুনিকতা ছোঁয়া লেগেছে। গৃহস্থদের বাড়ি ভেন্টিলেটারে কাঁচ ও জানালা-দরজায় পর্দা ঝুলছে। নারীদের মধ্যে মাতৃত্ব শব্দটি একাধিক সন্তান

জন্মদানের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বাইরের দূরত্ব কমেছে। সমাজে নারীদের মাতৃত্ব সম্পর্কে ‘আজ আছি কাল নেই’ গল্পে লেখক একাল ও সেকালের ধারণার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন—

> “আমরা আজকালের বিবি ছিলুম না তোমাদের মতো সারা জীবন পেটে একটা কিছু না থাকলে আমাদের কালে শরীরটা খালি খালি মনে হতো। কত্তা গর্ব করে বলতেন, সুখদা আমার হঁদুর কল, একটু, ঠুকরেছে কি অমনি ঝপাং। হাত ঠেকালেই সোনা। তোমরা হলে ফাঁকিবাজ। একটা কি দুটো অমনি ছুটলো কাটিয়ে কুটিয়ে ফাঁকা হয়ে ফিরে এলে।”[৯]

টিভির বাক্স পুরুষদের আড্ডা খানা থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছে। পারিবারিক কলহ থেকে মেয়েরাও টিভির মুভি, সিরিয়ালে আটকে ফেলেছে। তাছাড়া ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করার রুচি বদলে গেছে। প্রত্যেক মায়েরা ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। একালের মানুষজন বিপ্লবে বা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সুখের অন্বেষণ করে না। যৌবনবতী নারীর উষ্ণ স্পর্শে এবং সুস্বাদু ভোজন সামগ্রী দিয়ে ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করতে চায়। মানসিক স্থৈর্য বলে কিছু নেই। নারীরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব অধিকার দখল করতে পেরেছে। সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পে মেয়েরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে পেরেছে। সমাজে প্রেমের ক্ষেত্রে স্বকীয়ার তুলনায় পরকীয়ার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। খাঁটি প্রেমের তুলনায় মেকি প্রেম সমাজে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। লেখক প্রেম করা উপায় হিসেবে আত্মসমর্পণ ও সারেন্ডার শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। ‘গীতগোবিন্দ’ বা ‘বিল্বমঙ্গলে’র অনুভব থেকে প্রেম আজকাল আসে না। ‘তোয়ার’ গল্পে প্রেম সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য হল—

> “সিকির সিকি প্রেমই হলো আমার প্রেসক্রিপশাসন। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে বউয়ের মুখে একটু মিষ্টি গুঁজে দেবেন। ভালো শাড়ি পরিয়ে পার্কে পাশাপাশি বসে কোলের ওপর হাত নিয়ে খেলা করবেন। আঙুলের আংটি ঘোরাবেন। চীনেবাদাম, ঝালমুড়ি কিনে দেবেন। ফুচকা খাওয়াবেন। আড়ালে ঝোপঝাপ দেখে পাশাপাশি বসে মাথাটা কাঁধে হেলিয়ে দেবেন। ইডেনে গেলেই এ দৃশ্য দেখতে পাবেন। প্রথম প্রথম কপি করবেন। কপি করতে করতেই অরিজিন্যালিটি এসে যাবে।”[১০]

লেখক সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রেম সম্পর্কে বর্তমানের সামাজিক অভিজ্ঞতাকে তাঁর গল্পে প্রকাশ করেছেন। প্রেম নির্মল অনুভব সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে। প্রেমকে ইন্দ্রিয় ভোগের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করছে। দাম্পত্য জীবনের ডিসিপ্লিন অনেক পরিবারের মধ্যে নেই। তাই সমাজে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। ‘সুখ’ শব্দটির মধ্যেও সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ কেবল নিজের জন্যই সুখ খোঁজে। নিজেকে সুখে রাখার সাধ মেটাতে মেটাতে মানুষের জীবনের তিরিশটা বছর কেটে যায়। অন্যের কথা ভাবার ইচ্ছা জেগে ওঠে না। অনেক পুরুষ নিজের সুখের জন্য মা-বাবা-ভাই সবাইকে ত্যাগ করে গৃহকোণ বেছে নেয়। যেমন, ‘সুখের দিন’ গল্পের শুভ্রাংশু নিজেকে পরিবার থেকে সরিয়ে নিয়েছে। লেখক শুভ্রাংশুর বিবেককে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

> “শুভ্রাংশু কেন লীনাকে ওই পরিবেশে ছেড়ে আসতে পারলো না? কেন পারলো না শুভ্রাংশু? নিজের প্রয়োজনে। লীনা তোমার স্ত্রী না হয়ে যদি মা হতো কিংবা বোন, তুমি পারতে। লীনা তোমার সুখের একটি উপাদান। তাই না? কিন্তু তোমার বৃদ্ধ বাবা, বৃদ্ধা মা, বেকার ভাই তোমার কাছে বোঝার মতো। তোমার সান্ত্বনা, তুমি মাসে মাসে কিছু

টাকা পাঠাও, বছরে কয়েকটা জামাকাপড়। আর মাঝে মাঝে তোমার মনটা যখন হু হু করে করে ওঠে, নিজেকে যখন একটা চিট বলে মনে হয়, তখন তুমি উদাস হয়ে যাও।”[১১]

সামাজিক শিক্ষা মানুষকে নীতিবান করে তুলতে পারে নি। শুধু সংসার বদ্ধ হয়ে না থেকে শুভ্রাংশুর মতো ছেলেরা স্ত্রী যা দিতে পারে না, তা অন্য নারীর কাছে পুষিয়ে নেয়। বিবাহ বিচ্ছেদ ভাবনা একালের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে খুব সহজে এসে পড়েছে। পিতা-মাতার প্রতি দায়বদ্ধতাকেও আজকালকার সন্তানেরা নিশ্চিন্ত মনে এড়িয়ে চলে। বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক অবনতির চিত্রকে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘সুখের দিন’ গল্পে তুলে ধরেছেন—

“জীবনা তার নিজের, সেই তার রূপকার হয়েছে, ক্ষতি কি তাতে? কোনো পিতারই উচিত নয় সন্তানের কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তির আশা করা। সংসারটা তো দোকান নয়। পিতা শুভ্রাংশু ও তার সন্তানের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করবে না। শিক্ষা দেবে, বড়ো করবে, তারপর উড়ে যেতে দেবে পাখির মতো। সংসার হলো পাখির সংসার। শুভ্রাংশু তার উদাহরণ। নিজের সঙ্গে যতই তর্ক করুক তবু শুভ্রাংশুর মনে হলো সে স্বার্থপর।”[১২]

চরিত্রের সঙ্গে মানুষের জীবন একভাবে মিলেমিশে চলে না, জীবনের বেশির ভাগ স্বপ্নই অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ সমাজের ভিতর অধিকাংশ সংসার জ্বলতে থাকে এবং তার মধ্যে চরিত্রগুলি জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। জয়-পরাজয়ের ইতিহাসই হল চরিত্রের জীবনকথা। সমাজ, সংসার, বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে সরতে সরতে মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। চাকরী, প্রেম মানুষের মনের অভাব, অশান্তি, হতাশা, বিচ্ছেদের মতো নেতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলিকে দূর করতে পারে না। সমাজের ভয়াবহ চেহারা দেখে গল্পকার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন—

“দুনিয়াটা কি অদ্ভুত অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কেউ কারুর কর্তব্য করবে না। ছাত্র ছাত্রের কর্তব্য করবে না, স্ত্রী স্ত্রীর কর্তব্য করবে না, সামাজিক মানুষ তার সম্পর্কে উদাসীন। ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। ভাঙনের জয়গান গাই।”[১৩]

‘তনয়’ গল্পে গল্পকার সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের আত্মচিত্ত একালের পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় না। অঙ্ক, ইংরেজি, স্কুল, গৃহশিক্ষক নিয়ে সমাজের মানুষ দু-একটি সন্তানকে নৈতিক করে গড়ে তুলতে পারছেন না। শাসনের বদলে মিনতি ও আদরের আদিখ্যেতা পেয়ে ছেলেরা বিগড়ে যাচ্ছে। সন্তানদের মানুষ করার পেছনে মা-বাবা সমাজের চালচলনকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করে থাকে।

“ছেলে মানুষ? সে তো অটোমেটিক মানুষ হয়ে উঠবে। তার জন্যে অতো ভাবার কি আছে? একটা ভালো স্কুল, একজন ভালো শিক্ষক, ভালো খাওয়া। চড়চড় করে বেড়ে ওঠে, হাসতে হাসতে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার, প্রফেসার। ভাগ্যে থাকলে সবই ভালো, না থাকলে সবই গেল।”[১৪]

লেখক সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সমাজের চেহারার মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাননি। আহার, বিহার, প্রেম, জীবিকা সব কিছুর মধ্যে একালের মানুষের রুচির বদল ঘটেছে। অসভ্যতা, নেকামি, আদিখ্যেতাতে সমাজে মানুষগুলো নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। অর্থ উপার্জন করে সমাজের নিরীহ, দুর্বল মানুষদের উপর অধিকার

ফলানোকেই মানুষ সুখের অন্যতম পথ বলে বেছে নিয়েছে। নেশাখোর, লম্পট, মাতালের সংখ্যা সমাজে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইজ্জতহীন নারীরা লজ্জায় ভূষণ পরিত্যাগ করে ফিনফিনে পোশাক পরে শরীর দেখিয়ে অন্যের শরীরে আগুন জ্বালাবার কায়দা শিখেছে। সব মিলে সমাজের ভেতরে ভেতরে চলছে অসভ্য আদিম পাশবিকতার খণ্ড লড়াই। যা ভবিষ্যৎ ও প্রজন্মের জন্য ভয়াবহ। লেখক গল্পের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। পাঠকদের সমাজে শৃঙ্খলা, ন্যায় নীতিতে গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীব, বাছাই-গল্প, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৯, পঞ্চম মুদ্রণ: মাঘ ১৪০৬ সন, পৃ. ৯।
২. তদেব, পৃ. ১৫।
৩. তদেব, পৃ. ১৬০।
৪. তদেব, পৃ. ১৬১।
৫. তদেব, পৃ. ১৭।
৬. তদেব, পৃ. ৪৬।
৭. তদেব, পৃ. ২২।
৮. তদেব, পৃ. ৯২।
৯. তদেব, পৃ. ১৩৩।
১০. তদেব, পৃ. ১৮০।
১১. তদেব, পৃ. ১৫৫।
১২. তদেব, পৃ. ১৫৬।
১৩. তদেব, পৃ. ২৫১।
১৪. তদেব, পৃ. ২৪৫।

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ,ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়, জয়গাঁও, উত্তরবঙ্গ

সুখস্মৃতির অনুভবে দেশভাগের গল্প : 'শিকড়' ও 'স্বরাজ—রেলে'

শ্রীনাথ মাইতি

সংক্ষিপ্তসার-

দেশভাগ প্রথমে বিধ্বস্ত করেছিল দেশবাসীর 'দেশ'নামক চেতনার গভীরে। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,/সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি'— দেশভাগের ফলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল এই বোধ। দেশ সম্পর্কিত অখণ্ড ভাবনা ভুলে যেতে হল। দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, কৃষক আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি মানুষের চেতনাকে আলোড়িত করল।দেশভাগ হয়ে উঠল মানুষের ব্যথিত হৃদয়ের মর্মন্তুদ যন্ত্রণার পরিচয়বাহী। দেশভাগের এই ছিন্নভিন্ন রূপ, বিচ্ছিন্নতার দুঃসহ ট্র্যাজেডির মধ্যেও কোথাও কোথাও মিলনান্তক পরিণতি লক্ষ করি। দেশভাগের পটভূমিতে লেখা বহু রচনার মধ্যে আমরা একজন অবাঙালি ও একজন বাঙালি গল্পকারের একটি করে দুটি গল্প বেছে নিয়েছি। গল্প দুটি হল যথাক্রমে— উর্দু গল্পকার ইসমত চুগতাই-এর 'শিকড়' ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর 'স্বরাজ—রেলে'।'শিকড়' গল্পের অন্তঃস্থলে দেখি, দেশভাগের ফলে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ রূপ, রক্তাক্ত অবস্থার মধ্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তাদের মননে। আম্মা কিছুতেই স্বদেশ ছেড়ে নড়তে চাই না। নতুন স্বদেশের প্রতি বিমুখ হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত 'বটবৃক্ষের শিকড়'-এর মতো অটল ছিলেন। আর ছিলেন বলেই রূপচাঁদজির চেষ্টায় আম্মার বংশধরেরা সকলেই ফিরে আসে। আম্মা আবার স্বভূমিতে শিকড় চারিয়ে বসার সুযোগ পাই। স্বভূমি ছেড়ে যেতে হয় না, কুমুদবন্ধুকেও। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এই গল্পেও দেখি, শিকড়ের প্রতি টান। এই টান থেকেই কুমুদবন্ধু ফিরে যেতে পেরেছে ওপার বাংলায়। মিলিত হতে পেরেছে পরিবারের সঙ্গে। উভয় গল্পের পরিণতি তাই শেষপর্যন্ত মিলনান্তক এবং একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে দেশভাগের সুখস্মৃতির অনুভব শিল্প।

সূচক শব্দ-

দেশভাগ, স্বভূমি, বিচ্ছেদ, মিলনান্তক, শিকড়, সুখস্মৃতি, যন্ত্রণা, অনুভব।

মূল আলোচনা -

ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারত স্বাধীন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে ছিল তাদের মরণ কামড় থেকে সৃষ্ট ভয়াবহ এক ক্ষত।ক্ষতটিগভীর তাই তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বহু দিন ধরে আকাঙ্ক্ষিত এই আনন্দের সুখস্বপ্নভোগ করতে না করতেই এলো দেশভাগ। সঙ্গে এলো—নীড় হারানোর যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু মানুষেদের ভিড়, একরাশ শূন্যতা, মানুষের মৌলিক চাহিদারসংকট (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান), মৃত্যুভয়ের বিভীষিকা। প্রখ্যাত নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর 'নৌকায় আগমন' নামক নিবন্ধে বলেছেন—

> কারও চোখে ঘুম ছিল না। রাত বারোটায় ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটবে। জন্ম নেবে স্বাধীন ভারত, স্বাধীন পাকিস্তান।...ভেবেছিলাম স্বাধীন পাকিস্তানে নদীর দুই পাড়ে আলোর রোশনাই দেখব, আনন্দে আত্মহারা মানুষ নাচবে গাইবে, উৎসবে মুখর হবে।... বাস্তবে দেখা গেল নিথর রাত্রি ভূতের মতো

> ঝুলে আছে দু-পাড়ের ঝোপেঝাড়ে, ভাঙা মন্দিরে, শূন্য ঘরদুয়োর, গোয়ালবাড়িতে। বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ।[১]

দেশভাগের নেপথ্যে ছিল হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিকর্ষণ। সাম্প্রদায়িক ফাটলের পেছনে ইংরেজরা ছাড়াও ছিল দুটি দল। এই দুটি দল হল—হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ। দেশভাগের পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে সানজিদা আখতার বলেছেন—

> আমরা '৪৭-এর দেশবিভাগ এবং বাংলা বিভাগের পটভূমি আলোচনায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সমন্বয়, সম্প্রীতি, সম্পৃক্তহীনতা এবং সংঘর্ষের বিবর্তনের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি। কারণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক দেশবিভাগ এবং বাংলা বিভাগে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।[২]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল দেশভাগের মতো যন্ত্রণাদায়ক ও হৃদয়বিদারক এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নগ্ন রূপ কালের বুকে এঁকে দেয় এক গভীর ক্ষতচিহ্ন। ইতিহাসের পাতা-তে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাবো সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত রূপ। ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্রের লেখা থেকে জানতে পারি,

> Extreme communalism was based on the politics of hatred, fear psychosis and irrationality... The communalists attacked the other ‘communities’with, in W.C. Smith's words, ‘fervour, fear, contempt and bitter hatred,’ in the extremists or fascist phase of communalism after 1937.[৩]

দেশভাগের ফলে যেমন স্বভূমি থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছে তেমনই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগের পর মিলন অর্থাৎ স্বভূমিতে ফিরে আসার আনন্দ-মুহূর্তও রয়েছে। নির্বাচিত দুটি গল্পকে ধরে আমাদের এই আলোচনা বিস্তারের পথে অগ্রসর হবে।

দেশভাগকে কেন্দ্র করে বয়ে গেছে শিরা ধমনি কাটা রক্তের বহমান নদী। এই বহমান নদীর উৎসের সন্ধান করতে হলে আমাদের যেতে হবে ইসমত চুগতাই-এর ‘শিকড়’ (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গল্পটি ইসমত চুগতাই-এর ‘লেপ ও অন্যান্য গল্প’ নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।) গল্পের নিবিড় পাঠে। গল্পের শুরুতেই তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন একটি মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলে। যেখানে অরন্ধন চলছে ছয়দিন ধরে অর্থাৎ খাদ্যের সংকট। তাই সেখানে বাড়ির বাচ্চাদের অস্থিরতা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বাড়ির বড়োদেরকেও। এই অস্থিরতা দেখে গল্পকারের মনে হয় যেন ‘১৫ আগস্ট আসেইনি!’ এই ১৫ আগস্টে আসার নেপথ্যে ইংরেজরা রেখে গেছে দগদগে ঘা, যা দিয়ে বদরক্ত ঝরবে বছরের পর বছর। ‘পঙ্গু হাতের ডাক্তার’এবং ‘ভোঁতা অস্ত্র’–এর দ্বারা যে অপারেশন হিন্দুস্থানের শরীরে করা হয়েছিল, এবং এই অপারেশনের ফলে হিন্দুস্থানের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের সংহত বিন্যাস, সর্বোপরি বয়ে চলেছিল রক্তের নদী। গল্পকার আক্ষেপ করেছেন, যে এমন কেউ নেই যে তার নিপুণ হাতের সেলাই জুড়ে দেয় কাটা-ছেঁড়া দেহকে। প্রাবন্ধিক অতনু শাশমল-এর কলমে প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যাত হয়েছে এরকমভাবে— “এখানে ঔপনিবেশিক ‘অধীনতা অবসানে’-র কথা বলা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে দেশবিভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতার ছিন্নমস্তা স্বরূপটিকে। তবে চল্লিশ-পঞ্চাশের বছরগুলিতে বাঙালি-জীবনে কেবল দেশবিভাজনই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনা বছরের একবছর পরে সমকালীন ও পরবর্তী ক্ষুরধার অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, দাঙ্গা রক্তঝরা কৃষক-আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি শিরা ও ধমনিকাটা ক্ষত-বিক্ষত সময়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।”[৪] এরপর কলুষিত

পরিবেশের চেহারাটি তুলে ধরা হয়েছে। শহরের মুসলমানদের নজরবন্দি অবস্থা এবং সেইসঙ্গে ছিল পুলিশের পাহারা। কলুষের জমায়েত হতে থাকে।—

> যেখানে দারিদ্র থাকে সেখানেই অজ্ঞতার ঘোড়ায় ধর্মীয় আড়ম্বরের কলুষ স্তূপাকার হয়ে জমতে থাকে। এবং সেই স্তূপ ছত্রখান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার উপর পাঞ্জাব থেকে আগত শরণার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্কের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছিল। কলুষের স্তূপ খুব দ্রুত ছিটানো হচ্ছিল আর তার দুর্গন্ধ হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে খেতে পরিচ্ছন্ন সড়কেও পৌঁছে গিয়েছিল।[৫]

ক্রমশ পরিস্থিতি ভয়ানক হতে থাকে। পাঞ্জাব থেকে আসা শরণার্থীরা ভিড় জমায়, আর তাতেই সংখ্যালঘু মানুষদের আতঙ্কের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু-মুসলমানের অভিন্ন প্রতিচ্ছবি, সুদৃঢ় বন্ধনের দৃষ্টান্ত 'মারওয়াড় রাজ্যে' চোখে পড়ে। 'কিন্তু মারওয়াড় রাজ্যের হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সামাজিক আচার ব্যবহার এমনই অভিন্ন যে ওদের নাম, চেহারা অথবা পোশাক-আশাক দিয়ে হিন্দু মুসলমান চিহ্নিত করা বাইরের কারোর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।'[৬] বাইরের সংখ্যালঘুরা দেশভাগের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের সীমানার দিকে ধাবিত হতে থাকে। আর থেকে যায় কেবল পুরনো কিছু বাসিন্দা। আর কিছুজন গিয়েছিল খাদ্য সংকটের সুলভ আর্থিক সমাধানের আশায়, কিন্তু তারা নিরাশ মনে ফিরে এসেছিল। বাকি থাকল কিছু 'খানদান' পরিবারের কথা। তার মধ্যে রয়েছে গল্পকথকের খানদানি পরিবার। তারাও যাবার পথে পা বাড়িয়েছিল। যে পরিবারের সঙ্গে আর একটি হিন্দু পরিবারের(ডাক্তারসাহেব রূপচাঁদজীর পরিবার) জীবনযাত্রা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল।

একটি সামান্য ঘটনা ঘটল।—ছব্বা মিঞা স্কুলের দেওয়ালে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লিখেছিল আর রূপচাঁদজীর ছেলেরা তা মুছে লিখেছিল 'অখণ্ড হিন্দুস্থান'। কিছুদিন পর এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ন্যাশনাল গার্ড আর সেবক সংঘের এইরূপ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা যেন 'দেশ'নামক অখণ্ড সত্তার শিকড়ে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল।

এবার আমরা দুই পরিবারের সম্পর্কের রূপরেখা এবং সেইসঙ্গে সম্পর্কের ফাটলের দিকে যাত্রাপথের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করব। দুই পরিবারের মধ্যে মাঝে মাঝে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চক্রান্তের ঘূর্ণাবর্ত উঁকি মারত। —

> ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে ছিল আব্বার বন্ধুত্ব আর ওঁর ছেলেদের সঙ্গে আমার ভাইদের, ওঁর বউমাদের সঙ্গে আমার ভাবিদের আর ওদের নতুন ছানাপোনাদের সঙ্গে আমাদের নতুন ছানাপোনাদের বন্ধুত্ব বজায় ছিল। নিজেদের মধ্যে এক থালায় রুটি খাওয়ার সম্পর্ক। তিনপুরুষ ধরে এমন মিলেমিশে ছিল যে দুটি পরিবার, এখন ভাবাই যায় না হিন্দুস্তানের ভাগাভাগির পর সকাল হতে না হতেই তাদের সুসম্পর্কে ফাটল ধরে যাবে।[৭]

কিন্তু এই পার্টিগত ভেদাভেদের মধ্যেও তাদের 'বন্ধুত্ব' আর 'ভালোবাসা'-র জায়গাটি অটুট ছিল। ক্রমে তা বিপর্যস্ত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। রাজনীতির অভেদনীতি থেকে দূরে ছিলআম্মা আর চাচি। রাজনীতি তখনও হিন্দু-মুসলমানের অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র সহজলভ্য হয়নি। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তাদের হাসি ঠাট্টা ছিল অন্তরঙ্গ।—

> 'আরে এসব তো বাহানার অসুখ-বিসুখ ! আরে ভাই এমনিই ডেকে পাঠাতেআমাকে... আমি ঠিক চলে আসতাম... এতসব ঢঙ করা কেন ?'ডাক্তার সাহেবচোখে কৌতুকের ঝিলিক এনে মুচকি মুচকি হাসতেন। অমনি আম্মা হাত টেনেনিতেন। আব্বাও মৃদু মৃদু হাসতেন।[৮]

তা ছিল শিকড়ের মাটি শক্ত করার পক্ষে এবং আলগা হওয়ার বিপক্ষে।

আব্বার শরীর অসুস্থ হওয়া থেকে মারা যাওয়াপর্যন্ত তো বটেই এমনকী তার পরেও পরিবারের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে ছিল রূপচাঁদজী। আম্মার পরিবারের যে কোনো অসুখ-বিসুখ এবং সদ্য জন্মানো নবজাতকের যাবতীয় চিকিৎসা তিনি করতেন। প্রসবখানার সেবাও তাঁর তত্ত্বাবধানে হত। আব্বার শরীর যখন অর্ধেক প্যারালাইসিস হয়ে গেছিল তখন এই রূপচাঁদজী হাসপাতাল থেকে রিটায়ার্ড নিয়ে আব্বার চিকিৎসায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। পরিবারের লোকজন রূপচাঁদজীর পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করত। অবশেষে একদিন ফাটল ধরল। আর তার আঁচ গিয়ে পড়ল আম্মার মনে, সত্তার গভীরে। —

> আজ থেকে নয়, পনেরো আগস্ট যখন ডাক্তার সাহেবের ঘরে তেরঙা পতাকা আর নিজেদের ঘরে লিগের পতাকা লাগানো হয়েছিল, তখন থেকেই ওঁর মুখে ভাষা নেই। ওই দুই পতাকা যেন দুই বাড়ির মধ্যে মাইল মাইল দৈর্ঘ্য-প্রস্থের উপসাগর হয়ে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। আর তার ভয়ানক গভীরতা তিনি তাঁর বিস্মিত চোখে দেখতে দেখতে ভয়ে কেঁপে উঠেছিলেন। তারপর শরণার্থীর স্রোত আসতে লাগল।[৯]

এই থেকে শুরু হল নতুন স্বদেশের দিকে যাত্রার প্রস্তুতি। কিন্তু আম্মানড়ে চড়ে বসল। উত্তর-প্রত্যুত্তরের স্তর পেরিয়ে যেরকম ভাবে 'বটবৃক্ষের শিকড় ঝড়-তুফানেও অটল দাঁড়িয়ে থাকে।' সেরকমই আম্মা তার নিজের জায়গায় অটল হয়ে থাকল। আম্মার সেই সময়কার চিন্তা-ভাবনা গল্পকারের কল্পনায় ভাষা পেয়েছে —

> যদি আমার স্বল্পবাক আম্মার জিভে খরতা থাকত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন—স্বদেশ কোন পাখির নাম ? মানুষজন বলো তো দেখি, কোথায় রয়েছে সেই স্বদেশ ? যে মাটিতে জন্ম নিলাম, যে মাটিতে হেসেখেলে বেড়ে উঠলাম— সেটা স্বদেশ হল না যখন, তখন মাত্র চারদিন গিয়ে বসবাস করলেই তা স্বদেশ হয়ে যাবে ? তাছাড়া কেই-বা জানে যে ওখান থেকেও আবার তাড়িয়ে দেওয়া হবে না ? যদি বলে — যাও, নতুন স্বদেশ তৈরি করো।...[১০]

আম্মার মনে দাগ কাটল শাখা-প্রশাখা হারানোর বেদনা। পুরোনো স্মৃতিরা তার মানসপটে এসে ভিড় জমাল। চিন্তার নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ল। আর রূপচাঁদজীর অনুভূতিও খুবই প্রাসঙ্গিক ও মর্মান্তিক হয়ে উঠল— "কিছুক্ষণ পর্যন্ত ধূলিঝড়ের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া মুখগুলি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ফল দৃষ্টি অপরাধীর মতো উচ্ছ্বল ভিটের থেকে ফিরে এসে মাটির গভীরে নেমে গেল।... ঘৃণার শিকড়ের মতো যে জিনিস ওঁর অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল—তিনি সেটা তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে টানছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তার মাংসও উঠে আসছিল আর তিনি আর্তনাদ করে ছেড়ে দিচ্ছিলেন।"[১১] গাছের শিকড় টানলে যেমন তার সঙ্গে মাটির টুকরো উঠে আসে তেমনই সত্তার শিকড় টানার ফলে মাংস উঠে আসছিল অর্থাৎ তার আঘাত পৌঁছেছিল হৃদয়ের গভীরে। রূপচাঁদজী সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সফল হল তাঁর প্রচেষ্টা। শিকড়ের টানে আবার পূর্ণতা পেল স্বদেশ। সেই সঙ্গে আনন্দের স্রোত নতুন মাত্রা ফিরে পেল— 'আনন্দের আতিশয্যে সব ক'টি ইন্দ্রিয় আলুথালু হয়ে অন্ধকার ঘূর্ণাবর্তে ডুবে গেল।'[১২]এই মিলনান্তক পরিণতি দেশভাগকেন্দ্রিক সাহিত্যধারাকে দিয়েছে নূতন মাত্রা। বর্ণিত হয়েছেসত্যর অন্য পিঠ। যা সত্যই দেশভাগ চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সামগ্রী।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বরাজ—রেলে’(প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গল্পটি *প্রবাসী* পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘লঘুপাক’ নামক গল্পসংগ্রহ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।) গল্পটিও আনন্দ-বিষাদঘন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে দেশভাগের চরম সত্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। এই গল্পের মুখ্য চরিত্র কুমুদবন্ধু বি.এ. রেলওয়ের পার্বতীপুর স্টেশনে কাজ করত। বদলির হুকুম রদ করে সতেরো বছর পার্বতীপুরে কাটিয়েছেন তিনি।দু-পয়সা কামিয়ে, শহরে জমি-জায়গা কিনে বাড়ি-বাগান তৈরি করে নিজস্ব শখ আহ্লাদ পূরণ করে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।এমন সময় তাদের সুখে ভয়ানক থাবা বসালো দেশভাগ। কলকাতা-ঢাকা-নোয়াখালি প্রভৃতি জায়গায় শুরু হল গোলমাল। স্বাধীনতার সঙ্গেই আগমন ঘটল দেশ-বিভাগ এবং সেই সঙ্গে লোক-বিভাগেরও। যেমন পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান এবং সেই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান। দেশ সম্পর্কিত অখণ্ড ভাবনা ভুলে যেতে হল মানুষকে। বেছে নিতে হল যে কোনো একটি প্রদেশকে। কুমুদবন্ধু বেছে নিল হিন্দুস্থান। তাই যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেলওয়ে থেকে ডাক পেয়ে পাকিস্থানের পার্বতীপুর থেকে সপরিবারে চলে এল হিন্দুস্থানে। প্রথম সপ্তাহ কাটল প্ল্যাটফর্মে, মাসখানেক কাটল ওয়েটিং রুমে (কুমুদবন্ধুর বিধবা দিদি মহামায়ার অসম সাহস ও উদ্যমে)। এরই মধ্যে কুমুদবন্ধুর অনেকবার মনে হয়েছে এসব ছেড়ে দিয়ে স্বদেশভূমি পার্বতীপুর ফিরে যেতে।মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় কাজ। খোঁজ-খবর চলতে থাকে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, “ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য দুয়ার খুলিয়া রাখিলেও, ওদিকে ওরা অর্গলিত করিবারও হাঙ্গামা রাখে নাই, দুয়ারের জায়গায় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছে, আর কোন আশাই নাই।”[১৩] হিন্দু ও মুসলমান-এর পরিচিতি এখন ‘এরা’ ও ‘ওরা’ এই দুই শব্দে। *স্বদেশপ্রীতি* স্থান করে নিয়েছে মানুষে মানুষে বিভেদে আর *দেশ-ভাগ* আক্রমণ করেছে মানুষের অভিন্ন মানবিকতাবোধকে। এমন সময় চাকরি পেল কুমুদবন্ধু ওই স্টেশনেরই সেরেস্তাদারের পদে। খোঁজ মিলল নতুন বাসস্থানের। তা আবার চলমান। আট চাকার মালগাড়ি। শুরু হল সচল জীবনযাপন। সত্যিই ‘অভিনব ধরণের পল্লী’। এখানে স্টেশন প্রাঙ্গণের একধারে দেড়শোখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে, চার-চাকা, ছয়-চাকা, আট-চাকার। এক একটা কামরা এক-একখানা বাড়ি। দেশভাগের প্রভাবের ভিন্ন চিত্র লক্ষ করি এখানে। শত শত লোক পড়ে আছে প্ল্যাটফর্মে, কারো ভাগ্যে জুটেছে আশ্রয়, আর কারো ভগ্যে তাও জুটেনি। এই চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে গল্পকারের কলমে উঠে এসেছে চরম বাস্তব সত্য—“মানুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ করিয়া সহিবারই যুগ, একটা কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে।”[১৪]

চলমান বাসার স্থানান্তর চলতে থাকে। এইভাবে দুমাস যাপনের পর কুমুদবন্ধুর জীবনে দেখা দিল এক গভীর সঙ্কট। সঙ্কটের জন্মলগ্নে তা ততটা গভীর ছিল না। ক্রমে তা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা সহ্য করতে হল। রেলব্যবস্থার গলযোগের কারণে। একদিন রাত্রে এসে দেখে বাসা নেই। অনুসন্ধান করে জানা যায়—‘তাঁহার গাড়িটা ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্সেল এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে’। এই সমস্যাটি একার নয়, বহুর। তাই এর সমাধানের জন্য আলাদা করে একটা বিভাগ খোলা হয়েছে। কুমুদবন্ধু পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়, কিন্তু পরিশ্রমের ফল হয় তিক্ত। অবস্থাটি দাঁড়ায় এরকম —

> প্যাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে সমস্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোঁজ পেলেন এই পাশের স্টেশনে,ধরবেন ক্যাঁক করে, কাল খবর এল একশ’মাইল দূরে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—[১৫]

এই ধরণের দুর্যোগের মধ্য দিয়েই কুমুদবন্ধুর পরিচয় হয় নতুন বিভাগের একজন অফিসার অনুকূল ভাদুড়ীর সঙ্গে। তাঁর অন্য একটি পরিচয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। ছোটমেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন ভদ্রলোক। এই দুর্যোগে তিনি সাধ্য মতো কুমুদবন্ধুর পাশে থাকবেন, বিনিময়ে তাঁকে মেয়ের বিবাহের পাত্র খুঁজে দিতে হবে। ক্রমে এগারো দিন

অতিক্রান্ত হয় কিন্তু তাদের সচল বাসার কোনো সন্ধান নেই।কুমুদবন্ধু একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছে। দিদির কাছ থেকে হতাশার বাহক হয়ে আসে তিনখানা চিঠি। প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত কেরানীদের কাছ থেকে জোটে সান্ত্বনা বাক্য—

> গাড়ি যখন লাইনের ওপর আছে, ভয় কি?—একদিন না একদিন পাওয়া যাইবেই—এ তো সমুদ্র নয়, কোথায় ঝড়ে ডুবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোক্কর লাগিল—এ যতই কিছু হোক, বাঁধা লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না—ঐ তো পাঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার নষ্ট হইয়া গেল, এ তো তাহার চেয়ে ঢের ভাল—ধরা যাক, যদি নাই আর দেখা হয়, বাঁচিয়া তো থাকিবেই সবাই—[১৬]

শুধুমাত্র প্রাণরক্ষার জন্য কোনো মতে কাজেকর্মে বেঁচে থাকে কুমুদবন্ধু। কিন্তু অবশেষে আসে সুদিন। আবার সেই দিদির চিঠি। কিন্তু এবার এ চিঠি হতাশার বাহক হয়ে নয়, এসেছে সুখবর বয়ে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত কুমুদবন্ধু মিলিত হয় পরিবারের সঙ্গে। চিঠির মধ্যে বিবৃত হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র। চিঠির মধ্যেকার সেই অংশটি থেকে আমরা বাস্তবতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রূপ চকিতে দেখে নেব।—

> আমরা অনেক কষ্টে তিন দিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ির চারখানা দরজা আর দুইটা জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও কিছু নাই; শোনা যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা মোছলাদের বনিতেছে না। ...কলিমুদ্দির ছেলে তো কালেজে লেখাপড়া করিতেছে, সে-ই নাকি ভেতরের কথা টের পাইরা এই সব বলিয়াছে।[১৭]

সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের অভিজ্ঞতায় চলমান ট্রেনে দেশভাগের অন্য এক বাস্তব ধরা পড়েছে। যার মধ্য দিয়ে 'স্বরাজ—রেলে' গল্পের বাস্তবতার হদিশ কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে।—

> The train which came in the early hours on 15th August, 1947 as up Barisal Mail left Khulna for Calcutta as down Barisal Express...The engine drivers and firemen looked vacantly at the beginning of the human misery one of the worst in history. Thus the journey began and no one knew where to end.[১৮]

সর্বোপরি, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বরাজ—রেলে'গল্পটি যন্ত্রণাদীর্ণ দুঃসহ এক ট্র্যাজেডির মধ্যেও আনন্দের আভাস দিয়েছে। এ আভাস শুধুমাত্র আনন্দের নয়, কীভাবে সঙ্কটকে অতিক্রম করে তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নূতনভাবে পথ চলতে হয় তারও আভাস দেয়। মনের মধ্যে নূতন আশার উদ্রেক ঘটায়। যা আমাদের কাছে অভিনব।

ইসমত চুগতাই 'শিকড়' গল্পের প্রথম দিকে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এমন কারোরই শক্তি নেই যে শিরা ধমনি কাটা ঘাগুলিকে জুড়ে দেয়। কিন্তু গল্পের শেষে লক্ষ করি, এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহকে অভিন্ন করার প্রয়াস। আর 'কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে'-এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত 'স্বরাজ—রেলে' গল্প। উভয় গল্পেই ঘটেছে শিকড়ের টানে স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন। শেষ পর্যন্ত 'দেশ' সম্পর্কিত অখণ্ড ভাবনার সূত্র ধরেই দেশভাগ বিধ্বস্ত জীবন যাত্রা গতি লাভ করেছে। অগ্রসরের পথে ধাবিত হয়েছে মানব-জীবন। বলাবাহুল্য, আমরা এই ধাবমান জীবনের কালস্রোত থেকে আলোচ্য গল্পদ্বয়ের মধ্য দিয়ে দেশভাগ বিধ্বস্ত মর্মন্তুদ যন্ত্রণার কিছু সুখস্মৃতির উল্লেখ করলাম। বেণু দত্ত রায়ের ভাষায়—

> দেশভাগের পাঁচালি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একটা অনুভূতিও ঘটছে আমার। মানুষ হারে না। বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই বাঁধা হয় সাঁকো। জীবন এক আশ্চর্য শিল্প।...হারানো দিনের উপকূলে সাঁকো বাঁধা হয় এইভাবে। খণ্ডিত বাংলার বুকের ভেতর থেকেও বেজে ওঠে সানাই। সে কী শুধু কান্নার, নাকি আনন্দেরও?[১৭]

দেশভাগের বেদনামথিত এই সানাই সত্যই কি দুঃখের নাকি আনন্দের?— দ্বিধাজড়িত এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই গল্পদ্বয়ের মধ্য দিয়ে আমরা দেশভাগের সেই মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যেও সুখানুভূতির আনন্দ আস্বাদ পেলাম এবং একই সঙ্গে মুখোমুখি হলাম এক ভিন্ন সত্যের।

তথ্যসূত্র:

১. মনোজ মিত্র, *নৌকায় আগমন*, দ্র. মধুময় পাল (সম্পাদিত), দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২০,পৃ. ২৬৬।

২. সানজিদা আখতার,বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ (১৯৪৭-১৯৭০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০৯/ জুন ২০০২, পৃ. ২৯।

৩. Bipan Chandra, India's Struggle for Indipendence, Penguin Books, Hariyana, India, Revised and Updated 1989, p.428.

৪. অতনু শাশমল, নির্বাচিত বাংলা গল্পে চল্লিশ-পঞ্চাশের বাঙালি-জীবনের কয়েকটি প্রসঙ্গ : দাঙ্গা-দেশবিভাগ-উদ্বাস্তু-জীবন, খোয়াই,সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক সংকলন, কিশোর ভট্টাচার্য (সম্পাদনা), সংখ্যা ২৪, ১৫ আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ১।

৫. ইসমত চুগতাই,লেপ ও অন্যান্য গল্প, অনুবাদ : মবিনুল হক, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৯।

৬. তদেব।

৭. তদেব, পৃ. ২১।

৮. তদেব, পৃ.২২।

৯. তদেব, পৃ. ২৪।

১০. তদেব, পৃ. ২৬।

১১. তদেব, পৃ. ২৭-২৮।

১২. তদেব, পৃ. ২৯।

১৩. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়র চনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ২০০২, পৃ. ৩৫৫।

১৪. তদেব, পৃ. ৩৫৬।

১৫. তদেব, পৃ. ৩৬১।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৬৩।

১৭. তদেব, পৃ. ৩৬৪।

১৮. Sukharanjan Sengupta, 'LAST TRAINFROM KHULNA', পূর্বোক্ত দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ,পৃ. ২৭২-২৭৪।

১৯.বেণু দত্তরায়, 'খণ্ডতা-অখণ্ডতা : স্মৃতির পায়ে পায়ে',তদেব,পৃ. ৯৯-১০০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. উদয়চাঁদ দাশ, ও অরিন্দমচ ট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদনা), দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বাংলা বিভাগ, উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ : ১৫ ই অগস্ট, ২০০৫।

২. নীলা মজুমদার, কথাসাহিত্যের রূপকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২।

৩.প্রসূন মাঝি, দেশভাগের গল্প গল্পে দেশভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০২২।

৪. ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলালেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ : জুন ২০১০।

৫. রামেশ্বর শ', আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৪শে নভেম্বর,২০০৮/ ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৫।

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

অণুগল্পকার অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়:- একটি পর্যালোচনা

সুমন সরকার

সারসংক্ষেপ-

অণুগল্পকার অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় মধ্যবিত্ত মানুষের নানা ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর মধ্যবিত্ত চেতনার অণুগল্পগুলি হল-'বুদ্ধিমান', 'প্রতিবিম্ব', 'পরিবর্তন', 'বুড়োভাম' ইত্যাদি। তাঁর লেখায় প্রকৃতি চেতনা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। তাঁর প্রকৃতি চেতনামূলক অণুগল্পগুলি হল- 'আপন গন্ধে', 'ঘাসফুল' ইত্যাদি। তাছাড়া 'খড়ের মানুষ', 'সারভেন্ট' অণুগল্পে বয়স্ক মানুষের চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়া নারী চরিত্রের নানা দিক প্রকাশিত হয়েছে 'নারীত্ব', 'পয়া বৌ',ও 'ওজন' অণুগল্পে। 'ঈষা', 'হঠাৎ' অণুগল্পে রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুলশব্দ-

মধ্যবিত্ত চেতনা, প্রকৃতি চেতনা, নারীর স্বরূপ ও রাজনীতি।

মুল প্রবন্ধ-

ড. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৯ সালের ৮ ডিসেম্বর বীরভূমের কাঁইজুলীতে মাতুলালয়ে। পিতা হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায় একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তাঁরও সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল এবং নিয়মিত সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন। লেখক সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বাংলায় সাম্মানিক স্নাতক উপাধি লাভ করেন। তারপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। লেখক রাঢ় বঙ্গ নিয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া সাহিত্য চর্চার জন্য তিনি সাহিত্যবিনোদ ও জ্যোতির্ভূষণ উপাধি পান।

লেখক শৈশবকালে পিতার কর্মক্ষেত্র সাঁওতাল পরগণায় দীর্ঘদিন ছিলেন। সেই সুবাদে সেখানকার মানুষজনের অভিরুচি, সংস্কৃতি সবটাই চোখের সামনে দেখেন যা পরবর্তীতে সাহিত্যের পাতায় তার প্রতিফলন দেখা যায়। বাংলা অণুগল্পের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি অণুগল্পের লেখালিখির কাজে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অণুগল্পের প্রথম পত্রিকা 'পত্রাণু'র গ্রাহক ছিলেন। সেখান থেকেই অণুগল্পের প্রতি আকর্ষণ। তারপর অণুগল্পের সূচনালগ্নের অপর একটি পত্রিকা 'কফিহাউস' -এ তিনি নিয়মিত অণুগল্প লিখতেন। এছাড়া তার নিজস্ব উদ্যোগে বীরভূম জেলায় সর্বপ্রথম অণুসাহিত্যের কাগজ বের করেছিলেন। 'অণুপত্রী' নামের এই পত্রিকায় অণুগল্প সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত বহু লেখক এই পত্রিকায় নিয়মিত অণুগল্প প্রকাশ করতেন। তার লেখা অণুগল্পের গ্রন্থগুলি হল- 'গল্পিকা'(১৪০৯ বঙ্গাব্দের বইমেলা) 'পাঁচমিনিটের গল্প'(ডিসেম্বর, ২০০৮), 'টবের গাছ' (ডিসেম্বর, ২০১০), 'ঘাসফুল'(মহালয়া, ১৪১৯)।

লেখকের অণুগল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে নানা দিক-

তাঁর লেখায় মধ্যবিত্ত মানসিকতার নানাছবি উঠে এসেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারে সম্পত্তি বিভাজনকে কেন্দ্র করে ছলচাতুরি ও সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কাহিনী নিয়ে লেখা অণুগল্প 'বুদ্ধিমান'। অণুগল্পে দেখা যায়- 'হারাধন তো ব্যাপার স্যাপার দেখে রণে ভঙ্গ দিয়েছে- পাঁক মাখেনি গায়ে। কিন্তু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সঞ্জয় মা আর দিদির ব্যবহারে। সম্পর্কটা এমন দাঁড়াল যে ধনঞ্জয় সুলতাকে নেমন্তন্ন করলনা ওর ছেলের অন্নপ্রাশনে।'[১] সম্পত্তির কারণে আত্মীক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল অথচ এরা একই মায়ের সন্তান ছিল। আবার মধ্যবিত্ত মানসিকতায় দেখা যায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে

একাধিক ছেলে মেয়ের টানাপোড়েন। শুরু হয়ে যায় ভাগাভাগি। তবে নীচ মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায় খাবারের মেনুতে। বাবা-মা থাকাকালীন নামমাত্র খাবার রন্ধন হয়, অন্য ভাগে চলে যাবার পর খাবারের বৈচিত্র্য বাড়ে। অণুগল্পে- 'তিন ছেলের কাছে এক মাস এক মাস করে তো খাই বাবা, তোরা জানিস।-জানি তো। তবে কিনা ৩০ দিনের শর্ত। তো বাবা, তাই ৩১ দিনের শর্ত। তো বাবা, তাই ৩১ দিনে মাস হলে সে দিনটা আমাকে উপোস দিতে হয়। তাই তো বলছি ৩১ দিনে মাস কেন হয়।'[২] এমনকি বৃদ্ধ বাবা-মাকে একদিন বেশি রাখতে পছন্দ করে না পুত্ররা। 'পরিবর্তন' অণুগল্পে মধ্যবিত্ত নারী মানসিকতায় দেখা যায় প্রথম জীবনে স্বামী অন্ত প্রাণ। তাদের টাকা জয়েন্ট একাউন্টে ছিল। কিন্তু শেষ বয়সে সেই নারীই জয়েন্ট একাউন্টে না রেখে নিজের নামে রাখে। আসলে এখানে পুত্রের বিবাহের পর নতুন বধূ তাকে পর করে দেয় সেই ভীতি থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেয় শাশুড়ি বুলবুলি। আসলে পর করে দেবার এই ভয়টা যেকোনো মধ্যবিত্ত নারীর থাকে। সেজন্য সে তার স্বামীকে বলে-'পরিবর্তন' অণুগল্পে- 'টাকা থাকবে আমার, ছেলে বউ আমাকে তেলাবে।-তা হলে জয়েন্ট নামেই করে দি? -না- চেঁচিয়ে উঠল বুলবুলি- তোমার বাবার টাকা নাকি যে জয়েন্ট নামে রাখবে?'[৩] এই ভাবে মধ্যবিত্ত নারীর একটি স্বরূপ সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে। আবার অপর একটি গল্পে দেখা যায় একে সংসার চালাতে নাভিশ্বাস অবস্থা হয়ে পড়ে, তার উপর চাঁদা নিয়ে যে সংকট অবস্থা তৈরি হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে তার ছবি ফুটে উঠেছে 'বেদো' অণুগল্পে। কথক বিরক্তি নিয়ে বলে- 'সরস্বতী বানানটাও লিখতে শেখেনি শুদ্ধ করে। চাঁদার টাকায় নম নম করে পুজো- মদ গিলবে।'[৪] 'প্রতিবিম্ব' অণুগল্পে দেখা যায় এক মধ্যবিত্ত যুবক গ্রাজুয়েট পাশ করে বেকার বসে আছে। কিন্তু অর্থের প্রতি নেশা থাকায় সে বুদ্ধি খাটায় যে কোনো উপায়ে পুত্রহীন ধনী শ্বশুর বাড়ির মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই বুদ্ধি নিয়ে সে সম্পর্কে জড়িয়েছে ঊর্মির সঙ্গে। তার চিন্তাভাবনা হল- 'দুবোন ঊর্মিরা। বাপটা একেবারে ল্যাদারাম। দু'মেয়ের জন্য বাড়ি করেছে দুটো। ওকে একবার ফাঁসাতে পারলে একটা বাড়ি আমার হয়ে যাবে রে একরকম ভাবেই-'[৫] সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' অণুগল্প। যেখানে রোজকার বাড়িতে অশান্তি লেগেই আছে রোগীকে কেন্দ্র করে। আবার 'বুড়োভাম' অণুগল্পে বৃদ্ধ শ্বশুরকে নিয়ে নিত্য দিনের অশান্তি উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে। একই সঙ্গে 'স্বাধীন' অণুগল্পে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের বাড়ির গিন্নী নিত্যদিন রান্নার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। রান্নার স্বাদ সম্পর্কে বলা আছে- 'মাতঙ্গিনীর রান্নার হাতটি ভারী চমৎকার। রান্না নিয়ে নানারকম এক্সপেরিমেন্টও করে সে। ইলিশ পাতুড়ি, মুড়িঘন্ট আর বেগুনভর্তা সাজিয়ে দিল ডাইনিং টেবিলে।'[৬] 'পেন্সন' অণুগল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারে শাশুড়ির নিত্যদিনের খোঁচা সামলে নেয় শুধুমাত্র অর্থের জন্য। শত কষ্টের পরেও মুখ বুঝে সহ্য করে নেয় শাশুড়ির বাক্যবাণ মাসে পাঁচহাজার টাকার পেন্সনের জন্য। অণুগল্পকার এই প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন এই পরিবারের ছবিটি- 'নিজের কিছু থাকলে বেশীর ভাগ মহিলাই রায়বাঘিনী হয়ে ওথেন বিধবা হলেই, যেমন হেমাঙ্গিনী। সারা বাড়ি চষে বেড়ান সকাল থেকেই। সব সময় টিক্‌টিক্‌ করেন কেকার পেছনে। বউ সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে, এই তাঁর ধারণা। সকাল সকাল নম নম করে গোবিন্দ সেবা সেরেই মালা হাতে নিয়ে বসেন দোতলার বারান্দায় চেয়ারে, গ্রীলের ধারে। মালা জপতে জপতে চরকীর মতও ঘোরে দু'চোখ। একটু আনমনা হলে লেবুচুরি যাবে বাগান থেকে। সারা দুপুর ঘুম-নিদ্রা নেই হেমাঙ্গিনীর। আতিপাতি করে খুঁজছেন ঘরের কোন জিনিসটা এলোমেলো হয়ে গেল কে জানে! মাঝে মাঝে অতিষ্ট লাগে কেকার, পাগল পাগল লাগে। মিনমিন করে বলে চপলকে, আর পারছি নাগো তোমার মাকে নিয়ে! খেপে যাব শেষ কালে! ঠান্ডা গলায় বলে চপল, বেশ বুঝেছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করব বল? ...-এনি হাউ মাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে কেকা, জানলে? মাস মাস পাঁচ হাজার টাকা পেন্সন। সব ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিচ্ছি জয়েন্ট নামে। বন্ধ হয়ে যাবে যে!- কথাটা একটু বোঝ লক্ষ্মীটি!'[৭] এই ভাবে অর্থের জন্য আপোস করে চলতে হয়।

লেখকের কলমে প্রকৃতি প্রেমের নানা চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। 'আপন গন্ধে' অণুগল্পে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের ছবি দেখা যায়- 'ছোট্ট একতলা বাড়ী। বাড়ীর সামনে কৃষ্ণচূড়া। সারা বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য আর আনন্দকে যেন ব্লটিং -এর মত শুষে নিয়ে আপন খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে আছে গাছটা। ওর পাতায় পাতায় তিরতির করে কাঁপে আলো-বাতাস, ওর শিরায় শিরায় আনে আনন্দের শিহরণ। সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে নীলকাজলের মনে। পূর্বমুখী জানলার ধারে বসে তৈরী করে স্কুলের পড়া আর আপন মনে কথা বলে গাছটার সঙ্গে। এই গাছটাই কবি করে তুলল নীলকাগজকে হঠাৎই। ফাল্গুনের ভোর-বাতাসে এখনও রয়েছে একটু আধটু হিমেল পরশ। সূর্যের কাঁচা রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে বাগানে।'[৮] তার 'ঘাসফুল' অণুগল্পে একদিকে নাগরিক সভ্যতার যন্ত্রায়ণ অন্যদিকে প্রকৃতি প্রেমের দ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত সবুজের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেই সবুজকেই আশ্রয় করেছেন- 'জান না? আজ তোমাদের বাড়ীতে বোরিং। আমরা আর থাকব না বন্ধু, থাকব না। সিমেন্ট -বাঁধানো খটখটে শুকনো ডাঙা থাকবে পড়ে। নিশ্চিহ্ন হবে সবুজ। দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে ওঠে নচিকেতার গলায়-না, তোমরা থাকবে। সারা ডাঙ্গায় ছড়িয়ে দেব তোমাদের তুলে নিয়ে। গাছ লাগাব ঘাসফুল, অনেকগাছ। আবার ফুল ফুটবে, ভোমরা আসবে, গাছে গাছে নাচবে পাখি।'[৯] আবার 'ফিরে পাওয়া' অণুগল্পে ভুবনবাবু ও তার স্ত্রীর বাগান করার নেশা। স্বামী বিয়োগের পরেও মহামায়া বাগানের নেশাকে ভুলতে পারেনি। অণুগল্পে দেখা যায়- 'রিটায়ারের পরে পরেই হঠাৎ ফার্স্ট স্ট্রোকেই মারা গেলেন ভুবনবাবু। দু'মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে দূরে দূরে। বিশাল বাড়ী, চারদিকে ফুলের বাগান। নানারকমের গাছ লাগানোর শখ ছিল ভদ্রলোকের। নিজেই জল দিতেন, পরিচর্যাও করতেন নানাভাবে।... স্বামী নেই, তবু বাগান নিয়ে পড়েছে। কোন বিকার নেই। এই বাগানের প্রতিটি ফুলে যে ওর স্বামীর ছোঁয়া পাচ্ছে, আদর পাচ্ছে, সে কথা বললে কি জয়তী শুনবে?'[১০]

তাঁর লেখায় বয়স্ক মানুষের আত্মকথা নানাভাবে ফুটে উঠেছে। 'সার্ভেন্ট' অণুগল্পে দেখা যায় হিমাংশু আজীবন কম বেতনে চাকরি করেছেন, শেষ বয়সে কম পেনসনে আর টানতে পারছেন না। স্কুলে বেতন কম ছিল তাই অবস্থায় দিনকাটাতে হত। 'বয়স হয়েছে হিমাংশু শেখরের। রিটায়ার করেছেন প্রায় তেরো বছর। আর টানতে পারছেন না সংসারটা। কম বেতনে কাজ করেছেন সারাজীবন। লাভজনক বিপণন ছিলনা তখন স্কুল মাস্টারীতে। রিটায়ার করেছেন একরকম শূন্য হাতেই।'[১১] 'খড়ের মানুষ' অণুগল্পে দেখা যায় বৃদ্ধ শিক্ষক পিতাকে কনিষ্ঠ পুত্রের ভালবাসার ছবি। কনিষ্ঠ পুত্র জানায়- 'ঐ যে পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ। ঐ আমার ইষ্ট, ঐ আমার ধ্যানজ্ঞান, ঐ আমার তপস্যা, আমার সব।'[১২] 'শুয়োর' অণুগল্পে দেখা যায় বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে পুত্ররা সব ফ্ল্যাটে চলে যায়। শেষ বয়সে বৃদ্ধ পিতাটি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে থাকেন। সে পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছে- 'হ্যাঁ, আমার তিনছেলে জানোতো? তিন ছেলে আছে বড়ো বড়ো পোস্টে। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে বউ বগলে সরে পড়েছে। ওদের মা নেই, তা এই বুড়ো বাপকে একবার চোখের দেখাও দেখতে আসে না। আমার তিন ছেলেই শুয়োর, জানলে হে।'[১৩]

তাঁর অণুগল্পে নারী প্রকৃতির নানা দিক উঠে এসেছে। 'নারীত্ব' নামের অণুগল্পে দেবারতির মধ্যে শিল্পী সত্ত্বা, মাতৃত্বের গুণ আবার বয়স্ক পিতার প্রতি দায়িত্ব বোধ দেখা যায়। এই ত্রিবিধ গুণাবলীতে এই নারী চরিত্রটি উৎকর্ষ লাভ করেছে। অণুগল্পে দেবারতি সম্বন্ধে লেখক দেখিয়েছেন- ' ঘোষণা হল একটু পরেই -এবার উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবেন দেবারতী সেন। ... গান শেষ হতেই ছুটে এল বছর পাঁচেকের ওর ছেলে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল মায়ের কোলে... প্রণাম করল বাবাকে দেবারতি, তারপর ছোটখুকীর মতো গলা জড়িয়ে ধরল বাবার-'[১৪] এক বধূ শাশুড়ির কাছ থেকে শত কটু কথা সহ্য করেছিল। সে নিজে শাশুড়ি হয়ে সেই সব ফিরিয়ে দেয়নি বরং নিজের বৌমাকে ভালবেসে আপন করে নিয়েছিল। 'পয়া বউ' অণুগল্পে- 'যখন তখন চেঁচিয়ে ওঠেন ভৈরবের মা -আচ্ছা অপয়া বৌ আনলাম ঘটা করে। ঘরে পা না দিতেই দিতে শ্বশুরকে খেলে। কোন্ দিন আমার ব্যাটাকেও খাবে দেখবে ওই হতচ্ছাড়ী। ... পূর্ণিমার মনে এখন জোয়ার লেগেছে সুখের। পাড়া পড়শীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে -আচ্ছা ময়মন্ত বৌ এনেছে আমার তুহিন। বছর ঘুরতে না ঘুরতে চাকরি। ...

কথায় বলে না, স্ত্রী ভাগ্যে উন্নতি, জানলে?'[১৫] 'ওজন' অণুগল্পে দেখা যায় হারাধন ডোমের স্ত্রী স্বামীর হাতের অন্ন খাবেনা। সে পরিশ্রম করে নিজের অন্ন নিজে জোগার করে আনবে। নারীর পুরুষ নির্ভর মানসিকতার বদল লেখকের এই অণুগল্পে দেখা গেছে। লেখক দেখিয়েছেন- 'এই তো সেদিন হারাধন ডোম এল কাঁদতে কাঁদতে -আমার ইস্তিরী আমার ভাত খাবেনা বলছে মাশায়, উ আর যাবে না আমার সঙ্গে। বলছে, ভাত দেয় কি ভাতারে-ভাত দেয় গতরে। আমি বাপের গাঁইয়ে থেকে নোকের বাড়ী বাড়ী কাম করে খাব, তবু তোমার ঘরে থাকব না। লিকম্মা মরদ।'[১৬]

তাঁর লেখায় দেখা যায়- রাজনৈতিক অনুষঙ্গ। 'আমরা বেশ ভালো আছি' অণুগল্পে দেখা যায় জমি রাজনীতির কথা। জমি বাঁচাতে হলে রাজনৈতিক নেতাদের ক্লাবে টাকা দিতে হবে। তার অপর একটি অণুগল্প 'ঈষা'তে রাজনীতির কারণে রাস্তায় জ্যামের যে ছবি উঠে এসেছে তার ছবি। 'হঠাৎ অবরোধের ডাক দিয়েছে যুব-কংগ্রেস। ধরনা দিয়েছে মহাকরণে তারই জের। দশটা থেকে বারটা। বাসটাস ছাড়বে এরপর।'[১৭]

এছাড়াও 'নরখাদক' অণুগল্পে ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়- 'পাপুয়া নিউগিনির কোর উপজাতিরা আবার শ্রদ্ধা জানাত মৃত পূর্বপুরুষদের মাংস পুড়িয়ে খেয়ে। সব চেয়ে আজব কাহিনী মুর্সিদকুলি খাঁর মেয়ে আজিমুন্নিসার। রাতের নেশা জমাতে তার নাকি লাগত সদ্যমৃত কিংবা যুবদের কলিজা'।[১৮] 'ঢেঁকি' অণুগল্পে প্রাচীন বাংলার লোকউৎসব, লোকাচার, লোকব্রত, লোকানুষ্ঠানের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। তার লেখায় সম্পাদকের শ্রেণি চরিত্রের ছবিটাও আঁকা হয়েছে। 'লেখক' অণুগল্পে- 'শারদীয়া নৈবেদ্যে উপন্যাস যদি ছাপাতে চান চল্লিশ হাজার লাগবে। দু'কিস্তিতে দিতে পারেন। অনেকেই ঘুরঘুর করছে মশাই, আমার পিছনে। -চল্লিশ হাজার? চোখ কপালে উঠে সুজয়ের। -জানালেন কিনা, মহাশ্বেতা দেবীর পাশেই থাকবে যে। আর যদি পাঁচ পাতার গল্প দিয়ে মারতে চান দশ হাজারেই হবে। সুনীলের পাশেই দিয়ে দেব। টাকা দিয়ে লেখা ছাপানো? -জানলেন কিনা, আপনি কোন্ জগতে আছেন মশাই? শিল্প, সংস্কৃতির সব জায়গায় এখন টাকা।'[১৯]

এছাড়া তাঁর বেশ কিছু অণুগল্পে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। যেমন- 'মায়ের সেবা', 'মেয়ে', 'নাতি', 'শ্রাদ্ধ', 'ভুল', বেইমান' ইত্যাদি অণুগল্পগুলি তার নমুনা। তাঁর 'শেকড়ের টান' অণুগল্পে উদবাস্তু জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মুহূর্ত গল্প, কফিহাউস, ২৫/বি, নীলমণি মিত্র রোড, কল-৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট ২০০৬, পৃ-১২৭

২. তদেব, পৃ-১৩৪

৩. তদেব, পৃ-১৩৬

৪. তদেব, পৃ-১৩৯

৫. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচ মিনিটের গল্প, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ-৩১

৬. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, ঘাসফুল, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৪১৯, পৃ-২৪

৭. তদেব, পৃ-২১-২২

৮. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, গল্পিকা, বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ বি কলেজ রোড, কোলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশঃ বইমেলা, ১৪০৯, পৃ-৫৭

৯. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, ঘাসফুল, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৪১৯, পৃ-৯,

১০. তদেব, পৃ-১০

১১. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচ মিনিটের গল্প, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ-২

১২. তদেব, পৃ-১৩

১৩. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, ঘাসফুল, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৪১৯, পৃ-৫৬

১৪. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচ মিনিটের গল্প, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ-৫

১৫. তদেব, পৃ-২৩

১৬. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, গল্পিকা, বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ বি কলেজ রোড, কোলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশঃ বইমেলা, ১৪০৯, পৃ-১২

১৭. তদেব, পৃ-৭

১৮. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচ মিনিটের গল্প, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ-২০

১৯. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, ঘাসফুল, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৪১৯, পৃ-৩০

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, মুহূর্ত গল্প, কফিহাউস, ২৫/বি, নীলমণি মিত্র রোড, কল-৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট ২০০৬

২. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, গল্পিকা, বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ বি কলেজ রোড, কোলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশঃ বইমেলা, ১৪০৯

৩. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, ঘাসফুল, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৪১৯

৪. অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচ মিনিটের গল্প, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০০৮

....

গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

ফেসবুকের ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য

তিথি ঘোষ

সারসংক্ষেপ-

প্রবহমানতা ভাষারই ধর্ম । সময়, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডল নিয়ে শব্দ আকারপ্রাপ্ত হয়। নতুন শব্দ সৃষ্টি ও উপস্থাপন বৈচিত্র্য কেবল নিজেকে আকর্ষণীয় করা। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সীমা পেরিয়ে ভাষা সামাজিক status রক্ষার বাহন হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে ভাষার পরিবর্তনে Facebook অনেকাংশে নিজের ক্ষমতার আস্ফলন ঘটিয়েছে। ভাষা মানুষের প্রাতিস্বিক অধিকার। Facebook তার সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছে, যেখানে স্তর অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের রূপ বৈচিত্র্য ঘটেছে। Facebook এর ভাষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক। Facebook সম্প্রদায়ের অভিনব শব্দ নির্মাণ, বাক্য সংগঠন, মিশ্র শব্দের বাক্য নির্মাণ, অন্বয় ইত্যাদির সঙ্গে সমাজ পরিবেশের সম্পর্ক গভীরভাবে সংপৃক্ত। মানুষের লালিত সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধের ঐতিহ্য অনেকাংশে বয়সগত, সামাজিক ও শিক্ষাগত শ্রেণি বিভাজনের নিরীখে পরিবর্তনশীল। লিপি ব্যবহারে বৈচিত্র্য, লিখন রীতিতে বিশিষ্টতা, ধ্বনি নির্ভর শব্দগঠন, শব্দের স্তরে পরিবর্তন, উচ্চারণ নির্ভর বানান লেখার শৈলী বা শব্দ নির্মিতি, শব্দের অর্থগত পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাষার বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে থাকি। শব্দের জারিজুরিতে Facebook নিশ্চিত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। সময়ের স্রোতে কিছু শব্দ আদর্শ শব্দের মানদন্ড পাবে আবার কিছু এমন ভাবেই ক্ষণিকের অতিথি হয়ে যাবে।

-২-

চাবি শব্দ-

প্রবহমানতা, প্রযুক্তিবিদ্যা, অনুকরণ, নির্মাণ, প্রাতিস্বিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, চলচ্চিত্র, বৈচিত্র্য, ধর্মগত বিচ্যুতি

মূল নিবন্ধ-

ভাষ্যতে ইতি ভাষা, যা ভাবিত হয় তাই ভাষা। প্রবহমানতা ভাষারই ধর্ম। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় এসেছে পরিবর্তন, রূপান্তর। সময়, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডল নিয়েই শব্দ আকারপ্রাপ্ত হয়, এরমধ্যেই নিহিত থাকে তার মনস্তত্ত্ব। মনস্তত্ত্ব দ্বারা চালিত মানুষ শব্দের বৈচিত্র্য ও নির্মাণে তৎপর হয়েছে। নতুন শব্দ সৃষ্টি ও উপস্থাপন বৈচিত্র্য কেবল নিজেকে আকর্ষণীয় করা। আসলে নির্মাণটাই মানুষের অভিপ্রায়। নিজের স্বতন্ত্রতা প্রকাশের জন্যই শব্দে আসে পরিবর্তন ও নির্মাণ ।

আন্তর্জাতিকতাবাদ ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের মননে, চিন্তনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সীমা পেরিয়ে ভাষা সামাজিক status রক্ষার বাহন হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে ভাষার পরিবর্তনে Facebook অনেকাংশে নিজের ক্ষমতার আস্ফালন ঘটিয়েছে। অনুকরণ ও অনুসরণ আধুনিক Facebook সংস্কৃতিতে বিশেষ রূপে অঙ্গীভূত। অনুসৃয়মান ভাষিক সংস্কৃতি তথাকথিত আধুনিক মননে বিশেষ স্থানের অংশীদার হয়েছে।

ভাষা মানুষের প্রাতিস্বিক (Individual) অধিকার। Facebook এর ভাষা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষা, যেখানে ভাষাকে বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্ট ও ব্যবহারিক করে তোলা হয়েছে। Facebook নামক সমাজ পরিধিকে অধ্যয়নের জন্য Facebook তার সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছে। যেখানে স্তর অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে রূপ বৈচিত্র্য ঘটেছে। ভাষাকে অভিনব ভাবে উপস্থাপন করার অনেকগুলি কারণ হতে পারে-

এক।। অহংকে বিশেষ রূপে বিশেষায়িত করার অভিপ্রায়।

দুই।। সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ।

তিন।। প্রকৃষ্টরূপে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, মনোভাবকে জারিত করার চেষ্টা।

চার।। নিজেদেরকে সমকালীন সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা।

Facebook এর ভাষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক। সামাজিক প্রেষণা (Motivation) ভাষা পরিবর্তনের ভিত্তিস্তর। স্যসুর ভাষাবিজ্ঞানে 'সমকালিকতা' (Synchrony)[১] ও 'ঐতিহাসিকতা' / ' কালবিবর্তন' (Diachrony)[২] দুটি বিশেষ ধারণার কথা বলেছেন। 'সমকালিকতা' বলতে বোঝায় কোন ভাষা বিশেষের কোন একটি সময়ের ভাষিক বিশ্লেষণ আর 'ঐতিহাসিকতা' বলতে বোঝায় এককালের ভাষার সঙ্গে অন্যকালের ভাষার বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা। Facebook এর ভাষা হল ভাষা বিশেষের একটি ভাষিক নির্মাণ ।

-৩-

Facebook সম্প্রদায়ের অভিনব শব্দনির্মাণ, বাক্য সংগঠন, মিশ্রশব্দের বাক্যনির্মাণ, অন্বয় ইত্যাদির সঙ্গে সমাজ পরিবেশের সম্পর্ক গভীরভাবে সংপৃক্ত। ভাষার উপর সমাজের প্রভাব, কর্তৃত্ব তা অতীত ইতিহাসের থেকেই স্পষ্ট। মানুষের লালিত সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধের ঐতিহ্য অনেকাংশে বয়সগত সামাজিক ও শিক্ষাগত শ্রেণিবিভাজনের নিরীখে পরিবর্তনশীল, একইসঙ্গে তা সংস্কৃতির মানের সঙ্গে জড়িত ও সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মুখ অভিমুখ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিশেষ মাধ্যম বর্তমানে Facebook।

Facebook ভাষার যে পরিবর্তনগুলো সাধারণভাবে চোখে পড়েছে সে সম্পর্কে দু চার কথা-

১। **<u>লিপি ব্যবহারে বৈচিত্র্য:-</u>** বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ। সংস্কৃতিতে তার প্রতিরূপ খুবই স্বাভাবিক। Facebook তার সম্প্রদায়ে লিপি ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছে। ভাষার বিবর্তনে লিপির নবরূপায়ণ, গঠন ও নির্মাণে রকমফের ঘটেছে। কখনও সেটি সম্পূর্ণ বাংলা, কখনও শুধুই ইংরেজির মাধ্যমে, কখনও সেটি মিশ্র রূপ ধারণ করেছে। তবে চিত্রের মাধ্যমে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের ধারাটি বেশ অভিনবত্বের সঞ্চারক। যেমন -

বাংলা	-	তোমাকে খুব ভালো লাগছে
ইংরাজি	-	You are really awesome
মিশ্র	-	U r gd
চিত্রের রূপ	-	হাসি, কান্না, রাগ, ভালোবাসার অভিব্যক্তি সূচক চিহ্নসমূহ।

২। **<u>লিখন রীতিতে বিশিষ্টতা:-</u>** বাচন ভঙ্গিমা বা লিখন রীতি একটি শৈলী বা Style। 'Style is the man himself' নিজস্বতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে একটি মানুষের স্বতন্ত্রতা সূচিত হয়। লিখনশৈলীকে তাই বলা যায় এক ধরনের 'Art sequence' । লিখন রীতির অনেকগুলি মাধ্যম হতে পারে। কখনও পূর্ণশব্দ ও পূর্ণবাক্যের মধ্য দিয়ে, কখনও তার মাধ্যম বাক্যে ধ্বনিমূলক শব্দে।[৩] যেমন -

'U kmn a6s (তুই কেমন আছিস)

'Spk 2u L8R (Speak to you later)

'W8 4u (Waiting for you)

'N/A (Not applicable)

আবার কোন বাক্য যখন ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার মহাশয় লিখবেন সেখানে ধ্বনি ও বর্ণের শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই লিখবেন - 'Ami aj baRi yabo na', একই কথা আমাদের লেখনীতে আসবে 'Ami aj bri jbo na'.

এইভাবে শ্রেণীগত, বয়সগত ও শিক্ষাগত পার্থক্যের নিরীখে লিখন রীতিতে বিশিষ্টতা লক্ষণীয়।

-৪-

৩। **ধ্বনি নির্ভর শব্দ গঠন:-** শব্দ নির্মিতি কোন প্রথাসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী চলে না। এই নির্মাণ কৌশল সম্পূর্ণই ব্যক্তি কেন্দ্রিক। তাদের ব্যবহার কৌশলের উপর পার্থক্যই লক্ষিত হয় শব্দে। শব্দ নির্মিতি এই ভাবেই ব্যক্তি থেকে সমষ্টির চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে।[৪] বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হল যেমন-

(i) Ami aj bari jabo

Ami = a = Sound value + Alphabetic value

M = ম

i = ই

bari = b= ব

a = sound value

r = র

i = ই

jabo = j= জ

a = sound value

b = ব

o = sound value + Alphabetic value

(ii) Spk 2U L8R

Spk = s= স

P = প

K = ক

2 = Numerical value+ Alphabetic value

U = Alphabetic value (গোটা শব্দটি একইসঙ্গে letter ও শব্দ)

L8R = L= ল

8 = Numerical value+ Letter name

R= র

(iii) 2 dy

2= Numerical value + Alphabetic value

('2' গোটা শব্দটি letter ও শব্দ)

Dy = d= ড

y = এ

-৫-

৪। শব্দের স্তরে পরিবর্তন:- Facebook সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ও ইংরেজি মিশ্রিত ভাষিক সংমিশ্রণ বিশেষভাবে প্রকটিত। কখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে মিশ্র শব্দের বাক্য ব্যবহার দেখা যায়। সাহিত্য চলচ্চিত্র গণমাধ্যমের সহায়তায় শব্দে হিন্দি শব্দের আধিক্য এই সংস্কৃতিতে আনাগোনা করছে। যেমন- BINDAS, ROCK, JHAKASS.

আবার বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ - 'এটা শুধু childhood dosti not a dostana'

বাক্যের এই রকমারি ছাঁদ সংস্কৃতির স্বভাবগত কারণেই পুষ্ট। কখনও বন্ধুকে উপদেশ দেওয়ার অর্থে - 'Tension লেনেকা নেহি দেনেকা হে '

বন্ধুত্বের মজবুতি বোঝাতে - 'This called childhood TMT BAR'

৫। উচ্চারণ নির্ভর বানান লেখার শৈলী বা শব্দ নির্মিতি:- শব্দ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে উচ্চারণ ভঙ্গিমা অনুযায়ী বলবার প্রবণতার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করেছে। এই বিশেষ পদ্ধতিতে নিত্যনতুন শব্দ নির্মিতি ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি ভাষার রূপ বৈচিত্র্যেরই নিদর্শন।[৫] যেমন- Nice>Nyc, Heavy>Hvy, Byapok>Bpk, Speak>Spk, Thanks>Thanx, Good>Gd একটি শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনি গুলি নিয়ে তার প্রতিনিধিস্থানীয় শব্দ গঠন করে উচ্চারণ করা হচ্ছে।

৬। শব্দের অর্থগত পরিবর্তন:- কখনও শব্দের মূল অর্থ পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন অর্থকেই প্রকাশ করে। এই ধরনের পরিবর্তন অর্থগত বিচ্যুতি (Sementic Deviation)[৬] ক্রিয়াশীল। যেমন- 'Cool' অর্থে 'ঠিক আছি ' বোঝায়, 'সেই লাগছে' বলতে 'ভালোলাগা' অর্থে প্রযুক্ত।

৭। শব্দসংক্ষেপণ বা খন্ডিত শব্দের ব্যবহার আধিক্য:- আয়তনে বড় শব্দের উচ্চারণ সহজবোধ্য করতে শব্দের প্রথমে বা শেষে কিছু অংশ বর্জন করে মূল শব্দটির অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় শব্দ সংক্ষেপ করে উচ্চারণ ভঙ্গিমা বর্তমানে বিশিষ্ট একটি Art বলা যেতে পারে।[৭] যেমন-

Picture>Pic, Congratulation>Congo, Mobile>Mob,
Darling>Darlo, Advertisement>Add, Enthusiasm>Enthu, Sentiment>Sentu,
Pornography>Panu, Appointment>Appo, Telephone>Tel, Bengali>Ben,
English>Eng, Sister>Sis, Brother>Bro, Dinner>Dnr

৮। মুন্ডমাল শব্দে রূপান্তরিতকরণ (Abbreviation):- একাধিক স্বতন্ত্র শব্দের প্রত্যেকটির প্রথম বর্ণ নিয়ে নতুন শব্দ গঠন প্রক্রিয়ার নামই Abbreviation।[৮] বাংলা ভাষায় ইংরাজীর প্রভাবে এই ধরনের শব্দ নির্মাণ কৌশল লক্ষণীয় । এই সংস্কৃতি ভাষাকে বিশেষভাবে স্পৃষ্ট ও পুষ্ট করে তুলেছে। যেমন -

Rest In Peace>RIP, Oh My God>OMG, Laugh Out Loud>LOL, I Love You>ILU,
Thank You Very Much)>TYVM, Picture Courtesy>PC, Desktop Profile>DP

-৬-

৯। যন্ত্রাংশ নির্ভর শব্দ বাক্যে ব্যবহারে প্রাচুর্য:- যন্ত্র-নির্ভর মানুষ আজ যন্ত্রাংশে পরিণত। ইন্টারনেট, মোবাইল, ফেসবুক, টুইটারের অভিঘাত বর্তমান জীবনে অনিবার্য সত্য হয়ে উঠেছে । তাই বাচনভঙ্গি ও পরিবেশনে প্রযুক্তিগত ব্যবহার্য শব্দ অবলীলায় চলে এসেছে। স্মরণ শক্তির অভাব দেখা দেওয়াকে 'Delete' পরিভাষায় ব্যক্ত হয়, মানসিক অস্থিরতা ও চাপকে 'Hang' করা বোঝায়, দুর্বলতা বোঝাতে 'Charge নেই' বোঝায়, যোগাযোগ না থাকা বলতে 'Tower নেই' বোঝায়, নতুনভাবে শুরু করা 'Install' করাতে প্রযুক্ত।

ভাষা চিন্তাশক্তির দৃপ্ততা ও ক্ষয়ের ফসল । জীবন সংস্কৃতির পরিবর্তনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে ভাষার পরিবর্তন।

Facebook ভাষা এই অনিবার্যসূত্রে গ্রন্থিত হয়েছে। শব্দের এই জারিজুরি Facebook এখন তার নিশ্চিত আশ্রয়, এই ভাষা ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী , গোষ্ঠী থেকে জাতির ভাষাভান্ডারে স্থান পেয়েছে। শব্দের এই ধর্মগত বিচ্যুতি Facebook সংস্কৃতি অবলীলায় স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বিচ্যুতির শিকার Facebook নিজেও কারন বিবর্তনের ফলে Facebook এখন 'Fb' তে রূপান্তরিত হয়েছে। কালের প্রবাহে Facebook ব্যবহৃত ভাষা কিছুটা হয়ত মান্যতা পাবে উত্তরাধিকারের কাছে, কিছুটা কালের নিয়মে তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে।

➢ **গ্রন্থসূচিঃ-**

১। চক্রবর্তী ডঃ উদয়কুমার, চক্রবর্তী ডঃ নীলিমা, ভাষাবিজ্ঞান, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

২। হালদার নারায়ণ, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গ বানান কথন লিখনরীতি, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

৩। হালদার নারায়ণ, বাংলা অভিধান প্রসঙ্গ অতিথি শব্দ, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

৪। শ ডঃ রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

৫। চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রুপা পাব্লিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড, ৭/১৬ আন্সারী রোড, দরিয়াগঞ্জ, নতুন দিল্লি ১১০০০২

৬। মজুমদার ডঃ অভিজিৎ, শৈলী বিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

৭। হালদার নারায়ণ, জীবনানন্দের কবিতা, শৈলী ও শিল্পরূপ, মে ৩১, ২০২১, ভাষা সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, মদনপুর, নদীয়া , ৭৪১২৪৫

➢ **তথ্যসূত্রঃ-**

১। শ ডঃ রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পৃ.- ২৩

২। ঐ, পৃ.- ২৩

৩। মজুমদার ডঃ অভিজিৎ, শৈলী বিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ.- ১০৭, ১০৯

৪। ঐ, পৃ.- ৮৬, হালদার নারায়ণ, জীবনানন্দের কবিতা, শৈলী ও শিল্পরূপ, পৃ.- ২৯, ৩০, ৩১

৫। চক্রবর্তী ডঃ উদয়কুমার, চক্রবর্তী ডঃ নীলিমা, ভাষাবিজ্ঞান, পৃ.- ২৭৬, হালদার নারায়ণ, জীবনানন্দের কবিতা, শৈলী ও শিল্পরূপ, পৃ.- ৩২

৬। মজুমদার ডঃ অভিজিৎ, শৈলী বিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ.- ৭৫

৭। শ ডঃ রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পৃ.- ৬৪৯, হালদার নারায়ণ, বাংলা অভিধান প্রসঙ্গ অতিথি শব্দ, পৃ.- ঞ

৮। শ ডঃ রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পৃ.- ৬৪৯, হালদার নারায়ণ, বাংলা অভিধান প্রসঙ্গ অতিথি শব্দ, পৃ.- ঝ

....

প্রাক্তন ছাত্রী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভগীরথ মিশ্রের গল্পে একালের সমাজ চিত্র

ড. ব্রততী রানী মাইতি সাহু

সংক্ষিপ্তসার-

ভগীরথ মিশ্র একজন সমাজ সচেতন গল্পকার। বিশ শতক থেকে একবিংশ শতক পর্যন্ত ভারতের পরিবর্তিত সমাজের স্পষ্ট চিত্র তাঁর ছোটগল্পতে লক্ষ করা যায়। সময়ের সাথে সাথে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান সময় অনুযায়ী সমাজ আধুনিক হয়ে উঠেছে। মানুষ চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যেও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। লেখক দৃষ্টিতে মানুষের হৃদয়ের সরল প্রবৃত্তিগুলি একালে এসে স্বার্থপরতায় গণ্ডীবদ্ধ হয়ে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। শিক্ষায়-বিজ্ঞানে সভ্যতার উন্নয়ন ঘটলেও হৃদয়বৃত্তির উন্নতি সে পরিমাণে হয়নি। ফলে সমাজের মধ্যে ঘটে চলেছে দুর্নীতি, অন্যায় ও ভোগ দখলের লড়াই চলছে। অধিকার স্বাভাবিক পথে আসেনি, অধিকারকে আদায় করে নিতে হয়। দেশের শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে শিথিলতা এসে গেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যে বিশ্বের আকর্ষণীয় বিষয়গুলি মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেও সমাজের সব স্তরে যথাযথ উন্নয়ন ঘটেনি। অন্ত্যজ ও নীচুতলার মানুষগুলি আরও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারতো, যদি সমাজ মানুষগুলোর হৃদয় স্বচ্ছ ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন হত। ভগীরথ মিশ্র তাঁর ছোটগল্পগুলিতে পল্লি ও শহরের সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন।

সূচক শব্দ-

ইস্কিম, পাতালবিদ্যা, আগাশবিদ্যা, ককটেল, শান্তির নীড়, কমপ্লেক্স, ওপেন স্টেজ, হবিসেন্টার।

মূলপ্রবন্ধ-

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক মানুষগুলির বাইরের চেহারার বদল লক্ষ করার মতো। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রযুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজে উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু মানুষ এসব কিছু পেয়ে প্রকৃতপক্ষে চিন্তা-ভাবনাতে আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। আধুনিক সমাজের গতিবিধি নিয়ে অসংখ্য গল্প লিখেছেন ভগীরথ মিশ্র। আধুনিক সময় ও উন্নত সমাজের ভিতর মানুষগুলির সঠিক পরিস্থিতি আসলে কী তা ভগীরথ মিশ্রের গল্পগুলিতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি গোটা ভারতবর্ষের গ্রাম ও শহরের সামাজিক পরিস্থিতিকে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। মানুষ বুঝেছে—মিছিল, প্রতিবাদ ছাড়া কোন অধিকার লাভ করা যায় না। লড়াইয়ের মাধ্যমে অধিকারকে ছিনিয়ে আনতে হয়। ‘সুবচনী’ গল্পে গলাবাজি করে সুবচনী বাঁচার অধিকারকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করেছে। দেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত লড়াই চলছে। যখন যখন লড়াই হয়েছে, তখনই মানুষ অধিকারকে অর্জন করতে পেরেছে। লড়াইয়ের জন্য সমাজে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংস্থা। তিনি ‘রিং’ গল্পে দেখিয়েছেন, ‘এন্ড কোরাপশন সেল’ নামে এক গুপ্ত সংস্থার নেতৃত্বে সাধারণ মানুষেরা কিছু সাহায্য পেয়েছেন।

> “হাজার হাজার পোস্টারে ভরে দিচ্ছি শহর। কেন মারলুম চুরনলালকে। কেন মারব জয়মল কংকোরিয়াকে। দেখে শুনে সারা শহর তোলপাড়। অপরাধীরা আতঙ্কিত। সাধারণ মানুষ উল্লসিত। গুদোম থেকে বেরিয়ে আসছে চাল-ডাল-আটা-তেল-কাপড়-ওষুধ-দুধ, বাচ্চার খাবার, ছেলের চাকরি, স্ত্রী প্রেম, সবকিছু। থরে থরে সাজানো হচ্ছে খোলা দোকানে, মানুষজন কিনছে পরমানন্দে।”[১]

এভাবেই সমাজে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষেরা বেঁচে রয়েছে। আসলে ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা হল মানুষের পৈশাচিকতার দুটি দিক। যার দ্বারা মানব সমাজ ক্রমশ নৈতিকতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ভগীরথ মিশ্র একালের জ্বলন্ত পরিস্থিতিগুলি নিয়ে তাঁর গল্পের কাহিনি গড়ে তুলেছেন।

উন্নত জ্ঞানের আলো কিংবা উন্নত প্রযুক্তি বিজ্ঞান মানুষের অভাব অভিযোগকে দূর করতে পারেনি। যারা চিরকাল দুঃখের অন্ধকারে ডুবে রয়েছে তারা একালেও সুসভ্যতার আলো সঠিক ভাবে পায়নি। দলিত, পীড়িত মানুষের সংখ্যা এ সমাজে মুছে যায় নি। এখনও মানুষ অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয়ে চলেছে। ক্ষুধার কাতরতা এখনও মানুষকে পিষে চলেছে। সমাজের পরিবর্তন সকল মানুষের জন্য নয়। 'পুত্রেষ্টি' গল্পে ভগীরথ মিশ্র বাঁচার আর্তনাদকেই তুলে ধরেছেন।

> "কী এক আজব ইস্কিম এসেছে গো বলকে! লোক বেছে বেছে গরু দিচ্ছে, ছাগল দিচ্ছে, ভাচাতির জন্য টাকা দিচ্ছে। সেচের তরে পাম্প মিশিন। পঞ্চাতই পাইয়ে দিচ্ছে এসব। মেটালা, দাঁড়শোল, পাটপুরের বহুত মানুষ পেল। খবর পেয়েই পঞ্চাৎ অফিসে গিয়ে হামলে পড়েছিল প্রহলাদ তুঙ। আমার আইজ্ঞা জমিন নাই, জিরাত নাই, দেড় কাঠা ভিটা বাদে কিচ্ছো নাই। আমাকে একটা ইস্কিম দ্যান আইজ্ঞা।"[২]

গল্পকার ভগীরথ মিশ্র সমাজের দলিত পতিতদের জীবন চিত্রকে তুলে ধরেছেন। আর্থিক উন্নতি সমাজের নীচুতলার মানুষদের মধ্যে তেমন ভাবে হয় নি। দেশের শাসন ব্যবস্থা সর্বস্তরের মানুষকে একই গতির টানে নিয়ে আসতে পারেনি। আসলে সমাজের চেহারার বদল হয়েছে কিন্তু বিবেকের বদল ঘটেনি। সমাজের ধনী ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মূল পার্থক্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, সমাজের একদল মানুষ সম্পদ বৃদ্ধির খেলা খেলছে, আর এক দল মানুষ বেঁচে থাকার লড়াই করে চলেছে। আসলে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের কঠিন চেহারা গণতন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। গণতন্ত্রের কুৎসিত চেহারাকে ভগীরথ মিশ্র 'কদমডালির সাধু' গল্পে নগ্ন করে দেখিয়েছেন,—

> "সরকার থেকে কন্ট্রোল দরে গম বিক্রি হচ্ছে। মাথাপিছু তিনশো গ্রামে হপ্তা পিছু। তার জন্য হাজার মানুষের ভিড়। বিশ-পঞ্চাশ জনকে বিলি করার পর সে মালও রাতের অন্ধকারে হাওয়া। সরকার থেকে খয়রাতি গম, মাইলো, ছোলা আসে ট্রাকে ট্রাকে। ডিলাররা সে মাল বিলোয় লিস্টি ধরে। এলাকায় বুড়ো-বুড়ি অন্ধ-আতুর তার ছিটে ফোঁটা পায়। বাকিটা রাতের অন্ধকারে পাখা মেলে উড়ে যায়। কেবল সাধুর ভাগ্যে কিছুই জোটে না।"[৩]

এখনও সমাজে মানুষের কেবল জীবনই আছে, জীবিকা নেই। অন্ত্যজ সমাজে লোক - মানুষদের দুর্দশা ঘুচেনি। ভগীরথ মিশ্র বাস্তব জনজীবনের খাঁটি ঘটনাগুলিকে গল্পে তুলে ধরেছেন। তিনি গল্পে অলৌকিক বা রূপকথার কাহিনি লেখেননি। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, সুন্দরবন, ঝাড়গ্রাম হল তাঁর পল্লির মানুষদের নিয়ে লেখা গল্পের পটভূমি। শহুরে গল্পকাহিনির কেন্দ্রতে রয়েছে মূলত কলকাতা শহর। সমাজে গ্রাম-শহরের জীবনের ইতিহাস কতটা বদলে যাচ্ছে তার স্পষ্ট চিত্র ভগীরথ মিশ্রের গল্পগুলিতে পাওয়া যায়।

নারী ও পুরুষ উভয়েই পেটের দায়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। ঘরের কোণ ছেড়ে কাজের জন্য বাইরে বেরিয়েছে। নারী ও পুরুষ এক সাথে পা মিলিয়ে জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারটি সেকালের তুলনায় অগ্রগামী। ভগীরথ মিশ্র অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবন-যাপনের ক্ষেত্রটি বেশির ভাগ অংশে সেকেলের থেকে গেছে। লোকজ জীবনের সুখ-দুঃখের

গল্প এখনও প্রায় একই রকম। বামুন-কায়েত-তেলি-বাগদি-বাউরি এসব লোকমানুষগুলির সামাজিক পরিস্থিতি এখনও এক। একই বিশ্বাস, একই যন্ত্রণা নিয়ে এরা পল্লির কোণে কোণে দিন কাটাচ্ছে। ভগীরথ মিশ্র এদেরই বাঁচা-মরার কাহিনিগুলোকে গল্পে সংগ্রহ করেছেন। সাপুড়েরা ঘন জঙ্গলে শিকড়-বাকড়, জড়ি-জটকা, সাপের জন্য খুঁজে বেড়ায়। বাউরিদের মতো অন্ত্যজ সমাজগুলি তেলপড়া, জলপড়া, বাণমারা, ভূত-ছাড়ানো বিদ্যাকে বিশ্বাস করে দিন কাটাচ্ছে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস পল্লির আড়ালে-আবডালে গড়িয়ে চলছে। 'ইন্দর যাগ' গল্পে ভগীরথ মিশ্র লাল গুলাচের ফুল দেখিয়ে মানুষকে 'কুত্তা' বানানোর কাহিনি লিখেছেন। কারণ তিনি কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে চাননি। অন্ধবিদ্যাকে তিনি নরকে পাঠাতে চেয়েছেন। চিরকালের নীরব শ্রোতা চরিত্র লখিন্দরকে দিয়েই গল্পকার অন্ধবিশ্বাসের বিদ্যাকে নরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন—

> "বাণমারা, তেল মন্ত্রানো, মেয়া ভুলানো, ভূত ছাড়ানো, সাপ লাচানো, গর্ভপাত—ইসব কুনো বিদ্যা লয় আইজ্ঞা। হুজুর, ইসব হইল্যাক পাতাল বিদ্যা। মইরবার পর এ বিদ্যা যাবেক পাতালে—লরকে।"[৪]

ভারতের লোকজ সমাজের অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসের প্রতি গল্পকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। জনসমাজের উপর অন্ধবিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে। সাদা সরল মানুষের মনগুলো অন্ধ বিদ্যার কাছে বশীভূত হয়ে পড়ে। লোকমানসের সরল হৃদয়ের বিশ্বাসকে গল্পকার অবহেলিত করতে পারেননি। সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলোকে তিনি গল্পে তুলে ধরেছেন—

> "সে বিদ্যার প্রয়োগে চতুর্দিকে বান ছুইট্ব্যেক। শুরু হব্যেক সূয্যিদেবের সাথে ইন্দরদেবের লড়াই। লড়াইয়ে সূয্যিদেব হেইর‍্যে মুখ লুকাবেন অস্তাচলে। আকাশময় গুরুলে উচব্যেক মেঘ। শুরু হব্যেক সবুজ। সোনার বন্যো ধান ফইলব্যেক খেতে। জোড়ে-বাঁধে অফুরান মাছ। গাইয়ের বাঁটে আঠার মতো গাঢ় দুধ। মেইয়্যাদ্যার প্যাটে সুসন্তান। সে হইল্যাক হুজুর আগাশ বিদ্যা মইরবার পর সে বিদ্যা-দ্যাবতার রূপ ধরে স্বর্গে যায় আইজ্ঞা। স্বর্গের চিজ, স্বর্গে ফিইর‍্যেঁ যায়।"[৫]

পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো ভারতের সমগ্র সমাজকে অন্ধ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে কলুষমুক্ত করতে পারেনি। অন্ধবিশ্বাসের কাছে যুক্তি-বুদ্ধি পদানত হয়েছে। বিশ শতক থেকেই পল্লি সমাজের পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। পল্লির নির্বোধ মানুষগুলি ধীরে ধীরে সচেতন হয়েছে। কিন্তু স্বার্থপর একদল মানুষের কাছে অসহায়ভাবে জীবনকে যন্ত্রণার কুহকজালে জড়িয়ে ফেলছে নিরীহ মানুষগুলি। গল্পকার ভগীরথ মিশ্র 'সুবচনী' গল্পে দেখিয়েছেন নির্বোধ মানুষগুলি সময় ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নিজেদের পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে। তাদের কথাবার্তার মধ্যে তির্যকতার সুর ফুটে উঠেছে।

> "একতিল বেবেচনা নাই। খাটালি করাবে তুমি ষোলআনা, পইসা দিবার ব্যালা লবডঙ্কা, হাত উপুড় হইতেই চায় না! সুবচনীর গলাটা যেন ঝামা পাথরের! উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সুবচনী। ছেপ্ ফেলে মাটিতে, চরম বিতৃষ্ণায়। বলে, লয় বাবু, দশ টাকায় হব্যেক্ নাই। পনদরো টাকার এক ছ্যাদাম কম লয়।"[৬]

তিনি গ্রাম ও শহরের সমাজে নারীদের নিরাপত্তা বিষয়ে কড়া নজর দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন সমাজে নারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে এখনো অবহেলা রয়েছে। সমাজ শিক্ষার দিক দিয়ে নারীকে অধিকার দিলেও—এ বিষয়ে শহরের তুলনায় গ্রাম অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ বা মর্যাদার ব্যাপারটি কোন কোন ক্ষেত্রে হানি হয়ে

চলেছে। সকল ক্ষেত্রে অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয় না। কিছু ক্ষেত্রে মানুষ স্বভাববশত: নিজের এবং অন্যের চরিত্রকে নষ্ট করে থাকে। 'রাবণ' গল্পে ভগীরথ মিশ্র এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

> "শুধু তারিণী ওঝা নয়, তল্লাটের সব্বাই জানত ওটা আত্মহত্যা নয়। দিদিকে মেরে ওরা ঝুলিয়ে দিয়েছিল দড়িতে। সে নাকি সতীকান্ত সিংহ বাবুর হাজার পীড়াপীড়িতেও পেট নামাতে রাজি হয়নি। ফলে সিংহবাবু-বংশের 'মর্যাদা' রাখতে মরতে হলো দিদিকে।"[৭]

গল্পকার সমাজের অন্যায়, নীতিহীন চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। হত্যা বা আত্মহত্যা কোনদিন আত্মরক্ষা কিংবা মর্যাদার উপায় হতে পারে না। অন্যায় মৃত্যু কোন উন্নত, ভদ্র বা সভ্য সমাজে ঘটতে পারে না। মানুষের কেবল 'মান' থাকলে হবে না, মানুষকে মানের মর্যাদা রাখতে হবে। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ নিজের মান সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু অপরের মান রক্ষার ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব পালন করে না। গল্পকার মানুষের হৃদয়ের এই গভীর বিষয়টিকে খুঁজে পেয়েছেন—

> "মানুষের একটা বিশেষ নড়বড়ে জায়গার খোঁজ পেয়ে গেছে আচমকা। মানের জায়গা। মান হারাবার ভয়। ঐ ভয়টাকে পুঁজি করে যা খুশি করা যায়।"[৮]

ভগীরথ মিশ্র একালে বসে গল্প লিখতে বসে সমাজের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। আধুনিক সমাজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজের উন্নয়নে সর্বত্র অগ্রগতির চিত্র ফুটে ওঠেনি। যন্ত্র ও মানুষের কোলাহলে একদিক দিয়ে সমাজের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। সমাজের মানুষেরা পূর্বাপেক্ষা শিক্ষিত হয়েছে, তদুপরি শিক্ষিত ভদ্রস্থ ছেলেরা মস্তানি, গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে। চাঁদা আদায় নিয়ে সাধারণ মানুষদের উপর জুলুমবাজি করছে, ফলে তারা নিরুপায় হয়ে পড়ছে। পার্টি, ক্লাব, পূজা, মিটিং, তহবিল নানা অজুহাতের দ্বারা সাধারণ মানুষেরা নাজেহাল হয়ে পড়ছে। ওয়েলফেয়ার, প্রীতিভোজ, সেলিব্রেশন ইত্যাদি বিষয়গুলি মধ্যবিত্ত জীবনকে প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট করে চলেছে। নেশার বিষয়টি পুরুষ সমাজকে ধীরে ধীরে অধিকার করে ফেলেছে। তবে সাঁওতাল বা আদিবাসী সমাজের নেশার মর্ম একরকম এবং শহুরে মানুষদের ক্ষেত্রে আরেকরকম—তবে দুটিই নেশাখোরের দলে পর্যবসিত।

ভগীরথ মিশ্রের গল্পে সমাজের গতিবিধি বেশ ভালো করে লক্ষ করা যায়। পান-সিগারেটের নেশা ছাড়া সমাজের অধিকাংশ পুরুষের জীবন চলে না। কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় সব বয়সের চিন্তা-ভাবনার প্রকৃতি পাল্টে গেছে। বেশিরভাগ যুবকদের প্রিয় ফুটবলার কিংবা ক্রিকেটার রয়েছে। সেকেলের চণ্ডীমণ্ডপ নেই বটে, তবে অফিসে, দোকানে, রাস্তায় আড্ডা চলে পুরোদমে। চোখের জাগ্রত অবস্থাকে দখল করেছে মোবাইল ও ল্যাপটপ। সমাজের অকেজো লোকেরা খবর কাগজের সাথে দিন কাটায়। 'মিড ফিল্ডার' গল্পে গল্পকার খবর কাগজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন।

> "বড়খবর, মেজোখবর, ছোটখবর, রাঘব বোয়াল, চুনোপুঁটি খবর, এমনকি বিজ্ঞাপনগুলোও বাদ দেয় না।"[৯]

খবর কাগজ হল সমাজ মাধ্যম, সেখানে দৈনন্দিন জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনির আদি-অন্ত্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিছু মানুষ এসব খবরগুলিকে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খবরের কাগজে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে চর্চা করে দিন কাটায়। বেকারত্ব, গণধর্ষণ, চোরাই কারবার, পার্টি অফিস ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গল্পের সঙ্গে চমকপ্রদ ভাবে খবর কাগজে পাওয়া যায়। সমাজের দুর্নীতি ক্রমশ কত মাত্রায় বেড়েই চলেছে তার খবর এখান থেকেই জানা যায়।

গবেষকদের সাফল্যের ফলাফল। কম্পিউটার ট্রেনিং, রক্তদান শিবির, চক্ষুদাতা সংগ্রহ এসবের জন্যেও খবর কাগজের ভূমিকা সমাজের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

'অভিমন্যু' গল্পে ভগীরথ মিশ্র মানুষের বিলাস-ব্যসনের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেছেন। এই পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে তিনি প্ল্যাটফর্মকে বেছে নিয়েছেন। প্ল্যাটফর্মেই অসংখ্য মানুষকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। ফ্যাশনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ রুচির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্যাশনের মধ্যে ভি.আই.পি. লাগেজ একটি অন্যতম। পোশাক ও কথাবার্তার মধ্যেও স্মার্টনেশের ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। ষাট ভাগ ইংরেজি হল মডার্ণ যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাঙালিসহ প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ মাতৃভাষাকে ককটেল বানিয়ে ফেলেছে। সাজসজ্জায় উগ্র আধুনিকতা ফুটে উঠেছে। মেয়েরা চুলকে ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে দিয়েছে। তাছাড়া মডার্ণ মেয়েরা লম্বা ও সূচালো নখে নেলপালিশ পরে সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলে ধরেছে। ঠোঁটে চওড়া করে লিপস্টিক, ভুরু সেফ, মুখে উগ্র প্রসাধন এগুলো মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়। গল্পকার বেশভূষার পরিচয় দিয়েছেন 'অভিমন্যু' গল্পে।

> "বৈরাগ্য লক্ষ করে, চারপাশের যাত্রীদের মধ্যে খুব বেশি হলে কুড়ি পার্সেন্ট মানুষ ধুতি-শার্ট পরেছেন। আশি ভাগই প্যান্ট-শার্ট। প্যান্ট-শার্টের ধরণও কত বদলেছে। মেয়েদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শাড়ি। বাকিরা শালোয়ার-কুর্তা, বেলবটস, জিনস, নয়ত মিডি ফ্রক। বৈরাগ্য দেখে, বিশ পঁচিশ বছরে প্রায় কোনও মেয়েই শাড়ি পরেনি। বিবাহিতা হলেও নয়।"[১০]

বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারের দৌলতে ভারত আধুনিক হয়ে উঠেছে। খাদ্য সমস্যা দূরীকরণে, অবাধ অর্থনীতিতে, পারমানবিক বোমা ও মহাকাশযান সাফল্যে ভারত যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়ে চলেছেন। কিন্তু সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলি একই রকম পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রপন্থা, রাজনীতির ভণ্ডামি, মূল্যবৃদ্ধি সামাজিক পরিস্থিতিকে অস্থির করে তুলছে। সমাজের মানুষ ক্রমশ অভদ্র, স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। সমাজের নীচুতলার মানুষেরা উঁচু শ্রেণির মানুষদেরকে ভয় পায়। মানুষ একধরণের নখদন্ত সম্পন্ন মনুষ্যত্বহীন জীব হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মুখোশধারী মানুষেরা স্বার্থের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ট্রেনের কামরায় মানুষগুলির পরিচয় দিয়েছেন—

> "বৈরাগ্যের ভয় করছিল। এতগুলি শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, পরিচিত মানুষের মধ্যে থেকেও নিজেকে নিদারুণ নিঃসঙ্গ, অসহায় লাগছিল। পুরো কামরাটাই যেন এই মুহূর্তে এক শত্রুপুরী। যেন শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্য। যেন সারা কামরা জুড়ে আদিম যুগের বন্ধ, গুমোট বাতাস, অর্ধভুক্ত লাশের পচাগন্ধ। যেন ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে জ্ঞানবোধহীন একদল নখদন্তসম্পন্ন মনুষ্যেতর জীব।"[১১]

সমাজে জেগে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ। মন্দির-মসজিদের উপর এখনও হানাহানি চলছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে পা বাড়াচ্ছে। ফাংশানে গাওয়া গান বা কবিতা সংস্কৃতিকে বহন করতে পারে না। ভগীরথ মিশ্রের গল্পগুলিতে রবীন্দ্র ও নজরুলের দর্শন ফুটে উঠেছে। তিনি সমাজে সকল শ্রেণির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম/ কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মা-নুষ, সন্তান মোর সার।' তিনি মানুষের মধ্যে বিভেদকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ভারতের মানুষ এখন ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে চলে না। ভারতে এখন বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতের মধ্যে এখন সাম্প্রদায়িক লড়াই প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। 'নৌকাবিলাস' গল্প বলেছেন—

> "কাশ্মীরে তো আপনারা প্রিভিলেজড ক্লাস। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বাস করেও আপনারা এখনও আপনাদের ধর্মীয় আইনে চলতে পারেন। পাকিস্তান জিতলে বোমা ফাটাতে পারেন।"[১২]

গল্পকার ভগীরথ মিশ্র ভারতের সমাজের বর্তমান চেহারার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। উগ্র-আধুনিকতার ঝাঁঝে মনুষ্যত্ব, ধর্ম, জাতিগত ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের এখন হৃদয় আছের কিন্তু বিবেক নেই। কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা কেউই মানুষকে উদারচেতা করে তুলতে পারছে না। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো ভারতবর্ষের সমাজে ঐক্যকে সগৌরবে ধরে রাখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মতো দেখতে চান সমাজকে—

> "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
> শক-হূন-দল, পাঠান, মোগল একদেহে হল লীন।"[১৩]

গল্পকার ভগীরথ মিশ্র ঐক্যকে হারিয়ে যেতে দিতে চান না। তিনি শিকড়ের অন্বেষণ করেছেন। ছায়া সুনিবিড় শান্তি নীড়গুলিকে পুনরায় ফিরে দেখতে চেয়েছেন। চারিদিকে গড়ে উঠেছে অট্টালিকা। আধুনিক নগরীর চিত্র কেমন—তা 'দ্বীপগুলি' গল্পে স্পষ্ট রূপ দিয়েছেন। লেখকের বর্ণনায় 'ইন্দ্রপুরী'টি এরকম—

> "আধুনিক নগরীর মধ্যে রয়েছে সুসজ্জিত পার্ক, শিশু উদ্যান, স্পোর্টস-কমপ্লেক্স, শপিং সেন্টার, স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরি, নিজস্ব মেডিকেল ইউনিট, কমিউনিটি হল, ক্যাসেট লাইব্রেরি ওপেন স্টেজ, সেলুন লন্ড্রি-বিউটিপার্লার, হবি সেন্টার-অ্যান্ড হোয়ানেট।"[১৪]

সমাজে মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। অশান্তি, উদ্বেগ, বিশৃঙ্খলা সমাজের মধ্যে বেড়ে চলেছে। রাজনীতির কুটিলচক্রে প্রতিনিয়ত চলছে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে রাস্তার নির্জনতা টুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। অত্যাধুনিক জীবনযাপনের দুঃসহ পরিস্থিতি ভগীরথ মিশ্রের লেখায় ধরা পড়েছে।

> "গলির মুখেই ট্রাম রাস্তা। ভোর তিনটে থেকে রাত বারোটা অবধি ঘড়ঘড়িয়ে চলছে ট্রাম। কেঁপে কেঁপে উঠছে পুরনো কালের বাড়িঘর। ছুটে চলছে ডবল-ডেকার বাস, মিনি, বিশালাকায় ট্রাক। তাদের সমবেত গর্জন এবং কালো ধোঁয়ায় এ এলাকার বাতাস বিষাক্ত হয়ে থাকে বারোমাস।"[১৫]

শান্তির নীড় ও ছায়া সুশীতল দিঘীর পরিবেশ হারিয়ে গেছে। যানবাহন মানুষকে বুড়িয়ে দিয়েছে। অল্প হাঁটতেই মানুষের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। নিরুদ্বেগ জীবন মানুষের মধ্যে নেই। ড্রেনের নোংরা পচা কালো জলে সামাজিক পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠেছে। এভাবেই গল্পকার ভগীরথ মিশ্র একালের সমাজের কুশ্রী কঠিন চেহারাকে গল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মিশ্র ভগীরথ, শ্রেষ্ঠ-গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০২২, পৃ. ২০৭।
২. তদেব, পৃ. ২১৯।
৩. তদেব, পৃ. ২৫৮।
৪. তদেব, পৃ. ২৩৭।

৫. তদেব, পৃ. ২৩৭।
৬. তদেব, পৃ. ১৩২।
৭. তদেব, পৃ. ১৫১।
৮. তদেব, পৃ. ১৪১।
৯. তদেব, পৃ. ১৫।
১০. তদেব, পৃ. ২৩।
১১. তদেব, পৃ. ৪৮।
১২. তদেব, পৃ. ৮৭।
১৩. তদেব, পৃ. ৮৪।
১৪. তদেব, পৃ. ১১৬।
১৫. তদেব, পৃ. ১১৭।।।

....

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীদের অবস্থান ও সংগ্রাম

করম চাঁদ মান্ডি

সারসংক্ষেপ –

এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতিতে অসহায় সাঁওতাল নারীদের অবস্থান ও সংগ্রামের কথা। আমাদের দেশের সাঁওতালরা অন্যান্য জাতির শক্তির প্রভাবে ভীষণভাবে অত্যাচারিত ও আগ্রাসনে শিকার হয়। তাদের ভূমি, ভাষা, সম্পদ এমনকি সংস্কৃতির ওপর জোর পূর্বক গ্রাস করার পরিকল্পনা চালানো হয়। সাঁওতাল সমাজে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা, ভূমি হারানোর ভয়, সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সবসময় আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। শিল্পায়ন-শহরায়নের সাথে সাথে সাঁওতালরা তাদের জীবন থেকে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, গান সবই হারিয়ে যেতে বসেছে। পুরুষরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেও সাঁওতাল নারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার অত্যন্ত শোচনীয়। কাজেই শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণে তারা মর্যাদাহীন জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। ফলে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সাঁওতাল নারীদের জীবনে আর্থিক অনটনের পাশাপাশি শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা বা আগ্রহের অভাবকে বড়ো প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ সাঁওতাল নারীর শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে যায়। বৃহত্তর সমাজে নারীদের যে বৈষম্যের চিত্র পাই আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও সেই একই রকম বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়। এছাড়াও সাঁওতাল নারীরা দৈনন্দিন জীবনে কর্মঠ, শক্তিশালী, উদ্দাম হওয়া সত্ত্বেও অসহায় হয়ে পড়ে। আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে এই অসহায় নারীদের অবস্থান ও সংগ্রামের কথাই আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

সূচক শব্দ –

সাঁওতাল সমাজ, মানবজাতি, দামিন-ই-কো, মালিকানা, মাঝি-পরিষদ, বৈষম্য, পাড়হাট, কন্যাপণ, পুরুষতন্ত্র, মানবাধিকার

মূল আলোচনা –

মানব জাতির সৃষ্টির সময় থেকে সমস্ত গোষ্ঠী কোনো-না-কোনো অঞ্চলের আদিবাসী ছিল। তারপর বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটে গেছে তাদের স্থানান্তর। সাঁওতালদের আদি নিবাস হিসাবে চিহ্নিত সাঁওতাল পরগণা বা 'দামিন-ই-কো' ঐতিহাসিক বিচারে তাদের আদি বাসস্থান নয়। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে এখানে সাঁওতালদের আবির্ভাব ঘটে। তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় চাষবাস শুরু করেন। এ সম্পর্কে শুচিব্রত সেন লিখেছেন – " দামিন-ই-কো তখন ছিল জঙ্গল তরাই নামে সম্পূর্ণভাবে পাহাড়িয়া অধ্যুষিত এক অঞ্চল। এর ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে এই অঞ্চলের সাঁওতালদের আকর্ষণের কারণ। এর দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থিত রামগড় ও পাঞ্চেত, দক্ষিন-পূর্বে বীরভূম এবং পূর্বে রাজমহল পাহাড় অঞ্চলটি। কাজেই জঙ্গল-তরাই ও জঙ্গলমহলের এর সাধারণ সীমারেখা ছিল। যার ফলে জঙ্গলমহলের থেকে উৎখাত হয়ে সাঁওতালরা প্রথমেই বেছে নিল জঙ্গল তরাই । ১৭৯০ সালের আগে যে 'দামিন-ই-কো' – তে তাদের আগমন ঘটেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মেজর ব্রাউন এই অঞ্চল সার্ভে করার সময় একবারও সাঁওতালদের সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করেনি। এর সম্পর্কে প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ফ্রান্সিস বুকাননের রিপোর্ট থেকে। ১৮০৯ – ১০ সালে বুকানন ভাগলপুর অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন। তখনকার ভাগলপুর বলতে বোঝাত মুঙ্গের এবং বর্তমান সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পূর্বের দুই তৃতীয়াংশ। সেই সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন

পালামৌ, রামগড় ও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু সাঁওতাল পরিবার জমিদারের অত্যাচার থেকে পালিয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। ভাগলপুরের কালেক্টর জে. শেরবান ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে এই অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধির কথা বলছেন। এটি নিঃসন্দেহে সাঁওতালদের অবদান”[1] ।

সাঁওতাল পরগণায় বসতি নির্মাণেই আগেই অবশ্যই সাঁওতালরা বীরভূম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত জঙ্গলমহল জেলায় বাস করত। প্রাথমিক ভাবে সেখানেই তাদের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটে। কৃষি ব্যবস্থা গ্রহনের প্রবণতা তৈরি হয়। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভ এবং ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সাঁওতাল এবং অন্যান্য উপজাতিদের সংকট শুরু হয়।

ভারতবর্ষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সংকটজনক। কাজেই তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা পিছনে এবং দুর্বল। সাঁওতাল নারীদের অবস্থা আরো বেশি আশঙ্কাজনক। তাদের সমাজে ঐতিহ্যগত আইন এবং প্রথাই সাঁওতাল নারীকে দুর্বল করে রেখেছে। সাঁওতাল নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম এছাড়াও সহিংসতা ও নির্যাতন ইত্যাদির বাস্তব চিত্র নির্মমভাবে ফুটে উঠেছে [2]। সাঁওতাল সমাজে সম্পত্তিতে নারীদের কোনো অধিকার নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিতে অধিকার শুধুমাত্র পুরুষেরই। বাবা-মায়ের সম্পদের উত্তরাধিকার হয় ছেলের নামে। মেয়েরা সম্পদের এক অংশও পায় না। কোনো দম্পত্তির পুত্র সন্তান না থাকলে সেক্ষেত্রে মেয়েরা সম্পত্তির মালিকানা পায়। তাছাড়া নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্ত্রী বিধবা হলেও স্বামীর সম্পত্তির অধিকার পায় না। বিধবা স্ত্রী জীবনস্বত্ব পায় মাত্র। অর্থাৎ স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারে কিন্তু বিক্রি করতে পরবে না। সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার শুধুমাত্র ছেলের অর্থাৎ পুরুষের হাতে থাকে। এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী কোনো সম্পত্তিই পায় না। এই সম্পত্তি স্বামীর ভাই অথবা ভাইয়ের ছেলেরা পায়। অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও সাঁওতাল নারীকে বঞ্চনার মুখে পড়তে হয়। সাঁওতাল সমাজের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, “পুরুষরা শুধু বাইরের কাজ করবে। তারা ঘরের কাজ অর্থাৎ বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা, উঠোন-ঘর পরিষ্কার, তরকারি কাটা, মসলা বাটা ইত্যাদি করে না। অন্যদিকে সাঁওতাল নারীদের ঘরে-বাইরে সব জায়গায় কাজ করতে হয়। তাদেরকে সন্তান লালন-পালন থেকে শুরু করে জ্বালানি সংগ্রহ, কৃষিকাজ, এমনকি মজুরির কাজের জন্য মাঠেও যেতে হয়। কিছু কিছু কাজের ব্যাপারে সাঁওতাল নারীদের ওপর অলিখিত সামাজিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সামাজিক রীতির কারণে মেয়েরা কোদালের কাজ, ঘর ছাওয়া বা হাল বাওয়ার মতো কাজ করে না। এসব কাজ করলে সমাজ বিরুদ্ধ এবং সম্মানহানি হবে বলে মনে করা হয়। কাজেই সাঁওতাল নারীরা নিজেদের পুরুষদের সম্মানের কথা ভেবে এইসব অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকে। এর অন্যতম কারণ হল সাঁওতাল সমাজে পুরুষাধিপত্য সর্বত্র বিরাজমান”[3] ।

সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার এখনো খুব শোচনীয়। ফলে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে। এক সময় আদিবাসী সাঁওতাল গ্রামগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বর্তমানে বিভিন্ন এন.জি.ও প্রবর্তিত এমনকি সরকারি স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপরেও তাদের মধ্যে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। বিশেষ করে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা একেবারেই কম। সাঁওতালরা উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলেকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা মনে করে ছেলেরা ভবিষ্যতের কর্ণধার। ছেলেরা বড়ো হয়ে পরিবারের সংসার সামলাবে। বাবা-মাকে খাওয়াবে। আর মেয়েদের বিয়ে হলে পরের বাড়ি যেতে হয়। কাজেই তারা মনে করে পড়াতে হলে ছেলেদেরকেই পড়ানো উচিত। এইভাবে সাঁওতাল সমাজে নারীরা শিক্ষার দিক থেকেও বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। তবে বর্তমানে সাঁওতাল সমাজে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তারা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখানো উচিত বলে মনে করছে এবং লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি সামাজিক কাঠামো আছে। এই সামাজিক কাঠামোকে 'মাঝি-পরিষদ' বলা হয়। সাঁওতালদের এই 'মাঝি-পরিষদে' নারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে সমাজে নারীরা বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থায় বা মীমাংসার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের কোনো সুযোগ পায় না । সাঁওতাল নারীদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা কোনোদিক থেকেই ইতিবাচক নয়। কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান, বিচার-সালিশ কোথাও নারীরা মূল ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় না। সাঁওতাল নারীরা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই মতামত দেওয়ার সুযোগ পায় না। অথবা সমাজে তাদের থেকে মতামত নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করে না। ফলে সাঁওতাল নারীরা সামাজিক দিক থেকেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় স্বীকার হয়[8]।

সাঁওতাল নারীরা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গেলেও কর্মক্ষেত্রে নানান বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তাদেরকে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি কাজ দেওয়া হয় কিন্তু সে তুলনায় পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এইভাবে ব্যাপক বৈষম্য ও বঞ্চনা মেনে নিয়ে সাঁওতাল নারীদের কাজ করতে হয় সামান্য দুমুঠো ভাতের আশায়। এছাড়াও সাঁওতাল নারীরা পরিবারের পুরুষের বিভিন্ন কাজেও সহযোগী হয়ে ওঠে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে পুরুষের কাজ শুধু হাল বাওয়া। কিন্তু সংসারে নারীরা সন্তান লালন-পালন থেকে শুরু করে বীজ বপন, শস্য কাটা, জ্বালানি সংগ্রহ, ঘর-গৃহস্থালির সব কাজেই করে থাকে। তা সত্ত্বেও সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদা দেওয়া হয় না। পরিবারের হালধরা নারীদের সমাজে বিভিন্ন ভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়। পারিবারিক কাজে নারীদের বাইরে যেতে হয় বলে সমাজের চোখে তাদেরকে খারাপ বা নষ্ট মেয়ে বলা হয়। একজন নারী সৃষ্টিশীল ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজে তার যথাযথ স্বীকৃতি নেই ।

আমাদের দেশের সব সমাজের নারীরাই সাজসজ্জা করতে ভালোবাসে। আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই সাজসজ্জার ক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের কোনো মানদণ্ড থাকে না। যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে সাজসজ্জার ক্ষেত্রে নারীদের একটা আলাদা মাত্রা থাকে। সাঁওতাল মেয়েরা বালা, চুড়ি, বাজু, রিং, হাঁসুলি, মালা, দুল, চুলের কাঁটা, আংটি, কোমরবিছা ইত্যাদি সব ধরনেরই গহনা পরতে ভালোবাসে। তারা বিভিন্ন ধরনের কাঁচের চুড়ির প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয় কিন্তু পারিবারিক কাজে টেকসই নয় বলে তারা এ বিষয়ে লোভ সংবরণ করে রাখে। সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সংকটজনক। তাদের স্বর্ণলঙ্কার পরিধানের মত সামর্থ্য থাকে না। ফলে তারা চাঁদির গহনাকে স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত জনপ্রিয় বলে মনে করে। কিন্তু এর বাইরেও সাঁওতাল নারীরা ফুলসাজে সজ্জিত হতে খুব ভালবাসে। পথে ঘাটে ফুলগাছ থেকে ফুল তুলে সঙ্গে সঙ্গেই খোপায় পরে নেয়। উৎসব অনুষ্ঠানে গহনা পরার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ফুল, পাতা ইত্যাদিতে সজ্জিত থাকে। আদিবাসী তরুণীরা যেন প্রকৃতির সন্তান হিসেবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। গহনা গড়াতে দেওয়া, ডিজাইন দেখানো অথবা রেডিমেন্ট গহনা হাটবাজার থেকে কেনা সবেতেই সাঁওতাল মেয়েরা শেষ কথা বলে। নারীদের সাজসজ্জার ব্যাপারে পুরুষের পছন্দ-অপছন্দের ভূমিকা থাকে গৌণ। সাঁওতাল নারীদের পরিধান হিসেবে নিম্নাঙ্গের জন্য লুঙ্গি জাতীয় এবং ঊর্ধ্বাঙ্গের জন্য ব্লাউজের ওপর এক টুকরো বড়ো উড়না যেটাকে তারা পাড়হাট বলে সাধারণত ব্যবহার করে। আবার অঞ্চল বিশেষও নারীদের বস্ত্র পরিধানের ভিন্নতা দেখা যায়। তবে বস্ত্র পরিধানে সাঁওতাল নারীদের ক্ষেত্রে শাড়ীর প্রচলনও যথেষ্ট দেখা যায়।

সাঁওতাল সমাজের মূল সুর হল গোষ্ঠীভাবনা। তাই যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে নারীরা সাধারণত স্বামীর সাথেই যায়। কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রে দলবদ্ধতাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম। সাঁওতালদের বিবাহ অনুষ্ঠানে কোনো

গোপনীয়তা রক্ষা করার নিয়ম বা উপায় নেই। পারিবারিক ঘটকের মাধ্যমে সামাজিক রীতি মেনেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রথমে মেয়ের বাড়িতে তারপর ছেলের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। সাঁওতালদের মধ্যে যারা খৃষ্টধর্ম অনুসরণ করেন, তাদের বিয়ে চার্চে হয়। তবে বিয়ের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকার সাঁওতালদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে বিবাহ ঘিরে বহুবিচিত্র প্রথা-রীতি সংস্কারের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তাদের বিবাহ বা বাপলার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হল সমগোত্রে বিবাহ না হওয়া। এছাড়া বরকন্যার জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত সাঁওতালদের বিয়েতেও 'কন্যাপণ' প্রচলিত। অর্থাৎ সাঁওতালদের বিবাহে বরপক্ষই কন্যার পিতাকে পণ দেয়। যে কোনো সাঁওতাল বিয়েতে এই কন্যাপণ ৩ টাকা ৫০ পয়সা ধার্য করা হয়। এর থেকে ৫০ পয়সা দক্ষিণা সম্মান হিসেবে গ্রামের মাঝি-পরিষদকে দেওয়া হয়। আর বাকিটা কন্যার পিতার নামে থেকে যায়। মেয়ে যে এমনি পাওয়া যায় না তাকেও মূল্য দিয়ে কিনতে হয় সাঁওতাল সমাজে সে বোধ বিদ্যমান। সাঁওতাল সমাজে বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ রীতি প্রচলন ছিল না। আজও সেই রীতির প্রচলন নেই। তবে স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে তারা আবার বিয়ে করতে পারে। কোনো সন্তান-সন্ততি থাকলে মেয়েরা সাধারণত দ্বিতীয় বিয়ে করে না। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে স্বামীর ভিটাতেই থাকে। আবার কিছু কিছু মেয়ে বাপের বাড়িও চলে যায়। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে বা সন্তান না হলে পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে। যদিও একাধিক বিয়ে করাকে সাঁওতাল সমাজে ভালো চোখে দেখে না।

এই পুরুষতন্ত্র সমাজে নারীদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই তাদের সমাজভুক্ত করে রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নারীরা যে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে এ কথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য নারীর নিজস্ব জগৎ সৃষ্টির বিরুদ্ধে বেড়াজাল। সাঁওতাল বিদ্রোহের আলোচনায় ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বলেছেন– " এই বিদ্রোহে পুরুষদের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও কোনো অংশে কম উল্লেখযোগ্য ছিল না। যদিও ইতিহাসে সে কথা খুবই কম আলোচিত হয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথ মহাশয়ের এ মন্তব্য খুব সঙ্গত দেখা যায় যে, সাঁওতাল সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে প্রধান ভূমিকা মেয়েদেরই। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা শিকার দলের অন্তর্বর্তী হয়ে যেত। অনেক সময় পুরুষের বেশে তারা সরাসরি লড়াই করেছে ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে। অথচ আহতদের সেবা-শুশ্রূষায় ও গুপ্তচরের ভূমিকাতেও নারীরা নিয়োজিত ছিল। বিদ্রোহের পর বন্দি হিসেবে পুরুষদের মতো শত শত শিশু সন্তানসহ সাঁওতাল নারীরাও কারাবরণ হয়েছে"।[৫]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে বিদ্রোহে নারীর ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই বিদ্রোহে সাঁওতাল নারীদের অবদান একটা আকস্মিক ঘটনা। কেননা দৈনন্দিন জীবনে সাঁওতাল নারীদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো বা ধর্মে নারীদের স্থান নেই বললেই চলে। এই সৌন্দর্য চেতনায় উদ্ভাসিত সাঁওতাল নারীকে ডাইনি প্রথার মাধ্যমে অবদমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, নারী শক্তির প্রাধান্যজনিত ভীতি থেকে উদ্ভব ডাইনি চেতনার। ছোটোনাগপুরের মতো আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ছিল গভীর। নারীরা জ্বালানি সংগ্রহ থেকে ঔষধি বৃক্ষ বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ছিল। জ্ঞান ও কর্মের অপ্রতিরোধ্য এই শক্তিকে পরাহত করার জন্য 'ডাইনি' হয়ে দাঁড়ালো পুরুষতন্ত্রের এক অস্ত্র। ক্রমে তা কালান্তরে পরিণত হয় অন্ধবিশ্বাসে। এই অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি পাইনি স্বয়ং নারীরাও। ঈশ্বরের দ্বারা নারীরা যাতে আরও শক্তিশালী না হয়, তারজন্য ঈশ্বরের প্রার্থনা এমনকি ধর্মাচরণেও নারীর প্রতি জারি হল নিষেধাজ্ঞা। তথাকথিত egalitarian বা সমতাভিত্তিক সাঁওতাল সমাজেও নারী-পুরুষ সমতা সুদূরপরাহত হল।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রথাভিত্তিক সাঁওতাল সমাজের ভাঙন সূচিত হয়েছে। তার পরোক্ষ প্রভাবে নারীদের অধিকার আরও সংকুচিত হয়ে ডাইনি চিহ্নিতকরনের পথ প্রশস্ততর এক পরিসর লাভ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক দিকে যেমন ভূমির উপর সাঁওতালদের যৌথ মালিকানায়, অন্যদিকে মহাজন ও বাজার অর্থনীতির অনুপ্রবেশ নারীদের জমির উপর প্রথাসম্মত অধিকারেও হস্তক্ষেপ করে। এই সমাজে বিধবা এবং নিঃসঙ্গ নারীর জমির উপর ছিল এক স্বীকৃত প্রথা। এইসব নারীদের ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করে হত্যার ঘটনা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ডাইনি প্রথায় শিকার হয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন, উচ্ছেদ আতঙ্ক – চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে আদিবাসী সাঁওতাল নারীর মানবাধিকার [৬]।

আদিবাসী সাঁওতাল নারীদের সমস্যা সমাধানে দেশের মূলধারার নারী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের অধিকার আদায়ে শিক্ষিত সচেতন করার পাশাপাশি আইনি সহায়তা দেওয়াও দরকার। আরও দরকার সাঁওতালদের যেসব প্রথাগত আইন বা নিয়ম রয়েছে সেগুলোর সংস্কার করা। সাঁওতালদের মানবাধিকার রক্ষায় প্রথাগত আইন বা নিয়মের কল্যাণকর অংশটুকু রেখে দেওয়া হয়। আর কিছু নিয়ম যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাঁওতাল সহ বিভিন্ন আদিবাসী নারীর সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রশাসন ও সরকারের। আদিবাসী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনকে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও নাগরিক সমাজকে এ ব্যাপারে প্রানোদিত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১। মিশ্র, শিবেন্দুশেখর, "সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম" (সেপ্টেম্বর ২০১৭), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ । পৃষ্ঠা- ১০২

২। মিশ্র, শিবেন্দুশেখর, তদেব। পৃষ্ঠা- ১৩৭

৩। সেন, শুচিব্রত, "ভারতের আদিবাসী- সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম" বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা- ৭০০০০৯। পৃষ্ঠা- ৫১

৪। সেন, শুচিব্রত, তদেব। পৃষ্ঠা – ১৩২

৫। সেন, শুচিব্রত, তদেব। পৃষ্ঠা- ১৪৯

৬। সেন, শুচিব্রত, তদেব। পৃষ্ঠা- ৩৫১

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, "পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ" (প্রথম খন্ড, মে, ১৯৮৭), সন্তোষী প্রিন্টার্স, কলকাতা – ৭০০০৪০

২। কর্মকার, জলধর, "ঐক্য ভাবনায় সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি" (২০২১), Taurean Publication, New Delhi - 110053

৩। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, "বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক-বৈদিক প্রভাব" (মার্চ, ১৯৯২), সন্তোষী প্রিন্টার্স, কলকাতা- ৭০০০৪০

৪। হেমব্রম, পরিমল, “স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের ভূমিকা” (১৫ই আগস্ট,২০২১), আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, নর্থ ঘোষপাড়া, বালী, হাওড়া।

৫। ঘোষ, ঋষিপ্রতিম, “তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী” (অক্টোবর, ২০১২), পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৭০০০০৯

৬। ঘোষ, দীপঙ্কর, “বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা” (জানুয়ারি, ২০০০), অমরভারতী, কলকাতা-০৯

৭। সান্যাল, তপন, “বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী রমণী- পটভূমি ও ইতিবৃত্ত” (ডিসেম্বর ২০০০), বি.বি. প্রকাশন, কলকাতা।

৮। দেবসেন, সুবোধ, “বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ” (জানুয়ারি, ২০১০), পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯

....

গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সামাজিক প্রেক্ষাপটের আদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'

নিত্যানন্দ দাস

সারসংক্ষেপ-

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত প্রতিভা। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাতে যেমন হাত পাকিয়েছিলেন তেমনি বাংলা উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি বাংলা উপন্যাসের জগতের পালাবদল করেছিলেন । বাংলা উপন্যাসের জনক হিসাবে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের পর যদি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে যিনি বিখ্যাত প্রতিভার প্রদর্শন করেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধের ঔপন্যাসিক। পরাধিন ভারতবর্ষে অর্থাৎ বিংশ শতকের ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট ১৩টি উপন্যাস রচনা করেছেন। তারমধ্যে অন্যতম হল 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাস। 'চোখের বালি' উপন্যাসটি (১৩০৮-১৩০৯) 'বঙ্গদর্শন' -এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিশেষভাবে আমরা চারটি চরিত্র দেখতে পাই। মহেন্দ্র, আশালতা, বিহারী ও বিনোদিনী। বিনোদিনী বিধবা, মহেন্দ্র বিবাহিত, আশালতা বিবাহিতা স্ত্রী ও বিহারী অবিবাহিত। বালবিধবা বিনোদিনীর অন্তরে পুরুষের প্রতি অদম্য আকাঙ্খার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানা পোড়ন উপন্যাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অবচেতন সত্তার নিগুঢ় ইঙ্গিত, সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংঘাতের ফলে নারীর জীবন কোন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় প্রভৃতি বিষয়ের অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। 'চোখের বালি'র সমস্যাটি মহেন্দ্র বিনোদিনীর সম্পর্ক নিয়ে। তারাই উপন্যাসের মূখ্য নর-নারী। বাল্যবিধবা বিনোদিনীর চিত্ত পর-পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জায়গা এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহেন্দ্র ও আশালতার বিবাহের পর দুজনের প্রণয় মিলনে সংসারের কর্তব্য সবকিছুই ভুলে যায়। রাজলক্ষ্মী তা দেখে সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে নিজের কাছে পাবার জন্য এবং বউকে ছেলের কাছ থেকে দূর করার জন্য বিনোদিনীকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর কাছে প্রশ্রয় পেয়ে আশা এবং মহেন্দ্রের জীবনকে একেবারে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সে নিজের মায়া জ্বালে মাহেন্দ্রকে বশ করতে চায়। মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রেমে একেবারে উন্মাদ, অন্ধ হয়ে ঘর-সংসার, স্ত্রী-মাকে ছেড়ে বিনোদিনীকে নিয়ে পঠলভাঙায় যায়। অন্যদিকে, বিনোদিনীর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীকে লাভ করা। অবশেষে বিনোদিনী বুঝতে পেরেছিল এই সমাজ বিধবার প্রেম, বিধবার বিবাহ কখনো স্বীকার করবে না। তাইতো বিহারীর চাওয়া সত্ত্বেও বিনোদিনী বিহারীকে বিয়ে না করেই অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশি চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ বিধবার প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেননি আবার সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাইতো তিনি উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীকে কাশি যাত্রায় বিদায় দেন।

সূচক শব্দ-

উনবিংশ শতক, সমাজ, বিধবা প্রেম, উত্তরণ।

মূল প্রবন্ধ-

বাংলা সাহিত্য যখন বিশ্ব দরবারে প্রায় অবহেলিত, তখন বাংলা সাহিত্যে এক অম্লান আলোকের উৎস- রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "তোমার হাত দিয়া নিয়াছি অনেক এবং দিয়াছিও অনেক।"১ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রধানত রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগ বলে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর 'সন্ধ্যা- সঙ্গীত' (১৮৮২) থেকে' চৈতালী' (১৮৯৬) কাব্য, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪) থেকে 'মালিনী' (১৮৯৬) প্রভৃতি নাটক এবং বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও রাজর্ষি (১৮৮৭) উপন্যাস দুটি ১৯শ শতকের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। এর দ্বারাই তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতা ও গভীরতা সহজেই আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে। কিন্তু সেই সময় বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে অন্য কেউ সেখানে কোনও রকম ছায়াপাত করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর এক এই সময় থেকেই বাঙালি সাহিত্যিকদের উপর তাঁর প্রভাবের সূচনা শুরু হয়।

১২৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নতুন শিক্ষাদর্শের প্রবর্তন করলেও প্রথমে তাঁকেও গতানুগতিক পন্থায় শিক্ষাজীবন শুরু করতে হয়। প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ও পরে বেঙ্গল একাডেমী ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলেও তিনি কিছুদিন শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় জীবনের এই নিয়মানুবর্তিতায় এবং সীমাবদ্ধতায় তিনি কিছু- দিনের মধ্যেই ক্লান্তি অনুভব করলেন। তাঁর এই অস্বস্তিভাব দেখে তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হল এবং বাড়িতেই গৃহশিক্ষকদের অধীনে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। তিনি পিতার কাছে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ সতের বৎসর বয়সে সাগর- পারে যাত্রা করে ব্রাইটনের এক স্কুলে ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে আসেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাল্যকাল থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে। বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে আশি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ- নিবন্ধ ইত্যাদি লিখে বাংলা সাহিত্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছেন। ১২৮১ সনে 'তত্ত্বোধিনী' পত্রিকায় "দ্বাদশ বর্ষীয় বালক রচিত অভিলাস"২ কবিতাটি প্রকাশিত হয় কিন্তু কবিতাটিতে বালক কবির নাম ছিল না। তারপর তাঁর প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' ১৮৭৫ সালের হিন্দু- মেলায় পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র চিন্তাধারা বিচিত্রভাবে প্রকাশ করে যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাঁর কবিতা পাঠ করলেই আমরা তা বুঝতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, "আমার কাব্যের 'ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু জোগান নতুন পথ নেয়।..........কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এ তো স্বাভাবিক। এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না।"[৩]

এগার-বার বছর থেকে আঠারো-উনিশ বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্য অথবা কাব্যনাট্যের সংখ্যা যথেষ্ঠ। তাঁর প্রতিটি কাব্য-কবিতাই বাংলা সাহিত্যে এক নতুনত্বের সৃষ্টি করেছে। তাঁর কয়েকটি কাব্য-'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'মানসী' (১৮৯০); 'সোনার তরী' (১৮৯৩); 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১), 'বলাকা (১৯১৬), 'পরিশেষ' ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'শেষলেখা' (১৯৪১) ইত্যাদি।

গল্পকার ও নাট্যকার হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি রয়েছে। তাঁর রচিত ছোটগল্প সংকলন 'গল্পগুচ্ছ' এবং' নাটকের মধ্যে 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'রাজা' (১৯১০), মালিনী' (১৮৯৬) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে রূপক সাঙ্কেতিক নাটকে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। 'রাজা' থেকেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাঙ্কেতিক নাটকের শুরু।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে অনেক সময়ই লক্ষ্য করা যায় তা অতিমাত্রায় লীরিক প্রধান এবং কখনও কখনও বাস্তব পরিবেশ অতি রোমান্টিকতার শূণ্যলোকে প্রায় উধাও। কখনও সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কবির তত্ত্বকথা ও অনুভূতির বাহন হয়ে পড়ে। তবুও তাঁর নাটকে যে বৈচিত্রতা দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে তা বর্তমান পর্যন্ত পাওয়া বিরল। অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথে আসিয়া বাংলা নাটক তাহার পরিপূর্ণ আভিজাত্য এবং গৌরব লাভ করিল। নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে দেখা যায় নাই, এবং পরেও অনুসৃত হয়নি।"[৪]

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভা যে কতটুকু বিস্তৃত তা তাঁর গল্প-উপন্যাস আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাই। বাংলা উপন্যাসের বাঁক ফেরাতে ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে বঙ্কিমচন্দ্রের পরই রবীন্দ্রনাথের স্থান স্বীকৃত হবে। মাত্র ষোলো-সতেরো বছর বয়সে 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' (১৮৭৭- -৭৮) প্রকাশিত হয়। কিন্তু এতে তেমন পরিপক্কতা নেই বলে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তারপর প্রায় বাইশ বছর বয়সের সময় রবীন্দ্রনামের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই তিনি ক্রমে ক্রমে বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও সৃষ্টিশীলতার ওপর প্রত্যক্ষ অধিকার অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়- ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস, দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস, বৃহত্তর সমস্যাম্পলক উপন্যাস, মিস্টিক ও রোমান্টিক উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও বাংলা গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদিতে তাঁর সুনিপুণ সৃষ্টিশীলতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিয়ে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য চিরগৌরবান্বিত। ১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ বিশ্ববরেণ্য এই কবির দেহাবসান ঘটে। কিন্তু মৃত্যু শুধু কবিরই হয়, তাঁর সৃষ্টি শাশ্বত। তাঁর অমূল্য চিন্তারাজির উত্তরাধিকারী রূপে বাঙালি জাতি চিরদিনই গৌরব অনুভব করবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পকাঠামো ও শিল্পরীতি কিছু কিছু দিক দিয়ে আধুনিক ধারা বহন করলেও উপন্যাসকে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাতে প্রথাগত রীতিই মানা হয়েছে। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে পারিবারিক কাহিনির প্রতিই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং এই পন্থার সূত্রপাত করেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথম মহা- যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই ধারানুযায়ীই সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টি করা হয়েছে। তার অনেক পর গত তিন দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সামাজিক উপন্যাসের ধরণ বদলাতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ উপন্যাসই পারিবারিক কাহিনি বিশিষ্ট। 'শেষের কবিতা' এবং 'চার অধ্যায়' ছাড়া তাঁর উপন্যাসগুলি পারিবারিক গণ্ডি ছাড়াতে পারেনি। 'শেষের কবিতা'য় বর্ণিত হয়েছে পরিবার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা একটি একক নিঃসঙ্গ মেয়ের সঙ্গে কলকাতার পারিবারিক সংস্পর্শ থেকে বাইরে ছুটি কাটাতে আসা এক ব্যারিস্টার ও কবি যুবকের পার্বত্য পরিবেশে গড়ে উঠা এক মনোরম প্রেমের কাহিনি। কিন্তু তবুও এটি পরিবারের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হয়নি। অন্যদিকে, 'চার অধ্যায়' সামাজিকভাবে রাজনীতির কালপ্রবাহকে ধরতে চাওয়া সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির জটলায় পরিবার জীবনের দিকে মুখ ফেরাতে পারেনি। 'চার অধ্যায়-এর কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথ পরিবার বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে

রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পনাও কিছুটা 'শেষের কবিতা'র মতই, কিছু কিছু অংশে পারিবারিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের সঙ্গে জড়িত। মূল প্রসঙ্গে পারিবারিক আনুসঙ্গের তেমন যোগসূত্রতা না থাকলেও পার্শ্বিক অবস্থানে পরিবারই রয়েছে। তাই, এই উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে তথ্য পাওয়া গেছে যে 'চতুরঙ্গ' এবং 'শেষের কবিতা'র মূল আখ্যানে পরিবারবৃত্তের উপর নির্ভরশীল না হলেও পরিবার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রান্ত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের মোট দশটি সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সাতটি উপন্যাসই পারিবারিক ঘটনাবৃত্তে রচিত। কোথাও একটি আবার কোথাও একাধিক পরিবার রয়েছে। একটিমাত্র পরিবারের কাহিনি নিয়ে সৃষ্ট উপন্যাসগুলি 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'মালঞ্চ' এবং 'দুই বোন'।

এক পরিবারকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যে দুটি নভেলেট অর্থাৎ 'মালঞ্চ' এবং 'দুইবোন'কে পারিবারিক উপন্যাস বলা যায়। কেননা দুটি কাহিনিতেই প্রণয়-দ্বন্দ্বের রূপায়ণ ভঙ্গিমাগতভাবে এমন জায়গায় রয়েছে, যেখান থেকে বৃহত্তর সমাজ সমস্যার সঙ্গে প্রসঙ্গটি লিপ্ত করার কোন উপায় নেই। 'যোগাযোগ' এবং 'ঘরে বাইরে'র কাহিনি পরিবার বৃত্তে আবদ্ধ থেকেও বৃহত্তর সামাজিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

'চোখের বালি'র কাহিনি অন্য ধরণের। পরিবার প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্ব স্থান পেয়েছে যদিও প্রায়সমস্যা প্রধান উপন্যাসটির কাহিনি যেকোনো পরিস্থিতিতে পরিবারের গণ্ডি ভেঙ্গে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারতো। রাজলক্ষ্মী-মহেন্দ্র এবং আশার পারিবারিক সংঘাত থেকে এক সময় নিষিদ্ধ প্রেমের টানে কাহিনিটি সংসার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কিন্তু পারিবারিক সমাজনীতির মান রক্ষার্থেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনিটিকে জোরপূর্বক পারিবারিক গণ্ডিতেই ফিরিয়ে আনলেন। মা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, পরিবার এবং সেই পরিবারে আশ্রিত বিনোদিনী ইত্যাদি সম্পর্কগুলোর চারপাশে জমে ওঠা আবর্জনাকে পরিষ্কার করে পুরনো উজ্জ্বলতায় ফেরানো হল। এ গল্পের সমস্যা যদি ব্যভিচারী প্রেম বিষয়ক না হত তাহলে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত এটি একটি গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস হয়ে দাঁড়াত।

বিধবার প্রেম কাহিনিটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হওয়াতে কাহিনিটি পরিবার ভিত্তিক না হয়ে সমাজভিত্তিক হয়ে উঠেছে। বিধবার প্রেমে লক্ষবস্তু অপত্নীক যুবক হলে হয়ত সমাজ ততটা বিড়ম্বিত হয় না কিন্তু বিবাহিত পুরুষ লক্ষ্য হলে তা তাদের দাম্পত্য জীবনে আঘাত করে। দাম্পত্য থেকে পুরুষের অন্যগমনের চেয়ে নারীর অন্যগমনকে সমাজ অধিকতর বিষদৃষ্টিতে দেখে। অভিভাবকহীন অরক্ষিত বিধবারা পুরুষের অন্যগতির এক স্থায়ী ঠিকানা। কম বয়সী বিধবার অতৃপ্তিবোধ যেমন স্বাভাবিক, তেমনই স্বাভাবিক এই সামাজিক সম্পত্তিকে যথেচ্ছা ব্যবহার করার বিষয়টি। পুরনো সমাজে সমাজপতিরাই এ জাতীয় নারীদের ভুইতার পথে আকর্ষণ করতেন। 'চোখের বালি'র বিধবা প্রেম সমাজ সমস্যার গুরুত্বেই অনুধাবন যোগ্য। একই পরিবারে গৃহস্ত ও সেখানে আশ্রিতা নারীর একই সঙ্গে বিলীয়মান ঘটনা অবশ্যই সমাজের কাছে মুখরোচক। অন্তঃপুরে পোষিত অসামাজিক প্রণয় সম্পর্ক বিস্ফোরিত হলে তা কখনোই সমাজে স্বীকৃত নয়। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর পটল ডাঙায় বাসা করাটাই যথেষ্ট, সমাজ তারও অন্দরে চোখ মেলে দেখতে চায় তাদের শারীরিক সম্পর্ক সেখানে উপস্থিত কি না। রবীন্দ্রনাথ কাহিনিতে বিনোদিনীর শুচিতাকে আবৃত করে রাখলেও প্রকাশ্য সামাজিকতায় তার মান রক্ষা সম্ভব নয়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিষয়টি শেষপর্যন্ত সামাজিকতার মানেই শিল্পীর কাছে গ্রাহ্য হয়েছে। নিরপরাধিনী আশার বিষন্নতা সর্বদাই জেগে রয়েছে কাহিনির উপর। তার প্রতি আমাদের পক্ষপাত দোষী পাত্র-পাত্রীর উপর যে গ্লানিভাব চাপাতে থাকে, তাতে অপরাধের ওজন ক্রমশই বাড়তে থাকে কাহিনিটির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অপরাধী পাত্র-পাত্রীদের ঘরের বিচারকের (আশা ও রাজলক্ষ্মী) বিচারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সমাজনীতির এই দণ্ডাদেশ প্রমাণ করে দেয় যে এটি পরিবার ভিত্তিক হলেও শেষ পর্যন্ত' চোখের বালি' একটি সামাজিক উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে দুই ভিন্ন সামাজিকতার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। একদিকে যেমন বিধবার প্রেমকে নাগরিক সমাজ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে, অন্যদিকে তেমনই বারাসতের গ্রামীণ সমাজের দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘৃণনীয়। বিহারীর প্রত্যাখাত প্রেম নিয়ে বিনোদিনী যখন বারাসতে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে গেল, তখন সেখানে উদভ্রান্ত প্রেমিক মহেন্দ্রের অকস্মাৎ উপস্থিতি পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিষাক্ত করে তুলল। বিনোদিনীর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ীর ধিক্কারবাণীতে প্রকাশ হয়েছে সামাজিক উত্তেজনার তীব্র বহ্নিশ্বাস। তিনি মহেন্দ্রকে বলেন,

"মহেন্দ্র, তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার মা রাজলক্ষ্মী আমাদের গ্রামেরই মেয়ে, গ্রামসম্পর্কে আমি তাহার মামী। জিজ্ঞাসা করি, এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার স্ত্রী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া হইয়া, উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছ। ভদ্রসমাজে তুমি মুখ দেখাইবে কী বলিয়া।"[৫]

মহেন্দ্র নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি আরও বলেন, “যাইতে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না। আর এক মূহূর্ত ও দেরি করিয়ো না।”[৬]

বৃদ্ধা শুধু মহেন্দ্রকে বলেই থামেননি, তিনি বিনোদিনীকেও বললেন, “বাছা, এখানে তোমার থাকা হইবে না, তাহা বলিতেছি।.........তুমি এখনই যাও।"[৭]

বৃদ্ধার অভিপ্রায়টা এমন যে, যে দূষিত হাওয়া শহর থেকে এসেছে তা যেন গ্রাম্য পরিবেশকে নষ্ট না করে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ভোগোন্মত্ত নাগরিক সমাজ যে ব্যাপারে উদাসীন, গ্রাম কিন্তু সে ব্যাপারে সজাগ। তা না হলে, এত বড় দাম্পত্য বিস্ফোরণের ঘটনায় চাকর- বেহারাদের কোনও গোপন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম ও শহরের বিপরীত দিকগুলিকে যেভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা থেকে বলতে পারি যে 'চোখের বালি'তে সংসারেকে যত বড় ভাবেই দেখানো হোক না কেন, সমাজকে উপেক্ষা করার সামর্থ তার নেই। তাই সামাজিক উপন্যাস হিসেবে 'চোখের বালি' একটি অতি উন্নতমানের উপন্যাস।

'চোখের বালি'র সমস্যাটি মহেন্দ্র বিনোদিনীর সম্পর্ক নিয়ে। তারাই উপন্যাসের মূখ্য নর-নারী। ফলে এটিই উপন্যাসের মূল সমস্যা। বিনোদিনী বিধবা, মহেন্দ্র বিবাহিত। বাল্যবিধবা বিনোদিনীর চিত্ত পর-পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জায়গা এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহেন্দ্রের স্ত্রী আশালতা। মহেন্দ্র ও আশালতার বিবাহের পর দুজন প্রণয় মিলনে সংসারের কর্তব্য সবকিছুই ভুলে যায়। রাজলক্ষ্মী তা দেখে সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে নিজের কাছে পাবার জন্য এবং বউকে ছেলের কাছ থেকে দূর করার জন্য বিনোদিনীকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর কাজ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে আশা এবং মহেন্দ্রের জীবনকে একেবারে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সে নিজের মায়া জ্বালে মাহেন্দ্রকে বশ করতে চায়। মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর প্রেমে একেবারে উন্মাদ, অন্ধ হয়ে ঘর-সংসার, স্ত্রী মাকে ছেড়ে বিনোদিনীকে নিয়ে পঠলভাঙায় যায়। তখন কিন্তু বিনোদিনীর মহেন্দ্রকে আর ভালোলাগত না। সে মহেন্দ্রকে নিয়ে চলে যায় পশ্চিমে , কিন্তু তার লক্ষ্য হয়ে দাঁয়ায় মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীকে লাভ করা। এবং বিহারীকে অনুসন্ধান করতে হলে মহেন্দ্রকে একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল বিনোদিনীর।মহেন্দ্র চলে যাবার পর বিহারী বিনোদিনীর ঘরে প্রবেশ করে এবং সে বিনোদিনীকে অনেক খারাপ ভাবে, তখন বিনোদিনী বিহারীকে বলে যে সে বিহারীকে ভালোবাসে। তার পর যখন বিহারী বিনোদিনীকে বলে সে বিনোদিনীকে বিবাহ করতে চায়। তখন কিন্তু বিহারী চাইলেও ও বিনোদিনী ঠিক তেমনটা করেনি। কারণ সে জানতে পেরেছিল এই সমাজ বিধবার প্রেম, বিধবার বিবাহ কখনো স্বীকার করবে না। তাইতো বিহারীর চাওয়া সত্ত্বেও বিনোদিনী বিহারীকে বিয়ে না করেই অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশি চলে যায়।

উনবিংশ শতকের ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাল্য বিধবার প্রেমকে সহ্য করতে না পেরে তাকে বিষপান করিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছেন, না হয় গুলি করিয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিধবার বিবাহকে স্বীকার করতে পারেননি। তাইতো তিনি 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমা ও রমেশের প্রেমকে স্বীকার করেননি। তারা দুজন একজন অন্যজনকে ভালোবাসত। ভালোবাসাটা নিতান্তই ছেলেমানুষি ভালোবাসা। কিন্তু শেষে শরৎচন্দ্র রমা ও রমেশের বিয়ে দিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু সে যুগের পল্লীসমাজ তাদের প্রেমকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে বলেই উপন্যাসের শেষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রমাকে জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর সাথে কাশি যাত্রায় পাঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথও ঠিক তাই করেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিধবার প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেননি আবার সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাইতো তিনি উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীকে কাশি যাত্রায় বিদায় দেন।

পরিশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি ছিলেন। বিশেষত ভাবরসেই তাঁর আত্মার মুক্তি। ঔপন্যাসিকদের যে ধরণের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, গীতিকবিরা কিন্তু সে ধরণের নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন কলকাতার বাঙালি সমাজের নবজাগরণ এবং নতুন শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ ও জটিল মানুষের উদ্ভব হয়েছিল সেসব জিনিসকে বা বিষয়কে। রবীন্দ্রনাথ সেই নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত মানুষের সামাজিক জীবনসমস্যাকে গ্রহণ করলেন। 'চোখের বালি' তে তাঁর এসব বিষয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ'তে দেখতে পাই যে কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখেছিল যে নগেন্দ্র ও হীরার দ্বারা তার সর্বনাশ ঘটবে কিন্তু তাও সে তার প্রেমপিপাসা- কে তাড়াতে পারেনি। সর্বনাশের টানে মৃত্যু পর্যন্ত সে এগিয়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে সেভাবে তৈরী করেননি। সংসারের সঙ্গে নানা সম্পর্কে বাঁধা সেই সংসারেই তার বাসনা চরিতার্থ করার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীতে। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিনীকে পাপিষ্টের আসনে গড়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যে কুন্দনন্দিনীর মতো নিষ্পাপ পেলবতা না থাকলেই কোনো বিধবার আকাঙ্খা তাকে রোহিনী করে তোলে না।

সম্পূর্ণ উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করার পর দেখা যায়, উপন্যাসটি প্রধানত প্রেমবঞ্চিত হলেও প্রেমের দহনে দগ্ধ বিনোদিনীর হৃদয়ের তুষানুলের চিত্রই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

সূত্র নির্দেশ:

১/ আচার্য্য, দেবেশ কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), প্রকাশক: শ্রী শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ২০০৪, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা: ৪০২।

২/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রকাশক: মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৬, নতুন পুনর্বিন্যাস সংস্করণ: ২০১৬-২০১৭, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা: ৪১৭।

৩/ আচার্য্য, দেবেশ কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), প্রকাশক: শ্রী শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ২০০৪, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা: ১৯৭।

৪/ তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৭৭।

৫/ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চোখের বালি, প্রকাশক: শ্যামাপদ সরকার, কামিনী প্রকাশালয়, সপ্তম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা: ১০৮।

৬/ তদেব, পৃষ্ঠা: ১০৮।

৭/ তদেব, পৃষ্ঠা: ১০৮।

আকর গ্রন্থ:

১/ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : চোখের বালি, প্রকাশক: শ্যামাপদ সরকার, কামিনী প্রকাশালয়, সপ্তম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১/ আচার্য্য, দেবেশ কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), প্রকাশক: শ্রী শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ২০০৪, কলকাতা-৭০০০০৯।

২/ গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রকাশক: চিনময় মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ: ৮ আগস্ট, ২০০১, কলকাতা-৯।

৩/ চৌধুরী, শ্রী ভূদেব : বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৪/ দে, পিযূষ : বাণী বিচিত্রা, প্রকাশক: শ্রী হরিসাধন ভট্টাচার্য, বাণী প্রকাশনী, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ: ২০০৭-২০০৮, গুয়াহাটি-৭৮১০০১।

৫/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রকাশক: মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৬, নতুন পুনর্বিন্যাস সংস্করণ: ২০১৬-২০১৭, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৬/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : সমালোচনার কথা, প্রকাশক: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ: ২০১১-১২, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৭/ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত : রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, প্রকাশক: অসীম সরকার, তৃতীয় প্রকাশ: কলকাতা, বইমেলা, ২০১০, কলকাতা-৭০০০০৯।

৮/ বসু, রাজশেখর (সংকলিত) : চলন্তিকা (আধুনিক বঙ্গভাষা অভিধান), প্রকাশক: শমিত সরকার, নতুন সংস্করণ: ১৪২১, কলকাতা-৭৩।

৯/ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার: কালের প্রতিমা, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯, কলকাতা।

১০/ রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প, প্রকাশক: শ্রী সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

....

সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ , ডিফু গার্লস কলেজ, অসম

SAMSAPTAK
ISSN : 2454-4884
ESTD.- 2015
PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

যন্ত্রণা ও আত্মিক অবক্ষয়ের আলোকচিত্রঃ 'কেয়াপাতার নৌকো'

ধ্রুব মুন্সী

সারসংক্ষেপ-

সুর, প্রকৃতি, মানুষ একে অপরের পরিপূরক সত্তা। শব্দ তিনটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাংলার নদী, মাঠ, ক্ষেত এবং তার সঙ্গে মিশে থাকা মানুষের হাসি, গান, আনন্দ সম্প্রীতির চিত্র। সবকটি আজ যেন অতীত। অথচ স্মৃতির পাতায় ফিরে গেলে সব জীবন্ত প্রাণময়। এসব স্বপ্ন নয়, সত্যি। এটি সেই সময়ের কথা যখন আমাদের মূল ভূখণ্ড ছিল বাংলা। মানুষের সত্তা ছিল বৃহত্তর অর্থে দেশ ও জাতি কেন্দ্রিক। বদলে গেল সব। মানুষের চিত্ত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ। রাজনীতির গোলকধাঁধায় মানুষের বৃহত্তর বোধ, জাতি ও দেশগত আদর্শ, মানবতাবাদ সব অতীত। এর মূল কোথায় নিহিত? আমরা মূল আলোচনায় সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করব। দেশভাগ যেমন একদিকে যন্ত্রণা, আত্মিক অবক্ষয়, ব্যক্তি জীবনে নানা অভিঘাত ডেকে আনে অন্যদিকে তেমনি জাতির জীবনে নিয়ে আসে মহাসংকট। সাহিত্যিকরাও পারেনি এই সময়কে এড়িয়ে যেতে। বাঙালি জাতির এই চরম দুঃসময়ে ইতিহাসের দলিল স্বরূপ সেইসব সাহিত্য। আমরা তেমনি একটি সাহিত্যকে বেছে নিয়েছি দেশভাগের মূল স্বরূপকে তুলে ধরতে। মূল আলোচনায় আমরা প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটি অবলম্বনে দেশভাগ, রাজনীতি, ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা, দেশ ও জাতির মূল সমীকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

সূচক শব্দ-

প্রফুল্ল রায়, দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষ, জাতীয়তাবাদ, আত্মিক অবক্ষয়, কেয়াপাতার নৌকো।

মূল আলোচনা-

পৃথিবীতে যেদিন প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল সেদিন দেশ বলে কিছু ছিল না, ছিল শুধু ভূখণ্ড। মানুষ সেদিন ছিল আদিম আর বন্য। চাহিদা একটাই ছিল লড়াই করে বেঁচে থাকা। অবশ্য লড়াইটা কখনো প্রকৃতির সঙ্গে, কখনো বা জীবজন্তুর সঙ্গে। বাঁচার তাগিদেই মানুষ একদিন দলবদ্ধ আর গোষ্ঠীবদ্ধ হলো। এভাবেই দিন বদলালো, সময় বদলালো। আদিম মানুষ থেকে মানুষ আধুনিক মানুষে রূপায়িত হলো। সঙ্গে এল রাষ্ট্রভাবনা, দেশ গঠন। বস্তুত দেশ গঠিত হলো। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ বা রাষ্ট্র স্বার্থের উর্ধ্বে পৌঁছতে পারলো না। নিজেরাই নিজেদের ভাগ করে নিলাম। কখনো বর্ন, কখনো জাতি, কখনো ধর্মকে হাতিয়ার করে। যার ফলস্বরূপ আমরা যে শুধু দেশ ভাগ করলাম তা নয়, নিজেদেরকে টুকরোও করলাম। তাই মানুষের নির্মিত দেশভাগ শারীরিক- মানসিক পীড়নের কাল, যেখানে উগ্র সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেম ভয়ঙ্করভাবে দানা বিঁধেছিল।

বিগত শতাব্দীতে বাঙালির জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি মানবিক বিপর্যয়ের একটি হলো মানুষের ভাঙন, আরেকটি দেশবিভাগ। প্রথম বিপর্যয়ের জন্য ব্যক্তি বা সমষ্টির মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণটি জোরালো ছিল, আর দ্বিতীয় বিপর্যয়টি ঘটেছিল মূলত রাজনৈতিক কারণে, যার ব্যাপকতা ও গভীরতা এতই ভয়াবহ ছিল যে, উত্তর-প্রজন্ম এখনও সেই ক্ষত বহন করে চলেছে। সাম্প্রদায়িক সত্তার ভিত্তিতে ভৌগোলিক বিভাজন কোটি-কোটি মানুষকে শুধু ভিটেমাটি

ত্যাগেই বাধ্য করেনি, প্রাণ কেড়েছে, নিঃস্ব করেছে এবং অভিবাসী দেশে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছে। রাষ্ট্রের বৈধ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা নানা বৈষম্যের শিকার যেমন হন, তেমনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়। পারস্পরিক সন্দেহ, ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব তাদের সেই দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯৪৭ সালের সূচনালগ্নের সেই হত্যা-লুণ্ঠন-নির্যাতনের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারছে না উত্তর-প্রজন্ম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, ভারত থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন মেরুকরণ, সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব সংকট ও ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশবিরোধী দীর্ঘ গণ আন্দোলনের চাপ– সব মিলিয়ে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরেই ভাইসরয় ওয়াভেল ক্ষমতা হস্তান্তরের ইঙ্গিত দিলেন। তিন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন এসে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ও সংবিধান নিয়ে যে-প্রস্তাব দিলেন, কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউই তা পছন্দ করেনি। নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে তারা সম্মতি জানালেন বটে, কিন্তু বিরোধের বীজ নিহিত ছিল ওই প্রস্তাবের মাঝেই। কংগ্রেস-মুসলিম লীগ অনড় অবস্থানে চলে গেলে সংঘাতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় যে-ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার প্রভাবে নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গড় মুক্তেশ্বরে মুসলিমদের ওপর পৈশাচিক হামলা হয়। অক্টোবরে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ অন্যদের নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে যে-সরকার গঠন করল তা যে টিকবে না তা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকেই ব্রিটিশ সরকার বিকল্প ভাবতে শুরু করে। এক বছরের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি এসে তিন মাসের মধ্যে দেশভাগের ঘোষণা করে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে দেশটা গৃহযুদ্ধের দিকে চলে যাবে। বিভাজনের পক্ষে তাঁর সায় ছিল না, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উসকানি না থাকলে তিনি দেশভাগের মীমাংসায় রাজি হতেন না বলে পরবর্তীকালে নিজেই উলেখ করেছেন। অবশ্য এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু বাস্তবতা হল, এই মীমাংসা সেই সংঘাতকে এড়াতে পারেনি, বরং হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ-দখলদারি-বাস্তুত্যাগ সবমিলিয়ে ভয়াবহ এক মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত দাঙ্গার রক্ত ধুতে-ধুতে ভারতবাসী পেল এক দ্বিখণ্ড ভূখণ্ড। এই বিভাজনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল পাঞ্জাব আর বাংলা। এখানকার জনগণের ওপর তার প্রতিক্রিয়া ছিল বেদনাদায়ক ও সুদূরপ্রসারী।

সাহিত্য উঠে আসে সমাজ থেকে। সাহিত্য সামাজিক ঘটনারই বাঙ্ময় প্রকাশ। দেশভাগের এই বিরাট প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বহু সাহিত্য। আমরা এবার আমাদের আলোচ্য প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়াপাতার নৌকো’ উপন্যাসের আখ্যানভাগে প্রবেশ করব। উপন্যাসে দেশভাগের পূর্ববর্তী সময় ও জীবন এবং দেশভাগের পরবর্তী সময় ও জীবনের রূপরেখাটি চিত্রিত হয়েছে। কালের গতিতে বদলে যায় মানুষ, বদলে যায় জীবন, বদলে যায় ভাবনা। মূল কেন্দ্র থেকে সরে যায় মানুষ। কেউ বা হারিয়ে যায়, কেউবা অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে । উপন্যাসটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন সব চরিত্র যারা হারিয়ে যেতে যেতেও চেষ্টা করেছে বেঁচে ওঠার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা ও হাহাকার। উপন্যাসের তিনটি পর্ব যেন জীবনের তিন পর্বের সঙ্গে সমতুল্য।

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলিকে যদি ক্রমান্বয়ে সাজাতে বলা হয়, তাহলে প্রফুল্ল রায়ের নির্মিত ‘কেয়াপাতার নৌকো’ উপন্যাসটিকে দেশভাগের প্রথম সারির উপন্যাস হিসেবে নির্বাচন করতেই হয়। ‘কেয়াপাতার নৌকো’ উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিধৃত একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস । উপন্যাসটির প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। তবে ‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৮৬৮-৬৯ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পর্বের মতো উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্বও ‘অমৃত’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮-৬৯ সালে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একই সঙ্গে

গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যেহেতু গ্রন্থাগারে একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু উপন্যাসটির তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ অন্তিম পর্বে সময়ের ব্যবধান ছিল ৩২ বছর ১৯৬৯-২০০১ সাল। এই তৃতীয় পর্বটি শারদীয় বর্তমান পত্রিকায় ২০০১ ও ২০০২ সালে দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে লেখক নিজেই জবাবদিহি করে জানিয়েছেন—

> "দীর্ঘ ৩২ বছর পর দৈনিক বর্তমান পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক কাকলি চক্রবর্তী এবং তার সহকারী সাহানা নাগচৌধুরীর অফুরান আগ্রহ ও তাগিদে ২০০১ ও ২০০২ সালের শারদীয় বর্তমান পত্রিকায় কেয়াপাতার নৌকার শেষ পর্বটি লিখি। পরপর দু বছরে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব হিসেবে প্রকাশিত হলেও আসলে এটি তৃতীয় পর্বই এবং শেষ পর্বও। দুই অংশের প্রকাশকালের মধ্যে ছিল এক বছরের ব্যবধান। পাঠক যাতে খেই হারিয়ে না ফেলেন সেজন্য তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব এভাবে ভাগ করা হয়েছিল।"[১]

'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসের প্রথম পর্বে রয়েছে দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গের সমাজে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল, মানুষের জীবন জীবিকা, তাদের আচার-আচরণ, চিন্তাভাবনা এবং প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল— সেটাই উপন্যাসের প্রথম পর্বে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পূর্ববঙ্গের সমাজে হিন্দু-মুসলমান মানুষেরা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করত এবং সেখানে সম্প্রীতির বন্ধন ছিল বেশ দৃঢ়। কিন্তু দেশভাগের পরে সেই সম্প্রীতির বন্ধন আর অক্ষুণ্ণ থাকেনি। কারণ ধর্মীয় কারণে দেশভাগের ফলে বাঙালিকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। দেশভাগের ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্মিত বাঙালির সম্প্রীতি রাতারাতি বিদ্বেষ, হিংসায় পরিণত হয়। ৪৬ এর দাঙ্গার প্রভাব হিন্দু-মুসলমানকে যেমন অসহিষ্ণু করে তুলেছিল, তেমনি তাদের মধ্যে ধর্মান্ধতাও জাগিয়ে তুলেছিল। তাছাড়া পূর্ব বাংলার বুকে যে অস্থির সমাজ ব্যবস্থার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার ছবি ধরা পড়েছিল, পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনে যে কাল রাত্রি নেমে এসেছিল তারই নিখুঁত আলোকচিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কেয়াপাতার নৌকো'র দ্বিতীয় পর্বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব রাজদিয়ার মতো শান্ত শহরের মানুষের জীবনেও পরেছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতায় রাজদিয়া মানুষের শান্তি কীভাবে বিঘ্নিত হয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল, তা লেখক প্রফুল্ল রায় ঘটনার বর্ণনাক্রমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখি অবনীমোহনের পূর্ব বাংলার সৌন্দর্য মুগ্ধতার অবসান, ও ব্যর্থতার কাহিনি। গিরিগঞ্জের হাটে ধান চালের অভাব দেখা দেয়। নদীর পাড় ঘেঁষে থাকা সারি সারি আড়তগুলো তালাবদ্ধ। সারা রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য লোপাট হয়ে যায়। যুদ্ধের প্রকোপ থেকে রাজদিয়াও রক্ষা পায় না। ব্রিটিশ সেনাদের সামরিক আস্তানা তৈরি হয়। চোরা বাজার, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি পূর্ব বাংলার গ্রাম জীবনকে নষ্ট করে দেয়। সময়ের সাথে সাথে ঘটনার প্রবাহমানতাও এগিয়ে চলে। সুধার সঙ্গে হিরণের এবং সুনীতির সঙ্গে আনন্দের বিয়ে হয়ে যায়। অবনীমোহন ধান চাষ শুরু করেন। কলকাতা থেকে অবনীমোহনের নিয়ে আসা সংবাদপত্র থেকে হেমনাথ জানতে পারেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা। একদিকে ইতালি, জার্মানি অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স। হিটলার, মুসোলিনি, চেম্বারলেন, চার্চিল, রাশিয়া, জার্মানির মিত্রতা হিটলারের সঙ্গে মলোটভের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

যুদ্ধের আগে শান্ত মফস্বল শহর হিসেবে পরিচিত ছিল রাজদিয়া শহর। কিন্তু যুদ্ধের প্রভাবে হঠাৎ করে রাজদিয়া শহরের পরিবর্তন ঘটে গেল। যে শহরে আগে ইলেকট্রিকের কোনও ব্যবস্থায় ছিল না, সেই শহরে মিলিটারি ক্যাম বসার দরুন রাতারাতি ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা হয়ে গেল। তবে সাধারণ মানুষের জন্য সেই ব্যবস্থা ছিল না, সেটা শুধুমাত্র মিলিটারিদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। এমনকি ক্যাম্পের কাছে অনেকগুলো চায়ের দোকান বসতে শুরু করল।

তাছাড়া রাজদিয়ার মেয়েরা বিদেশি মিলিটারিদের লোলুপ দৃষ্টির ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরোতে সাহস পেত না। যুদ্ধের ভয়াবহতায় মানুষের জীবনে অন্ন জোটানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। কারণ পণ্য সামগ্রীর দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া। চাল, ডাল, বস্ত্র প্রভৃতি পণ্য সামগ্রীতে কালোবাজারি দেখা দিতে শুরু করেছিল। রেশন দোকানের মালিকেরা বাইরে চড়া দামে জিনিসপত্র বিক্রি করে দেয় সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে। ফলস্বরপ নিরন্ন সাধারণ মানুষের জীবনে অভাবের যন্ত্রণা দেখা দিতে শুরু করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং জাপানি বোমার ভয়ে অনেক বাঙালি বার্মা থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে আসতে থাকে । এইরকম এক বাঙালি হলেন রাজদিয়ার ত্রৈলোক্য সেন, যিনি জীবনের ত্রিশটা বছর বার্মায় কাটিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা তাকেও বার্মা ত্যাগ করতে পূর্ব বাংলায় ফিরে আসতে বাধ্য করেছিল। যুদ্ধের প্রভাবে বাঙালি জনমানসে সততা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। টাকার লোভে নিত্য দাসের মতো ব্যবসায়ীরা হেমনাথবাবুর নিষেধ অমান্য করে মদের দোকান দিয়ে রাজদিয়ার সংস্কৃতিকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। কেরোসিনের কালোবাজারির ফলে সমগ্র রাজদিয়াই কেরোসিনের সংকট দেখা দিতে শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ ছেলেমেয়েদের পক্ষে রাতে পড়াশোনা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় অনাহারে সাধারণ মানুষের দিন যাপন করছিল। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

> "আজকাল সমস্ত রাজদিয়া জুড়ে দিনরাত শুধু শোনা যায়, মা জননী, দু'গা ভাত দ্যান, ইট্টু ফ্যান দ্যান। না খাইয়া খাইয়া শরীলে আর দ্যায় না। রাস্তায় বেরুলেই চোখে পড়ে কঙ্কালসার প্রেতের মতো দলে দলে মানুষ দুর্বল, অশক্ত পায়ে টলমল করে হাঁটছে। এক দুয়ার থেকে তাড়া খেয়ে যাচ্ছে আরেক দুয়ারে।"[২]

যুদ্ধের প্রভাবে ভূমিহীন চাষিরা কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়ায় হওয়ায় ভূমি নিরন্ন চাষিদের কচু, শাপলা শালুক সেদ্ধ করে খেতে হয়েছে। এমনকি খিদের তাড়নায় এদের ইঁদুর, খরগোশ পুড়িয়ে খেতে হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় সমগ্র রাজদিয়া জুড়ে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দিয়েছে। নিদারুণ অর্থ সংকট এবং দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সমগ্র পূর্ব বাংলায় খাদ্যশস্য লোপাট হয়ে যাচ্ছিল। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। তবে ১৯৪৫ সালে এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ আমেরিকা তথা মিত্র পক্ষের জয়লাভ হয়। যুদ্ধ শেষে বিদেশি সৈন্যরা রাজদিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে যুদ্ধের অবসান হলেও, যুদ্ধের উত্তাপ ও ভয়াবহতায় রাজদিয়ার মানুষের মনে এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা গ্রাস করেছিল। উপন্যাসের প্রথম পর্বে হেমনাথবাবুর বাড়িতে সর্বদা যেখানে হাসি, আনন্দ, শান্তি বিরাজমান ছিল, সেই বাড়িতে আজ শূন্যতা বিরাজ করছে। এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

> "একদিন এই বাড়িটা ঘিরে সব সময় যেন উৎসব লেগে থাকত। হিরণ আসত, আনন্দ অসত, রুমা- ঝুমারা আসত। জাপানি বোমার ভয়ে সারাদেশে পালিয়ে এসেছিল, তারা আসত। গান-বাজনা নাটক এবং হুল্লোড়ে বাড়িটা গমগম করত। ভরা কোটালের পর প্রবল ভাঁটার টানে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাড়িটা আজকাল আশ্চর্য নিঝুম। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধুই শূন্যতা ।"[৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শেষ হতে না হতেই ১৯৪৬ সালে বাংলার বুকে হিন্দু-মুসলমানদের জীবনে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিঘাত নেমে আসে । ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে এক কালো দিন হিসেবে বিবেচিত। কারণ ওই দিন মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা হয়। কলকাতা, বিহার, যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে এবং সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। দাঙ্গার প্রভাবে রাতারাতি হিন্দু-

মুসলমান একে অপরের শত্রু হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেখানে হয়েছিল, সেখানে ভয়ংকর নারকীয় হত্যা লীলা চলেছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

> "ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট ইতিহাসের এক অন্ধকার দিন। সারা দেশ জুড়ে আত্মঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। কোথায় কলকাতা, কোথায় বিহার, কোথায় নোয়াখালি—সমস্ত ভারতবর্ষ রক্তের সমুদ্র হয়ে দুলতে লাগল। কে বলবে মাত্র ক'দিন আগে নৌ বিদ্রোহ ঘটে গেছে, কে বলবে রশিদ আলি ডে কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ সেদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছিল। খবরের কাগজ খুললে এখন শুধু আগুন হত্যা ধর্ষণ। ভারত বর্ষ যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোর বর্বর যুগের কোনও আদিম অন্ধকারে ফিরে গেছে।"[৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। যেমন রাজদিয়ার সমস্ত হিন্দু-মুসলমান হেমনাথবাবুকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা, ভক্তি করতো। তাদের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা দিলেই হেমনাথবাবু তৎক্ষণাৎ সেই বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে অটুট ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ৪৬ এর দাঙ্গা তাদের মধ্যে এক প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছিল। মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করল। ঢাকা শহরের রক্ষণশীল মৌলবাদী কিছু মুসলমান নেতারা সমাজের বিভিন্ন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন অপ্রীতিকর বক্তব্য রাখতে থাকেন। সমাজের এইসব মৌলবাদী নেতারা বলতে থাকেন যে, হিন্দু হল তাদের প্রধান শত্রু। ফলস্বরূপ সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনে অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করল। আবার উল্টোদিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিশ্বাসী কিছু নেতারা সাধারণ মানুষদের দেশ বিভাগ না হওয়ার জন্য কাতর আবেদন জানান। উপন্যাসে রাজদিয়ার উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোতাহার হোসেন সাহেব, হেমনাথ মিত্র- যারা গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমানকে একসঙ্গে থাকার কথা বলেন এবং দেশভাগ হলে মানুষের জীবনে কি কি সমস্যা হতে পারে তা তাদের সামনে তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

"আজকাল রোজই হয় মুসলিম লিগ, না হয় কংগ্রেস রাজদিয়ায় মিটিং করছে। মিটিং-এর পর দু'দলই মিছিল বার করে।

সবুজ পতাকা উড়িয়ে লিগের সমর্থকরা স্লোগান দেয়:

লড়কে লেঙ্গে—'
'পাকিস্তান।'
'কায়েদে আজম—'
'জিন্দাবাদ।'
কংগ্রেসের মিটিংয়ে মোতাহার হোসেন সাহেব আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেন,

আমরা হিন্দু-মুসলমান যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করছি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ দেশকে কোনও দিনই ভাগ করতে দেওয়া হবে না। এক বছর, দু'বছর, দশ হাজার বছর পরও এ দেশ একই থাকবে।

সারা দেশ যখন অস্থির উন্মাদ, তখন মোতাহার সাহেবের কথা কার কানে ঢুকবে? দেশজোড়া উন্মত্তরা জল বাংলার এই স্নিগ্ধ শ্যামল ভুবনেও একদিন রক্তের সমুদ্রকে টেনে নিয়ে এল।'"[৫]

দেশভাগের উত্তাপ, ভয়াবহতা মানুষকে এতটাই আতঙ্কিত করে তোলে যে মানুষ নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আসলে দাঙ্গা এবং দেশভাগ মানুষের জীবনের সুখ এবং শান্তি দুটোই কেড়ে নিয়েছিল । উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই মাতৃহারা বিনু আর পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে চায় না। তাছাড়া বিনুর দুই দিদি বিয়ের পর কলকাতায় চলে গিয়েছিল। এমনকি বাবা অবনীমোহনও কলকাতায় থাকেন। তাই বিনুও সিদ্ধান্ত নেয় সেও কলকাতায় ফিরে যাবেন। তাই বিনু দাদু হেমনাথবাবুকে নিজের বাড়িঘর জমিজমা বিক্রি করে কলকাতায় যাওয়ার কথা বললে হেমনাথবাবু কিছুতেই রাজি হননি। তবে কিছুদিন পর দেখা যায় হেমনাথবাবু কিছু কারণবশত বিনু ও ঝিনুককে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। আবার ঝিনুকের মা মারা যাওয়ার আগে ঝিনুককে শেষ দেখার দেখতে চেয়েছিল। সেইজন্য ভবতোষ ঝিনুককে নিয়ে যায় ঢাকায় তার মায়ের কাছে। কিন্তু পথে তারা একদল দাঙ্গাবাজের কবলে পড়ে যায়। ভবতোষকে ঘাতকের দল হত্যা করে মেরে ফেলে। আর ঝিনুককে গণধর্ষণ করে। অনুসন্ধানরত ঝিনুককে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয় । কিন্তু এ কোন ঝিনুক? রক্তাক্ত শরীর, স্থির চোখের দৃষ্টি, উদ্ভ্রান্ত অবস্থা। কোনো এক রাক্ষস তার শরীরের সার শুষে নিয়েছে যেন। তবে ঝিনুককে পাওয়া গেলেও তার মন থেকে কিন্তু আতঙ্ক দূর করা যায়নি। তাই হেমনাথ বাবু সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব পাকিস্তানে ঝিনুক থাকলে ঝিনুকের মন থেকে আতঙ্ক দূর করা যাবে না। তাই ঝিনুককে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিনু ধর্ষিতা ঝিনুককে নিয়ে ফিরে আসে কলকাতায়।

উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে আছে দেশভাগের সৌজন্যে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হলে সেখানকার হিন্দুদের জীবনে যে নিদারুণ বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার বর্ণনা। মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর একশ্রেণীর মুসলমানরা ভাবতে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান কেবলমাত্র তাদের। এখানে হিন্দুদের থাকার কোন জায়গা নেই, নেই কোনও অধিকার । তাই তারা দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে। মুসলমানদের অত্যাচারের অভিঘাতে হিন্দুরা রাতের অন্ধকারে ভারতে আসতে শুরু করে। এইসব হিন্দুরা ত্রিপুরা, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে শুরু করে। শুধুমাত্র যে বিনুরাই তাদের সর্বস্ব হারিয়ে দেশত্যাগ করেছে তা এমনটা নয়, হাজার হাজার হিন্দুরা সর্বস্ব হারিয়ে রাতের অন্ধকারে নৌকায় করে দেশত্যাগ করেছে।এর পর বিনু ঝিনুককে নিয়ে রাজেক ও তমিজ মাঝির নৌকায় উঠে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাদের নৌকা রাজদিয়া থেকে তারপাশা স্টিমার ঘাটে যাবে। তারপাশা থেকে তারা স্টিমারে যাবে গোয়ালন্দে। এরপর গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে বর্ডার পার হয়ে কলকাতায় পৌঁছবে। পথে যেতে যেতে বিনুর মনে একটাই ভয় কাজ করছিল তারা যেন কোনো হার্মাদবাহিনীর হাতে না পড়ে। এমনিতেই তাদের নৌকা রাতের অন্ধকার ভেদ করে গন্তব্যের দিকে চলছিল। পথে বিপদ কখন জানান দিয়ে আসে তা কেউ বলতে পারে না। এইরকম বিপদের আভাস পেয়েছিল বিনুরা। নৌকায় হালকা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল। সেই আলো দেখে হার্মাদবাহিনীরা বিনুদের নৌকা লক্ষ্য করে মশাল জ্বালিয়ে চিৎকার করে তীব্র বেগে ছুটে আসছিল। তবে নৌকায় ছিল দক্ষ রাজেক মাঝি। সে বিপদের আভাস টের পেয়েছে দেখেই নৌকার গতিমুখ পাড়ের দিকে করে নৌকা থেকে নেমে তারা তিনশো হাত দূরে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। এদিকে হার্মাদবাহিনী নদীর পাড়ে এসে তাদের খুঁজতে থাকে। হার্মাদবাহিনীকে দেখে ঝিনুক যাতে চিৎকার না করে, তার জন্য বিনু তার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে। অন্ধকারের বেতের ঘন জঙ্গল থেকে বিনুরা হার্মাদ বাহিনীকে দেখতে পাচ্ছিল। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে বিনু ও ঝিনুক সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল। ঝিনুক শঙ্কিত মনে ভেবেছিল, হার্মাদ বাহিনীরা যদি তাদের খুঁজে পায় তাহলে তাদের পরিণতি মৃত্যু। কিন্তু ঝিনুকের সৌভাগ্য যে, হার্মাদ বাহিনীরা তাদের খুঁজে পায়নি। তবে হার্মাদ বাহিনীরা ঝিনুকদের খুঁজে পায়নি ঠিকই, কিন্তু ফেরার সময় তাদের নৌকা নিয়ে তারা চলে যায়। নৌকাতে তাদের আসবাবপত্র খাওয়ার সরঞ্জাম সবকিছুই ছিল। কিন্তু নৌকা নিয়ে চলে যাওয়ায় তারা ক্লান্ত ক্ষুদার্থ বিধ্বস্ত এবং বিষন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই তারা ভেবে পায় না কীভাবে তারপাশায় পৌঁছবে। অবশেষে কোন উপায় বের করতে না পেরে সেই রাতেই রাজেক, তমিজ, বিনু ও ঝিনুক সেই ঝোপের মধ্যে মশার কামড় খেয়ে

রাত কাটিয়ে দেয়। পরের দিন সকালে তাদের সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আফজল হোসেনের সাক্ষাৎ হয়। বিনুরা ঘটনার বিবরণ জানিয়ে তার কাছে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। কারণ সেখানকার অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> "কিন্তু এইখানে বিশখান গেরাম চৈদ্দ পনর দিন ধইরা জবর গরম হইয়া আছে। খুন হইছে, ঘরে আগুন লাগছে। মেলা (অনেক) মানুষ দ্যাশের ভিটামাটি ছাইড়া কলইকাতা না আসাম, কুন দিকে জানি চইলা গ্যাছে। এই অবোস্থায় (অবস্থায়)—"[৬]

আফজল হোসেনের কথা বিনুর বুঝতে খুব একটা সময় লাগে না। আসলে মামুদপুরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। এই অবস্থায় মুসলমানরা যদি জানতে পারে তিনি হিন্দুদের উপকার করছেন, তাহলে সবাই তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে আফজল হোসেন বিনুকে বলেন—

> "আমি যদি আপনেগো লেইগা কিছু করতে যাই, তাফালে (ঝামেলায়) পইড়া যামু। মানুষ আর অহন মানুষ নাই। হগল সোময় তাগো মাথায় খুন চইড়া থাকে। অগো গুসা (ওদের রাগ) আইসা পড়ব আমার উপর।"[৭]

সমস্ত মানুষের ভেতরে বিবেক বিরাজমান থাকে। আফজল হোসেনের মধ্যেও তা ছিল। তাই তার মনে হয়েছিল এই দুঃসময়ে বিনুদের যদি তিনি সাহায্য না করেন, তাহলে আল্লাহ বা ঈশ্বর কোনোদিনই তাকে ক্ষমা করবেন না। তাই সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে তিনি বলেন—

> "যা হওনের হইব, আপনেগো লেইগা কিছু কিছু এট্টা না করলে মনে লয় গুনা (পাপ) লাগব। আল্লায় আমাকে মাফ করব না।"[৮]

আফজল হোসেন বিনু ঝিনুকের জীবনে ঈশ্বরের দেবদূত রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিনু ঝিনুককে গোয়ালন্দ স্টিমারের পৌঁছে দিতে গেলে তাকেও সঙ্গে করে যেতে হবে। সেইজন্য তিনি হামিদ মাঝির নৌকায় বিনুদেরকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালন্দ স্টিমারের দিকে রওনা দেন। তবে পথে যেতে যেতে হার্মাদ বাহিনীর মুখোমুখি হতে হয় তাদের। আফজল হোসেনকে হার্মাদ বাহিনীর নানা রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এরপর আফজল হোসেন হার্মাদ বাহিনীদের মনের সন্দেহ দূর করলে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলে। বিনুরা সকাল-সকাল তারপাশা স্টিমার ঘাটে এসে পৌঁছায়। এখান থেকে তারা গোয়ালন্দ স্টিমারে করে যাবে। কিন্তু গোয়ালন্দ স্টিমারে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে যাওয়ার জন্য। তাই দাঁড়াবার জায়গা নেই। তাই লেখক প্রফুল্ল রায় গোয়ালন্দ স্টিমারের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষদের বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে—

> "একটু পর সড়কে উঠে আসতেই চোখে পড়ল, গ্রামের দিক থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। পুরুষদের মাথায় টিনের বাক্স, পার্টি কি সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা, হাতে গাঁটরি বোঁচকা। সধবা বউদের এক কাঁকালে বাচ্চা, কাঁধে পোঁটলাপুঁটলি। যে বাচ্চাগুলো একটু বড়, তারাও ছোটখাট কিছু না কিছু হাতে ঝুলিয়ে আসছে। মানুষের যে মহাযাত্রা স্টিমার ঘাটের দিকে চলেছে তারা কারা, কী তাদের পরিচয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না। এইসব নানা বয়সের মানুষ—বুড়ো আধবুড়ো কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী বাচ্চাকাচ্চাদের চোখে মুখে অসীম ক্লান্তি আর আতঙ্কের ছাপ। মনে হয়, অনেক দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে তারা আসছে।"[৯]

SAMSAPTAK PEER REVIEWED JOURNAL ESTD-2015

স্টিমার ঘাটে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে বিনুরা অসহায় বোধ করে। তারা ভেবে পায় না কীভাবে তারা স্টিমারে উঠবে। তবে সেইসময় স্টিমার ঘাটে হরিন্দরের সঙ্গে বিনুর সাক্ষাৎ হয়। সে বিনুকে জানায় দুই দিন আগে তারপাশায় এসেও সে স্টিমারে উঠতে পারেনি। তবে দেশভাগের উত্তাপের বিপর্যয়, ঘাটে উদ্বাস্তু মানুষের জনসমাগম এবং স্টিমারে উঠতে পারা বা না পারার দোলাচলতা তাঁকে হতাশ করলেও মানসিক দিক দিয়ে সে আশাবাদী ছিলেন। ইন্ডিয়াতে পরিবার পরিজন না থাকলেও সে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য একটি কাজ যে জোগাড় করতে পারবে সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। তাই হরিন্দরের মনে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে এইরকম প্রতিদিন দুশ্চিন্তা নিয়ে একজন মানুষ কখনোই সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারেনা। তাই সে বিনুকে বলে—

> "ভিটা ছাইড়া যহন আসছি, পিছের দিকে আর তাকামু না। দ্যাশের লগে সমপক্ক চুইকা (চুকে) গ্যাছে ছুটো বাবু,... ইন্ডিয়ায় একবার যাইতে পারলে বাইচা থাকনের এট্টা না এট্টা বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যাইব।... ইন্ডিয়ায় গিয়া যদিন মরতেও হয়, তাও সই। দিন রাইত বুকের ভিতরে ডর লইয়া এইখানে থাকন যায় না।"[১০]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বহু ছিন্নমূল পরিবারের মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পথেই জীবনধারণ করছিল। আবার কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। আসলে দেশভাগ যদি না হতো তাহলে এইসব স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কখনোই বৃদ্ধি পেত না। উপন্যাসে নির্মিত নিত্য দাস এইরকমই একটি চরিত্র। পূর্ববঙ্গে থাকার সময় সে চাল, ডাল, নুন, তেলের ব্যবসা করত। কিন্তু দেশভাগের পর ইন্ডিয়ায় এসে সে এখন ব্যাঙ্ক থেকে লোন তুলে গড়িয়াহাটে জামা কাপড়ের ব্যবসা করছে। কসবাতে একটা পুরনো বাড়িও কিনেছে। তাঁর জীবনে নেই কোন সমস্যা, নেই কোন অস্থিরতা। সে মনে মনে ভেবেই নিয়েছে যে তাকে আর পূর্ববঙ্গে যেতে হবে না, এখানে বসেই সে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। তবে দেশভাগের ফলে শুধু যে নিত্য দাসের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, তাঁর মতন অনেক মানুষেরাও সেই সময় অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

> "পার্টিশন কত মানুষকে শেষ করে দিয়েছে, আবার নিত্য দাসের মতো লোকেদের সামনে টাকা করার কী সুবর্ণ সুযোগই না এনে দিয়েছে।"[১১]

স্টিমারে যেতে যেতে বিনুর সঙ্গে পরিচয় হয় অধর ভুঁইমালী নামে এক কৃষকের। লোকটির এক পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। লোকটি বিনুকে জানায় দাঙ্গাবাজদের কবলে পড়ে বল্লমে তার এক পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে লোকটির মধ্যে চূড়ান্ত এক আশা বিদ্যমান ছিল। সে বিশ্বাস করে একদিন এই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্রোহ, অশান্তির অবসান ঘটবে, এবং পূর্ববঙ্গে তারা আবার ফিরে যেতে পারবে, সেই সঙ্গে নিজেদের ভিটেমাটি এবং জমিজমাও ফেরত পাবে। তবে এই আশা শুধুমাত্র যে ভুঁইমালীর মতো কৃষকের ছিল তা নয়, এই আশা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত সমস্ত ছিন্নমূল মানুষের ছিল। দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষের জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে এসেছিল ঠিক তেমনি নিদারুণ যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়েছিল। তবে সে যন্ত্রনা যে শুধুমাত্র নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার জন্য তা নয়, পরিবার, পরিজন, স্ত্রী, সন্তানকে ছেড়ে আসারও যন্ত্রণা। সেই সত্যের অনুসন্ধানকে ইতিহাসের পাতায় ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় তৃতীয় পর্বে আধৃত করেছেন।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আমরা বাংলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পাই। হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাকা ঐক্যবদ্ধ বাংলা এবং পরবর্তীতে সম্প্রীতি হারিয়ে অস্তিত্বের সন্ধানে রত মানুষ। দেশভাগের যন্ত্রণা যে কতটা গভীরে প্রোথিত তা চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। বিনুর সংকট শুধু বিনুর একার নয়, দেশভাগের কুফলে হারিয়ে যায় ঝিনুকের মত মেয়েরাও সংকটে জর্জরিত । আজও আমরা মুখে সম্প্রীতির কথা বললেও আসল চিত্রটা অন্যরকম। হিন্দু মুসলমান

অসম্প্রীতি দেশভাগেরই ফসল। রাজনৈতিক নেতারা তাৎক্ষণিক পদমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যতার কথা মাথায় রেখে দেশভাগে রাজি হলেও পরবর্তী জীবনের কথা তারা ভাবেনি। যার ফল আমরা আজও ভোগ করে চলেছি। আমাদের আজ প্রয়োজন শুভ বোধের, ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে মিলিত প্রচেষ্টার। উপন্যাসের প্রথম পর্বে বর্ণিত জীবনের রূপ আমরা যদি খুঁজে পায়, তাহলে সত্য ভারতকে গঠন করতে পারবো।

তথ্যসূত্রঃ-

১। ড. প্রভাস কুমার রায়, প্রফুল্ল রায়ের কথা সাহিত্যে দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ১০০

২। প্রফুল্ল রায়, কেয়া পাতার নৌকো, দ্বিতীয় পর্ব, অখন্ড সংস্করণ, ২০০৪, করুনা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৩৭২

৩। তদেব, পৃ. ৩৯২

৪। তদেব, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭

৫। ড. প্রভাস কুমার রায়, প্রফুল্ল রায়ের কথা সাহিত্যে দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৮৬-৮৭

৬। প্রফুল্ল রায়, কেয়া পাতার নৌকো, অখন্ড সংস্করণ, ২০০৪, করুনা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ৪৩১

৭। তদেব, পৃ. ৪৩১

৮। তদেব, পৃ. ৪৩১

৯। তদেব, পৃ. ৪৫১

১০। তদেব, পৃ. ৪৫৭

১১। তদেব, পৃ. ৫৬৪

গ্রন্থঋণঃ

১। ওদুদ কাজী আবদুল, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৪০৮

২। কুন্ডু ড. চন্দনকুমার, ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ: বাংলা উপন্যাসের দর্পণে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

৩। কামাল আহমদ মোস্তফা, বাংলা গল্পের উত্তরাধিকার, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪

৪। ঘোষ সেমন্তী (সম্পাদনা), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ২০০৮

৫। চক্রবর্তী অমিতাভ, সাম্প্রদায়িকতা উৎস ও প্রসার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৩

৬। চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৩

৭। বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, দেশভাগ দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪

৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০১

৯। রায় ড. প্রভাস কুমার, প্রফুল্ল রায়ের কথা সাহিত্যে দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

১০। সরকার তারক, বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

....

লেখক পরিচিতিঃ জন্ম মালদায়। ২০১০ সালে চাঁচল কলেজ থেকে বাংলায় সম্মানিত স্নাতক ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১২ সালে স্নাতকোত্তর এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৭ সালে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২২ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে চলেছেন। ভালো লাগার বিষয় উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভাষা এবং দর্শন।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সংস্কৃতির বাহকরূপে আড্ডা

পায়েল দত্ত

সারসংক্ষেপ -

সামাজবদ্ধ হয়ে থাকা এবং অন্যের সাহচর্য কামনা করাই হল মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার তাগিদে এই স্বাভাবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে, যা মানব সমাজকে ক্লান্তি ও কর্মের প্রতি অনীহা এনে দিয়েছে। এই কর্মব্যস্ততা থেকে রেহাই পেতে ও সামান্য মুক্তির স্বাদ পেতে তারা বেছে নিয়েছে আড্ডার ক্ষেত্র। এই আড্ডাই সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির সাথে নৈতিক মূল্যবোধের ধারণাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সংস্কৃতি পরিবর্তিত হওয়ায় নৈতিক মূল্যবোধেরও অবক্ষয় হচ্ছে ও সংকীর্ণ মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে ক্রমশ হতাশাগ্রস্থ হচ্ছে বর্তমান যুবসমাজ। আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল বিবর্তিত এই সমাজব্যবস্থায় আড্ডার ধারণা কিভাবে এবং কেন পরিবর্তন হল এবং এই পরিবর্তন কিভাবে সংস্কৃতির ও নৈতিকতার পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করল তা আলোচনা করা। প্রাচীন ও বর্তমান সমাজের আড্ডার স্বরূপ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবনের অগ্রগতির পথে 'নির্ভেজাল আড্ডা' ক্রিয়াটি কতটা প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

মূলশব্দ-

নির্ভেজাল আড্ডা, তরুণ সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা, প্রাচীন আড্ডা, তরুণ সমাজের আড্ডা, চা এর আড্ডা, আড্ডার প্রকারভেদ।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

মূল প্রবন্ধ-

আড্ডা হল সংস্কৃতির (Culture) বাহক।'Culture' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'কৃষ্টি'। রবীন্দ্রনাথ যদিও শব্দটিকে 'সংস্কৃতি' অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রকৃতি নিয়ে নানা মত পরিলক্ষিত হয়। বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দটি সংস্কার বা মার্জনা এরূপ অর্থ থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সংস্কৃতি হল এমন বিষয় যা ব্যক্তি তার শিক্ষাদীক্ষা ও চর্চার দ্বারা যে উন্নত বুদ্ধি, রুচি, রীতি-নীতি লাভ করে তারই মার্জিত রূপের প্রকাশ। আড্ডার প্রকৃতি আজ অনেক পরিবর্তন লাভ করেছে। তাই আড্ডা হতে পারে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সংস্কৃতি পরিমাপের পথ নির্দেশক। 'আড্ডা' হল একটি উপায় বিশেষ যার মাধ্যমে অনেক মানুষ একসাথে অবসর সময়ে বসে বিনোদন করতে পারে এবং সদস্যদের মধ্যে একটি 'কথপোকথন' যারা মূলতঃ একই আর্থ-সামাজিক স্তরের ছিল, কিন্তু প্রক্রিয়াটি আধুনিক সমাজে গণতান্ত্রিক হয়েছে। 'আড্ডা' ছেলেবেলায় বাবা মায়ের কাছে বকুনি খাওয়ার কারণ হলেও তা হয়েছে সংস্কৃতির বাহক। সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে সুরুচি ও সুশিক্ষার পরিচয় বহন করে। তাই সংস্কৃতির উপরই নির্ভর হয় আড্ডার ধরণ। সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতি হল ব্যক্তির মানসিক সম্পদ, অর্থাৎ জাগতিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরেও যা কিছু মানসিক ক্ষুধা দূর করে তাই হল সংস্কৃতি। যেমন সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ লাভ করার যে তাগিদ আসে আমাদের অন্তর থেকে তাইই হল 'সংস্কৃতি'। ম্যাকাইভার, গিসবার্ট বলেন 'সংস্কৃতি হল মানুষের জীবনের একান্ত অঙ্গীভূত, আভ্যন্তরীণ বিষয়, যার উদ্দেশ্য হল শুধুই লক্ষ্য সাধন। 'সংস্কৃতির সাথেই যুক্ত হল নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা। কারণ নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের অন্তরেই নিহিত আছে। কিন্তু তা আত্মপ্রকাশ ঘটে সংস্কৃতির

মাধ্যমে। আড্ডা হলো অন্যতম একটি সংস্কৃতি। ভালো মানুষের কর্মের অবসরে একত্রে মিলিত হয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সময় কাটানোকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক ধর্মীয় বিষয়ে সহজ সরলভাবে তাত্ত্বিক আলোচনা চলে তাকে সাহিত্যের ভাষায় বলে আড্ডা।

আড্ডা হলো সেই একজন গুনী ব্যক্তিকে তার কিছু গুণমুগ্ধ ভক্ত-অনুরক্ত শিষ্য সাগরেদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় নির্মল, বিমলানন্দ জ্ঞানসহ সকল বিষয়ে উপস্থাপনা। আড্ডা কোন শিক্ষালয় বা কোন মক্তব হুজুর খানা নয়। নানা কর্ম-কান্ডের চাপে যখন মানুষের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় তখন তার আড্ডাখানার প্রয়োজন হয় এবং সুন্দর সর্বাঙ্গীন স্বার্থকভাবে সময় কাটিয়ে পুনরায় কর্মের সমুদ্রে ফিরে যাওয়া যায়। আড্ডায় থাকে রাজনীতির কচড়া, সাহিত্যের কচকচানি, ধর্মীয় বকবকানি, সংগীতের ছয়য়াগ, সিনেমার গরম খবরের নানা কাহিনী ইত্যাদি। প্রত্যেকে শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী নিজেদের আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করে। কেউ নির্ভেজাল আড্ডার মাধ্যমে আবার কেউ ফেসবুক, ওয়াটসপ ইত্যাদির মাধ্যমে বিনোদন করে আনন্দলাভ করে। বর্তমান সমাজে যদিও আড্ডা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে দ্বিতীয়টির প্রকোপই বেশি পরিলক্ষিত হয়, তাই মনে প্রশ্ন উদ্ভাবিত হতে পারে যে কেন এই পরিবর্তন? অনেক কারণেরই সমাবেশে হয়ত আজ এই পরিবর্তন।

পুরাতন সমাজব্যবস্থায় সাধারণত দুই প্রকারের আড্ডা দেখা যেত- গুণময় ব্যক্তির আড্ডা ও বয়সভেদে আড্ডা। সমাজে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত বিভিন্ন গুণময় ব্যক্তির একসাথে আড্ডা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল আবার একই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও একসাথে বসে আড্ডা দিতে দেখা যেত। বিভিন্ন গুণময় ব্যক্তির একত্রে সমাবেশের ফলে একজন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হত অপর গুণবান ব্যক্তি। ফলে বিকাশিত হতে পারত নানা প্রতিভা। এইভাবেই শ্রীকান্তের "ইন্দ্রনাথের" সৃষ্টি। তাই আড্ডাই পারে মুক্ত চিন্তার জন্ম দিতে। চা, সিঙ্গারা সহযোগে সে আড্ডা হলো সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। সাংবাদিক শঙ্কলাল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, বাঙ্গালিকে আড্ডার ঐতিহ্য দিয়ে গেছেন সাহেবরাই। তিনি এও বলেছেন যে, সেরা আড্ডাবাজদের মগজের ধারও কম নয়। কারণ সত্যজিৎ রায়ই বলেছেন যে, ফোন আসলেই ফোন রিসিভ করি। কারণ 'ওটাই আমার বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম'। সবাই মিলে একসাথে জড়ো হলে নিজেদের কথাগুলো আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ পাওয়া যেতে পারে। এমনও হয় যে, আড্ডা থেকেই বহু মানুষ নিজের ভেতরে জমিয়ে থাকা হতাশাগুলি উপড়ে দিতে সক্ষম হয়। আড্ডার আসর থেকে যখন ফেরে, বুক জুড়ে থাকে অনাবিল আনন্দের ধারা। আবার একই গুণসম্পন্ন ব্যক্তির একত্রে সমাবেশের ফলে জন্ম নিত কত নতুন চিন্তা-ভাবনার। মাঝে মাঝে তর্কাতর্কী, বাকবিতণ্ডাও বেঁধে যেত, তবুও তা ক্ষণিকের জন্যই। এভাবেই চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হত নানা নতুন শিল্পের ও নানা নতুন বন্ধুত্বের। শোনা যায় ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে চৌরঙ্গীতে নিত্য আড্ডার ঠেক ছিল সত্যজিৎ রায়, কমল কুমার মজুমদার ও রাধাপ্রসাদ গুপ্ত এদের মত বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের। সেই আড্ডা থেকেই সূত্রপাত হল 'পথের পাঁচালির' ভাবনা। এরপর আসা যাক বয়সভেদে আড্ডায়। তিন প্রকারে বিভক্ত হল এই আড্ডা। তা হল বয়স্ক ব্যক্তির আড্ডা, তরুণের আড্ডা ও শিশুদের আড্ডা। বয়স্ক ব্যক্তির আড্ডা হতে পারে কোন রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার বা অনেক অভিজ্ঞতা ও আবেগ আদান-প্রদান, স্মৃতিচারণ প্রভৃতির আশ্রয়স্থল। তরুণ সমাজের আড্ডায় প্রাধাণ্য পায় সিলেবাসের বহির্ভূত নানা বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে শেক্সপীয়রের আলোচনা, গীটারের সাথে গানের সুরে-বেসুরে ছড়িয়ে পড়ে তারুণ্যের উণ্মাদনা। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে নানা হাস্যকর মন্তব্য থেকে শুরু করে, কার ওপর কার ক্রাশ আছে এসব পি-এন-পিসি, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি আলোচনার ও নানা খুনসুটির আশ্রয়স্থল হল এই 'আড্ডা' নামক সংগঠনটি। আবার শিশুদের আড্ডা বলতে বোঝায় ঠাকুমার কাছে ঠাকুমার ঝুলির গল্প শোনা, পাড়ার অলি- গলি মাঠেঘাটে ছোটছোট শিশুরা একজায়গায় সমবেত হয়ে বিভিন্নরকম খেলাধূলায় মজে থাকা। এমনকি স্কুলে গিয়ে টিফিন ভাগ করে খাওয়াটাও তাদের কাছে অন্যতম আনন্দের বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে সম্প্রতি 'হামি'

ছবিতে শিশুদের অন্যতম একটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা মনে করে গানটি গাওয়া হয়েছে 'তোর জন্য খোলা টিফিন বক্স, ভাগ করে খাওয়া টিফিন বক্স'। অর্থাৎ তারাও বন্ধুদের সাথে আদান-প্রদানের আনন্দকে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও উপলব্ধি করে।

বিবর্তিত মানব জগতে বাংলার সংস্কৃতি কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা 'আড্ডা' নামক সাংগঠন বা ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বোঝা যায়। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই আড্ডার প্রচলন। ব্যসদেবের মহাভারতেও আড্ডার কথা শোনা যায়। মুনিঋষিরাও নাকি দান ধ্যানের ফাঁকে জমিয়ে আড্ডা দিত। ব্যসদেবের কথায় "নৈমিষারণ্যে মহর্ষিরা দৈনন্দিন কর্ম সমাধান করতঃ সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গ সুখে" অর্থাৎ আড্ডা দিচ্ছিলেন। এমন সময়ে এই আড্ডায় ঋষি লোম হর্ষণের ছেলে সৌতি কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলেন এবং যথারীতি তিনিও আড্ডায় জমে গেলেন। এর থেকেই স্পষ্ট যে আড্ডার ইতিহাস সুপ্রাচীন।

আড্ডার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান-কালের প্রয়োজন হয় না। তাই প্রাচীন কালের প্রবীণ নাগরিকদের আড্ডা বসত খোলা আকাশের নীচে, মাঠে-ঘাটে, নদীর পাড়ে, লেকের ধারে আবার অফিস ফেরার পথে চায়ের দোকানে ইত্যাদি জায়গায়। নির্ভেজাল আড্ডার খাতিরেই ছিল দেশ-বিদেশের বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনের বাড়িতে উৎসাহ সহকারে যাওয়া আসার রীতি। এক কাপ চা বা কফির সাথে প্রাণ খুলে হেসে গল্প করার মাধ্যমে উপভোগ করত তারা নির্ভেজাল আড্ডা। এমনকি আড্ডাবাজ বাঙালী আড্ডার অন্যতম স্বাদ আস্বাদনের তাগিদে একশ মাইল ড্রাইভ করতেও আপত্তি করত না। কিন্তু বর্তমান তরুণ সমাজে সেই নির্ভেজাল আনন্দমুখর আড্ডার হদিশ প্রায়ই মেলে না। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে তা আগেভাগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সাথে ধ্বনিত হয়েছিল 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই'। আড্ডা ছিল, আছে এবং থাকবেও যুগযুগান্তরে। কিন্তু কালের গতিতে আড্ডার প্রকৃতি হচ্ছে পরিবর্তিত। সেই নির্ভেজাল খুনসুটিমাখা আড্ডার অভাব লক্ষিত হচ্ছে চারিপাশে। বর্তমান কর্মব্যস্ততার জীবনে, সংসারে আর্থিক অনটন, এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়ার দরুন হারিয়ে যেতে বসেছে প্রাণ খোলা আড্ডা দেওয়া। কিন্তু প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা হল প্রাণ খুলে আনন্দ করা। একাকিত্বকে কেউ ভালবাসে না আপন করতে। তাই আড্ডার মাধ্যম হয়ে উঠেছে আজ সোশ্যাল মিডিয়া। টেলিফোন কল অনেক সস্তা হয়ে যাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ম্যারাথন আড্ডা টেলিফোনেই সেরে ফেলা যায়। আবার কেউ কেউ মাল্টিপল লাইনে একাধিক বন্ধুর সাথে একত্রে আড্ডা দিতে অভ্যস্ত। প্রযুক্তি প্রসারের সাথে সাথে এখন ইমেল, ফেসবুক, ট্রল, পাবজি গেমসের মধ্যেই আজ আড্ডা সীমাবদ্ধ। এমনকি দেখা গেছে পাঁচজন বন্ধু একসাথে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছে তখনও নিজেদের মত করে তারা বিনোদনে ব্যস্ত এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। ফলে গবেষণা, লেখনী, রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা থেকে অনেকটাই দূরে সরে যাচ্ছে তারা। কিন্তু আজ নির্ভেজাল বন্ধুত্ব খুবই বিরল। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের বিংহ্যামটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সুরিন্দর প্রথম বর্ষের স্নাতক স্তরের পড়ুয়ার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সামনাসামনি দেখা হওয়া, মুখোমুখি বসে আড্ডা দেওয়া, ফোন করে এ ওর সাথে কথা বলা এসব কমে যাওয়ায় সেসব ফাঁকা স্থান পুষিয়ে দিচ্ছে ফেসবুক, ওয়াটসপ, গেমস ইত্যাদি।

আড্ডার ধরণ এভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। যেহেতু সংস্কৃতি হল নৈতিকতার ধারক ও বাহক তাই মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপও পরিবর্তিত হতে থাকে। এভাবেই আড্ডার প্রকৃতির মধ্যেও সমাবেশ ঘটেছে নতুনত্বের। ঐতিহাসিক ও বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে মনে হয় সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে কোথাও যেমন নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে তেমন নৈতিক উন্নতিও ঘটেছে।

নৈতিক উন্নতির কথাই তাহলে আগে আলোচনা করা যাক। আড্ডায় বন্ধুদের সাথে কর্ম ব্যস্ততার জীবনে বিচ্ছেদ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু আড্ডাবাজ ও বন্ধুপ্রিয় বাঙালি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয় এই

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। দূরদূরান্তের বন্ধুদের খবরাখবর নেওয়া, তাদের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া, তাদের খারাপ সময়ে পাশে থেকে সমবেদনায় সমব্যাথী হওয়া এসবই সম্ভব হচ্ছে বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে থেকেই। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বেশি সক্রিয়। অহংকেন্দ্রিকতা যাদের বুকে এখনও দানা বাঁধেনি তারা চারপাশে বন্ধু ছাড়াও দেশ বিদেশের বন্ধুদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতে সচেষ্ট এবং তাদের মাধ্যমেই আজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষার কারণে নানা গুণসম্পন্ন বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে অনেক বেশী উদগ্রীব সেই সব ব্যক্তি বর্গ।

বন্ধুত্ব করার শিক্ষাও পাওয়া যায় পরিবার থেকেই। পরিবার হয় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র। তাই আড্ডার ধরণ বদলে যাওয়ার কারণস্বরূপ প্রথমেই পরিবারের কথায় আসা যাক। পারিবারিক কিছু শিক্ষা থেকেই স্বার্থপরতা দানা বাঁধে শিশুদের অন্তরে। তার প্রথম কারণ হল, পিতা-মাতা নিজেরাও আড্ডা থেকে বিরত হওয়ায় শিশুদের প্রতি হয়েছে অতি যত্নশীল। এর ফলে অজান্তেই সন্তানদের করে তুলছে স্বার্থপর মনোভাবাপন্ন। দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারে সদস্যের সংখ্যা কম থাকায় বাবা-মা সন্তানকে অনেক বেশী আগলে রাখার সুযোগ পায় এবং সমাজের কাছে সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করার লোভে পরিকল্পনামুখী জীবন যাপনে সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাভাবনায় জর্জরিত প্রায়। এর ফলে অবসরের সময়টুকুও নেই তাদের। জীবন কাটছে যান্ত্রিকভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন প্রভৃতি শিল্পের মতো নানা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ থেকে। তরুণ সমাজ এসবের মধ্যে থেকে অবসরের সময়টুকুর সাথে পরিচিতই হতে পারছে না। তাইতো তরুণ সমাজের পক্ষে আড্ডাকে জানা বহু দূরের কথা। আবার অন্যদিকে বাবা-মা উভয়ই চাকুরিজীবি হওয়ায় সন্তানকে সময় দিতে পারছে না। এমনকি নিজেদেরও সন্তান ও কর্মব্যস্ততার বাইরে আড্ডার জগত নেই বললেই চলে। এরফলে তাদেরও নৈতিক শিক্ষার অবক্ষয় ঘটছে। প্রথম থেকেই সন্তানের মধ্যে অনৈতিক শিক্ষার বীজ লুকিয়ে থাকায় তারা মন্দ আড্ডায় যুক্ত হয়ে পড়ছে ও নিজেদের অধঃপতন ঘটাচ্ছে। কারণ যান্ত্রিকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বাহ্যিক বিকাশ দ্রুত হলেও মানসিক বিকাশ হচ্ছে ক্ষীণ। বাহ্যিক আকর্ষণ কমে যাওয়ায় সামাজিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। আড্ডাতে অভ্যস্ত না হওয়ার অপর একটি কারণ হল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। কিছু ব্যক্তি অর্থনৈতিক ভাবে অধিক সচেতন হওয়ায় আড্ডা দিতে হয় পিছুপা। কারণ কিছু আর্থিকভাবে অধিক স্বচ্ছল ব্যক্তির কাছে আড্ডা মানেই হল একসাথে বসে চা, বিস্কুট, সিগারেট খাওয়া বা আর একটু বেশী হলে মদের ফোয়ারা তোলা। আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে শিশুদের মায়েরাই প্রথম থেকেই শিখিয়ে দিচ্ছে ভালো টিফিন বন্ধুর সাথে ভাগ না করে খেতে। এর দরুন টিফিনের অবসর সময় টিফিনের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের আনন্দকে ভাগ করে নেওয়ার কৌশলটাও আজ নেই বললেই চলে। এইভাবে ছোট থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকেই একাকীত্ব জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। কারণ স্কুল-কলেজের জীবনে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগের অভাবে অনেক আকাঙ্ক্ষার অন্তরেই অব্যক্তভাবে মৃত্যু ঘটে। আড্ডা হল সেই বিভিন্ন আবেগ, নানা প্রতিভার ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করার স্থল। কিন্তু সেই আড্ডার অভাবে এইসব উদ্দেশ্য সাধন করার উপায় হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ও মনে মনে একাকীত্বকেই বেছে নিয়েছে তরুণ সমাজ। এইভাবেই একাকীত্ব থেকেই জন্ম নিচ্ছে অহংকেন্দ্রিক মনোভাব, আবেগের প্রকাশ ঘটছে নানা বিরক্তির আকারে। বিপজ্জনক অথবা অবাঞ্ছিত বিষয় বা আচরণের প্রতি মানুষের যে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া তাকেই ধরা হয় বিরক্তির আকারে। MRI গবেষণায় দেখা গেছে এসব বিরক্তির মুখোমুখি হলে মস্তিষ্কের একটি অংশ উদ্দীপ্ত হয়।এর ফলে জন্ম হচ্ছে প্রতিহিংসাপরায়ণ তরুণ সমাজের।

আড্ডার অভাবে হ্রাস পাচ্ছে সামাজিক সংসক্তি এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ। সোশ্যাল মিডিয়াতে অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ। 'International Journal of Human Computer Studies' এ প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয় যে, আমরা যারা নিতান্ত ছাপোষা, আত্মবিশ্বাস যাদের মাঝারি তারাই সোশ্যাল মিডিয়াকে বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে আঁকড়ে ধরতে পছন্দ করে এবং প্রয়োজনের তাগিদে নতুন বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি করে। যোগাযোগের সহজ মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া হওয়ায় এক সম্পর্ক থেকে আর এক সম্পর্ক এভাবেই চলতে

থাকে,যদিও তাতে নেই কোন প্রান, সবটাই আবেগহীন সম্পর্ক। স্বার্থপরতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিহিত থাকায় প্রয়োজনের তাগিদেই সম্পর্ক শুরু ও তাতেই তা শেষ হয়ে চলেছে। উপকারীর উপকার স্বীকার করা উচিত এই নৈতিক বোধের অভাবে পুরোনো সম্পর্ক বহন করতে তারা নারাজ। কিন্তু প্রাচীন সমাজে নির্ভেজাল আড্ডাখানায় বন্ধুদের অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'সেই সাতজন নেই আজ টেবিলটা তবু আছে........'। কিন্তু আজ কোথায় মানুষের জন্য মানুষের সেই উতকণ্ঠা?' নেই কারোর সময় একটুও খোঁজ নেওয়ার একে অপরের। এমনকি আত্মকেন্দ্রিক সমাজে ঘুরতে গিয়ে ছবি তোলার সময়ও দেখা যায় যে, প্রকৃতির বা দলবদ্ধভাবে ছবি তোলার থেকে নিজস্বী তুলতে বেশী পছন্দ করে। পাশের বন্ধুকে ছেড়ে নিজের ছবিটুকুই ছড়িয়ে পড়ছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এভাবে অতি সংকীর্ণ মানসিকতায় আবদ্ধ হয়ে হতাশাগ্রস্থ হচ্ছে তারা এবং বেড়ে চলেছে হিংসুটে ও কুরুচিপূর্ণ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রকোপ। এমনকি শিশুরাও ঠাকুমার ঝুলির গল্প শুনতে আগ্রহী নয়, ফলে নৈতিক আচার আচরণের সাথে পরিচিতই নয় তারা। কিন্তু মূল্যবোধ ও ন্যায্যতা হল একটি জাতির জীবনীশক্তি। মূল্যবোধ ও ন্যায্যতাহীন সমাজ কাঠামো অন্তঃসারশূণ্য হয়ে যায়। জাতির মূল্যবোধ চর্চা ও নৈতিক চরিত্র যখন ভঙ্গুর হয়ে পড়ে তখনই সমাজে অবক্ষয়ের প্রাবল্য দেখা যায়। এমনকি ব্যক্তির নৈতিকতার বিকাশ না হলে সে নৈতিক অপরাধেরও স্বীকার হতে পারে। আজ সমাজে নৈতিক অবক্ষয় মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অনেক কারণের মধ্যে 'আড্ডা' হল এর অন্যতম কারণ। একসাথে টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া, খুনসুটি করা প্রভৃতি থেকে আন্তরিকতার বিকাশ সাধন ঘটে ও অপরের সুখের জন্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমব্যথী হওয়ার কৌশল আয়ত্ত করা যায়, দলবদ্ধভাবে কাজ করার আনন্দ উপভোগ করা যায় ও অপরের কাজে সহায়তা করার মনোভাব গড়ে ওঠে, এমনকি একসাথে কাজ করার জন্য যে সামঞ্জস্য বিধানের শক্তির(adjustment power) প্রয়োজন হয় তাও গড়ে ওঠে। ইংরাজীতে যাকে 'গসিপ' বলা হয় সেটুকুর পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় 'আড্ডা' শব্দটি। দলবদ্ধভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধন করার ক্রিয়াটিও এক প্রকার আড্ডা, যা সহানুভূতি, পরার্থপরতার মনোভাবও জাগিয়ে তোলে। এভেবেই তৈরি হয় নানা দুষ্টুমিষ্টি ভালবাসার সম্পর্ক। মিথ্যা কথা বলা, বেইমানি, চুরি করা, প্রতারণা করা এসমস্ত অনৈতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ হলেই তাকে দলছুট হতে হয় বা আড্ডার ক্ষেত্র থেকে বহির্গত হতে হয়। কারণ এই গুণসমূহকে আন্তঃসহযোগিতামূলক মনোভাবকে নষ্ট করার জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে। ফলে নির্ভেজাল ও দলবদ্ধভাবে আড্ডা থেকে অন্ততপক্ষে জন্ম হয় অনেক সৎ মানুষের। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে আবদ্ধ হয়ে যুবসমাজ হারিয়ে ফেলছে সামাজিকতা ও একাকীত্ব থেকে একাকীত্বতর হয়ে পড়ছে তারা। বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট বলেছেন যে, অভিজ্ঞতাই হল জ্ঞানের উপাদান। কিন্তু একাকীত্ব উপলব্ধি করছে এমন ব্যক্তি বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত। তাই নতুনত্বের আহরণ তো ঘটছেই না বরং স্বাভাবিক বুদ্ধির নাশ হচ্ছে ও নৈতিক-অনৈতিক বোধ যদিও থেকে থাকে তা হারিয়ে যাচ্ছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মান, শ্রদ্ধার মনোভাব হচ্ছে অন্তর্হিত। এমনকি একে অপরকে পরোয়াটুকুও করে না।

কথায় আছে যে, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে', অর্থাৎ যে যেমন কর্ম করবে তাকে তেমনই ফল ভোগ করতে হবে। পরিবার থেকেই শুরু হয় নৈতিক অবক্ষয়ের আবার পরিবারেই ঘটে তার পরিসমাপ্তি। ভালোবাসা, আন্তরিকতা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা এসব নৈতিক গুণ ব্যতীত যে সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল সে সমাজের থেকে অতি সম্মান পাওয়ার যোগ্য হলেও মানসিকভাবে সে থাকল একাই। আড্ডা, বন্ধুবান্ধব, মজা-ঠাট্টা সবই হল প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেরই বেঁচে থাকার অংশ। তাই সে ছোটবেলা থেকেই বাবা-মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে এসব আড্ডা থেকে হয় বিতাড়িত। তাই সমস্ত আনন্দের মাঝেও তারা এরুপ আড্ডার প্রতি হয় আকাঙ্ক্ষিত। নিজেরা একটু সুযোগ পেলেই চায় বাবা-মায়ের স্নেহচ্ছায়ার থেকে মুক্ত হতে। যেসব সন্তানের বুকে নৈতিকতাই দানা বাঁধেনি তারা কোন মায়াকেই পরোয়া করে না। শুরু হয় পরিবারের বন্ধনের মধ্যে ফাটল ধরা। এই ফাটল থেকেই জন্ম হয় বৃদ্ধাশ্রমের।

আড্ডা ছাড়া মানুষ অসহায়। 'Lamdon School of Economics' এর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, তারা MAPINESS APP এর মাধ্যমে এ তথ্য তারা সংগ্রহ করেছে যে, বন্ধুরা ৮.২%, জীবনসঙ্গী ৫.৯%, পরিবার ২.৯% ও সন্তান ১.4% সুখী করতে পারবে। পরিবারকে অতিক্রম করেও সব থেকে বেশী আনন্দ দিতে পারে একমাত্র বন্ধুই। তাই বলা হয়েছে যে, চুটিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডাই হল মানুষের জিয়নকাঠি। আর্থিক অনটনের যুগে অন্ততঃ 'চা' এর আড্ডা দেওয়াই যায় বন্ধুদের সাথে। 'চা' এর আড্ডায় ভাবনাচিন্তা, যুক্তি, মনসংযোগ সবেতেই আসতে পারে ইতিবাচক পরিবর্তন। গবেষণায় জানা গেছে যে, চা এর কাপে তুফানি আড্ডা শুধু মন ভালো রাখে না, কগনিটিভ স্কিল অর্থাৎ মাধার ক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে যারা একাকিত্বে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রেও উপকারি হলো চা পানের আড্ডা। তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়াতেও দ্রুততা আনতে সহায়তা করে। গবেষণায় প্রধাণ চিকিৎসক এডওয়ার্ড ওকেলো জানিয়েছেন যে, চা প্রেমিদের নিয়মিত অন্তত পাঁচ মিনিট চা পান করলে মেধা ও মননের বিকাশ হয়।

উপরোক্ত আলচনায় দেখা গেল যে, আড্ডা যেমন সংস্কৃতি বহন করে তেমন মানব সমাজকেও দিয়েছে মুক্তির স্বাদ ও জীবনে এগিয়ে চলার রসদ যুগিয়েছে। কিন্তু আড্ডা এখন আর আগের মত নির্ভেজাল নেই, তবুও বাঙ্গালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িত এই আড্ডা বিষয়টি কমতে থাকলেও হয়তো খুব শীঘ্রই 'আড্ডা' অবলুপ্ত হবে না। কিছু জায়গায় কোন কোন বাঙালি এই আড্ডাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁদের সংস্কার ও নৈতিকতা বোধ দিয়েই। তাই সেসব জায়গায় ঐ নৈতিক বোধের ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে NGOর মতো অনেক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন। এমনকি দেখা যায় প্রবাসী অনেক বাঙ্গালিও তাদের ভারতীয় সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখে এই আড্ডার মাধ্যমেই।

তথ্যসূত্র-

১/ পত্রিকা, দৈনিক সংগ্রাম, প্রিন্ট সংস্করণ,৬ই সেপ্তেম্বর,২০১৩

২/ Zeenews.india.com, Zee 24ঘণ্টা, 2nd july, 2017, 11:41pm

৩/ Bengaliindianexpress.com, july 24, 2019, 2:21:05pm

৪/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ই সেপ্টেম্বর, ঢাকা, ২০১৯

৫/ Calcuttanews.tv

৬/ ডঃ পীযুষকান্তি ঘোষ, সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০১২-২০১৩

৭/ TV9 Bangaliana: আড্ডা সৃষ্টিশীল নাকি কর্মনাশা?

৮/ আনন্দ মোহন, ০৩রা এপ্রিল, ২০১৫ বিকাল ৩.০৮

৯/ আনন্দবাজার অনলাইন, ১৮ই জানুয়ারি, ২০২১, ২১:২৭, কোলকাতা।

১০/ জীবনে আড্ডার আবেশ, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, ২০:৩৭

....

অতিথি অধ্যাপিকা -দর্শন বিভাগ , সুশীলকর কলেজ

সতীনাথ ভাদুড়ীর ' ঢোঁড়াইচরিত মানস ' উপন্যাসের আলোকে তৎকালীন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন

গৌরব সিনহা

সারসংক্ষেপ-

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসের লেখক নায়ক ঢোঁড়াইকে করে তুলেছেন রামচন্দ্রের আধুনিক সংস্করণ । রাজনৈতিক চেতনা সমাজের নিচুতলায় প্রবেশ করে কীভাবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয় এবং ঢোঁড়াইকে 'রামায়ণজী'তে পরিণত করে , শুধু তাই নয় উপন্যাসের পটভূমি বিহারের জিরানিয়া শহরের অদূরে তাৎমাটুলি । জাতে তাঁতি এই তাৎমাদের বৃত্তি ঘরামিও কুয়োর বালি ছাঁকা। পাশের ধাঙড়টুলিতে বড়ো হওয়া পরিত্যক্ত অনাথ বালক ঢোঁড়াই এই উপন্যাসের নায়ক । তাৎমাটুলিও ধাঙড়টুলিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের বিষয় আবর্তিত হয়েছে।তাৎমাটুলিও ধাঙড়টুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে বার বার ফুটে উঠেছে এবং ঢোঁড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। এরপর ঢোঁড়াইয়ের রবিয়াকে বিয়ে তারপর বিয়ে ভেঙে গিয়ে ঢোঁড়াইয়ের নতুন করে জীবন ধারণ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ঢোঁড়াইয়ের ক্রান্তিদলে নতুন নামকরণ উপন্যাসে আলাদা মাত্রা এনেছে। মোসাম্মতও সাগিয়াকেঘিরে ঢোঁড়াইয়ের জীবনকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কোয়েরীদের জীবন উপন্যাসে বিস্তরভাবে ফুটে উঠেছে।

মূলশব্দ -

তাৎমাও ধাঙড়দেরজীবন যাত্রা, রামায়ণের কথা , ঢোঁড়াইয়েরজীবন যাপন , ঢোঁড়াইও সাগিয়াকেঘিরে উপন্যাসের দ্বন্দ্ব , সমাজ জীবনের পরিবর্তন

মূলপ্রবন্ধ -

ব্যক্তির জীবন ধারণের প্রশ্নে সমাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, তেমনি সমাজে বসবাসরত ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ সাধনে সাহিত্যের পাতায় তাদের জীবন জীবিকা ঠাঁই পাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি একটি সাহিত্যের অন্যতম ধারা উপন্যাসে তৎকালীন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস 'উপন্যাস । 'ঢোঁড়াই চরিত মানস 'উপন্যাস বিহারের বিশেষ অঞ্চলের অন্ত্যজশ্রেণীর জীবন ধারার সামাজিক দলিল হলেও লেখকের দক্ষতায় তা শেষ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের অবহেলিত গ্রাম জীবনের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। উত্তর ভারতের অধিবাসীরা ধর্মের দিক থেকে রামচন্দ্রকেও কর্মের দিক থেকে গান্ধীজিকে নিজেদের হৃদয়ের আসনে স্থাপন করেছিল। উপন্যাসে দেখা যায় অন্ত্যজ সমাজের অতি সাধারণ ঢোঁড়াই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে হয়ে উঠেছে ঢোঁড়াই রাম শ্রেণী মানুষের প্রতিনিধি।

বিহারের মানুষজন এবং বিহারের ভূপ্রকৃতি আশ্রয় করে সতীনাথের কথাসাহিত্য রচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভৌগলিক অর্থেই বিহারকে অতিক্রম করে গেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে অভিজ্ঞতা। সতীনাথ নিছক কল্পনা বিলাসে তেমন আস্থাবান ছিলেন না। অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর লেখার প্রধান এবং একমাত্র ভিত্তি । সাহিত্যিক জীবনে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রবেশ তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল হাতে নিয়ে।

'জাগরী' প্রথম প্রকাশিত হবার পরে গল্পাংশবাদ দিয়েও অনেক পাঠকের কাছে তার একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল জার্নালিজম সুলভ গুণ অর্থাৎ জেলে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্দীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সতীনাথ নিজেও তাঁর লেখার এই বৈশিষ্ট্য সম্মুখে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় এটাকে তার আঙ্গিকের একটা দরকারি অংশ বলে ভাবতেন , কিন্তু আবার সঠিক ভাবেই খুঁটিনাটির ওপর জোর দিতে গিয়ে মূল কথাটা হারিয়ে যাবার বিপদ সম্পর্কে নিজেই বারবার সমাধান করে দিয়েছেন।

'জাগরী'এবং বিশেষ করে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের একটি বড় সম্পদ হয়ে দাঁড়ায় পূর্ণিয়া তথা বিহারের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে লেখকের প্রতক্ষ্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং এই জীবনেরও একটি বিশুদ্ধ ছবি যে তাঁর লেখার আমরা পাই তার জন্যও তার সাহিত্যিক প্রতিভা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাছে ঋণী । এর সঙ্গে তুলনায় তাঁর বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রন যেন অনেক হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হয়। তাঁর সাহিত্যিক কল্পনার সীমা যেন তাঁর রাজনৈতিক চেতনাই বেঁধে দিয়েছে।

উপন্যাসের শুরু থেকে দেখা যায় তাৎমাও ধাঙড়দের জীবনের নানা প্রতিরূপ। উপন্যাসে বার বার রামচরিত মানসের প্রসঙ্গ এসেছে যা তখনকার সমাজে রামচরিত মানস পাঠের একটা যে প্রচলন ছিল তা বলাই বাহুল্য এবং রামচন্দ্রের আদর্শে উপন্যাসে ঢোঁড়াই চরিত্রটিকে তিনি নির্মাণ করেছেন একই সঙ্গে যন্ত্রণা বঞ্চনা ও সংগ্রামের মানবিক প্রতিনিধি হিসেবে।

'রোজা - রোজগার - রামায়ণ 'এই নিয়েই তাৎমাটুলি জীবনের পরিচয় হলেও উপন্যাসে ব্যক্তি হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় রত ঢোঁড়াইকে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাৎমাদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে।

উপন্যাসে প্রধানত দুই গোষ্ঠী তাৎমাও ধাঙড়দের কিছু প্রথার সাথে ঔপন্যাসিক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যা তখনকার ওই আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন : তাৎমাসমাজে বরপণের প্রচলন ছিল না, কন্যা পণ দিতে হতো। যারা কন্যাপণ দিতে পারে না তাদের বিয়ে হয় না। এর সাথে আমরা উপলব্ধি করতে পারি তখনকার সমাজে বরপণের প্রচলন ছিল না ।তাৎমাদের বিয়েতে দেখা যায় -

"তৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে 'আহা টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটাসন্ন্যাসী হয়ে গেল।"[১]

শুধু তাই নয় বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু নিজস্ব রীতি নীতি আছে তাৎমা সমাজে। বিয়ের আগের দিন গোঁসাই জাগানের গান গাওয়া হয়, বরযাত্রী এলে দুয়ার বন্ধ করে অশ্লীল গান পরিবেশিত হয়.পাঁচজন নারী মাটিতে সিঁদুরের ফোঁটা দেয় । উপন্যাসে নাপিত ঢোঁড়াই রামিয়ার বিবাহ পর্বে উভয়ের আঙুল চিরে রক্ত বের করে পানে লাগিয়ে দিতে বলে । এমনকি বর - বধুকে উখলিতে ধান বানানো হয়, বিয়ের সময় চাল গণনাও চলে । মিসরজির হাতে জোড়া চাল উঠলে নব দম্পতি সুখী আর বিজোড় চাল উঠলে অসুখী । স্বীকার্য এসব সংস্কারের মধ্যে এই সমাজের নিজস্ব রূপটি ধরা পড়েছে যা তখন প্রচলিত ছিল।

বিয়ের পর তাৎমা ছেলে মেয়েদের বাবা - মা , শ্বশুর - শ্বাশুড়ির সঙ্গে থাকবার রেওয়াজ নেই। সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল তা আমরা জানতে পারি ঢোঁড়াইয়ের মা বুধনীর স্বামী মারা যাওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করে এর মধ্য দিয়ে। তাৎমাদের মধ্যে কুয়োর বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আবার লোটা নিয়ে ময়দানে যাওয়া তাৎমা নারীদের পক্ষে খুবই নিন্দনীয় কাজ। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত উপন্যাসে সর্বত্র রয়েছে।

কার্তিক - অগ্রহায়ণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার অনিশ্চিত হয়ে আসলে তাৎমা নারীরা পুবে ধান কাটতে যায় ।

"কার্তিক - অগ্রহায়ণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার অনিশ্চিত হয়ে আসে ঘরামির কাজ কমে যায় অথচ কুয়ো পরিস্কার করার কাজ তখনও আরম্ভ হয় না । বোধহয় সেই জন্যেই তাৎমা মেয়েরা অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে ।"[২]

এইসব জীবিকার মাধ্যম প্রচলিত ছিল বলে আমরা জানতে পারি।

তাৎমাদের জীবন আদিম মানুষের মতো ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিম জনজাতি যেমন দেবতা নির্ভর , তাৎমারাও তেমনি গোঁসাইকে দেবতা বলে মনে করে । তাই প্রতিবছর তাৎমাটুলিতে দেখা যায় :

"গোঁসাই থানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেইদিন প্রতিবছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন সেই সময় সে তার ভেড়ার কাঁচা রক্ত খায়, মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে সে হুঙ্কায় ছাড়ে । সেকি আর করে? তার মধ্য দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের ঘেরাটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে তা ফলবেই ফলবে ।"[৩]

উপন্যাসে ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির সন্তান সে সূত্রে উপন্যাসে তাৎমাটুলি জীবন-যাত্রার মধ্য দিয়ে ঢোঁড়াইয়ের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এটি কেবল এক দিক উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক আর এর অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা করেছে উপন্যাসের আরেক জন গোষ্ঠীর জীবন ধাঙড়টুলির জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে। নিম্নবর্গের আদিম জনজাতি তাৎমাদের ন্যায় ধাঙড়রাও লৌকিক সংস্কারের ওপর বিশ্বাসী । তাৎমাদের যেমন গোঁসাই থান দেবতা তেমনি ধাঙড়দের দেবতা হলো বাঙ্গাবাঙ্গী তাদের বিশ্বাস এই দেবতাকে সময় মতো পুজা না দিলে তাদের জীবনে অমঙ্গল নেমে আসবে।তখন তাদের জীবনের আশা আকাঙ্খা সব মলিন হয়ে যায় খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ফলে সেই স্থানে তারা আর থাকতে পারে না । তাদের বিশ্বাস :

"বাঙ্গাবাঙ্গীর নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল , না হয় দুঃসময় কাছে । এই ফুলের ফসল ছেড়োনা তাই দিয়ে বুটি তৈরি করে খাবে । তারপর বারো বছরের বেশি সেখানে থেকোনা – বারোবার গাছে তেঁতুল পাকুক তার পর তল্পিতল্পা গুটিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করার কথা ভাবতে হবে।"[৪]

এই কুসংস্কার মানুষের জীবন কতটা বিপদ নিয়ে আসতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই উপন্যাসে শনীচরাও তার স্ত্রীকে গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। এইসব কুসংস্কার গড়ে ওঠে অজ্ঞতা থেকে যা তখন ওইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার অভাব ছিল ফলে এইসব কুসংস্কার তাদের চিন্তা কর্মের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হয়।ফলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি তখনকার নীচু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে পারেনি।

নিম্নবর্গের মানুষ খুব সবকিছু বিশ্বাস করতে জানে । তাৎমাদের কৌমজীবনে নানা লোক বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। আর সে কারণেই তাৎমারা রেবণগুণীর মতো অসৎ ব্যক্তিকে মানে রোজা হিসেবে।তুক - তাক , জাদুমন্ত্রে পারদর্শী রেবণওঝার প্রতিপত্তি তাৎমা সমাজে এত অধিক যে রেবণগুণী যখন গানহী বাবার প্রতি লোহা মানে তখন তার চাতুরী তাৎমারা বোঝে না। এইসব তখন প্রচলিত বলে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। রেবণের এত প্রতিপত্তি যে তাৎমারাতা বোঝে না। শিক্ষাবর্জিত , কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিহারের গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের শোষণ আর প্রতারণার মাধ্যমে রেবণগুণী তার প্রতাপ, প্রতিপত্তি টিকিয়ে রেখেছে আর এইসব ঘটেছে শিক্ষার অভাবের ফলে ।

তাৎমাদের বিদ্যাবুদ্ধিবর্জিত জীবনজুড়ে রয়েছে কেবলই সংস্কার বুদ্ধি । তাদের বিত্তনেই , চিত্তের জৌলুসও নেই, কিন্তু জীবনপথে আছে বিস্তর বিপত্তি । জীবনে তাদের অভাব আছে , অনটন আছে , অনশন অর্ধাশন আছে কিন্তু নিয়ম ছিন্ন করার তাগিদ নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বুধনীর জীবন জীবিকা সম্পর্কিত যে তথ্য উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে তা লক্ষণীয় :

"বুধনীবিধবা ছিল প্রায় বছর দেড়েক।বর্ষা নামলেই শুকনো বকরহাট্টারমাঠ নতুন ঘাসে সবুজ হয়ে যায় । এরপর মাস কয়েক বুধনীঘাস বিক্রি করে টানে । অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে পুবে । মাঘ মাসে বুনো কুল ফাল্গুন চৈতে শিমুল তুলো আর কচি আমি বাবু ভাইয়াদের বাড়ি বিক্রি করে।"[৫]

অন্ধকারকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন আলোর প্রয়োজন, সুখকে অনুভব করতে হলে দুঃখ তেমন তাৎমাটুলিকে জানতে হলে ধাঙড়টুলিকে জানা প্রয়োজন। ধাঙড়দের মোড়ল বুড়ো এতোয়ারী ; সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে তার সহজ সরল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাৎমাটুলির ধনুয়ামহতোর থেকে সে উদার , সংস্কারশূণ্য , পসার , প্রতিপত্তি, রুজি রোজগার হারানোর শঙ্কা তার নেই। কারণ সে নিজে সাহেবদের সোডা কোম্পানিতে কাজ করে মোড়লবৃত্তির ওপর তাকে নির্ভর করতে হয় না। ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গেও তার বেশ সদ্ভাব ।

উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে আমরা দেখতে পাই তাদের জাতের মধ্যে উঁচু উঁচু ভেদাভেদ যা তখনও ওইসব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বিসকান্ধা গ্রামে ঢোঁড়াই ও বিল্টার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানতে পারি "তন্ত্রিমাছত্রী জাতটা কুশবাহছত্রী জাতের চাইতে অনেক নিচু "এইজাতপাতের ভেদাভেদ তখনও প্রচলিত ছিল এখনও প্রচলিত আছে । যা এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।বিসকান্ধার কোয়েরীর বাস করে জাত ও জমির রাজ্যে । স্বাভাবিক কারণেই তাদের জীবনযাত্রা বেশ জটিল। ---

"গাঁয়ের প্রাণ দলাদলি ।......বড় গ্রাম অনেক দল , অনেক স্বার্থ । বড়র নীচে মেজ , মেজর নীচে সেজো ।........সকলে সকলের নজর মাটির উপর জমির উপর । মাটির রস মরলে তাকাই উপরের দিকে......এখানক এখানকার হাসিকান্নাগল্পরঙ্গতামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে।"[৬]

জাতের দোহাই আর জমির প্রতি লোভ এখানের অন্ত্যজদের জীবন সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। উপন্যাসে সতীনাথ ঢোঁড়াই চরিত্র বিকাশে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে পর্বটিকে নির্বাচন করেছেন তা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ , আইন অমান্য , আগষ্ট আন্দোলন পর্ব । উত্তরপ্রদেশ , বিহারের বৃহৎ অংশের কিষাণ , মজুর খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে স্বরাজ ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যে বিপুল উদ্দীপনা তাদের অহিংস সত্যাগ্রহে অনুপ্রাণিত করেছিল তার বিবরণ ইতিহাস সম্মত । "তারা সর্বস্ব পণ করে মহাত্মাজিরপাশে দাঁড়িয়েছিল যতটা 'রংরেজ' তাড়াবার প্রেরণায় , তার চেয়ে বেশি বহুযুগ লালিত বর্গীয় শোষণ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় । তবে নিম্নবর্গের ও পণসর্বস্ব মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি বাস্তবে । সতীনাথ ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে ধরতে চান সারা দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিকে , এর মধ্যে লেখকের বিশ্বাস ও আদর্শ কাজ করলেও লেখক রামায়ণকারের মতোই প্রচ্ছন্ন যে জন্য এক সময়ে তিনি ভেবেছেন যতদিন বাঁচবে ঢোঁড়াইয়ের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাবেন । আসলে ঢোঁড়াইয়ের নামরূপথাকা সত্ত্বেও 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' কোনো ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের কাহিনী নয় , সমগ্র গ্রামীন সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে , পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে ।

পুরো উপন্যাস জুড়ে রয়েছে তৎকালীন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন । স্বভাবতই সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ তার আলেখ্য হয়ে উঠেছে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস ' । উপন্যাস দুই জাত তথা তাৎমাটুলিও ধাঙড়টুলির

জীবন যাত্রার মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের জীবনযাত্রা আমরা জানতে পারি। এছাড়া কোয়েরীদের জীবনে যাত্রার মধ্যে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই।

তথ্যসূত্র

১ সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস " করুণা প্রকাশণী; ১৮ এ , টেমারলেন কলকাতা - ৭০০০০৯ পৃ . ৭

২ পূর্বোক্ত পৃ. ৭২

৩ পূর্বোক্ত পৃ. ৩৩

৪ পূর্বোক্ত পৃ. ১০৯

৫ পূর্বোক্ত পৃ. ১২

৬ পূর্বোক্ত পৃ. ১৪৩

গ্রন্থপঞ্জী

১) পাল , শ্রাবণী , দাস বেলা , 'গবেষণার তত্ত্বতালাশ', পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭৯৯০০১

২) বন্দোপাধ্যায়, সরোজ , 'উত্তর প্রসঙ্গ', দেজপাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬

৩) ভাদুড়ী, সতীনাথ, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস,' করুণা প্রকাশনী, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৮ এ , টেমারলেন , কলকাতা ৭০০০০

৪) রসুল , মোমেনুর , 'সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস: ব্যক্তি - সমাজ- রাজনীতি ও শিল্পভাবনা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা – ১০০।

....

প্রাক্তন ছাত্র , বাংলা বিভাগ , বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুণ্ডা জনজাতির অবদান এবং তাঁদের সমাজ , ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি অনুসন্ধান

সুব্রত দাস

সারসংক্ষেপ-

মুণ্ডা এবং অন্যান্য আদিবাসী সমাজ ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুণ্ডা সম্প্রদায় প্রধানত ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং ছত্তিসগড় অঞ্চলে বাস করে। তাদের জীবনযাত্রা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত, কৃষি ও বনজীবিকায় নির্ভরশীল। মুণ্ডা সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, ভাষা, এবং সমাজব্যবস্থা। তারা মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর অধীনে বাস করে, যেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারা এবং পারস্পরিক সহায়তা প্রধান। মুণ্ডা সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রাকৃতিক উপাসনার ওপর ভিত্তি করে, যেখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়। তাদের নৃত্য, সঙ্গীত, এবং কারুশিল্প তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিফলন। বিরসা মুণ্ডা মুণ্ডা বিদ্রোহের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।অন্যদিকে, ভারতের অন্যান্য আদিবাসী সমাজও তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে অনন্য। তারা সাধারণত প্রান্তিক এলাকায় বাস করে এবং কৃষি, শিকার, ও বনজ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আদিবাসীদের জীবনে গুরুজনদের সম্মান, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, এবং প্রকৃতির সাথে সখ্যতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

SAMSAPTAK ESTD-2015 PEER-REVIEWED REFEREED JOURNAL

মূলশব্দ-

আদিবাসী , মুণ্ডা , সমাজ , সংস্কৃতি , স্বাধীনতা আন্দোলন

মূল প্রবন্ধ-

ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যাদেরকে "জনজাতি" বা "ট্রাইবাল" বলা হয়, একটি বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহনকারী জনগোষ্ঠী। তারা মূলত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চল, পাহাড়ি এবং বনাঞ্চলে বসবাস করে। ভারতের সংবিধানে আদিবাসীদের "Scheduled Tribes" (নির্ধারিত জনজাতি) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভারতে প্রায় ৭০৫টি আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান গোষ্ঠী হল- গোঁড (Gond) ,সাঁওতাল (Santhal) , মুণ্ডা (Munda) , ভীল (Bhil) , নাগা (Naga) মিজো (Mizo) ,গারো (Garo) ,গোন্ড (Kondh) ,বানজারা (Banjara) ইত্যাদি ।

প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, লোকগীতি, নৃত্য, এবং সঙ্গীত রয়েছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, গয়নাগাটি, এবং উৎসবগুলো তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রতিফলিত করে।আদিবাসীরা সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সখ্য রেখে জীবনযাপন করে। তারা কৃষি, শিকার, এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের জীবনধারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সহজ এবং প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে।এছাড়া তাদের ধর্ম এবং বিশ্বাস সমাজব্যবস্থা , শিল্প ও কারুশিল্প ,সামাজিক রীতি-নীতি রয়েছে ।

আমাদের আলোচনার বিষয় –ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুণ্ডাদের ভূমিকা এবং তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা । এবারে মূল আলোচনায় আসা যাক। আদিবাসীদের উপরিউক্ত দিকগুলি মুণ্ডাদের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য– সেই দিকটিও এই আলোচনায় উঠে আসবে। ভারতের ঝাড়খণ্ড ও ছত্রিশগড় রাজ্যের-ছোটনাগপুর অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে এঁদের বাস।'মুণ্ডা' শব্দটি এসেছে 'মুণ্ড' নামক সংস্কৃত শব্দ থেকে। এর অর্থ মাথা। সাধারণত গ্রাম্য এলাকায়, গ্রামের মাথা বলতে গ্রামের মোড়লকে বোঝাত।সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বলা হয় সর্দার। এঁরাই মুণ্ডা। সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা সঙ্গতিসম্পন্ন চাষিকে-ও বোঝাত। এভাবেই ক্রমে সমগ্র গোষ্ঠীটা- ই মুণ্ডা নামে পরিগণিত হয়। এই নামটি এঁদের নিজেদের অবশ্যই দেওয়া নয়। কেননা, মুণ্ডারা নিজেদের-কে হোরো-কো অর্থাৎ 'মানুষ' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। সরলপ্রাণ অরণ্যচারী এই সব আদিবাসীরা নিজেদের-কে সর্বদাই প্রকৃত মানুষ বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতেন। এঁরা ভারতবর্ষের মূলনিবাসী। এঁরাই ভারতমনের প্রকৃত প্রতিনিধি। মুণ্ডা জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে, তার নাম মুণ্ডারি। এটি অস্ট্রো- এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। সমালোচকের কথায়-- “ ১৯৬২ সালে শিলং-এ বিভিন্ন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে আদিবাসী বলতে কি বোঝায় তার সংজ্ঞা নির্ণয়ে সচেষ্ট হন। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন: 'A tribe is an indigenous unit speaking a common language, claiming a common descent, living in a particular geographical area, backward in technology, illiterate, loyally observing social and political customs based on kinships.' অর্থাৎ, আদিবাসী বলতে তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা সকলেই সমপ্রকৃতির, স্বতন্ত্র ভাষাভাষী, যাঁরা নিরক্ষর ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পশ্চাৎপদ, যাঁরা একই বংশজাত বলে দাবি করেন এবং যাঁরা জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে যে সব প্রথা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেইসব প্রথার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ” [১]

‘মুণ্ডা’ শব্দটি দিয়ে মূলত একটি গ্রামের গ্রাম প্রধানকে বোঝানো হলেও মুন্ডারী ভাষায় মুন্ডা অর্থ হল মানুষ এবং মনুষ্য জাতি।সে কথা পূর্বেও বলেছি । তবে জাতি হিসেবে মুন্ডারা নিজেদের কোলারিয়ান, আর্য পূর্ব, দ্রাবিড় পূর্ব, প্রোটো-অস্টলয়েড ইত্যাদি দাবী করলেও তাদের উদ্ভব, উৎপত্তি নিয়ে সঠিক কোন ইতিহাস সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। “ তাঁরা ছিলেন সমাজবদ্ধ বলিষ্ঠ গোষ্ঠী। উপজাতিদের মধ্যে মুণ্ডারাই প্রথম ও প্রধান গোষ্ঠী যাঁদের সমাজব্যবস্থার উপর ইংরেজদের পূর্বে কেউ হস্তক্ষেপ করার সাহস পায় নি। সামাজিক আদর্শে তাঁরা অটুট ছিলেন বলে কোনো গোষ্ঠীর কাছে তাঁরা পদানত হননি। এঁরা দিনমজুরি দিয়েও জীবিকা চালায়।এঁরা কৃষিকাজে যথেষ্ট দক্ষ। ইংরেজ আমলে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার এবং নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় নানাস্থানে জমিদার ও নীলকরদের নীলচাষের জন্য নিয়ে আসা হয়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির চা-বাগানে এঁদের শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসা হয়। পশ্চিমবঙ্গের এসব স্থানেই তাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বেঁচে আছেন। চাকরি, শিক্ষা পেয়ে কেউ কেউ শহরেও বসবাস করতে শুরু করেছেন।মুণ্ডারা অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মুণ্ডারা কোন একটিমাত্র উপজাতি নয়। বেশ কয়েকটি আদিম অধিবাসী গোষ্ঠীদের সমবেত নাম মুণ্ডা। এঁরা কতগুলি গোষ্ঠীর সমষ্টি। ”[২]

মুণ্ডারা তিনশ চল্লিশটা গোত্রে বিভক্ত। এঁদের গোত্তকে বলা হয় 'কিলি'। ভারতবর্ষে প্রধানত ১৩ টি মুন্ডা গোষ্ঠীর উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ২৭ গোত্রের খোঁজ মেলে যেমন-১. রাজপুত, ২. টুটি, ৩. তির্কিয়ার, ৪. গোয়ালিনী, ৫. হাংরোল, ৬. কছুয়া, ৭. কৌড়িয়ার, ৮. ভিম্রুল, ৯. কের্কেটা, ১০. মহুকাল, ১১. তুমড়াং, ১২. নাগ, ১৩. হাঁসড়া, ১৪. সাপোয়ার, ১৫. বাঘুত, ১৬. সংওয়ার, ১৭. মহাকাল, ১৮. ধানওয়ার, ১৯. সাংওয়ার, ২০. বার্মুড়া, ২১. রুড়া, ২২. গ্লোয়ার, ২৩. বাইন, ২৪. তাম্ড়িয়া, ২৫. শাল, ২৬. জম্টুটি, ২৭. ভূতকুয়ার ইত্যাদি । এঁরা সাধারণ প্রকৃতির উপাসক। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মুন্ডা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী বিদেশী প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত একটি বিচ্ছিন্ন মানব গোষ্ঠীর কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সূত্র ধরেই তাদের গোষ্ঠী চিন্তা প্রসারিত হয়।মুণ্ডা জনজাতি ভারতের উত্তর

পূর্বাঞ্চলে থাকে এবং তাদের সংস্কৃতি ও ভাবনা একটি গবেষণা মূলক বিষয়। এই জনজাতির সংস্কৃতির মূল অংশ হিসেবে যুদ্ধ, ভূমিকোণ, বৃহৎ বা ছোট পরিবারের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, সম্প্রদায়িক উৎসব, ও তাদের ধর্ম ও ধার্মিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাদের সামাজিক ব্যবস্থায় জীবনের বিভিন্ন দিক ও প্রক্রিয়া রয়েছে যা তাদের আলাদা করে সাধারণ ভারতীয় সমাজ থেকে।

বর্তমান সময়ে মুণ্ডা জনজাতির নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি প্রধান বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন আছে ,তাহলো -- তাদের শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য । মুণ্ডা সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার অতীতে অপেক্ষাকৃত কম ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। বিশেষ করে আদিবাসী এলাকাগুলিতে স্কুল ও কলেজ স্থাপন, স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখনও চ্যালেঞ্জিং হলেও তাদের মধ্যে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও দ্বারা কৃষি প্রযুক্তি, মাইক্রোফাইন্যান্স এবং উদ্যোগ বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। মুণ্ডা জনজাতির সামাজিক উন্নয়নেও কিছু অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, এবং স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প চালু হয়েছে, যা তাদের জীবনের মান উন্নত করতে সহায়তা করছে। তবে, প্রান্তিক ও দুর্বল জনগোষ্ঠী হিসেবে এখনও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুণ্ডাদের পিছিয়ে পরার কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ অপ্রতুল স্কুল ব্যবস্থা এবং তাদের নিজস্ব পারিবারিক ও ভাষাগত চর্চার নিরুৎসাহ প্রদান।

মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রচার করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তাদের নৃত্য, সঙ্গীত, এবং লোককথা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তবে, আধুনিক জীবনের প্রভাবে ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তবে, মুণ্ডা জনজাতি এখনও নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। জমি অধিকার, বনজ সম্পদ ব্যবহার, এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের অধিকার রক্ষা করা অন্যতম বড় সমস্যা। মুণ্ডা ভাষাভূক্ত বিভিন্ন উপভাষা উত্তর ও মধ্য ভারতে ব্যবহৃত হয় এবং ২০ টি ভাষাভাষির লোকেরা এ ভাষায় কথা বলে। এ সকল ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাঁওতালি ভাষা, যা রোমান, দেবনাগরী বাংলা এবং উড়িয়ান লিপিতে লেখা। মুণ্ডাদের মধ্যে অনেক উপগোত্র রয়েছে। মুণ্ডারা প্রাথমিক পর্যায়ে বন-জঙ্গল এবং চা শ্রমিক হিসাবে কাজ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের পেশার পরিবর্তন লক্ষণীয়। তারা মাছধরা এবং ছোটখাট ব্যবসায় নিয়োজিত আছে।

এবারে একটু তাঁদের সমাজ- সংস্কৃতি ভাবনায় আসা যাক । - জন্ম- মৃত্যু-বিবাহে কিংবা প্রয়োজন হলে মুণ্ডারা একই গোত্রের লোকেদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।'মুণ্ডা' সম্প্রদায়ের সকল গোত্র গুলোর মধ্যে বিয়ের ইতিবাচক নিয়ম-কানুন বিদ্যমান। তারা মূলত অন্তর্বিবাহে বিশ্বাসী। কেউ গোত্রের বাইরে বিবাহ করলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয় এবং গোত্র থেকে বের করে দেয়া হয়। 'মুণ্ডা' তরুন এবং তরুনীটি যখন বয়সপ্রাপ্ত হয় এবং পরিবার জীবনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় এবং দুজনে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা বিষয়টা গোত্রের বড়দের কাছে প্রকাশ করে, বড়রা রাজী হলে তারা তাদের বিয়ের ঘোষনা দেয় এবং তাদের বিয়ে করিয়ে দেয়া হয়। মুন্ডাদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে মুখ দেখা পর্ব পরিলক্ষিত হয়। উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী একজন আরেকজনকে দেখে পছন্দ করে। তাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান লোটাপানি অনুষ্ঠান করে। যা ছেলে বা মেয়ের পছন্দ হবার পর তাদেরকে নতুন বস্ত্র পরিধান করানো। বিয়ের পূর্বের রাতে বরযাত্রী কনের বাড়ীতে আসে এবং সেই রাতে ঝুমুর ও নৃত্যগীতির সাথে হাড়িয়া নামের দেশী মদ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। আমোদ-ফুর্তিতে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় হিন্দু রীতি অনুযায়ী। বিয়ের শুরুতে একটি কাঁসার থালাতে ফুলের মালা,

কাজল, হলুদ, মেথি, তেল ইত্যাদি একত্রে রাখা হয় যা উভয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তারপর তা দুইভাগ করে বর ও কনের হাতে দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানকে লগন বাঁধা বলে। মুণ্ডা সমাজে কনেকে পণ দেওয়ার প্রথার প্রচলন রয়েছে।

মুণ্ডাদের প্রায় সব উৎসবই ঋতু ও ফসলের সাথে সম্পৃক্ত। রোগ বালাই থেকে পরিত্রাণ ও শষ্য রক্ষার জন্য পশু-পাখি বলি দিয়ে দেবতার পূজা করে থাকে। বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সারহুল বা সারজুন বাবা, চৈত্র মাসের বসন্ত উৎসব। কাডলেটা বা বাতাউলি, আষাঢ়ের শুরুতে বর্ষার উৎসব। নানা বা জমনানা, আশ্বিন মাসের নতুন ধানের উৎসব। খাড়িয়া পূজা বা মাঘ পরব, শীতে ধান কাটার উৎসব। মুণ্ডাদের ধর্মীয় দেবতার নাম সিং, বোঙ্গা বা সূর্য। মুণ্ডারা সুর্য দেবতার পূজায় অভ্যস্ত। এছাড়াও তাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের দেবতার পূজা করে থাকে। মুণ্ডারা সাধারণত ঈশান পূজা, ঝান্ডাপূজা, মাড়-য়া পূজা, গরাইয়া পূজা, শারল পূজা, করম পূজা করে থাকে এবং তাদের প্রধান প্রধান দেবদেবীর নাম হলো গরাইয়া, বনপতি, সূর্যাহী, কর্মা-ধর্মা, বামসিং প্রভৃতি। মুন্ডাদের মধ্যে খৃষ্টানধর্মাবলম্বী থাকলেও অধিকাংশই সনাতন ধর্মের অনুসারী হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর উপসনা করে থাকে। মুণ্ডাদের সর্বপ্রধান দেবতার নাম সিংবোঙ্গা। প্রতি উৎসব অনুষ্ঠানেই এঁরা এই দেবতার আরাধনা করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস, সিংবোঙ্গা এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং সকলপ্রকার বিপদ আপদ থেকে তাঁদেরকে ইনিই রক্ষা করবেন। সিংবোঙ্গা ছাড়াও 'দাহের বুড়ি', 'চণ্ডীবোঙ্গা'-ও তাঁদের বিশিষ্ট দেবতা। 'পাহান' হলেন এদের গ্রাম্য পুরোহিত। তিনিই এই সব দেবতার পূজা করে থাকেন। এঁদের প্রতিটি বাড়িতেই থাকে 'ওড়া বোঙ্গা' নামক গৃহদেবতা। সরহুল, করম, বাহা, মাগে এঁদের প্রধান উৎসব।

মুণ্ডা সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রাজা, মন্ত্রী, চৌধুরী, ডাকুয়া নির্বাচন করা হয়। প্রতি বছর "রং সভা" নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বংশানুক্রমিকভাবে রাজা, মন্ত্রী, চৌধুরী বা ডাকুয়া নির্বাচন করা হয়। সমাজ পরিচালনার সুবিধার্থে সমাজকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। আধাগা, গাও ও চৌরাশী। শিশু জন্মের নবম দিনে শিশুর মাথার চুল ও মায়ের হাত ও পায়ের নখ কাটা হয়, এই অনুষ্ঠানকে নর্তা বলা হয়। নবজাতকের জন্মের একুশদিনে মা ও শিশুকে স্নান করানো হয়।মুণ্ডা সমাজে মৃতের সৎকারের পর একদিন ঘরে আগুন জ্বালানো হয় না। আত্মীয়, স্বজনও প্রতিবেশীরা চিড়া, গুড়, কলা, ফল-মূল খেয়ে দিন পার করে। মৃত্যুর দশদিন পর্যন্ত লবণ, তেল ও হলুদ ছাড়া রান্না করা নিরামিষ খাবার গ্রহণ করে।

বর্তমানে মুণ্ডারা বিভিন্ন এনজিও এবং সমাজ পতিদের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের স্কুলে পড়াচ্ছেন। মুণ্ডাদের পোশাক পরিধানে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- মহিলাদের গলায় হাঁসুলি, হায়কল, শ্রীবন্ধী, পায়ের কাকন পরিধান করত। পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছিল ধুতি বা গামছা- গেঞ্জী, কান ফুটু করে দুল পরিধান করা ও হতে বালা পরা। মুণ্ডার তীর ধনুক চালাতে পারদর্শী ছিল। মুণ্ডাদের জীবন বৈচিত্রর মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয় তা হলো। ভাত হল 'মুণ্ডা'দের প্রধান খাবার। ভাতের সাথে তারা সিদ্ধ সবজী, ডাল এবং মাংস খায় , ছাগল, শুকর, মহিশ ও অন্যান্য মাংস। সুন্দরবনাঞ্চলে বাস করা মুণ্ডাদের সব চেয়ে প্রিয় একটি পানীয় হল তাদের নিজেদের তৈরী হাড়িয়া মদ। সকল প্রকার অনুষ্ঠানের এর ব্যবহার আজও খুব ভাল ভাবে প্রচলন আছে। তাদের খাদ্য তালিকায় ইদুর, শামুখ, কুচিয়া, কাকড়া ও বিদ্যমান।

মুণ্ডাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মুন্ডা বিদ্রোহ, যা ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ঘটেছিল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিরসা মুণ্ডা , যিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মহান নেতা হিসেবে পরিচিত। বিরসা মুন্ডা ব্রিটিশ শাসন, জমিদারি ব্যবস্থা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তিনি আদিবাসীদের

ঐক্যবদ্ধ করে তাদের জমি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিরসা মুণ্ডার আন্দোলন ছিল মূলত জমির অধিকার এবং ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশরা মুন্ডা সম্প্রদায়ের জমি দখল করে এবং তাদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার চালাতো। বিরসা মুণ্ডা এসবের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং তার নেতৃত্বে মুণ্ডা সম্প্রদায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। যদিও বিদ্রোহটি সফলভাবে দমন করা হয়েছিল এবং বিরসা মুণ্ডাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কিন্তু তার আন্দোলন আদিবাসী সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মুণ্ডাদের সংগ্রাম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অমলকুমার মণ্ডল মনে করেন- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুণ্ডাদের অবদান অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ বিরোধী মুণ্ডা অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের হিন্দুরা যখন ইংরেজ বিরোধিতার কথা ভাবতেই পারেননি, তখন মহান মনীষী বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে মুণ্ডারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের ডাক দেন। ১৮৭৪ সালে রাঁচির এক মুণ্ডা পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল প্রচুর। বিরসার অনুগামীদের বলা হয় 'বিরসাইট'। এঁদের নিয়েই তিনি ইংরেজ বিরোধী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন এবং লড়াই দানা বাঁধান। ইংরেজদের অবর্ণনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুণ্ডারা ১৭৮৯, ১৭৯৯, ১৮০৭, ১৮১২ এবং ১৮৩১ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন। ১৮৩১ সালের বিদ্রোহই ইতিহাসে 'কোল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। মুণ্ডাদের ভূমিকা শুধু মুণ্ডা বিদ্রোহেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের চেতনা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য পর্যায়েও প্রভাব ফেলেছিল।এখন প্রশ্ন হলো মুণ্ডাদের ভবিষ্যৎ তাহলে ঠিক কোন অবস্থানে রয়েছে । বলতে হয় - " দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। উন্নয়ন এসে পৌঁছেছে জঙ্গলমহলের আনাচে কানাচেতেও। কিন্তু উপেক্ষা কি কমেছে ? বিরসা মুণ্ডার আদর্শ ও লড়াইয়ের ক্ষেত্র আজও সমান ভাবে প্রযোজ্য। আজ বিরসা মুন্ডার মাতৃভূমি দেখেছে নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড।তবুও সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কষ্ট ও বঞ্চনা কমেনি।[৩] তাহলে তাদের কি কোনো ভবিষ্যত নেই ? আছে । মোটকথা মুণ্ডা জনজাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে তাদের শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন , সামাজিক সমতা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার ওপর। সরকার, এনজিও এবং মুণ্ডা সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা একটি সুস্থ এবং সম্মানজনক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

১। ভারতীয় আদিবাসী , অমলকুমার মণ্ডল ,দেশ প্রকাশন , প্রথম প্রকাশ ২০১৭ পৃ.২৩

২। ভারতীয় আদিবাসী , অমলকুমার মণ্ডল ,দেশ প্রকাশন , প্রথম প্রকাশ ২০১৭ পৃ.২৩

৩।https://bangla.hindustantimes.com/lifestyle/birsa-munda-is-another-name-for-the-rights-and-protests-of-marginalized-people-31654831371626.html

সহায়ক গ্রন্থ-

১। ঘোষ সুবোধ, ভারতের আদিবাসী ।

২। আদিবাসী জগৎ , ভেরিয়ার এলুইন। অনুবাদ মহেশ্বেতা দেবী, পৃথ্বীশ সাহা ।

৩। রায় , ডঃ হিমাংশু মোহর , ভারতের আদিবাসী ।

৪। https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/agnisarothi/30082882

৫। উইকিপিডিয়া ডটকম ।

....

কলেজ শিক্ষক , ইতিহাস বিভাগ , আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

দ্বিশতবর্ষের আলোকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ছন্দা পাল

সারসংক্ষেপ -

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন এমন একজন মানুষ,যাঁর তুলনা তিনি নিজেই।দুইশ বছরআগে জন্মেছিলেন ,এমন একজন মানুষ ভাবতে আশ্চর্য হতে হয়। তাঁর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত,তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত,মাতা জাহ্নবী দেবী তাঁকে নিয়ে যে আশা ভরসা করেছিলেন,তাঁদের কোনো আশাই পুরণ তো হয়নি,বরং একমাত্র প্রিয়তম পুত্রের কাছ থেকে তাঁরা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন,যতদিন তাঁরা জীবিত ছিলেন।ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশের)যশোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে মধুসূদন জন্মেছিলেন।(২৫ শে জানুয়ারি১৮২৪ সালে তিনি এই ধরাধামে আসেন,এবং ১৮৭৩ এর ২৯ শে জুন তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চির ঘুমের দেশে যাত্রা করেন,এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে।ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি,নাট্যকার,প্রহসন রচয়িতা হিসেবে তাঁর নাম সর্বাগ্রে।বাংলার নবজাগরনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন তিনি। যৌবনে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহন করে মধুসূদন ,মাইকেল মধুসূদন নাম নেন।পাশ্চাত্য ভাষার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে ইংরেজি ভাষার সাহিত্য রচনা করার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন,জীবনের প্রথম দিকে ,কিন্তু পরবর্তিতে জীবনের দ্বিতীয় পর্বে নানা ঘাত প্রতিঘাতে মধ্যে দিয়ে মাতৃভাষায় নাটক,প্রহসন ও মহাকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।বাংলা ভাষায় সনেট এবং আমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনিই প্রথন প্রবর্তন করেন।তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, রামায়নের উপাখ্যান আবলম্বনে “মেঘনাদবধ” কাব্য। মধুসূদনের সারাটা জীবন ছিল বেদনাময় এবং নাটকীয়।মাত্র ৪৯বছর বয়সে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতার এক হাসপাতালে শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

সূচক শব্দঃ-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত , বাংলা সাহিত্য , নাটক , কাব্য

মূল প্রবন্ধ –

মধুসূদন দত্ত জন্মেছিলেন এমন একসময়ে বাঙালি সমাজে যখন চলছিল ভাঙ্গাগড়ার প্রবল আন্দোলন । কোন মানুষ অন্য আর একজনের থেকে থেকে বিত্ত এবং বিদ্যা অর্জন করে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করবে তার কাড়াকাড়ি লেগে যেত।সেই সময়ে সেই যুগচিহ্ন বহন করেই মধুসূদন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মতো এমন একজন বড় মাপের মানুষের কথা ব্যাখ্যা করার দুঃসাহস রাখি না।তবে তিনি যে সারাটা জীবন কতখানি দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন,সেকথা ভাবেও চোখের জল ধরে রাখা যায় না।ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মহাকবি এবং বাংলা নবজাগরনের অন্যতম পুরোধা ব্যাক্তিত্ব।তিনি বাংলা সনেট ও মহাকাব্যের জনক।মধুসূদন জন্মেছিলেন ২৫ শে জানুয়ারি ১৮২৪ সালে যশোরের সাগরদাঁড়ির কেশপুরে।তার পিতা বিশিষ্ট অয়াটর্নি রাজনারায়ন দত্ত,মাতা জাহ্নবি দেবি।মধুসূদন দত্ত তাঁর শৈশব কালে মায়ের কাছে রামায়ণ, মহাভারত,পুরানের কাহিনী শুনেছেন এবং তখন থেকেই তাঁর মনে সেইসব কথা চিরতরে গেঁথে গিয়েছিল।তাঁর জন্মস্থান সাগরদাঁড়ির পাশের গ্রামের শেখপুরা মসজিদের ইমাম মুফতি লুতফুল হকের কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়।সাগড়দাঁড়িতেই মধুর বাল্যকাল কেটেছে।তের বছর বয়সে কোলকাতায় আসেন তিনি, সেখানে

স্কুলে দুই বছর পড়ার পর তাঁর পিতা তাকে তদানীন্তন হিন্দু কলেজে ভর্তি করেন। (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) সেখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মধু কলেজের অধ্যক্ষ ডি, এল রিচার্ডশনের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন।হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়,রাজনারায়ন বসু,গৌরদাস বসাক ,প্যারিচাঁদ সরকার প্রমুখ ব্যাক্তিগন।১৮৩৪ সালে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে ইংরেজি "নাট্য বিষয়ক প্রস্তাব"আবৃত্তি করে সকলের মনে জায়গা করে নেন।হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই মধুসূদন কলেজের পরীক্ষায় বরাবর বৃত্তি পেতেন এবং এই সময় "নারীশিক্ষা" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্নপদক লাভ করেন। তার পিতামাতা সনতানের সাফল্যে যার পরই আনন্দিত হয়েছিলেন এবং একমাত্র প্রিয় সনতান কে নিয়ে ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখতে থাকেন,যদিও তাদের সেই স্বপ্ন এই জীবনে সত্যি হয়ে তো ওঠেই নি বরং মধুর কাছ থেকে তার পিতা মাতা গভীর আঘাত পেয়েছিলেন যতদিন উঁনারা জীবিত ছিলেন।

আঠারো বছর বয়স থেকেই মধুসূদনের মনে মহাকবি হবার এবং বিলেত যাবার উঠচ্চাকাঙ্খা বদ্ধমূল হয়ে যায়। ১৮৪৩ সালে মধু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।রাজনারায়ন দত্ত মধুর বিয়ের কথা জানালে মধু মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে মিশনারিদের সহায়তায় চার্চে গিয়ে আশ্রয় নেন।এবং কিছুদিন পর সেই ওল্ড মিশন চার্চে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়ে "মাইকেল মধুসূদন দত্ত" নামে পরিচিত হন।এই ধর্মান্তর তখনকার সমাজে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে।মধুর পিতা রাজনারায়ন দত্ত তাঁর পুত্র কে ত্যাজ্য পুত্র করেন এবং মধুর মায়ের চোখের জলের কোনও বাঁধ ছিল নাযে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।ধর্মান্তরের পরে মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার অধিকার হারিয়ে দেড় বছর আনুষ্টানিক শিক্ষা থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিরত ছিলেন।হিন্দু কলেজ ছাড়ার পর ১৮৪৪ সালে তিনি বিশপস কলেজে শিক্ষা পুনরায় শুরু করেন । বিশপস কলেজে মধু ইংরেজি ছাড়া গ্রিক,ল্যাটিন,সংস্কৃত ভাষা শেখার সুযোগ পান।ধর্মান্তরের তিন মাস পর থেকে তার পিতা আবার তার পড়ার এবং অন্যান্য খরচের জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন,মধুও তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে এতে করে তার পিতা রাজনারায়ন দত্ত আশার আলো দেখেছিলেন তাদের প্রিয় পুত্র মধু হয়ত আবার স্বধর্মে ফিরে আসবে।কিন্তু তিনি যে সম্পুর্ণ ভুল ধারনা করেছিলেন সেটা কিছুদিনের মধ্যেই প্রমানিত হয়।

মায়ের জন্যে মধুর অন্তরে গভীর দুঃখ ছিল,কিন্তু তার বিলেত যাবার উচ্চাশা তাকে নির্মম হতে বাধ্য করেছিল।মধুর ঘরে ফেরার বিন্দুমাত্র আশা যখন আর ছিল না তখন থেকে তার পিতা অর্থ দেওয়া বন্ধ করেদেন।নিরুপায় মধু ভাগ্যাণ্বেষনে মাদ্রাজ চলে যান, তার এক সহপাঠির পিতার সহায়তায় এবং সেখানে গিয়ে অনেক লড়াই করে একটি মেইল অরফ্যান আয়াসাইলামে শিক্ষকতার চাকরি পান এবং একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। আর সেই অরফ্যান আয়াসাইলামে একটি স্কটিশ ছাত্রী রেবেকা ম্যাক্টাভিস এর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাকে বিয়ে করে, সুখের সংসার পালন করেন,কিন্তু সেই সুখের সংসার তাদের মাত্র আট বছর স্থায়ি হয়েছিল।দৈনিক পত্রিকা "স্পেক্টেটর" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মধুসূদন মাদ্রাজের বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন মাদ্রাজে।১৮৪৯ সালে তিনি "ক্যাপ্টিভ লেডি"কাব্য রচনা করেন।কিন্তু তার সেই অনন্য প্রতিভাকে তৎকালীন কোলকাতার সংবাদ তেমন ভাবে প্রচারে আগ্রহ দেখান নাই।এমন কি বাঙালি পাঠক রাও কবির এই কাব্যভালো মনে নেন নি,তখন কবির কিছু বাঙালি বন্ধু,যাদের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তারা কবিকে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করার জন্যে বারেবারে অনুরোধ করেন।

মধুসূদন হিন্দু কলেজে পড়ার সময় থেকেই বিলেত যাওয়া এবং ইংরেজি ভাষায় কবি হবার স্বপ্ন দেখতেন।আর সেই কারনেই তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন।"টিমোথি পেনপোয়েম "এই ছদ্মনামে কবিতার প্রথম দুটি কাব্য

লেখেন-(১)ক্যাপটিভ লেডি (২)ভিশন্স অফ দি পাস্ট।মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিশোরকাল থেকেই আমিতব্যায়ি ছিলেন। তিনি মাদ্রাজে যে অর্থ উপার্জন করতেন সেখানেও কবির অমিতব্যায়িতার জন্য সংসারে টানাটানি চলত।তবুও তিনি যেহেতু চিরকালের শিক্ষানুরাগী, মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু,ফরাসি,তামিল,তেলেগু,জার্মান,ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করেন।১৮৫৬ সালে তার পিতামাতা মারা যাবার পর কবি তার পরিবার মাদ্রাজে রেখে কোলকাতায় ফিরে আসেন।এর পরে তার প্রিয়তমা স্ত্রী রেবেকা এবং সন্তানদের সঙ্গে তিনি আর কোনো যোগাযোগ রাখেননি। তিনি যখন মাদ্রাজ ছেড়ে চিরদিনের জন্যে চলে আসেন,তখন মধুকবির আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না।সহায় সম্বল হীনা স্ত্রী,চারটি শিশুসন্তান কে অকুলে ভাসিয়ে তিনি চলে এসে যে অপরাধ এবং চরম নিষ্ঠুরতা করেছিলেন ,সে সম্পর্কে একজন স্পর্শকাতর মানুষ হিসেবে তিনি পরবতী সারাজীবন অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হয়েছেন সেটা প্রমাণ রূপে তার অজস্র রচনায় আমরা দেখতে পাই।তার এই অন্তর্দহন তিনি তার প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস বসাকের সঙ্গেও ভাগ করে নেননি কখনো।আর সেই কারনেই তিনি কারনবারি পান করেছেন মাত্রাধিক্,'আত্মবিলাপ" লেখার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তার অন্তরের অন্তস্থল থেকেই।মধুকবি তার ঐকান্তিক হতাশা এবং অপরাধ বোধ এমন কি পাপবোধ থেকেই এই "আত্মবিলাপ"লিখেছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি হেনরিয়েটা নামে এক নীলনয়না মহিলার সঙ্গে বাকি জীবন কাটান যদিও তাদের বিয়ের কোনো প্রমান নেই,মধুকবি এবং হেনরিয়েটার তিনটি সন্তান ।তাদের প্রথম কন্যা সন্তানের নাম রেখেছিলেন "শর্মিষ্ঠা"।তার বন্ধুদের অনুরোধ এবং তার নিজের মনের তাগিদে তিনি কোলকাতায় এসে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন।ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় লিখেই মহাকবি হয়েছিলেন।বাংলাভাষায় মধুসূদন ১৮৫৮ সালে মহাভারতের "দেবযানি-যযাতি" কাহিনী অবলম্বনে প্রথম কাব্য লেখেন "শর্মিষ্ঠা "।আসামান্য সাড়া জাগানো লেখা তার এই নাটক।এরপর তিনি একে একে দুইখানি প্রহসন লেখেন।মধুকবির সেই প্রহসন দুটি(১)একেই কি বলে সভ্যতা(২)বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ আজো সংলাপের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতার দাবি রাখে।মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে একে একে অনেকগুলি কাব্য সৃজন করেছেন।তবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ"।যে বিলেত যাবার স্বপ্ন তিনি কিশোরবেলা থেকে দেখেছিলেন,তার মনের গভীরে গেঁথে গেছিল।কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি কোনোদিন সুপ্রসন্ন ছিল না বিলেত যাবার জন্যে তার বন্ধুরা সহযোগিতা করেছিল,কিন্তু যিনি তাকে সবচাইতে বেশি সবরকমের সাহায্য করেছিলেন ,তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।তারা মধুসূদন কে উন্নতির পথে এগিয়ে দিলেও আসলে ফলস্বরূপ দেখা যায় তিনি ধ্বংসের পথে ,এক সর্বনাশের অন্ধকার গহ্বরে পতিত হয়েছিলেন।আর সেই অন্ধকার থেকে সারাজীবনে আর কখনো আলোর পথে ফিরে আসা তার হয়ে ওঠেনি।যখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করার জন্যে সবরকম আয়োজন করে ফেলেছিলেন,ঠিক তখনি তার ভাগ্যদেবী তাকে ঠেলে দিলেন নিশ্চিত সর্বনাসের পথে।আশার ছলনে মধুসূদন পা বাড়ালেন চোরাবালির পথে।তার জীবনের বিরাট বড়ো ট্যাজেডি এই ,তিনি "আত্মবিলাপ" রচনা করার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেও সেই ভুল শুধরে না নিয়ে সত্যিকারের আত্মহননের পথে পুনরায় চলতে শুরু করলেন।সাহিত্যজীবনে সাফল্য লাভ করেছেন এবং মামলা-মোকদ্দমার শেষে আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখতেও শুরু করেছেন এমন সময় তিনি মায়ার স্বর্ণ-মৃগ দেখতে পেলেন এবং সত্যিকারের ধনী হবার অলীক স্বপ্ন দেখে, বিলেত যাবার চিন্তা তার মনকে উতলা করে দিল।

মাইকেল মধুসূদন ব্যারিষ্টার হবার ব্যাপারে বাড়তি উৎসাহ পেয়েছিলেন তার বন্ধু গৌরদাস বসাক,রাজনারায়ণ বসু এদের কাছ থেকে।আর যাঁকে মধুকবি "বীরাঙ্গনা" কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগর মধুকে ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিষ্টার হবার জন্য অর্থ,এবং অন্যান্য সমস্ত রকম দিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।কারণ মধুর মধ্যে সেই বিদ্যা ও মেধা রয়েছে।তিনি বিলেত যাবেন এই কথা জানিয়ে তার বন্ধু রাজনারায়ণ কে ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে চিঠি লিখেছিলেন,..."আমি বিলেত যাবার জন্য ব্যবস্থা করছি,সেখানে আইন অধ্যয়ন করবেন ।কাব্যদেবীকে

তাই বাধ্য হয়ে বিদায় জানাতে হবে।" ।যে কোনো উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখলে মধু তা নিয়ে বিভোর হয়ে যেত।এবারেও তার অন্যথা হয়নি। তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ কে লিখলেন,..."বোধ হয় সামনের মাসেই বিলেত যাচ্ছি,আর কবি মধু নয়,দোস্ত,এবারে মাইকেল এম এস ডাট এস্কোয়ার,ইনার টেম্পলের ব্যারিষ্টার।হা হা হা তাই না?" কিন্তু এমন বড়ো স্বপ্ন দেখতে তিনি একটুও ভয় পেয়েছিলেন কি?...যদিও তার মনেও দ্বিধা দ্বন্দের দোলাচল ছিল,কারন বারবার তার অনেক স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল এর আগে।জীবনের চলার পথটাকে তিনি যতটা মসৃণ ভেবেছিলেন ,পথ ততটা মসৃণ ছিলনা যে ,সে কথা তারথেকে বেশি আর কে জানে?কিন্তু মধু কবি কখনোই তার জীবনের দুঃখ কষ্ট কারো কাছে কোনোদিন প্রকাশ করেনি ।এটা ছিল তার চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা।তাই তিনি বন্ধুর চিঠিতে হা হা হা হা অট্টহাস্য করলেও একথাও লিখেছিলেন-"আশাকরি আমি হতাস হব না!"মধু শুনতে না পেলেও তার ভাগ্যদেবী প্রতিধ্বনির মত একই সময়ে হা হা করে অট্টহাস্য হেসেছেন।ভাগ্যদেবী যেন তার অজান্তে মধুকবিকে বলেছেন,"তোমার বিলেত যাবার সাধ পূরণ হবে,কিন্তু তাতে আশা তোমার পূরণ হবে না।ব্যারিষ্টার হবে কিন্তু সে বিদ্যা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারবে না" ।বিলেত যাবার আগে তিনি রাজনারায়ণ কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন।-"যদি বেঁচে থেকে ফিরে আস্তে পারি ,তাহলে দেখা হবে।তা না হলে একশো বছর পরে আমার দেশের লোকেরা হয়তো ক্ষীণতম বেদনার সঙ্গে বলবে,--

"Far away Far away
From the land he loved so well
Sleeps beneath the colder ray."

বিলেত যাবার আগে তার মন যে কতোখানি ব্যথিত হয়েছিল,তার নিজের দেশ,পরিচিত পরিবেশ,এবং আপনজন দের জন্যে,তার মন বিরহ-বিধুর হয়েছিল,তা খুব সহজেই বোঝা গেছে।এছাড়া তিনি বেঁচে ফিরে আসতে পারবেন কিনা এই ভাবনাও তাকে অনেক বেশি বেদনাময় করে তুলেছিল।জাহাজে ওঠার পাঁচ দিন আগে তার বন্ধুকে মধু যে চিঠি লিখেছিলেন,তা থেকে তার একটা অপরাধ বোধ প্রকাশিত হয়েছে ।কৈফিয়েতের সুরে তিনি বলেছেন,..."বন্ধু, আমি আমার স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি,আশা করি তুমি নিশ্চয়ই তা মনে করবে না,নুতন কাব্যটি যে অসাধারণ সাফল্যতা যদি না হত,তা হলে আমি অবশ্যই আমার যাত্রা পিছিয়ে দিতাম।অথবা হয়তো যেতাম না,আমার দায়িত্ব আমি তাহলে পৌরুষের সঙ্গে পালন করতাম।কিন্তু আমরা সকাল সকাল বিজয় লাভ করেছি।এমতাবস্থায় এই দায়িত্ব আমি এখন তরুণ দের হাতে সমর্পন করতে পারি।তাছাড়া দূর থেকেও আমি তাদের গতিবিধি পরিচালনায় ক্ষান্ত হবো না। মধুকবির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মেঘনাদবধের সাফল্য সম্পর্কে মধুকবির মনের ভেতরে কোনোরকমের সন্দেহ ছিল না। মানুষ হিসেবে মধুকবির অনেক কিছুর প্রতি দুর্বলতা ছিল,কিন্তু অর্থ এবং যশের মধ্যে কোনটার উপর তার বেশি দুর্বলতা ছিল তা বলা খুবই শক্ত।তিনি তার বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন,..."প্রিয় রাজ,তোমার বন্ধুকে কিন্তু ভুলে যেও না।তা ছাড়া ,তোমারবন্ধুর খ্যাতি যাতে টিকে থাকে সে দিকেও যত্ন নিও।" এইচিঠির সঙ্গে তিনি একটি ছোটো কবিতাও পাঠান—"বঙ্গভূমির প্রতি"কবিতাটি সম্পর্কে মধুকবি লিখেছিলেন,"আশা করি কবিতাটি ভালো না হলেও,অন্তত সম্মানজনক হয়েছে।"

কবিতাটি নিম্নরূপঃ-

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।

প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে![১]

এই কবিতাতে কবির আকুতি, অপরাধ বোধ ফুটে উঠেছে, তিনি দেশমাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন।"বিশ্বাস করো,প্রিয় বন্ধু,বাংলা একটি অসাধারণ সুন্দর ভাষা,এর পরিমার্জনের জন্যে দরকার কেবল প্রতিভাবান কয়েকজন লোকের।আমরা নিজেরা যেমন টা শিক্ষা পেয়েছি,সেই শিক্ষার মতো ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার কারণে এ ভাষার কথা সামান্যই জানা আছে,অথবা লোকেরা এ ভাষা কে কেবল ঘৃণা করতে শিখেছে,সেটা নিতান্ত ভ্রান্তি।এর আছে অসাধারণ মূল্যবান ভাষিক উপাদান।আহা,আমি যদি এই ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারতাম!কিন্তু তুমি তো জানো জীবিকা উপার্জনের কোনো কাজ না করে কেবা সাহিত্যিক জীবন যাপন করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই।আমি বড্ডো গরিব,বা বলতে পারো চিরকাল গরিব অবস্থা মেনে নেবার মতো মনভাব আমার নেই-আমি তারচেয়ে অনেকটা গর্বিত।তোমার যদি টাকা থাকে,তুমি তাহলে বড়ো মানুষ,তা না হলে তোমাকে পোছে?আমরা এখনো একটা মর্যাদাহীন জাতি।আমাদের দেশের বড়ো মানুষ কারা?চোরবাগান আর বড়োবাজারের নামহীন লোকেরা।...আমার যদি সাহিত্যিক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের জন্যে তেমন কিছু না-করে থাকি,তাহলে আমি যা করেছি,তা নিয়েই আমাদের জাতির সন্তুষ্ট থাকতে হবে,কারণ সেই আমার সাহিত্যিক প্রতিভা পুরোপুরি লালন করার মতো সঙ্গতি আমার নেই ।

মধুসূদন দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে -- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্যটি । চরিত্র-চিত্র হিসেবে রয়েছেন : রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, সীতা, সরমা, প্রমীলা প্রমুখ। তিনি তার কাব্যকে নয়টি সর্গে বিভক্ত করেছেন এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী এতে নগর, বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ, মন্ত্রণা প্রভৃতির সমাবেশও করেছেন। কিন্তু সর্গান্তে তিনি নতুন ছন্দ ব্যবহার করেন নি, সর্গশেষে পরবর্তী সর্গকথা আভাসিত করেন নি। যদিও তিনি বলেছিলেন,-

"গাইব মা বীর রসে ভাসি মহা গীত" [২]

তবুও কাব্যে করুণ রসেরই জয় হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ-আহৃত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নয়—এটি নবজাগ্রত বাঙালির দৃষ্টি নিয়তি-লাঞ্ছিত নবমানবতাবোধের সকরুণ মহাকাব্যের রূপে অপূর্ব গীতি-কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য এ দিক দিয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যে একক সৃষ্টি । মধুসূদন অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে নির্মাণ-কুশলতা গুণে মহাকাব্যোচিত কাব্য-বিগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। এ কাব্যের তাৎপর্য রাবণ-চরিত্রের প্রতীকতায়। তার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রে পরম দাম্ভিকতা প্রকট হয়ে উঠে নি। রামায়ণকে তিনি তার মানবতার আলোকে বিধৌত করে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, তা আসলে রোমান্টিক মহাকাব্য। এ কারণে আকারে 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যোচিত হলেও, এর প্রাণ-নন্দিনী সম্পূর্ণ রোমান্টিক এবং মধুসূদন এ কাব্যে জীবনের যে জয়গান করেছেন, তা বীররসের নয়, কারুণ্যের। কবি তাই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,-

"সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।"[৩]

মাইকেল মধুসূদন বিলেত যাবার আসল কারণ তার প্রানাধিক প্রিয় বন্ধু গউরদাস কে চিঠিতে স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন।অবশেষে ১৮৬২ র ৯ জুন সোমবার মধুসূদন ক্যান্ডিয়া জাহাজে চড়ে সকালবেলা কোলকাতা থেকে তার স্বপ্ন-রাজ্যের পথে যাত্রা করলেন।তার জাহাজ ১২ জুন মাদ্রাজে পউছালো। মাদ্রাজ,তার সেই স্মৃতি-ভরা মাদ্রাজ কে দেখে তার সমস্ত অন্তর-আত্মা বেদনায় মথিত হয়ে উঠল।মনের তীব্র কষ্ট কে বুকে চেপে রেখে তিনি যথা সময়ে ১৯ শে জুলাই তার গন্তব্যে পৌঁছে যান।উনিশে আগষ্ট, গ্রেজ ইনে,ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্যে। মাদ্রাজ এবং কোলকাতায় মধুকবি ইংরেজ দের বর্ণবাদ যে দেখেন নি তা নয় ,কিন্তু সেখানে লাখ লাখ লোক জনের ভিতরে মুষ্ঠিমেয় ইংরেজদের বর্ণবাদ মধুকে সেভাবে কষ্ট দেয়নি।কিন্তু কোলকাতা থেকে জাহাজে ওঠার পর থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম পরিবেশ এবং তাদের আচরণে তিনি যে কৃষ্ণাংগ, এই ব্যাপার ভীষণ ভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল।তাই তিনি খুব দ্রুত তার পড়াশোনা শেষ করে কোলকাতায় ফিরে যাবার কথা ভেবেছিলেন।।কয়েক সপ্তাহ মধু তার বন্ধু মনোমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর(রবি-ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)এদের সঙ্গে বাস করেছিলেন ,তারপর অন্যত্র বাসা ভাড়া করেন।

মধুসূদন,কোলকাতায় তার পরিবার এবং সন্তানদের রেখে এসেছিলেন,তাদের জীবন নির্বাহের জন্যে যে ব্যবস্থা তিনি করে এসেছিলেন,কিছুদিন ঠিকঠাক চললেও পরবর্তীতে চরম অর্থকষ্ট শুরু হয় সেখানে এদিকে মধুও দেশ থেকে টাকা পয়সা পাওয়ার ব্যাপারে নানারম সমস্যার কারণে ঋণ-জর্জরিত হয়ে পরেন।তখন হেনরিয়েটা তাদের সন্তান দের নিয়ে লন্ডনে গিয়ে উপস্থিত হন।মধুসূদন দেশে যার কাছ(মহাদেব চট্টোপাদ্ধ্যায়)তালুক পত্তনি দিয়ে টাকা নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করে এসেছিলেন,তিনি কিছুদিন পর টাকাপাঠানো বন্ধ করে দিলেন,তখন সুদূর বিদেশে কবি বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পরেন,তিনি চিরদিনেরবেহিশেবি ছিলেন,সেটাও তার জীবনের দুরাবস্থার এক বিরাট কারণ। পরিবার এসে পরাতে তার অর্থ সংকট অনেক বেড়ে যায়.১৮৬৩ তে তিনি চারটি টার্ম পড়া শেষ করেন ।তার ব্যারিষ্টার হতে আরো দুই বছর বাকি ছিল, এই পরিস্থিতিতে তিনি,এইভাবে কিছুদিন কাটানোর পরে তিনি পরিবার নিয়ে প্যারিস হয়ে ফ্রান্সের ভার্সাই তে চলে এলেন।তিনি যেহেতু বহু ভাষাবিদ ছিলেন,তিনি মনে মনে ফ্রান্সে এসে ফরাসি ভাষা শেখানোর কাজ পাবেন এমনটা ভেবেছিলেন ।ইংরেজ দের বর্ণবাদে তিনি যথেষ্ট পরিমানে আহত এবং বিরক্ত হয়েছিলেনএকথা তার বিদ্যাসাগর এবং গৌরদাস কে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়.১৮৬৩ সালে মধু তার পরিবার ভার্সাই নগরিতে রেখে লন্ডনে যান ।তার প্রতিনিধি রা যে দেশ থেকে তাকে টাকা পাঠোর ক্ষেত্রে এমনসমস্যা করবেন,তিনি ভাবতে পারেন নি।তিনি যে পরিবার সহ বিদেশে কতখানি দুরবস্থার মধ্যে পরেছিলেন তা প্রকাশ করার মত কোনো ভাষা তিনি খুঁজে পান নি।এদিকে জেল এবং অনাহারে মারা যাবার মত অবস্থায় অসুস্থ শরীরে মধুসূদন, কোলকাতা থেকে আসার দুবছর পরে ১৮৬৪দোসরা জুন চিঠি লেখেন-'আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি,আপ্নি একজন বন্ধু এবং আপনার এই দেশবাসীর মর্মান্তিক সর্বনাস আপনি হতে দেবেন না।...দয়া করে আমাকে উপরের ঠিকানায় ফ্রান্সে লিখবেন,কারণ ঈশ্বর এবং তাঁর নিচে আপনি সাহায্য না করলে আমার পক্ষে এদেশ ত্যাগ করার পার্থিব কোন সম্ভাবনা নেই।-আমার দুঃখের কথা শুনে আপনার কোমল হৃদয় ভেঙ্গে যাবে।"[৪](সংক্ষেপিত)এইভাবে মধুকবি নিজের চরম দুর্দশার কথা পর পর চিঠিতে বিদ্যাসাগর কে জানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কৃপায় মধুসূদন তার ব্যারিষ্টারি পড়া সম্পূর্ণ করে হাজারো সমস্যা পার করে মধুকবি,১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে ভারতবর্ষের পথে ফেরার জন্যে জাহাজে চড়েন।দুমাস পরে কোলকাতায় ফিরলেন রিক্তহস্তে।দেশে ফিরে অসুস্থ হয়ে তার ধনী হওয়ার স্বপ্ন, চিরকালের মত দুঃস্বপ্ন হয়ে গিয়েছিল।মাইকেল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে যে অসাধারণ অবদান রেখে গিয়েছেন,বাঙালী তা কোনোদিন অস্বীকার

করতে পারবে না।তবুও মধুসূদন তার ব্যাক্তি-জীবনে যে কতোখানি অসহায় ছিলেন এবং তিনি যে তাঁর নিজের কবর নিজেই খুড়েছিলেন একথাও অনস্বীকার্য।তবু তিনি যে বঙ্গমাতার কাছে মিনতি জানিয়েছিলেন,তা বিফলে যায়নি।

মধুসূদনের শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আইন ব্যবসায়ে তিনি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাছাড়া অমিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কপর্দকহীন (অর্থাভাবে) অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে কলকাতার সার্কুলার রোডে সমাধি দেওয়া হয়। মহাকবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে জন্মভূমির প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসার চিহ্ন রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় পংক্তিমালায়। তার সমাধিস্থলে নিচের কবিতাটি লেখা রয়েছে :

“দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী ”[৫]।

এই প্রসঙ্গে কবিবন্ধু নবীন চন্দ্র সেন বিলাপ করে লিখেছেন –

“অযত্নে মা অনাদরে
বঙ্গ কবিকুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে মাতঃ দিয়াছ বিদায়।”[৬]

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

তথ্যসূত্রঃ

১. মুরশিদ গোলাম,আশার ছলনে ভুলি(মাইকেল জীবনী) প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫

২.সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃ- ৩৯৩

৩. মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, পৃ- ১৩

৪. কথাশিল্প অন্বেষণ-ড.সৌমিত্র শেখর - ১৬৬ পৃ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রিভেট লিমিতেড.৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,কোলকাতা—৭০০০০৯ প্রকাশক সুধীর কুমার মিত্র ।

৫. উইকিপিডিয়া

....

স্বাধীন গবেষক , প্রাক্তন ছাত্রী , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলন - একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রদীপ কর্মকার

সারসংক্ষেপ -

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ‘সামাজিক আন্দোলন’ এই শব্দটি এক ধরণের গোষ্ঠী কর্মকে বোঝায়। এগুলি হল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিশাল অ-আনুষ্ঠানিক সমাবেশ, যা রাজনীতি এবং সমাজের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের দিকে পরিচালিত হয়। এটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার জন্য, তারা নির্দিষ্ট নীতি বা অনুশীলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বা একটি সামাজিক পরিবর্তনকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে। সংস্কার আন্দোলন হল এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন যার লক্ষ্য দ্রুত বা মৌলিক পরিবর্তনের পরিবর্তে সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনা। একটি সংস্কার আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনের মতো আরও উগ্র সামাজিক আন্দোলন থেকে আলাদা করা হয়। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল এবং ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। বৈশ্যরা বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান বৃদ্ধির সাথে তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি করতে চেয়েছিল। এই সবই খ্রিস্টপূর্ব ৭ম থেকে ৫ম শতাব্দীর মধ্যে ভারতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব ঘটায়। ভক্তি আন্দোলন প্রাচীন তামিলনাড়ুতে উদ্ভূত হয়েছিল এবং মধ্যযুগের শেষের দিকে যখন উত্তর ভারত ইসলামী শাসনের অধীনে ছিল তখন উত্তরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। ইসলামি শাসকরা জনগণকে হিন্দু থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। হিন্দু ধর্মকে বাঁচাতে ভক্তি আন্দোলনের নিজস্ব গুরুত্ব ছিল। 19 শতকের ভারত ধর্ম ও সমাজে সংস্কারমূলক কার্যক্রমের একটি শক্তিশালী তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছে। শিক্ষিত তরুণ ভারতীয়দের দ্বারা ধর্ম ও সমাজের মন্দ ও অপব্যবহার শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

মূলশব্দ-

সমাজ, বিপ্লব, আন্দোলন,পরিবর্তন, ভারত ,রাজনীতি ,আন্দোলন

মূল প্রবন্ধ -

সমাজ ও সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতির মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বীজ বর্তমান। সমাজের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক আন্দোলন। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের ব্যক্তিবর্গের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়া সুসংবদ্ধ হয় ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। যদিও সামাজিক আন্দোলনের সহজ-সরল ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। সামাজিক আন্দোলন একটি সমষ্টিগত শব্দ যা সমস্ত উদ্যোগকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় যা একটি নতুন জীবনশৈলী প্রতিষ্ঠা করে। তারা অস্থির অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং অসন্তোষ থেকে, বর্তমান জীবনের রূপ এবং একটি নতুন পরিকল্পনা বা জীবন ব্যবস্থার জন্য ইচ্ছা ও আশা থেকে তাদের উদ্দেশ্য শক্তি অর্জন করে। এর শুরুতে, সামাজিক আন্দোলন ছিল আকারহীন, দুর্বলভাবে সংগঠিত এবং রূপ বিহীন। একটি সামাজিক আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে উঠলে তা একটি সংগঠনের রূপ লাভ করে। এটির একটি প্রথা - ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব, শ্রমের একটি স্থায়ী বিভাগ, সামাজিক নিয়ম এবং সামাজিক মূল্যবোধ রয়েছে। সংক্ষেপে, এর একটি সংস্কৃতি, একটি সামাজিক সংগঠন এবং একটি নতুন পরিকল্পনা বা জীবনধারা রয়েছে। কাঠামোগত সহনশীলতা এবং স্ট্রেন, একটি

সাধারণ বিশ্বাসের সৃষ্টি, পরিস্থিতি, অংশগ্রহণকারীদের একত্রিত করা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ এরূপ ছয়টি প্রাথমিক কারণ যা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক আন্দোলনের নির্ধারক হিসাবে কাজ করে। সামাজিক আন্দোলনের অধ্যয়ন সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে খুবই সহায়ক।

তথ্য সংগ্রহ ও উদ্দেশ্য :-

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে সামাজিক আন্দোলন একটি গুরুত্ব পূর্ণ ইস্যু। এই চিন্তাধারাটি বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জি ও বেশ কিছু অনুলিপি এবং গবেষণা মূলক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধ লেখনীর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল প্রাচীন থেকে আধুনিক সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই সামাজিক আন্দোলন গুলির সংগঠিত হবার মূল কারণটি কি ও তার সমাধান সূত্র কি, তার সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা।

সামাজিক আন্দোলনের ধারণা :-

সামাজিক আন্দোলনের ধারণা ইউরোপে 19 শতকে সমৃদ্ধি লাভ করে। ইউরোপীয় সামাজিক বিশৃঙ্খলা সমাজে পরিবর্তনের জন্য একটি নতুন গতি শুরু করে , যা পরবর্তীতে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে পরিচিত হয়। তৎকালীন রাজনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তি এবং মার্কসবাদী আদর্শ অনুসারে সম্পত্তির অধিকার এবং সম্পর্ক পরিবর্তন করে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। তাদের আদর্শগুলি সামাজিক আন্দোলনের সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়। 1950-এর দশকের শুরু থেকে, অনেক সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক আন্দোলনের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হার্বার্ট ব্লুমার এর মতে, সামাজিক আন্দোলন জীবনের একটি নতুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথ উদ্যোগ। এক বিরাট অস্থির অবস্থায় তাদের সূচনা হয় এবং একদিকে বর্তমান জীবনের অসন্তোষ থেকে এবং অন্যদিকে একটি নতুন জীবন পরিকল্পনা ব্যবস্থার জন্য ইচ্ছা ও আশা থেকে তাদের উদ্দেশ্য শক্তি অর্জন করে। M.S.A. রাও এর ধারণায় - একটি সামাজিক আন্দোলনে মূলত অনানুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মাধ্যমে টেকসই সম্মিলিত সংহতি জড়িত থাকে এবং এটি সাধারণত আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনার দিকে পরিচালিত হয়। T.K. ওমেন এর মতে, একটি আন্দোলন হল একটি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাদের বঞ্চনা প্রশমিত করার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি সচেতন প্রচেষ্টা, একটি আন্দোলন সামাজিক কাঠামোর কারণগুলির দ্বারা শর্তযুক্ত; একটি আন্দোলন সম্ভবত প্রধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বঞ্চিত অংশ অভিযোগের প্রতিকারের জন্য একটি আদর্শের দ্বারা একত্রিত হয়ে তার শক্তি প্রদর্শন করে। অধ্যাপক ওয়াই. সিং বলেছেন - সামাজিক আন্দোলন হল একটি মতাদর্শগতভাবে সংজ্ঞায়িত সামাজিক উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য একটি ব্যক্তি বা যৌথ নেতৃত্বে একটি সংগঠিত পদ্ধতিতে একটি সমাজে জনগণের সমষ্টিগত সংগঠনের একটি প্রক্রিয়া।

সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য :-

সামাজিক আন্দোলনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল, যেমন-

১) এটি একটি ব্যক্তিগত বা সমষ্ঠিগত প্রচেষ্টা।

২) এর উদ্দেশ্য হল বিদ্যমান সমাজের পরিবর্তন আনা বা বিশেষ কোন পরিবর্তনকে প্রতিহত করা।

৩) এটা সু-সংগঠিত হতে পারে আবার অসংগঠিত হতে পারে।

৪) এটা শান্তিপূর্ণ হতে পারে আবার হিংসাত্মক হতে পারে।

৫) এর স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে আবার ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে।

'সামাজিক আন্দোলন' - শব্দটি 1850 সালে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী লরেঞ্জ ফন স্টেইন তার বই, "হিস্ট্রি অফ দ্য ফ্রেঞ্চ সোশ্যাল মুভমেন্ট ফ্রম 1789 টু দ্য প্রেজেন্ট" (1850) এ প্রবর্তন করেছিলেন। সামাজিক আন্দোলন হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন, প্রতিরোধ। একটি সামাজিক আন্দোলন সাধারণত সামাজিক কাঠামোতে সংস্কার বা পরিবর্তন আনার লক্ষ্য রাখে। এটি একটি সমাজে বঞ্চনা ও শোষণের অবস্থা থেকে জন্ম নেয়। একটি সামাজিক আন্দোলন একটি ইচ্ছাকৃত, সংগঠিত এবং সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। এর উদ্দেশ্য হল সমাজের সদস্যদের পক্ষ থেকে নিজেদের জন্য আরও সন্তোষজনক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। সামাজিক আন্দোলন বলতে সমাজে ভালো অবস্থা অর্জনের জন্য একটি সম্মিলিত ক্রিয়া বা আচরণ বোঝায়। এইভাবে, তারা একটি বৃহত্তর সমাজে আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তন করার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সমিতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। অনেক সময় সমাজে অন্যায়, বেআইনি ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্য এর মধ্যে থাকে। কখনও কখনও এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং আপেক্ষিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যা আধুনিক পশ্চিমি সংস্কৃতিতে প্রচলিত রয়েছে তা অভূতপূর্ব সংখ্যক সামাজিক আন্দোলনের জন্য দায়ী। 19 শতকের সমাজের শিল্পায়ন এবং নগরায়নের কারণে আধুনিক পশ্চিমি সামাজিক আন্দোলনগুলি শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। একটি সামাজিক আন্দোলন হল সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের সচেতনভাবে সংগঠিত এবং পরিকল্পিত কার্যকলাপ। আধুনিক বিশ্বে, এটি মূলত বিভিন্ন স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ গঠনের উপর নির্ভর করে। সামাজিক শ্রেণী এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মতো, 'সামাজিক আন্দোলন' শব্দটি বিভিন্ন পণ্ডিতরা মূর্খতার সাথে ব্যবহার করেন। প্রথমত, একটি সামাজিক আন্দোলন হল একদল লোক যারা একটি আমূল নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। মানুষ একটি বাসের ক্ষতি করতে পারে এবং তার চালককে আক্রমণ করতে পারে যখন বাসটি একটি শিশুর উপর চলে যায়। এটা প্রতিবাদের বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যেহেতু এটি জ্বলে ওঠে এবং মারা যায় এটি একটি সামাজিক আন্দোলন নয়। একটি সামাজিক আন্দোলন সময়ের সাথে সাথে টেকসইভাবে ও সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রয়োজন। এই ধরনের পদক্ষেপ প্রায়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্রের নীতি বা অনুশীলনে পরিবর্তনের দাবিতে রূপ নেয়। স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত প্রতিবাদকে সামাজিক আন্দোলনও বলা যায় না। সম্মিলিত পদক্ষেপ অবশ্যই কিছু মাত্রার সংগঠন দ্বারা চিহ্নিত করা উচিত। এই সংস্থায় একটি নেতৃত্ব এবং একটি কাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা সংজ্ঞায়িত করে কিভাবে সদস্যরা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেগুলি সম্পাদন করে। যারা একটি সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তাদেরও উদ্দেশ্য এবং মতাদর্শ রয়েছে। একটি সামাজিক আন্দোলনের একটি সাধারণ অভিযোজন বা উপায় রয়েছে যা পরিবর্তন নয় আসে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধ্রুবক নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হতে পারে। সামাজিক আন্দোলনগুলি প্রায়শই জনসাধারণের ইস্যুতে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে উদ্ভূত হয়, যেমন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বন ব্যবহার করার অধিকার বা বাস্তুচ্যুত লোকদের বসতি এবং ক্ষতিপূরণের অধিকার নিশ্চিত করা অতীতে এবং বর্তমান সময়ে সামাজিক আন্দোলনগুলি যে অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়েছিল সেগুলি। যদিও সামাজিক আন্দোলনগুলি সামাজিক পরিবর্তন আনতে চায়, কখনও কখনও স্থিতাবস্থা রক্ষায় পাল্টা আন্দোলন দেখা দেয়। এরকম পাল্টা আন্দোলনের অনেক নজির আছে। রাজা রামমোহন রায় যখন সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালান এবং ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন, তখন সতীদাহের রক্ষকরা ধর্মসভা গঠন করেন এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন না করার জন্য ব্রিটিশদের কাছে আবেদন করেন। সংস্কারকরা যখন মেয়েদের জন্য শিক্ষার দাবি করেন, তখন অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলেন যে এটি সমাজের জন্য বিপর্যয়কর হবে। সংস্কারকরা যখন বিধবা পুনর্বিবাহের জন্য

প্রচারণা চালায়, তখন তাদের সামাজিক ভাবে বয়কট করা হয়। যখন তথাকথিত 'নিম্ন বর্ণের' ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয়, তখন কিছু তথা কথিত 'উচ্চ বর্ণের' ছেলেমেয়েদের তাদের পরিবার স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। কৃষক আন্দোলন প্রায়ই নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি দলিতদের মতো পূর্ববর্তী বর্জিত গোষ্ঠীগুলির সামাজিক আন্দোলনগুলি প্রায়শই প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে। একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ বাড়ানোর প্রস্তাব তাদের বিরোধিতা করে পাল্টা আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেছে। সামাজিক আন্দোলন সমাজকে সহজে পরিবর্তন করতে পারে না। যেহেতু এটি স্বার্থ এবং মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যায়, তাই বিরোধিতা হতে বাধ্য। প্রতিরোধ এর মানসিকতা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে। যদিও প্রতিবাদ হল সম্মিলিত কর্মের সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ। সামাজিক আন্দোলনের কর্মীরা তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলিকে ঘিরে জনগণকে একত্রিত করার জন্য মিটিং করে। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ গুলি ভাগ করা বোঝাপড়ায় সহায়তা করে এবং কীভাবে সম্মিলিত এজেন্ডা অনুসরণ করা যায় সে সম্পর্কে চুক্তি বা ঐকমত্যের অনুভূতির জন্য প্রস্তুত হয়। সামাজিক আন্দোলন গুলিও প্রচারাভিযানের তালিকা তৈরি করে যার মধ্যে সরকার, মিডিয়া এবং জনমতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতাদের সাথে লবিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি হতে পারে মোমবাতি এবং মশাল আলোর মিছিল, কালো কাপড়ের ব্যবহার, রাস্তার থিয়েটার, গান, কবিতা পাঠের দ্বারা। গান্ধী অহিংসা, সত্যাগ্রহ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে চরখা ব্যবহারের মতো অভিনব উপায় অবলম্বন করেছিলেন। এছাড়া পিকেটিং এবং লবণ উৎপাদনে ঔপনিবেশিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার মত প্রতিবাদের উদ্ভাবনী পদ্ধতির কথা স্মরণ করুন। ভারতের সামাজিক আন্দোলন গুলির মধ্যে ঝাড়খণ্ডের কৃষক আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন, বিভিন্ন দলিত আন্দোলন, নর্থ ইস্ট আন্দোলন প্রভৃতির কথা বলা যায়।

সামাজিক আন্দোলনের কারণ :-

সামাজিক আন্দোলনের নিম্নলিখিত কারণগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন,

১) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন:-

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে, ফলে সমাজে মানুষের আচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে তেমনি নতুন নতুন ধারণা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হচ্ছে। এই নতুন নতুন ধারণা বা মূল্যবোধগুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে নারীদের স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন, সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ লিঙ্গ, বৈষম্য দূরীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার প্রভৃতির কথা বলা যায়।

২) সামাজিক বিশৃঙ্খলা:-

সামাজিক পরিবর্তন সমাজের সকল স্তরে একইসাথে সংগঠিত হয় না, সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশে পরিবর্তন সংঘটিত হলেও অপর কোনো অংশ অপরিবর্তিতই থেকে যায়। এই অপরিবর্তিত অংশ পরিবর্তিত অংশের সাথে মানিয়ে চলতে পারে না। ফলে পরিবর্তিত সমাজের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অপরিবর্তিত সমাজের নাগরিকদের মনে বিদ্যমান শাসকবর্গের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তারা সেই অপরিবর্তিত সমাজে নিজেদের সুরক্ষার কথা ভেবে হতাশাগ্রস্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপরিবর্তিত সমাজে এই সুরক্ষাহীনতা, হতাশা ও দ্বিধাগ্রস্ততা একসময় আন্দোলনের সূচনা করে।

৩) সামাজিক অবিচার:-

কখনো কখনো কোনো বিশেষ শ্রেণী, সমাজে নিজেদের নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত বলে মনে করেন। তারা তাদের শোষণ, বঞ্চনার বা লাঞ্ছনার জন্য বিদ্যমান সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দায়ী করে। তারা তাদের এই শোষণ, বঞ্চনা বা লাঞ্ছনার অবসানের জন্য বিদ্যমান শাসক বর্গের কাছে দাবী জানায়। কিন্তু তাদের সেই শোষণ-বঞ্চনা বা লাঞ্ছনার আশানুরূপ অবসান না ঘটলে তারা সামাজিক আন্দোলনে সামিল হয়।

৪) বিদ্যমান শাসকবর্গের ব্যর্থতা:-

অনেক সময় বিদ্যমান শাসকবর্গ জনগণের চাহিদা মতো প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে কিংবা শাসকবর্গ স্বৈরাচারী বা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে বিদ্যমান সাসন ব্যবস্থার বা সরকারের পরিবর্তন বা সংস্কার সাধনের উদ্যোগ দেখা যায়। বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা বা সরকারের সংস্কারসাধনের এই পরিবর্তন বা পয়াস সামাজিক আন্দোলনের মধ্য। প্রকাশ পায়।

৫) সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি গুলিকে রক্ষা:-

অনেক সময় সমাজের দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত রীতিনীতি বা মূল্যবোধগুলো বিধ্যমান শাসকবর্গ বা সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সমাজের সংস্কারবাদী মুষ্টিমেয় কিছু গোষ্ঠী সমাজের দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি নীতি বা মূল্যবোধগুলোকে সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নিলে, সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তখন সেই রীতিনীতি গুলি রক্ষার জন্য সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তনকে বাধা দেয়।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সামাজিক আন্দোলনের প্রকার :-

সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন-

(i) অভিবাসী সামাজিক আন্দোলন :-

এটি এমন এক ধরণের সামাজিক আন্দোলন যেখানে অংশগ্রহণকারীরা একটি সামাজিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলির পক্ষে থাকে এবং সেগুলি অর্জন করতে আগ্রহী, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ে তাদের স্বদেশে অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পায় না এবং অভিবাসন করে। অন্য কোথাও।

(ii) অভিব্যক্তিমূলক সামাজিক আন্দোলন :- এটি এমন এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি একটি সামাজিক আন্দোলন শুরু করতে চায় কিন্তু আইনি বিধিনিষেধ এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে তা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং নিজেদেরকে বর্তমানের সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অবস্থা.

(iii) কাল্পনিক সামাজিক আন্দোলন :-

এটি এমন এক ধরণের সামাজিক আন্দোলন যেখানে যারা আন্দোলন শুরু করে তাদের উদ্দেশ্য একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজ তৈরি করা।

(iv) সংস্কারমূলক সামাজিক আন্দোলন :- এটি এমন এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন যেখানে আন্দোলনের লক্ষ্য বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করা নয় বরং কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার করা।

(v) প্রতিরোধমূলক সামাজিক আন্দোলন:-

এটি এমন এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন যার লক্ষ্য বিদ্যমান শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা।সামাজিক আন্দোলনের শ্রেণীবিভাগ মানের ভিত্তিতে তারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। ঘনশ্যাম শাহ পরিবর্তনের মানের ভিত্তিতে সামাজিক আন্দোলনকে নিম্নলিখিত চারটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন-

(i) **বিদ্রোহ:** এটি হল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ, যার উদ্দেশ্য উৎখাত করা।

(ii) **প্রতিরোধ** : বিদ্রোহ হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কোনো অভিপ্রায় ছাড়াই বিদ্যমান কর্তৃত্বের ওপর আক্রমণ।

(iii) **সংস্কার:** সংস্কার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। এটি আরও দক্ষ, প্রতিক্রিয়াশীল এবং কার্যকর করার জন্য সিস্টেমের অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে।

(iv) **বিপ্লব:** একটি বিপ্লবে, সমাজের একটি অংশ বা অংশগুলি কেবল প্রতিষ্ঠিত সরকার এবং শাসনকে উৎখাত করার জন্য একটি সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে না, বরং আর্থ-সামাজিক কাঠামোও যা এটিকে টিকিয়ে রাখে এবং এটি একটি বিকল্প সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা কাঠামোটিকে প্রতিস্থাপন করে। বিষয়ের ভিত্তিতে সামাজিক আন্দোলনের শ্রেণীবিভাগ - বন আন্দোলন, নাগরিক অধিকার আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন, ভাষাগত আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। অংশগ্রহণকারীদের ভিত্তিতে, সামাজিক আন্দোলনগুলি নিম্নলিখিত ধরণের হয় যথা -

কৃষক আন্দোলন, উপজাতি আন্দোলন, ছাত্রদের আন্দোলন, নারী আন্দোলন ও দলিতদের আন্দোলন।

সাবেকি ও নয়া সামাজিক আন্দোলন:-

বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সামাজিক আন্দোলন শ্রেণী ভিত্তিক ছিল যেমন শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলন বা ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন। যেখানে ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন সমগ্র জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে একত্রিত করেছিল, শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন শ্রেণীকে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে একত্রিত করেছিল। এইভাবে গত শতাব্দীর সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী সামাজিক আন্দোলনগুলো হয়েছে শ্রেণী ভিত্তিক বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে। আপনি আপনার ইতিহাসের বইয়ে পড়েছেন ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং কিউবায়, এই আন্দোলনগুলি পুঁজিবাদের সংস্কারের দিকেও পরিচালিত করেছিল। পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত এবং সার্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানকারী কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সৃষ্টি আংশিকভাবে কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজনৈতিক চাপের কারণে হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মতোই প্রভাবশালী হয়েছে। যেহেতু পুঁজিবাদ এবং ঔপনিবেশিকতা সাধারণত সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে আন্তঃসম্পর্কিত হয়েছে, তাই সামাজিক আন্দোলন একই সাথে এই উভয় ধরনের শোষণকে লক্ষ্য করেছে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিদেশী শক্তির শাসনের বিরুদ্ধে এবং বিদেশী পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের দশকগুলি ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য অনেক দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যের অবসান এবং নতুন জাতি-রাষ্ট্র গঠনের সাক্ষী ছিল। তারপর থেকে, 1960 এবং 1970 এর দশকের শুরুতে সামাজিক আন্দোলনের আরেকটি তরঙ্গ দেখা দেয়। এটি ছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনী কমিউনিস্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন

ফরাসি উপনিবেশে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এর উদাহরন ইউরোপের প্যারিস ছিল একটি প্রাণবন্ত ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু যা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম ঘটে শ্রমিক দলগুলোর সাথে যোগ দেয়। সমগ্র আটলান্টিক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক প্রতিবাদের ঢেউ অনুভব করছিল। মার্টিন লুথার এর নেতৃত্বে নাগরিক অধিকার আন্দোলন, ম্যালকম এক্স-এর নেতৃত্বে ব্ল্যাক পাওয়ার আন্দোলনের দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে হাজার হাজার শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিল যাদের সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ভিয়েতনামে গিয়ে লড়াই করার জন্য খসড়া তৈরি করেছিল। নারী আন্দোলন এবং পরিবেশ আন্দোলনও এই সামাজিক উত্তেজনার সময়ে শক্তি অর্জন করে। এই তথাকথিত 'নতুন সামাজিক আন্দোলনের সদস্যদের একই শ্রেণীর বা এমনকি জাতির অন্তর্ভুক্ত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন ছিল। অংশগ্রহণকারীরা অনুভব করেছিল যে তারা ছাত্র হিসাবে পরিচয় ভাগ করেছে। ভারত নারী, কৃষক, দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্যদের সাথে জড়িত বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই আন্দোলনগুলিকে কি 'নতুন সামাজিক আন্দোলন' হিসেবে বোঝা যায়? গেইল ওমভেদ তার বই ‘ রিইনভেন্টিং রেভোলিউশনে’- উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক বৈষম্য এবং সম্পদের অসম বণ্টন নিয়ে উদ্বেগ এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে চলেছে। কৃষক আন্দোলনগুলি তাদের পণ্যের ভাল দামের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং কৃষি ভর্তুকি অপসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। দলিত শ্রমিকরা সম্মিলিত ভাবে কাজ করেছে যাতে তারা উচ্চবর্ণের জমির মালিক এবং মহাজনদের দ্বারা শোষিত না হয়। নারী আন্দোলন প্রসার করেছে লিঙ্গ সমস্যা কর্মক্ষেত্র এবং পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য। একই সময়ে, এই নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বৈষম্যের 'পুরানো' বিষয় নয়। অথবা তারা একা ক্লাস লাইন বরাবর সংগঠিত হয় না. পরিচয়ের রাজনীতি, সাংস্কৃতিক উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষা গুলি সামাজিক আন্দোলন তৈরির জন্য অপরিহার্য উপাদান এবং এমনভাবে ঘটে যা শ্রেণী-ভিত্তিক বৈষম্যের সন্ধান করা কঠিন। প্রায়শই, এই সামাজিক আন্দোলনগুলি শ্রেণী সীমানা পেরিয়ে অংশগ্রহণ কারীদের একত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ, নারী আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে শহুরে, মধ্যবিত্ত নারীবাদীদের পাশাপাশি দরিদ্র কৃষক নারীরাও। নয়া সামাজিক আন্দোলন নিয়ে অধুনা ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে। এই সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন সাধন হল নয়া আন্দোলন সমূহের উদ্দেশ্য। বিদ্যমান মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত পরিচিতি ও প্রতীকসমূহের রূপান্তর সাধনের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা। নয়া সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়াদি প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয়কে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা যায়: (১) নয়া সামাজিক আন্দোলনের কোনো শ্রেণিগত ভিত্তি নেই। (২) প্রকৃতিগত বিচারে প্রধানত সামাজিক। (৩) বিদ্যমান প্রয়োজন পূরণের তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে এটি সংগঠিত হয়। (৪) নাগরিক সমাজের বিষয়াদি বহুলাংশে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। (৫) এই আন্দোলন অনেকাংশে নমনীয়তার সঙ্গে এবং প্রথা-বহির্ভূতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। (৬) এই আন্দোলন নিজেদের কর্মসূচি ও কার্যপ্রক্রিয়ার প্রচারের জন্য গণমাধ্যমসমূহের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। (৭) প্রতিবাদী রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় শামিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির বিষয়াদিও এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমার অভিমত :-

সমস্ত কিছু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে , সমাজ ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে, সমাজের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রারও বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকের শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে এই সামাজিক আন্দোলন প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে, এইরূপ আন্দোলন ধনী - দরিদ্র, শিক্ষিত - মূর্খ, কিছু বিচার করে না, এটি একটি মানসিক আশা আকাঙ্খা না পূরণের লড়াই, যা প্রতিনিয়ত গতিশীলভাবে এগিয়ে চলেছে। এই ধারণাকে কোন নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। আমার

মতে বর্তমান সমাজ, রাজনীতি ও সমগ্র সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে তাদের একটা তাগিদ থাকা ভীষন দরকার সেটা কোন বিপ্লব নয় বরং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বা সংস্কার মূলক পথে হওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র :-

১. বসু, সজল, ভারতের সামাজিক আন্দোলন, বুক পোস্ট পাবলিকেশন, ভারত,২০০৭.

২. লতিফউদ্দিন, সেখ, ভারতের সামাজিক আন্দোলন, আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, ২০২১.

৩. মহাপাত্র, অনাদি, ভারতের সামাজিক আন্দোলন, সুহৃদ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১১.

৪. মহাপাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সুহৃদ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০

৫) সত্যব্রত চক্রবর্তী, রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, একুশে প্রকাশন,কলকাতা,২০০২.

৬) অমল মুখোপাধ্যায় ও ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত ও বিশ্ব : সমাজ,রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠন, শ্রীধর পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০১.

৭) প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্র ও রাজনীতি : তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক,বিজয়া পাবলিশিং হাউস,কলকাতা,২০০৭.

৮) প্রণব কুমার দালাল, স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৭,কলকাতা।

৯. Menon,Krishna & Subberwala, Ranjana, Social Movements in contemporary India, Sage publication, New Delhi, 2019.

১০. Shah, Ghanshyam, Social Movements in India; A literature review, Sage India, New Delhi, 2004.

১১. Deogaonkar, S, G, Social Movements in India & Abroad, Shree Sainath Prakashon,Nagpur, 2016.

....

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এস.এফ.এস.মহাবিদ্যালয়,বীরভূম

সামজিক চুক্তির মতবাদের আলোকে শাস্তিতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা

মন্দিরা ঘোষ

সারসংক্ষেপ-

আমাদের সাধারণ নীতি জ্ঞানের দাবী হল নৈতিক তথা উচিৎ কর্মকে সর্বদা ও সর্বত্র পুরস্কৃত হতে হবে এবং অনৈতিক তথা অনুচিত কর্মকে সর্বদা ও সর্বত্র তিরস্কৃত তথা শাস্তিযোগ্য হতে হবে। তবে বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই প্রত্যাশা পূরণ হয় না। সৎ ও ধার্মিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে আমরা প্রায়শঃই দুঃখ পেতে দেখি। অপরপক্ষে দুবৃত্ত, নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদের নিরুদ্বেগ, বিলাসবহুল, অনুশোচনাহীন, উল্লাসময় জীবন উপভোগ করতে দেখি। সমাজে, রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বে ন্যায়-নীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এমন অব্যবস্থা মেনে নেওয়া চলে না। এইজন্যই নীতিবিদগণ নৈতিক সুকর্মকে পুরস্কৃত করার জন্য এবং নৈতিক দুষ্কর্মের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে 'জন্মান্তর' ও 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব'কে নৈতিকতার দুটি স্বীকার্য সত্যরূপে স্বীকার করেছেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে পাপী বা দুষ্কৃতি তিরস্কৃত না হলে বা, শাস্তি না পেলে নৈতিক আদর্শ মিথ্যা প্রহেলিকায় পর্যবসিত হয়। ন্যায়ের মূল্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্যই অপরাধীর শাস্তি প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে শাস্তি হল অপরাধীর অর্জিত বিষয় অর্থাৎ অপরাধমূলক কর্মের মাধ্যমে অপরাধী শাস্তি অর্জন করে। ব্যক্তি যা অর্জন করে ব্যক্তিকে তা ভোগ করতে দেওয়াই হল ন্যায়নীতি।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD - 2015 PEER-REVIEWED REFEREED JOURNAL

মূল শব্দ-

ন্যায়সঙ্গত কর্ম, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, উপযোগবাদ, সামাজিকচুক্তি।

মূল প্রবন্ধ

মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত। সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনে প্রতিটি সমাজে কতকগুলি নিয়মকানুন, রীতি-নীতি প্রচলিত আছে। মানুষ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে এই প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করে তখন তা 'অপরাধ' হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এই 'অপরাধ' নামক ধারণার পাশাপাশি অপর অন্য আর একটা ধারণা সমান্তরাল ভাবে চলে আসে সেটা হল শাস্তির ধারণা। আমাদের মনে এরূপ ধারণা গ্রথিত আছে যে, অপরাধ করলেই শাস্তি পেতে হয়। শাস্তি হল অপরাধীর কৃতকর্মের ফল। এই শাস্তির উদ্দেশ্যই যেন অপরাধ দমন পূর্বক বিনাশ করে (good society) উত্তম সমাজ গঠন করা।

এখন প্রশ্ন হল, উত্তম সমাজের বৈশিষ্ট্য কী? অর্থাৎ কখন আমরা একটি সমাজকে উত্তম সমাজ রূপে গণ্য করবো? সাধারণত উত্তম সমাজ বলতে সেই সমাজকে বোঝানো হয়, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিয়ম-কানুন মেনে সুশৃঙ্খলিত জীবন যাপন করে। প্রাচীন সমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত প্রত্যেক সমাজকে মূল্যবোধক কিছু রীতি-নীতি, প্রথা, আচার, বিধি বা নিয়ম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। সমাজস্থ মানুষকে যা ঐক্যবদ্ধ করেছে, সমাজস্থ ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজ জীবন সুসংহত করেছে। বটোমার (T. B Bottomore) বলেন, সমাজস্থ ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর আচরণ দুইভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে – বল প্রয়োগের দ্বারা এবং কোন মূল্যবোধ বা আদর্শের প্রতিষ্ঠার

দ্বারা, যে মূল্যবোধ বা আদর্শকে সমাজের মানুষ অধিক-অনধিক ভাবে অবশ্য পালনীয় আচরণ-বিধি রূপে গ্রহণ করতে পারে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সমাজতাত্ত্বিকরা সাধারণত দ্বিতীয় প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই উল্লেখ করেছেন।[1] তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা বল প্রয়োগেরও নিদান দিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে আমরা থমাস হবস্ (Thomas Hobbes) প্রবর্তীত সামাজিক চুক্তির উল্লেখ করতে পারি। হবস্-এর মতে প্রকৃতির নিয়মে আমরা অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী হলেও আমরা সেই স্বাধীনতা উপভোগ করতে সক্ষম হব না যদি না আমরা একত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কিছু স্বাধীনতা ত্যাগ করি। কারণ, আবাধ স্বাধীনতা সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হয়ে থাকে। তাই সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন প্রকৃতি প্রদত্ত অবাধ স্বাধীনতার কিছুটা বর্জন করে কিছু রীতি নীতি মেনে চলা। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ হলেই যে ব্যক্তি সর্বদা রীতি নীতি মেনে চলবেন সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। অবস্থাভেদে এই নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

আমরা কেন চুক্তিবদ্ধ হয়ে রীতি নীতি অনুসরণ করব এবং যাঁরা উক্ত রীতি নীতি অনুসরণ করবেন না তাঁদের তা করতে বাধ্য করার জন্য কেন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সেটি উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মনুষ্য প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমরা যদি ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে –

১. প্রতিটি ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে নিজের স্বার্থের দ্বারা চালিত হন।

২. প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষমতা আছে অন্যের ক্ষতি করার। এমনকি সেই ব্যক্তি তাঁর থেকে সবল ও চতুর হলেও। ক্ষেত্র বিশেষে একার দ্বারা না হলেও অনেকে মিলে সেটা করতে সক্ষম।

৩. প্রতিটি ব্যক্তির কিছু প্রাথমিক চাহিদা (যেমন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ইত্যাদি।) আছে যেগুলি সে পূরণ করতে চায়। প্রাথমিক চাহিদার অতিরিক্তও কিছু চাহিদা আমাদের থাকে।

আমরা যদি আবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করতে চাই তাহলে অনিবার্য পরিণতি হবে সংঘাত, যা সকল ব্যক্তির যে কোন রকম স্বার্থ সিদ্ধির পরিপন্থী। এই সত্য উপলব্ধি করেই মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত অবাধ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ উপভোগ না করে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সামাজিক কিছু নিয়ম মেনে চলতে সম্মত হয় (হবস্, ১৯৬৫)। ফলে একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

সামাজিক জীবন তথা সমাজ ব্যবস্থা যখন এরকম সুসংবদ্ধভাবে অতিবাহিত হয়, তখনই একটা সমাজ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত (good বা just) হয়ে ওঠে। যেকোন সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, সমাজে বসবাসকারী লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। কে কার সঙ্গে কি অবস্থায় কি রকমের আচরণ করবে –এটা মোটামুটি নির্ধারিত থাকে। যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের নিয়ম বিরুদ্ধ। কারণ, যথেচ্ছ আচরণ স্বীকৃত হলে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। প্লেটোর দর্শনে উত্তম সমাজ (good society) না বলে ন্যায়সঙ্গত সমাজ (just society) – এর কথা বলা হয়েছে। প্লেটোর মতে, একটা সমাজ ন্যায়সঙ্গত হয়ে উঠবে যদি সেই সমাজ ন্যায়-নীতির দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। ব্যক্তি দেহ সুস্থ ও সবল রাখতে গেলে যেমন নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন, তেমনি সমাজ তথা রাষ্টব্যবস্থার সুস্থতা নির্ভর করে পারস্পারিক সহযোগিতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপর। প্লেটো তাঁর ***Republic*** নামক গ্রন্থে

[1] T. B Bottomore, Sociology, Blackie & Son (India) LTD. 1975

কতকগুলি সদ্‌গুণ অর্জনের কথা বলেছেন যেগুলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হতে পারে। প্লেটোর মতে সেই সদ্গুণগুলি হল ---- ১) প্রজ্ঞা ২) সাহস ৩) সহনশীলতা ৪) ন্যায়পরায়ণতা। এর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা হল আত্মার সেই গুণ যা ব্যক্তির নিজের স্বার্থকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি সার্বজনীন মঙ্গল বা কল্যাণকর কর্মে উদ্দীপ্ত করে। তিনি বলেন, মানুষের জীবন কেবলমাত্র আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থের জীবন হওয়া উচিত নয়। অন্যের ক্ষতি করা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কখনও কাম্য নয়। এই সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই হচ্ছে সমাজের ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তি। আর ব্যক্তি যেহেতু সমাজের অতিরিক্ত নয়, এই ন্যায় সঙ্গত ব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠে ন্যায় সঙ্গত সমাজ। ন্যায়সঙ্গত সমাজে প্রত্যেক মানুষকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা হবে। প্রতিটি মানুষ তার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ রেখে কর্মসম্পাদন করবে অন্যের ক্ষতিসাধন না করে। তবেই একটা সমাজ ন্যায়নিষ্ঠ ও উত্তম সমাজ বলে বিবেচিত।[2]

প্রশ্ন হতে পারে, একটি উত্তম সমাজ গড়ে তোলার জন্য punishment বা শাস্তির কি কোন ভূমিকা আছে বা প্রয়োজনীয়তা আছে - শাস্তির প্রয়োজনীয়তা দুই দিক থেকে আছে- ১) সদর্থক দিক আর নঞর্থক দিক। সদর্থক দিক থেকে যদি শাস্তির প্রয়োজনীয়তা good society বা উত্তম সমাজ গঠন করা হয় তবে নঞর্থক দিকটা হলো ব্যক্তিকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত করার মাধ্যমে মন্দ সমাজ উদ্ভব প্রতিহত করা (prevent for the bad society). সদর্থক দিক হোক বা নঞর্থক দিক হোক মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আসলে উত্তম সমাজ গঠন। উত্তম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শাস্তির ভূমিকা সর্বজনগ্রাহ্য কিনা, অথবা যাঁরা শাস্তির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করবেন তাঁরা কি শাস্তিকে সমাজের মঙ্গলের হেতু (good for society) বলবে, নাকি ব্যক্তির মঙ্গলের হেতু (good for human being) বলবে এই সকল প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ব্যক্তি হল সমাজের একক ও ধারক। তাই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ কল্পনাতীত। ব্যক্তি অতিরিক্ত সমাজ বলে কিছু নেই। সমাজ হল ব্যক্তিসমষ্টি। ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা সমাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পায়, ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য শাস্তি যদি একটা মানদন্ড হয় বা good for human being হয় অনন্তর শাস্তি হবে good for society; কারণ, ব্যক্তি সমাজের বাইরে নয়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান যা ব্যক্তির মঙ্গলের হেতু নয় তা সমাজের মঙ্গলের হেতু হতে পারেনা। অপরদিকে যা সমাজের মঙ্গলের হেতু হয় তা ব্যক্তির মঙ্গলের হেতু না হয়ে পারেনা।

প্রশ্ন হতে পারে উত্তম সমাজ গঠনের জন্য যারা শাস্তির ভূমিকা স্বীকার করেছেন তারা কেন স্বীকার করেছেন- পূর্বে বলা হয়েছে, শৃঙ্খলিত সমাজকে উত্তম সমাজ বলে। কোন ব্যক্তি যদি এই সামাজিক নিয়ম-নীতি শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে তখন তা 'অপরাধ' রূপে ধরা হয় এবং সেই অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল অপরাধ সংঘটিত হলে শাস্তি বিধান করবে কে? প্রাথমিকভাবে আমরা অপরাধ করলে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠগণ শাস্তি প্রদান করে থাকেন। যেমন, কোন বালক কোন অপরাধ করলে পিতা-মাতা শাস্তি প্রদান করেন। বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ বা রাষ্ট্র অপরাধের শাস্তি প্রদান করে। তবে সমস্যা হল ব্যক্তি অপরাধ সর্বসমক্ষে করেন না যে তাঁকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া সর্বদা সম্ভব হবে। অর্থাৎ এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা এমন ভাবে অপরাধ করতে পারেন যাতে তাঁর অপরাধ কেউ বুঝতে না পারে। প্লেটো তাঁর রিপাব্লিক নামক গ্রন্থে গাইজেস্ নামক একটি চরিত্র তুলে ধরেছিলেন যিনি এমন একটি আশ্চর্যজনক আংটি খুজে পান যেটিতে খচিত পাথরটি আঙুলের ভিতরের দিকে ঘোরালে তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন। এখন এমন একটি আংটি পেলে যে কেউ যে কোন অপরাধ সংঘটিত করতে পারেন যা কোন ভাবেই প্রকাশিত হবে না (প্লেটো ১৮৯১: ১২৭৮)। সেক্ষেত্রে তাঁর শাস্তি বিধানের কী হবে?

[2] Plato, *The Republic of Plato*, Francis Macdonald Cornford (trans.), London, Oxford University Press, 1945

এই সমস্যার সমাধানে সমাজতত্ত্ববিদগণ বলেন প্রতিটি ব্যক্তির একটি অন্তর সত্ত্বা (Inner Self) আছে যেটিকে বিবেক বলা হয়। কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় করেন তাহলে তিনি এই বিবেকের দংশন অনুভব করবেন। অর্থাৎ ব্যক্তির বিবেক তাঁকে শাস্তি দেবে। কিন্তু সমস্যা হল বাস্তবে আমরা ভিন্ন ঘটনাও দেখতে পারি। অর্থাৎ ব্যক্তি অপরাধ করলেও বিবেকের দংশন অনুভবই করেন না। এমনকি জনসমক্ষে অপরাধ সংঘটিত করেও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না। অর্থাৎ বিবেকের দংশনরূপ শাস্তির সম্ভাবনাই তাঁদের ক্ষেত্রে থাকে না। এর উত্তরে বলা যায় এমনও হতে পারে যে ব্যক্তি অপরাধ করে বিবেকের দংশন অনুভব করছে তবে সর্বসমক্ষে তা প্রকাশ করছেন না। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে এমন ব্যক্তিও বিরল নয় যাঁর বিবেক বলে কোন পদার্থই নেই বা থাকলেও তা জাগ্রত নয়। সেক্ষেত্রে বিবেকের দংশনরূপ শাস্তি তার কাছে অবান্তর। এমন ব্যক্তি যদি গাইজেসের প্রাপ্ত আংটি হস্তগত করতে পারেন তাহলে তিনি যে কোন প্রকার অপরাধ করার আগে বিন্দুমাত্র ভাবিত হবেন না (প্লেটো : ১২৭৮)। এমন ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা কী হবে? এই সমস্যার সমাধানে অতিপ্রাকৃতিক কিছু স্বীকার করতে হয়। যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলে থাকি। অর্থাৎ সমাজ বা রাষ্ট্র যখন শাস্তি প্রদানে অসমর্থ, বিবেক যেখানে নিদ্রিত সেখানে ঈশ্বর শাস্তি প্রদান করে থাকেন। প্লেটো বলেন ব্যক্তির পাপ ও পূণ্যের নিরিখে ঈশ্বর শাস্তি অথবা পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

উপযোগবাদী দার্শনিক বেন্থাম ও মিল সামাজিক মঙ্গল ও নৈতিক শৃঙ্খলার জন্য শাস্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তিনি উপযোগবাদী নীতির সাহায্যে শাস্তির নৈতিক ভিত্তিকে স্বীকার করেন। তাঁর মতে, শাস্তি এই জন্যই সমর্থনযোগ্য যে তা অপরাধীর উপকারে আসবে এবং অন্যদের সুরক্ষা দেবে। এক্ষেত্রে তাঁরা হবস্‌কে অনুসরণ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্লেটো থেকে শুরু করে প্রায় সব নীতিদার্শনিকরা শাস্তির পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ অপরাধী যখন স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে অপরাধ করে তখন সে কেবল অপরের ক্ষতি সাধন করে না বরং সমাজে তার নিজের নিরাপত্তারও বিঘ্ন ঘটায়। তাই ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করে, সেই জন্য অপরাধীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD.-2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

শাস্তির উদ্দেশ্য হল - অপরাধী ব্যক্তির অনুশোচনা জাগানো। সে যে ভুল করেছে এবং ভবিষ্যতে আর এই ধরনের ভুল যাতে না করে অর্থাৎ পুনরায় অপরাধ করা থেকে তাকে বিরত রাখা। আর এইভাবে প্রত্যেক অপরাধীকে অপরাধ থেকে বিরত রেখে পুরো সমাজকে অপরাধ মুক্ত করা সম্ভব এবং এটিই হল শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি কেউ শাস্তিপ্রদান করার যে নিয়ম সেই নিয়মকে গ্রহণ না করেন অর্থাৎ যদি কেউ বলেন শাস্তি প্রদানের নিয়ম গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এই নিয়ম কেবলমাত্র প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের প্রতিফল। তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা যায় প্রকৃতপক্ষে শাস্তি কেবলমাত্র প্রতিশোধমূলক ব্যাপার নয়। কেননা প্রতিশোধ সবসময় আত্মকেন্দ্রিক ব্যাপার অর্থাৎ প্রতিশোধের বেলায় ব্যক্তিকে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু শাস্তির বেলায় ব্যক্তিকে বিবেচনায় না এনে শুধু তার কৃত অন্যায়ের কথা বিবেচনা করা হয়। শাস্তির উদ্দেশ্য হলো, সমাজের অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করা, অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং সংশোধনের মাধ্যমে অপরাধীর চরিত্রের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা।

উত্তম সমাজ গড়ে তোলার জন্য শাস্তির প্রয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে, তখন আমাদের মনে এরকম প্রশ্ন ওঠে যদি কোন ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের অগোচরে কোন অপরাধ সংঘটিত করতে সক্ষম হন এবং তিনি যদি বিবেকবান ও ধার্মিক না হন তাহলে তাঁকে অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থেকে ন্যায় সঙ্গত কর্ম করার প্রতি যে বাধ্যবাধকতা বোধ সেই বাধ্যবাধকতা বোধের উৎস কোথায়? এরূপ প্রশ্ন কেবল শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেকোনো নৈতিক মানদন্ডকে যখন সমাজে স্থাপন করতে চাইছি সেই প্রতিটি নৈতিক মানদণ্ডের প্রতি এমন প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপন করা হয়। নীতি দর্শনের অন্যতম প্রধান দিক হলো এই গুলিকে উপেক্ষা না করে বরং এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া। বাস্তবিকপক্ষে যখনই কোন

ব্যক্তি একটি মানদণ্ডকে গ্রহণ করতে চায়, তখনই এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে। শাস্তির প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা সমাজের সকল ব্যক্তির হিতসাধনের দ্বারা উত্তম সমাজ গঠন করার কথা বলছি। সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, সাধারণের মঙ্গলকে বৃদ্ধি করতে আমি বাধ্য হবো কেন? যদি আমার নিজস্ব মঙ্গলের সাথে সাধারণের মঙ্গলের সংঘাত হয় তবে আমি কেন নিজস্ব মঙ্গলকেই প্রাধান্য দেব না? ধরা যাক, একজন চোর, চুরি করার মধ্যেই তার মঙ্গল কিন্তু সমাজের প্রেক্ষিতে চুরিটা খারাপ কাজ, এটি অন্যায়। তাই সর্বসাধারণের মঙ্গল চুরিরূপ অন্যায় কাজকে সমাজ থেকে উৎখাত করা, এটিই সমাজের জন্য শ্রেয়। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি চোরের মঙ্গলের সাথে সমাজের মঙ্গলের সংঘাত হচ্ছে। অর্থাৎ নীতিবোধ সম্বন্ধে উপযোগবাদীমত গ্রহণ করলে এরূপ সমস্যার সম্মুখীন আমাদের বারংবার হতে হয়। যতদিন পর্যন্ত উপযোগবাদের প্রভাবে কোন ফলাফলকে শুভ বলে মনে করার প্রতি নৈতিক চরিত্র গঠিত না হয়, যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সহসৃষ্টদের (fellow men) প্রতি একাত্মবোধ আমাদের চরিত্রের মধ্যে সুদৃঢ় না হয়, এবং কোন একটি নীতি যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষের মনে প্রয়োগের পবিত্র ইচ্ছার সাথে একেবারে গেঁথে না যায় সেই পর্যন্ত এই সমস্যা দূরীকরণের কোন উপায় নেই। এই সমস্যা কেবল উপযোগবাদী নীতিতে নয়, নৈতিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোন সমস্যার সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তির বিবেক জাগ্রত করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে ব্যাক্তি অপরাধ করলে বিবেক দংশন বোধ করেন; ফলে তিনি অপরাধ থেকে বিরত থাকবেন।

কিন্তু সমস্যা হল এই প্রচেষ্টা যে সর্বদা সফল হবে এমন নয়, সেক্ষেত্রে এমন একটি শর্ত অন্বেষণ করতে হবে যাতে সুচতুর বিবেকহীন নাস্তিক ব্যক্তিও অপরাধ থেকে বিরত থাকেন। সেক্ষেত্রে আমরা গেম থিওরির (Game Theory) উল্লেখ করতে পারি (Robort Axelrod 1984)। এই তত্ত্ব অনুসারে অপরাধ মুক্ত সমাজই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ, কোন ব্যক্তি যখন সুচতুরভাবে অপরাধ সংঘটিত করেন তখন তাঁর এটাও জানা প্রয়োজন যে, অন্য ব্যক্তিও একই ভাবে অপরাধ করতে সমর্থ এবং তিনিও তাঁর ন্যায় বিবেকহীন নাস্তিক হতে পারেন; ফলে তাঁর অমঙ্গলের সম্ভাবনাও সমানভাবে বিদ্যমান।

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করা যেতে পারে –

ধরা যাক, একটি কার্ড খেলায় রাম ও শ্যাম নামক দুই জন প্রতিযোগী আছেন। খেলার জন্য উভয়কে কুড়িটি করে সহযোগিতার ও কুড়িটি করে প্রতারণার কার্ড প্রদান করা হল। খেলার শর্ত হল:

১. দুজনকে এক সঙ্গে কার্ড ফেলতে হবে।
২. দুজনেই যদি সহযোগিতা কার্ডটি খেলে তাহলে দুজনেই ৫০০ টাকা পাবে।
৩. দুজনেই যদি প্রতারণার কার্ড খেলে তাহলে দুজনকে ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হবে।
৪. একজন সহযোগিতার কার্ড খেললে অপরজন যদি প্রতারণার কার্ড খেলে তাহলে যিনি প্রতারণার কার্ড খেলেছেন তিনি ১০০০ টাকা পাবেন আর যিনি সহযোগিতার কার্ড খেলেছেন তাঁকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে।
৫. সর্বমোট কুড়িটি কার্ড খেলতে পারবেন।

এই খেলায় রাম অথবা শ্যাম সর্বোচ্চ ২০০০০ টাকা লাভ করতে পারেন; যদি তিনি প্রতিবার প্রতারণার কার্ড খেলেন এবং অপর জন সহযোগিতার কার্ড খেলেন। সেক্ষেত্রে অপর জনের ১০০০০ টাকা জরিমানা হবে। এখন রাম ও শ্যাম উভয়ই যদি ভাবেন যে তাঁরা সর্বোচ্চ ২০০০০ টাকা লাভ করবেন তাহলে প্রত্যেকেই চাইবেন নিজে প্রতারণার কার্ড খেলতে এবং অন্যজন যেন সহযোগিতার কার্ড খেলেন। এক্ষেত্রে যেহেতু কেউই

জানতে পারছেন না যে অপর জন কোন কার্ডটি খেলছেন তাই উভয়ের প্রতারণার কার্ড খেলার সম্ভাবনা বেশী। সেক্ষেত্রে উভয়েরই ২০০০ টাকার জরিমানা হবে। এখন যদি তাঁরা ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ লাভের (২০০০০ টাকা) পিছনে না ছুটে উভয়ের সর্বাধিক মঙ্গলের কথা ভাবেন তাহলে উভয়েই সহযোগিতার কার্ড খেলবেন এবং প্রত্যকেই ১০০০০ টাকা লাভ করতে সক্ষম হবেন (Robort Axelrod 1984)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি অপরাধ থেকে দূরে থাকেন তাহলে সকলেরই মঙ্গল। অন্যথায় যিনি অপরাধ করছেন তিনিও অন্যের অপরাধের লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী

- Axelrod, Robert, *the Evolution of Cooperation*, New York Basic Book, 1984.
- Bottomore, T. B, Sociology, Blackie & Son (India) LTD. 1975.
- Hobbes, Thomas, *leviathan*, Oxford University Press, 1965.
- Mill, John Stuart, Utilitarianism (seven ed.), Longmans, green, and co. 1879.
- Plato, *The Republic of Plato*, Francis Macdonald Cornford (trans.), London, Oxford University Press, 1945.
- Plato, *The Dialogues of Plato*, 1891, http://www.gutenberg.net/etext98/chmds10.txt.
- আক্তার, ফাহিমা, *অপরাধ শাস্তি ও সমাজ সংস্কার*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩।
- কর, পরিমলভূষণ, *সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১।

....

দর্শন বিভাগ , মহারানী কাশীশ্বরী কলেজ ,কলকাতা, ৭০০০০৩

সুনীল মাজির কবিতায় নিসর্গ ও প্রকৃতি চেতনার প্রভাব

গৌতম মন্ডল

কবি তো ইতিহাস লেখেন। সেই ইতিহাস কেবল ঘটনা বা কালপঞ্জি নয়। সেই ইতিহাস কেবলমাত্র সময়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা মানুষের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম বা প্রতিরোধের কাহিনি নয়। মাটি ও মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস। প্রকৃতি আশ্রিত জীবনের রেখাচিত্র নির্মাণের ইতিহাস। জীবনাভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ কবি সুনীল মাজি তাঁর অঙ্কনের শৃঙ্খলায় অখণ্ড সেই সময়ের অবয়ব সংস্থাপন করেছেন তার কাব্যে। ভূমি এবং নদীকেন্দ্রিক যে জীবন তার অভিজ্ঞতা এবং অভীপ্সাকে একীভূত করে সুনীল মাজির মায়াবী চোখের আশ্চর্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। মুণ্ডেশ্বরী নদী, বিরুদ্ধ শক্তিরূপে প্রকৃতির খেয়াল, ঝড়, নদীভাঙনের চিহ্ন শুধু নয়, এ নদীর গভীরে ডুব দিয়ে আবহমান বাংলার নিসর্গ তুলে এনেছেন কবি। এবং এই নিসর্গের সাথে মিশে থাকা, একাত্ম হয়ে থাকা বসন্ত বাউরীদের মতো মানুষ যারা মহাজনী শোষণ এবং ধনবানের লুণ্ঠনে বিপন্ন পতিত, কৃষিব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সাধারণ মানুষের ধারাবাহিক জাগরণচিহ্ন মুদ্রিত হয়েছে এই ইতিহাসের ভেতর। তা সজীবতা লাভ করেছে অক্ষরভূমির বাইদ ও বহালে। প্রকৃতি আশ্রিত মানুষকে ঘিরে অর্থনৈতিক শক্তির সংঘাত—এই ইতিহাসের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে। কবি সুনীল মাজির এ যাবত প্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থ পড়লে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, নদী ও মৃত্তিকা আবর্তিত যে জীবন তার স্বরূপ সন্ধানে পরিশুদ্ধ এবং ঐকান্তিক অনুভবের নির্যাস তার কাব্যশরীরকে প্লাবিত করেছে। আঞ্চলিক থেকে তা হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক। ভূগোলের সমস্ত সীমানাকে ছুঁয়েও তা মানচিত্রের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছে সাবলীলভাবে। নিদারুণ দারিদ্রলাঞ্ছিত নিম্নবর্গীয় মানুষের ঘামসম্পৃক্ত প্রতিদিনের হাড়ভাঙা শ্রম, তাদের আর্থিক, পারিবারিক এবং গোষ্ঠীজীবনের নানা সমস্যা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, পাশাপাশি মানব জীবনের বিচিত্র লীলারসের বিচিত্র অনুষঙ্গ নির্মাণে কাব্যিক স্থাপত্যের কৃৎ কৌশলে চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছেন। শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত এবং নিরক্ষর মানুষের প্রেম অপ্রেম, প্রতিহিংসা, হীনতা, দারিদ্র ক্ষুধা এবং কামের তাড়নাসহ জীবনের সমগ্র তল উঠে এসেছে এবং প্রকৃতি লালিত জীবনের অনিবার্য প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

১. *কেন এত অন্ধকার দাও আমার উঠোনের সব গাছে?*
ফল দেখতে পাই না আমি, পাতার পর পাতা কেবল হাতড়ে বেড়াই।
এ বালক বড়ই অবুঝ, ফুল খোঁজে না।
কে যেন তাকে আঁতুড়ঘরে বলে গেছে কানে কানে :
ফুলের গন্ধ খুঁজতে হয় না, গন্ধ আলোর মতো নিজেকে ছড়ায়।
(সিদ্ধি/পটকথা উত্তরণ)

২. *রাত জাগে নিরক্ষর চোখ, বানায় শালপাতার দোনা*
চারদিকে বিদ্যুতের আলো নিকষ আঁধারে লোধাগ্রাম
(আঁধার যমুনা/নির্বাচিত কবিতা)

৩. *নদীর কাছে গেলেই এক সুন্দর গন্ধ পাই, প্রতিটি বালির কণায়*
মুঠো মুঠো সূর্যের কণা গুড়িয়ে কে পরায় নতুন পোশাক
তার সারা অঙ্গে? পলিমাটি মাখা নদীকে শুধাই
বয়স তোমার কত? এই গন্ধ তুমি কোথা থেকে পেলে?

(অর্ধনারীশ্বর/পটকথা উত্তরণ)

৪. *অন্ধকারে আমি অন্ধকার পেতে বসে থাকি নিঝুম।*
এবং আকাশের নক্ষত্রেরা আলোর বিন্দু হয়ে ফোটে
এবং নদীর জল ঢেউ তোলে পুরবীর সুর
এবং অচিন পাখি গান তোলে মধুর-বিধুর
অন্ধকার পেতে আমি অন্ধকারে বসে থাকি নিঝুম।

(অন্ধকারের নির্যাসে/রাত্রি সমুদ্রে বেহালার আঁচড়)

৫. *অই একটা গাছের কাছে এলেই শরীরের বসন্ত হেমন্ত হয়ে যায়*
সেই বৃক্ষের পত্রালাপ আমাকে বিমুগ্ধ করে
এতক্ষণ শূন্য মাঠের উপর দাঁড়িয়ে অভিশপ্ত মনে হয়েছিল
যে ঘামজল, সেই শরীরের ঘামও অঞ্জলি হয়ে শরীরপুটে ছড়িয়ে দেয় আশীর্বাদ

(শব্দাশ্ব/নাড়ি পোঁতা ভুবন)

৬. *বাসি মাড়ের মতোই তাদের দিন—দিনলিপি।*
মাটির শিরা ফুলে ওঠা মুখেও সেই গূঢ় আগুন।
এই আগুনই বাঁচিয়ে রেখেছে সাঁওতাল মাহাতো পরিবার।
তাদের আকাশে এখনও ঢোকেনি কৃত্রিম উপগ্রহ।
কুমারী নদীর বুকে আগুন দেখে রাতভর হাঁটি,
মাথার আকাশে জ্বলতে থাকে কত না নক্ষত্র!

(আগুনের মুখ/নাড়িপোঁতা ভুবন)

৭. *অধর বদলে গেলে চুম্বনের শব্দ ভিন্ন হয়*
অধর শঙ্খ হলে বেজে ওঠে শঙ্খনাদ
অধর বাঁশি হলে বেজে ওঠে সুজন বাঁশরি

(চুম্বন/পটকথা উত্তরণ)

৮. *বৃষ্টির আড়ালে চাঁদ চলে গেলে যে অপেক্ষায় থাকে*
সে আগামীজন্মেও খুঁজবে সেই অধরামুখ এই ধরার বুকেই

(মেঘ আছে বৃষ্টি নেই)

৯. *সকল মানুষের ভিতর এক জ্যোতির্ময় শরীর কমণ্ডলু হাতে*
নদীতীরে যায় একা একা। আঁধার—আলো ভোরে,

অদৃশ্য পৈতেয় হাত রেখে দেখতে পায় অন্য এক নদী।
নদীর ভিতরে স্নান সেরে অর্পণ করে বুকের স্রোত।
(একলব্য/বসন্ত বাউরির গান)

১০. *কোজাগরী গ্রামের চাঁদ এসে দাঁড়াল নারকেল গাছের মাথার উপর*
যেন কৃষি মেয়ের ফ্যাকাশে মুখ
বাজারে লেগেছে আগুন, নারকেল নাড়ুতেও চিনিহীন লবণের স্বাদ
সমুদ্রের পার থেকে পাহাড়ের চূড়া, সর্বত্রই
জ্যোৎস্না বালিকার উপোষ
আমার বোনের উপোষই সার হল
ভেসে যাচ্ছে খড়ের কঙ্কাল, মাটি লাগানো হল কই?
বলো, ওই পাপ খণ্ডন করতে কতগুলো একাদশীর তলায়
হাঁটু মুড়ে বসব?
আমাদের পেটে এখন নারকেল গাছের মতো
উঁচু হয়ে ওঠা ঢাক গুড়গুড়
কলস উপুড় করে বসে আছি আমরা অনেক ভাই-বোন
হাঁ মুখে তোমাকে ধরব বলে হে কৃষিচাঁদ
প্রতীক্ষায় থাকি
(লক্ষ্মীচাঁদ/অনিকেত এবং রাত্রিরা)

সুনীল মাজির কাব্যভূমি উর্বরিত হয়েছে নানা শৈল্পিক স্থাপত্যে এবং সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞায়। প্রকৃতি, মানুষ এবং নিসর্গের অত্যুজ্জ্বল রূপ তাঁর কলমে ভিন্ন এক মাত্রা লাভ করেছে। গ্রাম এবং নদীলালিত জীবনের বাস্তবতা ব্যক্তির রোমান্টিক স্বপ্নবাসনা প্রভৃতি আঞ্চলিক স্রোতের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে লোকায়ত জীবনের পরিধিকে অতিক্রম করে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আভাসিত হয়েছে। কবি সুনীল মাজির কবিতাপ্রবাহে চোখ রাখলে নিরন্তর পরিলক্ষিত হয় তার বিবিধ বর্ণালী, শৈল্পিক ভাঙচুর এবং জীবনের আশ্চর্য সংরাগ। এর প্রতিফল রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতায়—

১. *আমার বাবা কথা বলা শুরু করলে নিয়ন বাতির মতো*
উজ্জ্বল হতো ক্রমশ
রাস্তার ধুলোগুলো জ্যোৎস্না মাখতো
ঘাসে গাছে যে অন্ধকার দস্যুরা লুঠ করে নিতে চাইতো হরা রঙ
তারা চম্পট দিতো
আমাদের চলাফেরায় সাপের ভয় থাকতো না
এই আলোর জলাশয়ে স্পর্শ পেতাম জ্যোতির্ময়!
(বাবার কথা/ঘামদলিলের গন্ধ)

২. *জমির নোনাজীবন ধুয়ে দিচ্ছে নদী, স্নেহশীল মায়ের মতো*
বাসিমুখ ধুইয়ে আকাশের শিশির প্রতরাশের মতো

তুলে ধরছে মিষ্টি রোদ।

(পাণ্ডুলিপি : বৈঠা মুণ্ডেশ্বরী আমি/অনিকেত এবং রাত্রিরা)

৩. *আমি খেজুর গাছের বল্কল পরেছি*
মাথা ভর্তি কাটার পাতা
সারা গায়ে খাঁজ খাঁজ দাগ অতীতের
কোন কাঁটা নেই, কিন্তু ক্ষত আছে।

(শেকড়/ঘাম দলিলের গন্ধ)

৪. *লোকটা সারাদিন কাদামাটির সাথে ছিল,*
গুমগুম মেঘের বৃষ্টিতে ভিজে
উবু হয়ে আর হেঁট হয়ে পুঁতে দিচ্ছিল বীজচারা।

(জাগরি/অনিকেত এবং রাত্রির)

৫. *পাড়ার নাম বেহুলা।*
মানুষগুলো নদীপাড়ের বাসিন্দা।
পলিবালি মাটির উপর লংকা বেগুন পটল ঝিঙে ফলায়।
ক্ষেতের উপর মাচান যেন নৌকোর পাল
পাল দাঁড় টানা নৌকোয় গৃহস্থ সংসার, বর্ষাকাল।
বান মরে গেলে কোমর জলে তাই পাটায় বসে
জলের দিকে তাকিয়ে থাকা। (বেহুলাকথা/জন্মছায়া)

জলের দিকে তাকিয়ে বা গাছপালা নিসর্গের দিকে তাকিয়ে থাকাই শুধু নয় কবি সুনীল মাজির অর্ন্তদৃষ্টিতে প্রেম প্রকৃতি এবং গ্রামজীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রতিভাত হয়েছে। এই সব উপাদান ঘিরেই আলম্বিত হয়েছে তাঁর নির্মাণবিশ্ব। যার অনিবার্য অভিঘাত তাঁর কবিতাশরীরে। এর পাশাপাশি সময়-মনস্কতা এবং সমাজ আগ্রহের বিভিন্ন পরিসর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছে। সুনীল স্পষ্টতই বলেছেন—"*কবিতাই আমার বুকের হাড়। কোন হাড়ে কত বজ্র সে হিসেব করিনি। তবু প্রশ্ন জাগে—আলো যেভাবে বেরিয়ে আসে আগুন থেকে। বৃষ্টি যেভাবে বেরিয়ে আসে আসে মেঘ ভেঙে, আমি কি সেভাবে বেরিয়ে আসতে পেরেছি দগ্ধ অনুভূতি থেকে? বীজ যেভাবে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আলো খোঁজে বাতাস খোঁজে আমি কি পেরেছি শ্বাস-বিশ্বাসে সেই আত্মার ক্রন্দনকে বের করে আনতে? কবিতা আমার কাছে সৌন্দর্য স্বরূপ। আনন্দের ঈশ্বর। আলোর আস্পৃহা। সে আমাকে নিয়ে যায় মরু পাহাড়ে, আকাশ সমুদরে, এমনকি মাটির গভীরে—সেই অন্তঃশীলা রূপ আর বাজনার ভেতর হন্যমান খুঁজছি। বাস্তবের উপর অতিজগতের ছায়াও পড়েছে কোথাও না কোথাও। অভিজ্ঞতা আর প্রেম দিয়ে এই নির্মাণ, এই প্রণয়ন। অভিজাত জ্ঞানের দর্প-স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে অনুভবের অহংকার সম্পদ নিয়ে প্রেমের বিহ্বলতা ধরতে চেয়েছি অমল উজ্জ্বল। বৃক্ষ যেমন ধরে রোদ তেমনই অনন্ত থেকে ভেসে আসা। রোদও প্রতিফলিত রোদের মতো সংগীতবোধকে আমার দৃষ্টি ও দর্শনে মেলাতে চেয়েছি। আমার নিজের ভেতরেই এই পরিক্রমা। জয় পরাজয় নয়, সময়ের সঙ্গী ও সাক্ষী থেকেছি।*" সুনীলের প্রতি উচ্চারণের সাক্ষী তার কবিতা। বাইরের দৃশ্যমান জগত এবং অন্তরের অতীন্দ্রিয় ছায়াপাত এক স্বর্গীয় অনুভবে দীপ্ত করে। তাঁর কবিতা তাই প্রতীকময়। চারপাশের পরিদৃশ্যমান চেনা ছবি দিয়ে তিনি যেন শব্দে শব্দে ছবি আঁকার এক অমোঘ প্রকৌশল গ্রহণ করেছেন। চাঁদ জল নদী আগুন আলো বাতাস পাখি তাঁর বারবার এসেছে। গ্রামীণ মৃত্তিকা তাঁর চিরকালীন অবশেসন হওয়া সত্ত্বেও

তাঁকে কি গ্রামীণ কবি বলব আমরা? এর সরাসরি উত্তর না। গ্রামের ভেতর দিয়ে তিনি মহাজাগতিক সময়ের রেখাচিত্র এঁকেছেন। ছবি এঁকেছেন চিরন্তন সৌরগ্রামের। কসমিক ভিলেজকে তুলে এনেছেন সামগ্রিক বিন্যাসে, শব্দে, প্রতীকে এবং ধ্বনিময় অন্বেষণে। তাঁর চিন্তায় চেতনায় কারুকাজে তীব্র স্মার্টনেস। নাগরিক যেকোন কবির চেয়েও তীব্র নাগরিক তবু তাঁর মাটি থেকে উঠে আসা কবিতার যৌন শরীরে শস্যগন্ধী হাওয়া ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে শব্দটি ঠিক সুপ্রযুক্ত হল না। বলা উচিত এই তাঁর নাড়িপোঁতা ভুবন।

১. *আমরা চাইছিলাম কলতান হয়ে কাটিয়ে দিতে একজন্ম*
দিনগুলো পুষ্ট হোক আলো আগুনে রাতগুলো পুষ্ট হোক জ্যোৎস্না শিশিরে
নৈঃশব্দ্যের জন্মকাল যেন স্পর্শ না পায় আদিম নশ্বরতার
কারও জন্য ছেঁড়া আসন নয় কারও জন্য কাঁটাতার ঘেরা জমি নয়
আমাদের বায়ুযান হোক চাঁদ চাঁদ আমাদের প্রেমিকার নাম

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমরা যেন পেতে পারি আলোপাখির ঘ্রাণ
কোনও উন্মাদ শ্রাবণ কাচঘর ডুবিয়ে যেন নির্মাণ না করে নগ্ন ভগ্ন স্তূপ
দিনরাত এই যে শুনি শাসকের হুঙ্কার কামান মিশাইল রকেট গ্রেনেড
নদীকে ধর্ষণ করে কেউ যেন তুলতে না পারে এক দানা বালি

আমাদের স্বর দাও ভালোবাসার আর রাতের উঠোনে দাও ভোর, স্বপ্ন
(শ্বাস/শরণার্থীর ফুলশয্যা)

২. *চোখ বুজে গেলে আমি যেন সব দেখতে পাই, গল্প করা*
মানুষেরা নিড়ান দিতে এগিয়ে যাচ্ছে মাঠের পর মাঠ, চষা খেত।
মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া কিছু পাখি পার করে দেয় প্রান্তর।
প্রান্তর শেষেই নদী—এখানে জলের তপোবন—দর্পণ। স্নানে এসে
পাখিরাও চঞ্চুতে তুলে নেয় বর্তমানের পিপাসা।
নদী লেখে অক্ষর অভিযান কথা—বাতাসে স্বরলিপি দিলে শ্বাসে
মনে হয় এইখানে নদী এখনও আজও বুকের ভেতর, তাই গান
(আবহমান/শরণার্থীর ফুলশয্যা)

৩. *কোন ফুলের ঘ্রাণ তোমার পিতামহ? কোন ফলের স্বাদে আমার পিতা*
সন্ন্যাস ত্যাগ করে
চলো সেই নদী খুঁজি। কোন দেবতার বাহন নামিয়েছিল মেঘ এই বিস্তৃত
প্রান্তরে-ফলত নদীজন্ম।
কত যে পুষ্কর-পুষ্করিণী একটু বাজনার ইচ্ছায় ডুবে আছে নদীবুকে।
(অই বাজে/অগ্রন্থিত কবিতা)

৪.প্রেমের লীলা আসলে এক অনুবাদ

যেমন চাঁদ তার ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ অক্ষরে—
এক মায়াবী রহস্যের উজ্জ্বল বর্ণে পৃথিবীকে করে অনুবাদ।
(প্রতীপ/রাগচিত্রের মানচিত্র)

৫. *আমার ভেতরে তুমি রক্ত হয়ে আছ। শিশুবেলার*
দুরন্ত দিনে আলো খেলেছি। অন্ধকার খেলেছি।
খেলার লীলার রামধনু ছুঁতে গিয়ে মাটিতে পড়েছি।
ছিঁড়েছে কোমল ত্বক। উজিয়ে এসেছে রক্ত। (দূর্বা/ফুল)

৬. *সেও এক জ্যোৎস্নার গান-ফুলের গন্ধের মতো*
আমাদের সেই সম্পর্ক।
সেইসব গোপন রাতের ছবি—যেন এক জ্যোর্তিময়
সংগ্রহ করে রাগ আর সুর।
রাতের অন্ধকারে কেবল জ্যোৎস্না নয়, আরও অনেক
আলোর স্রোত থাকে সেই সম্পর্কটা আবহের বন্ধন।
(জ্যোতি/আলো ও দাহপর্ব)

৭. *চলো একটু গানবাজনা হোক। এই চলতে চলতে এই একটু খেতে*
শুতে ঘুমনোর ঠিক আগে আগেই একটু আলো মেখে নেওয়া যাক।
(হোক গান/অগ্রন্থিত কবিতা)

সুনীলের কবিতা প্রজ্ঞা এবং পর্যবেক্ষণের অপূর্ব সংশ্লেষণ। নিখুঁত সচেতন এবং ঋজু উচ্চারণ। কখনও ওই দুরূহতার কোন অভিযোগ তাঁর কবিতাকে রিক্ত করেনি, সরিয়ে দেয়নি পাঠকের সংলগ্নতা থেকে। কৃত্রিমতাবোধে আচ্ছন্ন হয়নি পঙক্তিমালা। এটাই সুনীল মাজির কবিতার অনিবার্যতা। রাঢ় বাংলার শাল পিয়াল পলাশের মতো তা মাটি থেকে জীবনরস সংগ্রহ করে বাঁচে। খুব নিচু মোলায়েম স্বরে কবিতা লেখেন সুনীল। কোথাও নিনাদ নেই, বজ্রগম্ভীর ছদ্মবেশ নেই। আছে মানুষের অন্তরের কথা, আছে ফুটিফাটা মাঠে নিরন্ন কৃষকের ভাতগান। আছে লোকজীবনের সরলতা। অসীম সৌন্দর্য চেতনা এবং লাবণ্যময় রূপলোক নির্মাণের ললিত প্রয়াসে বেড়ে উঠেছে কবিতার ডালপালা।

ছোট ছোট কিছু উদাহরণ এই বক্তব্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

১. *মন্ত্র লিখতে গিয়ে উঠে আসে বহুমাত্রিক শোক (পোকা/রাগচিত্রের মানচিত্র)*

২. *বিশটা বছর আমি এক শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে শূন্যতাকেই পাহারা দিয়েছি কেবল।*
(উপজীবন/রাগচিত্রের মানচিত্র)

৩. *বৃক্ষ কিছুই বলে না। পাতার আড়ালে রুদ্রাক্ষের মালার মতো ফল নিয়ে দোলে।*
(বসুধারা/বসন্ত বাউরির গান)

৪. *তবু আকাশ ধরে আকাশ ছুঁয়ে ভেসে যায় এক সমুদ্র জল (চিরস্রোত/নাড়িপোঁতা ভুবন)*

৫. *পৃথিবী কৃষ্ণপক্ষকে চিঠি লেখে, শুক্লপক্ষ সেই চিঠি পড়ে।*
কে যে কার প্রেমিক, যে শোনে সে বোঝে। (রাস/নাড়িপোঁতা ভুবন)

৬. *সব নারীর চোখে পদ্ম থাকে না (স্মৃতিপত্র/আলো এবং দাহপর্ব)*

৭. *আমি সেই হোমাপাখি অগ্নিজলে গড়ে তুলি নিজের কবরলিপি*

(হোমোপাখির গান/ঈশ্বরীর পুনর্জন্ম)

৮. *আমার শরীরের ভেতর মেঘমল্লার*

আর শেকড়ে বসে আছেন বাবা। (শেকড়/ঘাম দলিলের গন্ধ)

৯. *ধ্বনি চেয়েছি আজীবন। প্রতিধ্বনিকে বিশ্বাস করে ভয় পেয়ে গেছি।*

(ধ্বনি/অগ্রন্থিত কবিতা)

১০. *আকাশে সমুদ্রে কোন উঁচু নীচু নেই*

মেঘেদের বৈষম্য দেখে আকাশ স্বয়ং তার দর্প ভেঙে

আত্মনীল হয় (সৃষ্টি/জন্মছায়া)

সুনীল মাজির কবিতা নিয়ে এত কথা বলছি কেন? আজকের নগরায়ণ এবং প্রযুক্তি বিপ্লবের বিস্ফোরণের যুগে, আজকের ভুবনগ্রামে অন্তর্জালের ভয়ংকর বিপ্লবের সময়ে দাঁড়িয়ে সুনীল কতখানি প্রাসঙ্গিক? এই প্রশ্নটিও খুব সঙ্গত কারণেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এক বৈনাশিক সময়ে তথাকথিত সভ্যতা যখন পৃথিবীতে প্রতিদিন নিয়ে আসে তামসিক অন্ধকার। যখন নিষ্ঠুরতার আগ্রাসী চোখ বৈভবের আলোকেও মনে করে একমাত্র শুশ্রুষার আলো। যখন ক্ষমতার দম্ভের আস্ফালন আমাদের যাত্রাপথ। মনে পড়িয়ে দেয় মেফিস্টোফেলিসের সেই মর্মভেদী উচ্চারণ Mephistopheles, by summing up the bourgeois concept of money, is also damning indictment. The bourgeois system is hell and speaks through the devil, such is Goethe's verdict.

এই পুঁজিসর্বস্ব দুনিয়ার রক্তক্ষরণে সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শিখি আমরা। এই ধ্বংসোন্মত্ত সময়ে সংদাহ থেকে এক অমলিন প্রেমের উপলব্ধির মধ্যে সজীবতা লাভ করে সময়, প্রকৃতি এবং মানুষের আত্মিক বন্ধন এবং সম্পর্কের আস্থা ফিরে আসে অনুভবে, উপলব্ধিতে।

কবি সুনীল মাজি আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, কাছের মানুষ। তাঁর কবিতাকে চিনতে গেলে এই মানুষটিকে জানার দরকার পড়ে আগে। তাঁকে না ছুঁয়ে তাঁর কবিতাকে স্পর্শ করা যায় না, অন্তত আমার তাই মনে হয়। আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে যখন সুনীলদাগকে দেখিনি, যখন শুধুমাত্র তাঁর কবিতার দিয়েই তাঁকে জানতাম। সেই সময় কবিতা পড়তে পড়তে জমাট স্তর ভেঙে উঠে আসত অক্ষরের মুখ। স্তব্ধ অক্ষরের সমারোহে আমি দেখতে পেতাম মানুষটির মুখ। দেখতাম বুকের ভেতর হাজার বছরের অন্তঃশীল স্রোত শুয়ে আছে, মনের ভেতর গড়গড় করে উচ্চারিত হতো চির আয়ুষ্মান শব্দগুলি—

চাঁদকে দিয়েছি কথা, কথা মানে জ্যোৎস্নার ঋণ
এই মাটি—জলবৃক্ষের পাতায় পাতায় ঢেউ তুলে,
সে অধরে লিখেছে নতুন কবিতা (কথামুল)

এই কবিতার লাইনগুলো যেভাবে স্পর্শ করেছিলাম আজ সেভাবে দেখি না। সেদিন কিছু প্রশ্ন ছিল, সংশয় ছিল, জিজ্ঞাসা ছিল। পরে সুনীলদার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়েছে। কবি সুনীলকে খুঁজেছি মানুষ সুনীলের প্রতিটি চলাচলে, পদক্ষেপে। সুনীলদা যাকে সেদিন নতুন বলেছিলেন আজ তা চিরায়ত শাশ্বত। শিশিরের কালি দিয়ে জলবৃক্ষের পাতায়

ঢেউ তুলে যে কবিতা তাই তো আবহমান কবিতা। শাব্দিক এই উন্মোচনের ভেতর ভূমিজ অভিকর্ষ, সুসংহত উচ্চারণ এবং জীবনের রসঘনত্বের যাদুকুশলতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এসব কিছু ছাড়িয়ে লোকায়ত পরিসরের ভেতর কবিতার সিনট্যাক্সকে চারিয়ে দেওয়ার এক অপরূপ সন্ধিৎসা তাকে ক্রমাগত চঞ্চল করে। প্রত্নকবিতার অন্তর্বয়নে ছিন্ন বাকপদ আর মাটিসংলগ্ন মানুষের জমাট স্পন্দন আমরা টের পাই। এখানে ভাষাবিন্যাস, শব্দের কাদামাটি এবং তার ভেতরে বহমান নান্দনিকতায় কবি সুনীল মাজির কবিতার স্বতন্ত্র রূপমূর্তি গড়ে ওঠে।

প্রতিটি দিন পিয়ন।
অজস্র কথার থলি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়,
খুঁজে ফেরে ঠিকানার সন্ধান। (বর্ণলিপি প্রেম/পটকথা উত্তরণ)

অজস্র কথার থলি নিয়ে ঠিকানার সন্ধান করেন কবি নিজেও। বিস্মৃতির ভগ্নস্তূপ থেকে তুলে আনেন শৈশবের মায়াবী চঞ্চলতা। শরীরের ভেতরে এক মননশীল আশ্রয়ে নির্মাণ করেন ডাকঘর। কবি তো প্রেমিক তাই অনায়াসে খুঁজে পায় প্রেমিকার মুখ।

মেধা আর শ্রম দিয়ে এভাবেই শব্দের ঘরবাড়ি এবং তার প্রযুক্তি অনুসন্ধান করেন সুনীল।

প্রেমের লীলা আসলে এক অনুবাদ
যেমন চাঁদ তার ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির অক্ষরে—
এক মায়াবী রহস্যের উজ্জ্বল বর্ণে পৃথিবীকে করে অনুবাদ।
প্রেমের বাদ্য যেন ঈশ্বরীর কাছে নীরব প্রার্থনা।

(প্রতীপ/রাগচিত্রের মানচিত্র)

সুনীল যথার্থই বলেছেন প্রেম আসলে এক অনুবাদ। যুদ্ধও আসলে এক অনুবাদ। যে অনুবাদের মধ্যে দিয়েই সুনীল স্পর্শ করেছেন মৌলজীবনের রহস্য। হ্যাঁ, সেই জীবন

ছাই এর ভেতর যেন রয়ে গেছে এক একটা জীবন
কান্নার ভিতর যেন রয়ে গেছে এক একটা জীবন
রোদ বৃষ্টির ভিতরও রয়ে গেছে কত মুখ কত ফুল কত আলাপন

অমল আকাশের নীচে সেই জীবনের রূপ রস আর গন্ধময়তার সংশ্লেষণই স্থাপিত হয়েছে তাঁর ভাবনাভঙ্গিতে এবং ভাষ্যে। জীবনের সময়স্পন্দিত আলো অন্ধকার রোদ বৃষ্টির বাইরে আপতিত জীবনের বিচিত্র বর্ণময়তা ছুঁয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টিপথের অনন্ত সমুদ্রস্রোত।

নিজের অন্তরের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয় প্রশ্নের বুদবুদ। কে এর জবাব দেবে। কবিকেই দিতে হয় এই অনন্ত জিজ্ঞাসার সদুত্তর। কবিতা তো ইন্দ্রিয়াতীত কিছু নয়। ইন্দ্রিয়শক্তির এক বিশেষ মুহূর্তে চেতনাপ্রবাহ সুক্ষ্ম অনুভূতির জালিকার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিমানুষের স্বরূপের হাজার অনুবৃত্তে ছড়িয়ে পড়ে। শূন্য থেকে এক থেকে অনন্ত হয়ে উঠবার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত স্বরবর্ণকে সামষ্টিক ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিয়ে দেওয়ার অনন্ত স্রোত। শুখা অপত্যপথের ভূমিতে এভাবেই বীজ রোপণ করেন সুনীল।

যতটুকু আমার চোখে জল আছে
তা দিয়ে যতটা অক্ষরের মূর্তি আঁকা যায়

তার চেয়ে বেশি একটা কবিতাও আমি লিখব না (মেঘ আছে, বৃষ্টি নেই)

বৃষ্টির আড়ালে চাঁদ ডুবে গেলে যে প্রতীক্ষা করে অনন্তের দিগন্ত ছুঁয়ে সে আগামী জন্মেও খুঁজবে অধরা সেই মুখ। সৈনিকের জীবনে সুনীল প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করেছেন মেঘের আড়ালে থাকা চাঁদকে। গুলি গোলা আর বিমানের শব্দ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় না জ্যোৎস্নার ছায়া, মুণ্ডেশ্বরী নদীর প্রবাহ। অক্ষরের মানবিক শব্দের সাথে সখ্যতা তাঁর জন্মসূত্রে। নদীর জলে শৈশবের মুখ হিরন্ময় মানচিত্র ভেঙে দিলে কবির শরীরে সৈনিকের পোশাক উঠে আসে। সুনীল এই দিনগুলি প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন—

কবিতার জ্যোৎস্না ঢাকা পড়ে গেল সৈনিকের পোশাকের আড়ালে। একটা বন্ডেড—লাইফ মৃত্যুযন্ত্রণার অপর নাম। বেঁচে যাওয়া নামক এক চাকরির সন্ধানে পৌঁছে গেলাম এক মৃত্যু উপত্যকায়। প্রতিরক্ষায় গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে না পারার ভয়। নিজেই নিজের কাছে হয়ে উঠলাম সন্ত্রাসী। সুখ নয় শান্তি নয় ভালোবাসা নয় কোন এক বোধের জগতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ভাঙা তলোয়ার হাতে পলাতক সৈনিকের মতো। জনান্তি বলল—পালাবে কোথায়? পলায়নবাদী কেন হবে? এই ম্লান পৃথিবীতে অম্লান অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই। কবিতা আমাকে একা করল বটে কিন্তু নির্জন হতে দিল না।

সুনীল অনুভব করলেন—

অন্ধকারে আমি অন্ধকার অন্ধকার পেতে চুপচাপ বসে থাকি নিঝুম।
এবং আকাশের নক্ষত্রেরা আলোর বিন্দু হয়ে ফোটে
এবং নদীর জল ঢেউ তোলে পূরবীর সুর
এবং অচিন পাখি গান তোলে মধুর বিধুর
অন্ধকার পেতে আমি অন্ধকারে বসে থাকি নিঝুম।

(অন্ধকারের নির্যাস/রাত্রি সমুদ্রে বেহালার আঁচড়)

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL ESTD-2015

কবিতা এভাবেই একজন কবিকে দগ্ধ অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। জন্মসমগ্রের ভেতর রুদ্ধতার পথগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে নদীপথের জলাভূমি সংরক্ষণ করে রাখে। ছায়াভ্রমে ঢুকে যাওয়া এক নকল জীবনের চক্রব্যুহ থেকে বিচ্ছেদ খুঁজে নেওয়ার চাহিদাই কবিতার রোদ্দুরে পাখি হয়ে ওড়ে। জীবন আসলে এক ফিলসফিক্যাল মিসটেক। ক্রোমোজোমের উপর তৈরি হওয়া শূন্যতার গসাগু অথচ যা অনন্ত সম্ভাবনার জন্ম দিয়ে যায়।

প্রেমিকারা কথা কয়। গাছ নেই কোনো
দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। হৃদয় শূন্য শূন্য।

(শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সেই প্রেমিকা/বসন্ত বাউরির গান)

এই শূন্যতার গ সা গু থেকেই ক্রোমোজোমের রীতির পরিবর্তন ঘটে। এই মিউটেশন থেকেই শিল্পের সূচনা। তখনই রোদ পড়ে বুকের প্রিজমে। দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। হৃদয় শূন্য শূন্য। দুবার শূন্য কেন? একবার ব্যবহার করলেই তো হত। আসলে শূন্যের রিক্ততাকে বোঝানোর জন্য এই পুনরাবৃত্তি। গাছ নেই কোনো। গাছ এখানে প্রাণের প্রতীক। যেহেতু গাছ নেই। তাই শূন্যের অধিক শূন্যতা। যুদ্ধের বিপরীতে এক প্রেমের পৃথিবীর অন্বেষণ তাঁর। বারুদের উল্টোদিকে প্রকৃতির সবীজ ছবিটিকেই খুঁজেছেন দীর্ঘ দীর্ঘকাল। খুঁজেছেন শুধু নয়, বুকের ভেতর বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই সব জীবন্ত অক্ষর। তাই ফসিলের ভেতর তিনি খনন করেন জীবনচিহ্ন।

ফসিলের ভেতর রয়ে গেছে জীবনের জলছবি

রঙিন অণুর কণা। যেন স্টিল ফটোগ্রাফি প্রস্তর ফলকে
জীবন্ত অক্ষর সব পড়েছে ঘুমিয়ে অ্যালবামে (ফসিল)

বন্দুক আর কামান দিয়ে হত্যা করেছি সুমধুর শব্দ
জীবনের সুদীর্ঘ বছর,
আমার পেশা আমাকে বাধ্য করেছিল এই হত্যালীলা
(আত্মজীবনীর অংশ/বসন্ত বাউরির গান)

কবি সুনীল মজির স্বতন্ত্র চলাচল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যেসব গ্রন্থের মধ্যে তার তালিকা এরকম—

(১) রাত্রি সমুদ্রে বেহালার আঁচড় (চর্যাপদ, ২০০২); (২) বসন্ত বাউরির গান (ভাষা ও সাহিত্য ২০০৪); (৩) পটকথা উত্তরণ (অমৃতলোক ২০০৫); (৪) রাগচিত্রের মানচিত্র (অমৃতলোক ২০০৫); (৫) প্রহরের পালাগান (অমৃতলোক ২০০৬); (৬) নাড়িপোঁতা ভুবন (প্রিয়শিল্প ২০০৬); (৭) মেঘ আছে বৃষ্টি নেই (প্রিয়শিল্প ২০০৭); (৮) ঈশ্বরীয় পুনর্জন্ম (বাকপ্রতিমা ২০০৭); (৯) অনিকেত এবং রাত্রিরা (বাকপ্রতিমা ২০০৯); (১০) ঘামদলিলের গন্ধ (তূর্য ২০১২); (১১) ভাতফুল ভাতগন্ধ (তূর্য ২০১২); (১২) নির্বাচিত কবিতা (পত্রলেখ ২০১৩); (১৩) কালো বণিকের পিরামিড (পাঠক ২০১৩); (১৪) ফুল (পাঠক ২০১৫); (১৫) নদীতীর্থ (প্রিয়শিল্প ২০১৬); (১৬) আলো এবং দাহপর্ব (পাঠক ২০১৭); (১৭) জন্মছায়া (প্রিয়শিল্প ২০১৭); (১৮) লাশসাঁতার (কবি ভবেশ বসুর সাথে যৌথভাবে); (১৯) শরণার্থীর ফুলশয্যা; (২০) কাব্য উপন্যাসের মধ্যে বানজারার তৃষ্ণা (তূর্য ২০১৭) এবং ২১. প্রহরের পালাগান বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। উপন্যাসগুলি মধ্যে অন্যতম উপরতলা নীচুতলা, ছায়াপ্রেম, ঢেউ ডিঙা, শুকনো চোখ জমি। এছাড়া তাঁর কবিতার অনুবাদগ্রন্থ 'Pictorial Tune (Amritalok sahitya parishad) Translated by Dr. Harisadhan Goswami' কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর কবিতাভাবনা সম্পর্কিত গদ্যগ্রন্থগুলিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) আলো আগুনের স্নানযাত্রা (তূর্য ২০০৬); (২) প্রহরের পালাগান (পত্রলেখা ২০০৬; (৩) শ্বাসবিশ্বাস (তূর্য ২০১৭)। সম্পাদনার কাজেও তিনি নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলি হল— (১) মেদিনীপুরের কবিতা। প্রসঙ্গ অনিল ঘড়াই। প্লাবনকালের কবিতা। দগ্ধদিনের কৃষ্ণচূড়া। বাংলার বাছাই কবিতা। অনিল ঘড়াই পরিক্রমা। এক জীবন অনন্ত জীবন। অন্ধকার গুহা থেকে আলোর দিকে তাকানো খুব কঠিন হলেও সুনীল তাঁর কাব্যস্থাপত্যে তাঁরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মুঠোর ভেতর চেপে ধরে রাখা একটা জীবন যার বেষ্টনীর ভেতর চেপে বসে আছে এক আরোপিত ছদ্মবেশ। এই ক্রমঅঙ্কুরিত হতবাক নিংড়ে নিজের ভেতরের অজস্রতা দিয়ে চারাগাছ লাগানোর প্রতিপাদ্যকে পুষ্পিত জাগরণের দিকে জড়ো করেছেন ক্রমাগত। যে আয়নায় সাহিত্য বিম্বিত হয়ে উগরে দেয় ছবি তা হল সময়, বহমান সময়। প্রতিটি শিল্পের ভেতর যা সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এই ছাপগুলি চিহ্নগুলি বিম্বিত হয়ে ওঠে। আপন সত্তার জাগরিত হয়ে ওঠার ভাস্বরতাই শুধু নয় অন্তর্বৃত এবং বহির্বৃত সময়ের সুপ্ত বিন্যাসের বাইরেও সময়ের প্রচ্ছন্ন চাহিদা পেরিয়ে সময়োত্তীর্ণ হওয়ার দুঃসহ স্পর্ধা রয়েছে কবি সুনীল মাজির কবিতায়। ক্ষণিকের মুষ্টিবদ্ধতা থেকে অনন্তের সৃজনী যা স্রোত এবং প্রতিস্রোতের নিরন্তর চলমানতার দ্যোতক, সুনীলের কবিতায় তা স্ফুটতর হয়ে ওঠে।

এইসব শব্দবৃক্ষ ভূমি চায়। উড়ে উড়ে বসে। যাযাবর প্রেম
কখনও এদিক ওদিক বানজারা তাঁবুতে রেখে যায় বংশতিলক,
ঠিকানা। ঠিকানা এই রক্তের ভেতর। কয়েককোটি শুক্রাণু প্রতিদিন

ওড়া ওড়ি করে পেতে চায় গর্ভধার। তুমি। তুমি, দাও মাটি চূর্ণ
চূর্ণ সব কথা। কথার পাথর ভেঙে বিমূর্ত কথারা কিছুটা কান্নার
জলে যদি মূর্ত করে অন্তমূল, তবে তা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
তোমার চোখের পল্লবে রন্ধ্রপথে বৃষ্টিকথা, রৌদ্রকথা প্রাণের
ঔরসে গর্ভবতী করে দেবে গান (ঈশ্বরী অথবা জাতিকার কথা/ঈশ্বরীয় পুনর্জন্ম)

চারপাশের প্রকৃতি, মাটির আর মমতার স্থাপত্যে নিকোনো ভাষাপথ। যেখানে সূর্যের রোদ যেন প্রথম কুটুম। যেখানে শুকতার ফুটলে দিনের আলপনা। জাম শিরীষের ফাঁকে নামে সূর্যের ক্ষত্রিয়তেজ। নদীপথে জীবনের সমুজ্জ্বল সমারোহ যেখানে স্বপ্ন হয়ে মেঘ হয়ে ছায়া হয়ে ফিরে আসে। সেই অন্তঃশীল স্রোতজীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন কবি। তাই সুনীল সহজেই পারেন ঘাসের শেকড় থেকে জীবনের নির্যাস তুলে এনে ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প তৈরি করতে। যা আমাদের শারীরিক আকাঙ্ক্ষা, দৈহিক স্পর্শসহ এক অপূর্ব সংবেদন তৈরি করে। প্রকৃতির সাথে নিজেকে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে অতি সজীব এক শাব্দিক—অভিঘাত তুলে আনতে পারেন।

আমরা যারা শস্যবোনার পক্ষপাতী
আমরা চাইছি শস্যচারার পাশাপাশি ঘাসবীজ সুপ্ত থাক
কিন্তু এই নিয়ে এমন ঠোকাঠুকি তর্কবিতর্ক হল
ফোঁস করে সর্পঅগ্নি
এবং ঘাসের অন্তিম মাটিকেও পুড়িয়ে ফেলছিল
আমরা কিছুতেই চিনতে পারছিলাম না পিতৃদের পিতামহের মুখ।
স্বর্গের পথ দেখিয়ে একদল প্রভুভক্ত প্রাণ লাফাতে লাফাতে
পেরিয়ে যাচ্ছে কুরুক্ষেত্র
আর আমাদের কামক্রোধদর্পের দল মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে
তবু কলসটাই দাঁড়িয়ে আছে ধর্মপুত্রের মতো।
(ঘাসের আগুন/অনিকেত এবং রাত্রিরা)

সুনীল মাজির কবিতা আসলে বিশ্বাস-রিক্ত মানুষের কেন্দ্রচ্যুত মানুষের যাবতীয় লালসার তন্দ্র ভেঙে আবার প্রকৃতির দিকে ফিরিয়ে দেয় তাদের অভিমুখ। দীর্ঘ সময় ধরে কবি সুনীল মাজি যে সাধনায় রত আছেন তা নদনদী পাহাড় প্রান্তর বন জনপদ আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা মানুষের আত্মপরিচয়ের ইতিহাস খনন। সমাজের প্রবাহমান ধারাস্রোতের ভেতর স্বকীয় আলো জ্বেলে দেওয়ার কাজ।

নিজের কবিতা নির্মাণ প্রসঙ্গে কবি সুনীল মাজি যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন তা তুলে ধরতেই হয়। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন—

গর্ভবতী হওয়ার জন্য একজন নারী শিবলিঙ্গের কাছে আকাঙ্ক্ষা করে যেমন, কবিতা আমার কাছে তেমনই ঈশ্বর, আস্পৃহা। সে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে মরু-পাহাড়ে, আকাশ-সমুদ্রে, এমনকি মাটির ভেতর সেই অন্তঃশীলা রূপ এবং বাজনার ভেতর হন্যমান খুঁজেছি। অন্ধকার গুহা থেকে আলোর দিকে তাকানো বড় কঠিন কাজ। একটু একটু করে জোছনা দেখতে দেখতে ফুল নদী পাখির দৃশ্য দেখতে দেখতে মাটি ও মানুষের দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছি। একটা শূন্যতার গোলকের উপর দাঁড়িয়ে গ্রামের ছবি, পরিচিত মুখমণ্ডলের ছবি ভেসে আসতে দেখেছি—বস্তুত এই সঙ্গীত অনন্ত

থেকে আসা বোধই বোধ হয় আমার কবিতা—বাস্তবের উপর অতিজগতের ছায়াও পড়েছে কোথাও না কোথাও। অভিজ্ঞতা আর প্রেম দিয়ে এই নির্মাণ—এই প্রণয়ন। অভিজাত জ্ঞানের দর্প, দম্ভ থেকে বেরিয়ে অনুভবের অহংকার সম্পদ দিয়ে প্রেমের বিহ্বলতাকে ধরতে চেয়েছি বৃক্ষের মতো। জয় করতে চেয়েছি নিজেকেই।

তাই সুনীল মাজির কবিতাসমূহ আগুন এক ধ্যানদীপ্র নৈব্যক্তিকতায় সমাহিত। আগুন জল আর মাটি অপূর্ব এক সংহতি আর সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত। কোথাও কোন অপ্রয়োজনীয় জটিলতা বা ধাঁধা নেই। কবিতার মায়াবী কুহকের আড়ালে রয়েছে এক নিরঞ্জন প্রাঞ্জলতা। তাঁর সেই বিরল শব্দসিদ্ধির কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরার প্রলোভন এড়ানো বড় কঠিন।

১. *নারীর শরীর লতাপাতা গন্ধের ভিতর*
আমার দৃষ্টি অনন্ত সমুদ্র স্রোত ছোঁয়
(বাস তীর্থ ভূমি/রাত্রি সমুদ্রে বেহালার আঁচড়)

২. *আসঙ্গ সংস্কার ভেঙে যে পারে*
জমাট স্তর ভেঙে উঠে যেতে উদাসীন ছায়াকে পিছনে রেখে
প্রতিধ্বনি পিছে রেখে গভীর গভীর এক স্তরে (দীক্ষা/ঈশ্বরীয় পুনর্জন্ম)

৩. *যে কথা লিখি আমি প্রতিদিন, সে সবই না বলা কথা*
গতজন্মের। সে সবই না গাওয়া গান
প্রস্থিত জীবন ভেসে আসে কবিতায়
(বীজতলা/রাগচিত্রের মানচিত্র)

৪. *বৃক্ষ নিধন হলে ভেঙে যায় শিবলিঙ্গ*
তখন নুড়িকে পাথর
আর শরীরকে রক্তমাংসহাড় বলে মনে হয়
(কলস/নদীতীর্থ)

৫. *জানি, একমাত্র অন্ধকারই দাফনা দেবে মায়ার শরীর, রূপকথা*
আর আকাশে আকাশে ভেসে বেড়াবে বাস্তুহারা পাখি
(শূন্য/অনিকেত এবং রাত্রিরা)

৬. *রাতকে মনে হয় নিজস্ব, স্থাবর সম্পত্তির দলিল*
নিরাপদে এখানে রেখে আমি ঘুমোতে পারি
স্বপ্ন দেখতে পারি নদী বা সমুদ্র হতে হতে
আকাশের সঙ্গে আমার সখ্যতা বেড়ে ওঠে
(রাত্রিদেবী/নদীতীর্থ)

জগত এবং জীবনের পাশাপাশি জীবনোত্তর সময়ের অন্বেষণ এবং ইঙ্গিতপূর্ণ জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে সন্দর্ভের সুক্ষ্ম বিভঙ্গে আলোকময় হয়ে ওঠে তাঁর শিল্পকৃতি। পাঠক হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কবিতার মধ্যে সত্তা এবং অপরতার যুগ্ম সম্মিলন অনুভব করি ও নতুন কর্ষণভূমি খুঁজে পাই। প্রতিটি জড় পদার্থের অনুভবকে জীবনের ভাষায় অনুবাদ করেন

সুনীল। চেতনাহীনের বোধিচিত্র জেগে ওঠে তার কবিতায়। সুনীলের অন্তরে রয়েছে ভালোবাসার ফল্গুস্রোত এর টানেই তিনি বিপন্ন কুকুরের সেবা করেন। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ালের জন্য কেঁদে ভাসান। চারপাশের প্রাণী ও অপ্রাণীজগত নিয়ে ভালোবাসায় গড়ে তোলেন এক সম্পন্ন সংসার। প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তুপুঞ্জের আকুতি তার মনোজগৎকে তছনছ করে দেয়। এক প্রেমবর্ণের মানবিক আলোয় এভাবেই অনুদিত হয় তাঁর মগ্ন উচ্চারণ।

তথ্যসূত্র:

১. এবাদুল হল, ভবেশ বসু, অভিষেক রায়চৌধুরী ও ভবানীপ্রসাদ গুইন (সম্পাদিত), 'সুনীল মুণ্ডেশ্বরী', উডপেকার, কলকাতা—৪৯, এপ্রিল ২০২২।

২. লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল, সৈকত পট্টনায়ক (সম্পা.), 'কৃষ্ণ প্রহরের কবি, কবিতার সৈনিক', তূর্য, কলকাতা—০৯, জুন ২০১৫।

....

পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, সানরাইজ বিশ্ববিদ্যালয়, আলোয়ার, রাজস্থান

মহাপুরুষদের পদধূলি ধন্য ধর্মীয় পীঠস্থানের ইতিহাসে বারুইপুর

সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য

সারসংক্ষেপ :-

সুপ্রাচীনকাল থেকে একাধিক মহাপুরুষদের আবির্ভাব ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাসের জগৎকে করে তুলেছে বৈচিত্রময়। তাঁদের জীবনদর্শন, অমোঘবাণী কখনও বা ধর্মের গন্ডী পেরিয়ে সমাজ সংস্কারের প্রাঙ্গঁনে তাঁদের অগ্রদূতের সম পদার্পন, আমাদের দেশের ইতিহাসকে প্রকৃত অর্থেই করেছে সমৃদ্ধ। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দেশ এই ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে অবস্থান করছে এমন অনেক ধর্মীয় স্থান, যেগুলির পরিচিতি প্রসঙ্গেঁ অন্য প্রেক্ষাপট প্রতিভাত হলেও সেগুলির ধর্মীয় প্রাসঙ্গিঁকতা কখনও বা আমাদের কাছে অধরা থেকে গেছে। এমনই একটি অন্যতম স্থান হল পশ্চিমবঙ্গের দঃ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত বারুইপুর। ধর্মীয় আঙ্গিঁকের দৃষ্টিতে বারুইপুরে মহাপুরুষদের আগমণ ও তার ইতিহাস পর্যালোচনাই আমার এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মূলশব্দ :-

বারুইপুর, ধর্মীয় পীঠস্থান, মহাপুরুষ

মূল প্রবন্ধ-

ভারতে উপনিবেশিক তত্ত্বাবধানে ইংরেজ কোম্পানীর আধিপত্য ও ক্ষমতা কায়েম করার উদ্দেশ্যে এদেশের ইতিহাস প্রণালীর সূত্রপাত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের যথার্থ ইতাহাস রচনার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্বে মধ্যযুগের মতো আধুনিক যুগ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে ইউরোপীয় পন্ডিতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘরনা গড়ে তুলতে পেরেছে। ফলসরূপ সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ স্থানের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। আবার অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও সঠিক অনুসন্ধানের অভাবে এমন অনেক জায়গা থেকে গেছে, যার ইতিহাস সকলের অলক্ষ্যে স্থান পেয়েছে, এমনই একটা জায়গা হলে দঃ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর, যা এতদিন অনেকের দৃষ্টির অগোচরে থাকলেও বর্তমানে সে তার নিজস্ব যোগ্যতার দাবী নিয়ে ইতিহাসের দরবারে উপস্থিত হয়েছে যার ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিঁকতা সত্যিই বিবেচ্য।

প্রথমে দৃষ্টিনিক্ষেপ করব বারুইপুরের অবস্থান এবং নামকরণ বিষয়ে। মোগল আমলে টোড়রমলের আইন – ই – আকবরীতে ২৪ পরগণার বর্ণনায় উল্লেখিত আছে ২৪টি পরগণার অন্যতম মেদনমল্ল পরগণার মধ্যে বারুইপুরের অবস্থানের কথা। বারুইপুর নামটি প্রথম পাওয়া যায় ১৪৯৫ খ্রীঃ হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিপ্রদাস পিপলাই – এর মনসা বিজয় কাব্যে। একদল গবেষকদের মতে, এখানে বারুজীবি বা পানচাষী সম্প্রদায়ের আধিক্য থেকে 'বারুইপুর' শব্দটির উৎপত্তি। অন্য একদল গবেষকের মতে লৌকিক দেবতা বারা ঠাকুরের নামের থেকে 'বারুইপুর' নামের আবির্ভাব ঘটে।

বারুইপুরে দেবালয়ের সুত্রপাতের সঠিক সময় নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতপার্থক্য বিতর্ক থাকলেও এখানে এমন কিছু ধর্মীয় স্থান আছে, যেগুলি সুপ্রাচীন কাল থেকে একাধিক মহাপুরুষের পদধূলি স্পর্শে হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। এই

সকল ঐতিহ্যমন্ডিত স্থানগুলি সামাজিক তথা ধর্মীয় ইতিহাসের প্রাঙ্গনে বারুইপুরকে করে তুলেছে গৌরবমন্ডীত। এই প্রসঙ্গে বারুইপুরে যে স্থানগুলির কথা বলতে হয়, সেগুলি হল –

১) বিশালাক্ষী মন্দির :- বারুইপুর স্টেশনের পশ্চিমে কাছারী বাজারের উত্তরে অবস্থিত বিশালাক্ষী মন্দির। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরে প্রণাম করে অনন্ত আচার্যের আশ্রমে গিয়েছিলেন, কয়েক বছর আগে এই মন্দিরে আগত স্বামী লোকেশ্বরানন্দ অন্তত সেইরকম ঈঙ্গিত দিয়েছেন। কৃষ্ণরামদাসের রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে এই বিশালক্ষীদেবী ও বারুইপুরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর এই মন্দিরে এসেছিলেন বলে লোকমুখে প্রচলিত আছে। ১৪৯৫ খ্রীঃ বাংলার হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিপ্রদাস পিপলাই এর মনসাবিজয় কাব্যে চাঁদসদাগরের বারুইপুরের এই মন্দিরে আগমন এবং বারুইপুর নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

“কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পূজিয়া
চূড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া।
ধনস্থান এড়াইলো বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে”। [১]

বারুইপুরের এই বিশালক্ষী দেবীর মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে এক সময়ে দূরাঞ্চলের আধিবাসী ও সমুদ্রগামী বণিকগণও এখানে পূজা দিতে আসতেন। কথিত আছে - “সপ্তদশ শতকের অন্তিম তথা বিংশ শতাব্দীতে এই মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি ভূমধ্যধিকারী নটুবিহারী ময়রার অধিকারে ছিল। রাজস্ব অনাদায়ে তাঁর সম্পত্তি নিলামে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দা স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র মৈত্রের হাতে মালিকানা চলে আসায় তিনি স্থানীয় অনুরাগীদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন, যেটি ১৯২৫ সাল নাগাদ থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত মন্দির দেখাশুনা করে চলেছে”। [২]

দীর্ঘকালের স্থানীয় বাসিন্দার নিকট হতে জানা যায় –

“মন্দিরে বিশালাক্ষী মায়ের সামনে মঙ্গঁলচন্ডী ও শীতলা মায়ের দুটি প্রাচীন মূর্তি আছে। এই মূর্তিত্রয় নিত্য দুবেলা পূজিত হয়। এই বিশালাক্ষীদেবী দূর্গারূপে এখানে পূজিত হন। নিত্যদিন ভক্তমন্ডলীর সমাবেশ, বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রসাদ বিতরণ, বছরের বিশেষ দিন গুলিতে ট্রাস্টের মাধ্যমে দুঃস্থদের কাপড় বিতরণ এই মন্দির প্রাঙ্গনকে আলোকময় করে রেখেছে”। [৩]

২) মহাপ্রভুতলা :- বারুইপুরের ঐতিহাসিক ধর্মীয় পীঠস্থানের তালিকায় মহাপ্রভুতলার অবস্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। বারুইপুরের পুরাতন বাজার সংলগ্ন আটিসারা গ্রামে ৮ নং ওয়ার্ডের শাঁখারী পাড়ায় অবস্থিত এই মহাপ্রভুতলা। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে বারুইপুরের আদিগঙ্গাঁর তীর ধরে পদব্রজে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন যার বিশেষ উল্লেখ আছে বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতণ্য ভাগবত’ গ্রন্থে। চৈতণ্যের আগমন সংক্রান্ত বর্ণনায় এখানে বলা হয়েছে

“হেনমতে প্রভুতত্ত্ব কহিতে কহিতে
উত্তারিলা আসি আটিসারা নগরীতে।।
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান
আছেন পরম সাধু শ্রী অনন্ত নাম”। [৪]

এই আটিসারা গ্রামে পরম বৈষ্ণব শ্রীঅনন্ত আচার্যের কুটীরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতণ্য একরাত্রিকাল বসবাস করেন। সারারাত নামকীর্তন করে ভগ্ন ঢোলটি পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে ফেলে দিয়ে যান। কথিত আছে সেই থেকে ঐ স্থানের নাম হয় কীর্তনখোলা। এই অনন্ত আচার্যের কুটীর বর্তমানে ‘মহাপ্রভুতলা’ নামে সুপরিচিত। চৈতণ্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস আটিসারাকে অতি সমৃদ্ধ জনপদ বলেছেন।

মহাপ্রভুর স্পর্ষধন্য এই স্থানটি প্রথম চিহ্নিত করে বৈষ্ণব সাধু 'রামদাস' বাবাজি। এখানে নিমকাঠের তৈরী গৌর-নিতাই মূর্তি ও শ্রীচৈতণ্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন রয়েছে। আনুমানিক ৫০০ বছরের পুরাতন এই মন্দিরে অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নিয়মিত পূজার্চনা, শ্রীচৈতণ্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান তিথি পালনসহ নামসংকীর্তন হয়ে থাকে। এখানে অসংখ্য ভক্তের আগমন, প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি দুঃস্থদের বস্ত্রদান বহিরাগত দর্শনার্থীদের রাত্রিযাপন ও আহারাদির ব্যবস্থা, অনাথ, অসহায় মানুষদের থাকার ব্যবস্থা বর্তমান।

৩) ধপধপি দক্ষিণেশ্বর মন্দির :-

বারুইপুর থানার অন্তর্গত ধপধপিতে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি অত্যন্ত জাগ্রত। এই মন্দিরের বিগ্রহ বন্দুকধারী দক্ষিণরায়। প্রসঙ্গঁত উল্লেখ্য ইতিপূর্বে সমগ্র ভারতে ধর্মীয় প্রাঙ্গঁনে কোন বন্দুকধারী বিগ্রহ দেখা যায়নি, যা এই মন্দিরে বর্তমান। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গঁল ও শনিবার করে এই মন্দির প্রাঙ্গঁনে মেলা বসে, বিগ্রহ ভক্তিভরে দুবেলা পূজিত। এই দেবতার দর্শনে, মনোবাঞ্ছা পূরণে দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন।

লোককথা অনুযায়ী, "বনবিবির সাথে দক্ষিণরায়ের মা নারায়ণী দেবী যুদ্ধ করেন, এবং পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধির মধ্য দিয়েই বনবিবি "Warrior Goddess" রূপে পরিচিত হন। বনবিবির কোলে বালকের মূর্তি দেখা যায়, কেউ বলেন বালকটি দক্ষিণরায়, কেউ আবার তাঁকে বাংলার শাসক রূপে কল্পনা করেছেন"। [৫]

দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম নিয়ে যে পুঁথি বিখ্যাত, তা হল কৃষ্ণরাম দাসের "রায় মঙ্গঁলকাব্য"। এই গ্রন্থে যে কাহিনী আছে, তা হল এরকম –

বড়দহের বণিক পুষ্পদত্ত, কাঠুরে রতাই বাউল্যাকে সমুদ্রগামী ডিঙা তৈরী করতে আদেশ দিলেন। রতাই বনে গেলে, তার দুভাইকে হত্যা করলো দক্ষিণরায়ের ছয় অনুচর বাঘ। কেননা -

এখানে দক্ষিণরায় সব ভাটী অধিকার
হিজলীতে কাল রায় থানা
সর্বত্র সাহেব পীর নোয়াইবে শির
কেহ তার না করিবে মানা। [৬]

দক্ষিণ রায়কে সন্তুষ্ট করতে রতাই তাঁর নির্দেশে পুত্র বলি দিয়ে পূজো করলে দক্ষিণরায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ছয় ভাই ও পুত্রকে ফিরিয়ে দেন। সুন্দরবনের অধিকার নিয়ে একবার বড়খাঁ গাজীর সঙ্গেঁ দক্ষিণরায়ের বিবাদ বাধে, ফল স্বরূপ দক্ষিণরায়ের মুন্ডু কাটা যায়, এবং অতঃপর অলৌকিক শক্তিতে তার জোড়া লাগে। শান্তি ও সন্ধির জন্য আসেন পরমেশ্বর অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধেক পয়গম্বর রূপে।

"অর্ধেক মাথায় কালো একভাগ চূড়া টানা
বনমালা ছিলম্বিনী তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীলামেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে"। [৭]

দক্ষিণরায় ভাঁটি অঞ্চলের অধিপতি রূপে স্বীকৃত হন। ইনি দক্ষিণদর, বাবাঠাকুর নামেও পরিচিত। সুন্দরবনাঞ্চলের বাউলে, মৌলে, শিকারী, আবাদকারী সম্প্রদায় এঁনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের নোয়খালি যশোহর, খুলনা অঞ্চলেও এই দেবতা পূজিত। বলা হয়েছে -

"দক্ষিণরায়ের মত সুশ্রী ও সুপুরুষ আকৃতির লৌকিক দেবতা বিরল .... কোন কোন স্থানে এর বাহন ব্যাঘ্র, কোনো স্থানে অশ্ব। বারা প্রতীকে দক্ষিণরায় সর্বক্ষেত্রে তাঁর মাতা বলে কথিত নারায়নীর সঙ্গে পূজিত হন"। [৮]

৪) গেন্ডেরিয়া আশ্রম :- বারুইপুর থানার অন্তর্গত খাসমল্লিক অবস্থিত গেন্ডেরিয়া আশ্রম যেটি, প্রকৃত অর্থে স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্দির তথা আশ্রম। বঙ্গবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ ঢাকায় গোস্বামী প্রভু প্রতিষ্ঠিত গেন্ডারিয় আশ্রমের এটি একটি অন্যতম শাখা। বাংলাদেশের ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অন্যতম নেতা তথা প্রচারক ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কৃপাপ্রার্থী ও অনুগত শ্রী বিজয়কৃষ্ণের ছবি এখানে নিত্য পূজিত হয়। বিজয়কৃষ্ণের দেহসমাধি বর্তমানে পুরীতে থাকলেও এখানে তাঁর তৃতীয় বংশধর ধীরেন্দ্র কিশোর মৈত্র স্বপরিবারে বসবাস করছেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য হয়েও এই সমাজের অর্ন্তকলহের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করেন। ফলস্বরূপ উক্ত সমাজের নিয়মবিধির বাহিরে এসে বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বরের ভক্তিপ্রেম, নাম সংকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হন। তাঁর কীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনি অপরূপ নৃত্য ও হুঙ্কারধ্বনি ঢাকাবাসীদের ভাবসাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলা দেশে বসবাসকালে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ শ্রীশ্রী অদ্বৈতপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে মহাসমারোহে ধূলট উৎসব প্রবর্তন করেন বাংলার ১২৯৮ সনের মাঘ মাসে, যা বর্তমানে বারুইপুরের খাসমল্লিকে অবস্থিত গেন্ডারিয়া আশ্রমে আজও নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাংলাদেশে অতিযত্নে এক ভজনকূটীর করেন, যার বাইরে ও ভিতরে তাঁর নিজের হাতে লেখা উপদেশাবলীতে মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শের বাণী প্রস্ফুটিত হয়েছে –

ক) কুটীরের দেওয়ালের বাইরের গায়ে – ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতণ্যায় নমঃ

খ) কুটীরের ভেতরে দেওয়ালের গায়ে –

এইছা দিন নাহি রহেগা।
আত্মপ্রশংসা করিও না।
পরনিন্দা করিও না।
অহিংসা পরমোধর্মঃ।
সর্ব জীবে দয়া কর।
শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।
শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না
তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ কর। [৯]

৫) বিবিমাতলা :- বারুইপুর পুরাতন বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত বিবিমাতলা বা বিবিমার থান প্রসঙ্গঁত উল্লেখ্য। আমাদের দেশে তুর্কী শাসনের পর আগত পীর-গাজী বিবির দলের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার ও রাজ্যরক্ষায় সহয়তা করা। এই সময়ে আমরা পেয়ে থাকি বনবিবি, বিবিমা, প্রভৃতি মুসলমানী মাতৃক দেবীদের উত্থানের কাহিনী। এই ধর্মীয় স্থানের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওতঃপ্রতভাবে জড়িত সুদীর্ঘ বছরের এক বাসিন্দার নিকট থেকে জানা যায় –

"মধ্যযুগ তথা তুর্কীআমলের পর থেকে বিশেষত দক্ষিণবঙ্গেঁ মানুষের পানীয় জলের অভাবে পেটের অসুখ ছিল নিত্য সঙ্গীঁ। কলেরা বা ওলাওঠায় ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ বিবিমাকে আশ্রয় করেছিল। বিবিমার চরণামৃত বা থান থেকে জল এনে তারা রোগীকে খাওয়াতো। ওলাওঠা নির্বান করতো বলে এঁনার নাম ওলাই বিবি। ওলা অর্থে বাহ্যি এবং ওঠা অর্থে বমি। বিবিমার কোন মূর্তি বা মনুষ্য প্রতিরূপ হয়না"। [১০]

এছাড়া এই এলাকা ও নিকটস্থ এলাকার আধিবাসীদের সাথে প্রত্যক্ষ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে –

SAMSAPTAK ISSN : 2454-4884 ESTD- 2015 PEER-REVIEWED & REFEREED JOURNAL

"আমাদের দেশে ইসলামের আগমনের প্রথম পর্বে সনাতনী হিন্দুরা মুসলিমদের থেকে নিজেদের সহস্রদূরে রাখলেও পরবর্তীকালে সুদীর্ঘকাল একসাথে বসবাসের মধ্য দিয়ে হিন্দু – মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান – প্রদান ঘটেছিল, যার প্রতিফলন বর্তমান এই বিবিমাতলায় পরিলক্ষীত হয়। ব্রাক্ষণ পরিবারে মহিলারা সারাদিন উপবাস করে এখানে পূজো দিতে আসেন, মুসলিম পরিবারে পুরুষরা সেই পূজোকার্য সম্পন্ন করেন। এখানে হিন্দু – মুসলমানের এক অদ্ভুদ মেলবন্ধন আজও সুস্পষ্ট। একেবারে সঠিক সন – তারিখ না জানা গেলেও এই বিবিমার থানটি আনুমানিক ৪০০ শত বা তারও বেশি বছরের পুরানো"। [১১]

যদিও এই নিবন্ধে কেবলমাত্র মহাপুরুষদের পদধূলি সমৃদ্ধ ধর্মীয় পীঠস্থান আলোচিত হয়েছে তথাপি বারুইপুরের নানা স্থানে জাতি – ধর্ম নির্বিশেষে এমন অনেক মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, দরগা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বারুইপুরের দোলতলার মন্দিরের ইতিহাস অবিস্মরণীয়। এটি মন্দিরটিতে বারুইপুরের মধ্যে সর্বপ্রথম বৈদেশিক স্থাপত্যের রীতির সুচারু ব্যবহার পরিলক্ষীত হয়েছে। এছাড়া রায়চৌধুরীদের আনন্দময়ী মন্দির, পঞ্চানন মন্দির, শিবানীপীঠ সহ একাধিক ধর্মীয় পীঠস্থানের সমাবেশ বারুইপুরকে দঃ ২৪ পরগণা তথা পশ্চিমবঙ্গেঁর ধর্মীয় ইতিহাসের দরজায় উপনীত করেছে।

তথ্যসূত্র :-

১) হাজরা ডঃ অমলেন্দু, দঃ ২৪ পরগণার উপকথা ও লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১১
২) চ্যাটার্জী ইরা ও পুরকাইত মনোরঞ্জন বারুইপুরের ইতিহাস, পৃঃ ১২৩
৩) বারুইপুর নিবাসী শ্রী মানবব্রত মিশ্র ও হেমেন মজুমদার সহিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য (০২.০৩.২০২৪, ও ০৫.০৩.২০২৪)
৪) চৌধুরী, ডঃ দুলাল, প্রসঙ্গঁ বারা ঠাকুর
৫) দাস, ডঃ রামরঞ্জন, পশ্চিমবঙ্গেঁর দেবদেউল পুরাকীর্তি ও লোকসংস্কৃতি পৃঃ ১২৫
৬) হাজরা, ডঃ অমলেন্দু, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উপকথা ও লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১4, উর্শ্রী প্রকাশনী
৭) তদৈব পৃঃ ১4
৮) বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবদেবী, পৃঃ ১৫৫
৯) চক্রবর্তী করণ কিরণ, গেন্ডারিয়া আশ্রম, ঢাকা অধুনা বারুইপুর, পৃঃ ১০ ও ১১, ক্লাসিক পাবলিকেশন
১০) বিবিমাতলার বর্তমান পূজারী (সিরাজ) তথা স্থানীয় মুসলিম পরিবারের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ০৯.০৩.২০২৪ ও ১০.০৩.২০২৪
১১) সুদীর্ঘ কালের বাসিন্দা বুলবুল রায়চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞাত।

....

ইতিহাস বিভাগ, সুশীল-কর কলেজ, চম্পাহাটি

বৃত্তিরূপে লক্ষণা : ন্যায় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সমীক্ষা

রাধারঞ্জন সাহা

ABSTRACT –

People use everything by śabda (words), whether spoken or written. The function of śabda (words) is to convey meaning. An important aspect of this term is bṛtti. These bṛtti are two types, namely śakti and lakṣaṇā. Śakti is the main or primarybṛtti and lakṣaṇā is the secondary bṛtti. This article will discuss, What islakṣaṇā in the form of bṛtti? What is necessity of lakṣaṇā? Which is thebija or producer of lakṣaṇā? How many types of lakṣaṇā. The main purpose of this article is to discuss how semantics is generated by lakṣaṇā from the standpoint of Nyāya philosophy.

KEY-WORDS-

śabda (words), bṛtti, śakti, lakṣaṇā, bija, gauṇīvrtti, śābdabodha

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশে শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ নিয়ে যেসকল আলোচনা দেখা যায়, ন্যায় দর্শন তথা ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই তা আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে শব্দের আলোচনা ভারতবর্ষে ঋগ্বেদের যুগেই শুরু হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার শব্দের দ্বারা সম্পাদিত হয়। উচ্চারিত হোক্ বা লিখিতই হোক্ শব্দের কাজই হল অর্থকে বহন করা। শব্দ ও পদ ভারতীয় দর্শনে সাধারণতঃ অভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। শব্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৃত্তি। একটি পদের সাথে তার বাচ্য পদার্থের শাব্দবোধের অনুকূল সম্বন্ধের পারিভাষিক নাম হল বৃত্তি। বিভিন্ন দর্শনে বৃত্তির বিভিন্ন প্রকার স্বীকৃত হয়েছে। সাধারনভাবে শক্তি, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য এই চার প্রকার বৃত্তি প্রচলিত। ন্যায় মতে এই বৃত্তি দুই প্রকার : শক্তি ও লক্ষণা। শক্তি হল প্রধান বা মুখ্য বৃত্তি এবং লক্ষণা হল গৌণ বৃত্তি। শক্তি বা লক্ষণা এই দুই প্রকার বৃত্তিরূপ সম্বন্ধের কোন একটির জ্ঞান ব্যতীত একটি পদ শ্রবণান্তর সেই শ্রুতপদ থেকে তার বাচ্য পদার্থের স্মরণ সম্ভব হয় না। শক্তির দ্বারা যখন শব্দার্থ বা পদার্থ জ্ঞান হয় না তখন লক্ষণার দ্বারা সেই পদার্থজ্ঞান সম্ভব হয়। এই জন্য ন্যায় দর্শনে শক্তি ও লক্ষণার জ্ঞানকে শাব্দবোধের সহকারী কারণ রূপে গণ্য করা হয়েছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে বৃত্তিরূপে এই লক্ষণা কী? লক্ষণার প্রয়োজন কী? লক্ষণার প্রয়োজন কেন হয় অর্থাৎ লক্ষণার প্রযোজক বা বীজ কী? লক্ষণার কি কোন প্রকার আছে? থাকলে সেই প্রকার গুলি কী কী? উক্ত সমস্ত বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের চিন্তাধারা আমার এই নিবন্ধে প্রতিফলিত হবে।

লক্ষণা: পদপদার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধরূপ দ্বিবিধ বৃত্তির মধ্যে অন্যতম গৌণ বৃত্তিটি হল লক্ষণা। লক্ষণার পরিচয় দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় বলেছেন, "শক্যসম্বন্ধো লক্ষণা"।[১] অর্থাৎ তাঁর মতে, শক্যের সম্বন্ধ হল লক্ষণা। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে লক্ষণার সূচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্যানুপপত্তিতঃ"।[২] পুংক্তিটির সরলার্থ এই যে, শক্তিলভ্য অর্থের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাই হল লক্ষণা। শক্তির দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় শক্য বা শক্যার্থ। এই শক্যার্থে বাক্যার্থের অন্বয়ের অনুপপত্তির বা তাৎপর্যের অনুপপত্তির জ্ঞান জন্মায়। আর সেই জ্ঞান থেকে লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা লক্ষ্যার্থের স্মরণ এবং ফলস্বরূপ শাব্দবোধ জন্মায়। এই জন্য শক্য বা শক্যার্থের সম্বন্ধকে বলা হয় লক্ষণা। লক্ষণীয় এই যে, শক্তির দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তা যেমন শক্যার্থ, তেমনই লক্ষণার দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহল লক্ষ্যার্থ। লক্ষ্যার্থ কোন না কোন সম্বন্ধে শক্যার্থের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। শক্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের এই সম্বন্ধই হল শক্যসম্বন্ধ। শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের এই সম্বন্ধ গুলি ন্যায় মতে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে- (১) সংযোগ(বাচ্যত্ব), (২)সামীপ্য, (৩)সমবায়(আধার-আধেয়), (৪)বৈপরীত্য এবং (৫)কার্যকারণভাব প্রভৃতি।

ন্যায় মতে, উপরীউক্ত সম্বন্ধ গুলির যে কোনটিকেই শক্য সম্বন্ধ বলা হয়। এইরূপ শক্য সম্বন্ধই হল ন্যায় মতে লক্ষণাবৃত্তি। এখন আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করব। ''গঙ্গায়াং ঘোষঃ''[৩]- এই বাক্যের অর্থজ্ঞান অর্থাৎ শাব্দবোধ শক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ 'গঙ্গা' শব্দের শক্যার্থ বা শক্তিলব্ধ অর্থ হল পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে- ভগীরথের রথচক্রখাত পথে প্রবাহিত জলধারা। আর 'ঘোষ' পদের শক্যার্থ হল ঘোষপল্লী(গোয়াল পাড়া)। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত 'গঙ্গায়াং ঘোষ' এই সম্পুর্ন বাক্যটির শক্যার্থ হল গঙ্গার জলপ্রবাহে ঘোষপল্লী বাসরত। আধুনিক কালেও আমরা সচরাচর বলে থাকি- আপনার বাড়ী কি গঙ্গার ওপরে? আমাদের বাড়ী একেবারে ঠিক ষ্টেশনের ওপরে, ইত্যাদি। কিন্তু গঙ্গার জলপ্রবাহে ঘোষপল্লী কেন, কারোরই পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যটির শক্যার্থের অন্বয়ে বাধ ঘটছে, যাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা যায় অন্বয়ানুপপত্তি ঘটছে। আবার বাক্যটিতে তাৎপর্যেরও বাধ তথা অনুপপত্তি ঘটছে। কারণ বক্তা যা বলতে ইচ্ছা করেন, তাকেই বলা হয় তাৎপর্য। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বাক্যটি প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তা গঙ্গার জলপ্রবাহে ঘোষপল্লীর বসবাস বোঝাতে চাইছেন না, বোঝাতে চাইছেন গঙ্গার তীরে ঘোষপল্লীর বসবাস। অর্থাৎ ঐ বাক্যের দ্বারা বক্তার যে সঙ্গত মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য উক্ত বাক্যস্থিত 'গঙ্গা' পদের লাক্ষনিক অর্থ গ্রহণ করতে হয়। আর সেই অর্থটি হল গঙ্গার তীর। এই লাক্ষণিক অর্থটি হল শক্যার্থ সম্বন্ধী। 'গঙ্গা' পদের শক্যার্থ হল গঙ্গা নামক নদীর জলপ্রবাহ এবং ঐ জলপ্রবাহের সম্বন্ধী হল তার তীর বিশেষ। এখানে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটি হল সামীপ্যসম্বন্ধ। ফলতঃ গঙ্গা নদীর জলপ্রবাহ সমীপস্থ তীরই এখানে 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ। সুতরাং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বাক্যটি শ্রবণান্তর শ্রোতার গঙ্গা নদীর তীরে ঘোষপল্লীর বসবাস এই অর্থ বোধিত হয়।

লক্ষণার প্রকার : ন্যায় দর্শনের বিভিন্ন শাস্ত্রে লক্ষণার বিভিন্ন প্রকারভেদ পরিলক্ষীত হয়। কোন কোন ন্যায় শাস্ত্রে লক্ষণাকে জহৎ লক্ষণা, অজহৎ লক্ষণা ও জহদজহৎ লক্ষণা ভেদে তিন প্রকার বলা হয়েছে। কোন কোন ন্যায় শাস্ত্রে এই তিন প্রকার লক্ষণাকেই ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে- জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ এবং জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা। আবার কোন কোন ন্যায় শাস্ত্রে লক্ষণার দুটি প্রকার স্বীকৃত হয়েছে, যথা-জহৎস্বার্থ এবং অজহৎস্বার্থ। বিশিষ্ট নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থে এই অজহৎস্বার্থ লক্ষণাকে একস্বার্থবহিত্ব লক্ষণা নামে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি তিনি উক্ত তিন প্রকার লক্ষণার বাইরে লক্ষিত লক্ষণা নামে চতুর্থ একপ্রকার লক্ষণার কথাও বলেছেন। যাইহোক এখন এই বহুল প্রচলিত লক্ষণা গুলির পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

জহৎ লক্ষণা : যেসকল বাক্যে লাক্ষণিক পদটি নিজের বাক্যার্থকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে একটি নতুন অর্থের বোধক হয় সেখানে ব্যবহৃত লক্ষণাকে বলা হয় জহৎলক্ষণা বা জহৎস্বার্থলক্ষণা। অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় জহৎলক্ষণার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "যত্র বাচ্যার্থস্য অন্বয়াভাবঃ তৎ জহৎ ইতি"।[৪] সরলার্থ হল এই যে, যে লক্ষণায় একটি পদের বাচ্যার্থ বা বাক্যার্থ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়, বাক্যের অর্থবোধে ঐ পদের বাচ্যার্থের অন্বয় হয় না, তাই হল জহৎ লক্ষণা। এই লক্ষণার উদাহরণ দিতে গিয়ে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'।[৫] এই বাক্যস্থিত 'মঞ্চ' পদের শক্যার্থ গ্রহণ করা হলে উক্ত বাক্যের অর্থ দারাই মঞ্চ গুলি কলরব বা চিৎকার করছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত পশু-পক্ষীদের প্রকোপ থেকে ক্ষেতের শস্যকে রক্ষা করার জন্য ক্ষেতের মালিক বাঁশ, কাঠ দ্বারা মঞ্চ নির্মাণ করে তাতে উপবিষ্ঠ হয়ে(বসে) শস্য পাহারা দিয়ে থাকেন। যখন শস্যক্ষেতে পশু-পক্ষীর আগমন হয় তখন তাদের উদ্দেশ্যে পাহারারত ব্যাক্তিগণ চিৎকার করেন এবং ঐ চিৎকার শুনে পশু-পক্ষীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এর ফলে ক্ষেতের শস্য রক্ষা পায়। সুতরাং এখানে 'মঞ্চগুলি চিৎকার করে' বলতে মঞ্চে উপবিষ্ট মানুষগুলি শব্দ করে একথাই বুঝতে হবে। মঞ্চে উপবিষ্ট মানুষই 'মঞ্চ' পদের লাক্ষণিক অর্থ। কিন্তু 'মঞ্চ' পদের বাচ্যার্থ গ্রহণ করলে 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যের অর্থ উপপন্ন হয় না, উক্ত বাক্যে তাৎপর্যের অনুপপত্তি হয়। কেননা মঞ্চ যেহেতু একটি জড় বা অচেতন বস্তু সেহেতু তার পক্ষে চিৎকার করা সম্ভব

হয় না। তাই এই অনুপপত্তি নিবারণের জন্য 'মঞ্চ' পদে লক্ষণার দ্বারা মঞ্চস্থিত মানুষকে বুঝতে হবে। আর যেহেতু এক্ষেত্রে 'মঞ্চ' পদের শক্যার্থকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে এইরূপ লক্ষণা করা হয়, তাই এই লক্ষণাকে জহৎলক্ষণা বা জহৎস্বার্থ লক্ষণা বলা হয়।

অজহৎ লক্ষণা : লক্ষণার দ্বিতীয় প্রকারটি হল অজহৎলক্ষণা বা অজহৎস্বার্থলক্ষণা। যেসকল বাক্যে লাক্ষণিক পদটি নিজের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ না করে নিজ বাচ্যার্থের সাথে অন্যান্য অর্থকেও অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে ব্যবহৃত লক্ষণাকে বলা হয় অজহৎলক্ষণা বা অজহৎস্বার্থলক্ষণা। অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় জহৎলক্ষণার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "যত্র বাচ্যার্থস্য অপি অন্বয়ঃ তত্র অজহৎ ইতি"।[৬] সরলার্থ হল এই যে, যে লক্ষণায় একটি পদের বাচ্যার্থ তথা মুখ্যার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় না, বাক্যের অর্থবোধে ঐ বাচ্যার্থেরও অন্বয় হয়, তাই হল অজহৎ লক্ষণা। অজহৎ লক্ষণার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্'।[৭] এই বাক্যস্থিত 'কাক' পদে যে লক্ষণা করা হয় তা অজহৎস্বার্থ লক্ষণা। উক্ত বাক্যে কাক থেকে দধিকে রক্ষা করতে বলার অর্থ হল কাক ও তৎভিন্ন অন্যান্য দধি নাশক প্রাণী, যথা- কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী থেকে দধিকে রক্ষা করা। অর্থাৎ এখানে 'কাক' পদের শক্যার্থকে পরিত্যাগ না করে লক্ষণার দ্বারা অন্যান্য অর্থকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট প্রমুখ কোন কোন নৈয়ায়িক "ছত্রিনো গচ্ছন্তি"[৮]-এই বাক্যস্থিত 'ছত্রিনো' পদে অজহৎ লক্ষণার কথা বলে থাকেন। একদল মানুষ যখন একসাথে যায় তখন তাদের মধ্যে অনেকের মাথায় ছাতা দেখে কেউ বলতে পারেন যে, ছত্রধারীরা যাচ্ছেন। কিন্তু ঐ দলে যেমন কিছু ছত্রধারী মানুষ থাকেন তেমনি কিছু ছত্রহীন মানুষও থাকেন। এই কারণে 'ছত্রিনো গচ্ছন্তি' এই বাক্যস্থিত 'ছত্রিনো' পদে লক্ষণা করে ছত্রধারী ও ছত্রহীন এই দুই ধরনের মানুষকেই বোঝানো হয়। তাই এক্ষেত্রে 'ছত্রিনো' পদের এইরূপ লক্ষণা হল অজহৎস্বার্থ লক্ষণা। যদিও বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ কোন কোন নৈয়ায়িক এই মত স্বীকার করেন না। তাদের মতে,'ছত্রিনো' একটি পদ নয়, দুটি পদ। 'ছত্র' পদের সাথে 'ইন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'ছত্রিন' পদটি নিস্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে 'ছত্র' পদের যেমন শক্তি আছে তেমনি 'ইন্' প্রত্যয়েরও শক্তি আছে। তাছাড়া ন্যায় দর্শনে পদসমষ্টিকে বাক্য বলা হয়। নৈয়ায়িকগণ বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করেন না, পদে লক্ষণা স্বীকার করেন। তাই 'ছত্রিনো' যেহেতু ন্যায়মতে পদসমষ্টিযুক্ত বাক্য, সেহেতু নৈয়ায়িকগণের পক্ষে এক্ষেত্রে লক্ষণা স্বীকার করার সম্ভব নয়।

জহদজহৎ লক্ষণা : যেসকল বাক্যে লাক্ষণিক পদটি নিজের বাচ্যার্থ বা বাক্যার্থের এক অংশকে পরিত্যাগ করে এবং অন্য অংশকে গ্রহণ করে তখন ঐ পদের লক্ষণাকে জহদজহৎ লক্ষণা তথা জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা বলা হয়। এই লক্ষণাকে তটস্থলক্ষণা বা ভাগলক্ষণাও নামে অভিহীত করা হয়ে থাকে। দীপিকা টীকায় অন্নংভট্ট জহদজহৎ লক্ষণার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "যত্র বাচ্যৈকদেশত্যাগেন একদেশ অন্বয়ঃ তত্র জহত্ত-অজহৎ ইতি"।[৯] অর্থাৎ তাঁর মতানুসারে যে লক্ষণায় পদের বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের একাংশ পরিত্যক্ত হয় এবং একাংশ অন্বিত হয় তথা গৃহীত হয় তাকে জহদঅজহৎ লক্ষণা বলা হয়। "সোহয়ং দেবদত্তঃ"[১০] অথবা উপনিষদীয় "তত্ত্বমসি"[১১] মহাবাক্য- এই সকল বাক্যের অর্থবোধের জন্য জহদজহৎ লক্ষণা স্বীকার করা হয়। "সোহয়ং দেবদত্তঃ"[১১] এই বাক্যে 'সো' পদের অর্থ হল তৎদেশ বৃত্তিত্ববিশিষ্ট দেবদত্ত বা তৎকালীন দেবদত্ত এবং 'অয়ম্' পদের অর্থ হল এতৎদেশ বৃত্তিত্ববিশিষ্ট দেবদত্ত বা এতৎকালীন দেবদত্ত। এখানে বক্তার ইচ্ছারূপ তাৎপর্য অনুসারে উক্ত দুটি পদের শক্যার্থের অভেদ সম্বন্ধ উপপন্ন না হওয়ায় লক্ষণার প্রয়োজন হয়। লক্ষণার দ্বারা এতৎকালীন দেবদত্ত এবং তৎকালীন দেবদত্ত এই পদদ্বয়ের শক্যার্থ বা বাচ্যার্থের অন্তর্গত এতৎকাল ও তৎকাল এই দুটি বিরুদ্ধ অংশ তথা বিশেষণ অংশ পরিত্যাগ করে উভয় পদের যে দেবদত্ত, সেই দুটিকে(যা শক্যার্থের অপর এক অংশ) তথা বিশেষ্য অংশকে গ্রহণ করে শুদ্ধ দেবদত্তকেই উভয় পদের দ্বারা বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে

বাচ্যার্থের কিছু অংশকে পরিত্যাগ করা হয় এবং কিছু অংশকে গ্রহণ করা হয় বলে এইরূপ লক্ষণাকে জহদজহৎ লক্ষণা বলা হয়। অনুরূপভাবে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে 'তৎ' পদের দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য এবং 'ত্বম' পদের দ্বারা জীবচৈতন্য এই দুইয়ের অভেদ বা অভিন্নতা বোঝানো হয়। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম এবং অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান জীব অভিন্ন হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের চৈতন্য অংশেই অভেদ স্বীকার করা হয় এবং অন্য অংশে ভেদই স্বীকার করা হয়। তাই এইরূপ লক্ষণাকে জহদজহৎ লক্ষণা বলা হয়।

লক্ষিত লক্ষণা : যখন কোন লাক্ষণিক পদে শক্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধরূপ লক্ষণা করা হয় তখন ঐ পদের লক্ষণাকে লক্ষিত লক্ষণা বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ''দ্বিরেফ''[১২] পদে ভ্রমরে লক্ষণা। 'দ্বিরেফ' পদের অর্থ হল দুইটি রেফ বা 'র'কার। 'ভ্রমর' পদেও দুইটি 'র'কার থাকায় 'ভ্রমর' পদ এবং 'দ্বিরেফ' পদ সম্বন্ধী। আবার 'ভ্রমর' পদের শক্যার্থ হল পতঙ্গজীব বিশেষ। তাই বলা যায় যে, 'দ্বিরেফ' পদটি পরম্পরা সম্বন্ধে 'ভ্রমর' পদের বোধক হয়। এইভাবে পরম্পরা সম্বন্ধে লক্ষ্যার্থের বোধজনক লক্ষণাবৃত্তিকে বলা হয় লক্ষিত লক্ষণা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ কোন কোন নৈয়ায়িক মনে করেন যে, এই লক্ষিত লক্ষণা নামক লক্ষণাটি পৃথক কোন লক্ষণা নয়, এটি জহৎস্বার্থ লক্ষণারই অন্তর্ভুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জহৎ লক্ষণার ক্ষেত্রে একটি পদের নিজ বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়, অজহৎ লক্ষণার ক্ষেত্রে একটি পদের নিজ বাচ্যার্থের সাথে অন্যকিছু অর্থকে গ্রহণ করা হয় এবং জহদজহৎ লক্ষণার ক্ষেত্রে একটি পদের নিজ বাচ্যার্থকে আংশিকভাবে গ্রহণ ও আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। অন্যদিকে লক্ষিত লক্ষণার ক্ষেত্রে একটি পদ নিজ বাচ্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধে লক্ষার্থের বোধক হয়।

লক্ষণার প্রয়োজন : ন্যায় মতে পদের গৌণবৃত্তি রূপে লক্ষণা হল শক্যসম্বন্ধ। একথা ঠিক যে, ন্যায় দর্শনে বাক্যের অর্থ উপপন্ন করার জন্যই লক্ষণা স্বীকার করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করলে বক্তার অভিপ্রায় বা তাৎপর্য উপপন্ন হয় না। এই জন্য লক্ষণার দ্বারা উক্ত বাক্যের সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করতে হয়। আর সেই সঙ্গত অর্থ হল গঙ্গা নামক জল প্রবাহের অতি নিকটে ঘোষপল্লীর বসবাস। লক্ষণা বৃত্তির দ্বারাই 'গঙ্গা' পদ শ্রবণান্তর গঙ্গা নদীর তীররূপ অর্থ বোধিত হয়। সুতরাং উক্ত বাক্যে তাৎপর্যের অনুপপত্তির কারণে ' গঙ্গা' পদের লক্ষণাই স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু আপত্তি উঠতে পারে যে, 'গঙ্গায়াং ঘোষ' এই বাক্যস্থ 'গঙ্গা' পদে লক্ষণা স্বীকার না করে 'গঙ্গা' পদটিকে নানার্থ বোধক বললে ক্ষতি কি? 'গঙ্গা' পদটি একঅর্থে জলপ্রবাহ বোধক এবং অপরঅর্থে গঙ্গারতীর বোধক হতে পারে। এই আপত্তির উত্তরে ন্যায়মত অবলম্বন করে বলা যায় যে, 'গঙ্গা' পদকে নানার্থক বললে উক্ত পদে দুটি পৃথক শক্তি স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে একটি শক্তির দ্বারা জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থ বোঝাবে এবং অপর শক্তির দ্বারা তীররূপ শক্যার্থ বোঝাবে। ফলতঃ একই পদে বহু শক্তি স্বীকারে গৌরব দোষের আশঙ্কা দেখা দেয়। বরং 'গঙ্গা' পদে লক্ষণা স্বীকার করে গঙ্গাতীরকে বোঝালে লাঘব হয়। সুতরাং 'গঙ্গায়াং ঘোষ'- এই বাক্যের তাৎপর্যের উপপত্তির জন্য 'গঙ্গা' পদকে নানার্থক বলার পরিবর্তে লক্ষণার দ্বারা গঙ্গাতীররূপ লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করাই শ্রেয়।

পুনরায় আপত্তি উঠতে পারে যে, ক্ষেত্র বিশেষে যখন নৈয়ায়িকগণ একই পদে একাধিক শক্তি স্বীকার করেন তখন তাঁদের নানার্থক পদ স্বীকারে গৌরব দোষের আপত্তি স্ববিরোধীয় দুষ্ট। যেমন'' সৈন্ধব''[১৩] পদ একঅর্থে লবণকে বোঝায় এবং অপরঅর্থে অশ্বকেও বোঝায়। অর্থাৎ 'সৈন্ধব' পদে দুটি শক্তি স্বীকার করা হয়। আবার ব্যাকরণেও অনেক পদেই একাধিক শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। তাহলে 'গঙ্গা' পদে দুটি শক্তি স্বীকার করলে ক্ষতি কী? একই পদে

একাধিক শক্তি স্বীকার করলে যদি যথার্থ বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় তাহলে অতিরিক্ত পদবৃত্তিরূপে লক্ষণা স্বীকার করার প্রয়োজন কি? তাছাড়া শক্তিবৃত্তির অতিরিক্ত একটি বৃত্তি স্বীকার করাটাও তো গৌরবের। এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, 'সৈন্ধব' পদের ক্ষেত্রে যেদুটি অর্থ প্রচলিত তার একটিকে শক্যার্থ এবং অপরটিকে লক্ষ্যার্থ বলা যায় না। কারণ সেক্ষেত্রে লবণকে শক্যার্থ এবং অশ্বকে লক্ষ্যার্থ বলার জন্য লবণ ও অশ্বের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। তাই 'সৈন্ধব' পদের ক্ষেত্রে দুটি শক্তি স্বীকার করাটা একপ্রকার অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যস্থ 'গঙ্গা' পদের নানা শক্তি স্বীকারের জন্য সেরূপ কোন অনিবার্যতা নাই। লক্ষণার দ্বারাই 'গঙ্গা' পদের অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব। 'গঙ্গা' পদের শক্যার্থ হল বিশেষ এক প্রকার জলপ্রবাহ। গঙ্গার জলপ্রবাহের সঙ্গে গঙ্গার তীরের সামীপ্য সম্বন্ধ থাকায় লক্ষণা স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাও নাই। লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই 'গঙ্গা' পদটি গঙ্গাতীর অর্থের বোধক হয়। এরজন্য 'গঙ্গা' পদের নানা অর্থ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই এবং তা গৌরব দোষে দুষ্ট। সুতরাং বাক্যার্থ নির্ণয়ের জন্য শক্তিবৃত্তির অতিরিক্ত লক্ষণাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ন্যায় দর্শনে বাক্যের অর্থ উৎপন্ন করার জন্যই শক্তিবৃত্তির অতিরিক্ত লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করেন না, পদেই লক্ষণা স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, পদের লক্ষণার দ্বারাই বাক্যের অর্থ উৎপন্ন করা সম্ভব। বাক্যে শক্তি থাকে না, তাই বাক্যের শক্যার্থও থাকে না। আর বাক্যের শক্যার্থ নাই বলে বাক্যে শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাও সম্ভব হয় না। তাই বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই।

লক্ষণার প্রযোজক বা বীজ : একথা ঠীক যে, ন্যায় দর্শনে বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করা হয় না, একমাত্র পদেই লক্ষণা স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, কোন পদে লক্ষণার প্রয়োজন কেন হয়? অন্যকথায় বলা যেতে পারে যে, লক্ষণার প্রযোজক বা বীজ কোনটি? কেউ কেউ মনে করেন অন্বয়ের অনুপত্তিই লক্ষণার প্রযোজক। আবার কারও কারও মতে তাৎপর্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার প্রযোজক। যারা অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার প্রযোজক বা কারণ বলে মনে করেন তাদের মতে, 'গঙ্গায়াং ঘোষ' এই বাক্যস্থ 'গঙ্গা' পদের শক্যার্থের সঙ্গে ঘোষপল্লীর অন্বয়ের উপপত্তি হয় না। কেননা গঙ্গার জলপ্রবাহে ঘোষপল্লী বসবাস করতে পারে না। তাই লক্ষণার দ্বারা 'গঙ্গা' পদে গঙ্গার সন্নিকটস্থ তীর অর্থ গ্রহণ করা হয়, যাকে বলা হয় লক্ষণার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ। এই লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করলে 'গঙ্গা' এবং 'ঘোষ' পদদ্বয়ের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ উপপন্ন হয়। ফলতঃ গঙ্গার জলপ্রবাহের অতি সন্নিকটস্থ তীরে ঘোষপল্লীর বসবাসে কোন অনুপপত্তি হয় না। এই কারণে তারা অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার প্রযোজক বলে স্বীকার করেন।

নৈয়ায়িকগণ লক্ষণার প্রযোজক বা বীজ সংক্রান্ত উপরীউক্ত অভিমত স্বীকার করেন না। ন্যায় মতে তাৎপর্যের অনুপপত্তি হল লক্ষণার প্রযোজক তথা বীজ। অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ রূপে স্বীকার করলে নানান অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়। বিশিষ্ট নৈয়ায়িক আচার্য্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থে ও তৎসহ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাগ্রন্থে লক্ষণার বীজরূপে অন্বয়ানুপপত্তিকে নিরস্ত করে কেবল তাৎপর্যানুপপত্তিকেই লক্ষণার বীজরূপে স্বীকার করেছেনএবং তিনি এক এক করে বাস্তব দৃষ্টান্তযোগে যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন যে, অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ বলা হলে স্থলবিশেষে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে। এখন সেই সমস্যাগুলি নিয়েধাপে ধাপে নিম্নে আলোচনা করব–

প্রথমতঃ অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ বলা হলে 'গঙ্গায়াং ঘোষ' এই বাক্যটি শুধুমাত্র 'গঙ্গা' পদে লক্ষণা করে নয়, 'ঘোষ' পদে লক্ষণা করেও অন্বয়ের উপপত্তি করা সম্ভব। 'গঙ্গা' পদে 'গঙ্গাতীর' লক্ষণার্থ গ্রহণ করে গঙ্গার তীরে ঘোষপল্লীর বসবাসরূপ বাক্যার্থবোধ যেমন উপপন্ন হয় ঠিক তেমনি 'ঘোষ' পদে 'মৎস্য' লক্ষণার্থ গ্রহণ করে গঙ্গার জলপ্রবাহে মৎস্যের বসবাসরূপ বাক্যার্থবোধ উপপন্ন করা যায়। অর্থাৎ 'গঙ্গা' ও 'ঘোষ' এই দুটি পদের মধ্যে যেকোন

একটির লক্ষণার্থ গ্রহণ করে অন্বয়ের উপপত্তি করা তথা অন্বয়ের অনুপপত্তি পরিহার করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, কোন্ পদে লক্ষণা করা হবে এবং কোন্ পদে লক্ষণা করা হবে না তা ব্যবস্থিত হবে কীভাবে? অথবা কখন কোন্ পদে লক্ষণা করতে হবে তা নির্ধারণ করার নিয়ম কী? এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। এইসব ক্ষেত্রে বক্তার ইচ্ছারূপ তাৎপর্যকেই বাক্যার্থবোধের নির্ধারক রূপে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ যেমন যেমন বক্তার তাৎপর্য, তেমন তেমন লক্ষণা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন জাগে যে, বক্তার ইচ্ছারূপ তাৎপর্যকে শ্রোতা জানবেন কেমন করে?এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন-"প্রকরণাদিকং তাৎপর্যগ্রাহকম্"।[১৪] অর্থাৎ প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ, আভিমুখ্য, সংকেত ইত্যাদির সাহায্যে শ্রোতা বক্তার ইচ্ছারূপ তাৎপর্যকে জেনে থাকেন। যেমন ভোজনপ্রকরণে (খেতে বসে) যদি কেউ বলেন 'সৈন্ধবম্ আনয়',[১৫] তাহলে শ্রোতা প্রকরণ অনুসারে 'সৈন্ধব' পদ থেকে লবণ অর্থই বুঝবেন, 'সৈন্ধব' পদের অপর অর্থ অশ্বকে বুঝবেন না। এবং তদনুসারে শ্রোতা ভোজনপ্রবৃত্ত বক্তার জন্য লবণই নিয়ে আসবেন- অশ্ব আনবেন না। সুতরাং অন্বয়ের অনুপপত্তিকে নয় তাৎপর্যের অনুপপত্তিকেই লক্ষণার প্রযোজক বা বীজ বলা শ্রেয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ তথা কারণ বলা হলে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্বয়ের অনুপপত্তি ছাড়াই লক্ষণার প্রয়োজন হয়। যেমন, যখন কোন স্থানে বৃদ্ধগণকে সবার আগে ভোজন গ্রহণ করার জন্য বলা হয়-"যষ্টীঃ প্রবেশয়"[১৬] অর্থাৎ যষ্টীকে প্রবেশ করান হোক্, তখন অন্বয়ের কোন অনুপপত্তি থাকে না। কিন্তু এইরূপ বাক্য শ্রবণান্তর ভোজনের তাৎপর্য কোন ভাবেই উপপন্ন হয় না। একমাত্র 'যষ্টী' পদটিকে ধরে লক্ষণার মাধ্যমে ভোজনের তাৎপর্য উপপন্ন হয়। তাই অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ না বলে তাৎপর্যের অনুপপত্তিকেই লক্ষণার বীজ বলা উচিত।

তৃতীয়তঃ অন্বয়ের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ বলা হলে "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্"[১৭] এইরূপ বাক্যে অন্বয়ের কোন অনুপপত্তি না হওয়ায় তাৎপর্য ব্যতীত বাক্যার্থবোধও উপপন্ন হয় না। এখানে যদি 'কাক' পদে লক্ষণা না করা হয় তাহলে বক্তার ইচ্ছারূপ কোন তাৎপর্য উপপন্ন হয় না। 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' এইবাক্যে কাকসকল থেকে দধিকে রক্ষা করতে বলার মধ্যদিয়ে কাকভিন্ন অন্যান্য দধির উপঘাতক প্রাণী, যথা- কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি থেকে দধিকে রক্ষা করার ইচ্ছাই হল বক্তার তাৎপর্য। এইজন্য এখানে 'কাক' পদে দধির উপঘাতক লক্ষণার্থ করা হয়। অনুরূপভাবে 'ছত্রিণো যান্তি'[১৮] এইরূপ বাক্যে অন্বয়ের অনুপত্তি হয় না। 'ছত্রিণো যান্তি' অর্থাৎ একসাথে অনেক লোক যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছত্রধারী(ছাতা নিয়ে আছে), আবার কয়েকজন ছত্রবিহীনও যাচ্ছে এবং এদের সাথে আছে গজ, অশ্ব ইত্যাদি।কিন্তু এখানে তাৎপর্যের অনুপপত্তি বশতঃই 'ছত্রী' পদে লক্ষণা করে ছত্রধারী ও ছত্রবিহীন এই দুই ধরনের লোক এবং গজ, অশ্ব প্রভৃত্তিকে অর্থাৎ সকলে মিলে একটি দলকে বোঝান হয়। ফলতঃ উক্ত বাক্যের অর্থবোধ উৎপন্ন হয়।

উপরীউক্ত সমস্যা গুলির কারণে বিশ্বনাথ প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অন্বয়ের অনুপপত্তি নয় বরং তাৎপর্যের অনুপপত্তিই হল লক্ষণার প্রযোজক বা বীজ তথা কারণ।

আলোচ্য উপস্থাপন পত্রের বিষয়বস্তু আলোচনার শেষ পর্বে এসে মনে হয় যে, বৃত্তিরূপে লক্ষণার ন্যায় তত্ত্ব আজও কার্যকর। একথা ঠিক যে, দৈনন্দিন জীবনে আমাদের ব্যবহৃত বহু পদের পরোক্ষ অর্থ বোধগম্যতার ক্ষেত্রে বৃত্তিরূপে লক্ষণার অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার মনে হয় শুধুমাত্র লক্ষণা-ই বিভিন্ন পদের পরোক্ষ অর্থ বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেক্ষেত্রে লক্ষণার অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা স্বীকার করা শ্রেয়। যদিও নৈয়ায়িকগণ ব্যঞ্জনা স্বীকার করেনা। তাঁদের মতে, ব্যঞ্জনা লক্ষণারই বিস্তারিত রূপ। কিন্তু এই মত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহুপদের অর্থ বোধগম্যতার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

তথ্যসূত্র:

১) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০(ব.), পৃ.৪৪১।

২) ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, ডঃ শ্রীদীপক ঘোষ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩ খ্রি., পৃ.৩২১।

৩) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০(ব.), পৃ.৪৪১।

৪) তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা, দীপক কুমার বাগচী,মিত্রম্, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৫৪।

৫) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০(ব.), পৃ.৪৪১।

৬) তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা, দীপক কুমার বাগচী, মিত্রম্, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৫৫।

৭) ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ, বর্ধমানবিশ্ববিধ্যালয়, ২০০৮খ্রি.,পৃ. ২৯১।

৮) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০(ব.), পৃ.৪৬৫।

৯) তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা, দীপক কুমার বাগচী, মিত্রম্, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৫৫।

১০) ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, ডঃ শ্রীদীপক ঘোষ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩ খ্রি., পৃ.৩৩৩।

১১) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০(ব.), পৃ.৪৬৬।

১২) ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ, বর্ধমানবিশ্ববিধ্যালয়, ২০০৮খ্রি.,পৃ. ২৯৪।

১৩) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০ (ব.), পৃ. ৪৭৬।

১৪) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০ (ব.), পৃ. ৪৭৬।

১৫) সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪৩০ (ব.), পৃ. ৪৭৭।

১৬) ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, ডঃ শ্রীদীপক ঘোষ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩৩০।

১৭) ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, ডঃ শ্রীদীপক ঘোষ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩৩০।

১৮) ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা, ডঃ শ্রীদীপক ঘোষ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩৩০।

SAMSAPTAK ISSN: 2454-4884 PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, পঞ্চাননশাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা, ২০১৬ খ্রি.।

২) ন্যায়দর্শন(১ম খন্ড), ব্যাৎস্যায়নভাষ্য, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ১৯৮১ খ্রি.।

৩) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদসহ, সম্পাদক প্রবালকুমার সেন, ১৪২২ (ব.)

৪) তর্কসংগ্রহঃ, ডঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৭ (ব.)।

৫) তর্কসংগ্রহ, দীপিকাসহ, কানাইলাল পোদ্দার, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০১১ খ্রি.।

৬) ভাষাপরিচ্ছেদ, অনামিকা রায় চৌধুরী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৫ খ্রি.।

....

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়

বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনদর্শন ভাবনা

উত্তম দাস

সারসংক্ষেপ -

অন্নদাশঙ্করের রায়ের (১৯০৪-২০০২) জীবনদর্শন কীভাবে গড়ে উঠেছে এবং সেই দর্শনের মধ্যে প্রজ্ঞা , জ্ঞান , অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ততা, সত্যের উপলব্ধি , বিচারের ভারসাম্য ও বিশ্লেষণের সামঞ্জস্যতা ঠিক কীভাবে উঠে এসেছে এবং তা ভারতীয় দর্শনের সাথে সাদৃশ্য কোথায় ? সেই দিকটিও এই প্রবন্ধের আলোচনায় উঠে আসবে ।অন্যদিকে অন্নদাশঙ্করের অন্তর্জগতের সত্তা কীভাবে গড়ে উঠলো , সেই দিকটিও এই আলোচনায় উঠে আসবে । অন্নদাশঙ্কর মনে করেন তাঁর কিছু দেবার আছে। যার কিছু নিজস্ব মূল্য আছে। যার কিছু নিজস্ব রূপ আছে। না দিয়ে তাঁর মুক্তি নেই। অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করেন শিল্পীর মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিৎ কিংবা মানুষের ধর্ম যে কয়েকখানি শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় , এবং তা কেন ? – সেই দিকটিও এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে। তিনি প্রতি নিয়ত বিশ্ব স্রষ্টার কাছে সৃষ্টি শক্তির একটি কণা প্রার্থনা করেছেন। যাতে তিনিও সৃষ্টি করতে পারেন। তিনই মনে করেন সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উপায়। বিনু বা লেখক বারবার চেয়েছে সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ দেখা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক। অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করেন ভবিষৎ সম্ভাবনার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।তাই প্রাবন্ধিক সাম্প্রদায়িকতার, অশিক্ষার, অপসংস্কৃতির সংহতিহীনতার ঘনায়মান অন্ধকারের আলোকবর্তিকা। তাঁর 'আমার লেখক সত্তা', 'আমার জীবন দর্শন', 'আমার ধর্ম জিজ্ঞাসা', 'আর্ট', 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'আমার সাহিত্যিক বিকাশ' ইত্যাদি প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনদর্শন ভাবনা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

মূল শব্দ-

অন্নদাশঙ্কর , শিল্পি , দর্শন , প্রবন্ধ , সংস্কৃতি , ধর্ম , সংস্কৃতি , সাহিত্য

মূল প্রবন্ধ -

যিনি কখনও জ্ঞানের গরিমা অনুভব না করে , সারা জীবন প্রজ্ঞার সাধনা করেন, তিনিই দার্শনিক হিসেবে বিদগ্ধ। অন্নদাশঙ্কর রায়ের যে জীবনদর্শন এবং সেই দর্শনের জন্য যে প্রজ্ঞা কাম্য যেমন- অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ততা, বিচারের ভারসাম্য ও বিশ্লেষণের সামঞ্জস্য- তা তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে। যে দিকগুলিও তাঁর প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে । যেমন - 'আমার লেখক সত্তা', 'আমার জীবন দর্শন', 'আমার ধর্ম জিজ্ঞাসা', 'আর্ট', 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'আমার সাহিত্যিক বিকাশ' - এমন অনেক রচনা তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। যেখানে রয়েছে নিজের জীবনদর্শনের কথা । তিনি কোন কোন ঘটনার জন্য লেখক হয়ে উঠলেন কিংবা তাঁর জীবনদর্শন কী করে গড়ে উঠল, সব কিছুর উত্তর মেলে উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে। যেমন 'বিনুর বই' -এ লেখকের জীবনের চেয়ে মনের কাহিনীই বেশি করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই গ্রন্থে মেলে জীবন ও শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ । গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায়, বিনু যেন সমস্ত সচেতন শিল্পীরই প্রতিনিধি। বিনুর বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে আমরা শিল্প সাহিত্য নিয়ে চিন্তাভাবনার চেয়ে বিনুর জীবনের ঘটনাবলীর চিন্তা-ভাবনাই বেশি পাই। অন্যদিকে তাঁর চুয়াল্লিশ বছর ধরে অন্বেষণ, অনুভব ও অনুশীলনের ফসল 'আর্ট' নামক গ্রন্থটি।

ভারতীয় দর্শনে বহির্জগতের চেয়ে অন্তর্জগতের দিকেই যেহেতু দৃষ্টি বেশি , সেই দিক দিয়ে অন্নদাশঙ্করের অন্তর্জগতের ঠিক কীভাবে গড়ে উঠলো তা ধরা পড়ে তাঁর 'আমার লেখকসত্তা' প্রবন্ধে । প্রাবন্ধিক স্বীকার করেছেন— " বিভিন্ন ভাষার সেরা পত্রিকার সেরা লেখকদের রচনা পড়ে বাল্যকাল থেকেই আমার অজ্ঞাতসারে আমার লেখকসত্তা গড়ে উঠে।" [১] গান্ধী টলস্টয়ের প্রভাবে জনগণের জীবনের শরিক হতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে— "ধীরে ধীরে

আমার প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে সাহিত্যে যদি আমার তন্ময়তা না থাকে তবে একটি মাঝারি উচ্চতায় আমি উঠতে পারব, তার উপরে আর পারব না। একরাশ লেখাটাই পুরুষার্থ নয়। চাই উত্তরোত্তর উৎকর্ষ। একটার পর একটা সোপান অতিক্রম। উচ্চতার থেকে অধিকতর উচ্চতায় উন্নয়ন। রাজকর্ম যদি অনুকূল না হয় তবে রাজকর্মই পরিত্যজ্য। কিন্তু অ্যাকশনের আকাঙ্ক্ষা তখনো প্রবল ছিল। সেই ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে আর কী ভাবে করব ? সাহিত্যিকের জীবনে কি শুধু লেখার অভিজ্ঞতাই থাকবে, জীবনের আর দশটা দিক দেখার অভিজ্ঞতা থাকবে না? আর অভিজ্ঞতা যে সব সময় প্রীতিকর হবেই এমন নিশ্চয়তা কে দেবে? ইউরোপের লেখকদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। সেটা কি কম অপ্রীতিকর ? প্রীতিকর হোক অপ্রীতিকর হোক নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে না গেলে সাহিত্যিক নিতান্ত একদেশদর্শী হয় ও দর্শনের অভাব কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে দেয়। আমার কর্মজীবন আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে।” [২]

তাঁর সাহিত্যিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়ের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে। তিনি পরের মতো করে নয়, নিজের মতো করেই বলতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায় — “আমি জানি যে আমার - কিছু দেবার আছে। যার কিছু নিজস্ব মূল্য আছে। যার কিছু নিজস্ব রূপ আছে। না দিয়ে আমার মুক্তি নেই। আমি যেন অন্তঃসত্তা নারী। দিয়েই আমি খালাস হব। তার আগে নয়। তার আগে আমাকে অতি যত্নে গর্ভরক্ষা করতে হবে। শিল্পীমাত্রেরই এটা কর্তব্য। আর্টের এটা দাবী। আদিকাল থেকে আজ অবধি যতগুলি সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিতে রিলিজনের পরেই আর্টের স্থান। যেখানে রিলিজন বিলুপ্ত সেখানেও আর্ট এখনো বিদ্যমান। যেমন মিশরে ও গ্রীসে। যেমন সিন্ধু উপত্যকায়। আমরা শিল্পীরা যদি তৎপর না থাকি তবে হাজার দুয়েক বছর বাদে এযুগের সভ্যতার কোন চিহ্ন থাকবে না। ”[৩]

প্রাবন্ধিকের প্রধান কাজ যদিও সৌন্দর্যসৃষ্টি ও স্বার্থকতাও তাই, তবুও প্রাবন্ধিক নিজের দেশের ও যুগের ভাবুক। তাঁকে অনেক সময়ই সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ সরিয়ে রেখে ভাগ নিতে ও দিতে হয়। প্রাবন্ধিক পঞ্চাশ বছর বয়সে উপলব্ধি করেন সৌন্দর্য বলতে শুধু বহিঃসৌন্দর্যই শেষ কথা নয়, অন্তর সৌন্দর্যও বোঝায়। অন্তঃসার তো থাকবেই। দুটি নিয়ে সৃষ্টি।— “ শিল্পীকে যেমন করতে হয় গর্ভরক্ষা তেমনি মানবিকবাদীকে বা ধ্যানীকে করতে হয় বীজরক্ষা। চাষীরা যেমন বীজধান রক্ষা করে তেমনি আদর্শবাদীদেরও রক্ষা করতে হয় সেইসব আদর্শ যেসব পরে একদিন অঙ্কুরিত হবে, বিকশিত হবে, ফুটবে ও ফলবে।” [৪] এই হলো ভারতীয় দর্শনের মতো দৃষ্টি ভঙ্গীর উদারতার কথা ।

অন্যদিকে ‘ আমার জীবন দর্শন’ নামক প্রবন্ধে বললেন – মানুষের ধর্ম কয়েকখানি শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ধর্মের অভিজ্ঞতা একটি নিত্য প্রবহমান অভিজ্ঞতা। তিনি বিশ্ব স্রষ্টার কাছে সৃষ্টি শক্তির একটি কণা প্রার্থনা করেছেন। যাতে তিনিও সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি বলেছেন—“এখন যীশুর সেই অনুশাসনের আমি এই অর্থ করি যে অপ্রেম দেখলে প্রেম দিতে হবে, অমঙ্গল দেখলে মঙ্গলকর্ম করতে হবে, অন্যায় দেখলে ন্যায়ের জন্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত হতে হবে। নীরসতার মধ্যে রস আনতে হবে, কুরূপের মধ্যে রূপ। নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ। অসত্যের মধ্যে সত্য। লেখনী যখন আমার হাতে দেওয়া হয়েছে তখন লেখনীকেও কাজে লাগাতে হবে।” [৫] তিনি বলেন তাঁর দেশ, কাল, সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ, অন্তরে ও বাইরে যা আছে, প্রকৃতি, ভগবান ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত নৈতিক বিধান— সবাইকে নিয়ে তিনি এবং তাকে নিয়েই সবাই। এই হল তাঁর জীবন দর্শনের মূলকথা। অন্যদিকে ‘আমার ধর্ম’ নামক প্রবন্ধে তিনি যা বলেন, তাতে আর এক জীবনদর্শন। তিনি নতুন করে সত্যকে বরণ করেন। বরণ করেন সৌন্দর্যকেও, যা না হলে লেখা আর্ট হয় না । বরণ করেন প্রেমকে, যা না হলে আর্ট হয় প্রেমহীন। প্রেম কেবল নরনারীর নয়, মানব প্রেম। তার থেকে ঈশ্বর প্রেম। তা না হলে প্রেমের সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়। তাঁর ভাষায়- “আমি মানবিকবাদী। ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে এর বিরোধ দেখিনে। প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে বিরোধ দেখলে আমি মানবিকবাদকেই শ্রেয় মনে করি।” [৬]

'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামক প্রবন্ধে শিল্পীর মানদণ্ড সম্পর্কে সজাগ। যাঁরা নতুন কিছু বলতে চান বা লেখনীর মাধ্যমে সৃষ্টি করতে চান। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন লেখক ও শিল্পীর কর্তব্য সম্পর্কে। আধুনিক যুগে একজন লেখক ও শিল্পীর কর্তব্য স্থির করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সবদিক বিবেচনা করে তাঁকে কাজ করতে হয়। যতক্ষণ না তিনি আত্মবিক্রয় করছেন ততক্ষণ তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েই থাকবেন। তাঁর শেষ বিচার হবে তাঁর সৃষ্টিকর্মের দ্বারা, তিনি যেটা করেন নি বা করতে পারেননি, সেটার দ্বারা নয়- অন্নদাশঙ্কর রায় এমনটাই মনে করেন ।

লেখকের আত্মজীবনমূলক ও আত্মশিল্পমূলক গ্রন্থ 'বিনুর বই'। বিনুর বই-এর নায়ক বিনু লেখকের প্রতিরূপ না হলেও অনুরূপ , কল্পরূপ— ভাবরূপ-প্রতীকী রূপ যেকোনোটি হতে পারে এবং প্রকৃতই লেখকের এই সমস্ত রূপের একটি সমবায় বিনু। যদিও আমরা বিনু চরিত্রটির প্রথম সাক্ষাৎ পাই 'জীবনশিল্পী' গ্রন্থে। তিনি কীভাবে লেখক হয়ে উঠেছিলেন বিনুর বই তারই দলিল। লেখক নিজেই যদিও বলেছেন বিনু কিন্তু সব সময় তিনি (অন্নদাশঙ্কর রায়) নন। তার মতোই একজন লেখক। মোট কথা যে কোন লেখকই নিজের বৃত্তি সম্পর্কে গভীর ভাবে ভেবেছেন কিংবা লেখক হয়ে উঠতে গিয়ে যাঁদের 'অন্তর-বাহির'-এ নানা রকম বোঝাপড়া করতে হয়েছে তার অনেক উত্তর পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। বিনু যেন সকল সৃষ্টিশীল ব্যক্তির দর্পণ। বিনুর বই দুটি পাঠের মধ্যে প্রথম পর্বে এক সাহিত্যিকের শিক্ষানবিশির বিবর্তনেরও চূড়ান্ত পরিণতির— বৃত্তান্ত। একদিকে দেশ-কাল-পাত্রের অন্যদিকে লেখকের জীবনের ও মনের বিকাশেরও রূপান্তর বা সংক্রমণের সাহিত্যিক-নান্দনিক রূপরেখা।

বিনু অন্নদাশঙ্করে ক্ষেত্রে যতটা না বিষয় ও পদ্ধতি, তার চাইতেও বেশি অ্যাপ্রোচ বা প্রতিন্যাস। অন্নদাশঙ্কর — বিনু— 'আমি' চরিত্র : এই তিন ধারার বিরহ-মিলনের ফলাফল দিয়েই অন্নদাশঙ্করকে বিচার করলে বোধ হয় জীবনদর্শন পরিষ্কার বোঝা যাবে। বিনুর বই, লেখা হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। তখন লেখকের বয়স চল্লিশ বছর। যৌবন তখনও অস্ত যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ লিখলেন ছিয়াশি বছর বয়সে। তখন তিনি প্রায় সূর্যাস্তের কাছাকাছি। বইটি নামাঙ্কিত কয়েকটি ছোট ছোট অংশে। এক একটি নামই লেখকের জীবনের এক একটি থীম। যেমন— পোষা প্রাণী; খাঁচার পাখি, অমরত্ব, কর্তব্য, দোরেখা নীতি, জীবন যাপন, জীবন বেদ, নীতিবিচার, দ্বিতীয় পর্বে বিনুর পূর্বকথা, বিনুর উত্তর কথা, বিনুর প্রস্তুতি, বিনুর নিয়তি ইত্যাদি। এগুলি যেন কতগুলি সংকেত।

বিনুর বই-এর প্রথম পর্ব থেকে তাঁর শিক্ষা নবীশীর মধ্য দিয়ে কীভাবে জীবন দর্শনের ইমারত গড়ে উঠল দেখা যাক। বিনুর কাছে সাধনার শেষকথা মোক্ষ, রসমোক্ষণ। তাঁর পিছনেই বিনুর লাগামহীন লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাগিদ। সেই মাসিক পত্রের ছিদ্র দিয়েই লিখতে সাধ যায় বিনুর। কিন্তু মাসিক পত্র বন্ধ হলেও বিনু লিখবেই, না লিখে যে তাঁর মুক্তি নেই। আর লিখেও মুক্তি পায় না বিনু। কেননা, কেমন করে লিখবে? সে তো জানে না। যাও লিখে তাও নকলনবিশী। তারপর সবুজ পত্র থেকে আর্ট শব্দের সাথে তাঁর সখ্যতা জন্মায়। কথাটা মালার মতো গেঁথে যায় তাঁর গলায়, মনে। বিনু সেই মানুষ যে বুঝতে পেরেছে লেখক হয়ে উঠতে গেলে শুধু 'লিপিচতুর' হলে তো হবে না, 'জীবনচতুর' ও হতে হবে। যেমন— " চতুর শুধু লিপিচতুর নয়। জীবনচতুর! রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর লিপিচাতুর্য জীবনের চাতুর্য। তাঁদের চোখ চতুর, কান চতুর, রুচি চতুর। তাঁদের মন চতুর। এক প্রকার মন আছে, বিদগ্ধ মন। যার সে মন নেই সে যদি লিপিচতুর হতে যায় তবে রসের বদলে দেয় রসাভাস। তাতে প্রাণ জুড়ায় না। একটু চমক লাগে এই যা। ' ঘরে বাইরে'র বা 'চার ইয়ারী'র চাতুর্য ওষ্ঠগত নয়। বৈদগ্ধের বিদ্যুৎস্ফুরণ। 'মেঘদূতে'র চাতুর্যও তাই এমনি করে ক্লাসিকের প্রতি বিনুর কৌতূহল জন্মায়। কিন্তু তার মনের ছাঁদ রোমান্টিক।"[৭]

বিনু স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়, নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে চায় সমান বিচার। আর নিজের লক্ষ্যে বিনু লালন করে একজন বিদ্রোহীকে। মানুষের বদ্ধমূল সংস্কারকে সে ভাঙতে চায়, গড়তে চায় নতুন ইমারত। বিনু স্বপ্ন দেখে নতুন

সমাজের। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা বিনুর বৈশিষ্ট্য। বিনু চায় মানুষের সাথে মানুষের সম্প্রীতি। বিনু এমন এক সমাজ চায় যেখানে জীবিকার ভাগ কমবে, জীবনের ভাগ বাড়বে। বিনু সাহিত্যের মধ্যে দেখাতে চায় সমগ্র মানব জীবনের রূপ।বিনুর অস্থির, চঞ্চল, দেশ-বিদেশ বেড়ানো তাঁর আশৈশব সাধ। শুধু তাই নয়, মা ও ঠাকুমার সাথে বাল্যকাল থেকেই মন্দিরে যাওয়ার অভ্যাস পরবর্তীতে তাকে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসবান করে। সে সাকার বাদে আস্তা হারায় চিরকালের মতো। কিন্তু সৌন্দর্যের টানে লেখকের কথায়— "ধর্ম বাদ দিলেও আমাদের সভ্যতার অনেকখানি থাকে, মন্দির তার কেন্দ্র। মন্দির বাদ দিলে ঐতিহ্য বাদ দেওয়া হয়, বিনু তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, প্রস্তুত নয়। সে সাকারবাদী না হয়েও হিন্দু, কারণ সে তার স্বদেশের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু এর জন্যে যতটা নৈতিক সাহসের দরকার ততটা তার নেই। মন্দিরে যাব, মাথা নোয়াব না, প্রসাদ পাব না, কী করে তা সম্ভব? অগত্যা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। এটা একটা সমাধানই নয়। এইটেই পলায়ন।" [৮] অন্যদিকে ঐতিহ্য সম্পর্কে বিনুর বক্তব্য যেন এক জীবনদর্শনের কথা শোনায়— " বিনু যদি কোন দিন লেখাপড়া না শিখত, পেয়ারা গাছে বসে সারাদিন কাটাত, পুকুরের জলের দিনের বেলা সাঁতার কেটে সন্ধ্যা বেলা আবার ঝাঁপ দিত, তাহলেও রামায়ণ মহাভারত ও বৈষ্ণব কবিতা তাকে ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রাখত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীও। তার ঠাকুমা তাকে মুখে মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলেছিলেন, মোটামুটি নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বই পড়ে সে তার বেশি শেখেনি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গল্প দুটিও সে তাঁর মুখে শুনেছিল। বাড়িতে চণ্ডী পড়া হত সুর করে। বিনু প্রথমে ছিল শ্রোতা, পরে হল পাঠক। আর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী তো কীর্তনের সময় তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল। সেও হত দোহার। থিয়েটার, যাত্রা ও কথকতা তাকে প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজ্ঞান করেছিল। বিনা অধ্যয়নে। এর প্রভাব তার জীবনব্যাপী।"[৯] সমাজের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী বিনু। আবার কেন লিখবে, এর উত্তরে বিনু বলত কর্তব্য। নামের নেশা তার কম বেশি ছিল। কর্তব্যটা ছিল সামাজিক ও মানবিক। তাঁর ঝোঁকটা তখনও সাহিত্য সৃষ্টির উপর নয়, সমাজ সংস্কারের উপর, সংস্কার মুক্তির উপর। শ্রেণী সাহিত্য সম্পর্কে বিনুর বক্তব্য এই রকম— " বিনু বারবার চেয়েছে সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ দেখা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক।" [১০]

রামায়ণ, মহাভারত বিনুর শিশু বয়স থেকেই প্রিয় ছিল। বিনুর জীবনে এমন একটি দিন এল যেদিন তাকেও মানতে হল তিনি ঠকেছেন প্রণয়ের দায়ে, তাই তাঁকে লিখতেই হবে। কিন্তু কেন লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে, কার জন্যে লিখতে হবে, এসব পুঁথি পড়া মনগড়া প্রশ্ন এতদিন আসর জুড়ে বসেছিল, দায় যেদিন এল সেদিন বিদায় নিল অলক্ষে।তাঁকে সৃষ্টি করতেই হবে। বিনু মনে করে লেখনী এক ধরনের বাঁশি। বাঁশি যে প্রেমের খেয়াতরী, একজনকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দেয়। বিনু মনে করেন বাঁচাটাও লেখা, আবার লেখটাও বাঁচা। তাঁর কাছে সৃজন হচ্ছে আত্মদান। আপনাকে দেওয়া – "আর্ট ফর আর্টস্ সেক বলতে বিনু বোঝে এই তত্ত্ব। যাঁরা আর্টের কাছে কোনো একটা ফল দাবি করেন তাঁরা হয় তো প্রচলিত অর্থে পাটোয়ারী নন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল, দেবত্বের বিকাশ, ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, নৈতিক উন্নয়ন, লোকশিক্ষা প্রভৃতি যত রকম ফল আছে সমস্তই লাভের তুলিকায় লাঞ্ছিত। সে পথে পথ চলার আনন্দ নেই।"[১১]

তবে বিনু বিশ্বাস করে প্রেমের মতো আর্টের সবটাই দেওয়া, দু'হাত খালি করে বিলানো। বিনু মনে করে— "সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উপায়। সেই জন্যে বিনু বলে, আর্টের খাতিরে আর্ট। আর্টই আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টই আর্টের উপায়। আর্‌ট যখন লক্ষ্য ভেদ করে তখন আর্টেরই লক্ষ্য ভেদ করে, আর্ট হয়েই তার উত্তীর্ণতা বা উদ্ধার।"[১২] মোট কথা কবিত্বকে কবিতা করাই বিনুর সাধনা। আবার আঙ্গিক সম্পর্কে বিনুর সচেতন । গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, প্রত্যেক বাক্যের একটা ছন্দ আছে, প্রত্যেক শব্দের একটা ধ্বনি আছে। তার জন্যে কান তৈরি করতে হয়। যেমন বাইরের কান তেমনি ভিতরের কান। তারপর কান যে রায় দেয় সে রায় কলমকে মেনে নিতে হয়। বিনু প্রেরণায়

বিশ্বাস করে। সাধনায় বিশ্বাস করে, তাই তাঁর উক্তি— " রূপ গুণ ও প্রাণচর্চা উত্তম, কিন্তু যথেষ্ট নয়। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে কী এক দুর্বার প্রেরণা, সে প্রেরণা জীবসৃষ্টির মূলেও।" [১৩]

আবার প্রেরণার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। নিয়ে যাওয়ার ভার প্রেরণার উপর। আর পৌঁছে দেওয়ার ভার প্রজ্ঞার। যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা জাগেনি তাঁকে প্রজ্ঞার জন্য তপস্যা করতে হয়। আবার রিয়ালিজম অংশে বিনুর উক্তি – " রিয়ালিটিকেই তার দরকার বলে রিয়ালিজমে অনাস্থা। মধু চায় বলেই সে গুড় দিয়ে কাজ সারে না। তবে পৃথিবীতে গুড়ও থাকবে, গুড়ের চাহিদাও থাকবে, এমন মানুষও থাকবে যারা গুড় পেলে মধু চাইবে না। এও বড়ো মজার কথা যে, যারা মধু ভালোবাসে তারা গুড়ও ভালোবাসে এবং মাঝে মাঝে মুখ বদলায়। রিয়ালিজমে অনাস্থা আছে বলে বিনু যে রিয়ালিস্টদের রচনা দূরে সরিয়ে রাখে তা নয়। পড়ে তাড়িফ করে।" [১৪]

অন্যদিকে বিনুর ছন্দ জিজ্ঞাসা বেশ গভীর। তাঁর কাছে আর্ট তথা ধর্ম ইনটুইশনমার্গী আর দর্শন বিজ্ঞান ইনটেলেক্টমার্গী। বিনুর কথায়—" মানুষ কি কেবল বিদ্রোহ করেছে, বিদ্রোহের দ্বারাই এক প্রকার ছন্দ রক্ষা করেছে? না, না। মানুষ তো শুধু মানুষ নয়, সে সত্তা।সে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র নীহারিকার সাথী। সে চলে অণু পরমাণুর সাথে তাল রেখে। তাকে ডাক দিয়ে যায় শরতের মেঘ, বসন্তের হাওয়া। সে সাড়া দেয় বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে। গুহার গায়ে হিজিবিজি এঁকে। এমনি করে সংগীতের বিবর্তন, চিত্রকলার বিবর্তন হয়েছে। কাব্যের, ভাস্কর্যের, স্থাপত্যের। আর্ট এইভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আর্টের সঙ্গে সংগতি রেখে রিলিজন। কিংবা রিলিজনের সঙ্গে সংগতি রেখে আর্ট।"[১৫]

বিনুকে এগিয়ে যেতে হয় অনেক কণ্টকময় পথ। তাই বিনু এসব কাটিয়েও প্রেমের দ্বারা অন্তরের বিকাশে বিশ্বাসী। তাই বিনু প্রতিবাদ করে ঘৃণ্য সমাজকে । বিনুর মনটা সমাজের বিরুদ্ধে রুখে রয়েছিল তখনকার দিনে। যে সমাজ নারীকে সতী আখ্যা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে একশবছর আগে তার নীতিবোধের উপর বিনুর ভরসা ছিল না। ইংরেজরা চলে গেলে সতীদাহ প্রথার পুনঃপ্রবর্তন হবে না, কে এ কথা জোর করে বলতে পারে ? ইংরেজরা বহুবিবাহ করে না বলে ইংরেজি শিক্ষিতরাও করছে না। কিন্তু সামান্য একটু ছুঁতো পেলেই আর একটা বিয়ে করতে বাধে না। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না দেখে খবরের কাগজে বহুবিবাহের জন্যে হাহুতাশও ছাপা হয়। স্থির নীতি বলে অস্থির জগতে কিছু আছে কিনা বিনু দীর্ঘকাল তা অন্বেষণ করেছে। বিনু যে সৃষ্টিকর, সেজন্য সে সৃষ্টির নেশায় মত্ত। এ বিশ্ব হাজার কুৎসিত হোক সৃষ্টিকরের চোখে তো সর্বাঙ্গসুন্দর। তবে বিনু যে এক সংকট-এর সম্মুখীন, তাঁর বাধা যে তাঁকেই কাটিয়ে উঠতে হয় – "একদিকে অন্তহীন অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে সীমাহীন প্রত্যয়। বিনু মন দিয়ে বুঝতে পারত না কী আছে, কী নেই। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সব আছে, এক আছেন। বুদ্ধি বলত, নেতি নেতি। স্বজ্ঞা বলত, ইতি ইতি। দর্শন বিজ্ঞান তাকে শেখাত ক্রিটিকাল হতে। কাব্য ও প্রেম শেখাত ক্রিয়েটিভ হতে। ক্ষুরধার পন্থা। ...... তার দেখার ধরন বৈজ্ঞানিকের মতো বিষয়মুখ বা অবজেকটিভ। অথচ যাদের দেখছে তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পৃথক নয়। তাই তার দেখাটা প্রকৃতপক্ষে আত্মমুখ বা সাবজেকটিভ। সে তার আপনাকেই দেখত নাটকের বা উপন্যাসের দুটি চরিত্র রূপে। চরিত্র দুটি সে নিজেই। কিন্তু তাদের উপর তার কোনো হাত নেই। সে শুধু সাক্ষী। এবং লিপিকর। লিপিকরপ্রমাদ যদি ঘটে তো তার অজ্ঞাতসারে। ঘটা বিচিত্র নয়, কারণ চরিত্র এবং চরিত্রকার একই ব্যক্তি।" [১৬] এভাবেই বিনু কবি থেকে ঔপন্যাসিক হয়। এভাবেই বিনু হয়ে উঠে ঔপন্যাসিক। যে কোনো রচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিনুর সাবধানবাণী নিঃস্পৃহ হওয়া। যেমনটা সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কিন্তু উদাসীন হলে চলবে না। সংকল্প করতে হবে, সাধনা করতে হবে; প্রীতির দেনা শেষ করতে হবে। বিনু বলে— "এই যে আমি আপনাকে পাচ্ছি এই আমার পুরস্কার। আমার পুরস্কার আত্ম আবিষ্কার।" [১৭] আর সেটা অন্তরের পূর্ণতা দিয়ে ভরে নিতে হয়। এভাবেই গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষমতাবোধ দিয়ে বিনুর যাত্রা শুরু। শেষ পর্বে এসে বিনু বলে শেষ নয়, অশেষ।

দ্বিতীয় পর্বে সেই জীবন কথাই উঠে এসেছে। যা পূর্ববর্তী প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু তাঁর জীবন দর্শনের রূপ দেখার চেষ্টা করবো। বিশ্বজগৎকে যা ধারন করে আছে, সেই শাশ্বত বিধানই ধর্ম। বিনুর মতে— " ধর্মের সারবস্তু ছেড়ে তার খোলসটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৌলবাদ। যেমন— মুসলিম আরবে, ইরানে, পাকিস্তানে তেমনি হিন্দু ভারতে। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ জনতা গভীর কদমে পতিত হচ্ছে; তবে চিরকালের জন্য নয়। মানুষের স্বয়ং সংশোধিকা শক্তিতে বিনুর বিশ্বাস অটল। একটা প্রজন্মের ভুল আর একটা প্রজন্ম সংশোধন করবে। একটা শতকের ভুল আর একটা শতক। তবে কতক মানুষকে সদা সজাগ থাকতে হবে। তারা অতন্দ্র প্রহরী।"[১৮]

অন্যদিকে 'আর্ট' গ্রন্থের অনেক প্রসঙ্গই প্রাথমিক ভাবে বিনুর বইয়ে আলোচিত হয়েছে বলে নতুন করে আর এই গ্রন্থের বিশ্লেষণ এখানে করা হলো না। শুধু এতটুকু আমরা জানবো সবকিছু নিয়েই আর্টের আপন সংসার। শিল্পী শিল্পে কী বলেছে ও কেমন করে বলেছে সঙ্গে কে বলেছে তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষৎ সম্ভাবনার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না বলেই প্রাবন্ধিক সাম্প্রদায়িকতার, অশিক্ষার, অপসংস্কৃতির সংহতিহীনতার ঘনায়মান অন্ধকারের আলোকবর্তিকা। তাঁর আলো দেবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এই হল অন্নদাশঙ্করের জীবন দর্শন। যে দর্শনের মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা , জ্ঞান , অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ততা, সত্যের উপলব্ধি , বিচারের ভারসাম্য ও বিশ্লেষণের সামঞ্জস্যতা - যা ভারতীয় দর্শনের মূল কথা ।

তথ্যসূত্র-

১/রায় অন্নদাশঙ্কর, প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড , সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ - ১৪০৬ পৃ- ৫৭৭

২/ ঐ পৃ-৫৭৭ , ৩/ঐ পৃ-৯৪ , ৪/ ঐ পৃ- ৯৪ , ৫/ঐ পৃ-১০৭ , ৬/ঐ পৃ-১১০

৭/রায় অন্নদাশঙ্কর, প্রবন্ধ সমগ্র নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ - ১৪১৩ পৃ- ১৯

৮/ঐ পৃ- পৃ- ২২ , ৯/ ঐ পৃ- ২৪-২৫ , ১০/ ঐ পৃ- ৩৫ , ১১/ঐ পৃ- ৪৮ , ১২/ ঐ পৃ- ৪৯

১৩/ঐ পৃ- ৫১ , ১৪/ ঐপৃ- ৫৯ , ১৫/ঐ পৃ- ৫৯ , ১৬/ ঐ পৃ- ৬৭ , ১৭/ ঐ পৃ- ৬৭ , ১৮/ ঐ পৃ- ১৬৩

সহায়ক গ্রন্থ-

১/ বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় ,শিবনারায়ন রায় , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪০০,

২/ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ , অন্নদাশঙ্কর রায় , প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫ সংস্করণ ১৯৯৪

....

সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ , বীরভূম মহাবিদ্যালয় , সিউড়ি